রাজবৃত্তে রাঢ়ের প্রজাজীবন • সুদীপ্ত পোড়েল

কলকাতা প্রকাশন

# রাজবৃত্তে রাঢ়ের প্রজাজীবন

## সুদীপ্ত পোড়েল

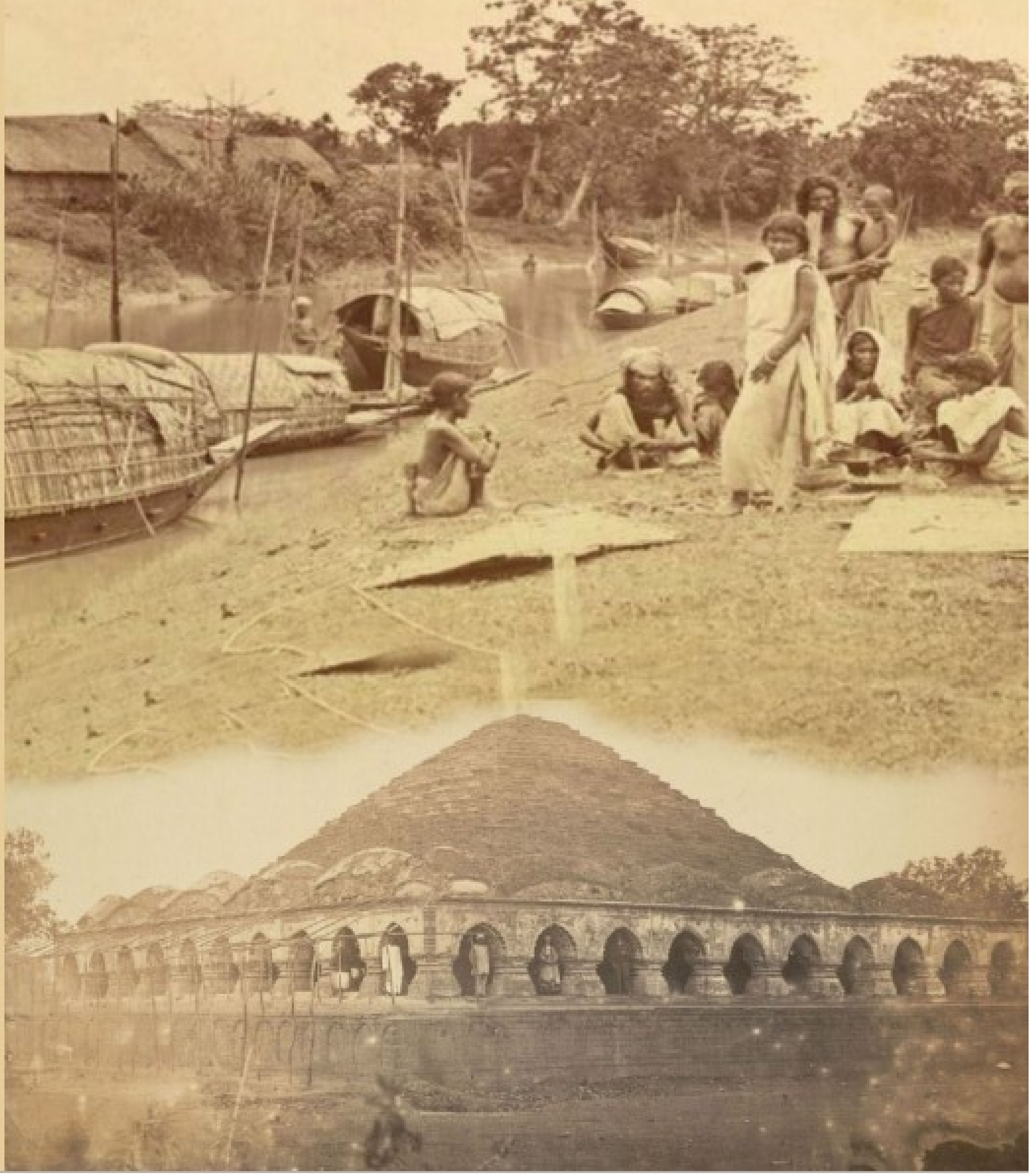

# রাজবৃত্তে
# রাঢ়ের প্রজাজীবন

সুদীপ্ত পোড়েল

কলকাতা প্রকাশন

RAJBRITTE RADHER PROJAJIBAN
*by Sudipta Porel*
*(M-8697748385, porel2008@gmail.com)*
Rs. 650.00

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর, ২০২৪

গ্রন্থস্বত্ব : শুভ্রা পোড়েল

কলকাতা প্রকাশনের পক্ষে ৪৮/১২, এন এস সি বোস রোড কলকাতা ৭০০ ০৪০ থেকে সৌরভ মণ্ডল কর্তৃক প্রকাশিত (৯৮৩৬৩২৭৫৩৬/ ৯৮৭৪৪২৬৩৩৩) এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টার্স,
৩০ বিধান সরণী কলকাতা ৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত

বর্ণসজ্জা : অশোক ঘোড়াই, নিউব্যারাকপুর, ৯৮৭৪০৩৭৫২১

পরিবেশক : দে'জ পাবলিকেশন, কলেজ স্ট্রিট

বিনিময় মূল্য : ৬৫০৲

# উৎসর্গ

স্বর্গীয় পিতা রণজিৎ কুমার পোড়েল
ও
স্বর্গীয় মাতা ঝর্ণা পোড়েল

# মুখবন্ধ

বাংলা ভাষায় ইতিহাস সম্পর্কিত প্রথম সাময়িকপত্র 'ঐতিহাসিক চিত্র'-এ শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার মৈত্র লিখেছেন, 'বাঙালি নিজে চেষ্টা না করিলে সেই ইতিহাস লিখিত হইতে পারে না।'

অস্বীকার করার উপায় নেই শুধুমাত্র গবেষণার অবহেলায় বহু ইতিহাস হারিয়ে গেছে। আবার বহু আঞ্চলিক ইতিহাস প্রসিদ্ধ হয়েছে গবেষকদের আন্তরিক প্রয়াসে। বলাই বাহুল্য ইতিহাসচর্চা সম্পূর্ণ হতে পারে না আঞ্চলিক ইতিহাস তুলে না আনলে। সাধারণত গবেষকরা আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা থেকে বিরত থাকেন সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন না বলে, সেই হিসাবে আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা এক কঠিন প্রয়াস।

বাঁকুড়া জেলার ইতিহাসচর্চার যে গৌরবময় অধ্যায় প্রবাহিত হয়েছে তার যোগ্য উত্তরসূরী বলা যেতে পারে সুদীপ্ত পোড়েলকে। তাঁর রচিত 'রাজবৃত্তে রাঢ়ের প্রজাজীবন' তাঁর ইতিহাস সাধনার উৎকৃষ্ট ফসল।

ইতিহাসের একজন শিক্ষক, গবেষক, পাঠক এবং ছাত্র হিসাবে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাই এই বইয়ের লেখক সুদীপ্ত পোড়েলকে। যেকাজ একজন ইতিহাসের ছাত্রের করা উচিত ছিল সেই কাজ সম্পন্ন হচ্ছে একজন পেশাদার প্রশাসনিক আধিকারিকের হাত ধরে।

প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো এই গবেষণাগ্রন্থের ভূমিকা লেখার প্রকৃত অধিকারী আমি নই। কেননা ইতিহাসের যে প্রেক্ষাপটে আমার বিচরণ, তা থেকে পৃথক প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে এই পুস্তকখানি। এতে সুবিধা হয়েছে তনিষ্ঠ পাঠকের ন্যায় উপলব্ধি করতে পেরেছি এই পুস্তকটি। যা থেকে আমার উপলব্ধি হয়েছে একজন যোগ্য প্রশাসনিক আধিকারিক হয়েও সুদীপ্ত পোড়েল মহাশয় ইতিহাসের একজন প্রকৃত গবেষক। উপলব্ধি করেছি তাকে কি বিপুল পরিমাণ শক্তিক্ষয় করতে হয়েছে এই গবেষণা গ্রন্থটির প্রতিটি শব্দ তুলে আনার জন্য এবং তথ্যনিষ্ঠ সত্য পরিবেশনে।

নির্দ্বিধায় বলা যায় তাঁর এই পুস্তক ইতিহাসের কোন থিসিস (গবেষণাপত্র) অপেক্ষা কম কিছু নয়। এই গবেষণার মাধ্যমে তিনি অনায়াসেই অর্জন করতে পারতেন কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত পিএইচডি অথবা ডিলিট অথচ তিনি সেসব উপেক্ষা করে সহজ সরল ভাষায় ইতিহাসকে পরিবেশন করেছেন সাধারণ পাঠকদের কথা ভেবে এবং জনমানসে ইতিহাস চেতনা গড়ে তোলার জন্য।

জনমানসে তাঁর এই ইতিহাসচেতনা গড়ে তোলার প্রয়াসের প্রতি ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা।

বারোটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত 'রাজবৃত্তে রাঢ়ের প্রজাজীবন' গ্রন্থটিতে তিনি মূলত তুলে ধরেছেন ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত রাঢ় বাংলার অন্তর্গত জঙ্গল মহলে যে ভূমরাজ্যগুলি গড়ে উঠেছিল তার সুনির্দিষ্ট ইতিহাস। বলা যেতে পারে এই গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি অভিমুখ গড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এই অঞ্চল নিয়ে গবেষণা-প্রয়াসী ভবিষ্যত গবেষকদের। ১৯৭৭-৮২ নিজের গবেষণার প্রয়োজনে এই অঞ্চল পরিভ্রমণকালে ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে কষ্ট পেয়েছিলাম ইতিহাসের তথ্যপ্রমাণ কিভাবে হারিয়ে যাচ্ছে তা দেখে।

অস্বীকার করার উপায় নেই পাঁচশ বছরের পরিসরে দশটি ভৌমরাজ্যের উত্থান বাঁকুড়া জেলায় যে উজ্জ্বল নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনা করেছিল কালের আবহে তা লুপ্তপ্রায়। এই সময়ে দাঁড়িয়ে রসপাল রাজবাড়ি বা খাতড়া রাজপরিবারের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অথচ সেই দুষ্কর কাজটিই তিনি করেছেন এই পুস্তকে।

বইটা পড়লে অনুধাবন করা যাবে ইতিহাস বলতে তিনি শুধুমাত্র রাজা-রাজদের কথাই তুলে আনেননি। প্রস্ফুটিত করেছেন সমকালীন ধর্মীয় ভাবাবেগ, ধর্মবিস্তারের ইতিহাস, প্রসারিত সাহিত্য ও সংস্কৃতির কথা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা তথা তৎকালীন সামাজিক যাপনচিত্র। যা ভবিষ্যত ইতিহাসগবেষকদের পথ দেখাবে বলেই আমার বিশ্বাস। সেইসঙ্গে আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই গ্রন্থপ্রকাশের ফলে একদিকে যেমন প্রাতিষ্ঠানিক গবেষকদের পথ দেখবে তেমনি অন্যদিকে সাধারণ পাঠককে আকৃষ্ট করবে আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রতি।

ডঃ রূপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়
ভূতপূর্ব অধ্যাপক, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

# লেখকের কথা

২০১০ সালে প্রকাশিত 'অতীত বাঁকুড়ার সমাজ ও অর্থনীতি' বইটি প্রকাশের পর থেকেই রাঢ় বাঁকুড়ার দশটি ভূম রাজ্য ভিত্তিক ইতিহাস রচনা করার কথা ভাবতে থাকি। সেই ভাবনারই ফসল এই পুস্তকটি। এটি শুধু উপজেলা স্তরের রাজন্যবর্গের ইতিহাস নয়, বরং ভূমরাজ্যের আপামর প্রজাসাধারণের, বিশেষত অন্ত্যজ মানুষের ইতিহাস। যে সময়ের পরিসর ভারতদেশে আফগান-তুর্ক শাসনের সূচনা পর্ব থেকে ঔপনিবেশিক শাসনে ভৌমরাজ্যগুলির অবলুপ্তি পর্যন্ত।

রাঢ় বাকুড়ায় ভূম রাজ্যগুলি হল সামন্তভূম, মল্লভূম, তুঙ্গভূম, ধবলভূম। পরে এই ভূমরাজ্যগুলি বিভাজিত হয়ে কয়েকটি স্বতন্ত্র্য তালুকে পরিণত হয়। যেমন তুঙ্গভূম শ্যামসুন্দরপুর, ফুলকুসুমা, রাইপুর, সিমলাপাল ও ভেলাইডিহা নামে পাঁচটি পরগণায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। ধবলভূমে সৃষ্টি হয় খাতড়া ও অম্বিকানগর পরগণা দুটি। মল্লভূমির প্রভাব বলয়ের প্রান্তিক শক্তি হিসাবে উঠে আসে মালিয়াড়া এস্টেট। এই আখ্যানে তাই আলোচিত হল (১) সামন্তভূম (২) মল্লভূম (৩)শ্যামসুন্দরপুর (৪) ফুলকুসুমা (৫) রাইপুর (৬) সিমলাপাল (৭) ভেলাইডিহা (৮) খাতড়া (৯) অম্বিকানগর (১০) মালিয়াড়া পরগণার কথা।

রাঢ় বাঁকুড়ায় ভূমরাজ্যগুলির পত্তন ঘটে অরণ্যান্তরালে বর্ণেতর মানুষের ক্ষমতায়নের অনুষঙ্গে। পাল শাসনে রাঢ় বাঁকুড়ার স্থানীয় উপজাতীয় জনজীবন গোষ্ঠী জীবনের আঙ্গিনা থেকে বহত্তর রাষ্ট্র চেতনায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তখনও এ দেশ ছিল কোটাটবী, তৈলকম্প, শূরশাসক ও আংশিক ওড়িয়া শাসনের বৃত্তে। সেন বংশের পতনোত্তর শূন্যতা পূরণে ও মুসলিম শাসকদের আগমনের ক্ষণে ভূমরাজ্যগুলির উন্মেষ ঘটে। এ সময় বৃহৎ শক্তিগুলি অরণ্যশঙ্কুল অনুর্বর এই রাঢ়

খন্ডে যেমন শক্তি সংহত করতে চায়নি, তেমনি উপজাতীয় ও আর্যেতর জনসমাজের লৌকিক ভাবনার প্রাবল্য বহুকাল মূল ধারার ধর্মীয় ও সামাজিক স্রোতকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। অতিঝঞ্ঝায় গাছেরা মাথা নুইয়ে মাটি স্পর্শ করলেও দিন শেষে আবার খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। পাল সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন ভাবধারা রাঢ়ের জনমনকে নাড়িয়ে দিলেও লোকধর্মের উৎসে ফিরে যেতে বেশি সময় লাগেনি। আর ভৌম রাষ্ট্র শক্তিগুলি সংহত হলে, মূলধারার ধর্মীয় ও সামাজিক ভবনা গণমতকে প্রভাবিত করেছিল লোকধর্মের মোড়কে। মোট কথা দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকে মধ্যে ভূমরাজ্যগুলির উদ্ভব ঘটেছিল আর্যেতর সর্দারতন্ত্রের খোলস ছেড়ে বহত্তর রাষ্ট্র ভাবনায় অঙ্গীভুত হওয়ার বাসনাকে সম্বল করে।

সামন্তভূমের সূচনা পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। আদিতে শিখরভূমের প্রভাব বলয়ে ছিল পূর্ব সীমান্তের সামন্তভূম রাজ্যের। জনশ্রুতি এক সময় শিখররাজ কুলপুরোহিতের বংশের ভবানী ঝরাইতকে বারো সাঁওতাল উপসম্প্রদায় অধ্যুষিত এই বন প্রদেশে অনুগত রাজা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে। রাজা ভবানীর প্রজাদের উপজাতীয় ভাবধারায় আঘাত হেনে পার্বতী পূজার মত আর্যীয় আচার ও চর্চা প্রচলনের প্রয়াসের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ ঘনীভূত হতে থাকে। তারই ফলশ্রুতিতে মোলবোনা গাজন মেলায় ছাতনারাজের সপরিবার যাত্রার প্রথার সুযোগে সাঁওতাল গুপ্ত ঘাতকের হাতে সপরিবারে রাজপরিবারটির বিনাশ ঘটে। সে প্রাণঘাতী হাতিয়ার আজও রাজপরিবারে সযত্নে রক্ষিত ও দূর্গাপূজার অনুষঙ্গে পূজিত। বারো সাঁওত সর্দারের প্রারম্ভিক যৌথ শাসনের ঘেরাটোপ থেকে শীঘ্রই জন্ম নেয় বর্তমান রাজবংশের শাসনধারা। ঘাটোয়ালী সর্দারতন্ত্রে আধারিত এই রাজ বংশের প্রভাব অস্তমিত হয় ইংরেজ শাসনের অন্তভাগে। সমর শহর ও পরবর্তীকালে জেলাশহর হিসাবে গড়ে ওঠা বাঁকুড়া, ছাতনা রাজের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নেওয়া জমিতে গড়ে ওঠে। যেটি ছিল সামন্তভূমের নদী বাণিজ্যকেন্দ্র রাজগ্রামের উপকণ্ঠে। সামন্তভূমের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের রেখচিত্র অনেকটাই ধরা পড়েছে আলোচ্য পরিসরে।

সামন্তভূম সংলগ্ন বৃহৎ ভূমরাজ্য মল্লভূমের সূচনা অনেকটাই জনশ্রুতি ও কাহিনী নির্ভর। ৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে(৩০৩ মল্লাব্দে) মল্লভূমি পত্তনের ইতিহাস প্রামাণিক তথ্যনির্ভর নয়। সমকালীন ঐতিহাসিক নথিতেও তার উল্লেখ নেই।বরং ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে প্রদ্যুম্নগড় কেন্দ্রিক শাসানাধিষ্ঠান ও সেই রাজাধারের অবসানে লাউগ্রাম

কেন্দ্রিক স্থানীয় মল্লদলপতির উত্থান অনেক বেশি ইতিহাস সমর্থিত। চতুর্থ অনঙ্গভীমের রাঢ় বিজয়ের পর ১২৪৪ খ্রিষ্টাব্দের মার্চে অনঙ্গ পুত্র জাজনগরের প্রথম নরসিংহদেব বাংলার শাসক তুঘান খানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান করেন। ১২৪৫ খ্রিষ্টাব্দের কাটাসনের যুদ্ধে ওড়িয়া শাসকের হাতে তুর্ক বাহিনীর পরাজয়ে দক্ষিণ রাঢ়ে ওড়িয়া আধিপত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিজয়ের অনুষঙ্গে প্রথম নরসিংহদেবের জামাতা পরমারদিন বা প্রদ্যুম্ন গড়মন্দারণে প্রান্তিক প্রশাসনিক ও সামরিক গড়ে ঘাঁটি তৈরি করেন। কিন্তু ১২৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বঙ্গ-বিহারের শাসন কর্তা মুঘিসউদ্দিন ইউজবেক গড়মন্দারণ একাধিকবার আক্রমণ করে ১২৫৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রদ্যুম্নকে পরাজিত করেন। অধ্যাপক পি মুখার্জী এই যুদ্ধের ফলে প্রদ্যুম্নের মৃত্যুর কথা বলেন, যেখানে অধ্যাপক নুরুল হাসান মনে করতেন সব কিছু ছেড়ে তিনি পলায়ন করেন। ঐতিহাসিক রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর মতে গড়মন্দারণে পরাজয়ের পর প্রদ্যুম্ন বা তার বংশধরেরা জয়পুর জঙ্গলে প্রদ্যুম্নপুর কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন (প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যুম্নের নামে এই গড়ের নাম প্রদ্যুম্নপুর নামকরণ সম্ভব)। গবেষকদের মতে কান্তরে প্রাপ্ত অষ্টভূজা নটরাজ (যেটি স্থানীয়ভাবে ষটক্রবাহিনী নামে পরিচিত) প্রদ্যুম্ন রাজাদের গৃহদেবতা ছিল। নটরাজ মূর্তি দক্ষিণ ভারতেই পাওয়া যায়। প্রদ্যুম্নপুর পরিমন্ডলে সলদা-গোকুলনগরে ভূবনেশ্বর ও গন্ধেশ্বর শিব মন্দিরের, দেউলভিড়ার ১০৮ শিব মন্দিরের প্রাচীনত্ব থেকে এই এলাকার অতীত রাজনৈতিক গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। অনেকে এটি শৈব শশাঙ্কের প্রান্তিক শাসনকেন্দ্র বলে ভাবলেও, লাউগ্রামে শক্তি সংহত করে দন্ডেশ্বরীর পূজারী মল্লরাজ হাম্বিরের পূর্বজ স্থানীয় অর্ধউপজাতীয় দলপতি ক্রমে গনদেবতা শিবের উপাসকে পরিণত হয়ে এসব শৈবকেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন বলে মনে করা অনেক বেশি ঘটনা সমর্থিত। ক্রমে এই গোষ্ঠীপতি শক্তি সংহত করে প্রদ্যুম্নগড়ের ওড়িয়া বংশীয় শাসককে উচ্ছেদ করে এলাকার শক্তিশালী রাজায় পরিণত হয় ও বিষ্ণুপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই বংশের প্রথম ইতিহাস স্বীকৃত মল্ল রাজা হলেন বীর হাম্বির। তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে। অর্থাৎ পারমাদিন বা প্রদ্যুম্নের সম্ভাব্য জয়পুর বনমধ্যে শাসনাধিষ্ঠান পত্তন ও বীর হাম্বিরের উত্থানের মধ্যবর্তী তিন শতক ছিল অর্ধউপজাতীয়(বাগদী সম্পর্কিত) মল্ল সর্দারদের শক্তির বিকাশের কাল। হাম্বিরের সমকালে প্রদ্যুম্নপুর-শলদা-গোকুলনগর পরিমন্ডল শৈব কেন্দ্র থেকে বৈষ্ণব আরাধনা কেন্দ্রে পরিণত হয়। এদিকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে

রাঢ়ের এই অংশে ইংরেজ শাসকদের প্রবল প্রশাসনিক উপস্থিতি মল্লশাসকদের কাছে অশনি সংকেত বয়ে আনে। ঐতিহাসিক সমাপতনের নিরিখে মাত্র দুই শত বছরের মধ্যে ইংরেজ শাসনে সূচনা লগ্নের এই মল্ল শাসনের অন্তরাগ রচিত হয়ে যায়। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের পরিসরেই দেবালয়পূর্ণ মল্লভূম, মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরে নির্মাণ সম্পন্ন হয়। বিচিত্র ও বহুমাত্রিক ধর্মীয় ভাবনার বিকাশ ও বিস্তার এই গ্রন্থের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

দক্ষিণ বাঁকুড়ার অন্যতম বৃহৎ ভূমরাজ্য তুঙ্গভূমের ইতিহাস অরণ্য অন্তর্গত আঁধারের মতই অস্পষ্ট। সাঁওতাল ভূমিজ দ্বন্দ্বের আবহে তুঙ্গভূমের রাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। রাঢ়ের এই প্রান্তদেশে আদি বাসিন্দা মুন্ডা-ভূমিজদের আধিপত্যে ভাগ বসাতে থেকে শিলদা কেন্দ্রিক অভিবাসিত সাঁওতাল উপজাতিতন্ত্র। ঐতিহাসিকদের বিশ্লেষণে এই জমি দখলের লড়াইয়ের চূড়ান্ত পরিণতি ভূমিজ নকুড়ের নেতৃত্বে সাঁওতাল সামন্তসার রাজ্যের উৎসাদন। পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে সৃষ্ট শ্যামসুন্দরপুর-রসপাল(ফুলকুসুমা) কেন্দ্রিক তুঙ্গভূমিতে এই শাসনের ধারা অব্যাহত ছিল ঔপনিবেশিক সময় কাল পর্যন্ত। সপ্তদশ শতকের শুরুতে অবশ্য অখন্ড তুঙ্গভূম শ্যামসুন্দর কেন্দ্রিক বড়তুঙ্গ ও রসপাল কেন্দ্রিক ছোটতুঙ্গ ভূমিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নকুড়ের হাতে তুঙ্গভূমে শাসনাধিষ্ঠান সূচনা পর্বে মিত্র ভূমিজ সেনাপতিকে রাইপুরের শাসন ভার এবং গুরু তথা রাজনৈতিক পরামর্শদাতা শ্রীপতি মহাপাত্রকে সিমলাপাল পরগণা দান করেন। সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে অবশ্য শরিকি বিবাদে সিমলাপালের অখন্ডতা বিনষ্ট হয়ে ভেলাইডিহা পরগণার জন্ম হয়। তুঙ্গভূমের এই পরগণাগুলিতে পালা-পার্বণ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সংস্কৃতির বিকাশ এই গ্রন্থটিতে সমীক্ষা ও তথ্য ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে।

আরেকটি ভূমরাজ্য ধবলভূমের বিকাশের সাথে অর্ধউপজাতীয় রজক বা ধোপা সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের অনুষঙ্গ জড়িত। এই ঘটনা ঘটেছিল সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে। ওড়িয়া প্রভাবিত দক্ষিণ বাঁকুড়ায় ওড়িয়া সাহিত্য চর্চার চল ছিল। ধোপা বা ধবল বংশোদ্ভুত অম্বিকানগর রাজবাড়ীতেও এই চর্চা অব্যাহত ছিল। অম্বিকানগর রাজা ছাড়াও ধবল রাজবংশের অন্য শাখা খাতড়ার রাজবংশ কয়েক পুরুষের মধ্যে ঋণগ্রস্ত ও জমিদারি উচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। চৈতন্য পার্ষদ গদাধর গোস্বামীর পৌত্র মথুরানন্দ ধবলভূম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জগন্নাথ ঢোলের কুলগুরু হিসাবে এরাজ্যে এসে ব্রজরাজপুরে শ্যামসুন্দরের প্রতিষ্ঠা করেন। বর্গী আক্রমণ প্রতিহত করতে যেমন

খাতড়া রাজপরিবার বীরত্ব দেখিয়েছিল তেমনই ইংরেজ বিরোধী চুয়ার বিদ্রোহ ও বিপ্লবী আন্দোলনে অম্বিকানগর রাজপরিবারের সদস্যদের যোগদান ছিল সাহসিক ও স্মরণীয়। বিভিন্ন অজানা কাহিনী নিয়ে প্রায় অনালোচিত খাতড়া রাজপরিবার ও স্বল্প আলোচিত অম্বিকানগরের বিভিন্ন দিক আলোকপাত করা হয়েছে এই গ্রন্থে।

বড়জোড়া-বেলিয়াতোড় কেন্দ্রিক শূরভূম পরিমন্ডলে গড়ে উঠেছিল মালিয়াড়া রাজ অধ্বর্য্যু বংশের রাজত্ব। মানসিংহের বাংলা অভিযানের বীর সেনানী দেব অধ্বর্য্যু মোঘল সেনাপতি মানসিংহের আনুকূল্যে যে রাজ বংশের পত্তন ঘটান সেটি সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা, স্থাপত্য, জনসেবায় উৎকর্ষ স্থান দখল করে। রাঢ়ভূমির রামানন্দ পন্থী ভাবধারার প্রসার এবং রামমন্দির-অস্থল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই পরিবারের সাথে পশ্চিমাগত সম্প্রদায়ের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

রাজবৃত্তে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে প্রজাদের সুখ,আহ্লাদ, ভালো থাকা না থাকার কাহিনী। নীলচাষ, মহাজনি কারবার, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, ঋণ ও রাজস্বভার, প্রজা অসন্তোষ, বিদ্রোহ, স্থাপত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, উৎসব, জীবিকা সহ বিভিন্ন বিষয় এসেছে সেই আলোচনার বৃত্তে।

নিরলস প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বহু বিষয় উল্লেখ করা গেল না। তার অনেকটাই হয়ত আমার অগোচরে রয়ে গেছে বা অপ্রতুল তথ্যের কারণে। কিন্তু সেই খামতি যদি ভাবীকালের কাছে নতুনতর গবেষণার রসদ যোগায়, তাহলেও আমার এই পরিশ্রম কিছুটা সার্থক হবে। যথেষ্ট খুঁটিয়ে দেখেও হয়ত এই বৃহৎ পরিসরে রচিত রাঢ় বাঁকুড়ার ভূমরাজ্য ভিত্তিক ইতিহাসে কিছু তথ্যগত অসঙ্গতি ও ভ্রান্তি রয়ে গেল। ভবিষ্যতের ত্রুটি মুক্তির অঙ্গীকার রইল। ক্ষেত্র সমীক্ষা ছাড়াও গ্রন্থের অন্তভাবে উল্লেখিত লিখিত উৎসগুলি যেমন গ্রন্থটি রচনায় সহায়ক হয়েছে, উল্লেখিত ব্যক্তি ঋণও শোধ হওয়ার নয়। পরিশেষে অধ্যাপক রূপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিভিন্ন ভাবে উৎসাহ যোগানোর কথা না বললে এই লেখা অপূর্ণ থেকে যাবে। তিনি গ্রন্থটির মুখবন্ধ রচনা করে আমাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

পাঠক মহলে এ গ্রন্থটি সমাদৃত হলে আমার গ্রন্থ রচনার কায়িক ও বৌদ্ধিক শ্রম সার্থক হবে।

কলকাতা
অক্টোবর ২০২৩

সুদীপ্ত পোড়েল

# সূ চি প ত্র

**প্রথম অধ্যায় : বাঁকুড়ার ভূমরাজ্য** ১৭-২৭

রাঢ়ের দশটি ভূমরাজ্য ও বর্ণেতর যোগ ১৭
দশটি ভূমরাজ্যের বংশতালিকা ২০

**দ্বিতীয় অধ্যায় : শ্যামসুন্দরপুর** ২৮-৪৯

শ্যামসুন্দরপুরের রাজকথা ২৮ তুঙ্গরাজবংশ প্রতিষ্ঠার প্রাককথন ২৮
বংশপঞ্জি ও রাজকাহিনী ২৯ সাহিত্য ও সংস্কৃতি ৪১
ধর্মীয় পরিমন্ডল ৪২ শ্যামসুন্দরপুরের দেবীপূজা ৪৩
ঔপনিবেশিক অভিযান ৪৪ দেবোত্তর সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও ভূদান ৪৫
ভূসম্পত্তিদানের খতিয়ান ৪৬ শ্যামসুন্দরপুরের পতন ৪৭

**তৃতীয় অধ্যায় : রাইপুর কথা** ৫০-৭৬

সিংহ রাজবংশের পত্তন ৫০ মহামায়ার আবির্ভাব ৫২
রাইপুর রাজবংশের বংশতালিকা ও রাজকাহিনী ৫৬
রঘুনাথ ও ফতে সিংহ : রাইপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ৬০
দুর্জন সিংহের বিদ্রোহ : ফতে সিংহের রাজ্যাভিষেক ৬০
বীরসিংহদেবের রাজকাল ও ক্ষুত্র জমিদারির পত্তন ৬৫
রঘুনাথ সিংহ ও হরিহর সিংহের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধ ৬৬
ইন্দ্র সিংহদেব (১ম রানী উজ্জ্বলকুমারী, ২য় রানী নিশাকুমারী) -লাল সিংহদেবের সমকালীন প্রজাদুর্দশা ৬৭
রাইপুরের রাজা বলভদ্র সিংহদেবের ঋণগ্রস্ততা ৬৭
পারিবারিক বিরোধ ও জমিদারির পত্তন ৬৯
রাইপুর পরগণার শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসার ৭১ নীলচাষ ও রাইপুর ৭২
রাইপুরের দুর্ভিক্ষ ও ত্রাণভাবনা ৭৩ রাইপুরের পতন ৭৩

**চতুর্থ অধ্যায় : ফুলকুসুমার ইতিহাস** **৭৭-৯৯**

পরগণার পত্তন ৭৭ রাজবংশ ও রাজকাহিনী ৭৮
ভূমিরাজস্বের ঊর্ধমুখিতা ৮৩ সুখনিদি স্বত্ব ও চুয়ার বিদ্রোহ ৮৪
শিক্ষা-সংস্কৃতির খতিয়ান ৮৬ রসপালের লোকজীবন ও বাঘুৎ পূজা ৮৭
ফুলকুসুমার পতন ৮৯ ফুলকুসুমা (রসপাল) রাজবংশের পতনের ঘটনাক্রম ৮৯

**পঞ্চম অধ্যায় : সিমলাপালের ইতিহাস** **১০০-১১৬**

সিমলাপালের পত্তন ১০০ রাজবংশও রাজকাহিনী ১০২
মল্লভূমের সাথে বিরোধ ও মিত্রতা ১০৯ সিমলাপাল পরগণার বিভাজন ১০৯
সিমলাপাল দুর্গাপূজার বিশেষ প্রথা ১১১ কুবেরের 'পেতে'র ইতিহাস ১১১
পার্শলা গ্রামের মল্লিকদের দুর্গাপূজার ইতিহাস ১১২
জাড়িষ্যা গ্রামের সিংহমহাপাত্র ১১৩
মহাপাত্র বংশের আদি বাসস্থান ওড়িষ্যার বীররামচন্দ্রপুর ১১৩
সিমলাপালের দুর্ভিক্ষ ও ত্রাণভাবনা ১১৪ সিমলাপালের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ১১৫
জমিদারি উচ্ছেদ ১১৬

**ষষ্ঠ অধ্যায় : ভেলাইডিহার কথা** **১১৭-১৩৯**

ভেলাইডিহার পত্তন ১১৭ রাজপরিবারের বংশতালিকা ও রাজকাহিনী ১১৯
রাজপরিবারের বীরত্বগাথা ১২১ বিচারব্যবস্থা ১২২
শিক্ষা বিস্তার ও সংস্কৃতির বিকাশ ১২২ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব ১২৪
ভেলাইডিহা রাজপরিবারের দুর্গাপূজা ১২৫
ভেলাইডিহাতে নীলচাষের প্রসার ১২৬ লক্ষ্মীসাগর পরিমন্ডল ১২৭
সঙ্গীত ও সংস্কৃতি চর্চা ১৩১ শিকার সংস্কৃতি ও এখ্যান উৎসব ১৩২
ভূমিব্যবস্থা ১৩৩ রাজধানীর হালহকিকত ১৩৩
মুক্তি আন্দোলন ও ভেলাইডিহা রাজার ভূমিকা ১৩৪
প্রজাজীবন ১৩৫ ভেলাইডিহা রাজপরিবারের ভাঙ্গন ১৩৬
রাজবংশের পতন ১৩৮

**সপ্তম অধ্যায় : ধবলভূমের ইতিহাস (অম্বিকানগর ও খাতড়া)** **১৪০-১৬৮**

ধবলভূমের পতন ও চিন্তামণি পাই ১৪০ জগন্নাথ ধল্ল বংশের সূচনা ১৪১
মথুরানন্দ গোস্বামীর আগমন ও ধবলভূমের বিভাজন ১৪৩

খাতড়া-সুপুর রাজা : ব্রজরাজপুর কাহিনী ১৪৫
অম্বিকানগরের গড়ে ওঠার ইতিহাস ও রাজকাহিনী ১৪৭
খাতড়া রাজবংশের পরিচয় ১৫৫ ধবলভূমের প্রজাজীবন ১৬১
ব্রজরাজপুরে বর্গি আক্রমণ ও প্রজাদুর্দশা ১৬৪
মশকপাহাড়ের কথা ১৬৫ পতনের নির্ঘন্ট ১৬৬
শেষকথা ১৬৭

**অষ্টম অধ্যায় : সামন্তভূম ছাতনায় সাঁওত রাজা ও সাঁওতাল জনসমাজ ১৬৯- ২০১**

সামন্তভূমের পত্তন ১৬৯ রাজবংশ পরিচয় ও রাজকাহিনী ১৭৬
জমিদারি রক্ষার সার্বিক প্রয়াস ১৮৬ সামন্তভূমের ব্যবসা-বাণিজ্য ১৮৬
ঘাটোয়ালী প্রথা ১৮৭ ধর্মীয় পরিমন্ডল ১৮৯
মল্লভূমের সাথে বিরোধ ও ফলাফল ১৯৩ পতনের সালতামামি ১৯৪

**নবম অধ্যায় : মালিয়াড়া কথা ২০২-২২০**

মালিয়াড়ার পত্তন ২০২ রাজবংশ তালিকা ২০২
বিভিন্ন রাজা ও তাদের কাহিনী ২০৪
মন্দির প্রতিষ্ঠা ও মালিয়াড়ার ধর্মীয় পরিমন্ডল ২১৫
অধীনস্থ জমিদার চৈতন্যপুরের দুর্গাপূজা ২১৮
শেষ কথা ২১৯

**দশম অধ্যায় : মল্লভুম ২২১- ৪০৬**

লাউগ্রামের সায়লা উৎসব ও মল্লরাজবংশের সূচনাপর্ব ২২১
প্রাকমল্ল সলদা-গোকুলনগর পরিমন্ডলের তাৎপর্য ও প্রদ্যুম্নপুর কথা ২২৩
মণিপুর-বীরসিংহ-কোড়াসুরগড়ের তাৎপর্য ২৩৩
বীরসিংহ পরিমন্ডল ২৩১ ছান্দার পরিমন্ডল ২৩৩
মল্লভূমের পত্তন ও মল্লরাজবংশের ইতিহাস ২৩৫
চৈতন্য বিরোধী দামোদর সিংহের বিদ্রোহ ও মল্লভূমের দুর্গতি ২৫০
মল্লরাজ্যের পতনের নির্ঘন্ট ২৫২
মল্লভূমের ব্রিটিশ প্রতিনিধিঃবর্গি ও পাহাড়ী উপদ্রব সংবাদ ২৬২
মল্লভূমে মন্বন্তর ২৬৫ মল্লভূমে চুয়ার বিদ্রোহ ২৬৬
মল্লভূমে সন্ন্যাসী আগমন ২৭০ মল্লভূমে মন্বন্তরের অভিঘাত ও ফলাফল ২৭১

মল্লভূমে রাজউৎসব ২৭৪ সামাজিক কুসংস্কার ২৭৬
মল্লশাসনে সঙ্গীত সমাজ ও বিষ্ণুপুর ঘরানার জন্ম ২৭৭
শুভঙ্কর কথা ও মল্লশাসনে সামাজিক চিত্র ২৭৯ শ্রীনিবাস আচার্য ঘরানা ২৮০
মল্ল রাজবংশের পতনোত্তর কুচিয়াকোল, জামকুড়ি ও ইন্দাস ২৮৪
মল্লভূমের কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবার ও গণউৎসব ৩০০
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রাম পত্তনের নিদর্শন ও গ্রাম প্রশাসন ৩৫০
মল্লভূমে বিভিন্ন পেশা-জাতির মানুষের অভিবাসনের ইতিহাস ৩৬৫
মন্দির স্থাপত্যের কারিগর ৩৭৩ বিষ্ণুপুরের শিল্প ও শিল্পীসমাজ ৩৭৬
রাজহাটী বাণিজ্যকেন্দ্র ৩৭৯ মল্লভূমে ব্যবসা-বাণিজ্যে পরিবহন ও সড়ক ৩৮০
মল্লভূমির ভূমিব্যবস্থা ৩৮১ সোনামুখীর তন্তুবায় সমাজ ও মনোহর উবাচ ৩৮৮
মল্লভূমে ধর্মীয়-সামাজিক পরিবর্তন ও গোস্বামীতন্ত্রের জন্ম ৩৯০
বিষ্ণুপুরের প্রাচীন মন্দিরসমূহের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৩৯০
হাম্বিরপূর্ব রাজবংশের জনশ্রুতি ৩৯৪

**একাদশ অধ্যায় : লৌকিক ও হিন্দু দেবদেবীর পূজা অর্চনা ও প্রজাজীবন ৪০৭-৪৩৭**

লোকদেবতা ও লোকউৎসবের বিবরণ ৪০৭
প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার ধারা ৪১৭
দুর্ভিক্ষ ও ত্রাণকাজে ভূমরাজাদের ভূমিকা ৪২১
কৃষি সমাজের ভাঙন, দারিদ্র ও শেষ কথা ৪২৩

**দ্বাদশ অধ্যায় : অস্থল কাহিনী, দেবোত্তর ও পীরোত্তর সম্পদ ৪৩৮-৪৭৪**

অস্থল কাহিনী ৪৩৯ দেবোত্তর অছি ও পীরোত্তর সম্পদ ৪৪৯
পীরোত্তর অছি ৪৬৩ রাজবৃত্তে মেলা-পার্বণ ৪৬৮
লোকগানে বীরত্বগাথা ৪৬৯ সংযোজনী ৪৭৫

তথ্য সহায়ক
গ্রন্থপঞ্জি ৫০৮
শব্দসূত্র ৫১৬
আলোকচিত্র ৫২১

## প্রথম অধ্যায়

# বাঁকুড়ার ভূমরাজ্য

## রাঢ়ের দশটি ভূমরাজ্য ও বর্ণেতর যোগ

সেন শাসনের অবসানে ও অধুনা বাঁকুড়ায় শূর শাসনের প্রভাব অস্তমিত হলে অরণ্য অন্তরালে ভূম রাজ্যগুলির উদ্ভব ঘটে। এদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ভূম রাজ্য হল মল্লভূম (বর্তমান বিষ্ণুপুর, ওন্দা, সোনামুখী, গঙ্গাজলঘাটি, জয়পুর, কোতলপুর, ইন্দাস, পাত্রসায়ের থানা ও বাঁকুড়া-বড়জোড়া থানার কিয়দংশ)। মোঘল সময়ে এর ব্যাপ্তিও ছিল অনেক বেশি। মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুরের অবশিষ্ট মন্দির স্থাপত্যও বহু চর্চিত। তুলনায় অন্য ভূম শাসনের সালতামামি আলোচনার অগোচরেই রয়ে গেছে। সময়ের সাথে সাথে কঠিন হয়েছে কয়েক শতাব্দী প্রাচীন সেই উজ্জ্বল ইতিহাসের উদ্ধারের সম্ভাবনা। সে ইতিহাস অন্ত্যজ জনের ইতিহাস এবং অন্ত্যবাসী প্রজাদের ইতিহাস।

এই ভূম রাজ্যগুলির মধ্যে মল্লভূমের পরেই আসে সামন্তভূমের (বর্তমান ছাতনা, বাঁকুড়া থানা, শালতোড়ার কিয়দংশ) আলোচনা। এই প্রাচীন রাজবংশের 'ঐতিহাসিক উল্লেখ' মল্ল রাজবংশের চেয়েও সুপ্রাচীন। বড়ু চণ্ডীদাসের অনুষঙ্গে সামন্তভূমের পরিচয় অনেক আগে থকেই গ্রন্থিত হতে শুরু করে। মল্লরাজাদের উল্লেখ ঐতিহাসিক নথিতে যেখানে আকবরের সমকালীন হাম্বিরের শাসনকালে, সামন্তরাজাদের প্রতিষ্ঠিত বাসুলি মাতা ও মন্দিরের সূত্র আরও প্রাচীনতর সময়ের পরিসরে নিহিত। পঞ্চদশ শতকের অন্তভাগ থেকে।

তুলনায় দক্ষিণ বাঁকুড়ার দুই ভূমরাজ্য তুঙ্গভূম ও ধবলভূমের (বর্তমান খাতড়া মহকুমা) ইতিহাস স্বল্প চর্চিত ও বিভাজন বিড়ম্বিত। অখন্ড তুঙ্গভূমের (খাতড়া, হিড়বাঁধ, ইন্দপুর, রানীবাঁধ থানা বাদে সমগ্র খাতড়া মহকুমা) প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল পঞ্চদশ শতকের সাতের দশকে। প্রতিষ্ঠার ক্ষণেই জয়ী শক্তিজোটের সিদ্ধান্তে তুঙ্গভূমের ত্রিধাবিভক্তি ঘটে।[১] মূল অংশ থাকে দলপতি নকুড় তুঙ্গের অধীনে শ্যামসুন্দরপুর কেন্দ্রিক(রাইপুর থানার অংশ)। কুটনীতিক ও সেনাগুরু শ্রীপতি মহাপাত্রের অধীনে সিমলাপাল ভিত্তিক (বর্তমান সিমলাপাল ও তালডাংরা থানা) ভূম রাজ্য ও স্থানীয় সাহায্যকারী দলপতি জনৈক ভূমিজ সর্দারের অধীন রাইপুর (রাইপুর থানা, সারেঙ্গা) পরগণার জন্ম হয়। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে শ্যামসুন্দর কেন্দ্রিক রাজ্য বিভাজিত হয়ে ফুলকুসুমা (রাইপুর থানার একাংশ) ও ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে সিমলাপাল পরগণা (সারেঙ্গা, সিমলাপাল ব্লক) বিভাজিত হয়ে ভেলাইডিহা পরগণার (সিমলাপাল ব্লকের এক অংশ) জন্ম হয়।

দক্ষিণ বাঁকুড়ার আরেক শক্তিশালী ভূম রাজ্য সুপুর কেন্দ্রিক ধবলভূমের পত্তন হয় ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে। প্রতিষ্ঠাতা রাজার অনুমোদনে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিবাদ এড়াতে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে ধবলভূম দ্বিধা বিভক্ত হয়ে অম্বিকানগর কেন্দ্রিক ধবলভূম (রানীবাঁধ, হিড়বাঁধ) ও অবশিষ্ট অংশে খাতড়া পরগণার (খাতড়া, ইন্দপুর) জন্ম হয়।

১৫৯০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ প্রাথমিক ভাবে স্বতন্ত্র ও পরে মল্ল প্রভাবের অন্তর্গত বর্তমান বড়জোড়া থানায় মালিয়াড়া তালুকের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মানসিংহের বাংলা বিজয় অভিযানের সঙ্গী সেনানায়ক দেব অধ্বর্য্যু। বর্তমান বাঁকুড়া জেলার অবশিষ্ট মেজিয়া থানা, শালতোড়া থানার অংশ বিশেষ তৎকালীন কাশীপুর কেন্দ্রিক শিখরভূমের মহিষাড়া পরগণার অংশ ছিল।১৭৯০ সালে রচিত জগদ্রামী রামায়ণের রচয়িতা জগদ্রাম ছিলেন মেজিয়া থানার ভলুই গ্রামের বাসিন্দা। মহিষাড়া পরগণার গ্রাম ছিল মহিষাড়া ও রামচন্দ্রপুর। প্রায় চারশ বছর আগে পঞ্চকোটের রাজা রামচন্দ্রপুর গ্রামটি বাণেশ্বর পট্টনায়ককে শ্রীশ্রী শ্যামচাঁদ বিগ্রহ সেবার জন্য দান করেছিলেন। এই বংশের রামানন্দ পট্টনায়ক পরে বিহার-নেপালের রাজবৃত্তে সম্মানের জায়গায় আসীন ছিলেন। গড়ে উঠেছিল রামচন্দ্রপুর সংলগ্ন নুনিয়া শহর। ১৯১৩ সালের দামোদরের বন্যায় পাথরের মাণিকেশ্বর শিবমন্দির ও নুনিয়া শহরের অবলুপ্তি ঘটে দামোদরের গর্ভে।

এইভাবে প্রায় পাঁচশ বছরের পরিসরে দশটি ভৌমরাজ্যের উত্থান বাঁকুড়া জেলায় এক উজ্জ্বল নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনা করেছিল। শাক্ত শশাঙ্ক ও সেন শাসন পর্বে জেলায় লৌকিক ও অনার্য দেব দেবীর পাশাপাশি শৈব আরাধনার প্রাচুর্য দেখা যায়। সেন শাসনপূর্ব রাঢ় জনমনে বৌদ্ধ বিশেষত জৈন ধর্ম ভাবনা গুরুতর প্রভাব ফেলেছিল। তার পাথুরে প্রমাণ এখনও অক্ষত আছে। তবে এই ধর্মগুলির অস্তমিত প্রভাব বলয়ে হিন্দু ভাবনার প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। চৈতন্য পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণব ধর্মের প্রাবল্য সব ভূমরাজ্যগুলিকে প্লাবিত করে। শ্রীনিবাস আচার্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ভাবধারা অনেকটা উচ্চবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও নিত্যানন্দ গোস্বামীর অনুগামীদের ভক্তি আন্দোলন সর্বজনীন রূপ পেয়েছিল। শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব-মাতৃ আরাধনার প্রাবল্য কিন্তু আবহমান কালের লোকদেবতার প্রভাব ও অন্ত্যজ সমাজের পালা-পার্বণের গভীরতা কিছুমাত্র  ম্লান করতে পারেনি।

ইংরেজ আগমনের সাথে সাথে ভূমরাজা ও প্রজাদের ভূমি অধিকার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা হ্রাস পায়। শুরু হয় নতুন এক বিপন্নতা ও বিষাদের পর্ব।

আলাদা ভূমরাজ্য ভিত্তিক আলোচনা করলে স্থানিক বৃত্তে প্রজা জীবনের আলেখ্য আরও ভালো ভাবে তুলে আনা সম্ভব। কিছু ভূম রাজপরিবারের ইতিহাস সময়ের বালুরাশির অন্তরালে হারিয়ে গেছে। যেমন রসপাল রাজবাড়ী ও খাতড়া রাজবাড়ীর ইতিহাস। এদের এখনকার প্রজন্ম অতীত ইতিহাস ও অগ্রজদের পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই আখ্যান সেই অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াস।

দশটি ভূমরাজ্যের শাসক তালিকা ও শাসনকাল সীমা পাশাপাশি রেখে কাল বিভ্রান্তি অনেকাংশে এড়ানো সম্ভব। তাছাড়া এতে যে বিভিন্ন ঘটনা  সমগ্র জেলা অর্থাৎ দশটি ভূমরাজ্যকেই আলোড়িত করেছিল, তার সামগ্রিক ধারণা ও ভূম রাজ্য ভিত্তিক অভিঘাত বিশ্লেষণ সহজ হবে। নিম্ন বর্ণিত রাজবংশ তালিকা রচনার মাধ্যমে কালসীমার সাপেক্ষে প্রায় সঠিক বংশলতিকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে (কোন কোন রাজবংশের দুই-তিন প্রজন্ম মাত্র উদ্ধার করা যায়নি)। শেষ দুটি সারণীতে গিয়ে বর্তমান জীবিত প্রজন্মের সময়কাল মিলে গেছে, যেটা নির্মিত বংশ তালিকাকে অভ্রান্ত প্রমাণ করে।

## দশটি ভূম রাজ্যের বংশ তালিকা

| সামন্ত রাজবংশ | মল্ল রাজবংশ | মালিয়াড়া রাজবংশ | রাইপুর রাজবংশ | শ্যামসুন্দর রাজবংশ | ফুলকুসুমা রাজবংশ | সিমলাপাল রাজবংশ | ভেলাইডিহা রাজবংশ | অম্বিকানগর রাজবংশ | খাতড়া রাজবংশ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শঙ্খ রায় (১৪৮১ খ্রিস্টাব্দে) | | | | | | | | | |
| শিবু-ভ্রমর কালীচরণ | | | | | | | | | |
| উত্তর হামীর (১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ) | | | | | | | | | |
| বীর হামীর | ... | ... | শিখর রাজ ১ | নকুড় ছঃ নঃ তুঙ্গ (১৪৭৩-১৫০৩) | ... | শ্রীপতি মহাপাত্র (১৪৬৩-১৪৯৪) | ... | ... | ... |
| নিঃশঙ্ক হামীর | ... | ... | শিখর রাজ ২ | চৈতন্য ১৫০৩-১৫২৮)/পুত্র মাধব (?) | | মাধব মহাপাত্র (১৪৯৪-১৫২৪) | ... | ... | ... |

| সামন্ত রাজবংশ | মল্ল রাজবংশ | মালিয়াড়া রাজবংশ | রাইপুর রাজবংশ | শ্যামসুন্দর রাজবংশ | ফুলকুসুমা রাজবংশ | সিমলাপাল রাজবংশ | ভেলাইডিহা রাজবংশ | অম্বিকান গর রাজবংশ | খাতড়া রাজবংশ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নৃসিংহদেব | হাম্বীর মল্লদেব (১৫৬৫-১৬২০) | দেব অধ্বর্য্যু (১৫৯০- | শিখর রাজ ৩ | দামোদর (১৫২৮-১৫৫৮) | ... | জগন্নাথ মহাপাত্র (১৫২৪-১৫৪৫) বলরাম মহাপাত্র (১৫৫৮-১৫৮০) | ... | ... | ... |
| মোহন্ত রায় | ধারীহাম্বীর মল্লদেব (১৬২০-১৬২৬) | ঘরবাস অধ্বর্য্যু | শিখর-আফগান পতনে ব্রাহ্মণ রাজা? | গদাধর সুন্দরনারায়ণ (১৫৫৮-১৫৯৩) | গদাধর সুন্দরনারায়ণ (১৫৫৮-১৫৯৩) | বাসুদেব মহাপাত্র (১৫৪৫-১৫৫৮) | ... | ... | ... |
| শঙ্কর নারায়ণ | রঘুনাথসিংহ দেব (১৫২৬-১৬৫৬) | মণিরাম অধ্বর্য্যু | ব্রাহ্মণ রাজাকে উচ্ছেদে ফতে সিং? | শ্যামসুন্দর (লক্ষী) ছত্রনারায়ণ (১৫৯৩-১৬২৮)+শ্যামা | মুকুটনারায়ণ দেউ (১৫৯১-) | মোহন দাস মহাপাত্র (১৫৮০-১৫৯৩) | ... | ... | ... |

| সামন্ত রাজবংশ | মল্ল রাজবংশ | মালিয়াড়া রাজবংশ | রাইপুর রাজবংশ | শ্যামসুন্দর রাজবংশ | ফুলকুসুমা রাজবংশ | সিমলাপাল রাজবংশ | ভেলাইডিহা রাজবংশ | অম্বিকান গর রাজবংশ | খাতড়া রাজবংশ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিরিঞ্চি নারায়ণ, চঞ্চল কুমারী | বীরসিংহদেব (১৬৫৬-১৬৪২) | গোপাল দাস অধ্বর্য্য | রঘুনাথ সিংহদেব (১৬৫৫) | জনার্দন (১৬২৮-৫৮) | অজ্ঞাত | চিরঞ্জীব সিংহ (১৫৯৩-১৬১৫) | ... | ... | ... |
| হামীর উত্তর | দুর্জন সিংহদেব (১৬৪২-১৭০২) | ধরণীধর সিংহ | ধরমসিংহদেব কৃষ্ণসিংহদেব অর্জুন সিংহদেব | আইঠু (১৬৫৮-১৬৯০) | অজ্ঞাত | লক্ষ্মণ সিংহ (১৬১৫-১৬৫২) | লস্কর সিংহ চৌধুরী | জগন্নাথ ঢোল | জগন্নাথ ঢোল |
| জটিল বিবেক, স্বরূপ নারায়ণ ১৬২৮-), উত্তর নারায়ণ ১৬৪৮-) | রঘুনাথসিংহ দেব (১৭০২-১৭১২) | পরমান্দ সিংহ | দুর্জন সিংহদেব (১৭৬৭-১৮০০) | রামচন্দ্র (১৬৯০-১৭২৮) | অজ্ঞাত | কৃষ্ণদাস সিংহ (১৬৫২-১৬৯৩) | গৌরমোহন | খড়্গেশ্বর (১৬৩৫-) | হরিশচন্দ্র/ টেকচাঁদ |

| সামন্ত রাজবংশ | মল্ল রাজবংশ | মালিয়াড়া রাজবংশ | রাইপুর রাজবংশ | শ্যামসুন্দর রাজবংশ | ফুলকুসুমা রাজবংশ | সিমলাপাল রাজবংশ | ভেলাইডিহা রাজবংশ | অম্বিকানগর রাজবংশ | খাতড়া রাজবংশ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| খড়্গা বিবেক নারায়ণ | গোপাল সিংহদেব (১৭১২-১৭৪৮) | মান সিংহ | ফতে সিংহদেব | বীরকিশোর (১৭২৮-৬৮) | সুন্দরনারায়ণ (১৭৬৭-) | রাধানন্দ সিংহ (১৬৯৩-১৭২৮) | নন্দলাল | অনন্তলাল (১৭৩২-১৮০৯) | জয়চাঁদ (-১৭৫১) |
| স্বরূপ নারায়ণ | চৈতন্য সিংহদেব (১৭৪৮-১৮০১) | জয় সিংহ | বীর সিংহদেব (১৮৪১-) | গঙ্গাগোবিন্দ (১৭৬৮-০৮) | অজ্ঞাত | বলরাম সিংহ (১৭২৮-১৭৭৫) | কৃষ্ণলাল-ভবানী সিংহ হাকিম | গোপীনাথ (১৬৬০?) ৩য় পুরুষ? | বীরাঙ্গনা ভ্রাতা |
| লক্ষ্মী নারায়ণ (১৭৫৮-) | মাধব সিংহদেব (১৮০১-১৮০৯) | আমান সিংহ | হরিহর সিংহদেব-রাজা রঘুনাথ ১৮৮০ | আইঠু (২য়) (১৮০৭-৩৭) | অজ্ঞাত | জগন্নাথ সিংহ (১৭৭৫-১৮২০) | রামচন্দ্র সিংহ চৌধুরী | জগজীবন | অজ্ঞাত |
| দ্বিতীয় স্বরূপ নারায়ণ | গোপাল সিংহদেব ২য় (১৮০৯-১৮৭৬) | দামোদর চন্দ্র সিংহ (১৮৫৪-৭৫) | ইন্দ্র সিংহদেব (১ম রাণী উজ্জ্বল কুমারী, ২য় রাণী নিশা কুমারী)- লাল সিংহদেব | বলভদ্র (১৮৩৭-৬৩) | অজ্ঞাত | চিরঞ্জীব সিংহ চৌধুরী (১৮২০-(১৮৩১) | হরলাল | নিমাইচরণ-নীলমণি (১৮৩২-) | হিতেশ্বর (?) |

| সামন্ত রাজবংশ | মল্ল রাজবংশ | মালিয়াড়া রাজবংশ | রাইপুর রাজবংশ | শ্যামসুন্দর রাজবংশ | ফুলকুসুমা রাজবংশ | সিমলাপাল রাজবংশ | ভেলাইডিহা রাজবংশ | অম্বিকানগর রাজবংশ | খাতড়া রাজবংশ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কানাইনারায়ণ বলাইনারায়ণ (১৮০৩-) | রামকৃষ্ণ সিংহদেব (১৮৭৬-১৮৮৫) | ব্রজেন্দ্র গোপাল চন্দ্রাধ্বর্য্যু | বলভদ্র সিংহদেব (১৯১১) | বীরকিশোর (২য়) (১৮৬৩-৯৩) | দর্পনারায়ণ | নটবর সিংহ চৌধুরী (১৮৪৪-১৯০৫) | চৈতন্যচাঁদ | গৌড়ধ্বজ | হরিশচন্দ্র (২?) |
| আনন্দলাল অক্ষয়কুমারী (১৮৬০-৬৩) আনন্দকুমারী (১৮৬৩-) | ধ্বজামণীদেবী (১৮৮৫-১৮৮৯) | রাজ নারায়ণ চন্দ্রাধ্বর্য্যু (১৯২০-) | কালীপদ সিংহদেব | গৌরীপ্রসাদ (১৮৯৩-১২) | মুকুন্দনারায়ণ | মানগোবিন্দ সিংহ চৌধুরী (১৯০৫-জগবন্ধু সিংহ চৌধুরী (১৯০৫-১৯০৯) | প্রাণবল্লভ (১৮৮৪-১৯৩২) | রাইচরণ (১৮৭৭-১৯২৬) | সুকুমার |
| মহেন্দ্রলাল | নীলমণি সিংহদেব (১৮৮৯-১৯০৩) | নৃপেন্দ্র নারায়ণ চন্দ্রাধ্বর্য্যু (-১৯৬২) | চক্রধর সিংহদেব | শ্যামনফর (১৯১২-৩৩) | সুন্দরনারায়ণ | মদনমোহন সিংহচৌধুরী ১৯০৯-১৯২৭) | বিজয়চন্দ্র (১৯১০-১৯৪৯) | কালাচাঁদ | হিতেশ্বর (গঙ্গেশ্বর) ১৯৩৪- |

| সামন্ত রাজবংশ | মল্ল রাজবংশ | মালিয়াড়া রাজবংশ | রাইপুর রাজবংশ | শ্যামসুন্দর রাজবংশ | ফুলকুসুমা রাজবংশ | সিমলাপাল রাজবংশ | ভেলাইডিহা রাজবংশ | অম্বিকান গর রাজবংশ | খাতড়া রাজবংশ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ত্রিগুণা | রাজানেই (১৯০৩-১৯৩০) | গোপাল চন্দ্র | শশধর সিংহদেব/ মধুসূদন/ গোপীনাথ | কানাই (১৯৩৩-৭৬) | কালীপ্রসন্ন শশাঙ্ক | শ্যামসুন্দর সিংহ চৌধুরী (১৯২৭-১৯৫৫) | প্রদ্যোৎ কুমার | জয়া-বিজয়া-সুনন্দা | প্রবীর ধবলদেব |
| প্রদীপ | কালীপদ সিংহঠাকুর (১৯৩০-১৯৮৩) | হিমাদ্রি নারায়ণ | হরিপদ সিংহদেব | গৌরীশঙ্কর | বিদ্যানিধি | কল্যাণী প্রসাদ- দেব প্রসাদ | রজতকান্তি | প্রণব-গৌরীশঙ্কর | সূর্যকান্ত ধবলদেব |
| ... | সলিল/ জ্যোতি প্রসাদ সিংহ ঠাকুর | ... | শিবনাথ/ পৌলমী | ... | সুশান্ত নারায়ণ দেও/ চূনীলাল | চিরঞ্জীব | রাজর্ষি | ... | ... |

এই রাজ বংশগুলির ইতিহাস ও জনশ্রুতি বিশ্লেষণ করে রাঢ় বাঁকুড়ার অধিকাংশ রাজ বংশের বর্ণেতর সম্প্রদায়-স্পর্শিত উৎসে পৌঁছান যায়। মল্লভূমি ছিল আদিতে নৃতাত্ত্বিক বিচারে কৈবর্ত-বাউরি জ্ঞাতিত্বে আবদ্ধ অর্ধউপজাতীয় বাগদী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত। মল্লবংশের উদ্ভব নিয়ে রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর মত প্রকাশ করেছিলেন, 'দ্বাদশ শতাব্দীতে বীরগুণের কোটাটবী রাজ্য ভেঙ্গে পড়ার পর মল্লভূমে ছোট বড় কয়েকটি স্থানীয় সর্দার শাসিত রাজ্যের উদ্ভব ঘটেছিল বলে মনে হয়। এ ধরণের একটি রাজ্য ছিল জয়পুর থানার প্রদ্যুম্নপুর বা পদুমপুর। ...কোতলপুর থানার লাউগ্রামে এক মল্ল বাগদি সর্দারের নেতৃত্বে প্রদ্যুম্নপুরের অনুগত আরেকটি রাজ্য স্থাপিত হয়।'[২] এই বাগদি সর্দারই পরে ইন্দাস-যোথবিহার ও প্রদ্যুম্নপুরের উপর আধিপত্য বিস্তার করে বৃহৎ মল্লভূম রাজ্যের পত্তন করে। এর থেকে মল্লরাজবংশের অর্ধউপজাতীয় উৎসমূল অনুমান করা যায়। যদিও অন্যান্য ভূম রাজ্যগুলির মত এই রাজবংশের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণে সব সময়ই পশ্চিম-দেশাগত রাজ পুরুষ কর্তৃক এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠার জনশ্রুতি জারি আছে।

মল্লরাজবংশের এক সদস্য আর এক ভূম রাজ্য তুঙ্গভূমের রাইপুর তালুকের বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। সুতরাং তার বংশের উৎস স্বাভাবিক ভাবেই বাগদি অর্ধ-উপজাতীয়।

রাঢ়ের প্রাচীন রাজবংশ সামন্তভূমের রাজপরিবারের জাতিত্ব নিয়ে রথীন্দ্রবাবুর বিশ্লেষণ, 'সামন্তভূমের রাজবংশ নিসন্দেহে সাঁওতাল উপজাতি সম্ভূত। এদিক থেকে জেলার ভূমরাজ্যগুলির মধ্যে একমার ছাতনা রাজবংশ সরাসরি উপজাতীয় কৌমোদ্ভূত; আদিম উপজাতিগুলির সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব সম্পৃক্ত কোন অর্ধ-উপজাতীয় নিম্নবর্ণীয় জাতি সম্ভূত নয়। ছাতনা রাজবংশের উৎপত্তি সম্পর্কে বেগলারের...ও ও'ম্যালির জেলা গেজেটিয়ার (১৯০৮) গ্রন্থ দুটিতে লিপিবদ্ধ জনশ্রুতি ভিত্তিক তথ্যাদি থেকে এর নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়।'[৩]

ধবলভূমের রাজাদের রজক বা ধোপা রাজবংশ প্রসঙ্গে রথীন্দ্রমোহন বাবুর মন্তব্য ছিল, 'ধবলভূমের রাজবংশ যে ছিল 'রজক' তার একটি বড় প্রমাণ হলো খাতড়ায় এ রাজবংশ কর্তৃক রঙ্কিণীদেবীর পূজা প্রবর্তন। রঙ্কিণী দেবী ধলভূমের অর্থাৎ ঘাটশীলার রাজপরিবারের কুলদেবী। ...দেবী রজককে রাজা করেন। রজকের সঙ্গে 'ধবল' কথার সম্পর্ক টেনে রাজ্যের নাম হয় ধবলভূম'।[৪] একই ভাবে রজক বংশের উৎসাদনে পশ্চিমা রাজপুত বংশের সূচনার কাহিনী এখানে প্রচলিত থাকলেও,

ধবলভূমের রাজ বংশের 'ধোবা' জাতিত্ব ঐতিহাসিক সত্য বলেই অনেক বেশি গ্রহণীয়। সুতরাং খতড়া ও অম্বিকানগর রাজ বংশ এই অর্ধউপজাতীয় জাতিত্ব মূলে আবদ্ধ।

শ্যামসুন্দরপুর ও ফুলকুসুমার রাজবংশের আদি প্রতিষ্ঠাতা নকুড় তুঙ্গের জাতি উৎস নিয়ে একাধিক মত থাকলেও তাঁকে স্থানীয় ভূমিজ সর্দার হিসাবেই মনে করা হয়। পূর্বতন সাঁওতাল 'সামন্তসার' রাজবংশের উৎসাদনে সহায়ক হয়েছিল ওড়িয়া কূটনীতিক ও সমরবিশারদ শ্রীপতি মহাপাত্র ও রাইপুরের সমকালীন ভূমিজ বা গোয়ালা-কুর্মি শিখর দলপতি।[৫]

সিমলাপাল রাজ্যের পত্তন হয় ওড়িয়া ব্রাহ্মণ শ্রীপতি মহাপাত্রের দ্বারা। ভূমরাজ্যগুলির মধ্যে এই রাজবংশটিই কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ বংশীয় ছিল। এরা ছিল বৈষ্ণব ভাবধারায় বিশ্বাসী। এই রাজবংশ থেকে সৃষ্ট ভেলাইডিহা রাজবংশও একই জাতি পরিচয় বহন করে চলেছে।[৬]

মালিয়াড়া জমিদারির পত্তন করেছিলেন মান সিংহের সেনা বাহিনীর দেব অধ্বর্য্যু। তিনি পশ্চিম দেশীয় রাজপুত বংশীয়। এই রূপ দশটি ভূম পরিবারের জাতিত্ব বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় মল্লভূম, তুঙ্গভূম, সামন্তভূম, ধবলভূমের মত চারটি মূল ভূম রাজ্যের পরিচালকরা ছিলেন মূলত সাঁওতাল, মুন্ডাদের হিন্দুকৃত রূপ ভূমিজদের মত উপজাতীয়, বাগদি ও ধোবার মত অর্ধ-উপজাতীয় পরিচয়ের।[৭]

**তথ্যসূত্র :**


১. **LSS O'malley, Bankura Dist Gazetter, Calcutta, 1908 (Reprint 1995), P. 210-211.**
২. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়া জনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০১০, পৃ. ৭০।
৩ রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, পৃ. ৪৩।
৪. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, পৃ. ৩৮।
৫. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়া জনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০, পৃ. ২।
৬. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, পৃ. ২৭।
৭. **Paramanda Acharya, Studies in Orissan History, Archaeology and Archives, Cuttack–1969, p.453** পরমানন্দ আচার্য যে ভূমরাজ্যগুলি চিহ্নিত কর ছিলেন সেগুলি হল আদিত্যভূম (মেদিনীপুর), বাঘভূম (দঃ মেদিনীপুর), বরাভূম (বরাবাজার), ভঞ্জভূম (ময়ূরভঞ্জ), ভাওয়ালভূম (মন্দারণ), বীরভূম, ব্রাহ্মণভূম (উঃ মেদিনীপুর), ধলভূম (সিংভূম), সেনভূম (দঃবীরভূম), মল্লভূম (বিষ্ণুপুর), মানভূম (পুরুলিয়া), নাগভূম (ছোটনাগপুর), সামন্তভূম (ছাতনা), সেনভূম (দঃবর্ধমান), শূরভূম (উঃবাঁকুড়া), শিখরভূম (পূর্ব পুরুলিয়া), সিংভূম, তুঙ্গভূম (দঃবাঁকুড়া)।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# শ্যামসুন্দরপুর

### শ্যামসুন্দরপুরের রাজকথা

রাঢ় বাংলায় বিশেষত জঙ্গলমহলে সেন বংশের পতন ও আফগান শাসনের অন্তবর্তী ইতিহাসের গতিপথ অতি অস্পষ্ট। এই সময়েই মূলত জঙ্গল মহলে ভূম রাজত্বগুলি গড়ে ওঠে। যেমন মল্লভূম (সমগ্র বিষ্ণুপুর মহকুমা ও ওন্দা থানা কেন্দ্রিক), তুঙ্গভূম (সিমলাপাল, ভেলাইডিহা, রাইপুর, শ্যামসুন্দরপুর কেন্দ্রিক), সামন্তভূম (ছাতনা কেন্দ্রিক), ধবলভূম (অম্বিকানগর কেন্দ্রিক এই ধবলভূম সুপুর-খাতড়া ও অম্বিকানগর এই দুই জমিদারিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে)। তৈরি হয় অন্ত্যজ সমাজের ইতিহাস। অবশ্য এই রাজতন্ত্রগুলির শিকড় আর্যেতর পরিমন্ডলে পুষ্ট হলেও পশ্চিমা বা ওড়িয়া ক্ষত্রিয় বংশগুলির সাথে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সমাজতাত্ত্বিকদের মতে 'উর্দ্ধমুখী সচলতার' নিদর্শন।[১]

বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের রায়পুর থানার শ্যামসুন্দরপুর তালুকে তুঙ্গরাজ বংশের প্রতিষ্ঠা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এবং আর্যেতর শাসন ইতিহাসের অনন্য নজির।

### তুঙ্গ রাজবংশ প্রতিষ্ঠার প্রাককথন :

তুঙ্গদেব পরিবারের আদিপুরুষ গন্ডকী নদীর তীর থেকে শালগ্রাম শিলা বহন করে শ্রীক্ষেত্র বা পুরীধামে গিয়ে জগন্নাথের আশীর্বাদে পুরীধামের রাজপদে আসীন হন।

কিন্তু তাঁর পৌত্র গঙ্গাধর স্বপ্নাদিষ্ট হন যে আর সে পরিবারের কেউ পুরীর সিংহাসনে বসতে পারবে না। ফলে লোক লস্কর, পরিবার, সম্পদ ও সেনা সহ পুত্র নকুড় তুঙ্গ নতুন রাজত্বের সন্ধানে ১০ বছর খোঁজাখুজির পর বর্তমান বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণাংশে শ্যামসুন্দরপুরের কাছে (টিকড়পাড়াতে) স্থিতু হন।[২]

## বংশপঞ্জি ও রাজকাহিনী :

১৪৭৩ সালে নকুড় তুঙ্গ (১৪৭৩-১৫০৩) 'ছত্রনারায়ণ' নাম নিয়ে তুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুত নকুড় তুঙ্গ দক্ষিণ রাঢ়ের এই অংশের সামজিক অস্থিরতার কালে রাষ্ট্র-সামাজিক সুস্থিতি প্রতিষ্ঠা কল্পে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। সাথে পেয়েছিলেন এলাকার প্রজা সাধারণকে। কৌশল রচনা করেছিলেন শ্রীপতি মহাপাত্র নাম্নী ওড়িয়া দেশীয় এক কূটনীতিবিদ ও সমর বিশারদ। আসলে তুঙ্গভূম সন্নিহিত শিলদা ছিল সাঁওতাল(সাঁওত)দের আদিভূমি।[৩] মূলত ঝাড়খন্ডের হিহিড়ি-পিপিড়ি ও চৈ-চম্পা থেকে অভিবাসনের পর। এই সাঁওতরাই তুঙ্গভূমের পূর্বতন সামন্তসার রাজ্যের নিয়ন্ত্রক ছিল বলে অনুমান।[৪] এদিকে এলাকার আদি বাসিন্দা মুন্ডারা উড়িষ্যা প্রদেশাগত হিন্দুদের প্রভাবে হিন্দুকৃত হয়ে ভূমিজ নামে পরিচিত হচ্ছিল। ফলে সাঁওত-ভূমিজ দ্বন্দ্বে সামন্তসার রাজ্যে রাজনৈতিক-সামাজিক অস্থিরতার জন্ম হয়। শ্রীপতি মহাপাত্রের কূটনৈতিক ও সামরিক সাহায্য এবং রাইপুরের ভূমিজ শিখররাজার সাহায্য নিয়ে ভূমিজ সর্দার নকুড় তুঙ্গ তুঙ্গভূমের নতুন রাজবংশের পত্তন করেন। শ্রীপতির প্রভাবে স্থানীয় বিপুল সংখ্যক ওড়িয়া অভিবাসিতের দল এই রাজনৈতিক পালাবদলে অংশ নেয়। রাষ্ট্র শাসন পরিবর্তনের এই বিপুল আয়োজন চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ভূমিকার কথা মনে করায় শ্রীপতি ও নকুড়ের জোটশক্তি।

এ জেলায় ওড়িয়া অভিবাসন শুরু হয়েছিল ১১৩৫ সালে, ওড়িয়ারাজ অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের দক্ষিণ রাঢ়ে আধিপত্য বিস্তারের সাথে। উড়িষ্যার সমুদ্র বন্দর ও বাণিজ্যের অবনতি, ধারাবাহিক রাজনৈতিক অস্থিরতা, মোঘল আফগান দ্বন্দ্ব, আর্থিক মন্দা সহ বিভিন্ন কারণে বালাশোর সহ বিভিন্ন এলাকার ওড়িয়া তন্তুবায়, বণিক, মহাজনদের রাঢ় বাঁকুড়ায় আগমন ঘটে। চোড়গঙ্গের পর ১৪৭৩ সালে এই ওড়িয়া জন অধ্যুষিত দক্ষিণ বাঁকুড়ায়, সহজেই শ্রীপতি মহাপাত্র ২৫২ জন সাথী নিয়ে এসে তুঙ্গভূমে রাজত্ব পত্তন করতে পেরেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য সহযোগীদের তালিকা

নিম্নরূপ।

(১) স্বয়ং শ্রীপতি মহাপাত্র : রাজগুরু (নকুড় পুত্র চৈতন্যের জন্ম দিনে নকুড় রাজগুরুকে সিমলাপাল পরগণা দান করেন)
(২) রঘুনাথ পান্ডা : জগন্নাথজীউয়ের পূজক
(৩) পিতাম্বর মিশ্র : রাজ্যের আইন সংক্রান্ত কাছারী সেরেস্তা
(৪) পুরুষোত্তম কর : 'রাজচক্রবর্তী' উপাধি ও ডাঙ্গরসাই মৌজা প্রাপ্তি
(৫) সূর্যকান্ত রায় : পূজা পাঠক
(৬) বিজয়চাদ সিংহ : প্রধান সেনাপতি
(৭) সুজয়চাঁদ সিংহ : কোটাল (দেহরক্ষী)
(৮) দামোদর করণ : কাছাড়ী সেরেস্তার কর্মচারী
(৯) শুকদেব করণ : কৃষিকর্ম তদারক কর্মী
(১০) বাসুদেব করণ : কাছারি সেরেস্তার কর্মী
(১১) ঈশ্বর ভাট : অগ্রদানী ক্রিয়াদির কর্মী
(১২) কৃষ্ণচন্দ্র নাপিত : ক্ষৌরকর্মাদির কর্মী
(১৩) জগন্নাথ ত্রিপাঠী : পূজাপাঠ ক্রিয়া কর্মী

স্পষ্টতই বিভিন্ন পেশার মানুষের আগমন ঘটেছিল দীর্ঘস্থায়ী বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে।

এসময় সর্বভারতীয় মানচিত্রে ও বাংলায় আফগান আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওড়িষ্যাতেও হিন্দু আধিপত্যের পাশাপাশি আফগানের শাসন ধারা বিস্তার লাভ করেছিল। রাঢ়দেশেও আফগান লড়াকু, মুসলিম-সুফি ধর্মপ্রচারক দলের এসময় আনাগোনা বাড়ছিল। মল্লভূমের কুরবান শাহের মত রায়পুরের মিরণ শাহ ছিলেন সম্ভবত এমন লড়াকু বাহিনীর ফকির নায়ক। একটি প্রচলিত মতে রায়পুরের স্থানীয়(সম্ভবত ভূমিজ) রাজার উচ্ছেদ হয়েছিল বাইরের আক্রমণে। তাতে মিরণ শাহ নিহত হন এবং রাইপুরের রাজপরিবার শিখর সায়রে আত্মহুতি দেয় (উল্লেখ্য হাম্বিরের সমকালে হাম্বির সমর্থিত মোঘল সেনাপতি মানসিংহের পুত্র জগৎ সিংহের সাথে আফগান বীর কোতল খাঁয়ের এক সেনাদলের সংঘর্ষ হয়েছিল রাইপুরে)।[৫] এখনও শিখর সায়রের পাশে কুরবান শাহের অক্ষত সমাধি এই ইতিহাসের সাক্ষ্য। এরপর রাজপুরোহিত গুরুপাড়া গ্রামে রাজদন্ড ধারণ করে কিছুকাল রাজ্য শাসন করেন। এসময় মল্লরাজ দ্বিতীয় বীরসিংহের (১৬৩৬-৫৬) অত্যাচারে দেশ থেকে

পালিয়ে এসে রাজভ্রাতা ফতে সিংহ নতুন শাসনাধিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সুযোগে ছিলেন।[৬] তিনি এই ব্রাহ্মণ্য শাসনের অবসান ঘটিয়ে বর্তমান রাইপুর রাজবংশের পত্তন করেন। এই ঘটনা ঘটেছিল শ্যামসুন্দরপুরের ষষ্ঠ রাজা জনার্দন তুঙ্গের (১৬২৮-১৬৫৮) সময়ে। রাইপুরে নকুড় তুঙ্গের বিজয়ে পূর্বতন সামন্তসার রাজ্য তিন ভাগ হয়ে পড়ে। মূল শাসনাধিষ্ঠান থাকে টিকড়পাড়ার কাছে শ্যামসুন্দরপুরে (জগন্নাথপুর নামে পরিচিত হয়) তুঙ্গভূম হিসাবে। দ্বিতীয়টি রাইপুরের রাজবংশের অধীনে কিছু অংশ এবং বাকি অংশ নকুড়ের গুরু শ্রীপতি মহাপাত্রের অধীনে সিমলাপাল পরগণা। শেযোক্ত এই পরগণা ১৬১৭ সালে শরিকি বিবাদে লক্ষণ সিংহ চৌধুরী (সিমলাপাল) ও লস্কর সিংহ চৌধরীর (ভেলাইডিহা) মধ্যে বিভাজিত হয়ে যায়। প্রায় একই সময়ে মূল শ্যামসুন্দরপুর পরগণার শরিকি বিভাজন ঘটেছিল লক্ষীনারায়ণ দেব ও মুকুটনারায়ণ দেবের মধ্যে। মুকুটনারায়ণের হাতে রসপাল (রাইপুর থানার অন্তর্গত) তালুকের ভার আসে, যা মোট পরগণার ৪০ শতাংশ।[৭]

প্রায় পাঁচ শতাব্দী সময়কাল ব্যাপ্ত শ্যামসুন্দরপুর কেন্দ্রিক তুঙ্গভূম রাজপরিবারের বংশপঞ্জিকা ও তাঁদের কাহিনী নিম্নরূপ

## (১) নকুড় ছত্রনারায়ণ তুঙ্গদেউ (১৪৭৩-১৫০৩)

প্রচলিত লোকগাথা অনুসারে শ্রীক্ষেত্র (পুরী) রাজবংশের নকুড় তুঙ্গ জগন্নাথের স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে শ্বেত পায়রা অনুসরণ করে ভৈরববাকি নদীর উত্তর তীরে টিকড়পাড়া-গড়খুল্ল্যা সাতপাট্টা-ডাঙ্গারসাই-এর উঁচু অংশে পৌঁছে রাজত্ব স্থাপন করেন (উচ্চ ভূমিগত কারণে নয়া রাজ্যপাট তুঙ্গভূম বলে পরিচিতি লাভ করে)।[৮] রাজবাটী ছিল প্রথমে টিকড়পাড়ায়, পরে গড়খুল্ল্যায়। এর সীমানা হল উত্তরে সিমলাপাল, দক্ষিণে শিলদা, পূর্বে বগরী, পশ্চিমে কুইলাপাল। অন্য একটি প্রচলিত মতে নকুড় তুঙ্গ ও ছকুড় তুঙ্গ ওড়িয়া রাজ মুকুন্দদেবের দুই সন্তান। ১৪৬৫ সালে কালাপাহাড়ের পুরী আক্রমণ প্রতিহত করতে এই দুই রাজপুত্র বিশেষ বীরত্ব দেখান ও কালাপাহাড়কে বিতাড়িত করেন। এদেরই একজন নকুড় তুঙ্গ শ্যামসুন্দরপুরে রাজত্ব পত্তন করেন। যদিও এর সমর্থনে তেমন ঐতিহাসিক নথি নেই। ইনি নিজ রাজ্যে রথযাত্রারও প্রচলন করেন। যদিও রথযাত্রা সূচনার একটি সময় দেখা যাচ্ছে ১৬০৯ সাল। অর্থাৎ আদি পরগণা শ্যামসুন্দরপুর ও ফুলকুসুমায় বিভাজিত হওয়ার কালে। মনে হয় নকুড় প্রচলিত রথযাত্রা দুই বিভাজিত রাজবংশ কর্তৃক অনুসৃত হয়েছিল।

আরেকটি মতবাদ হল নকুড় ছিলেন ওড়িষার শেষ হিন্দু নরপতি মুকুন্দদেবের পুত্র। কোন এক গর্হিত অপরাধে রাজা তার মৃত্যু দন্ডাজ্ঞা দিলে রাজপুরোহিত শ্রীপতি মহাপাত্র তার প্রতিবাদ করেন। রাজা তখন প্রতিবাদকারী রাজপুরোহিত সহ পুত্রের দেশান্তরের আদেশ দেন। আর একটি স্থানীয় কিংবদন্তীতে প্রকাশিত, কালাপাহাড়ের আসন্ন আক্রমণের ও মুকুন্দদের রাজত্বের ধ্বংশের বার্তা দিয়ে, দেবাজ্ঞা হয় রাজপুত্রদের দেশত্যাগের।

প্রচলিত উপকথা অনুসারে সামন্তসার রাজার উৎসাদনে নকুড়তুঙ্গ ফুলকুসুমায় ও ভাই ছকুড়তুঙ্গ শ্যামসুন্দরপুরে রাজ্যপাট শুরু করেন। নকুড় স্বদেশ থেকে শাসনের সুবিধার্থে ২৫২ জন লোক নিয়ে ফিরে এসে দেখলেন অশান্ত দেশকালের পাকচক্রে ছকুড় নিহত হয়েছেন। এরপর তিনি কৌশলী ভূমিকা নিয়ে শ্যামসুন্দরপুর কেন্দ্রিক অখন্ড তুঙ্গভূমের শাসন শুরু করেন ছত্রনারায়ণদেব অভিধায়। রাজ্যের নাম দেন জগন্নাথপুর।

কথিত আছে নকুড় তুঙ্গ দীর্ঘকাল অপুত্রক থাকায় রাজগুরু শ্রীপতি মহাপাত্র পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞ করেন। জন্ম হয় পরবর্তী রাজা চৈতন্য তুঙ্গের। সামন্তসার রাজ্যের অরাজক অবস্থার অবসান ঘটিয়ে সুশাসন ও সুস্থিতি প্রতিষ্ঠায় নকুড় তুঙ্গের ভূমিকা যদি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ন্যায়, তবে শ্রীপতির ভূমিকা ছিল চাণক্যের। নকুড়ের প্রাণদন্ড লাঘবে,তার রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা ও পুত্রলাভে শ্রীপতির ভূমিকার মর্যাদা দিতে রাজা নকুড় পূর্বতন সামন্তসার রাজ্যের ৭৬৪২৪ একর পরিমিত রাজ্যের মধ্যে সিমলাপাল পরগণা (২৬২৬৬ একরের ভেলাইডিহা পরগণা সহ) গুরুকে হস্তান্তর করেন।

এই ভাবে নকুড় প্রতিষ্ঠিত তুঙ্গভূম শ্যামসুন্দরপুর ও মিত্র রাজ্য সিমলাপালে বিভাজিত হয়। প্রতিষ্ঠা ক্ষণে সামরিক সাহায্যকারী রাইপুরের ভূমিজ দলপতিকে রাইপুরের শাসক হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই ভাবে তুঙ্গভূমের নতুন শাসন ব্যবস্থার সূচনা হয়।[৯] সময়ের অসঙ্গতি থাকায় নকুরের উৎস নিয়ে আলোচনায় তাঁকে ওড়িয়া রাজ্য প্রতাপরুদ্রের ভাই হিসাবে দেখান হলেও তা মেনে নেওয়া শক্ত। অন্য সহোদররা হলেন ছকুড়, শ্রুতিশ্রব্য। নকুড়ের পূর্বপুরুষদের তালিকায় দেখানো হয়েছে পুরুষোত্তমদেব-উপেন্দ্রদেব-নরেন্দ্রদেব-গালদেব-মুকুন্দদেব-নকুড়দেব। যদিও এই তালিকার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

## (২) চৈতন্য সুন্দরনারায়ণ তুঙ্গদেউ (১৫০৩-১৫২৮)

প্রতিষ্ঠাতা নকুড়ের নয়া রাজ্যপাটকে সুসংহত ভূমিকা দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন

চৈতন্য সুন্দরনারায়ণ। বৈষ্ণব ভাবনা অনুসারী বিভিন্ন পালা-পার্বণের মাধ্যমে প্রজাদের এক সূত্রে বাঁধা হতে থাকে। কৃষি কাজের প্রসারে রাজাদের জনকল্যাণমুখী ভূমিকা নিতে দেখা যায়। সেকালে ধার্মিক ও প্রজাবৎসল রাজারা বিভিন্ন জনহিতকর কাজে অংশ নিতেন। সেচের প্রসারে রাজানুকূল্যে রাজ্যে ভগবানবাঁধ, শ্যামসায়ের বাঁধ সহ অজস্র জলাশয় খনন করা হয়।[১০]

## (৩) দামোদর ছত্রনারায়ণ তুঙ্গদেউ (১৫২৮-১৫৫৮)

দামোদেরের সময়কাল ছিল সুশাসন ধরে রাখার পর্ব। তাঁর পিতাকে যেমন নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যকে সুস্থিতি দিতে প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হয়েছিল ও পুত্রের সময় যেমন শরিকি বিবাদ মেটাতে রাজ্য বিভাজনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল, সেই সমস্যা থেকে এই রাজকাল ছিল মুক্ত। আরেকটি মতে রাজা চৈতন্যদেব ও দামোদরের মধ্যে রাজা মাধবদেবের অস্তিত্ব ছিল।

## (৪) গদাধর সুন্দরনারায়ণ তুঙ্গদেউ (১৫৫৮-১৫৯৩)

গদাধরের জীবদ্দশায় দুই পুত্র শ্যামসুন্দর ও মুকুটনারায়ণের গৃহবিবাদ চরম আকার নেয়। দুই সন্তানের বিবাদ মেটাতে ১৫৯১ খ্রিষ্টাব্দে কনিষ্ঠ মুকুটনারায়ণকে জমিদারির রসপাল-ফুলকুসুমা কেন্দ্রিক ৪০ শতাংশ দিয়ে ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্য ষাট শতাংশ রেখে রাজ্যের বিভাজন ঘটান। দুই বছর পর তাঁর মৃত্যু হলে শ্যামসুন্দরপুরের দায়িত্ব নেন শ্যামসুন্দর।[১১]

## (৫) শ্যামসুন্দর ছত্রনারায়ণ তুঙ্গদেউ (১৫৯৩-১৬২৮)

ভাই মুকুটনারায়ণের সাথে পারিবারিক বিবাদ শুরু হলে ভৈরববাঁকির দক্ষিণে জমিদারির ৬ আনা ছেড়ে দিয়ে গড়খুল্ল্যা ত্যাগ করে উপরপাড়ায় (বর্তমান শ্যামসুন্দরপুরে) রাজবাটীতে শ্যামসুন্দর ছত্রনারায়ণ তৈরি করেন রাজপ্রাসাদ। বাঁকুড়া জেলার মটগোদা অঞ্চল সংলগ্ন ভৈরববাঁকী নদীর দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং ছোট তুঙ্গভূম-রসপাল ছাড়িয়ে ভৈরববাঁকী নদীর উত্তরে রাজবাড়িটির অবস্থান। ৬০০ বছরের পুরাতন রাজবাড়ীটি এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। তবে রাজবাড়ী প্রাঙ্গণের একাংশে সংস্কৃত রাজবাটীতে থাকেন রাজবংশের বর্তমান উত্তরাধিকারীরা।[১২]

বিশাল রাজধানী প্রাঙ্গণে আছে কুলদেবীর মন্দির, শ্যামসুন্দর জীউ মন্দির, চন্ডী-দুর্গা মন্ডপ, ব্রাহ্মণ-করণ-নামাতা-রজক-ডোম সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসতি।

নয়টি বাঁধপুকুর, চাষের জমি সহ প্রতিষ্ঠা ঘটে রাজধানীর। তাঁর সময়ে শুরু হওয়া দুর্গাপূজা শুরু হত মিত্র বিষ্ণুপুর মল্লরাজবাড়ীর তোপধ্বনি শুনে। তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত রাজপরিবারকে মল্লরাজ নানা ভাবে সাহায্য করতেন। মল্লভূম-শ্যামসুন্দরপুর সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে মল্লরাজ হাম্বির নিজের অষ্টম বর্ষীয় কন্যা শ্যামাকুমারীর সাথে এই রাজার বিবাহ দেন।[১৩] তুঙ্গভূমের রাজপুরুষরা মল্ল সেনা বাহিনীতে যোগ দিতেন। মল্লরাজের "মল্ল অবনীনাথ" উপাধির অনুকরণে এঁরাও তুঙ্গ অবনীনাথ ব্যবহার করতেন। স্পষ্টতই শ্যামসুন্দরপুরের রাজনৈতিক যাত্রাপথ ছিল মল্ল প্রভাবিত।

শ্যামসুন্দরপুরের রাজারা ছিলেন বৈষ্ণব ভাবধারার। তবে নতুন শ্যামসুন্দরপুর রাজ্যে লৌকিক ও অন্য হিন্দু দেব দেবীরা অনেক গুরুত্ব পেয়েছে রাজাদের কাছে। সমকালীন রাষ্ট্র ও সামাজিক প্রেক্ষিতে এই অনুসৃত নীতি ছিল অনেক বেশি বাস্তব সম্মত ও প্রজানুকূল। কথিত রয়েছে শ্যামসুন্দরপুর রাজপরিবারের তদানীন্তন রাজা ছত্রনারায়ণ দেওকে রাজবাড়ির কুললক্ষ্মী ষড়চক্রবাসিনী স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন। সেই স্বপ্নাদেশে দেবী বলেছিলেন, তিনিই কালী। আর প্রতিমা মূর্তি গড়ে তাঁর পুজো করা চলবে না। সেই সময় থেকেই এলাকায় আর কোনও কালী মূর্তি তৈরি করে পুজো করা হয় না। প্রতি বছর কার্তিকের অমাবস্যায় কুললক্ষ্মী ষড়চক্রবাসিনীকে দক্ষিণাকালী (এলাকায় বুড়ীমা নামেও পরিচিত) রূপে পুজো করা হয়। এই রীতি মেনে পুজোর রাতে রাজপরিবারের কুললক্ষ্মীকে নির্দিষ্ট মন্দিরে আনা হয়। চিরকালই রাজার নামে সংকল্প করে পূজা শুরু হয়। বর্তমান রাজা পশুপতি নারায়ণ দেও-এর নামে সংকল্প করে পূজা শুরু হয়। বিগ্রহ পূজা করে 'গাঙ্গুলি' ব্রাহ্মণ ও সেবায় থাকে 'ধাইভাই' উপাধীর ভৃত্য পরিবার।

শ্যামসুন্দরপুর রাজপরিবারের বর্তমান রাজা পশুপতি নারায়ণ দেও বলেন, "আমাদের পূর্বপুরুষ স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। দেবীর নির্দেশ মেনে এলাকায় ঘট পুজো করলেও কালীর মূর্তি তৈরি করে কেউই পুজো করেন না। আমাদের কুললক্ষ্মী ষড়চক্রবাসিনী দেবী দক্ষিণাকালী হিসাবে পূজিতা হন। এটাই এলাকার প্রাচীন রীতি। দীর্ঘদিন ধরে এই রীতি মেনে আসছেন এলাকার বাসিন্দারা।' শ্যামসুন্দরপুর রাজপরিবারের কুলপুরোহিত গ্রামের গঙ্গোপাধ্যায় পরিবার।[১৪]

রাজা শ্যামসুন্দর নারায়ণ দেও (১৫১৩-১৮২৮) শ্যামসুন্দরপুরে দুর্গাপুজোর সূচনা করেছিলেন। মল্লরাজধানীতে দুর্গাপূজার প্রচলন থেকে প্রভাবিত হয়ে এই পর্বের সূচনা বলে ধারণা করা যায়। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত বলির সময়ে কামান

দাগা হতো। এই পূজা উপলক্ষে মেলা, জনসাধারণের ব্যাপক অংশ গ্রহণের সূত্রে সর্বজনীন রূপ পেয়েছে। বর্তমানে প্রাচীন রাজবাড়ীর এই পুজো পরিচালনা করে গ্রামেরই নেতাজী তরুণ সঙ্ঘ। শ্যামসুন্দরপুর ছাড়াও মটগোদা, ঘুরাগাড়ি, পালি, নিশ্চিন্তপুর, ধানঘোরি-সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ এই পুজোর জন্য আর্থিক সাহায্য করেন। সপ্তমীর সকালে গ্রামের বাঁশ পুকুরে নবপত্রিকার ঘট প্রতিষ্ঠায় সূচনা ও দশমীর দিন প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত আখ বলি, নবমীতে ছাগশিশু বলি, বলির সময় কামান দাগা হল পূজার প্রচলিত কিছু রীতি।[১৫]

### (৬) জনার্দন সুন্দরনারায়ণ তুঙ্গদেউ (১৬২৮-১৬৫৮)

ভৌমরাজ্যগুলির সংহতি ও সুস্থিতির লক্ষ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল সুদৃঢ়। রাজা জনার্দনের আমলে রাঢ়ভূমের ভৌমরাজত্বগুলির মধ্যে মিত্রতার সম্পর্ক বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে আরো সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। যেটি 'নয় মহলা সম্পর্ক' হিসাবে খ্যাত হয়। এই নয়টি রাজ পরিবার, যাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্বাভাবিক ঘটনা ছিল সেগুলি হল মল্লভূম, সুপুর, শ্যামসুন্দরপুর, অম্বিকানগর, গড়রাইপুর, ঝাড়গ্রাম, জামবনী-ধলভূম, বরাহভূম, মানভূম। এই রীতির অংশ হিসাবে, রাজা জনার্দন বিবাহ করেন অম্বিকানগরের রাজকন্যাকে।[১৬]

### (৭) আইঠু ছত্রনারায়ণ তুঙ্গদেউ (১৬৫৮-১৬৯০)

রাজা জনার্দন ও পুত্র আইঠুর সাথে অম্বিকানগর (দৌহিত্র) রাজবংশীয় সদস্যদের সুসম্পর্কের জেরে শ্যামসুন্দরপুর ও অম্বিকানগর তালুক দুটির যোগাযোগ ও সহযোগিতা সুদৃঢ় হয়।

### (৮) রামচন্দ্র সুন্দরনারায়ণ তুঙ্গদেউ (১৬৯০-১৭২৮)

সামজিক ও ধর্মীয় পরিমন্ডল সুসংহত করার পাশাপাশি সামরিক শক্তির ও সামরিক প্রস্তুতিতে যাতে কোন শিথিলতা না থাকে তার প্রয়াস শুরু হয়। রাজকুমার বীরকিশোর রাজসেনাকে সুসংহত করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

### (৯) বীরকিশোর ছত্রনারায়ণ তুঙ্গদেউ (১৭২৮-১৭৬৮)

ইনি ছিলেন বীর যোদ্ধা। তাঁর দেহরক্ষী রণভীমও ছিলেন কৌশলী বীর সেনানী। রাজা এই গুণের স্বীকৃতিতে বীর রণভীমকে বাগজবড়া মৌজায় ২৬৪ বিঘা জমি দান করেন। এই দান থেকে গুণী মানুষদের শ্যামসুন্দরপুরের রাজাদের জমিদানের

রীতির পরিচয় মেলে। মল্লরাজাদের মত সেবা জমি দানের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও মেলে। সতেরখানি তরফের সর্দার প্রায়ই বড়বাজার থেকে এই রাজ্যসহ দক্ষিণ বাঁকুড়ায় লুটপাট করতে থাকায় আক্রান্ত রাজারা একটি প্রতিরোধী মিত্রজোট গড়ে তোলেন। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর কাটারজ্ঞা পাহাড়ের যুদ্ধে (১৭৫০-৭৫) সর্দার ত্রিভন সিংহ পরাজিত হন। চূড়ান্ত এই যুদ্ধ হয়েছিল পুত্র গঙ্গাগোবিন্দের রাজত্বকালে।

## (১০) গঙ্গাগোবিন্দ সুন্দরনারায়ণ তুঙ্গদেউ (১৭৬৮-১৮০৮)

গঙ্গানারায়ণের সময়ে লৌকিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও মান্যতা একটি বড় ঘটনা। রাজ্যে জনশ্রুতির মোড়কে ধর্মরাজের প্রতিষ্ঠা প্রজানুগত্য আদায়ে সহায়ক হয়েছিল, কারণ প্রজাসাধারণের উপর ধর্মঠাকুরের প্রভাব ছিল অবিসংবাদিত। ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে রাজা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কচ্ছপাকৃতি স্বরূপনারায়ণ, ক্ষুদিরায়, বেচারায় ধর্মশীলা ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করেন। স্বপ্নাদেশ মোতাবেক শ্যামসুন্দরপুরের ভগবানবাঁধের নির্দিষ্ট জায়গা থেকে বিগ্রহমূর্তি নিয়ে এসে মটগোদা গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন ও পুজোর জন্য পুরোহিত নিয়ে আসেন। ধর্মরাজ ঠাকুরের প্রথম পুরোহিত ছিলেন বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিনপুরের নিকটস্থ লালগড়ের নেগই গ্রামের জেলে ভৈরব ধীবর। এই ধীবর ছিলেন পন্ডিত পদবীধারী কৈবর্ত-শুভ্রবর্ণ কশ্যপ গোত্রীয়। রাজা স্বপ্নাদেশের ফলেই এদের খোঁজ পান। এই প্রতিষ্ঠিত ধর্মশিলাটি স্বরূপনারায়ণ নামে পরিচিত। এই প্রধান দেবতার সাথে অন্য অপ্রধান লৌকিক দেবতারা হল বাঁকুড়া রায়, বেচা রায়, ক্ষুদি রায় ধর্মশিলা। আর আছে ত্রিনয়না বস্ত্র পরহিতা সর্বমঙ্গলা, ত্রিনয়না চতুর্ভূজা ষড়চক্রবাসিনী দেবী, কালীর ধ্যানে পুজিতা এক দেবী।[১৭]

অবিঘ্নিত ও নিয়মিত দেব সেবা নিশ্চিত করতে রাজা পূজারীর তত্বাবধানে দেবোত্তর হিসাবে ৫৪ বিঘা সেবা জমি ও মন্দিরের জন্য ১০ শতক বাস্তু ও ৭৭ শতক অতিরিক্ত জমি দান করেন। আর দেবতার উদ্দেশ্যে ১০৭ ভরি সোনা এবং ৮৯৬ ভরি রুপো দান করা হয়। ক্রমে পূজা উপলক্ষ্যে উৎসবের প্রচলন হয়। মাঘ মাসের শেষ শনিবার আট দিনের মহোৎসব শুরু হয় ( শনি মেলা)। এখনও পর্যন্ত মেলার সরকারি অনুজ্ঞাপত্র জারি হয় রাজার নামে এবং রাজাই এই মেলার হোতা। রাজা নিজে এসে পূজার অনুমতি দিলে ধর্মীয় আচার কাজ শুরু হয়। গাজনের মত শালেভক বাণফোঁড়া, আগুন সন্ন্যাসের মত আত্মনিগ্রহ মূলক প্রথা চলে আসছে।

গঙ্গাগোবিন্দের রাজত্বে বড় ঘটনা শ্যামসুন্দরপুরে সন্ন্যাস আগমন। এই রাজার সময়ে মল্লভূম থেকে সন্ন্যাসী দল হাজারে হাজারে ইংরেজ সেনার তাড়া খেয়ে প্রথমে শ্যামসুন্দরপুর পরগণায় প্রবেশ করে। তারপর শিলদা হয়ে গোপীবল্লভপুরের দিকে পালায়। কয়েক হাজার ফকির সন্ন্যাসী পশ্চিমের প্রদেশগুলো থেকে সামন্তভূম মল্লভূমে বেশ কিছু কাল অবস্থান করার পর ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ফোর্বসের তাড়া খেয়ে বিষ্ণুপুর-রায়পুর-শিলদা-আলমপুর পথে মারাঠা নিয়ন্ত্রিত গোপীবল্লভপুরের দিকে পালিয়ে যায়।[১৮] সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে লুঠতরাজ ও প্রজাপীড়নের অভিযোগ ছিল। তবে এই সময়ে ইংরেজের অপশাসন ও শোষণে বিক্ষুব্ধ আম জনতা ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইয়ে এই সন্ন্যাসীদের পাশে দাড়িয়েছিলেন।

শ্যামসুন্দরপুর পরগণায় এদের অবস্থানের সমাচার নেই। তবে এই পরগণা হয়েই সন্ন্যাসীদল শিলদা অভিমুখে রওনা দেয়।

## (১১) আইঠু দ্বিতীয় ছত্রনারায়ণ তুঙ্গদেউ (১৮০৮-১৮৩৭)

এই রাজার সময়ে বরাভূমের গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে চোয়াড় বিদ্রোহ শুরু হয় (১৮৩৭-১৮৪৫)। মটগোদায় আশ্রয় পায় ইংরেজের সাথে যুদ্ধরত বিদ্রোহী গঙ্গানারায়ণ। এই সংবাদে রুষ্ট কোম্পানী শাসকরা শ্যামসুন্দরপুর-ফুলকুসুমা অভিযান করেন। গঙ্গানারায়ণ এই তালুক থেকে বরাভূমের দিকে পালিয়ে যান। ধরা পড়ে বিদ্রোহে সামিল আইঠুদেব ও ভাই প্রতাপনারায়ণ। এদের শিক্ষা দিতে ও জনমনে ভীতির সঞ্চার করতে মটগোদা-রাজাকাটা জঙ্গলে ব্রিটিশ পুলিশ আইঠুদেব ও ভাই প্রতাপনারায়ণের প্রকাশ্য ফাঁসির আয়োজন করে। রাজাদের ফাসি হওয়ার কারণেই সম্ভবত সারিগাড়ি জঙ্গলের নাম পরবর্তীকালে রাজাকাটা জঙ্গল হয়। স্পষ্টতই এই বিদ্রোহে রাজার, রাজপরিবারের ও প্রজাদের সহানুভূতি ও পরোক্ষ যোগদান ছিল।[১৯]

ধর্মীয় পরিমন্ডল রচনা ও লোকধর্মের প্রসারে রাজা যত্নবান ছিলেন। ইনি ধর্মরাজের পুরোহিত ভৈরব ধীবরকে স্থায়ী ভাবে ধর্মমন্দিরটি হস্তান্তরিত করেন। সেই সময় থেকে ধর্মরাজ ঠাকুরের পুরোহিত স্থায়ীভাবে জেলে বা ধীবর সম্প্রদায় ভুক্ত পন্ডিত পদবীধারী মানুষজন। তুঙ্গরাজাই ধীবর পূজারীকে পণ্ডিত উপাধি দেন। সেই পণ্ডিত উপাধি ধীবররা বংশ পরম্পরায় ধর্মরাজের পূজা করে চলেছেন। আইঠুর পুত্র বলভদ্রের সময় পূজারী পন্ডিতদের জমিদানের মাধ্যমে এই স্বীকৃতি আরো জোরালো হয়।

## (১২) বলভদ্র সুন্দরনারায়ণ তুঙ্গদেউ (১৮৩৭-১৮৬৩)

ইনি ছিলেন বীর রাজা। রাজদ্বার ছিল অস্ত্র সজ্জিত ও পদাতিক-অশ্বারোহী-তীরন্দাজ বাহিনী সুরক্ষিত। তাঁর বীরত্বকে অন্য ভূম রাজারা সমীহ করতেন। তিনি খাতড়ার রাজা হরিশ্চন্দ্র ধবলের কন্যাকে বিবাহ করেন। এর পর মানভূম, বরাহভূম, সুপুর, অম্বিকানগর, রাইপুরের রাজকন্যা সহ আরো বারো জনকে। এর দশ পুত্র হল বীরকিশোর(২য়), ছত্রনারায়ণ দেউ, মদন, মোহন, দামোদর, গৌরী প্রসাদ, ব্রজগোপাল, জগন্নাথ, মাধব, গদাধর। নয় কন্যা হল লালকুমারী, উজ্জ্বলকুমারী, আতরকুমারী, বিদ্যুৎলতা, অমৃতকুমারী, সুভদ্রা, সূর্যকুমারী, নীলকুমারী, সাবিত্রীকুমারী। জামবনীর শক্তিশালী রাজা হরিহরদেও ধবলদেব (১৮৬০-১৮৮৭) রাইপুর রাজা রঘুনাথ সিংহের কন্যা ও শ্যামসুন্দরপুরের রাজকন্যা নীলকুমারীকে বিবাহ করেন 'নয় মহলা সম্পর্ক রীতি' মেনে।[২০] ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে শ্যামসুন্দরপুরের রাজা মটগোদার ক্ষেত্রমোহন পন্ডিতকে ঠাকুরের পূজো করার জন্য জমি দান করেন। এছাড়া ঠাকুরের পূজো করার দায়িত্বও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। সেই থেকেই এই পরিবারের সদস্যরাই ধর্মরাজ দেবতার পূজো করে আসছেন স্থায়ীভাবে।

## (১৩) বীরকিশোর দ্বিতীয় ছত্রনারায়ণ তুঙ্গদেউ (১৮৬৩-১৮৯৩)

রাজা দ্বিতীয় বীরকিশোরের সঙ্গীতানুরাগ ও পৃষ্ঠপোষকতার কারণে শ্যামসুন্দরপুর শিল্প-সঙ্গীতের পীঠস্থান হয়ে ওঠে। রাজা ছিলেন সঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধক। ইনি গোয়ালিয়র ঘরানার বন্দিত ওস্তাদ করিম খাঁর পুত্র ওস্তাদ আহম্মদ খাঁকে শ্যামসুন্দরপুরে প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজে সঙ্গীতে পারদর্শী হয়ে ওঠা ছাড়াও ভাই, ছেলে, গ্রামবাসীদের সঙ্গীতমুখী করে তোলেন। গড়ে ওঠে বিষ্ণুপুর ঘরানোর মত ঘরানা, যাকে অনেকে 'ছোট দিল্লী' ঘরানা বলে। এই রাজ্যের সঙ্গীতের আসরে আসতেন বিষ্ণুপুরের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক যদুনাথ ভট্ট, হলধর গোস্বামী, রামব্রহ্ম, গিরিশ চট্টোপাধ্যায়, অনন্তলাল বন্দোপাধ্যায়,নবীন মোহন চূড়ামণি, রামধন শিরোমণি, রামসুন্দর ভট্টাচার্য, গয়া দন্ডপাত প্রমুখ। এর ফলে শ্যামসুন্দরপুরে এক উন্নত সঙ্গীত ঘরানার সৃষ্টি হয়।[২১]

শ্যামসুন্দরপুরের রাজারাও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সুস্থিতির লক্ষ্যে ভূমিদান করেছিলেন। ১৮৭৮ সালের এক দলিল মূলে দেখা যায় ছত্রনারায়ণের পিতা ও পিতামহের গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরজীউ, গোপালজীউ, শালগ্রাম জীউয়ের নিয়মিত

সেবাপূজা, ঝুলন যাত্রা, রাস যাত্রা ও দোল যাত্রার ব্যায় নির্বাহের জন্যে বাঁকুড়া মৌজায় ৩৪ বিঘা ১০ কাঠা জমি, পাথরি মৌজায় ১৫ বিঘা ৩.৫ ছটাক জমি, আসানবাটি মৌজায় ৭ বিঘা জমি দেবোত্তর চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া আরো কিছু মৌজায় দেওয়া হয় খাস পতিত জমি। ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে এই সম্প্রদান দলিল লিখিত হয় বলে মনে হয়।[২২] এই সম্পত্তি ছিল দান, হস্তান্তর, বিক্রয় নিরপেক্ষ।

অন্যান্য তালুকগুলির মতো এসময় শ্যামসুন্দরপুরও করভারে জর্জরিত হয়ে পড়ে। এই রাজার সময়েই কর অনাদয়ে শ্যামসুন্দরপুর জমিদারি হাতছাড়া হয়। ১৮৮৯ সালে ইংরেজ সরকারের আয়োজিত নিলামে শ্যামসুন্দরপুর জমিদারি বিক্রি হয়ে যায়।

১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে তালুকের ইজারা গিসবর্ণ এ্যান্ড কোম্পানীর হাতে চলে যায়। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের নিলামে এটি চলে চলে যায় সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের হাতে। সেস অনাদয়ে ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে জমিদারি আবার নিলামে ওঠে। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা অবশেষে এর মালিকানা পান।[২৩]

তাঁর সময়েও 'নয় মহলা সম্পর্ক' রীতি অব্যাহত ছিল। তিনি নিজে জামবনীর রাজকন্যা হৃদয়কুমারীকে বিবাহ করেছিলেন। অন্যদিকে জামবনীরাজ ঈশ্বরচন্দ্র ধবলদেব (১৮৮৭-১৮৯৪) বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন শ্যামসুন্দরপুর রাজকন্যা চুদাকুমারী ও বরাভূমের রাজকন্যা শ্যামকুমারীর সাথে (বরাভূমের যদুনাথ সিংহদেবের কন্যা)।

## (১৪) গৌরীপ্রসাদ সুন্দরনারায়ণ তুঙ্গদেউ (১৮৯৩-১৯১২)

গৌরীপ্রসাদ আর্থিক অনটন সত্ত্বেও পিতার দ্বারা প্রবর্তিত সঙ্গীত ঘরানার আবহ ও ধারা অক্ষত রাখেন। এসময় বিপ্লবী আন্দোলনের তীব্রতা অনুভূত হয় জঙ্গলমহলে। ক্ষুদিরামের মত বিপ্লবীদের আস্তানা ছিল ছেঁদাপাহাড়ে। রাজভ্রাতা তপনকুমার নারায়ণ দেউ ছিলেন এই আস্তানার ঘোড়দৌড় সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মূল কারিগর। প্রত্যেকদিন রাতে এ কাজে বেড়িয়ে ভোরে ফিরে আসতেন, গ্রামবাসীদের জানতে না দিয়ে। ১৯০৮ সালের ১১ আগষ্ট ক্ষুদিরামের ফাঁসির কিছুদিন আগে থেকেই তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। হয় ব্রিটিশ পুলিশের হাতে মৃত্যু বা কোন আশ্রমে স্বেচ্ছানির্বাসনের তত্ত্ব কেউ কেউ দিয়ে থাকেন। যাই হোক ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এই রাজ পরিবারের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল। এই পরিবারের চৌদ্দ

বছরের বালক বিশ্বনাথ নারায়ণ দেউ অমরকাননে শিশুরাম মন্ডলের সাথে দেশমুক্তির সাধনায় যোগ দেন এবং কারাবরণ করেন।

১৮৯৮ সালের পরগণার একটি পারিবারিক দলিলে 'আড়া' মাপের উল্লেখ আছে। তুঙ্গভূমে এক আড়া (অর্থাৎ ১ কুইন্টাল ৬ কেজি) ধানের দাম ছিল ২ টাকা। চালের হিসাবে ৭০ কেজি। এই হিসেব থেকে সমকালীন অর্থ-ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। রাজা অর্থ সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে রাইপুরের মহাজন শ্রীনাথ সাহুর কাছে ঋণ নিতেন।

## (১৫) শ্যামনফর ছত্রনারায়ণ তুঙ্গদেউ (১৯১২-১৯৩৩)

এই আমলেও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা জারি ছিল। রামরুদ্র, শ্যামনফর শরৎচন্দ্র, তপননারায়ণ ছিলেন চার ভাই। ১৯০৮ সালে চার্লস টেগর্ট হাতির পিঠে দুর্গম শ্যামসুন্দরপুর-ফুলকুসুমা অভিযান করলে বিদ্রোহী তপননারায়ণ (বড়ঠাকুর) খুন বা নিখোঁজ হয়ে যান। একই হাল হয় ফুলকুসুমার সুন্দরনারায়ণের ভাই কালীপ্রসন্নর। তপননারায়ণ ঘোড়ায় চড়তে পারতেন। ঘোড়ায় চড়ে বিপ্লবী কাজকর্ম করতেন, ছেঁদাপাহাড় বিপ্লবী ঘাঁটিতেও যেতেন।

'নয় মহলা সম্পর্কের' রীতি মেনে রাজা শ্যামনফর বিবাহ করেছিলেন জামবনীর রাজকুমারী সরস্বতী দেবীকে। হিকিম শরৎ চন্দ্র নারায়ণদেও বিবাহ করেছিলেন ঐ পরিবারের আরেক রাজকুমারী দুর্গা দেবীকে।[২৪]

## (১৬) কানাই সুন্দরনারায়ণ তুঙ্গদেউ (১৯৩৩-১৯৭৬)

আর্থিক সংকট সত্বেও সঙ্গীত ও সংস্কৃতির প্রতি রাজপরিবার ছিল সমান দায়বদ্ধ। 'নয় মহলা সম্পর্কের' রীতি মেনে অম্বিকানগর রাজা রাইচরণের পৌত্রী সুনন্দার (কারু শিল্পের জন্য রাজ্য সরকার দ্বারা পুরস্কৃত) সাথে পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৫৩ সালে জমিদারি অধিগ্রহণের সময় সরকার অধিগৃহীত এই রাজ্যের দেবোত্তর সম্পত্তির চিরকালীন বার্ষিক বৃত্তি ধার্য হয় ২০০৭ টাকা ১৫ আনা ৭ পাই।

কানাইসুন্দরের পুত্র বর্তমান মুকুটহীন রাজা বলে পরিচিত পশুপতি ছত্রনারায়ণ দেউ ও তাঁর পুত্র শুভেন্দু সুন্দরনারায়ণ, এই সুপ্রাচীন রাজবংশধারার বিভিন্ন রীতি নীতির এখন ধারক ও বাহক। প্রজন্মভেদে ছত্রনারায়ণ ও সুন্দরনারায়ণ পদবী ব্যবহারের চল এখনও মানা হয়।

## সাহিত্য ও সংস্কৃতি

শ্যামসুন্দর-রাইপুরে পরিমন্ডলে রাজানুকূল্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশের প্রমাণ মেলে চতুষ্পাঠীর অস্তিত্বে ও প্রসারে। ১৯২০ সাল নাগাদ রাইপুর থানার বীরভানপুরের শ্রীনাথচন্দ্র কাব্যব্যকরণতীর্থ প্রতিষ্ঠিত বৃষভানু চতুষ্পাঠী এলাকায় খ্যাতি লাভ করে। শ্যামসুন্দপুরের রাজাদের প্রত্যক্ষ আনুকূল্যে সঙ্গীত ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছিল। বলভদ্র সুন্দরনারায়ণ গোয়ালিয়র ঘরানার ওস্তাদ করিম খানকে এনে সঙ্গীতসভা চালু করেন। বীরকিশোর ছত্রনারায়ণ ধ্রুপদ গানে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। চতুর্থ ভাই গোপালনারায়ণ পাখোয়াজ-সারেঙ্গীতে, পঞ্চম ভাই গঙ্গানারায়ণ সারেঙ্গী বাদনে, সপ্তম ভাই মদনমোহন সেতার বাদনে সুনাম অর্জন করেন। শুধু রাজ অন্তঃ পুরেই সুরের মুর্ছনা সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রজা সাধারণের মধ্যেও এই সঙ্গীতের ধারা সমান ভাবে আলোড়ন তোলে। গ্রামের রাধানাথ মাইতি, ভগীরথ ধাইভাই খেয়াল ও ধ্রুপদানে প্রতিভার সাক্ষ্য দেন ও রাজা এতে আপ্লুত হয়ে এদেরকে ভূমিদান করেন, যা এক কথায় অভূতপূর্ব। সঙ্গীত সাধনায় প্রতিভার সাক্ষ্য রাখার জন্যে ভূমিদানের ঘটনা অশ্রুত। বড় রাজকুমার গৌরীপ্রসাদ সুন্দরনারায়ণ সঙ্গীত সাধানায় জীবন অতিবাহিত করেন। ময়ূরভঞ্জের রাজদরবারের সঙ্গীতগুরু যদুনাথ রায় শ্যামসুন্দরপুরের সঙ্গীত আবহ ও বড় রাজকুমারের সেতার-সুরবীনের সুরক্ষেপ দেখে মোহিত হয়ে যান। এমনকি পরবর্তী প্রজন্মের শ্যামনফর ছত্রনারায়ণ সেতার-মৃদঙ্গে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র, চিকিৎসা বিদ্যা, কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাতেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর স্বরচিত স্বরলিপি ভাবীকালের কাছে সম্পদ স্বরূপ। তাঁর ছোটভাই তপন নারায়ণও সেতার-মৃদঙ্গে দক্ষতা প্রদর্শন করেন। এর পরবর্তী সময়েও কানাই নারায়ণের তবলা-মৃদঙ্গের মধ্যে দীর্ঘ সঙ্গীতচর্চার রেশ বজায় থাকে। রাজপরিবারের হরিপদ নারায়ণ দেউ সিমলাপালের রাজ সঙ্গীতগুরু জ্ঞানপ্রকাশ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে খেয়াল ও ধ্রুপদ পরিবেশন করে শ্যামসুন্দর ঘরানার উৎকর্ষতার প্রমাণ দেন।[২৫] তাঁর আলাপ, বিস্তার, গলায় গিটকারী জ্ঞানপ্রকাশের প্রশংসা আদায় করে। উত্তর বংশের গিরিশ নারায়ণের আনুকূল্যে শ্যামসুন্দরপুরে যাত্রা-থিয়েটারেরও সমৃদ্ধি ঘটে। এভাবেই রাজানুকূল্যে শ্যামসুন্দর পরিমন্ডলে শিল্প-সংস্কৃতি-শিক্ষার বিস্তার সম্ভব হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে পাল-মৌর্য-গুপ্ত-পাল যুগে জৈন প্রভাবে শ্যামসুন্দর পরিমন্ডলে জৈন জীবন ও জ্ঞানচর্চার বিকাশ ঘটেছিল। সাতপাট্টা-মন্ডলকুলি-গড়খুল্যা সহ বিভিন্ন

গ্রামে আবিষ্কৃত জৈন সভ্যতার অবশেষ এর প্রমাণ।

## ধর্মীয় পরিমন্ডল :

রাজ পরিবার প্রবর্তিত দেবদেবী হল কুলদেবী শ্রী শ্রী দক্ষিণাকালী ষড় চক্রবাসিনী দেবী, গোপীনাথ জীউ, বলরাম জিউ, ঠাকুরাণী, শালগ্রাম শিলার ছয় মূর্তি, দধিচী জিউ, শ্রী শ্রী শ্যামসুন্দর জীউ, ছয় যুগল মূর্তি, নাড়ু গোপাল, শীতলা দেবী, শিব, শীতলা, কালাচাঁদ জীউ, ক্ষুদে জগন্নাথ জীউ, পবিত্র দুটি তরবারীর ন্যায় স্বকেলা বা শুরহী, দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ, বহুদন্ড চামর। হাম্বিরকন্যা শ্যামাসুন্দরীর সাথে শ্যামসুন্দরপুররাজের (শ্যামসুন্দর ছত্রনারায়ণ) বিবাহের সময় মল্লভূম থেকে শ্যামসুন্দর, মদনমোহন, গোপীনাথ সহ ছয় যুগল মূর্তি আনীত হয়। কালের গর্ভে সমস্ত দেবালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে বর্তমানে রাজবাড়ীর দ্বিতল কক্ষে এসব দেবতা একত্রে সংরক্ষিত আছে।[২৬]

রায়পুরের কুলদেবী কোকামুখ মহামায়া (অনেকের মতে রায়পুরে তুঙ্গভূমরাজ প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দর মন্দিরে, পরে রাইপুররাজ সিংহ পরিবার কর্তৃক মহামায়া প্রতিষ্ঠিত হয়), রসপালের কুলদেব জগন্নাথের মন্দির মূল তুঙ্গভূমের বৈষ্ণব ভাবনার অনুসারী। বৈষ্ণব মল্লরাজার অনুকরণে এরা 'তুঙ্গ অবনীনাথ' অভিধায় ভূষিত হত। তবে মল্লভূমে শ্রীনিবাস আচার্য প্রভাবিত বৈষ্ণব ভাবধারার প্রচলনের অনেক আগেই তুঙ্গভূমে ওড়িষ্যাগত বৈষ্ণব আদর্শ প্রচারিত হয়েছিল।

জন সাধারণের কাছে মটগোদার ধর্ম ঠাকুরের প্রভাব দু'শতাব্দী ধরে অবিসংবাদিত ও অপ্রতিহত। মটগোদা ধর্মরাজ সম্পর্কে জনশ্রুতি যে ঠাকুরের স্বপ্নাদেশে ভগবানবাঁধের নির্দিষ্ট অংশ থেকে রাজা এই বিগ্রহ উদ্ধার করেন। আর পূজারি সম্পর্কে স্বপ্নাদেশ ছিল মেদিনীপুরের বিনপুর থানার নেগই গ্রামের ভৈরব ধীবরকে শ্যামসুন্দরপুরে প্রতিষ্ঠার। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে জেলে-কৈবর্ত বংশীয় শূদ্রবর্ণের কশ্যপ গোত্রের একজনকে পূজারি হিসাবে নিয়োগ ছিল সমাজতাত্ত্বিক ভাবনার নিরিখে বৈপ্লবিক ঘটনা। রাজা এনিয়ে নবদ্বীপের পন্ডিত সমাজের মত জানতে চাইলে তারা বলেন, ভৈরব ধীবর ভক্তি ও শক্তিতে ব্রহ্ম জ্ঞান-ঋদ্ধ ব্রাহ্মণ। যে ঈশ্বর আরাধনা করে, তার পূজার পূর্ণ অধিকার আছে। অবশ্য তাঁকে উপনয়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে আড়াই প্যাচ তামার অঙ্গুরী ধারণ করে পন্ডিত উপাধি নিতে হয়েছিল। ধর্ম ঠাকুরের ভোগ আসত মটগোদা, সারিগাড়ি,

লজাট, আসানবনী মৌজা থেকে। দেবালয়ের সম্পদ ছিল চারটি সোনার ছাতা (প্রতিটি তিন ভরি), আটটি সোনার পাখা (প্রতিটি তিন ভরি), তিন ভরি সোনার মুকুট। মোট সোনার পরিমাণ ১০৭ ভরি। চাঁদি রূপার খড়ম ৬৪ জোড়া (প্রতি জোড়া ১৪ ভরি), মোট রূপা ৮৯৬ ভরি।

শ্যামসুন্দরপুর রাজপরিবার সোমবংশীয় তুয়ার শাখার ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত। গোত্র ধৌম্যঋষি, প্রবর হল অগস্ত্য-চ্যবন-ভৃগু-ধ্রুব। কুলদেবী কাঙ্কালীচণ্ডী। ঘটিক শ্যামবর্ণ, অস্ত্র স্বকেলা বা শূরহি, পাগড়ি আড়াই পোঁচ। এদের রাজপুরোহিত ছিলেন ভরদ্বাজ গোত্রীয় পুরুষোত্তম করের বংশধর। জগন্নাথপুর থেকে শ্যামসুন্দরপুরে রাজধানী স্থানান্তর হলে এক ফুটের নিমকাঠের জগন্নাথের ঠাঁই হয় চুনসুরকির ছোট মন্দিরে। যেটি এখন মণ্ডলকুলিতে। উত্থান একাদশী ও রথের দিন এখানে বিশেষ পূজা হয়। করেরা সেবা জমি, বৃত্তি ও ‘চক্রবর্তী’ উপাধী পায় রাজা শ্যামসুন্দরের কাছে। গৌরহরি কর (১৭৭০), প্রসাদ কর (১৮২৪ সালের একটি পুঁথির লিপিকর) বর্তমান পূজারী অজিতের পূর্বজ। কর্মকারেরা ছিল রাজাদের আঁখরিয়া। মটগোদার পাণ্ডারা ছিল রাজা আনীত উৎকল ব্রাহ্মণ। এরা পায় দেবোত্তর মৌজা নীলজোড়া ও সাঁকো। তখন থেকে কাঠের জগন্নাথ মটগোদায় পূজিত হয়। প্রথম পুরুষ মার্কণ্ড পাণ্ডার বংশ হল নরসিংহ-হরি-পীতাম্বর-রাসু-ব্রজ-গোপেশ্বর।

## শ্যামসুন্দরপুরের দেবীপূজা

ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যায় বেল তলায় বোধন অধিবাস পালিত হয়। নবপত্রিকা (কলাগাছ, কচু, হলুদ, জয়ন্তি, জোড়া বেল, ডালিম, অশোক, মান, ধান) পাটরজ্জু দিয়ে বেঁধে চৌদলে চাপিয়ে তন্ত্রধারক, পুরোহিত, ছয়জন ব্রাহ্মণ, রাজপরিবারের জ্যেষ্ঠ সদস্য (ব্রতী) সহ বিভিন্নজন পুকুরপাড়ে পূজাদি সম্পন্ন করে দুর্গামণ্ডপে প্রতিষ্ঠায় অংশ নেয়। সপ্তমিতে পূজা, চন্ডীপাঠ, হোম, আখ-কুমড়ো বলি করা হয়। দুর্গ-চণ্ডী মণ্ডপে সন্ধিপূজা ও বলিদান হয়। পাঁচদশক আগেও বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী মন্দিরের সন্ধিপূজার তোপধ্বনির শব্দ শুনে শ্যামসুন্দরপুরের রাজবাড়ির তোপদাগা হত ও রসপাল রাজবাড়ির বলিদান অনুষ্ঠিত হত। আর শুরু হত এলাকার অন্যান্য পূজার সন্ধি পূজা। দ্বিপ্রহরের মধ্যে রাজকুলদেবী, দক্ষিণাকালী, ষঢ়চক্রবাসিনী দেবীকে নির্দিষ্ট বেদিতে স্থাপন করে দেওঘরিয়া গাঙ্গুলী বংশের পুরোহিত পূজা সম্পন্ন করেন। তিন দিন ধরে জ্বলে জাগর প্রদীপ। এক হাজার আটটি বেলপাতাও ঘি দিয়ে তিন দিন ধরে

হোম ও চণ্ডীপাঠ হয়। দশমীর দিন দেবী ও নবপত্রিকার বিসর্জন হয়। নবপত্রিকার পূজাপাঠ করে তন্ত্রধারক এগুলি বালা করে সবাইকে পরিয়ে দেয়। প্রণাম, আলিঙ্গন, শান্তি জল প্রদানের মধ্যে বিজয়া সম্পন্ন হয়। দুর্গাপূজা করেন বীরভারপুরের পাণ্ডা বংশের পূজক। তন্ত্রধারক ও চণ্ডীপাঠক হলেন ধর পরিবার।

বিকেল চারটায় কুলদেবীকে নিয়ে দেওঘরিয়া গাঙ্গুলী পদবীর পূজক দেড় কিমি দৌড়ে পাঠা বিন্ধা নামক নির্দিষ্ট জায়গায় স্থাপন করেন। হোম-পূজা পাঠ শেষ পাটার মধ্যে মাটির মূর্তিকে তীরবিদ্ধ করা হয়। তারপর আবার দৌড়ে দেবীকে মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। এইরূপ বিবিধ বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে শ্যামসুন্দরপুরের দুর্গাপূজা।

## ঔপনিবেশিক অভিযান

১৭৬০ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তা জন এনসাইন ফারগুসনের নেতৃত্বে দক্ষিণ বাঁকুড়ার ভূমরাজ্যগুলিতে আধিপত্য বিস্তারের আশায় এক সামরিক অভিযান হয়। এই অভিযানে শ্যামসুন্দরপুর-ফুলকুসুমার ভূমিকর ধার্য হয় বার্ষিক ৫০০ টাকা (অখন্ড জমিদারির ষাট শতাংশ শ্যামসুন্দরপুরের)। তবে রায়পুরের দুর্জন সিংহ যেমন আরোপিত বার্ষিক ভূমিকর ২৫০৯ টাকা দিতে অস্বীকার করেন, তেমনি ফুলকুসুমার রাজা দুর্জন সিংহের মতই বিদ্রোহী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এসময় শ্যামসুন্দরপুরের জমিদার ছিলেন বীরকিশোর ছত্রনারায়ণতুঙ্গ দেউ (১৭২৮-১৭৬৮) ও গঙ্গাগোবিন্দ সুন্দরনারায়ণ তুঙ্গদেউ (১৭৬৮-১৮০৮)। এরাও সম্ভবত বিদ্রোহে যোগ দেন। কারণ ১৮৩৩ সালে বরাভূমের বিদ্রোহী নায়ক গঙ্গানারায়ণ যখন তুঙ্গভূমে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন তাকে আশ্রয় নিতে দেখা গিয়েছিল শ্যামসুন্দরপুর রাজবাড়ী সন্নিহিত মটগোদার জঙ্গলের রাজাকাটা বনে।[২৭] এই অপরাধে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রাজা দ্বিতীয় আইঠুদেব ছত্রনারায়ণ তুঙ্গ দেউ (সাথে ভাই প্রতাপনারায়ণ) ও ফুলকুসুমার দর্পনারায়ণের রাজাকাটা জঙ্গলে প্রকাশ্য ফাঁসির আয়োজন করে। জনমনে ভীতি ও ভবিষ্যত বিদ্রোহ প্রবণতা বন্ধেই ছিল এই নারকীয় প্রকাশ্য ফাঁসির আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।

কোম্পানীর গা-জোয়ারী নীতির ফলে জঙ্গলমহল আরো অশান্ত হয়ে পড়ে। কারণ নতুন ভূমি নীতির ফলে এত দিনকার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙে পড়ে ও উচ্ছিন্ন সর্দার - ভূমিপতিরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। প্রচলিত ব্যবস্থায় শাসিত

পরগণাগুলো কয়েকটি তরফে বিভক্ত ছিল। এর শাসক ছিল তরফ- সর্দার বা সদর ঘাটোয়াল বা দিগওয়ার। তরফের মধ্যে কিছু গ্রামের দায়িত্বে ছিল সাদিয়াল বা মনকি এবং পাড়ার দায়িত্বে ছিলেন তাঁবেদার। এরাই ছিল কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সাথে গ্রাম সাধারণের যোগসূত্র। এরা প্রশাসনিক ও রাজস্ব দায়িত্বের বিনিময়ে গ্রামে নিষ্কর বা পঞ্চকি জমি ভোগ করতেন। নয়া ঔপনিবেশিক রাজস্ব ব্যবস্থায় এই ব্যবস্থাগুলির স্বীকৃতি না মেলায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে একেবারে নিচের তলাতেও। এমনকি সাঁওতাল-ভূমিজদের স্বশাসিত গ্রাম ব্যবস্থাও ভেঙে পড়তে থাকে। ১৯০৯ সালে প্রকাশিত ম্যাকালপিন প্রতিবেদনে দেখা যায় আদিতে শ্যামসুন্দর পরগণার যেখানে ৭০টি ছিল সাঁওতাল মন্ডলী প্রথার গ্রাম, ১৮৯২ সালে মাত্র ১৪ টি গ্রামে এই প্রথা অবশিষ্ট আছে এবং ১৯০৯ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র দুটিতে।[২৮] এই অবক্ষয় ছিল মূলত ঔপনিবেশিক ভূমি ব্যবসা ও বেনিয়াতন্ত্রের অভিঘাত সঞ্জাত।

শ্যামসুন্দরপুর-রাইপুর পরিমন্ডলে প্রাক-ঔপনিবেশিক সময়েই কৃষি ব্যবস্থায় সমৃদ্ধি এসেছিল। ১৭৬৭ সালে রাইপুর তালুকে অভিযানকালে জন এনসাইন ফারগুসন যমুনা সায়র সহ বিভিন্ন সরোবরের সাহায্যে গড়ে ওঠা সেচ ব্যবস্থা ও সমৃদ্ধ কৃষিক্ষেত দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। বস্তুত উপজাতীয় ঝুমচাষ ওড়িয়া দেশাগত কৃষক-বণিক নাগরিকদের প্রভাবে অনেক আগেই জলা-জমি চাষে পরিবর্তিত হয়েছিল, যা কৃষি প্রকরণের মৌলিক পরিবর্তন এনেছিল।

১৮৯৮ সালের পারিবারিক দলিলে আড়া মাপের উল্লেখ আছে। তখন ১ আড়া ধানের দাম ছিল ২ টাকা। ১ আড়া হল ১ কুইন্টাল ৬ কেজি।

## দেবোত্তর সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও ভূদান :

রাজানুকূল্যে তুঙ্গভূমের বিভিন্ন গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে বিভিন্ন দেবালয়। মূলত বৈষ্ণব অনুষঙ্গে। এই সব মন্দির ও সেবাইতদের বিবরণ নিম্নরূপ।

(১) শ্যামসুন্দর জীউ : পূজা পার্বণাদি বর্তমান রাজপরিবার করে।

(২) জগন্নাথ জীউ : ডাঙ্গরসাই/জগন্নাথপুর মৌজার একসময়ের আদি চক্রবর্তী (পুরুষোত্তম কর) হতে দৌহিত্র বংশ পান্ডে, পাত্র, মহান্তি, রায়, আচার্য পরিবার দেখাশোনা করত। বর্তমানে রাজবাড়ীতে আনীত।

(৩) দামোদর জীউ : গাঙ্গুলি বংশীয়রা পূজা করেন।

(৪) কুলদেবী সহ অন্যান্য দেবদেবী : গাঙ্গুলি বংশীয়রা বর্তমান পূজারী।

(৫) মটগোদার ধর্মরাজ জীউ এবং শনি মেলা: পন্ডিত পূজারী।

(৬) মটগোদা গোবিন্দ জীউ : মুখার্জী বংশীয়রা পূজারী।
(৭) বাসন্তী পূজা ও দুর্গা পূজা : মটগোদার পান্ডা বংশীয়রা পূজারী।
(৮) জনার্দন বিগ্রহ : কেলেপাড়া ব্রহ্মোত্তর ভূদান পূজারী চৌধুরী বংশের অনুকূলে।
(৯) কলাচাঁদ জীউ : সারিগাড়ি গোস্বামী বংশীয়দের দ্বারা।
(১০) শীতলা বিগ্রহ : সাতপাট্টার দেবোত্তর সম্পদ নিলামে কাশ্মীরের দেওয়ানের হাতে গেলেও পরে রাজপরিবারের হাতে ক্রয়মূলে আসে।
(১১) শিব/শীতলা: মন্ডলকুলির চক্রবর্তী পরিবার।
(১২) মন্ডলকুলির জগন্নাথ জীউ : কর বংশীয়রা পূজার্চনা করেন। (১৩) তুঙ্গচাড়রের শিব : মুখার্জী ও চক্রবর্তী বংশীয়দের দ্বারা।

নকুড় তুঙ্গ সহ প্রথম চারপুরুষের রাজত্বকালে বিভিন্ন গ্রামে যেসব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তা হল (১) সাতপাট্টা গ্রামের শীতলা দেবী (২) ডাঙ্গরসাই গ্রামের জগন্নাথ জীউ (৩) মন্ডলকুলি গ্রামের শিব-শীতলা, কর বাড়ীর জগন্নাথ জীউ (৪) সারিগাড়ি গ্রামে কালাচাঁদ জীউ।

## ভূ-সম্পত্তি দানের খতিয়ান :

শুধু রাজানুকূল্যে দেবালয় ও দেবতার প্রতিষ্ঠা নয়, এদের নিয়মিত সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে সেবা জমি দানের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী ও কর্মী মানুষদের জমিদান ছিল এই রাজপরিবারের ঐতিহ্য ও উদারতার সাক্ষ্য। এমন কিছু উদাহরণ হল—

(১) রাজগুরু শ্রীপতি মহাপাত্র রাজা নকুড়ের রাজ্যাভিষেকের পৌরোহিত্য করেন। পরে পুত্র চৈতন্যের অন্নপ্রাশনের দিন তাঁকে সিমলাপাল মৌজা দান করে।
(২) রায়পুরের পূর্বতন রাজপরিবারের জমিদারির স্বীকৃতি দেন।
(৩) ডাঙ্গরসাই/জগন্নাথপুর মৌজা একসময় আদি চক্রবর্তী (পুরুষোত্তম কর হতে দৌহিত্র বংশ পান্ডে, পাত্র, মহান্তি, রায়, আচার্য পরিবার) দেখাশোনা করত। বর্তমানে রাজবাড়ীতে আনীত।
(৪) অক্ষয়চন্দ্র গোস্বামীকে (মানভূম পরগণার অন্তর্গত শ্রীপাট শ্যামনগর নিবাসী) রাজাকাটা ও অসুরগড়িয়া মৌজা দান করেন।
(৫) বলরামপুর (খাতড়া) নিবাসী গোস্বামীদের মালবেড়া মৌজা দান করেন।

(৬) শ্যামনগরের গোস্বমীদের ভাদুলী, তুড়ুপতুপা, কালাশোল মৌজা দান করেন।
(৭) খড়দহ নিবাসী নিত্যানন্দ গোস্বামীদের বেলাকলা, গোপীবল্লভপুর মৌজা দান।
(৮) গয়াধাম নিবাসী লছমনলাল মোহরাকে কুইলাপাল ও পাঁচশাবন্ধ মৌজা দান করেন।
(৯) শ্যামসুন্দরপুরের রাধানাথ মাইতিকে ঢেকিকাটা মৌজা দান করেন। ওই গ্রামের ভগিরথ ধাইভাইকে খর্দা মৌজার ৬০ বিঘা জমি দান করেন। এরা ভূমিদান পেয়েছিলেন সঙ্গীতের ভক্ত হিসাবে।
(১০) করণ বংশীয়দের খড়িগেড়্যা মৌজায় ভূমিদান। এরা ভূমিদান পেয়েছিলেন সঙ্গীতের ভক্ত হিসাবে।
(১১) মটগোদার জীবন মেট্যাকে নেদরা মৌজায় ৬০ বিঘা জমি দান। এদের ভূমিদান পেয়েছিলেন সঙ্গীতের ভক্ত হিসাবে।
(১২) ১২৪৭ সালে (১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে) শ্যামসুন্দরপুরের রাজা ছত্রনারায়ন তুঙ্গদেও -এর পুত্র সুন্দরনারায়ন তুঙ্গদেও মটগোদার ক্ষেত্রমোহন পন্ডিতকে ঠাকুরের পুজো করার জন্য জমি দান করেন।

দক্ষিণ বাঁকুড়ার প্রাচীন এই রাজবংশের সৃষ্টি ও পুষ্টি ঘটেছিল বৃহৎ সময়ের পরিসরে ও স্থানিক বৃত্তে। এর ঐতিহাসিক সূচনা পর্ব ছিল মল্লবংশের ইতিহাস সিদ্ধ শাসন প্রবর্তনের অনেক আগেই। তুঙ্গভূমির আয়তন মল্লভূমির সমতুল। তবে তুঙ্গভূমের দানশীল ভূমিকায় রায়পুর, সিমলাপাল পরগণা ও পরবর্তীকালে ফুলকুসুমা পরগণা তুঙ্গভূমের মূল ক্ষমতা কেন্দ্রের বাইরে চলে যাওয়ায় এর কার্যকরী আয়তন অনেক কমে যায়। কিন্তু কর্ম তৎপরতা, প্রজাহিতৈষণা, শিক্ষা সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা, দেশভক্তি, ধর্মীয় সমতার ভাবনায় এই রাজ বংশের অবদান প্রায় অনালোচিত। রাইপুর-শ্যামসুন্দরপুর-সিমলাপালের প্রাচীন রাজ ঐতিহ্য ও স্মারকগুলিও প্রায় পর্যটকদের অগোচরেই ধ্বংশ হতে বসেছে। এই বিপন্নতা ও সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায়ও বোধহয় আমাদের জানা নেই।

## শ্যামসুন্দরপুরের পতন

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে শ্যামসুন্দরপুর জমিদারি সেস অনাদয়ের কারণে নিলামে ওঠে ও কিনে নেন সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। কিন্তু তিনি এই জমিদারি কিনে লাভ করতে

পারেন নি। তিনি উপায় হিসাবে খুব সামান্য খাজনায় চিরস্থায়ী মোকাবরী ইজারায় বিভিন্ন জনকে জমিদারির অংশ ইজারা দিতে থাকেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ভাগলপুরের বিশিষ্ট উকিল ও শরৎকামিনী এস্টেটের মালিক চন্দ্রশেখর এই সম্পূর্ণ এস্টেটটি কিনে নেন। অবশেষে ১৯১৩ সালের পর শরৎপুত্র যামিনীমোহনদের কাছ থেকে দ্বারভাঙ্গার মহারাজ কিনে নেন শ্যামসুন্দরপুর পরগণা। পতন ঘটে এক সুপ্রাচীন রাজবংশের।[২৯]

**তথ্যসূত্র :**


১. **Hiteshranjan Sanyal, Social Mobility in Bengal, Calcutta 1981, p. 68.**
২. **LSS O'Malley, Bankura District Gazetteers, Calcutta 1908 (Reprint 1995), p. 179.**
৩. বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড, কলকাতা ১৯৫০, পৃ. ৬৪ ও ১৭৮।
৪. **LSS O'Malley, Bankura District Gazetteers, Calcutta 1908 (Reprint 1995), p. 179.**
৫. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০ (পুনঃ মুদ্রণ ২০১০) পৃ. ৭৩।
৬. **A. P. Mallik, History of Bishnupurraj, Calcutta, 1921, p.42.**
৭. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০ (পুনঃ মুদ্রণ ২০১০) পৃ. ৩১।
৮. অশোক মিত্র, পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ৪র্থ খণ্ড, দিল্লী, ১৯৭৪, পৃঃ ১৫১।
৯. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০ (পুনঃ মুদ্রণ ২০১০), পৃঃ ৩১।
১০. **Sahidul Hasan, Water Management in Medieval Bengal, Bangladesh Historical Studies, Vol-XXIV, 2014-16, p.21.**
১১. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০ (পুনঃ মুদ্রণ ২০১০), পৃঃ ৩০।
১২. **LSS O'Malley, Bankura District Gazetteers, Calcutta 1908 (Reprint 1995), p. 210-11.**
১৩. মাণিকলাল সিংহ, পশ্চিমরাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ১৭৯।
১৪. ক্ষেত্রসমীক্ষা ও শ্যামসুন্দর রাজপরিবারের পশুপতি নারায়ণ দেউয়ের দেওয়া তথ্যাদি।
১৫. বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা ১৯৫০, পৃ. ৯৩।
১৬. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০ (পুনঃ মুদ্রণ ২০১০), পৃঃ ৮২।
১৭. অশোক মিত্র, পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ৪র্থ খণ্ড, দিল্লী, ১৯৭৪, পৃঃ ১৫২।
১৮. **Jaminimohan Ghosh, Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal, Calcutta, 1930, p.58**
১৯. দেবপ্রসাদ জানা (স.), অহল্যাভূমি পুরুলিয়া, পর্ব-১, ২০০৩, পৃ. ৫১।
২০. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০ (পুনঃ মুদ্রণ ২০১০), পৃঃ ৮২।
২১. শ্যামসুন্দর রাজবাড়িতে সংরক্ষিত নথি। সৌজন্যে রাজপরিবারের পশুপতি নারায়ণ দেউ।

২২. ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ও ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের দলিল সংক্রান্ত ব্রিটিশ নথি।
২৩. **F W Robertson, Final Report on the Survey and settlement Operations in the District of Bankura, Calcutta, 1926, p.37.**
২৪. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০ (পুনঃ মুদ্রণ ২০১০), পৃঃ ৩১।
২৫. লীলাময় মুখোপাধ্যায়, সুরতীর্থ বিষ্ণুপুরের পাঁচ সঙ্গীতগুণী, বিষ্ণুপুর, ২০০৭, পৃ. ৭৬।
২৬. ২০১৭ সালে লেখকের ক্ষেত্রসমীক্ষা ও শ্যামসুন্দর রাজপরিবারের পশুপতি নারায়ণ দেউয়ের দেওয়া তথ্যাদি।
২৭. **Nitish Sengupta, Land of Two Rivers, New Delhi, 2011, p. 227.**
২৮. **M. C. McAlpine, Report on the condition of the Santals in the Districts of Birbhum Bankura Midnapore and North Balasore, Calcutta, 1909, p. 227.**
২৯. **F. W. Robertson, Final Report on the Survey and Settlement Operations in the district of Bankura 1919-1924, Cal, 1926, P.37.**

## তৃতীয় অধ্যায়

# রাইপুর কথা

### সিংহ রাজ বংশের পত্তন

সামন্তসার রাজত্বের (সম্ভবত সাঁওতাল সর্দারদের শাসন) অবসানের পর তুঙ্গভূমে ক্ষমতায় আসীন হয় নকুড় তুঙ্গের সামরিক নেতৃত্বাধীন জোট। এই জোটে ছিলেন নকুড়ের গুরু ও মুখ্য পরামর্শদাতা শ্রীপতি মাহাপাত্র ও রাইপুর নিবাসী স্থানীয় ভূমিজ সর্দার। বিজয়ের পর তুঙ্গভূমের মুখ্য অংশ শ্যামসুন্দরপুরে নকুড়তুঙ্গ রাজত্ব শুরু করেন। রাইপুর পরগণা ছেড়ে দেন স্থানীয় ভূমিজ সম্প্রদায়ের রাজাকে (শিখর রাজ), যার সঙ্গী ভূমিজ সেনারা নকুড়কে রাজ্যজয়ে সহায়তা করেছিল। সিমলাপাল দিয়েছিলেন গুরু শ্রীপতি মহাপাত্রকে। নকুর তুঙ্গভূম জয় করে 'তুঙ্গ' উপাধি নেন।

এই রায়পুর পরগণার ইতিহাস অনেকটাই কুহেলিকাময়। আবুল ফজলের আকবরনামা অনুসারে আফগান-মুঘল সংঘর্ষের কালে মুঘল সেনাপতি মানসিংহের পুত্র জগৎ কোতল খাঁর হাতে রাইপুরে বন্দী হন, এক অচানক নৈশ অভিযানের কারণে। মল্লরাজ বীর হাম্বির কোনক্রমে তাঁকে উদ্ধার করে বিষ্ণুপুরে নিয়ে যান। তেমনি গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণের ভাষ্যে দেখা যায় রাইপুর তথা শিখররাজত্ব বর্গী আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অর্থাৎ বিভিন্ন রাষ্ট্র পরিবর্তনের ক্ষণে রাইপুর ছিল ঘটনা আলোড়িত। ১৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর ওড়িষা দখল করে নেওয়া দাউদ খানের সেনাপতি কুতলু খাঁর বিরুদ্ধে আকবরের সেনাপতি মান সিংহ এক সামরিক অভিযান চালান। কোতল খাঁ-মান সিংহ সংঘর্ষ বাঁধে ১৫৯১ খ্রিস্টাব্দের ২১ মে।[১]

এখনকার কোতলপুর অঞ্চলে ছিল আফগানদের মূল ঘাঁটি। রাইপুর দুর্গে বাহাদুর কুরুর অধীনে একটি বড় আফগান সেনাদল অবস্থান করছিল। মানসিংহ আরম্যনগর (জাহানাবাদ) ও গড়মন্দারণ সেনাঘাঁটি থেকে এক দল সেনাকে পুত্র জগত সিংহের নেতৃত্বে পাঠিয়ে বড় ভুল সিদ্ধান্ত নেন। অপদার্থ জগত রাত্রে সামরিক প্রস্তুতি না নিয়ে রাইপুরে আমোদ-প্রমোদ-খানাপিনায় ডুবে যান। আফগানরা এই সুযোগে শিবির দখল করে জগতকে বন্দী করে। যুদ্ধে ভিকা রাঠোর, মহেশ দাস, নাড়ুচরণের মত সঙ্গী মুঘল সেনানায়করা নিহত হয়। এই অবস্থায় বিষ্ণুপুর থেকে ঠিক সময়ে সেনাদল নিয়ে এসে রাজা হাম্বির কোনক্রমে জগতকে উদ্ধার করে বিষ্ণুপুরে নিয়ে যান। এই সংঘর্ষে সম্ভবত নুকুড় প্রতিষ্ঠিত বা স্বীকৃত স্থানীয় ভূমিজ শিখর রাজের পুত্র বা পৌত্রের অধীনস্ত আফগান সেনাপতি মিরণ শাহের মৃত্যু হয়। রাজা সপরিবারে সুড়ঙ্গে আশ্রয় নেন ও পরে সলিল সমাধি ঘটে। এই সুযোগে রাজপুরোহিত রাজদন্ড হাতে নিয়ে গুড়েপাড়া (গুরুপল্লী) থেকে রাইপুর শাসন করতে থাকেন।[২]

যেমন মল্লভূমে অনেক পির-ফকিরের আগমন ও বসতি স্থাপন হয়েছিল তেমনি কাঁসাইকুলেও মিরণ শাহ সহ আফগান যোদ্ধাদের আগমন ঘটেছিল। মৃত্যুর পরে সম্ভবত বীর যোদ্ধা মিরণ শাহ সন্ত মর্যাদায় উন্নীত হন। তাঁর মৃত্যু আফগান-মুঘল সংঘর্ষের ফলে ঘটে থাকতে পারে। যাই হোক, এর ফলে শিখর রাজবংশের অবসান ঘটে। পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে শিখর সায়রে সমগ্র রাজবংশ আত্ম বিসর্জন দেন। সায়রের তীরে ভগ্ন শিখড়গড় দুর্গ-রাজপ্রাসাদ, মিরণ শাহের সমাধি এই অনাবিষ্কৃত ইতিহাসের সাক্ষ্য।[৩]

তিন নদী কংসাবতী, ভৈরববাঁকি ও তারাফেনি বেষ্টিত নিরাপদ রাজ্য ছিল রাইপুর। শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচতে এমনই জায়গায় কয়েকটি গড় তৈরি করে এক স্থানীয় ভূমিজ সর্দার, যিনি শিখর বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলে পরিচিতি পান। রাইপুরের ইতিহাস স্বীকৃত পুকুরটির নাম শিখরসায়র। রাইপুর শিখর রাজবংশের আমলে পুকুরটি খনন হয় বলে রাজবংশের নামানুসারে পুকুরটির নাম হয় 'শিখর' আর সায়র অর্থে পুকুর বা জলাশয়। অন্যান্য ভূম রাজবংশের মতই এই স্থানীয় ভূমিজ রাজবংশের ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রচেষ্টায় রাজপুতনা আগত রাজবংশের অনুষঙ্গ আনা হয়। রাইপুরে শিখর রাজবংশের উদ্ভব তাই বলা হয় রাজপুতনা থেকে আগত এক রাজপুতের হাত ধরে। আগত রাজপুত রাইপুরে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন

করেন এবং 'শিখর' উপাধি ধারণ করে শিখর রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।[৪] শিখর রাজবংশের প্রধান সেনাপতি ছিলেন মীরন শাহ। রাইপুরে বর্গী আক্রমণ হলে বর্গীদের সাথে যুদ্ধে মিরণ শাহ মারা যান। প্রধান সেনাপতির মৃত্যু সংবাদে শিখর রাজ সপরিবারে শিখর সায়রের সুড়ঙ্গে আত্মগোপন করেন। প্রাসাদ অন্তরালের সুড়ঙ্গে আশ্রয় নিলে কোন কারণে তাদের সলিল সমাধি ঘটে ও রাজবংশের অবসান ঘটে। ও'ম্যালী গুড়েপাড়ায় মাটির দুর্গ, দক্ষিণ দিকের জলাশয়, রাজমহল, মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখেছিলেন।

এর পর নিহত শিখররাজের রাজপুরোহিত নিকটস্থ গুরুপল্লী (বর্তমান গুড়েপাড়া) গ্রামে নতুন রাজত্বের সূচনা করেন। তবে অনতিকাল পরেই মল্লরাজ বংশের এক রাজপুরুষ ফতে সিংহ এই ব্রাহ্মণরাজাকে হত্যা করে 'সিংহ' রাজবংশের সূচনা করেন।[৫] মল্লরাজ দাদা বীরসিংহের নিষ্ঠুরতার কারণে মল্লভূম ত্যাগ করে ফতে সিংহ ধবলভূমে আশ্রয় নেন। এরপর ধবলরাজের কন্যাকে বিবাহ করে ও বরাহভূমের মিত্রতা লাভ করে সংহত শক্তি নিয়ে রাইপুরের শাসন ভার ছিনিয়ে নেন।[৬] সম্ভবত তিনিই রাজপুরোহিতকে উচ্ছেদ করে সিংহ বংশীয় শাসনের সূচনা করেন। কথিত আছে মল্লভূমের অত্যাচারী রাজা বীরসিংহদেবের অত্যাচার, হত্যালীলা ও বঞ্চনার ফলে তিনি ধবলভূমে পালিয়ে আসেন। এই ঘটনা ঘটেছিল ১৬৪০-১৬৫০ সালের মধ্যে। তবে এই রাজ পরিবারে রক্ষিত বংশতালিকা অনুসারে রঘুনাথ সিংহ ১৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দে এই রাজবংশের পত্তন করেন। কথিত আছে তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের সনদও লাভ করেন। প্রতিষ্ঠাতা নাম বিভ্রাট কাটানো যায়, যদি ফতে সিংহ ও রঘুনাথ সিংহকে একই ব্যক্তি ধরা হয় বা ফতে সিংহের পুত্র হিসাবে রঘুনাথকে ধরা হয়।

মল্লবংশ জাত রাইপুরের এই রাজবংশের ইতিহাসের বড় অংশ জুড়ে আছে বংশের পঞ্চম রাজা দুর্জন সিংহের দীর্ঘ বিদ্রোহী জীবনকথা আর মা মহামায়ার মহিমান্বিত ইতিহাস।

## মহামায়ার আবির্ভাব

রাইপুরের মা মহামায়া আসলে কোকমুখ মা দুর্গার পাথরের প্রতিমা। মূর্তিটির উচ্চতা প্রায় আড়াই ফুট। মূর্তিটির নির্মাণ শৈলী ও অর্চন রীতি দ্রাবিড়ী।

পাথরের এই মূর্তিটি বাংলার ব্যাতিক্রমী দুর্গা মূর্তির উদাহরণ।[৭] দেবীর ছয়টি

হাত অর্থাৎ ষড়ভুজা। দুহাতে একটা হাতিকে ( করিন্দাসুর) মর্দন করে বধ করছেন। প্রতিমাটি সিঁদুরে রাঙা। দেবীর দক্ষিণ পাশে তুঙ্গভদ্রা ও বামে আছেন সর্বমঙ্গলা। এই কোক বা নেকড়েমুখো মহামায়া হলেন দ্রাবিড়ী দুর্গা। অনেকের অনুমান চোলরা দক্ষিণ রাঢ় আক্রমণ করার সময় চোল বংশের রাজা রাজেন্দ্র চোল একাদশ শতকে মূর্তিটি স্থাপন করেন। তা হলে বর্তমান সময় অনুযায়ী মূর্তিটি প্রায় নয় শত বছরের প্রাচীন। মন্দিরটি অবশ্য হাল আমলের। নিকটে একটি থান ও পঞ্চমুন্ডীর আসন এই মন্দির সংশ্লিষ্ট বলেই মনে করা হয়। স্বভাবতই মহামায়া এখানে দেবী দুর্গার মর্যাদায় পূজিতা হয়।

তবে মহামায়া রূপী এই দুর্গা পূজার সময় বিভিন্ন ও বিচিত্র রীতিতে দেবীর আরাধনা হয়ে থাকে। চুয়াড় বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেওয়া বাঁকুড়ার রাইপুরের তৎকালীন রাজা দুর্জন সিংহের খড়্গ আজও মহামায়া মন্দিরে মহা অষ্টমীতে ছাগ বলিতে ব্যবহৃত হয়। সারা বছর রাজবাড়িতে এই খড়্গ ও কামান সযত্নে রাখা থাকে। ষষ্ঠীর দিন শোভাযাত্রা সহকারে তা আনা হয় মন্দিরে। বিজয়া দশমীর পুজো শেষে একই ভাবে তা নিয়ে যাওয়া হয় রাজবাড়িতে। আর আসে পেতলের একটি কলসে রাখা মালক্ষ্মী। এছাড়াও কালী পূজার সময় শ্যামসুন্দর মন্দিরে তিন দিন অন্ন ভোগের জন্য মা লক্ষ্মীকে বাইরে রাখা হয়। এই দুই বার ছাড়া সারা বছর বড় রাজকুমারের কাছে হাঁড়ির মধ্যে মা লক্ষ্মীকে রাখা থাকে। রাজা দুর্জন সিংহের ব্যবহৃত খড়্গ ছাড়াও তাঁর ব্যবহৃত একটা কামান বা মশাল এখনো রাজবাড়ীতে সংরক্ষিত রয়েছে। স্থানীয় মানুষের কাছে তা হাত কামান নামে পরিচিত। এখনও মহাষ্টমীর পুজোতে সেই কামানের তোপধ্বনি দিয়ে দেবী মহামায়ার পুজো শুরু হয়। আগে মল্লরাজধানীর মৃন্ময়ী আরাধনার অষ্টমী পূজার কামানের ধ্বনির সাথে এই কামান দাগা হত। এটাই দুই রাজ বংশের উৎসের অভিন্নতার দ্যোতক। পূজান্তে আবার কামান রাজবাটীতে ফেরত যায়। পূজায় ব্যবহৃত খাঁড়াটি সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল।

এই মহামায়ার প্রতিষ্ঠা নিয়ে রাজপরিবারের নিজস্ব ভাষ্য আছে। রাইপুরের রাজ পরিবারের সদস্যদের দাবী অনুসারে রাইপুরের বর্তমান রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা ধরম সিংহদেবের পুত্র কৃষ্ণ সিংহদেব মহামায়া সম্পর্কিত স্বপ্নাদেশ পান আনুমানিক ১৫৯৫ সালে। মা মহামায়া স্বপ্নে তার অবস্থিতি বলেন চাঁদুডাঙ্গায় এক জঙ্গলে। রাজা কৃষ্ণ সিংহদেব ভোরে ঘুম থেকে উঠে চাঁদুডাঙ্গার ঝোপের মধ্য থেকে

মা মহামায়া কে উদ্ধার করেন। তখন থেকেই এই দেবী পুজোর সূচনা হয়। তৈরি করা হয় মন্দির। দুর্গা পুজোর ষষ্ঠী তিথিতে রাইপুর রাজপরিবারের কুলদেবী মা রাজলক্ষ্মীকে রাইপুরের হরিহরগঞ্জগড় রাজবাড়ি থেকে শোভা যাত্রা সহকারে মহামায়ার মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। পূজোর দিন গুলিতে মা সেখানেই থাকেন, বিজয়ার দিন দেবী রাজলক্ষ্মী শোভাযাত্রা সহকারে আবার হরিহরগঞ্জগড় রাজবাড়ীতে ফিরে আসেন। প্রাচীন প্রথা মেনে আজও পুজোর চারদিন রাজপরিবারের কুলদেবী রাজলক্ষ্মীকে মহামায়া মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও বিজয়া দশমীতে পুজো শেষে আবারও রাজপরিবারে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় রাজলক্ষ্মীকে।[৮]

আলমসায়রের পাড়ে চাঁদুড়ঙ্গায় রাজ-আরাধ্য কোকামুখ দেবী মহামায়া মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কাছেই পুরানগড়ের ধ্বংশাবশেষ ছিল। দেবী মহামায়া আদপে বিরাজিত হয়েছে শিলাখন্ডে দেবী চন্ডীতে। অবশ্য পুরাণে চন্ডী ও মহামায়া একই রূপ। ছাতনায় বাসুলীমাতার মন্দির সংলগ্ন সরোবরে দেবী নিমজ্জিত থেকে হাত দেখিয়ে বালা পরার সত্যতা প্রমাণ দিয়েছিল। একই মহাত্ম্যকথা আলমসায়র নিয়ে প্রচারিত।[৯] ৮৫০-৯০০ বছর আগে বিষ্ণুপুরের এক শাঁখারি আলমসায়র পুকুরের পাড় ধরে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে যাওয়ার সময় পুকুরের ঘাটে পাথরের উপর বসে থাকা ১৫-১৬ বছরের একটি মেয়ে দুটি হাতে ছয়টি শাঁখা পরতে আবদার করেন। শাঁখারি মূল্য চোকানোর কথা বলাতে দেওঘোরাদের কালাচাঁদ সন্ন্যাসীর বাড়ীর মেয়ে পরিচয় দিয়ে ওই বাড়ীর কলঙ্গীতে ভাঁড়ের মধ্যে দেড় ছেদাম পয়সা থাকার কথা বলেন। শাঁখারি দেওঘোরাদের বাড়ি গিয়ে দেখেন তিনি অবিবাহিত। পুকুরের সামনে ছুটে এসে শাঁখা পড়া কন্যার দর্শনে কাতর হলে পুকুরের মধ্য থেকে জলের উপরে বেরিয়ে আসে জোড় হাত করা তিন জোড়া হাত যার ছয়টি হাতে ছয়টি শাঁখা। প্রণাম করে সন্ন্যাসী ও শাঁখারি বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন ভাঁড়ের মধ্যে দেড় ছেদাম পয়সা রাখা আছে। শাঁখারি মাকে প্রণাম করে পয়সা নিতে অস্বীকার করে এবং প্রতিবছর মায়ের পূজার সময় ছয়টি শাঁখা দেওয়ার অঙ্গীকার করে ফিরে যান। সেই থেকে ঐ শাঁখারির বংশধররা প্রতি বছর এখনও মা মহামায়াকে দুর্গা পূজার সময় শাঁখা দিয়ে যান। জনপ্রিয় লোককথার কথা শুনিয়েছেন এই মন্দিরে বংশপরম্পরায় পৌরহিত্য করে আসা গঙ্গাধর চ্যাটার্জী। তিনি বলেন, বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে তাদের পূর্বপুরুষ কালারাম চ্যাটার্জী এখানে

আসেন। ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি অবিবাহিত ছিলেন। সেই সময় একদিন বিষ্ণুপুরের এক শাঁখা বিক্রেতা আলমসায়েরের পাড় দিয়ে যাওয়ার সময় একটি ছোট্ট মেয়ে তার কাছে শাঁখা পরে। এবং সেই শাঁখার দাম তার বাবা কালারাম চ্যাটার্জীর কাছে নেওয়ার কথা বলে। বাকি কাহিনী আগের মতই। তবে তাঁর বর্ণনা মত চাদুডাঙ্গার জঙ্গল নয়, এই ঘটনার পর রাজা আলমসায়র থেকে দেবীকে তুলে এনে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন ও কালারাম চ্যাটার্জীকে পুজোর দায়িত্ব দেন। পুজো পরিচালনার জন্য বংশরক্ষার কারণে ৮০ বছর বয়সে কালারাম চ্যাটার্জী সিমলাপাল রাজপরিবারের পুরোহিতের মেয়েকে বিয়ে করেন ও বংশপরম্পরায় তাঁরা আজও পূজার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।[১০]

রাইপুরের মহামায়া মন্দিরের অষ্টমীর সন্ধি পুজোর সময় তোপ দাগা রীতি সেই পূজোর সূচনার সময় থেকে আজও হয়ে আসছে। সেই তোপধ্বনির আওয়াজ শুনে রাইপুর সারেঙ্গা রানীবাঁধ ব্লকের বিভিন্ন পূজোর সন্ধি পূজো আরম্ভ হয়। লোকশ্রুতি এবং রাজ পরিবারের সদস্যদের দাবী, রাজা দুর্জন সিংহদেবের আমলে এখানে পুজোর সময় নরবলি হতো। কিন্তু রাজা ফতে সিংহদেবের আমলে তিনি নরবলি বন্ধ করে দেন। তাঁর আমল থেকে শুরু হয় ছাগ বলি। রাজাদের সেই নরবলি দেওয়া দা দিয়েই এখনো মায়ের পুজোর ছাগ বলি দেওয়া হয়। কথিত আছে প্রত্যেক বছর পালা করে নরবলি দেওয়ার জন্য সবর সহ অন্ত্যজ গ্রামের পুরুষদের চিহ্নিত করে রাখা হত।

রাইপুরের রাজা ফতে সিংহ দেবের সময় পুজোর সময় পুজোর বিভিন্ন উপাচার বিভিন্ন এলাকা থেকে নিতেন এবং তাঁর বিনিময়ে তিনি রাজ এলাকার বেশ কিছু জমি ওই এলাকার বাসিন্দাদের হাতে তুলে দেন। অর্থাৎ সেবা জমির বন্দোবস্ত করা হয়।

মহামায়ার মন্দির ছাড়াও রাজপরিবারের পূজিত দেবতা হল নতুনগঞ্জের রাজবাড়ী সংলগ্ন জগন্নাথ ও শ্যামসুন্দর মন্দিরের জগন্নাথ দেব। রাজ বাড়ির বিশ্বাস মল্লভূম থেকে মল্লরাজের মৃত্যু পরোয়ানা এড়িয়ে রাইপুর সিংহ বংশের প্রতিষ্ঠাতাকে রক্ষা করে ধবলভূম-তুঙ্গভূমে এনে ফেলতে সাহায্য করেছিলেন জগন্নাথদেব। এই আরাধনা থেকে রাইপুরের রাজপরিবারের উপর বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাব প্রমাণিত হয়।

## রাইপুর রাজবংশের বংশলতিকা ও রাজকাহিনী

বর্তমান রাজপরিবারের কাছে রক্ষিত রাজ-তালিকা নিম্নরূপ।

রঘুনাথ সিংহদেব (১৬৫৫)

|

ধরমসিংহদেব- কৃষ্ণসিংহদেব-অর্জুন সিংহদেব (সিমলাপাল রাজ রাধানন্দ (১৬৯৩-১৭২৮)-এর সাথে ভাই রাধারমণের বিরোধ তীব্র হলে তিনি রাইপুরে আশ্রয় নেন। পরে মল্লরাজ সিমলাপাল আক্রমণ করলে তিনি রাজাকে সাহায্য করে, রাজ্য রক্ষা করে, জাড়িষ্যা সহ কয়েকটি মৌজার দায়িত্ব পান।)

|

দুর্জন সিংহদেব (চুয়ার বিদ্রোহে যোগ দেন)

|

ফতে সিংহদেব (জমিদার ফিরে পান)

|

বীর সিংহদেব (১৮৪১ সালে ধবনীর স্বরূপ পালকে জমিদারি)

|

হরিহর সিংহদেব (গঞ্জ তৈরি)-রাজা রঘুনাথ (আদালতে মামলা চলে ও হেরে যান, নতুন গড়ে ১৮৮০ সালে নতুন বাটী স্থাপন)

ইন্দ্র সিংহদেব (১ম রাণী উজ্জ্বল কুমারী ২য় রাণী নিশা কুমারী)-লাল সিংহদেব

|

বলভদ্র সিংহদেব (১৯১১)

|

কালীপদ সিংহদেব

|

চক্রধর সিংহদেব

|

শশধর সিংহদেব/গোপীনাথ/মধুসূদন

|

হরিপদ সিংহদেব/গোপাল

|

মধুসূদন সিংহদেব, গোপীনাথ সিংহদেব

সন্নিহিত রাজবংশগুলোর রাজাদের কালসীমা তুলনা করলে ঘটনাগুলির সংযোগ ও ভূমিকা উদ্ধার করা সহজ হয়। এমন একটি তালিকা পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

| ফুলকুসমা রাজ পরিবার | শ্যামসুন্দরপুর রাজপরিবার | সিমলাপাল করাজপরিবার | রাইপুরের রাজবংশ | মল্লরাজ বংশ |
|---|---|---|---|---|
| —— | নকুড় তুঙ্গ (১৪৭৩-১৫০৩) | শ্রীপতি মহাপাত্র (১৪৬৩-১৪৯৪) | শিখর রাজ ১ | —— |
| —— | চৈতন্য (১৫০৩-১৫২৮) /পুত্র মাধব (?) | মাধব (১৪৯৪-১৫২৪) | শিখর রাজ ২ | —— |
| —— | দামোদর (১৫২৮-১৫৫৮) | জগন্নাথ (১৫২৪-১৫৪৫) | শিখর রাজ ৩ | |
| গদাধর সুন্দরনারায়ণ (১৫৫৮-১৫৯৩ | গদাধর সুন্দরনারায়ণ (১৫৫৮-১৫৯৩ | বাসুদেব (১৫৪৫-(১৫৫৮) ও বলরাম (১৫৫৮-১৫৮০) | শিখর-আফগান শক্তি জোটের পতনে ব্রাহ্মণ রাজা? | হাম্বিরমল্লদেব (১৫৬৫-১৬২০) |
| মুকুটনারায়ণ দেউ (১৫৯১-) | শ্যামসুন্দর (লক্ষী) ছত্রনারায়ণ (১৫৯৩-১৬২৮) ও শ্যামা | মোহনদাস (১৫৮০-১৫৯৩) | ব্রাহ্মণ রাজাকে উচ্ছেদে ফতে সিং? | ধারীহাম্বির মল্লদেব (১৬২০-১৬২৬) |
| অজ্ঞাত | জনার্দন (১৬২৮-৫৮) | চিরঞ্জীব (১৫৯৩-১৬১৫) | রঘুনাথ সিংহদেব (১৬৫৫) | রঘুনাথ সিংহদেব (১৬২৬-১৬৩৬ |

| ফুলকুসমা রাজ পরিবার | শ্যামসুন্দরপুর রাজপরিবার | সিমলাপাল করাজপরিবার | রাইপুরের রাজবংশ | মল্লরাজ বংশ |
|---|---|---|---|---|
| অজ্ঞাত | আইঠু (১৬৫৮-১৬৯০) | লক্ষ্মণ (১৬১৫-১৬৫২) | ধরমসিংহদেব কৃষ্ণসিংহদেব অর্জুনসিংহদেব | বীরসিংহদেব (১৬৩৬-১৬৪২) এর ভাই ফতে? |
| অজ্ঞাত | রামচন্দ্র (১৬৯০-১৭২৮) | কৃষ্ণদাস (৬৫২-১৬৯৩) | দুর্জন সিংহদেব (১৭৬৭-১৮০০) | দুর্জন সিংহদেব (১৬৪২-১৭০২) |
| অজ্ঞাত | বীরকিশোর (১৭২৮-৬৮) | রাধানন্দ (৬৯৩-১৭২৮) | ফতে সিংহদেব (২য়) | রঘুনাথ সিংহদেব ২য় (১৭০২-১৭১২) |
| অজ্ঞাত | গঙ্গাগোবিন্দ (১৭৬৮-০৮) | বলরাম (১৭২৮-১৭৭৫) | বীর সিংহদেব (১৮৪১) | গোপাল সিংহদেব (১৭১২-১৭৪৮) |
| দর্পনারায়ণ দেউ (১৮৩৩) | আইঠু (২য়) ১৮০৭-৩৭) | জগন্নাথ (১১৭৭৫-১৮২০ | হরিহর সিংহদেব -রাজা রঘুনাথ ১৮৮০ | চৈতন্য সিংহদেব (৭৪৮-১৮০১) |
| মুকুন্দনারায়ণ (—১৮৯৩) | বলভদ্র (১৮৩৭-৬৩) | চিরঞ্জীব (১৮২০-১৮৩১) | ইন্দ্র সিংহদেব (১ম রাণী উজজ্বল কুমারী ২য় রাণী নিশা কুমারী) লাল সিংহদেব | মাধব সিংহদেব (১৮০১-১৮০৯) |

| ফুলকুসমা রাজ পরিবার | শ্যামসুন্দরপুর রাজপরিবার | সিমলাপাল করাজপরিবার | রাইপুরের রাজবংশ | মল্লরাজ বংশ |
|---|---|---|---|---|
| কালিপ্রসন্ন (১৯০০*) | বীরকিশোর (২য়) (১৮৬৩-৯৩) | নটবর (১৮৪৪-১৯০৫) | বলভদ্র সিংহদেব (১৯১১) | গোপাল সিংহদেব ২য় (১৮০৯-১৮৭৬) |
| বিদ্যানিধিনারায়ণ | | | কালীপদ সিংহদেব (১৭৬৭-১৮০০) | রামকৃষ্ণ সিংহদেব (১৮৭৬-১৮৮৫) |
| শশাঙ্কনারায়ণ (১৯১৫-) | গৌরীপ্রসাদ (১৮৯৩-১২) | মানগোবিন্দ (১৯০৫-) জগবন্ধু | চক্রধর সিংহদেব | ধ্বজামণীদেবী (১৮৮৫-১৮৮৯) |
| | শ্যামনফর (১৯১২-৩৩) | মদনমোহন (১৯০৯-১৯২৭) | শশধর সিংহদেব/মধুসূদন/গোপীনাথ | নীলমণি সিংহদেব (১৮৮৯-১৯০৩) |
| | কানাই (১৯৩৩-৭৬) | শ্যামসুন্দর (১৯২৭-১৯৫৫) | হরিপদ সিংহদেব | রাজানেই (১৯০৩-১৯৩০) |
| সুশান্তনারায়ণ দেও (১৮৩৩) | গৌরীশঙ্কর ১৮০৭-৩৭) | কল্যাণী/দেবপ্রসাদ (১১৭৭৫-১৮২০ | শিবনাথ/পৌলমী | কালীপদ সিংহঠাকুর (১৯৩০-১৯৮৩ |
| | | | | সলিল/জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ ঠাকুর |

## রঘুনাথ ও ফতে সিংহ : রাইপুর রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা

সম্ভবত অম্বিকানগর বা বরাভূমরাজ রাইপুরের সিংহ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা পর্বে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এই বংশের কন্যার সাথে রাইপুরের প্রতিষ্ঠাতা রাজার(ফতে সিংহ) বিবাহ হয়। কথিত আছে মল্লরাজ ২য় বীর সিংহের নিষ্ঠুর আচরণ ও অত্যাচারে ভীত রাজভ্রাতা ফতে সিং বরাভম- ধবলভূমে পালিয়া এসে রাজাদের সাহায্য নিয়ে রাইপুরের ব্রাহ্মণ রাজাকে পরাজিত করে সিংহ রাজবংশের পত্তন ঘটান।[১১] সম্ভবত বরাভূমরাজ রাইপুরের সিংহ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতে সাহায্য করেন। খুব সম্ভব অম্বিকানগরের রাজা গোপীনাথের কন্যার সাথে রাইপুরের প্রতিষ্ঠাতা রাজার (ফতে সিংহ) বিবাহ হয়। রাজপরিবারে সংরক্ষিত বংশতালিকায় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে রঘুনাথকে দেখান হয়েছে। যদি ফতে সিংহ ও রঘুনাথকে একই ব্যক্তি ধরা হয় বা ফতের পুত্র রঘুনাথ হয়, তবে এই কাল বিভ্রাট এড়ান যায়।

## দুর্জন সিংহের বিদ্রোহ : ফতে সিংহের রাজ্যাভিষেক

১৭৬০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মীরকাশিমের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে বর্ধমান পরগণার দেওয়ানী লাভ করে। গড়রাইপুর সেই সময় বর্ধমান পরগনার অন্তর্ভূক্ত ছিল। ওই চুক্তি বলে ১৭৬৭ সালে লেফটেন্যান্ট ফার্গুসন জঙ্গল মহলের কয়েকটি অঞ্চল দেখাশোনার দায়িত্ব পান। ওই অঞ্চলে সুপুর, ফুলকুসমা, অম্বিকানগরের সঙ্গে রাইপুরের জমিদারিও ছিল। ইতিহাসের পাতা ঘেঁটে জানা যায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বকেয়া খাজনা মেটাতে ব্যর্থ হন রাজা দুর্জন সিংহ।

রাইপুরে বিদ্রোহের বীজ উপ্ত হয় ১৭৬৭ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রাইপুরে ১৫০০ টাকা বার্ষিক ভূমিকর আদায়ে বিদ্রোহী অর্জুন সিংহের বিরুদ্ধে লেঃ জন এনসাইন ফারগুসনের সামরিক অভিযান থেকে। প্রাথমিক ভাবে ৬ই মার্চ ১৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানীর চাপে অধীনতা স্বীকার করলেও পুরো এলাকা বিদ্রোহী কবলিত করে তোলার মানসে ভেলাইডিহা, ফুলকুসুমা, বগড়ির রাজার সাথে একটি শক্তিশালী মিত্র জোট গড়ে তোলেন দুর্জন সিংহ। ঘাটশিলার রাজাকে চিঠি দিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেন। কর্ণগড়ের বিদ্রোহী রানীও ছিলেন রাইপুরের বিষয়ে সহানুভূতিশীল। ১৬৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ছাড়াও ১৭৬৯, ১৭৭০ সালে ক্যাপ্টেন ফোর্বস ও লেঃ নানের নেতৃত্বে রাইপুর রাজের বিরুদ্ধে অভিযান হয়। কিন্তু কোনোভাবেই

দুর্জনের নেতৃত্বাধীন এই গেরিলা বাহিনীকে ঘায়েল করতে না পেরে ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে আপোষের আছিলায় বর্ধমানে ডেকে দুর্জনকে অন্তরীণ করা হয় ও বগরীর রাজা জয়দেব সিংকে রাইপুরের রাজস্ব আদায়ের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে প্রমাণাভাবে তিনি কিছুকাল পরেই মুক্তি পান। আবার শুরু হয় লড়াই। রক্তক্ষয়ী এ সংগ্রামে দুর্জন সিং জঙ্গল থেকে গেরিলা কায়দায় লড়াই করতে থাকেন। ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ২৫শে সেপ্টেম্বর রাইপুরের শান্তি স্থাপনের জন্য লেঃ লংয়ের নেতৃত্বে রাইপুর অভিযান হয় ও প্রাদেশিক কাউন্সিলের নির্দেশে বর্ধমানের রানীকে সরাসরি রাইপুরের খাজনা আদায় করতে বলা হয়। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে রাইপুরে শান্তি ফেরাতে দুর্জনের কাকা অর্জুন ইংরেজের সাথে মধ্যস্থতা শুরু করেন।[১২] দুর্জনের আত্মসমর্পণ এবং রাজা ও পাইকদের ক্ষমা প্রদর্শনের শর্তে আলোচলা অনেকটাই ফলপ্রসু হয়। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর রাইপুরে সাময়িক শান্তি ফিরে আসে।

১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে নতুন ভূমিরাজস্ব ২৫০৯ টাকা ধার্য হলে দুর্জন আবার বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে ধরেন। ১৭৯০ সালে সেজোয়াল পাঠিয়ে কর আদায়ের চেষ্টা সফল না হওয়ায় ১৭৯৩ সালের ১৯শে জুলাই দুর্জন সিংহ নিজেকে রাইপুরের স্বাধীন তালুকদার বলে ঘোষণা করেন। রুষ্ট কোম্পানী শাসকদের এক অভিযানে মোট ৩১৪৫ টাকা অনাদায়ী রাজস্বের জন্য রাইপুররাজ কারারুদ্ধ হন। ১৭৯৩ সালের ২০ শে আগষ্ট বর্ধমানের কালেক্টরেটে ২৫০৯ টাকা সরকারী হারে ৫৭ টি গ্রাম কে নিয়ে রাইপুর জমিদারির নিলামের নোটিশ ঝোলান হয়। শিউপ্রসাদ বলে এক ব্যাক্তি তা ৭০২৫ টাকায় খরিদ করেন। ১৭৯৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর সরকারি এক নির্দেশে রাইপুর, শ্যামসুন্দরপুরসহ ৬ টি জঙ্গল মহাল তদানীন্তন মেদিনীপুর জেলায় স্থানান্তরিত হয়। এর আগে দুর্জন, নিজ পুত্র ফতে সিংহকে ম্যানেজার করে বকেয়া পরিশোধের সুযোগ দিয়ে জমিদারি ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন করেন বর্ধমানের কালেক্টর স্যামুয়েল ডেভিসের কাছে। এখানে তাঁর আবেদন খারিজ হলে জেলা আদালতে তিনি এই বিষয়ে আবেদন করেন। জেলা আদালতে তিনিই জয়ী হন। কিন্তু ১৭৯৫ সালে কালেক্টরের আপিলে সাড়া দিয়ে কলকাতা সদর আদালত দুর্জনের বিরুদ্ধে রায় দেয়। শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের এক অধ্যায়।

১৭৯৮ সালের মার্চ মাস থেকেই দুর্জন সিংহের নেতৃত্বে রাইপুর পরগনায় চুয়াড় বিদ্রোহ শুরু হয়ে গিয়েছিল। দেড় হাজার চুয়াড় সেনা নিয়ে তিনি রাইপুর পরগনার ৩০ টি গ্রামের উপর নিজের দখলদারি কায়েম করেন।[১৩] পরে তিনি এই সশস্ত্র

আন্দোলনকে বগড়ির চুয়াড় বিদ্রোহের সঙ্গে সামিল করেছিলেন। বিদ্রোহীদের আক্রমণে ব্রিটিশ শাসকের নিযুক্ত জমিদার, নায়েব, গোমস্তারা এবং থানার দারোগা-সহ পুলিশ কর্মীরা প্রাণভয়ে রাইপুর ছেড়ে পালিয়ে যান। তবে এই পরিস্থিতি স্থায়ী হয়নি। পরে সশস্ত্র ব্রিটিশ সেনা বাহিনী বিদ্রোহীদের হটিয়ে পুনরায় রাইপুর দখল করে। চুয়াড় বিদ্রোহের এক পর্বে দুর্জন সিংহকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

কোম্পানীর প্রতিবেদন থেকে জানা যায় দুর্জন সিংহ কোম্পানী কুঠি লুণ্ঠন ছাড়াও বড়হাজারী, মালিয়াড়া, সাহারজোড়া, ছাতনার বিভিন্ন এলাকায় লুঠতরাজ চালান। পুত্র ফতে সিংহ ১৫০০ পাইক নিয়ে রাইপুর কাছারি দখল ও ভস্মীভূত করেন। কোম্পানী ও নয়া জমিদার শিউপ্রসাদের লোক মেদিনীপুরে পালিয়ে যায়। নায়েব, গোমস্তা, দারোগা সবাই। অনেক আদায়কারী আহত ও নিহত হন। একই হাল হয় সিপাই-বরকন্দাজদের। লেঃ হিলের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী এলে বিদ্রোহীরা নয়াঘর, সরাকল, কুইলাপাল, ধাইন্দকা পথে আত্মগোপন করে। এই পথ অনুসরণ করে বিদ্রোহীদের দ্বারাই সামরিক বাহিনী আক্রান্ত ও বিপন্ন হয়। শিউপ্রসাদের থেকে জমিদারি নিয়ে হীরালালও সুবিধা করতে পারলেন না। ১৭৯৮ সালে ১৫০০ জনের গেরিলা বাহিনী তৈরি করে দুর্জন সিংহ ব্রিটিশ শাসকদের এলাকা ছাড়া করেন। এপ্রিল মাসে বড় সেনাদল এসে রাইপুরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু মে মাসে ৫০০ চুয়ার নায়েবের কাছারি বাড়ি আক্রমণ ও ভস্মীভূত করে। রাত্রে গুণারি থানা আক্রমণ করলে ভীষণ লড়াই পরদিন ১০ টা পর্যন্ত চলে।

জুলাই-আগষ্টে এই বাহিনী আবার কাছারি ও প্রধান বাজার আক্রমণ করে। এই মাসে ব্যারাকের কাছে চাষরত দুই কৃষক সকাল আটটায় চোয়ার আক্রমণে নিহত হলে, দুর্জন-কোম্পানী সংঘর্ষ চূড়ান্ত রূপ নেয়। ১৬ ই শ্রাবণের যুদ্ধে জমাদার সহ ৪ জন সেপাই, দারোগা দলের ৩ জন, জমিদারের ৬-৭ জন নিহত ও বহুজন আহত হন। সেনানায়ক হেনরী অসুস্থতার অজুহাতে মেদিনীপুর ফিরে গেলে পল্টন সুবাদার আহ্লাদ সিংহকে ছয় মাস রাইপুরে অবস্থান করে বিদ্রোহ সামলাতে প্রচুর বেগ পেতে হয়।[১৪] নায়েব কানু বক্সী বলরামপুরে পালানোর সময় দুর্জনের ভাইপোর হাতে নিহত হন। রায়ত সংক্রান্ত কাগজপত্র ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ১৭৯৯ সালে দুর্জন সিংকে গ্রেপ্তার করে মেদিনীপুর জেলে রাখা হলেও প্রমাণাভাবে তিনি বেকসুর খালাস পান। আসলে দুর্জন সিংহ সম্পর্কে জনমনে যে সম্ভ্রম ও ভীতির জন্ম হয়েছিল তার ফলে আদালতে তাঁর বিপক্ষে কেউ সাক্ষ্য দিতে রাজি হয়নি। তাঁর সেই বীরত্বের

স্মরণে রাইপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভবনের নাম রাখা হয়েছে রাজা দুর্জন সিংহের নামে। চুয়াড় বিদ্রোহের সময়ে দুর্জন সিংহকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরে ১৭৯৯ সালের ২০ নভেম্বর ব্রিটিশ সরকার সমঝোতা করে। দুর্জন সিংহকে মুক্তি দেওয়া হয়। কথিত তিনি ১০টাকা মাস মাইনের চৌকিদারে পরিণত হন।

ফতে সিংহের বংশধর রাজা দুর্জন সিংহের জমিদারি গঠিত ছিল গড়রাইপুর, নতুনগড়, ধরমপুর, ধোবাশোল, কামারডিহা, বনপাথরি, নীলজোড়া, সিমলি, উপরবাঁধা, দুবনালা, কেলেপাড়া, খড়িগেড়্যা, যাদবনগর, যশপাড়া, দেমুশন্যা- সহ ২৭ টি মৌজা নিয়ে। চুয়াড় বিদ্রোহের সময়ে দুর্জন সিংহকে বিভিন্ন সময়ে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরে ১৭৯৯ সালের ২০ নভেম্বর বৃটিশ সরকার সমঝোতা করে। দুর্জন সিংহ ও পুত্র ফতে সিংহকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই চূড়ান্ত অরাজকতা থেকে মুক্তি পেতে ১৮০০ সাল নাগাদ ইজারাদার হীরালালের নিলামের ৬৮৫৭ টাকা ফেরত দিয়ে, নির্দিষ্ট অঙ্কের ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে ফতে সিংহকে রাজ্য ভার ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কোম্পানীর করভারে জর্জরিত রাইপুর রাজা রাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই নিলাম বিক্রি চলছিল। ১৯১৫ সাল নাগাদ অপরিশোধিত ঋণ ও রাজস্ব অনাদায়ের কারণে সমস্ত রাইপুর পরগণা নিলাম হয়ে যায়। এই পরগনার জমিদারি দ্বারভাঙা মহারাজের অধীনে ন্যস্ত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দুর্জন সিংহ রাইপুরে ক্ষুদ্র শক্তির অধিকারী হয়ে যেভাবে ব্রিটিশ প্রভাবকে অস্তমিত করেছিল তা বিস্ময়কর। শুধু তাই নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে রাইপুরের অন্তর্গত মহলগুলোর সর্দাররাও বিদ্রোহের আগুন জ্বালান। যেমন ডোমপাড়ার বৈদ্যনাথ সিংহ ও খোরশোলের বৃন্দাবন সিংহ।[১৫] জেলেই মারা যায় বৃন্দাবন। এর দুই দশক পরেও বৈদ্যনাথের ভাইপো রঘুনাথ সিংহ ও বৃন্দাবনের ছেলে প্রতাপ সিংহ বিদ্রোহের রেশ বজায় রাখেন।

রাইপুরের সিংহ রাজবংশের শৌর্যের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে রাইপুর জুড়ে। গুড়াপাড়ার প্রাচীন ধ্বংশপ্রাপ্ত দুর্গ ছাড়াও অন্তত তিনটি রাজবাড়ী ও দুর্গের সন্ধান পাওয়া যায়। পুরানগড়ে ছিল দুর্জন সিংহের গড় (বর্তমান ব্লক অফিস ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র যে স্থানে)। নতুনগঞ্জে ও হরিহরগঞ্জে প্রায় ভগ্ন রাজপ্রাসাদে বর্তমানে রাজপরিবারের সদস্যরা বাস করেন। জনশ্রুতি সারংগড়েও ছিল একটি দুর্গ। এটি ধ্বংশ হয়ে এখন মাটির নিচে।

বাঁকুড়ার কালেক্টর ব্লান্টের সমাধান সূত্রে জেলায় রাইপুরের অন্তর্ভূক্তি রাইপুরের

চুয়ার বিদ্রোহের অভিঘাত ১৮০৬ সালেও স্তিমিত করতে পারেনি। বরং জেলাশাসক ব্লান্ট প্রাদেশিক অধিকর্তা জর্জ ডসওয়েলকে ২২ ডিসেম্বর ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে জানালেন ৫০০ জন চুয়ার রাইপুরের জঙ্গলে অশান্তি পাকানোর জন্য সমবেত হচ্ছে।

ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে মামলা-মোকদ্দমা ও ঔপনিবেশিক ভূমি ব্যবস্থার অভিঘাতে রাইপুরের জমিদার অতি দূর্বল হয়ে পড়ে। ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে তালুকটির ইজারা পায় গিসবর্ণ কোম্পানী। পরে হাতবদল হয়ে ১৯১৩ সাল নাগাদ এটি দ্বারভাঙ্গার মহারাজের হাতে আসে।

রাইপুরের জমিদার শুধু নয়, পাইকান জমি অধিগ্রহণের পর পাইক ও সর্দাররা জমি থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে বিদ্রোহী হন। রাইপুর পরগণার মৌলচাঁড়র মৌজার এমন এক সর্দার পরিবার ছিল 'সিং সর্দার' পদবীধারী। এই বংশের প্রতাপ সিং সর্দারকে ইংরেজরা প্রকাশ্যে গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়, চুয়ার বিদ্রোহ বা ইংরেজি বিরোধিতার শাস্তি স্বরূপ। জনমনে ভীতি উদ্রেক করা ছিল এমন নারকীয় হত্যার উদ্দেশ্য। সাথে ফাঁসি হয়েছিল গুরুচরণ সিং সর্দারের। জায়গাটির বর্তমান নাম 'ফাঁসিডাঙ্গা'। অবশ্যই শহীদ স্মরণে। পূর্বদিকে আরেক সহযোদ্ধা সর্দার পরিবার ছিল মুচিরাম সিং সর্দার ও পশ্চিমে বুটা সিং সর্দার। এদের মধ্যে তিন জনের বংশলতিকা হল— প্রতাপনারায়ণ-জহুর-ভরত-গোবর্দ্ধন-প্রদীপ। মুচিরাম-ফোর্দ-জবা-রজনা-হারাধন-অমিয়। বুটা-ভোলানাথ-গোবিন্দ-রাম। এই সর্দারদের সম্মিলিত লড়াই শাসকদের বিপদে ফেলে।[১৬]

রায়পুরের চুয়ার বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন স্থানীয় সর্দাররা। তাদের অন্যতম রানীবাঁধের ধডাঙ্গা গ্রামের প্রতাপনারায়ণ সিং ও বিক্রমডিহির গুরুচরণ সিং। গঙ্গানারায়ণের ভূমিজ বিদ্রোহে এদের যোগদান ইংরেজকে রুষ্ট করে। গেরিলা যুদ্ধে এরা ১৩ জন গোরা সেনাকে হত্যা করে। অবশেষে ব্রিটিশ শাসকেরা এদের ঘোরাধরার কাছে খামারডাঙ্গার ফাসিডাঙ্গা জঙ্গলে মেরে গাছে ঝুলিয়ে দেয়। বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার অপরাধে পটমদার ভূমিজ যোদ্ধা পরিবারের থেকে আসা গুরুচরণের সম্পত্তি ১৮৮০ সালে নিলাম হলেতা কিনে নেয় গোড়াবাড়ির সাহু পরিবার। এই বিদ্রোহীদের আনুগত্য ছিল ফুলকুসুমা রাজা ও পরোক্ষে অম্বিকানগরের প্রতি। অর্থাৎ রাইপুর-অম্বিকানগর-ফুলকুসুমার রাজাদের সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্রোহীজোটের প্রতি।

শুধু তাই নয়, জমিদারি হারানো বগরীর রাজারাও লুণ্ঠনের আশ্রয় নেন। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাস জুড়ে বগরী রাজা যদু সিংহ প্রতিবেশী রাইপুর ও

সিমলাপালকে লুণ্ঠনে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

এই অশান্ত সময়ে মল্লভূম ও সামন্তভূমে ফকির আগমন ঘটে। কাছারি বাড়ি, বণিক, রায়ত, ভূম্যধিকারীদের সম্পদ ও গৃহ লুণ্ঠন ছাড়াও স্থানীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ দেশের আর্থ-সামাজিক স্থিরতাকে বিপন্ন করে। এদের দৌরাত্ম্যে দেশে রাজস্ব আদায় ভীষণ ভাবে ব্যাহত হয়। কোম্পানী কমান্ডার ফোর্বস এক অভিযানে এদের ধাওয়া করে মারাঠা নিয়ন্ত্রিত গোপীবল্লভপুরের দিকে পাঠিয়ে দেয়। মল্লভূমে অবস্থানকারী ৩০০০ এর বেশি এমন সন্ন্যাসী ও ফকিরের দল এই যাত্রা পথে রাইপুরের উপর দিয়ে পলায়ন করতে থাকলে এলাকায় আতঙ্ক ও আশঙ্কার বাতাবরণ তৈরি হয়।[১৭]

এই দীর্ঘকালীন বিদ্রোহ কোম্পানী শাসকদের জেলায় এলাকাগত বহু যোগ বিয়োগে প্রাণিত করে। ১৮০৫ সালে জঙ্গল মহল জেলা গঠিত হয়। পরে ১৮৩২ সালে এই জেলা অবলুপ্ত হয়। ১৮৫৭ সালে রাইপুর প্রথমে মানভূম জেলার অন্তর্গত ছিল। ১৮৭৯ সালে মানভূম জেলা থেকে যেসব এলাকা বাঁকুড়া জেলায় স্থানান্তরিত হয় তার মধ্যে ছিল রাইপুর। গড় রাইপুর, নতুন গড়, ধরমপুর, ধোবাশোল, কামারডিহা, বনপাথরি, নীলজোড়া, সিমলি, উপরবাঁধা, দুবনালা, কেলেপাড়া, খড়িগেড়্যা, যাদবনগর, যশপাড়া, দেশন্যা-সহ ২৭ টি মৌজা নিয়ে গঠিত ছিল ফতে সিংহের বংশধর রাজা দুর্জন সিংহের জমিদারি।

রাইপুরের আদি রাজ বংশের হাত থেকে জমিদারি হাত ছাড়া হওয়ার পর নিলামের মাধ্যমে অনেকেই জমিদারির অংশ বিশেষ কিনে লাভবান হয়েছেন। যেমন ময়নাপুরের জমিদার মুখোপাধ্যায় পরিবার বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাইপুরের কাজলা, চিলতোড়, বনপাথারী মৌজার পত্তনি লাভ করেন। এখানে গাঁজা-আফিমের চাষ করে এই ভূস্বামীরা ভালই লাভবান হতে থাকেন।

## বীরসিংহদেবের রাজকাল ও ক্ষুদ্র জমিদারির পত্তন

রাইপুরের রাজাদের অধীনে ছোট জমিদারির পত্তনের প্রমাণ মেলে রাজা বীরসিংহ দেবের সময়ে ধবনী গ্রামের স্বরূপ পালের জমিদারি পত্তনের মধ্য দিয়ে। এরা ছিল রাজবাড়ীর বিশ্বস্ত কর্মী।

রাজা বীরসিংহের আনুকূল্যে প্রভূত ভূসম্পত্তি লাভ করে গ্রামে দুর্গাপূজার পত্তন করেন, যা ক্রমে সর্বজনীন রূপ পায়। ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে সারেঙ্গার ধবনী গ্রামের জমিদার স্বরুপ চন্দ্র পালের স্ত্রী শ্যামা সুন্দরীদেবী মা দুর্গার স্বপ্নাদেশ পান। সেই

স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর মন্দির, আটচালা তৈরি করে দুর্গাপুজোর সূচনা করেন জমিদার স্বরূপ চন্দ্র পাল। মায়ের পুজোয় বলিদানের প্রথা নেই। পুজো হয় বিশুদ্ধ বৈষ্ণব মতে। পরিবার সূত্রে জানা যায় জমিদার স্বরূপ চন্দ্র পালের আদি বাড়ি ছিল বর্তমান বিষ্ণুপুরের গোঁসাইপুর গ্রামে। যতদিন জমিদারি বজায় ছিল, জৌলুস ও দাপটের সাথে পূজা ও পার্বণ সমাধা হত। পুজোর সময় আটচালায়, মন্দিরে জ্বলতো ঝাড় লণ্ঠন, বসতো জলসা, মেলা। আসতো কলিকাতার বিখ্যাত যাত্রার দল। দুর্গাপুজোকে ঘিরে ধুমধাম আর হই হুল্লোড় পড়ে যেত এলাকায়। জমিদারী চলে যাওয়ার সাথে সাথেই জৌলুস হারিয়েছে সারেঙ্গার ধবনি গ্রামের পালেদের পূজা। এখন জমিদার বাড়ির নোনা ধরা দালান প্রায় ধ্বংসের মুখে। পাঁচদিনের ব্যায়বহুল দুর্গাপুজোর আয়োজন এখনও করেন জমিদার বংশের শরিকরা। বংশের বর্তমান প্রজন্ম ভক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতি বছর মায়ের পূজার আয়োজন করেন। আজও বাইরের বা স্থানীয় শিল্পীরাই মঞ্চস্থ করেন যাত্রা পালা। হয়তো এই যাত্রা পালার মাধ্যমেই জমিদারীর জৌলুস আজও বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন পাল বংশের বর্তমান প্রজন্ম। একসময় এই পরিবারের কাছেই রাইপুর পরগণা বন্ধক রাখে রাজ পরিবার। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮৮৫ সালের ২২ এপ্রিল রাণী নীলকুমারী ও জমিদার গোরাচাঁদ পালের মধ্যে।

## রঘুনাথ সিংহ ও হরিহর সিংহের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধ

রাজপরিবারের মতে (২য়?) ফতে সিংহের বড় রানীর পুত্র রঘুনাথ সিংহের কনিষ্ঠ রানীর পুত্র হরিহরের পরে জন্ম হলেও বড় রানীর ছেলে হিসাবে সিংহাসনে বসেন রঘুনাথ। রাজা রঘুনাথ নতুনগড়ে রাজবাটী তুলে নিয়ে যান। রাজা রঘুনাথের কন্যা জগৎ কুমারীর সাথে 'নয় মহলা সম্পর্কের' রীতিতে বিবাহ হয় জামবনীর রাজা হরিহর দেও ধবলদেবের (১৮৬০-৭৮)।

রঘুনাথের এই রাজ্যলাভের বিরুদ্ধে ছোট রানীর পুত্র হরিহর সিংহ আদালতের দ্বারস্থ হন। জন্ম আগে হওয়ার কারণে শাসকের প্রাথমিক বিচারে সহজেই রাজা হিসাবে তিনি স্বীকৃতি পান। হরিহরপুত্র ইন্দ্রের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হলে প্রথম রানী উজ্বল কুমারী ও তার পর দ্বিতীয় রানী নিশা কুমারী রাজ্যপাট সামলান। এর পর রাজভ্রাতা লাল সিংহদেব রাজত্ব ভার নেন। ১৯১১ সালে লাল সিংহের পুত্র বলভদ্র সিংহদেব রাজসিংহাসনে আসীন হন। হরিহর সিংহদেব আদালতের আদেশে

রাজ্য ফিরে পেলে হরিহরগঞ্জে বসতি স্থাপন করেন। অদ্যাবধি এখানেই হরিহর সিংহদেবের বংশধররা বাস করেন (যেমন বর্তমান প্রজন্মের মধুসূদন সিংহদেব, গোপীনাথ সিংহদেব)। এদের আগে বসতি ছিল বর্তমান ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র যেখানে গড়ে উঠেছে। ১৯১৩ সালে দ্বারভাঙ্গার মহারাজ এই জমিদারি কিনে নিলে রাজবংশটির পতন ঘটে।

## **ইন্দ্র সিংহদেব** (১ম রানী উজ্জ্বল কুমারী, ২য় রানী নিশা কুমারী)-**লাল সিংহদেবের সমকালীন প্রজা দুর্দশা**

হরিহরপুত্র ইন্দ্রের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হলে প্রথম রানী উজ্বল কুমারী ও তার পর দ্বিতীয় রানী নিশা কুমারী রাজ্যপাট সামলান। এর পর রাজভ্রাতা লাল সিংহদেব রাজত্ব ভার নেন। এসময় রাইপুর ছিল পৌনঃপুনিক অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের অভিঘাত জর্জরিত। এই দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে সেচের প্রসারে সরকারী সহায়তায় গণউদ্যোগে চারটি সেচ সমবায় শুরু হয়। এই উদ্যোগ ছিল রাজবাড়ী সমর্থিত।

রাইপুরের রাজারা কৃষি উন্নয়নে সবচেয়ে জোর দিয়েছিলেন। ১৭৬৭ সালে ফারগুসন রাইপুর অভিযানের সময় এলাকার কৃষি সমৃদ্ধি দেখে চমৎকৃত হন। বিভিন্ন সায়র থেকে জলসেচের ব্যবস্থাও এই ব্রিটিশ সমরনায়ককে বিস্মিত করে।

শুধু প্রজাহিতৈষণা নয়, কৃষক ও প্রজাদের স্বার্থ রক্ষায় এই রাজবংশের কয়েক দশকের সংগ্রাম আঞ্চলিক ইতিহাসে বিরল।

রায়ত বিদ্রোহের পরিসরকে প্রশস্ত করেছিল রাজ্যব্যাপী মহাজনী শোষণ। ম্যাকালপিনের হিসাবে পরগণায় জমির বন্ধকী ঋণ ছিল ১৭.৫-২৫ শতাংশ সুদে। রাইপুর তালুকে এমন এক মহাজন ছিল তারাচাঁদ চৌধুরী।

## রাইপুরের রাজা বলভদ্র সিংহদেবের ঋণগ্রস্ততা

ঋণগ্রস্ত রাইপুর রাজা বিভিন্ন মহাজনের অনুগ্রহে তাদের একজন মুখ্য খাতকে পরিণত হয়েছিলেন। রাইপুরের জঙ্গল জমির ব্যবসা ছিল রাজার আয়ের মুখ্য অংশ। সিমলির কার্তিক মন্ডল ও সারেঙ্গার গোয়ালা হরি গিরি রাইপুরের রাজার কাছ থেকে জঙ্গলের কাঠ কিনতেন। কার্তিক ছিলেন ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে রাইপুরের গিসবর্ণ কোম্পানীর একজন আমমোক্তার বা এ্যাটর্নী। এদের রাইপুরে বড় প্রতিষ্ঠান ছিল। ছিল পূর্ণ সময়ের সাহেব ম্যানেজার সহ কর্মীবর্গ। ১৯০৯-১০ সালে রাইপুরের মাসিক দশ

টাকা বেতনে ঘাটোয়ালী খাজনা আদায় করতেন সিমলির বেণীমাধব মন্ডল নামে এক আমীন। সারেঙ্গার ছত্রী রোহিনী সিংহ ১৮ বছর বয়সে চাকুরিতে ঢুকে মাসিক ৬ টাকা বেতনে গিসবর্ণ কোম্পানীতে ১৯১০ সাল পর্যন্ত কাজ করেছেন (তারপরও শরৎকামিনী এস্টেটে তিন বছর একই মাহিনাতে চাকুরি করেন)।[১৮]

ঋণের জালে উত্তরোত্তর জড়িয়ে পড়েছিলেন হতভাগ্য রাইপুর রাজা। তার উদাহরণ হল (১) রাইপুরের জমিদারি ও তেজারতি ব্যবসায় লিপ্ত গিসবর্ণ কোম্পানীর অছি বোর্ডের চার সদস্য ডি এইচ ম্যাকফারল, ডি ক্রুইকম্যান, জে এফ ম্যাকনেয়ার ও জি এইচ সাদারল্যান্ড কর্তৃক বন্ধকী খতনামামূলে রাইপুরের জমিদার বলভদ্র সিংহদেবকে ১৮৮৫ সালে ২৬২৬ টাকা, ১৮৮৯ সালে ১৪৯৯৯ টাকা ও ১৮৯০ সালের ১৭ ই অক্টোবর ২৬০০০ টাকা ঋণ দান। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে গিসবর্ণ কোম্পানীর বকেয়া আদায়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন অছি হেগ ডানলেক ও এজেন্ট জি সি রায়।[১৯] (২) বলভদ্র ১৯২৭ সালের ৬ ই শ্রাবণ কলকাতা পাথুরিয়াঘাটার রাজা ব্রজমাধব মিত্রের কাছ থেকে বার্ষিক ৩০ শতাংশ সুদে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন।[২০] (৩) ১৯০৬ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা অস্থলের মহন্ত ভরত রামানুজ দাসের কাছ থেকে বলভদ্র ২১ হাজার ১১২ টাকা ঋণ নিয়ে জমিদারি বন্ধক দেন। যথারীতি ঋণ অনাদয়ের কারণে বাঁকুড়ার সাব-জজ আদালতে মামলা দায়ের করে নিজের অনুকূলে ১৯১৫ সালের ৩০ এপ্রিল মহন্ত একটি ডিক্রিও পান। মামলাটি হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। ভরত মহারাজ মটগোদা শরৎকামিনী এস্টেটের কাছারির সাথে যুক্ত ছিলেন। সিমলির কার্তিকচন্দ্র মন্ডল ছিলেন মহন্তের কর্মী (১৯০৯-১৯১৪)।[২১] (৪) সূর্যাস্ত নিয়মের সুযোগ নিয়ে ভাগলপুরের শরৎকামিনী এস্টেট খাতড়া ও রাইপুর জমিদারি ক্রয় করেছিলেন। বলভদ্র এই এস্টেটের কাছ থেকে ৩০০০০ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। সুদ ছিল মাসিক এক শতাংশ। ঋণের শর্ত ছিল রাজা রাইপুর জমিদারির বার্ষিক ২৬৭৬ টাকা ৪ আনা ৪ পাই সরকারকে আদায় দেবেন এবং ৩০০০০ টাকা সুদ সহ কিস্তিতে ফেরত দেবেন। খেলাপী কিস্তির উপর চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ দেবেন ও অনাদয়ে মামলা হলে তার খরচও বহন করতে হবে। সমস্ত ঋণ পরিশোধ করতে হবে পরের তিন বছরের মধ্যে।[২২] (৫) ইংরাজ প্রবর্তিত অনাদয়ী রাজস্বের জন্য জমিদারির অংশ নিলামের রীতি মেনে রাইপুর পরগণার একাংশ বাঁকুড়া শহরের মহাজন রাঠী পরিবার, চিন্তামণি দত্ত সহ কয়েকজনের হাতে চলে যায়। বলভদ্র অনন্তরাম রাঠীর পুত্র ও শুকদেব রাঠীর ভ্রাতুষ্পুত্র হরিকিষণদাস

রাঠীর কাছ থেকে জমিদারি বন্ধকের বিনিময়ে ৭৫০০০ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন।[২৩] (৬) রাজা বলভদ্র শ্রীনাথ সাহু নাম্নী এক মহাজনের কাছ থেকে বন্ধকী খতে ১৯০৫ সালের ২৭ আষাঢ় ও ১৯০৬ সালের ৫ ফাল্গুন মাসে ঋণ গ্রহণ করেন। প্রথম ঋণ গ্রহণের কারণ ১৯০৪ সালে মৃত রানী নীলকুমারীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান আয়োজনের জন্যে ব্যয়িত ৪১১টাকা ৯ আনা ধারের সুদসহ ৬২৮ টাকা ৯ আনা পরিশোধের তাড়না। এই ঋণের সুদের হার ছিল মাসিক শতকরা ১ টাকা ৪ আনা। দ্বিতীয়টি মাসিক শতকরা ২ টাকায়।[২৪] (৭) ১৯০৬ সালের ১৫ চৈত্র জনৈক বামাচরণ মহাপাত্র রাজা বলভদ্রকে বন্ধকী খাতে টাকা ধার দেন। ১১৭০ টাকার এই কর্জের উপর সুদের হার ছিল মাসে শতকরা ৩ টাকা ১ আনা। এই ঋণ শোধের সময়সীমা ছিল ১৯০৮ সালের ফাল্গুন মাস। (৮) গোপীনাথ দরিপা নামের মহাজনের কাছ থেকে রাজা বলভদ্র ধার নিয়েছিলেন ২৫০০০ টাকা। ১৯০৯ সালে এই টাকা উদ্ধারের জন্য তিনি রাজার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।[২৫] (৯) রাজগ্রাম ইলমবাজারের বৃন্দাবন দত্ত মাসিক শতকরা ৮ আনা সুদে রাজা বলভদ্রকে টাকা ধার দিয়েছিলেন। তাঁকে ৭০০০০ টাকা বন্ধকী ধারের উপরে আরো ৪০০০ টাকা ধার নিতে হয়। আর এক মাসের মধ্যে সমুদয় অর্থ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল।[২৬]

এই খতিয়ান থেকে রাজার আর্থিক দুর্দশার চিত্র ফুটে ওঠে। ঋণগ্রস্ত রাজা বলভদ্র জগবন্ধু সিংহ চৌধুরীকে (সিমলাপালের রাজা) ১৯০৯ সালে দখলীয় ১০০০ বিঘার একটি জঙ্গল বিক্রি করে দেন।

## পারিবারিক বিরোধ ও জমিদারির পতন

হরিহর সিংহদেবের সিংহাসন প্রাপ্তি যেমন ছিল আইনি বিবাদ বিড়ম্বিত, তেমনই হরিহর পুত্র ইন্দ্রদেব নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে রাজপরিবারটি আইনি বিবাদ ও বিভিন্ন জটিলতার আবর্তে পড়ে দ্রুত পতনের দিকে এগিয়ে যায়। হরিহরি সিংহের তিন পুত্র ছিলেন ইন্দ্র, লাল ও মোহর। রাজা হরিহরের মৃত্যুর পর বড় সন্তান ইন্দ্র সিংহাসনে বলেন। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে অপুত্রক ইন্দ্রদেবের অকাল মৃত্যু হলে রাজপরিবারে জটিলতার সূচনা হয়। লাল সিংহ সিংহাসনের দাবিদার হলেও আইনি বিধানে বিধবা দুই রানী বড় উজ্জ্বল কুমারী ও ছোট নীলকুমারী জীবদ্দশায় রাজ্যপাট ভোগ করবেন বলে সাব্যস্ত হয়। উজ্জ্বল কুমারী মারা যান ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ও পরবর্তী রানী নীলকুমারী রাজ্যের দায়িত্ব সামলে মারা যান ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মার্চ।

ইতিমধ্যেই মারা গেছে দুই পরবর্তী দাবিদার লাল ও মোহর সিংহ। রেখে গেছেন তাদের দুই পুত্র যথাক্রমে বলভদ্র ও রাধেশ্যামকে। মোহর সিং রানী নীলকুমারীর বোনকে বিবাহ করে নীলকুমারীর সাথে একত্রে বাস করতেন এবং যথেচ্ছভাবে অমিতব্যয়ী জীবন যাপন করে রাজ পরিবারকে ধ্বংসের কিনারে পৌঁছে দেয়। খরচ সামলাতে নীলকুমারী ১৮৭৫ সালের ২৪ অগ্রহায়ণ ৩৪ বছরের মেয়াদে ইজারা হিসাবে রাজ্য তুলে দেন নীলকর গিসবর্ণ এ্যান্ড মেসার্স কোম্পানীর হাতে। বিনিময়ে পেতেন মাসোহারা, কিছু জঙ্গলের ও শস্যে রাজস্ব পাওয়ার কিছু চাষ জমির অধিকার। এর পর থেকেই ক্রমাগত চলতে থাকে বন্ধক দেওয়ার ধারা। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২২ এপ্রিল নীলকুমারী সারা রাজ্য ধবনীর জমিদার গোরাচাঁদ পালকে বন্ধক দেন। গোরাচাঁদ আইনি লড়াইয়ে ডিক্রি পেলে পরগণাটি নিলাম তোলা হয়। ১৮৯১ সালে ২০শে জানুয়ারি নিলামে অংশ নিয়ে পরগনার বিভিন্ন অংশ কিনে নেয় অনন্তরাম রাঠি, সুকদেব রাঠি, চিন্তরানী দত্ত।

একদিকে বলভদ্র সিংহ ভবিষ্যত উত্তরাধিকার হিসাবে ১৮৯১ সালের ২২ নভেম্বর ও ১৯০৪ সালের ২৩ জুন সমস্ত অধিকার বন্ধক দিয়ে দিয়ে দেন জনৈক পাল পদবীধারীকে। অন্যদিকে রাঠি ও দত্তদের কাছে রাজ্যপাট হস্তান্তর করা রানী নীলকুমারী গত হন ১৯০৫ সালের ২৯ মার্চ। অবশ্য ১৯০৬ সালে রাঠি ও দত্তদের সাথে বলভদ্র আপোষ মীমাংসা করে এই জটিলতার অবসান ঘটান।

এদিকে ১৯০৯ সালে বলভদ্রের কাছ থেকে অধিকার স্বত্ব পাওয়া পালেরা আইনের দ্বারস্থ হলে ১৯১০ সালের ১ মে নিজেদের অনুকূলে ডিক্রি পান। ডিক্রিকৃত পাওনা আদায়ে সম্পত্তি নিলামের অধিকার দেওয়া হয়। ১৯১০ সালের ১ আগস্ট এই রায়টি চূড়ান্ত ঘোষণা হলে বলভদ্র জমিদার বাঁচানোর আশায় আইনের দ্বারস্থ হয়েও বিফল হলেন। ১৯১২ সালের ৬ই জুন পরগণা নিলামের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯১৩ সালে ভাগপুরের প্রসিদ্ধ উকিল চন্দ্রশেখর সরকার স্ত্রী শরৎকামিনীর নামে এই পরগণাটি কিনে নেয়। ১৯১৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি সরকার পরিবার এই এস্টেটের অধিকার নিলে (১) ইন্দ্র সিংহের দেওয়া মোকাবরী স্বত্ব যাচাইয়ের পর জাল প্রমাণিত না হলে তা গ্রহণ করে। (২) উজ্জ্বলকুমারী ও নীলকুমারীর প্রদান করা স্বত্বসমূহ বিতর্কের উর্দ্ধে না থাকলে সেগুলিও গ্রহণ করা হয়। (৩) গিসবর্ণ কোম্পানীর দেওয়া স্বত্বসমূহ বাতিল করা হয়, যেহেতু মেয়াদী লিজহোল্ডার এমন স্থায়ী মোকাররী স্বত্ব দিতে পারে না। (৪) রাঠি ও দত্তদের প্রদত্ত এমন স্বত্বসমূহ বাতিল করা হয়, যেহেতু মেয়াদী

লিজহোল্ডার এমন স্থায়ী মোকাররী স্বত্ব দিতে পারে না। (৪) রাঠি ও দত্তদের প্রদত্ত এমন স্বত্বসমূহ বাতিল করা হয়, যেহেতু রানী নীলকুমারীর অধিকারের উপর এই প্রদান সঠিক ছিল না। (৫) বলভদ্রের দেওয়া স্বত্বসমূহ বাতিল হয় এই যুক্তিতে, তিনি সম্পত্তির অধিকারী হলেও নিজ অধিকার এসময়ে তিনি বন্ধক দিয়ে রেখেছিলেন। এই ভাবে উজ্জ্বলকুমারী, নীলকুমারী, বলভদ্রদেবের সময়কালে প্রদত্ত মোকাররী স্বত্বের সমস্যাগুলি সমাধান করা হয়। পরগনায় এমন ১০৬১ টি স্বত্ব মোকাবরী নয় বলে সাব্যস্ত হয়, যেখানে ৪১৮টি স্বত্ব মোকাবরী বলে প্রমাণিত হয়। অবশ্য ১৯১৯ সালে চন্দ্রশেখর সরকার ও স্ত্রী শরৎকামিনীর ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে মৃত্যু হলে তাদের বিবাদমান উত্তরাধিকারীরা রায়তদের এক বছরের রাজস্বের সমান সেলামী নিয়ে মোকাররী স্বত্বের স্বীকৃতি মেনে নেয়।[২৭]

## রাইপুর পরগণায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার

রাইপুরে সিংহ রাজবংশের আনুকূল্যে একটি শক্তিশালী সংস্কৃত শিক্ষার পরিন্ডল গড়ে উঠেছিল রাজধানী গড়রাইপুর ও সন্নিহিত এলাকায়। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বহু টোল-চতুষ্পাটী। ১৯২০ সালের দিকে প্রতিষ্ঠিত বীরভানপুরের চতুষ্পাঠীর নাম সারা রাঢ় বাঁকুড়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। উৎকল ব্রাহ্মণ শ্রীনাথচন্দ্র কাব্যব্যাকরণতীর্থ ছিলেন এই চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠাতা। সংস্কৃত শিক্ষার পাশাপাশি আয়ুর্বেদ চিকিৎসার প্রচলন ও চর্চার কথা জানা যায়। রাইপুরের এমন আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ও শিক্ষকের নাম উদ্ধার করা না গেলেও খাতড়ার মহিমার্ণব সেনগুপ্ত (১৮৬০-১৯২৮) ও ভেলাইডিহার পঞ্চানন দাশগুপ্ত ভীষণাচার্যের চিকিৎসার খ্যাতি রাইপুরেও প্রসারিত হয়েছিল। ইন্দপুর গোপালনগরের কবিরাজদের ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগাবার খ্যাতি অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

রাইপুরে বহু প্রাচীন পুঁথির আবিষ্কার রাইপুর অঞ্চলের এই শক্তিশালী শিক্ষা পরিমন্ডল গড়ে ওঠার সাক্ষ্য। আঞ্চলিক গবেষক অধ্যাপক অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় রাইপুর ব্লকের মণ্ডলকুলি গ্রাম থেকে যে চৌদ্দটি পত্রের প্রাচীন পুঁথি দ্বিজ কবিচন্দ্রের 'কপিলা মঙ্গল' সংগ্রহ করে সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছিলেন তার লিপিকাল ছিল ১২৮১ বঙ্গাব্দের (১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দের) ১৫ বৈশাখ। কৃষি নির্ভর পশ্চিমরাঢ় ও মানভূম তথা বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার লোক মুখে প্রচলিত বাঁদনা খুঁটান গান গুলি থেকেই কপিলা মঙ্গলের জন্ম। এখনও এই অঞ্চলে কার্তিক মাসের বিশেষ একটি সময়ে কপিলামঙ্গল

কাব্য গাওয়া হয়। সম্ভবত দ্বিজ কবিচন্দ-ই এর প্রথম এবং প্রধান কবি।

আরেকটি উদ্ধার হওয়া প্রাচীন পুঁথি হল ছারপোকার পালা। এটির লিপিকর হলেন রাইপুর পরগণার পড়াশ্যা গ্রামের ধনঞ্জয় (গ্রামটি বর্তমানে সারেঙ্গা ব্লকের বারপাখান এলাকায়)। এর লিপিকাল উল্লেখ না থাকলেও তিন পত্রে সম্পন্ন, পত্র প্রতি ১০-১১ পংক্তি বিশিষ্ট হাতে তৈরি দু'ভাঁজ কাগজে কালিতে লেখা এই গ্রন্থ অতি প্রাচীন তা নিয়ে সন্দেহ নেই। পুঁথিটির বানান রীতি ও ভাষারীতি মধ্যযুগের। এটি উৎসর্গ করা হয়েছিল শ্রীধনমোহন দেবকে। ধনমোহন সম্ভবত রাইপুর অথবা রসপাল রাজবাড়ীর কেউ। এঁদের পদবি সিংহ দেব বা তুঙ্গদেব সংক্ষেপে দেব লেখা হতো। এর থেকে সাহিত্য সংস্কৃতির প্রসারে আমজনতার যোগদান এবং রাজাদের উৎসাহ ও অংশগ্রহণ প্রমাণিত হয়। এই পুঁথির পাঠ ও গীতের ক্ষেত্রে লিপিকারের অনুজ্ঞা অংশে সাবধান বাণী হল, পুঁথি পড়তে দেবে পন্ডিতকে, মূর্খকে নয়-মূর্খ পুত্র যম সম, মানে থাকার চেয়ে না থাকা ভালো, আর এই পুস্তক তাঁকেই গাইতে দেবে যাঁর কোকিলের মতো গলা এবং স্বরশক্তি আছে। ১৯৪১ সালে, রাজানুকূল্যে রাইপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ' গ্রামীণ পাঠাগার। রাজপোষিত দুটি বড় মেলা ছিল হরিহরগঞ্জের জিতামেলা ও রাইপুরের ইন্দমেলা। ইন্দমেলা থেকে আয় না থাকলেও জিতামেলা থেকে আয় ছিল ৪ টাকা। জেলা বোর্ডকে দিতে হত ১ টাকা করে। ১৮০০ সালের পর এই দুটি মেলার মালিক ছিলেন রাজা চক্রধর সিংহদেব।

## নীলচাষ ও রাইপুর

ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগ থেকে রাইপুরে নীলচাষের রমরমা শুরু হয়। এতে অনেক ভূস্বামী ও অর্থবান লোক সহযোগীর ভূমিকা নেয়। রাইপুরে এখনও একটি নীলকুঠি ও আবাস প্রায় অক্ষত আছে। উল্লেখ্য ঋণের দায়ে ১৯০৯ সালে রাইপুর পরগণার দখল ছিল নীল ব্যবসায়ে জড়িত মিঃ স্কেলের গিসবর্ণের হাতে। এ সময় এদের উদ্যোগে নীলকুঠির প্রতিষ্ঠা ও চাষের প্রসার ঘটতে পারে। রাইপুর জমিদারি নীলকর গিসবর্ণ কোম্পানীর অধিকারে এলে এই পরগণায় নীল চাষে বেগ আসে।

বেদখল পূর্বোক্ত বাড়িটির গায়ে এখনও স্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত সমুদ্রের মানচিত্র ও ইংরাজী ভাষায় দিক নির্দেশ এখানে ইংরেজ নীলকর পরিবারের বাস প্রমাণ করে। ক্রমাগত প্রজা অসন্তোষের কারণে ও ইংরেজ সরকারের নীলকর বিরোধী অবস্থানের

ফলে রাইপুরে এই নীল চাষের রমরমা বন্ধ হয়। অবশ্য ১৯০৮ সালের দুর্ভিক্ষের সময় রাইপুরে গিসবর্ণ এ্যান্ড কোম্পানীর ভূমিকা সদর্থক ব্যতিক্রমী।[২৮] কোম্পানীর ম্যানেজার লিডিয়ার্ড রাইপুরের ত্রাণাধ্যক্ষকে ত্রাণ কাজ পরিচালনার জন্য নিজের বাংলোই ছেড়ে দিয়েছিলেন। চাল বিতরণ করা হত বয়স্কদের মাথাপিছু ১০ ছটাক, স্ত্রীলোকদের ৮ ছটাক, ১৪ বছরের নিচে হলে ৪ ছটাক। রাইপুর থেকে ত্রাণের জন্য সংগ্রহ হয়েছিল ২২৫ টাকা ১৩ আনা।[২৯]

## রাইপুরে দুর্ভিক্ষ ও ত্রাণ ভাবনা

ব্রিটিশ নথি থেকে দেখা যায় ১৮৯৭ সালে রাইপুরে অনাবৃষ্টি, শস্যহানি, মন্বন্তর ও অনাহারের ঘটনা ঘটছে। কালেক্টর কিরস্কলে ও কমিশনার এস এল ম্যাডক্সের হিসাবে ১৯০৮ সালে রাইপুর পরগণার প্রায় এক তৃতীয়াংশ দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়ে পড়েছে। ৭৩০০০ মানুষ এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই পৌনঃপুনিক অভিঘাত থেকে মুক্তি পেতে সরকারি ও গণউদ্যোগে রাইপুরে ৫ টি সেচ সমবায় গঠন করা হয়। এসময় রাইপুরের জমিদার ছিলেন ইন্দ্র সিংহদেব (প্রথম পক্ষের রানী উজ্বল কুমারী, দ্বিতীয় রানী নিশা কুমারী ইন্দ্রের মৃত্যুর পর রাইপুর শাসন করেন) ও লাল সিংহদেব। রাইপুরে মহাজনী শোষণের নায়ক ছিল তারাচাঁদ ও রামসদয় চৌধুরী। সুদের হার ছিল ২৫-২৭.৫ শতাংশ। জমি হারাতে থাকে নিম্নবর্গীয় মানুষেরা। রায়পুরের নীলচাষও রায়তদের কাছে ছিল অলাভজনক।[৩০]

## রাইপুরের পতন

১৯১৩ সালে বন্ধকী ঋণ অনাদয়ের কারণে আদালতের ডিক্রি বলে রাইপুর পরগণা নিলামে ওঠে। ভাগলপুরের বিশিষ্ট উকিল ও শরৎকামিনী এস্টেটের মালিক চন্দ্রশেখর এই এস্টেটটি কিনে নেন। পরে শরৎপুত্র যামিনীমোহনদের কাছ থেকে দ্বারভাঙ্গার মহারাজ কিনে নেন রাইপুর পরগণা। ১৯১৩ সালের আগে গিসবর্ণ কোম্পানীও এই পরগণার শাসনভার পেয়েছিল। ১৯০৯ সাল পর্যন্ত ইজারা ছিল এই কোম্পানীর হাতে।[৩১]

কালেক্টর ও রাজপরিবার নথি (নথিটি এক সাবেক রাজকর্মচারীর থেকে সংগ্রহ করেছিলেন অধ্যাপক অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়) স্পষ্ট হয় ১৯২০ সালে পর্য সময়কালে

পতনের চিহ্নগুলি। ১৯২০ সাল নাগাদ শরৎকামিনী দেবীর পাঁচ পুত্রের মালিকানায় ছিল বাঁকুড়া কালেক্টরীর ৯৯৫ নং মহাল রাইপুর (রায়পুর রাজ দুর্জনের তিরিশটি গ্রাম ছিল চাতরি, সারিগাড়ি, বিক্রমডিহি, ধডাঙ্গা, হলুদকানালি, দুন্দার, সোনাগড়া, বিষাণপুর, পিড়রা, নিবড়া, শুশুনিয়া, অসুরগেড়্যা, কদমাগড়, জামবনি, মুরকুম ইত্যাদি)। রাজা ইন্দ্র সিংহদেবের ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ভাদ্র মাসে অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হলে রানী উজ্জ্বলকুমারী রাজ্যপাট সমলান। ১৮৬৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে রানীর মৃত্যু হলে দ্বিতীয়া পত্নী নীলকুমারী রাজ্যের দায়িত্ব নেন। ইতিমধ্যে দেওর লাল সিংহের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র বলভদ্র সিংহদেব সিংহাসনে বসেন ১৯১১ সালে, নীলকুমারীর মৃত্যুর পর। ১৯০৯ সালে কর অনাদায়ের কারণে সূর্যাস্ত আইনে ব্রিটিশ সরকার রাইপুর জমিদারি নিলামে চড়ালে এর কিছু অংশ কেনে বাঁকুড়া শহরের গোপীনাথ দরিপা ও ভাগলপুরের উকিল চন্দ্রশেখর সরকার। ১৯১৩ সালের ৬ মে শরৎকামিনী এস্টেটের হাতে আসে পুরো রাইপুর জমিদারি (৩৩৯ নং দেওয়ানী আদেশনামা)। ঋণগ্রস্ত রাইপুররাজ ইজারা বা বন্ধকী শর্তে ধার করেছিলেন ১৮৭০ সালের ৩ জ্যৈষ্ঠ মেদিনীপুরের মীরবাজার নিবাসী গঙ্গারাম দত্তের কাছে এবং ১৮৭৫ সালের ২৪ অগ্রহায়ন গিসবর্ন এ্যান্ড কোম্পানীর কাছে। বাঁকুড়া শহরের শুকদেব রাঠী আদালতের ডিক্রী বলে ১৯০৭ সালের চৈত্র মাস পর্যন্ত রানী নীলকুমারীর এস্টেটের দখলদার ছিলেন। ১৯০৯ সালের ৯৪ নং মোকদ্দমার রায়ে ডিক্রী হওয়া পরগণার সম্পত্তি কিনে নেন শরৎকামিনী এস্টেট। বলভদ্র সিংহদেবের হাতে থাকা অবশিষ্ট জমিদারির সোলেনামা সুরত বিক্রি হয় ১৯১০ সালের ১১ মে। বলভদ্রের পরবর্তী রাজধারা হল কালীপদ-চক্রধর-শশধর-হরিপদ।

নথিটির তৃতীয় অনুচ্ছেদে আছে, "এই জমিদারি পূর্বে জঙ্গল অবস্থায় জঙ্গলমহাল নামে খ্যাত ছিল। দশশালা বন্দোবস্তের সময় এই জমিদারিতে ১৮০টি আসলি মৌজা ছিল। পরে ক্রমশ জঙ্গল কাটা হইলে ও পতিত তুরদুদ হইলে নূতন মৌজার পত্তন হয়। ঐ সকল মৌজাকে দাখিলী মৌজা বলে। ক্রমশ এই পরগণায় ১৫০টি দাখিলী মৌজার পত্তন হয়েছিল এবং কোন কোন দাখিলী মৌজার অন্তর্গত জমি লইয়া খাপ মৌজা আখ্যাত হইয়াছে।" চতুর্থ অনুচ্ছেদে আছে সমকালীন মাপের কথা। ১৮ ইঞ্চিতে এক হাত ও পাঁচ হাতে এক কাঠা। কুড়ি কাঠায় এক বিঘা। পঞ্চম অনুচ্ছেদে ১৭/১২/১০২০ সালে প্রজাসত্ত্ব আইনে জমির রেকর্ডের চূড়ান্ত প্রকাশ করা হয়। উদয়াড়্যার মুকুন্দপুর মৌজার চূড়ান্ত প্রকাশিত ভূমিনথিতে দখলদার দেখান আছে

চন্দ্রশেখর সরকারের পাঁচ পুত্র যামিনীমোহন, যতীন্দ্রমোহন, সৌরেন্দ্রমোহন, ভূজেন্দ্রমোহন, নৃপেন্দ্রমোহন। অর্থাৎ এই নথি থেকে সমকালীন ভূমি অর্থনীতি ও দখলের ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।

অধুনা দক্ষিণ বাঁকুড়ায় প্রাচীন এই ভূম রাজ্যের ইতিহাস বিস্মৃতপ্রায়। মন্দির-রাজবাটী অনাদরে ধ্বংশের কিনারায়। কিন্তু প্রান্তিক এই রাজ্যের ইতিহাস এখন অল্প চর্চিত হলেও হয়ত একদিন তা আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার সরণি বেয়ে বৃহত্তর পরিসরে আলোকিত হবে।

**তথ্যসূত্র :**


১. **Jadunath Sarkar, History of Bengal, 2nd edition, Delhi, 1943, p.208**

২. **Abhaya Pada Mallik, History of Bishnupur-Raj, Calcutta, 1921, p.119.**

৩. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০, পৃ. ২৮।

৪. **LSS O’Malley, Bankura District Gazetteers, Calcutta, 1908 (reprint 1995), p. 172.**

৫. **LSS O’Malley, Bankura District Gazetteers, Calcutta, 1908 (reprint 1995), p. 172.**

৬. **Abhay Pada Mallik, History of Bishnupur-Raj, Calcutta, 1921, p.42.**

৬ক. বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলকাতা, ১৯৫০, পৃঃ ৯৭।

৭. **B Ray, Bankura District Handbook, Calcutta, 1961, p. 151-52.**

৮. ২০১৭ লেখকের ক্ষেত্রসমীক্ষা ও শ্যামসুন্দর রাজপরিবারের পশুপতি নারায়ণ দেউয়ের দেওয়া তথ্যাদি।

৯. **B Ray, Bankura District Handbook, Calcutta, 1961, p. 151-52.**

১০. মহামায়ার পুরোহিত বংশের বর্তমান প্রজন্মের গঙ্গারাম চ্যাটার্জীর কাছে সংগৃহীত।

১১. **Abhay Pada Mallik, History of Bishnupur-Raj, Calcutta, 1921, p.42.**

১২. কোম্পানীর উদ্দেশ্যে বর্ধমানের প্রাদেশিক রাজস্ব আধিকারিকের লেখা ১৫ই মার্চ, ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দের পত্র।

১৩. **B S Das, Changing Profile of Frontier Bengal, Delhi, 1984, p.232 with appendix in chuar Rebellion of 1779 of J C Price.**

১৪. **Letter from Midnapore Collector to Company dated 19th March, 1799 and 29th April, 1799.** সরকার দুর্জনের কাকার (অর্জুন) মাধ্যমে মধ্যস্থতা করে।

১৫. সুদীপ্ত পোড়েল, অতীত বাঁকুড়ার সমাজ ও অর্থনীতি, কলকাতা, ২০১৬, পৃঃ ২৩২।

১৬. সব্যসাচী মণ্ডল (সঃ), রাঢ় বাংলার লোকসংস্কৃতি, কলকাতা, ২০১৮, পৃঃ ৩০৮ ও ২০১৭ সালে লেখকের ক্ষেত্রসমীক্ষা।

১৭. **Jaminimohan Ghosh, Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal, Calcutta, 1930, p.59.**

১৮. Paper Book Group II, Apeal on the decree No. 118 of 1920 of Bankura Sb-Judge Court at 22/01/20, P.115.
১৯. ibid, P. 80, 96-97.
২০. ibid, P. 90.
২১. ibid, P. 26, 85
২২. ibid, P. 85
২৩. ibid, P. 76
২৪. ibid, P. 21, 61, 111, 115
২৫. ibid, P. 10-11
২৬. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, ব্রিটিশ রাজপর্বে বাঁকুড়া জীবন, বাঁকুড়া, ২০১৬, পৃঃ ১৮২। রাজা বলভদ্রকে মহাজন, বৃন্দাবন দত্ত মাসিক ৮ আনা হারে ৭৪০০০ টাকা ধার দিয়েছিলেন। ১৩৮৫৩৮ টাকা ১১ আনা ৬ পাই ঋণের উপর মাসিক দশ আনা হারে সুদ দিতে হত। রাইপুর রাজার ঋণের উপর এই কম সুদ হারের কারণ ঋণের পরিমাণ ছিল ৪০০০ টাকা (প্রাথমিক) ও এক মাসের মধ্যে শোধ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। তাছাড়া দত্তরা রাজার সম্পত্তিতে তাঁদের Lien ছেড়ে দেওয়ায়, রাজা ৭০০০০ টাকার একটি মর্টগেজ বন্ড সম্পাদন করেন।
২৭. F W Robertson, Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Bankura, Calcutta, 1926, p. 92-94.
২৮. Minutes of Richard Temple, Lt Governor of Bengal dated 31st Octber, 1874.
২৯. Bankura Collector's Famine Relief Report, Bankura, 1908, Para 31.
৩০. F H B Scrine, Memorandum on the Material Condition of the Lower orders in Bengal during the ten years 1881-082 to 1891-92, Calcutta, 1892, p.32.
৩১. F W Robertson, Final Report of the Survey and Settlement Operations in the District of Bankura, Calcutta 1926, p. 92-94.

## চতুর্থ অধ্যায়

# ফুলকুসুমার ইতিহাস

### পরগণার পত্তন

পলাশী যুদ্ধে জয়ের পর বাংলায় ব্রিটিশ শাসন সংহত করার কাজ শুরু হয়। এতদিন প্রায় স্বাধীনতা ভোগ করা অরণ্যান্তরালের ভূমরাজ্যগুলিকে কঠিন রাজস্ব শৃঙ্খলে বাঁধার আয়োজন শুরু হয়। মেদিনীপুর রেসিডেন্ট গ্রাহামের নির্দেশে ১৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে জন এনসাইন ফারগুসন জঙ্গলমহলের সব ভূমরাজ্যগুলির নতুন করে দেয় ভূমিকর নির্ধারণ শুরু করেন ও অবাধ্য দেশীয় রাজাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান হাতে নেওয়া হয়। এবিষয়ে তাঁকে সাহায্য করতে সঙ্গী হন এলাকা সম্পর্কে অবহিত কার্তিকরাম ও রাজস্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ চন্দন ঘোষ। এই অভিযানে ফুলকুসুমার মত ক্ষুদ্র ভূম রাজ্যও কোম্পানীর রোষানলে পড়ে। ফুলকুসুমা রাজা সুন্দরনারায়ণ বার্ষিক ৩০০ টাকা দিতে রাজী হলেও কোম্পানী নেহাতই লবণ-রেশম-তাঁত বস্ত্রের বাণিজ্যকেন্দ্র ও জনপদ আনন্দপুর (মেদিনীপুরের কাছে) লুণ্ঠনে যুক্ত সন্দেহে ফুলকুসুমার রাজস্ব ৫০০ টাকাই নির্ধারিত হয় এবং লুণ্ঠনের অভিযোগে জরিমানা আদায়ের প্রয়াস জারি থাকে। এই ঘটনা প্রবাহ ফুলকুসুমাকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্র করে তোলে। ১৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই মার্চ মেদিনীপুরের রেসিডেন্ট গ্রাহাম আরোপিত রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় নিয়ে ফুলকুসুমা ও রাইপুর পরগণার লাগাতর বাধা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে অভিযানরত ফারগুসনকে লিখলেন, 'The Raipore and Fulkusma districts doubtless depend on the Province of Burdwan– but it appears somewhat mysterious and

inconsistent that they should reject our assistance for obtaining from them an increase.'

ফুলকুসুমা রাজ্য তুঙ্গভূম বিভাজনের ফলে সৃষ্টি হয় ১৫৯১ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ, প্রায় ৪০ শতাংশ তালুক নিয়ে। তুঙ্গভূমের প্রতিষ্ঠাতা নকুড় তুঙ্গের পঞ্চম পুরুষ গদাধর তুঙ্গের সময়ে এটি শ্যামসুন্দর তুঙ্গের অধীনে শ্যামসুন্দরপুর ও মুকুটনারায়ণ শাসিত ফুলকুসুমায় বিভাজিত হয়। ফুলকুসুমায় ব্রিটিশের রাজস্ব অভিযানের সময় রাজা ছিলেন সুন্দরনারায়ণ। বিভাজিত শ্যামসুন্দরপুর ও ফুলকুসুমার দায়িত্বে থাকলেন দুই ভাই যথাক্রমে লক্ষ্মীনারায়ণ দেব ও মুকুটনারায়ণ দেব।

ফুলকুসুমা রাজ্যের এই মুকুটনারায়ণ (১৫৯১) ও সুন্দরনারায়ণের(১৭৬৭) মধ্যবর্তী ১৭৬ বছরের তেমন ভাবে গ্রন্থিত হয়নি। অন্তত তিন-চার পুরুষের রাজা ও রাজত্বের হদিশ পাওয়া যায়নি। শ্যামসুন্দরপুরের রাজবংশের কালপঞ্জীর সাথে তুলনা করলে এই সময়কাল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কৃষি ও সেচের উন্নয়নে রাজাদের আন্তরিকতার অভাব ছিল না। তবে রাজস্ব নিয়ে কোন জোর জুলুম ছিল না। মোটের ওপর প্রজারা শান্তিতে বাস করত এবং রাজার প্রতি অন্ত্যজ মানুষদের আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। যা ইংরেজ আগমনের পরও বজায় ছিল। রাজারা এবং মোটের উপর প্রজারা ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী।

## রাজবংশ ও রাজ কাহিনী

তথ্যের অপ্রতুলতা সত্বেও বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া সংবাদের নিরিখে নির্মিত ফুলকুসুমার রাজপরিবারের তালিকা ও কাহিনী নিম্নরূপ।

**(১) রাজা মুকুটনারায়ণ :**

গদাধর সুন্দরনারায়ণ তুঙ্গদেউ (১৫৫৮-১৫৯৩)-এর রাজত্বের অন্তভাগে তুঙ্গভূমের বিভাজন ঘটে। গদাধর ছিলেন তুঙ্গভূমের প্রতিষ্ঠাতা নকুড় তুঙ্গের পঞ্চম অধস্তন পুরুষ। লক্ষ্মীনারায়ণ দেবের সাথে ভাই মুকুটনারায়ণের পারিবারিক বিবাদ সামলাতে রাজা গদাধর তাঁর মৃত্যুর দুই বছর আগে কনিষ্ঠ পুত্র মুকুটনারায়ণকে রসপাল-ফুলকুসুমা নামক বিভাজিত রাজ্যের ভার দেন ১৫৯১ খ্রিষ্টাব্দে। ফলে শ্যামসুন্দরপুরে বড় রাজকুমার লক্ষ্মীনারায়ণ দেব ও ফুলকুসুমায় ছোটকুমার মুকুটনারায়ণ দেবের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তুঙ্গভূমের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামসুন্দর ছত্রনারায়ণ তুঙ্গদেউ

(১৫৯৩-১৬২৮) ভৈরববাঁকির দক্ষিণে জমিদারির ৬ আনা ছেড়ে দিয়ে গড়খুল্ল্যা ত্যাগ করে উপরপাড়ায় (বর্তমান শ্যামসুন্দরপুরে) রাজবাটী তৈরি করেন। রাজবাটী স্থাপনের আগে কিছুকাল জগন্নাথপুর-ডামরসাঞ্চিতে অবস্থানকালে মুকুটনারায়ণ যে পুকুর খনন করেছিলেন তা মুকুটসায়র নামে এখনও পরিচিত। শ্যামসুন্দরপুরে স্থাপিত হয় গুপ্ত ঘর ও সুড়ঙ্গ সহ রাজ প্রাসাদ, কুল দেবীর (জগন্নাথ) মন্দির, শ্যামসুন্দর জীউ মন্দির, চন্ডী-দুর্গা সহ নাট মন্ডপ। ঘটে ব্রাহ্মণ-করণ-নামাতা-রজক-ডোমসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসতি। নয়টি বাঁধ—পুকুর সহ চাষের জমি তৈরি হয় রাজধানীর পরিসীমায়। এই রাজার সময়ে চালু হওয়া দুর্গা পূজা শুরু হত মিত্র বিষ্ণুপুর মল্ল রাজবাড়ীর তোপ ধ্বনি শুনে। এখান থেকেই বড় রাজকুমার (লক্ষ্মীনারায়ণ) রাজত্ব চালিয়ে যান।

আর মুকুটনারায়ণ কংসাবতী-তারাফেনী নদী মধ্যস্থ জঙ্গলভূমিতে নতুন রাজত্ব শুরু করেন। রাজ্যের অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি রসপালে প্রতিষ্ঠা করেন রাজধানী। রাজবাড়ির যেটুকু ধ্বংসাবশেষ আজও আছে তা থেকেও এই ভৌগলিক সুবিধা অনুমান করা যায়। পশ্চিম দিকের অন্দর মহলের সঙ্গে দু'টি গোপন কক্ষ পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছে। আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক সজল কান্তি মণ্ডলের মতে, পরবর্তীকালে সংযোজিত ওই দু'টি কক্ষে বিপ্লবীদের গোপন সভা বসত। শুধু বিপ্লবীরাই নয়, রাজপরিবারের প্রতিরোধে যোগ দিয়েছেন স্থানীয় লোহার, বাগদি, ভূমিজ, শবর প্রজারাও। দেশমুক্তির আন্দোলনে রাজাদের যোগদান এই নিম্নবর্গীয় প্রজাদের প্রাণিত করে। এদের হাতে তৈরি হয় বন্দুক-কামানের মত অস্ত্র। সম্ভবত রসপালের রাজা মুকুটনারায়ণের আমলে রাজবাড়ির কাছে জঙ্গলের ধারে নিষ্কর হাটের প্রবর্তন হয়, যেখানে শুধু বনজ সম্পদ বিক্রি হত। আজও প্রতি সোমবার সেই হাটের ধারা অক্ষুণ্ণ আছে। রসপাল রাজবাড়ির এই হাটটি প্রতি সোমবারে বসে। সোম দিয়ে (সোমা, সোমনাথ ইত্যাদি) যদি কোন গুরুজনের নাম হয়, গুরুজনের নাম সরাসরি উচ্চারণ না করার রীতি মেনে (গ্রাম্য বিশ্বাস, সরাসরি নাম উচ্চারণে পরিবারের অকল্যাণ হয়) দক্ষিণ বাঁকুড়ার মানুষজন তখন সেই গুরুজনকে বোঝাতে 'রসপাল হাটবার' শব্দটি ব্যবহার করতেন। এই শব্দবন্ধ তৈরি হওয়ার মধ্য দিয়ে রসপালরাজ প্রবর্তিত এই মেলার ব্যাপ্তি, জনপ্রিয়তা ও জনগ্রাহ্যতা বোঝা যায়। তেমনি খাতড়া সংলগ্ন এলাকার বধূরা মকর সংক্রান্তি (যদি মকর দিয়ে কারো নাম হয়) কথাটি বোঝাবার জন্য 'পরকুল' কথাটি ব্যবহার করে। এটি এই

এলাকার একটি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামের মকর সংক্রান্তির 'পরকুল উৎসবে' যোগদান ছিল সমগ্র খাতড়া মহকুমার। আজও রাজবাড়ির দুর্গা পুজো হয়, প্রচলন মেনে মোষবলিও হয়। বলির কাজ করেন শবর সম্প্রদায়ের মানুষেরা। পূজার জোগাড় করে শবর রসিক নামাতার পরিবার ও বংশধরেরা।

এই রাজারা আদিতে ছিলেন সোমবংশীয় তুয়ার শাখার ক্ষত্রিয়। কুলদেবতা ছিল কঙ্কালি চন্ডী। বাহন ঘোড়া শ্যামবর্ণ। দেবীর পাগড়ী আড়াই পেঁচ। অস্ত্র স্বাকেলা বা শূরহি।

রসপালে চৈত্র-বৈশাখ মাসে শিবের চড়ক ও গাজন এবং আশ্বিন মাসে পাঁচদিন ব্যাপী দুর্গাপূজা রাজানুকূল্যে আয়োজিত হত। রাজবাটীর কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কুলদেবতা কৃষ্ণবলরামের মন্দির, অনাদি শিবলিঙ্গের মন্দির ও দুর্গামণ্ডপ।[১]

### (২) সুন্দরনারায়ণ

এই মুকুটনারায়ণ (১৫৯১) ও সুন্দরনারায়ণের (১৭৬৭) মধ্যবর্তী ১৭৬ বছরের ইতিহাস তেমন ভাবে গ্রন্থিত হয়নি। অন্তত চার পুরুষের রাজা ও রাজত্বের হদিশ পাওয়া যায়নি। শ্যামসুন্দরপুরের রাজবংশের কালপঞ্জীর সাথে তুলনা করলে এই সময়কাল ও বিরতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সুন্দরনারায়ণের সময়কাল ছিল ঘটনাবহুল। তাঁর সময়ে ফুলকুসুমা রাজত্ব কোম্পানীর অধীনস্থ হয়।

১৭৬০ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সমর কর্তা জন এনসাইন ফারগুসনের নেতৃত্বে দক্ষিণ বাঁকুড়ার ভুমরাজ্যগুলিতে আধিপত্য বিস্তারের আশায় এক সামরিক অভিযান হয়। এই অভিযানে শ্যামসুন্দরপুর-ফুলকুসুমার ভূমিকর ধার্য হয় বার্ষিক ৫০০ টাকা (অখন্ড জমিদারির ৬০ শতাংশ শ্যামসুন্দরপুরের, মাত্র ৪০ শতাংশ রসপাল জমিদারির)। তবে রায়পুরের দুর্জন সিংহ যেমন আরোপিত বার্ষিক ভূমিকর ২৫০৯ টাকা দিতে অস্বীকার করেন, তেমনি ফুলকুসুমার রাজা একইভাবে বিদ্রোহী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এ সময় শ্যামসুন্দরপুরের জমিদার ছিলেন বীরকিশোর ছত্রনারায়ণ তুঙ্গ দেউ (১৭২৮-১৭৬৮) ও গঙ্গাগোবিন্দ সুন্দরনারায়ণ তুঙ্গদেউ (১৭৬৮-১৮০৮)। এরাও সম্ভবত বিদ্রোহে যোগ দেন। ব্রিটিশ শাসনের সূচনা পর্বে মেদিনীপুরের আনন্দপুরে কোম্পানীর বাণিজ্য কুঠি গড়ে ওঠে। নুনগোলা, রেশম ও তাঁতের কাপড়ের গুদামের এই কেন্দ্র একাধিকবার লুণ্ঠিত হয়। কোম্পানীর বদ্ধমূল ধারণা হয়, এগুলি করিয়েছেন ফুলকুসুমার রাজা। এই ধারণা থেকে রাজার উপর

কোম্পানী জবরদস্তি জরিমানাও আরোপ করে।

সন্ন্যাস বিদ্রোহীদের ফুলকুসুমায় আগমন ছিল আর একটি বড় ঘটনা। ১৭৭৩ সালে রাঢ়ের বিস্তৃত অঞ্চল সন্ন্যাস উপদ্রুত হয়ে পড়ে। ৩০০০ সন্ন্যাসী মল্লভূমে বেশ কিছু কাল অবস্থান করে। পরে ক্যাপ্টেন ফোবর্সের নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী এই সন্ন্যাসী দলকে বিষ্ণুপুর-রাইপুর-ফুলকুসুমা-শিলদা আলমপুর- গোপীবল্লভপুর পথে বিতাড়িত করে।[২] সুন্দরনারায়ণের আমলে এই সন্ন্যাসীদের সাথে রাজ্যবাসীর কোন বিরূপতা সৃষ্টি হয়নি বলে মনে হয়, কারণ রাজা ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী। তবে সন্ন্যাসীদল দ্রুত এই রাজ্য অতিক্রম করে চলে যায়।[৩]

**(৩) দর্পনারায়ণ বা ছত্রনারায়ণ**

১৮৩৩ সালে বরাভূমের রাজা গঙ্গানারায়ণ সিংহাসন চ্যুত হয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। তাঁর আন্দোলনকে ব্রিটিশরা গঙ্গানারায়নী হাঙ্গামা বলে অভিহিত করে। তুঙ্গভূমে এই আন্দোলনের অভিঘাত ছিল প্রবল। ফুলকুসুমার রাজা দর্পনারায়ণ ও শ্যামসুন্দরপুরের রাজা প্রতাপনারায়ণ এই হাঙ্গামার সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়েন। শ্যামসুন্দরপুরের মটগোদা সন্নিহিত জঙ্গলে গঙ্গানারায়ণ ঘাঁটি গাড়েন। মালিয়াড়া লুণ্ঠিত হয়। ছাতনা পরগণার অন্তর্গত বাঁকুড়া শহর অরক্ষিত হয়ে পড়ে। ফলে জোরদার ব্রটিশ অভিযান শুরু হয়। ব্রিটিশ সামরিক অভিযানে কোম্পানী সেনাদল শ্যামসুন্দরপুরের রাজা দ্বিতীয় আইঠু দেব ছত্রনারায়ণ তুঙ্গ দেউ (সাথে ভাই প্রতাপনারায়ণ) ও ফুলকুসুমার দর্পনারায়ণকে গ্রেপ্তার করে। প্রজাসাধারণের মনে ভয় সঞ্চার করতে এই দুই রাজাকে প্রকাশ্যে মটগোদা জঙ্গলে ফাঁসি দেওয়া হয়। এটি একারণে এখন রাজাকাটা জঙ্গল নামে পরিচিত। সম্ভবত দুই রাজার ফাঁসির কারণে লোকমুখে এমন নাম হয়ে গিয়ে থাকবে। ১৮৩৩ সালে বরাভূমের বিদ্রোহী নায়ক গঙ্গানারায়ণ যখন তুঙ্গভূমে আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন তাঁকে আশ্রয় নিতে দেখা গিয়েছিল শ্যামসুন্দরপুর রাজবাড়ী সন্নিহিত মটগোদার জঙ্গলের রাজাকাটা বনে। এই অপরাধে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রাজা দ্বিতীয় আইঠুদের ছত্রনারায়ণ তুঙ্গ দেউ (সাথে ভাই প্রতাপনারায়ণ) ও ফুলকুসুমার দর্পনারায়ণের রাজাকাটা জঙ্গলে প্রকাশ্য ফাঁসির আয়োজন করে।

## (৪) কালীপ্রসন্ন

বিংশ শতকের প্রারম্ভে ব্রিটিশ পুলিশ কর্তা চার্লস টেগর্টের অভিযানে ফুলকুসুমা আলোড়িত হয়ে ওঠে। পরিখা ঘেরা উচ্চভূমিতে ছিল ফুলকুসুমার রাজবাড়ী। সাথে কুলদেবীর মন্দির(জগন্নাথ মন্দির), দুর্গামন্ডপ, নাটমন্দির। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ভৈরববাঁকি নদী। সন্নিকটে হলুদবাড়ির জঙ্গল। সোজা পৌঁছে যাওয়া যায় বিপ্লববাদীদের গোপন কেন্দ্র ছেঁদাপাহাড়ে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমকালে ফুলকুসুমা রাজবাড়ী বিপ্লবীদের গোপন আশ্রয়স্থল ও অস্ত্রাগার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কলকাতা থেকে যেমন বিপ্লবীরা আসতেন, তেমনি এলাকার বিপ্লববাদীদের কেন্দ্রগুলির যোগসূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল ফুলকুসুমা ও অম্বিকানগরে রাজবাড়ী। হলুদবাড়ী জঙ্গলে চলত অস্ত্র প্রশিক্ষণ। শবর প্রজারাও এই প্রশিক্ষণে অংশ নিত। রাজ্যের কামারদের লাগান হত হাত-কামান তৈরির কাজে। বোমা তৈরির প্রশিক্ষণও হত। মালমশলা সংগ্রহ হত কলকাতার বিপ্লবীদের সহায়তায়। এ খবর পৌঁছে যায় রাজ্যের গোয়েন্দা প্রধান টেগর্টের কাছে।

১৯০৮ সালে চার্লস টেগর্ট হাতির পিঠে দুর্গম শ্যামসুন্দরপুর-ফুলকুসুমা অভিযান করলে বিদ্রোহী (শ্যামসুন্দরপুরের রাজা শ্যামনরায়ণের ভ্রাতা) তপননারায়ণ (ইনি বড়ঠাকুর নামে পরিচিত ছিলেন এবং অশ্বচালনায় ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ) খুন বা নিখোঁজ হয়ে যান। একই হাল হয় ফুলকুসুমার সুন্দরনারায়ণের ভাই কালীপ্রসন্নের। অস্ত্রের খোঁজে টেগর্ট ফুলকুসুমা রাজবাড়ীর দেওয়াল পর্যন্ত ভেঙে ফেলেন। নাটমন্দির গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনা রাজ পরিবারের মন ভেঙে দেয়। কুলদেবতার উপর জন্ম নেয় অভিমান। তখন থেকে জগন্নাথধাম পুরীযাত্রা হতে আজও বিরত থাকেন রাজপরিবারের সদস্যরা। অবহেলিত হয় জগন্নাথ আরাধনা ও রথযাত্রা।

বিপ্লবীদের নিয়মিত সাহায্য করতেন অম্বিকানগরের রাজা রাইচরণ ধবল আর রসপালের রাজা কালীপ্রসন্নদেব। ১৯০৮-এ কৃষ্ণনগর ফাস্ট ট্র্যাককোর্টে জবান বন্দি দেওয়ার সময়ে আলিপুর বোমা মামলায় অভিযুক্ত বিপ্লবী শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ জানান, ছেঁদাপাথরের প্রশিক্ষণ শিবিরে রসপাল রাজ পরিবারের সদস্যেরা নিয়মিত যোগ দিতেন। ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে রসপাল রাজবংশ পুরোপুরি জড়িয়ে ছিল সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে। বাংলার বিপ্লবীরা কলকাতা আর মেদিনীপুরের বাইরে যে সব জায়গায় গোপন আস্তানা তৈরি করেন, তার অন্যতম ছিল বাঁকুড়ার এই

ছেঁদাপাথর। অম্বিকানগরের অধীন এই ছেদাপাহাড়ে নিয়মিত যাতায়াত ছিল রাজপরিবারের সদস্যদের। গোপনীয়তা বজায় রেখে রাজপরিবারের সদস্যরা প্রায়দিন ছেঁদাপাহাড়ে অধিক রাত্রে গিয়ে ভোররাতে ফিরে আসার কারণে সম্ভবত বাহন হিসাবে ঘোড়া বা রণপার সাহায্য নিতেন। এসময় দুর্গাপূজা করতেন লড্ডুকা গ্রামের রামরতন ব্যানার্জী। ইনি দেবাশোল-শালকী গ্রামের চতুষ্পাঠী চালাতেন।

**(৫) বিদ্যানিধিনারায়ণ**

এই রাজাও নানাভাবে বিপ্লবীদের সাহায্য করতে থাকেন। অম্বিকানগরের রাজা রাইচরণ ধবলের সমকালীন ও বিপ্লবসাথী।

**(৬) শশাঙ্কনারায়ণ**

১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে তালুকের ইজারা গিসবর্ণ এ্যান্ড কোম্পানীর হাতে চলে যায়। অনেক টানাপড়েনের পর ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে পুরোপুরি ফুলকুসুমা জমিদারি কিনে নেন রামগড়ের বনোয়ারীলাল। রসপালের রাজা শশাঙ্ক নারায়ণ তুঙ্গ দেও-র আমলে এই জমিদারি চলে যায়। রাজবাড়িতে জগন্নাথদেবের কাঠের বিগ্রহ থাকাকালীন রাজত্ব চলে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ ও অভিমানী হন রাজা শশাঙ্ক নারায়ণ তুঙ্গ দেও। রাগে রাজবাড়িতে জগন্নাথদেবের পুজো বন্ধ করে দেন। এমনকী রাজপরিবারের কেউ যেন আর পুরী না যান তারও আদেশ দিয়েছিলেন। তারপর বন্ধ করে দেন রথযাত্রা। অতীত রাজাদেশ মেনে আজও রাজপরিবারের সদস্যরা পুরীধাম দর্শন থেকে বিরত থাকেন। রাজপরিবারের বর্তমান আবাসস্থল নমোপাড়ায় একটি টিনের ভগ্ন চালায় রক্ষিত আছে পুরীধাম থেকে আনীত রাজপরিবার প্রতিষ্ঠাকালের প্রায় অক্ষত দারুমূর্তি বলভদ্র, অপূজিত বিষ্ণু শালগ্রাম শিলা, ধাতুর দুর্গা ও পদযুগল চিহ্ন বিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড। রাজবাড়ি সংলগ্ন দালান মন্দিরে রূপচণ্ডীর মর্যাদায় দুর্গাপূজা হত। অষ্টমীর সন্ধিক্ষণে এখানে নরবলি হত। যোগান দিতে রামচন্দ্রপুর ও শালবনির শবররা। এরা পয়লা মাঘ এখানে জাটিয়াসিনির পূজা করে ও জগন্নাথ সেবায় অংশ নেয়।[৪]

## ভূমি রাজস্বের ঊর্ধমুখিতা

১৭৬০ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শ্যামসুন্দরপুর ও ফুলকুসুমার যৌথ রাজস্ব নির্ধারিত হয় ৫০০ টাকা। এই ভূমিরাজস্ব আদায় ও আধিপত্য নিশ্চিত করতে

কোম্পানীর কমান্ডার জন এনসাইন ফারগুসন রাঢ় অঞ্চলে বড় সামরিক অভিযান করেন। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ৩৫৭৬৩.৫ একর পরিমিত ফুলকুসুমার রাজস্ব দাঁড়ায় ২১২ টাকা ৯ আনা ৮ পয়সা। রবার্টসনের হিসাবে ১৯১৭-২৪ সময়কালে রাইপুর থানা অঞ্চলে (যেখানে ফুলকুসুমা তালুক অবস্থিত) রাজস্ব দাঁড়ায় একর প্রতি ১৪ আনা ৮ পয়সা। অনাবাদী দক্ষিণ রাঢ়ের এই তালুকগুলিতে ক্রমবর্ধমান করভার রাজপরিবারগুলিকে ধ্বংশের কিনারায় নিয়ে যায়। ১৮৯২ সালে সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর শ্যামসুন্দরপুরের জমিদারি কিনে নেন সূর্যাস্ত আইনে। ১৯০৯ সালে একই ভাবে কিনে নেন ফুলকুসুমার জমিদারি। এর আগে ১৮৭০ সালে এটি মেসার্স গিসবর্ণ এ্যান্ড কোং-এর হাতে গিয়েছিল।

## সুখনিদি স্বত্ব ও চুয়ার বিদ্রোহ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সমস্ত বাঁকুড়া জুড়েই ভূম রাজাদের আনুকূল্যে প্রজা বিদ্রোহ ঘটতে থাকে। এতে সুস্থ রাজস্ব ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে থাকে। অনেক সময় বিভিন্ন স্থানীয় সর্দারদের উপদ্রবেও রাজস্ব আদায় বস্তুত স্তব্ধ হয়ে পড়ে। রাইপুর, অম্বিকানগর সহ দক্ষিণ বাঁকুড়ার ভূমরাজ্যগুলি ছিল এসময় সর্দার উপদ্রুত। সুপুর-শ্যামসুন্দরপুর-ফুলকুসুমার মত ছোট জমিদারিগুলো এই রাজস্ব আদায়ের ক্ষতি এড়াতে কুইলাপাল তালুকের সাহায্য নেয়। বস্তুত বীর সিংহ-বাহাদুর সিংহ-সুবলা সিংহের মত কুইলাপালের দলপতিরা এই সব উপদ্রব থেকে এই উপদ্রুত রাজাদের রক্ষা করতেন। এতে কুইলাপালের অবস্থাগত সুবিধা ও গেরিলা কায়দার বীরত্ব কাজে লেগেছিল। বিনিময়ে কুইলাপালকে দিতে হত ‘সুখনিদি’ স্বত্ত্বের অর্থ। অর্থাৎ এই রাজাদের সুখে নিদ্রা যাওয়ার বিনিময় মূল্য।

ফুলকুসুমার রাজাদের ক্রমিক বংশ তালিকা আজও অমিল। নিচে তুলনীয় ঘটনাক্রমের অনুষঙ্গে ও সন্নিহিত শ্যামসুন্দরপুর, সিমলাপাল, রাইপুরের রাজাদের কালসীমার সাথে মিল খাইয়ে একটি ফুলকুসুমা রাজবংশ তালিকা নির্মাণের চেষ্টা করা হল।

| ফুলকুসুমা রাজ পরিবার | শ্যামসুন্দরপুর রাজপরিবার | সিমলাপাল রাজপরিবার | রাইপুরের রাজবংশ |
|---|---|---|---|
| | নকুড় তুঙ্গ (১৪৭৩-১৫০৩) | শ্রীপতি মহাপাত্র (১৪৬৩-১৪৯৪) | |
| | চৈতন্য (১৫০৩-১৫২৮) | মাধব (১৪৯৪-১৫২৪) | |
| | দামোদর (১৫২৮-১৫৫৮) | জগন্নাথ (১৫২৪-১৫৪৫) | |
| গদাধর সুন্দরনারায়ণ (১৫৫৮-১৫৯৩) | গদাধর সুন্দরনারায়ণ (১৫৫৮-১৫৯৩) | বাসুদেব (১৫৪৫-১৫৫৮) ও বলরাম (১৫৫৮-১৫৮০) | |
| মুকুটনারায়ণ দেউ (১৫৯১-) | শ্যামসুন্দর ছত্রনারায়ণ (১৫৯৩-১৬২৮) | মোহনদাস (১৫৮০-১৫৯৩) | |
| অজ্ঞাত | জনার্দন (১৬২৮-৫৮) | চিরঞ্জীব (১৫৯৩-১৬১৫) | রঘুনাথ সিংহদেব (১৬৫৫) ফতে |
| অজ্ঞাত | আইঠু (১৬৫৮-১৬৯০) | লক্ষ্মণ (১৬১৫-১৬৫২) | রঘুনাথ ধরমসিংহদেব- কৃষ্ণসিংহদেব- অর্জুন সিংহদেব |
| অজ্ঞাত | রামচন্দ্র (১৬৯০-১৭২৮) | কৃষ্ণদাস (১৬৫২-১৬৯৩) | দুর্জন সিংহদেব (১৭৬৭-১৮০০) |
| সুন্দরনারায়ণ (১৭৬৭) | বীরকিশোর (১৭২৮-৬৮) | রাধানন্দ (১৬৯৩-১৭২৮) | ফতে সিংহদেব |
| অজ্ঞাত | গঙ্গাগোবিন্দ (১৭৬৮-০৮) | বলরাম (১৭২৮-১৭৭৫) | বীর সিংহদেব (১৮৪১) |
| দর্পনারায়ণ দেউ (১৮৩৩)/ছত্র | আইঠু (২য়) (১৮০৭-৩৭) | জগন্নাথ (১৭৭৫-১৮২০) | হরিহর সিংহদেব রাজা রঘুনাথ ১৮৮০ |

| ফুলকুসুমা রাজ পরিবার | শ্যামসুন্দরপুর রাজপরিবার | সিমলাপাল রাজপরিবার | রাইপুরের রাজবংশ |
|---|---|---|---|
| মুকুন্দনারায়ণ (১৯০৮) (২য়) | বলভদ্র (১৮৩৭-৬৩) | চিরঞ্জীব (১৮২০-১৮৩১) | ইন্দ্র সিংহদেব (১ম রাণী উজ্জ্বল কুমারী, ২য় রাণী নিশা কুমারী)- লাল সিংহদেব |
| সুন্দরনারায়ণ (১৯০৮) (২য়) | বীরকিশোর (২য়) (১৮৬৩-৯৩) | নটবর (১৮৪৪-১৯০৫) | বলভদ্র সিংহদেব (১৯১১) |
| কালিপ্রসন্ন (১৯০০) | গৌরীপ্রসাদ (১৮৯৩-১২) | মানগোবিন্দ (১৯০৫- জগবন্ধু (১৯০৫-১৯০৯) | কালীপদ সিংহদেব |
| শশাঙ্কনারায়ণ? (-১৯১৫-) | শ্যামনফর (১২-৩৩) | মদনমোহন (১৯০৯-১৯২৭) | চক্রধর সিংহদেব |
| বিদ্যানিধি | কানাই (১৯৩৩-৭৬) | শ্যামসুন্দর (১৯২৭-১৯৫৫) | শশধর সিংহদেব |
| সুশান্ত নারায়ণ দেও | গৌরীশঙ্কর | কল্যাণী/দেবপ্রসাদ | হরিপদ সিংহদেব মধুসূদন/ গোপীনাথ |

## শিক্ষা ও সংস্কৃতির খতিয়ান

অন্যান্য ভূমরাজ্যের মতো ফুলকুসুমাতেও আধুনিক শিক্ষার আয়োজন সম্পন্ন হয় ১৯২৬ সালে, বাঙ্গলা মাধ্যমের উচ বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে। সাধ্যমতো সবক্ষেত্রেই স্থানীয় জমিদাররা এই উদ্যোগে সামিল হতেন। ১৯৬৪ সালে ফুলকুসুমায় শুধুমাত্র বালিকাদের জন্য একটি বিদ্যলয় গড়ে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠান দুটির সাহায্যে এলাকায় আধুনিক শিক্ষার আবহ নির্মাণ সম্ভব হয়। এর আগে দেবাশোল, শালবনী গ্রামে রাজানুকূল্যে চতুষ্পাঠী খোলা হয়েছিল। এর শেষ পণ্ডিত ছিলেন লুড়কা গ্রামের রমরতন ব্যানার্জী। ১৯১১ সালে জেলার টোলগুলির জন্য জেলা বোর্ডের অনুদান ছিল ৯৬০ টাকা।[৫]

## রসপালের লোকজীবন ও বাঘুৎ পূজা

ফুলকুসুমা (রসপাল) সহ রাঢ় বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় উৎসব 'বাঘুৎ'। পশ্চিম সীমান্তে বাংলায় পুরুলিয়া জেলার প্রায় সর্বত্র, বাকুড়া জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ, পুরো পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা এবং পশ্চিম বাংলার সংলগ্ন বিহার ও ওড়িশায় সর্বাধিক পূজিত বাঘ দেবতার নাম 'বাঘুৎ'। অন্তত পাঁচশ গ্রামে তার থান। বাঁকুড়া জেলার রাইপুর থানার ফুলকুসুমা মন্ডলডিহা, কাশুড়ি, রসপাল, শালপাতড়া, মেলেড়া, কমলপুর, মগুলকুলি, দুধ্যা, লেদরা, বড়াপচা, বরাগাড়ি, ঠাকুরবাড়ি, রানিবাঁধ থানার ফুলঝোর, ছেন্দাপাথর, বনলতা, পুরুলিয়া জেলার বন্দোয়ান, পুঞ্চা নামোপাড়া, লালমডিহি কুচিয়া, মানবাজার এবং মেদিনীপুর জেলার বিনপুর, বাঁকড়া, এটলা, বেলপাহাড়ি, বাঁশপাহাড়ি, শিলদা প্রভৃতি অঞ্চলে বাঘুৎ এর থানগুলির দেখা মেলে। শালতোড়া থানার বারকোণা গ্রামে যেখানে ভক্তদের প্রাত্যহিক সমাগম হয়, সেখানে বাঘুৎ মেলারও আয়োজন করা হয়।

বাঘুৎ এর মূর্তিটি বেশ আকর্ষণীয় ও বিস্ময়কর। বারো থেকে যোল ইঞ্চি করে কয়েকটি বাঘ যেন সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে গর্জনরত। পাগুলি আবৃত। চোখ দুটি গোলাকার, কানগুলি খাড়া। সব সময় এর পূর্ণাঙ্গ অবয়ব পূজিত হয় তা নয়। কেবল প্রস্তর খন্ড। তাতে বাঘের প্রতীকী দেহাংশ অঙ্কন করেও পূজা করা হয়।

প্রধানত কোনো পুরোনো গাছের গোড়ায় তাঁর অবস্থান। কোথাও কোথাও ভক্ত গ্রামবাসীরা খড়ের চালা তৈরি করেছেন। কোনো কোনো স্থানে ইট-সিমেন্টের ছোট ছোট বেদিও তৈরি হয়েছে ও তাতে বাঘ দেবতাকে প্রোথিত করা হয়েছে। বেদী থাকলে বাঘ দেবতা থাকেন বেদীর উপরে, চারপাশ ভর্তি থাকে ভক্তদের নিবেদন করা মাটির ছোট ছোট বাঘ। এই বাঘ মূর্তিগুলি তৈরি করেন স্থানীয় কুমোর সম্প্রদয়ের মানুষরা। কোনো কোনো স্থানে পুজোর দিনে ডোকরা শিল্পীদের নির্মিত ধাতুর তৈরি বাঘও বসানো হয়। ধাতু মূর্তির প্রয়োজন হলে তৈরি করেন কর্মকারেরা। ফুলকুসুমা গ্রামের সূত্রধর পরিবার কাঠের বাঘ বানিয়ে দেয়।

সারা দক্ষিণ বাঁকুড়ার সমস্ত অনুন্নত সমাজ তথা শ্রমিক মুনিষ শ্রেণী বাঘ দেবতার পুজো করে। পূজারি কাজ করেন পুরুষানুক্রমে। তাঁরা নিজ নিজ সমাজ থেকে পূজারি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কোথাও ব্রাহ্মণ পূজারি নেই। অর্থাৎ এ আরাধনা একান্তই অনার্য ও অন্ত্যজ শ্রেণীর। পূজার মন্ত্রও কিছু নেই। বছর ভর বিভিন্ন পূজা লেগে থাকে। যেমন পূজা-রোহিনী (১৩জোষ্ঠ), দশহরা, অম্বুবচী, ঝাঁপন-সংক্রান্তি

(শ্রাবণের শেষ দিন), ডাকসং (আশ্বিনের শেষ দিন) এবং এখান (১মাঘ)। তবে মানসিক থাকলে যে কোনো মঙ্গল বা শনি বারে তা পূর্ণ করার অনুষ্ঠান হয়।

পুজোর নৈবেদ্য তেমন কিছুই নয়। কিন্তু কালো ছাগ বা পায়রার রক্ত চাই-ই-চাই। তবে সঙ্গে চাই কোনো পশুর (ছাগ-মেষ বা গাভীর) নির্জলা দুধ। আর থাকে দই চিঁড়ে, গুড়পাটালি ও গুড়ের নাড়ু। আধুনিক ভাবনার অগ্রগতির সাথে চালু হয়েছে প্রদীপ প্রজ্বলন, ধূপ-ধুনা, ঘি, মধু, ফলমূল, এমনকি মিষ্টি ভোগ। বাঘুৎএর পুজোয় উল্লেখিত রক্ত সংগ্রহ বাধ্যতামূলক। যদি কোন বছর কালো পশু-পাখি সংগ্রহ করতে না পারা যায়, তখন পূজারিকেই তার বুক থেকে তিন ফোঁটা রক্ত দিয়ে পূজা কাজ সম্পন্ন করেন। 'বাঘুৎ'কে ভক্তরা বাঘের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলে মনে করে। সর্পদেবী মনসা আরাধনার মাধ্যমে যেমন সাপের ভয় থেকে মুক্তি মেলে, তেমনই বাঘুৎও সারাদেশের বাঘ সমাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন, ভক্তদের রক্ষা করেন।

রাঢ়ের জঙ্গলে অসংখ্য শিকারজীবী ও বনাঞ্চলবাসী বাঘুৎ সম্পর্কে এমনই ধারণা পোষণ করেন। স্পষ্টতই ফুলকুসুমার মত জনপদে বাঘের উপদ্রব একসময় যথেষ্ট ছিল ও এর থেকে পরিত্রাণ পেতেই বাঘ পুজোর ধারণা আসে।

বাঘুৎ-এর পুজো নিয়ে এমন বিশ্বাসও আছে যে সঠিক পুজোয় বাঘ দেবতা সন্তুষ্ট হলে, শুধু মানুষ কেন, কোনো পশুকেই বাঘে খাবে না। এই বিশ্বাসে অনেক ভক্ত মন্ত্রপুত মাদুলি পশুদের গলায় ঝুলিয়ে দেয়, কেউবা গোয়ালে টাঙিয়ে রাখে। অনেকে বাঘ থেকে সকলকে নিরাপদ রাখতে পাঁঠা বলির মানসিক রাখেন।

বাঁকুড়ার ছেঁদপাথর অঞ্চলে ফুলঝোর একটি অনন্য ঝর্ণাধারা। অসংখ্য মানুষ সেই ঝর্ণার জল পান করে। ঝর্ণার পাশেই আছে এ প্রস্তর নির্মিত 'বাঘুৎ'। তিনি কোনো রক্তই চান না। পথচারীর কাছে তিনি সম্মান চান। তাই একটি করে ছোটো প্রস্তরখন্ড দিলেই তিনি সন্তুষ্ট। ভক্তদের এমন পাথরের নৈবেদ্য জমে জায়গাটি ছোটো পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে গেছে। সন্নিহিত সড়কে গোরুর গাড়ীর বিভ্রাট হলে বা গোরু মোষের অসুখ করলে, ভক্তরা তাঁর নামে 'তামাকু' (মানসিক) দেয়। বর্ণিত বাঘুৎটি 'গুটি-বাঘুৎ' নামে পরিচিত। গুটি মানে গোল পাথরখন্ড।

বাঘুৎ সম্পর্কে নানা সমাজে নানা লোক বিশ্বাস। তাঁকে নিয়ে নানা লোক গাথা। বাঁকুড়ার রাইপুর থানার কমলপুরে একটি পশুপালক সম্প্রদায়ের নাম রাজোড়। 'রায়' এদের উপাধি। এরা বাড়িতে বাড়িতে গাভীপালন করে। পাশের গ্রামের গৃহস্থ

বাড়িতে দুধ দেয়। এদের পারিবারিক দেবতা বাঘুৎ। প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতেই সিজ মনসার গাছ আছে। তার তলায় বাঘুৎ পূজা পান হাতিঘোড়া রূপে। নির্জলা দুধই তাঁর নৈবেদ্য। রক্ত লাগে না। আবার মোট পঁচিশ পরিবার মিলে এরা 'এখ্যান' দিনে এর সাড়ম্বরে পুজো করে। পিঠে দেয়। পিঠে বলতে সিম-পিঠে, লাউপিঠে, মাছের পিঠে, ছাগল-মাংসের পিঠে। অধুনা কাকড়া পিঠেও দেওয়া হচ্ছে। 'গড়গড়ে' বা 'পুরপিঠে' তো থাকেই। একদা পয়লা মাঘ এদের সমাজের মুরুব্বিরা শিকারে বেরোতেন। প্রবীণরা বলেন বাঘুতের প্রসাদ যেহেতু দুধ, দুধে জল মিশলেই তিনি সর্বনাশ করে ছাড়বেন। তাই গ্রামের রাজোড় সম্প্রদায় কখনও দুধে জল মেশায় না। এই সম্প্রদায় এখন পশুপালন বৃত্তি ছাড়ার মুখে। কিন্তু যারাই দুধ বিক্রি করে, তাদের দুধ সত্যিই আজও অবিমিশ্র খাঁটি রয়ে গেছে। অবশ্যই বাঘুৎ দেবতার মহিমায়।[৫]

পয়লা মাঘের এখ্যান উৎসব, পৌষসংক্রান্তির 'আগুন সন্ন্যাসব্রত' ফুলকুসুমায় আয়োজিত হয়। মানুষ মুখ ও বাঘ দেহের 'কালামহাদান' গ্রাম দেবতা আছে গ্রামে যার ধাতু নির্মিত চোখ আছে। আর গ্রামে আছে বুড়োশিব ও বাবাঠাকুর।[৬]

## ফুলকুসুমার পতন

১৮৭০ সালে ঋণগ্রস্ত রাজাকে সাহায্য নিতে হয় মেদিনীপুরের ব্যবসায়ী গঙ্গানারায়ণ-বিপিন পালের। এদের চালাকিতে সে বছর জমিদারি গিসবর্ণ কোম্পানীর অধীনে চলে যায়।[৭] ১৯১৫ সালের মধ্যে ফুলকুসুমা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই বছরই কোর্টের ডিক্রি বলে নিলাম অনুষ্ঠিত হলে রামগড়ের রাজা বনোয়ারীলাল এটি কিনে নেন। পতন ঘটে প্রাচীন এক রাজবংশের।

## ফুলকুসুমা (রসপাল) রাজবংশের পতনের ঘটনাক্রম

ব্রিটিশ নথিতে ফুলকুসুমা (রসপাল) রাজ পরিবারের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হল দর্পনারায়ণ, তাঁর পুত্র চৈতন্যনারায়ণ। পরবর্তী রাজা মুকুন্দনারায়ণ। তারপর রাজা হন সুন্দরনারায়ণ। শেষ রাজা কালীপ্রসন্ন ও তার পুত্র বিদ্যানিধি। এর পরবর্তী ও বর্তমান প্রজন্ম সুশান্তনারায়ণ ও পুত্র চুনীলাল।

ঔপনিবেশিক শাসনের অভিঘাতে এই প্রাচীন রাজধারা একদম নিঃশেষ হয়ে যায়। দর্পনারায়ণের সময় (১৭৯০ সালের অনেক আগে থেকেই তিনি রাজা ছিলেন)

থেকেই ঔপনিবেশিক অভিঘাত অনুভূত হতে থাকে। ১৭৯০ সালের দশশালা বন্দোবস্ত, ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছিল। অন্যান্য জমিদারদের মত ফুলকুসুমার রাজা দেবোত্তর সম্পত্তি প্রদানের মাধ্যমে অবিঘ্নিত দেবসেবা নিশ্চিত করেছিলেন। খড়ের চালায় মাটির ঘরে অধিষ্ঠিত গৃহদেবতা বলরাম জীউয়ের ১২ আড়া ধানের নিত্যসেবার জন্য প্রয়োজনে ১০০ বিঘা জল জমি নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। গাছের তলায় অধিষ্ঠিত সোনার চোখ ও চারকোণা প্রস্তর খন্ডে বিরাজিত কালা মহাদানের জন্য দেবোত্তর ছিল ৫০ বিঘা জমি। এছাড়া যুবরাজের খরপোশের রাখা ছিল জন্য হরিণবাঁধ মৌজায় ২৫০ বিঘা ও রসপালে ৫০ বিঘা বাস্তু ও জমি। ১৭৯৩ সালে দীক্ষাগুরু খড়দহ নিবাসী গোবিন্দপ্রাসাদ গোস্বামীকে দেওয়া হয়েছিল খেঁকড়াবাঁধ, উপরবাঁধ মৌজার ৪০ বিঘা জমি ও কাদাডিহা, কীউরশোল, পড়াশী ও চাঁদবিলা মৌজা। রাজপরিবারের কুলগুরু ছিলেন হরিশ্চন্দ্র গোস্বামী। পরে হরিশ্চন্দ্র পুত্র পূর্ণ গোস্বামীও কুলগুরু হিসাবে কাজ করেছিলেন। তিনি খড়দহ থেকে চন্দ্রকোণার বসনচোরা গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। কুলদেবতা গোপাল জীউয়ের সেবা পূজা, দোল-জন্মাষ্টমী, আশ্বিনী পূজা(দুর্গা পূজা) নির্বাহের জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি হিসাবে নির্দিষ্ট ছিল পাচামি, কেন্দুয়া কাগডিহা সহ বেশ কিছু মৌজা। রানীদের খরপোশের জন্য চিহ্নিত হয়েছিল নাকালা, মডখুল্যা ও ধাধাকিডাঙ্গা মৌজার ৯৫ বিঘা জমি।[৮]

পূণ্যাহ অনুষ্ঠান পালিত হত বিচিত্র রীতিতে। অনুষ্ঠান শুরু হত ইন্দ্র দ্বাদশী তিথিতে। চলত তিন দিন ধরে। রসপালে পূণ্যাহ অনুষ্ঠান 'শূন্য' নামে সমধিক পরচিত। এই পূণ্যাহ অনুষ্ঠান মূলত প্রজাদের তরফে রাজাদের দেয় পরিশোধের অনুষ্ঠান। এমন অনুষ্ঠানে আদায় হত ৭৫ টাকা থেকে ১২৫ টাকা। তবে ক্রমে পূণ্যাহ অনুষ্ঠানে দেয় টাকা রাজস্বের অতিরিক্ত রাজার ব্যক্তি আয় হয়ে দাঁড়ায় এবং রায়ত প্রতি এর হারও ঠিক করে দেওয়া হয়। প্রথম দিনে শতাধিক রায়ত শূন্য প্রদান করত। বাকিরা পরের দুই দিনে। রাজা নিজেই অর্থ গ্রহণ করতেন। এর জন্য কোন রসিদও দেওয়া হত না। একজন রাজকর্মচারী সমস্ত আদায়ের খতিয়ান হিসাব খাতায় লিখে রাখত। রায়তদের পূণ্যাহ জমার বিনিময়ে দেওয়া হত ধুতি, গামছা, মিঠাই ও পান। ১৯১৩ সালে উমেশচন্দ্র ঘোষ দেয় ২ টাকার বিনিময়ে পেয়েছিলেন একটি ধুতি ও আটটি মিঠাই। সেদিন আর রায়ত উপস্থিত ছিলেন কালীপদ সাহু, নরসিংহ দত্ত, দিবাকর সাহু, হারাধন সাহু, ফকির তপাদার সহ অনেকে। হিসাব রাখছিলেন শরৎ দত্ত। বিশ্লেষণ

করে দেখা যায় আট আনা 'শূন্য' দাতা পেতেন চার হাতি গামছা, দুই টাকা 'শূন্য' দাতাদের জন্য শিরোপা ছিল ২ টি আট হাতি ধুতি ও ৬ টি মিঠাই। ১৯১৩-১৪ সালে বিষ্ণুচরণ মন্ডল আট আনা 'শূন্য' দিয়ে পেয়েছিলেন গামছা ও মিঠাই।[৯] এই প্রসঙ্গে রামগড়ের রাজার ফুলকুসুমায় পূণ্যাহ অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা যায়। রসপালের রাজারা নানাভাবে রামগড় রাজের সাহায্যভোগী হয়ে পড়েন। ফলে ফুলকুসুমা পরগণায় তাদের প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৮৯১ সালে ২৭ শে মাঘ উদয় ও মদনমোহন মাঝির জমি কিনে ফুলকুসুমা গ্রামে রামগড়ের জমিদার বনোয়ারীলাল সিংহ সাহস রায় কাছারি বাড়ি তৈরি করেন ও ফুলকুসুমা রাজাদের অনুকরণে পূণ্যাহ অনুষ্ঠান আয়োজন শুরু করেন। বনোয়ারীলালের পিতা চন্দ্রমোহনের আমল থেকেই রসপালরাজের সাথে তাঁদের খাতক-মহাজন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বনোয়ারীলালের পুত্র নগেন্দ্রনাথও এই ফুলকুসুমার কাছারি বাড়ির প্রতিষ্ঠান বজায় রেখেছিলেন।[১০] জনৈক শ্রীকান্ত বিশ্বাস ছিলেন বক্সী বা কোষাধ্যক্ষ-সহকারী নায়েব এবং সূর্যকান্ত দাস নামের এক শ্রেষ্ঠী ইজারাদার ছিলেন মোহরা (১৯১৪-১৯১৭ সালে মোহরা, পরে ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত নায়েব)। রবার্টসনের রাজস্ব সমীক্ষার সময় রায়তদের সাথে মিলে এরা রামগড়ের এস্টেটের রাজস্ব ক্ষতি করে বিকৃত নথি তৈরিতে মদত দিলে 'বাঁকুড়া দর্পণ' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে তিনি এই দুই কর্মীকে বরখাস্ত করেন।[১১]

ফুলকুসুমা প্রশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ঘাটোয়ালী প্রথা। ব্রিটিশ নথি থেকে লগদা ও সিরসা মৌজায় দুটি ঘাটের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯২৪ সালে লগদা ঘাটের ঘাটোয়াল ছিলেন কীর্তিবাস ঘোড়ুই ও সিরসা ঘাটের ঘাটোয়াল ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ রায়। লগদা ঘাটের পঞ্চকী জমা বাবদ কীর্তিবাস ঘড়ুই আদায় দিতেন ৫ টাকা ৫ আনা। সিরসা ঘাটের জন্য লক্ষ্মীনারায়ণ রায় জমা করতেন ৬ টাকা ১৩ আনা।[১২] ১৮৮৫ সালের রামগড় রাজ বানোয়ারীলালের ঋণ অনাদয় জনিত মামলার আদেশ কার্যকর করার মামলা নং ৬৩ রূপায়িত হয় ১৯০২ সালের রসপাল জমিদারি অধিগ্রহণের সময়, যখন এই মৌজা দুটি ১১২৯ ও ১১৪০ নং তৌজিতে রূপান্তরিত হয়। ফুলকুসুমা পরগণায় আরেকটি বিশেষ ঘটনা ছিল 'মহাত্রাণ' ভূমি। এমন জমির অধিকারী ছিল পূর্ণচন্দ্র কর্মকার, প্রতাপ কর্মকার, প্রাণগোবিন্দ কর্মকার ও নীলাচল কর্মকার সহ অনেকে। সাধারণত শূদ্র বা দাসকে প্রদত্ত জমিকে মহাত্রাণ জমি বলা হয়।[১৩] স্পষ্টতই এ ছিল রাজাদের কাছে কর্মকারদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের স্বীকৃতি। এই অরণ্যরাজ্যে বন্যপশু ও দস্যুদের হাত থেকে রক্ষা পেতে অস্ত্র তৈরিতে

কর্মকারদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। পরে বিপ্লবী কর্মধারায় রসপাল রাজবাড়ি জড়িয়ে পড়লে বিপ্লবীদের অস্ত্র তৈরিতে এদের কাজে লাগান হয়।

দর্পনারায়ণের সময়ে উপরোক্ত রীতি ও বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে রাজ্য পরিচালনা নিজস্ব গতিতে চললেও ঔপনিবেশিক ঘূর্ণাবর্তে পরবর্তী রাজা চৈতন্যনারায়ণের অপরিণামদর্শী অমিতব্যয়িতার ফলে রাজ্যের অগ্রগমন টালমাটাল হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সময়ে ঋণগ্রস্ত রাজাকে ধার দিয়েছিলেন সুখবন্ধু মিশ্র, সৃষ্টিধর চৌধুরী, মহম্মদ হোসেন খান, নবাবদী খান, আব্দুর রহিম খান, মামুদ খান, মীর ওয়াজিদ আলি খান, রায় ইন্দাদ খান, শোভন খান, অয়াজেদ খান, গৌর চাপরাশী, ব্রজমোহন খান, ঈশানচাঁদ খান সহ অনেকে। খাতক রাজার বিরুদ্ধে বহু সংখ্যক মহাজন টাকা ফেরতের মামলা করলে মহামান্য আদালত সমগ্র ফুলকুসুমা পরগণা খাস তহশীলে বাজেয়াপ্ত করে রাখার নির্দেশ দেন এবং মুকুন্দনারায়ণকে পাওনাদারদদের বকেয়া মিটিয়ে জমিদারির উপর অধিকার ফিরে পাওয়ার শর্ত দেন। ১৮৮৪ সালের ৭ ই অক্টোবর অন্য ঋণদাতাদের সাহায্যে নতুন রাজা পিতার দায় মিটিয়ে রাজ্যাধিকার ফিরে পান।[১৪]

মুকুন্দনারায়ণ দৌহিত্র বংশের সূত্রে শিলদা জমিদারির অংশ পান ও মেদিনীপুর-মীরবাজারের মহাজন ভাতৃদ্বয় গঙ্গারাম-রামচাঁদ দত্তের সংস্পর্শে আসেন। ঋণগ্রস্ত রাজা গঙ্গারাম-রামচাঁদের মহাজনী প্রলোভনে পড়ে নিজের সর্বনাশ তরান্বিত করেন। এরা মহাজনী ঋণের বিনিময়ে জমিদারির উপর পুরো কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। ১৮৬১ সালের ২৯ শে শ্রাবণ রাজাকে বোকা বানিয়ে অসৎ উপায়ে জমিদারির দুটি পত্তনির মালিকানা হাসিল করেন। এমনকি যুবরাজ সুন্দরনারায়ণকে বশে রাখার জন্য গঙ্গারাম দৈনিক এক টাকা করে হাত খরচা দিতেন। কথা না শুনলে এই ভাতাও বন্ধ করে রাখতেন। বেশির ভাগ দিন তিনি রসপালেই অবস্থান করতেন এবং রাজকোষের হিসাব পরীক্ষা করতেন। তিনি না থাকলে সাত ও আট টাকা মাস মাহিনাতে রাখা একান্ত অনুগত কর্মী গোলাম বিশ্বাস ও গদাই সেন রাজকোষের উপর নজর রাখতেন। রাজাকে বশে রাখার জন্য তাঁরা নিজের অনুগত রামমাধব চট্টোপাধ্যায়কে রাজ পুরোহিত হিসাবে নিয়োগ করাতে সফল হন।[১৫] সেই সময় মহাজনদের জমিদারের উপর এমন প্রতিপত্তি বোঝা যায় রাইপুরের রাজের উপর মহাজন শ্রীনাথ সাহুর একই একম প্রতাপ ও প্রভাব দেখে। তাই সহজেই জালিয়াতির সাহায্য নিয়ে রাজাকে দিয়ে দুটি বন্ধকনামা খত সম্পাদন করিয়ে নেন শ্রীনাথ।[১৬]

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মুকুন্দনারায়ণের মৃত্যুর পর অমিতব্যয়ী সুন্দরনারায়ণ রাজা হলে

আর্থিক সংকট নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। নতুন রাজার পক্ষে রাজস্ব পরিশোধ, মামলা মোকদ্দমার খরচ, পূর্বতন রাজার ঋণ শোধ, নিত্য দিনের খরচ সামলানো সম্ভব হল না। সুন্দরনারায়ণের ব্যাভিচারিতা, অমিতব্যয়িতার একটি উদাহরণ হল চার পত্নী থাকা সত্ত্বেও হরমোহিনী ও অন্নপূর্ণা নামে দুই উপপত্নী বা রক্ষিতা রাখা। শুধু তাই নয়, এদের ও এদের সন্তানদের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতারও কোন খামতি ছিল না। অন্নপূর্ণা গর্ভজাত সন্তান 'শীতল বাবু' রাজকুমার বলে এলাকায় পরিচিত ও সম্মানিত হতেন। এছাড়া অন্নপূর্ণাকে ১৮৭১ সালের ১০ই জুন মুড়াছেড়া মৌজার পাট্টা দেওয়া হয়েছিল। ১৮৯৩ সালে সুন্দরনারায়ণের মৃত্যুর পর অন্নপূর্ণা এলাকাতেই থাকতেন এবং ১৯১১ সালের ৮ই আগষ্ট তিনি মুড়াছেড়া মৌজার তাঁর অংশের ৬ আনা অন্য রায়তকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। বাকি অংশের স্বত্বভোগী হয়েছিলেন উক্ত শীতলবাবু। শীতলবাবু ফুলঝোড় জঙ্গলের মালিক কোহেন সাহেবের কুঠিতে কাজ নিয়েছিলেন বলেও জানা যায়। অনিময় ও অমিতব্যয়িতা সঞ্জাত এই অস্বাভাবিক আর্থিক সংকট থেকে নিষ্কৃতি পেতে রাজা ১৮৭৩ সালের ১৭ই বৈশাখ ভেলাইডিহার রাজা হরগোবিন্দ সিংহ চৌধুরীর কাছে ১৯০০ টাকা ঋণ নিয়ে বিনিময়ে খয়েরবনী, কড়াইডাঙ্গা ও কৃষ্ণনগর মৌজার খাজনা আদায়ের অধিকার দিয়ে দেন। ১৮৭৫ সালের ৬ ই জ্যৈষ্ঠ বক্সী নিবাসী পদ্মলোচন লাহার কাছে রাজা ১৪৯৯ টাকা ধার নেন বক্সী, ধবনী, চামটা মৌজার বন্ধকের বিনিময়ে। ১৮৭৬ সালে তিনি দুই মহাজন রামচরণ ঘোষ ও গিরীশ সাহুকে জমিদারি ইজারা দিতে বাধ্য হন। এতেও সমস্ত ঋণ শোধ না হওয়াতে ১৮৭৭ — ১৮৮১ সময় সীমার মধ্যে বিভিন্ন দফায় ৪৭১৪ টাকা ধার নেন রামগড়ের রাজা চন্দ্রমোহন সিংহ সাহস রায়ের কাছ থেকে এবং বিপিনবিহারী দত্তের সাথে ১৮৮০ সালের ২৭ শে পৌষ ১৪৫২০০ টাকা ঋণের বিনিময়ে একটি পেশঘী ইজারা দলিল সম্পাদন করেন।[১৭] ১৮৮৬ সালে ২ রা পৌষ সম্পাদিত এক বন্ধকী খতের দ্বারা রাজা ৩৪১১ টাকার বিনিময়ে জমিদারি গদাধর বেরার কাছে বন্ধক রাখেন। গদাধর আদালতের অনুকূল ডিক্রি পেয়ে এটি বিক্রি করেছিলেন রাজগ্রামের চিন্তামণি দত্তকে। যেটি তিনি আবার ১৮৯৬ সালের ১৭ শে মে রামগড়ের রাজপরিবারকে বিক্রি করে দেন। এই ঋণের জাল ছিল অন্তহীন।

রামগড়রাজ চন্দ্রমোহন ঋণ (আসল ও সুদমূলে ৯২৪৭ টাকা ৫ আনার ঋণ ১৮৭৮ সালে ১০২১০ টাকা ১০ আনা ৬ গন্ডাতে দাঁড়ায়) আনাদায়ের কারণে মামলা দায়ের করলে মেদিনীপুর সাব-জজ কোর্ট জমিদারি নিলাম করে আনাদয়ী ঋণের

টাকা আদায়ের নির্দেশ দেয়। ফলশ্রুতিতে ১৮৮৬ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর যে নিলাম আয়োজন করা হয় তাতে চন্দ্রমোহনের পুত্র বনোয়ারীলাল সিংহ সহিস রায় সর্বোচ্চ ডাক দেন। এদিকে উক্ত জমিদারি উপর বিপিনবিহারী দত্তের যে পেশগী ইজারা স্বত্ব ছিল তা ১৮৯১ সালে জনৈক জগমোহন দাসকে বিক্রি করে দেন। ১৯১২ সালে জগমোহনপুত্র সূর্যকান্তের দখলীয় এই ইজারা স্বত্বের মেয়াদ শেষ হলে বনোয়ারীলাল পুত্র নগেন্দ্র জমিদারির উপর সম্পূর্ণ আইনি ও বাস্তব অধিকার কায়েম করেন।[১৮] ১৯২৩ সালে রামগড় রাজের অধীন রসপাল জমিদারির নায়েব ছিলেন আনন্দলাল সিংহ (১৯২৩ সালের শেষ দিক থেকে)। মাসিক বেতন ছিল আট টাকা।

এদিকে ঋণের বিনিময়ে ইজারা, খাজনা আদায়ের অধিকার সহ নিলাম ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে জমিদারির অংশগুলির উপর অধিকার হারাতে থাকা রসপাল রাজা পতনের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যান। জমিদারি নিলামের পরও যুবরাজ কালীপ্রসন্নের দখলীয় আটটি মৌজার রাজস্ব আদায় হত সদর তহশীলদারের কাছারি থেকে। যেটি ভেঙ্গে পড়লে সারাইয়ের সামর্থ্য রাজপরিবারে ছিল না। আদায় কাজ শুরু হয় কালীপ্রসন্নের বসত বাড়ি থেকে। সোমবার করে আয়োজিত রসপাল হাটের আদায় (১০-১২ আনা) শেষ পর্যন্ত রাজাদের হাতেই ছিল।[১৯]

রাজপরিবারটির শেষ করুণ পরিণতির কথা বোঝা যায়, পরিবারটির জীবিকা নির্বাহের জন্য রামগড় এস্টেটের মাগন বা দানের উপর নির্ভরশীলতা এবং রাজা কালীপ্রসন্নের নিজেকে আদালতে 'কাঙ্গাল' প্রতিপন্ন করে জমিদারি অধিকারের কিছুটা ফিরে পাওয়ার চেষ্টার মধ্যে। ১৮৯৩ সালের নভেম্বরে রাজা সুন্দরনারায়ণের মৃত্যুর পর নিঃস্ব রাজা কালীকৃষ্ণনারায়ণ দেও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তি ও মামলার খরচ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য মেদিনীপুর আদালতের শরণাপন্ন হন। নিজেকে 'কাঙ্গাল' ঘোষণা করার জন্য। কিন্তু অর্থাভাবে হাজিরা দিতে না পারার কারণে মামলা বাতিল হয়। হাইকোর্টে মামলা পুনরুজ্জীবনের আবেদন করলে উচ্চ আদালত প্রয়োজনীয় ফি জমা দিতে বলেন। রাজার ওই ফি জমা করার ক্ষমতা না থাকায় মামলাটি বাতিল হয়। ১৯২৪ সালে ১০ই সেপ্টেম্বর বাঁকুড়ার সাব-জজের কাছে তিনি আবার একই আর্জি জানিয়ে দরখাস্ত করেন। এই আর্জিতে নিজের নিঃস্বতার সপক্ষে মোট সম্পত্তির হিসাব দিয়েছিলেন (১) ৪০ টাকার একটি পুরাতন বন্দুক (২) ২০ টাকার দুটি গাভী (৩) ৫০ টাকার মাটির বাড়ি (৪) ১০ টাকার তাঁত বস্ত্রাদি। নিঃস্ব রাজার সপক্ষে

জেলা আদালত ১৯২৬ সালের ৯ই এপ্রিল উচ্চ আদালতে সুপারিশ পাঠান। ১৯৩৩ সালের ৩রা জানুয়ারী উচ্চ আদালত রাজার নিঃস্বতার সপক্ষে সুপারিশ গ্রহণ করলেও সম্পদ ও জমিদারি খুইয়ে কাঙ্গাল রাজার রাজ্য পুনরুদ্ধারের আর কোন আশা দেখা গেল না।[২০] তবে এই বিপন্ন ও রিক্ত সময়েও রাজা সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে বিচ্যুত হননি। জেলাশাসক এ ডব্লু কুক সাহেব (১৯১২-১৭) রসপাল প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ৩ একর জমি অধিগ্রহণ করলেও রাজা ক্ষতিপূরণ নিতে চাননি। বিনিময়ে সরকার তাঁর দেয় রাজস্ব চার আনা ছয় পাই কমিয়ে দেয়।[২১]

যাই হোক, অদৃষ্টের পরিহাসে তাঁর বাকি জীবনের পারানি ছিল নতুন জমিদার বানোয়ারীলাল ও নগেন্দ্রর (১৯০৭ সালের ২৯ শে জানুয়ারী থেকে) কাছ থেকে প্রাপ্ত মাগন। এমনকি রাজপোষিত কালা মহাদানের নিত্য ভোগ পাঁচ কোণা আতপ চাল, নৈবদ্যের জন্য চাল, গুড়, মিষ্টান্ন, ব্রাহ্মণ দিবাকরের প্রণামী, এখ্যান উৎসবের ১৫ টাকা সহ মোট বছরে ২০০ টাকা যোগানের ক্ষমতা রাজাদের আর ছিল না। কুলদেবতা বলরাম জীউ ও কালা মহাদানের পূজার জন্য রাজা প্রজা সাধারণের কাছে মাগন চাইতেন। প্রজা ও বাইরের ভক্তদের কাছ থেকে মাগন আদায় হত ১-৫ টাকা। দুর্গাপূজা আয়োজিত হত সেই মাগনের ভরসাতেই। যুবরাজ বিদ্যানিধিও এই মাগনের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। ধনী ধনঞ্জয় মন্ডল দিতেন বছরে তিন চারবার। রাজাকে মামলা লড়ার জন্য দিয়েছিলেন ১ টাকা। শুশুনিয়ার যজ্ঞেশ্বর মন্ডল দেবীপূজায় মাগন দিতেন। ১৯২২-২৩ সালে কোহেন সাহেবের কর্মী দিবাকর সাহু দিতেন আট আনা থেকে ১ টাকা। ১৯০৪-০৫ থেকে মন্ডলপাড়া হতে দুর্গাপূজা আয়োজন করতে মাগন দেওয়া হত নগদ দুই টাকা ও ২০ পাই আতপ চাল। এক কালের প্রতাপশালী রাজপরিবার কালের পাকচক্রে সামাজিক ও ধর্মীয় কর্তব্য পালনে অন্যের ও প্রজাদের ভিক্ষার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।[২২]

নতুন জমিদার রামগড় রাজের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ হতে থাকে রসপাল রাজপরিবারের। যেমন রাজা সুন্দরনারায়ণের ভ্রাতা যোগেশ্বরের বিধবা পত্নী চন্দ্ররেখা বানোয়ারীলালের কাছ থেকে মাসিক ৪০০ টাকা মাঙ্গন বা সাহায্য পেতেন। মুকুন্দনারায়ণের বিধবা পত্নী রামগড়ের বনোয়ারীলাল ও নগেন্দ্রনাথের কাছ থেকে মাঙ্গন গ্রহণ করতেন বলে নথি আছে। সুন্দরনারায়ণের বিধবা পত্নী সাবিত্রীদেবী সাথী বোষ্টমীর সাথে মাগনের আবেদন পত্র নিয়ে রামগড়ে হাজির হয়েছিলেন বলে জানা যায়।[২৩] ছাতনার রানীরা যেমন ছিলেন অন্তরালবর্তী, ঠিক উল্টো ছিলেন

রসপালের রানীরা। জঙ্গলের মালিক রসপাল রানীরা প্রায়শই জঙ্গল প্রশাসনের হালহকিকত দেখতে অরণ্য ভ্রমণ করতেন। থেকে যেতেন বনগ্রামের কর্মীদের বাড়ি। ফুলকুসুমায় বড় জঙ্গলগুলি ছিল ফুলঝোড়, চাপষি, শকুনিবাসা, ঘাটপাল, বীরবাঁধ, দুধেনালা, মাজগেড়িয়া, সিমুলপাল। সবচেয়ে বড় জঙ্গল ফুলঝোড়ের আয়তন ছিল ৩০০০ বিঘা ও বছরে আয় আনুমানিক ২০০ টাকা। হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল জঙ্গলটি ছিল বসবাসহীন। তিনের দশকে রামগড়ের তহশীলদার হেমচন্দ্র রায় এর দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন। একমাত্র বনবাসী সাঁওতাল পরিবারের ছেলে বাঘের পেটে গেলে তারাও বনের চৌহদ্দি ছেড়ে চলে যান। জঙ্গল প্রশাসনে 'নগদি' হলেন মুখ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী। 'চেতেল'রা ছিলেন বনরক্ষী ও বিভিন্ন কাজের তদারক। কুলি-কাঠুরে ও মুঠে ছিলেন কাঠ কাটা ও বহনের কর্মী। রাজা সুন্দরনারায়ণের সময় ফুলকুসুমার এই জঙ্গলগুলির মালিক ছিলেন রানী সাবিত্রীকুমারী। নগদী ছিলেন ছত্রীবর্ণীয় উপেন্দ্র ধবল (১৮৯৯-১৯০৬)। ১৮৯২ সালে ফুলঝোড় জঙ্গলের চেতেল ছিলেন বলাই-হৃদয় রাজওয়ার এবং নফর নাপিত। প্রথমে তহশীলদারের কোন বেতন ছিল না। রায়তদের কাছে কেবল 'তহুরি' (রাজস্বের অতিরিক্ত আয়) পেতেন। পরে মাসিক বেতন ছিলেন ৩৬ টাকা। নথি থেকে গাছের দাম দেখা যায় পাঁচটি বড় গাছ ও এক গাড়ি রলা তিন টাকায় (১৮৯৬ সালে লুরকা গ্রামের রামব্রজ চৌধুরী এমন পাঁচটি গাছ কিনেছিলেন ঘর ও গোয়ালঘর তৈরির জন্য)। ১৮৯৭-১৯০৩ সালে মধ্যে ছয়-সাত গাড়ি কাঠের দাম ছিল ১৪ আনা- এক টাকা চার আনা। পাতা-ডালের মত জ্বালানী সংগ্রহের জন্য দিতে হত এক গাড়িতে ১-৪ আনা থেকে ২ টাকা পর্যন্ত। বর্ষায় জ্বালানী সংগ্রহের জন্য কোন কর দিতে হত না। বর্ষায় বড় গাছ কাটার নিয়ম ছিল না। নথিভুক্ত গ্রাহক ছিলেন বিশ্বনাথ সাহু, জিতু সাহু, দিবাকর সাহু, শ্রীবাস-ধনু-তারিণী-কালী-চিনু-জগু-অধর-দিনু মন্ডল প্রভৃতি। বিনিময়ে মাধ্যম হিসাবে ধান-চালও ব্যবহৃত হয়। ঘাটপালের সুখের সাঁওতাল, ঝাঁটিপাহাড়ীর বাঁকা সাঁওতাল চালের বিনিময়ে কাঠ সংগ্রহ করতেন। বনকর্মীদের মাসে বেতন ছিল পাঁচ টাকা করে। বড় বড় গাছ কাটার জন্য কুলিরা পেত গাছ প্রতি ২ টাকা। জ্বালানি কাঠকে বলা হত 'অকাঠ'।[২৪]

রানী সাবিত্রীকুমারের পর জঙ্গলের অধিকার বর্তায় চম্পকলতায়, যিনি ছিলেন রাজা বিদ্যানিধির পত্নী। চম্পকলতা অরণ্য পরিদর্শনের সময় ও কাজে অরণ্য-কর্মী সাঁওতালের বাড়ীতে থেকেও যেতেন। অল্প বিস্তর লেখাপড়া জানতেন। কোহেন

সাহেবের সাথে কথা বলতেন। নবজাতকদের নাড়ী নিজেরাই কাটতেন।

১৮৭৪ সালের পূর্বতন দলিলের মত ১৮৮৩ সালের পাট্টা কবলা মূলে চম্পকলাতার পক্ষে এই হস্তান্তর সম্পন্ন হয়।[২৫] তবে ঋণগ্রস্ত রানী ক্রমেই হারাতে থাকেন জঙ্গলের অধিকার। বিভিন্ন নথি থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে ফুলকুসুমা পরগণার মালিকানা বিংশ শতকের প্রথম ভাগ থেকেই হস্তান্তর হতে থাকে। পরগণার সিমুলপাল জঙ্গলের মালিকানা হিসাবে দেখা যাচ্ছে সদগোপ উমেশচন্দ্র ঘোষের নাম। এই জঙ্গল ব্যবসায়ী ইতিমধ্যে রাইপুরের পুন্নাপানি অরণ্যও কিনে নিয়েছেন। পরগণার মালিকানা পাওয়ার পর রামগড় জমিদারদের ফুলকুসুমার জঙ্গলের উপর অধিকারও সুদৃঢ় হচ্ছিল। ৩০০০ একরের ফুলঝোড় জঙ্গলের ৭০০-৮০০ বিঘা (পাটজবনী অংশ) রাজা নগেন্দ্র ধানশালার কিনু মাহাত ও জনৈক কেশব কুন্ডুকে বন্দোবস্ত দিয়ে দেন বার্ষিক ১০০০ টাকার বিনিময়ে। ২৫০ টাকা বিক্রয়ের সময় ও ৭৫০ টাকা পরের ৪-৫ মাসে শোধ হয়। এ জঙ্গলের দুই চেতেল ছিলেন হীরু কুন্ডু ও হৃদয় রাজওয়ার। রামগড়ের অংশে ছিলেন যুগল রাজওয়ার, ধর্মরাজ সেন(কামাইয়ের ক্ষেত্রে পুত্র সতীশ), সদয় মাঝি, হারাধন কুন্ডু, নটবর চক্রবর্তী, পরাণ পাতর। মাহিনা পেতেন মাসে তিন টাকা যা মোহরার চেয়ে দুই টাকা কম। আগে চেতেলরা বেতনের পরিবর্তে কমিশন পেতেন কাঠের গাড়ি প্রতি এক টাকা। এদের ঠেক ছিল রামগড় এস্টেটের তৈরি খীরকাউর গ্রামের আস্তানা। চেতেলদের খাওয়ার ব্যবস্থা করত এস্টেট, নায়েব হেমবাবুর বাসাতে। সেখান থেকে কাঠের গাড়ির চালানও দেওয়া হত। এই জঙ্গলের একাংশ ক্রয়ের এক বছর খানেক পর কিনু মাহাত রাইপুরের কাউরডাঙ্গা জঙ্গল কিনেছিলেন শরৎকামিনী এস্টেটের কাছ থেকে।[২৬]

রাইপুরের জঙ্গল ব্যবসার বড় হিস্যা ছিল কলকাতার এ এম এ কোহেন সাহেবের। ১৯১৬ সালে রানী চম্পকলতার কাছ থেকে ফুলঝোড় জঙ্গলের বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন কোহান সাহেব। সেবছর মন্ডলদের কাছ থেকে কোহেন রাওতাড়া জঙ্গল কেনার পরই রাজা বিদ্যানিধি এই বিক্রয়ের ব্যাপারে সক্রিয় হন। বন্দোবস্তের শর্ত অনুসারে ৭৫০০ টাকা সেলামী ও বার্ষিক ৬০০ টাকা খাজনা জমা দিতে হত। সেলামীর ৭৫০০ টাকা পেয়ে ঋণগ্রস্ত রানী মৌলামনির কুন্ডুদের ২৫০০ টাকা ও রাওতড়ার মন্ডলদের তেরশ টাকা শোধ করেন। এরপর অবশ্য মাসিক ৫০ টাকা হারে রানীকে প্রদেয় অর্থ কোহেন সাহেব রানীকে দিতেন না বা বাকি রাখতেন। রানী বাধ্য হয়ে ১৯২০ সালে খাতড়া মুন্সেফ আদালতে এবং ১৯২৬ সালে বাঁকুড়া মুন্সেফ আদলতে

বকেয়া ৩৭০০ টাকারও বেশি মিটিয়ে দেওয়ার মামলা দায়ের করেন। দুটি ক্ষেত্রেই আদালতের আদেশ মান্য করে কোহেন সাহেব বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেন।[২৭] এ বিষয়ে কোহেনের আইনি উপদেষ্টা ছিলেন জে এন সেন। কোহেনের ম্যানেজার ছিলেন বালী-উত্তরপাড়ার অনুকূল পুরকায়েত। আমমোক্তার মিসেস চিউ। অফিস কর্মী সারদা দত্ত, শরৎশশী মুখোপাধ্যায়, শীতল নারায়ণ বাবু, ফুলঝোড়ের জানকীনাথ দাস, নগদি দিবাকর সাহু (এর আগে রানীর নগদি ছিলেন ঋষি বাবু, বেতন ১১ টাকা), চেতেল উপেন্দ্র ধবল, বিহারী নাপিত, বদন সিং, নারায়ণ তেওয়ারী।[২৮] এদের ১৯১৮ সাল থেকে কাছাড়ি বাড়ি ছিল রসপালে এবং সন্নিহিত উপরশোলে। এছাড়া কোহেন সাহেব দুধেনালা ও মাজগেরিয়া জঙ্গল দুটিও কিনে নেন। ১৯২৪ সালে কিনে নেন ২১ টাকা খাজনার ঘাটপাল মৌজা। অবশ্য ১৯২৪ সালে দুধেনালা ও মাজগেরিয়া জঙ্গল দুটির মালিক হিসাবে দেখা যাচ্ছে জনৈক কালীপদ সাহু। স্পষ্টতই নতুন ভূমি ব্যবস্থায় নয়া ভূমি মালিকদের ভিড়ে আদি তুঙ্গ রাজপরিবার(ছোটতুঙ্গ) বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়।[২৯]

**তথ্যসূত্র :**


১. অশোক মিত্র, পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ৪র্থ খণ্ড, দিল্লী, ১৯৭৪, পৃঃ ১৪৭।
২. Jaminimohan Ghosh, Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal, Calcutta, 1930, p.59.
৩. Letter of Charles Stuart, Calcutta to Resident of Midnapore dated 17th March, 1773.
৪. অশোক মিত্র, পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ৪র্থ খণ্ড, দিল্লী, ১৯৭৪, পৃঃ ১৪৭।
৫. গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা, কলকাতা, ২০০৮, পৃঃ ৪, ১৬০।
৬. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০, পৃঃ ৪০২।
৭. F W Robertson, Final Report of the Survey and Settlement Operations in the District of Bankura, Calcutta, 1926, p.37.
৮. Paper Book I, Group II, Pt I, Appeal on Decree No. 30 of 1933 of Pauper Case No. 10 of 1924 at Additional Sub-Judge, Bankura at 30.11.1932 (Kaliprasanna Narayan Deo vs. Nagendra Nath Singha Sahas Roy & oths.) P. 104.
৯. ibid, P. 117, 121, 132, 214.
১০. ibid, P. 61.
১১. ibid, P. 168. Deposition of Radhakanta Roy at 26.06.32
১২. ibid, P. 207
১৩. ibid, P. 61.

১৪. Paper Book, Vol-I, Gp II, Pt-II. Appeal on Decree No. 30 of 1933. Receipt granted by Raja Mukunda Narayan Deo to the collector, Bankura, dt 7.10.1884, P. 35.

১৫. ibid, P. 90-92, 97.

১৬. Paper Book II. Appeal on Decree No. 118 of 1920 of Bankura, Sub-Judge Court Dt. 22.01.20. P. 21, 61, 111, 115, 124.

১৭. Paper Book II, Group II, Pt II. Appeal on Decree No. 30 of 1930 of Additional Sub-Judge Court, Bankura, Dt 30.11.32. Paper Case No. 10 of 1924.

১৮. ibid, P. 59.

১৯. ibid, P. 325.

২০. ibid, P. 37.

২১. ibid, P. 165. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, ব্রিটিশ রাজপর্বে বাঁকুড়া জীবন, বাঁকুড়া, ২০১৬, পৃ. ১৬৬।

২২. ibid, P. 104-05, 137, 246, 333.

২৩. ibid, P. 65, 99.

২৪. Bankura Sub-Judge Court P.S. no 13 of 1932. Paper Book Gr II Pr I, P. 298, 171. Pauper Case No. 10 of 1924 of Bankura Addl. Sub-Judge Court, dt 30.11.32, P. 405 (PB, ibid).

২৫. Pauper Case No. 10 of 1924. Paper Book, ibid, P. 398.

২৬. ibid, P. 277-78. Deposition dt. 26.06.32.

২৭. T. S. No. 13 of 1930 of Bankura Sub-Judge Court Paper Book Gr II, Part I, P. 328.

২৮. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, ব্রিটিশ রাজপর্বে বাঁকুড়া জীবন, বাঁকুড়া, ২০১৬, পৃ. ২০৯।

২৯. Pauper Case No. 10 of 1924. Appeal on decree No. 30 of 1930 at Addl. Sub-Judge Court, Bankura, Paper Book, Gr II, Pt I, P. 52. শেষ রাজা কালীপ্রসন্নের আদালতে নিজের নিঃস্বতার স্বপক্ষে স্বীকারোক্তি ছিল, "There was no asault or other use of force in ousting me except recovery of rents and dues from tenants."

পঞ্চম অধ্যায়

# সিমলাপালের ইতিহাস

## সিমলাপালের পত্তন

পঞ্চদশ শতকে দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়ার কংসাবতী-তারাফেনী-জয়পান্ডা নদী বিধৃত ২৮৮২৫৪ একরের শিখররাজ্য-তুঙ্গভূমির পাঁচশ বছরের ইতিহাস আজও অনাবিষ্কৃত। এসময় এই ভূমি রাজগ্রাম নামে পরিচিত ছিল। শাসিত ছিল সামন্তসার রাজের দ্বারা। পরিচালিত হত রাইপুর নগর থেকে (আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরিতে এটি রায়পুর নামে উল্লিখিত আছে)। মধ্যযুগের সূচনা পর্বে ছোটনাগপুর থেকে সাঁওতাল অভিবাসনে ফুলকুসুমা সন্নিহিত শিলদা সাঁওতাল আদিবাসীদের ক্ষমতা কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। এর আগে থেকেই রাঢ়ভূমির আদি বাসিন্দা ভূমিজ সম্প্রদায় সামন্তসার রাজ্যে ক্ষমতা ভোগ করছিল। হয়ত কেন্দ্রীয়ভাবে না হলেও গ্রাম শাসন ও সামাজিক সংগঠনগুলির মাধ্যমে। ফলে সামন্তসার রাজ্য সাঁওতাল-ভূমিজ ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অশান্ত হয়ে ওঠে। অরণ্য অন্তরালে রাজগ্রামের সাঁওতাল শাসনের বিস্তৃত কোন অভিজ্ঞান, ইতিহাস বা রূপকথার মোড়কে প্রচলিত আখ্যান থেকে উদ্ধার করা যায়নি। কিন্তু এই এলাকায় সাঁওতাল অভিবাসন ও আধিপত্য একটি ঐতিহাসিক সত্য। ভূমিজদের পূর্ব আধিপত্যও একটি নৃতাত্ত্বিকভাবে প্রমাণিত ঘটনা। এই অশান্ত সময়ে রাজগ্রাম দেশে ওড়িয়া রাজপুরুষ নকুড় তুঙ্গের আগমন ও বিজয় অভিযান শিখররাজ্য-তুঙ্গভূমের (পূর্বতন রাজগ্রাম) নতুন ইতিহাস রচনা করে।

নকুড় তুঙ্গের বংশ পরিচয় নিয়ে একাধিক তত্ত্ব পাওয়া যায়। কারো মতে তিনি স্থানীয় ভূমিজ সর্দার। যিনি পূর্ব পুরুষদের রাজ্য সাঁওতদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করেন। একটি মতানুসারে গন্ডকী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল (বিষ্ণু বা নারায়ণের রূপক

শালগ্রাম শিলার প্রাপ্তিস্থান) থেকে একজন তীর্থদর্শন উপলক্ষ্যে পুরীধামে আসেন এবং জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদে পুরীর রাজপদে আসীন হন। তাঁর পৌত্র গঙ্গাধর জগন্নাথ দেবের স্বপ্নাদেশ পান যে তাঁর পরে বংশের আর কেউ রাজপদে আসীন হতে পারবেন না। এর পরই গঙ্গাধর পুত্র ১৩৪৮ খ্রিষ্টাব্দে নিজ পত্নী, ভাই, ধনরত্ন, সৈন্যসামন্ত সহ পুরীধাম ছেড়ে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত পরিভ্রমণ করে ১৩৫৮ সালে রাজগ্রামের টিকরপাড়ায় স্থিতু হন। কারো কারো মতে এক শ্বেত পারাবত পথ দেখিয়ে তাদের এই স্থানে এনে ফেলে। এর পর সঙ্গী শ্রীপতি মহাপাত্রের কৌশলে স্থানীয় রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে তুঙ্গভূমে নকুড় তুঙ্গের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

আরেকটি মতবাদ হল নকুড় ছিলেন ওড়িষার শেষ হিন্দু নরপতি মুকুন্দদেবের পুত্র। কোন এক গর্হিত অপরাধে রাজা তার মৃত্যু দন্ডাজ্ঞা দিলে রাজপুরোহিত শ্রীপতি মহাপাত্র তার প্রতিবাদ করেন। রাজা তখন প্রতিবাদকারী রাজপুরোহিত সহ পুত্রের দেশান্তরের আদেশ দেন। আর একটি স্থানীয় কিংবদন্তীতে প্রকাশিত মত কালাপাহাড়ের আসন্ন আক্রমণের ও মুকুন্দদেব রাজত্বের ধ্বংশের বার্তা দিয়ে দেবাজ্ঞা হলে রাজপুত্রদের দেশত্যাগের ঘটনা ঘটে। পুরো ঘটনা মুখে মুখে চলে আসেছে নিম্নরূপে,

"শ্রীপতি কহিলা, রাজা পূর্ণ অবিচার।

... ... ...

তবে তু চলি যাবা মু রাজ্য ছাড়ি
নিজ হাতে পালিব রাজ আজ্ঞা করি।

... ... ...

উদয় হইল সূরজ তমা না কাটিলা
পুতরদের লয়ে সাথে শ্রীপতি চলিলা।

... ... ...

নকুড়দেব ও ছকুড়দেবের যাত্রাকালের দৃশ্য
চাহে শূন্যপথে, হেথা জগন্নাথে, মহামায়া প্রকাশিলা।।
হইয়া প্রখরা, উড়িল পায়রা, দোঁহে নয়নে দেখিলা।
উত্তর মুখেতে, ধাইলা ত্বরিতে, দেশ দেশ হইয়া পা।।
পারাবত রঙ্গে, হইয়া অবিষতুঙ্গে, বসিলা মেদিনীপুরে।
সেই ভূমিমাঝ, দুই যুবরাজ, নামিল অতি সাদরে।।
সেই দেশ রাজা, নাশ হইল প্রজা, আছিল অনাথ হয়্যা।।

ছিল অরাজক, পরম কৌতুক, দুই রাজপুত পায়্যা।।
বেদের বিধানে, পেয়ে দুইজনে, দুইজনে রাজা হইল।
অর্ধতুঙ্গ হইয়া পারাবত গিয়া সে ভূমে উড়ি বসিল।।
তেঁই তো জগতে হইল বিদিতে, তুঙ্গভূম খ্যাত হইল।
সবে বলে বঙ্গে, ছকুড় যে তুঙ্গে, নকুড়তুঙ্গ বলে আর।
তুঙ্গভূম খ্যাত, হইল এমত, হইল বংশ অধিকার।।"

আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর মতে ওড়িয়া আগমনের অভিঘাতে রাজগ্রামের আদি মুন্ডা অধিবাসীরা হিন্দুকৃত হয়ে ভূমিজে পরিণত হয়। সাঁওত-ভূমিজ সংঘাতের আবর্তে ওড়িয়াদের সাহায্যে স্থানীয় ভূমিজ দলপতি নকুড় সামন্তসার রাজ্যের অবসান ঘটিয়ে তুঙ্গরাজত্বের সূচনা ঘটান।[১]

## রাজবংশ ও রাজকাহিনী

ঘটনা যাই ঘটুক তুঙ্গভূমের অস্তিত্ব ও চলমান কাহিনী একটি ঐতিহাসিক সত্য এবং তা ঔপনিবেশিক কালপর্বেও অব্যাহত ছিল। কথিত আছে নকুড় তুঙ্গ দীর্ঘকাল অপুত্রক থাকায় রাজগুরু শ্রীপতি মহাপাত্র পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞ করেন। জন্ম হয় পরবর্তী রাজা চৈতন্য তুঙ্গের। সামন্তসার রাজ্যের অরাজক অবস্থার অবসান ঘটিয়ে সুশাসন ও সুস্থিতি প্রতিষ্ঠায় নকুড় তুঙ্গের ভূমিকা যদি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ন্যায়, তবে শ্রীপতির ভূমিকা ছিল চাণক্যের। নকুড়ের প্রাণদন্ড লাঘবে, তার রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা ও পুত্রলাভে শ্রীপতির ভূমিকার মর্যাদা দিতে রাজা নকুড় পূর্বতন সামন্তসার রাজ্যের ৭৬৪২৪ একর পরিমিত রাজ্যের মধ্যে সিমলাপাল পরগণা (২৬২৬৬ একরের ভেলাইডিহা পরগণা সহ) গুরুকে হস্তান্তর করেন। শুরু হয় নতুন এক ইতিহাসের। সূচিত হয় সিমলাপাল রাজ্যের ইতিহাস।[২]

আরেকটি মত হল ভাগ্যান্বেষী শ্রীপতি মহাপাত্র কোন কারণে মল্লরাজের রোষানলে পড়ে রাজকারাগারে অন্তরীণ হন। কিন্তু অমিত বিক্রমশালী শ্রীপতি নাকি রোজই কারাপ্রাচীর টপকে বাইরে স্নানাদি করে কারাগারে ফিরে যেতেন। মল্লরাজ বিষয়টি জানতে পেরে ও সত্যতা যাচাই করে এই বীরকে মুক্তি দেন এবং সিমলাপাল পরগণায় অশ্বপৃষ্ঠে একদিনে যতটা ঘুরতে পারবেন তত এলাকা শাসনাধিকার দিতে প্রতিশ্রুত হন। ঐতিহাসিক রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর মতে এক সময়কার তুঙ্গভূমের মিত্র-করদ সিমলাপাল রাজ্য প্রবল পরাক্রমী মল্লরাজের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়,

নেহাতই অধিকতর স্বার্থ সিদ্ধির তাড়নায়। তবে এসময় মল্লভূমের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কিনা, হলেও তার এমন প্রতিপত্তি ছিল কিনা এনিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। কারণ মল্লরাজ বংশের ইতিহাস স্বীকৃত প্রতিষ্ঠাতা হাম্বিরের রাজত্ব শুরুই হয় শ্রীপতি মহাপাত্র প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের চতুর্থ পুরুষ বাসুদেব মহাপাত্রের (বা তাঁর খুল্লতাত বলরামের) আমলে।[৩]

অধিক সমাদৃত তত্ত্ব হোল দোলপূর্ণিমার দিন মহা আড়ম্বরে শ্রীপতি মহাপাত্রের রাজ্যাভিষেক আয়োজিত হয় নতুন রাজ্যে। জগন্নাথপুরে জগন্নাথদেবের পদতলে রক্ষিত তাম্রপত্র দিয়ে সিমলাপাল তালুককে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর হিসাবে দানপত্র করে দিলেন তুঙ্গরাজ নকুড়। নতুন রাজ্যে গিয়ে তিনি নয়া রাজ্যের আমাত্য বিশ্বম্ভর মহাপাত্র, রঘুনাথ পান্ডা (জগন্নাথপূজক), পীতাম্বর মিশ্র (আইন ও কাছারী সেরেস্তা), পুরুষোত্তম কর (রাজচক্রবর্তী), সূর্যকান্ত রায় (পূজা পাঠ ও রাজমাতুল), বিজয়চাঁদ সিংহ (প্রধান সেনাপতি), সুজয়চাঁদ সিংহ (রাজরক্ষী), দামোদর করণ (কাছারী সেরেস্তা), শুকদেব করণ (কৃষিকর্ম বিষয়ক), বাসুদেব করণ (কাছারী সেরেস্তা), ঈশ্বর ভাট (অগ্রদানী ক্রিয়াদি), কৃষ্ণচন্দ নাপিত (ক্ষৌরকর্ম), জগন্নাথ ত্রিপাঠী (পূজাপাঠ) সহ প্রজাসাধারণের উপস্থিতিতে পূর্বতন গুরু ও সেনাপতির হাতে রাজ্যশাসনের অধিকার তুলে দেন। এর পরবর্তী পাঁচ বছর ছিল রাজত্ব সুসংহত করার সময়কাল। এসময় ঘটে শ্রীপতির স্বদেশ উৎকল থেকে প্রচুর মানুষের অভিবাসন। পরিবর্তন ঘটে দক্ষিণ বাঁকুড়ার জনবিন্যাসের। ঐতিহাসিক রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর মতে এই অভিবাসনের সাথে যুক্ত হয়েছিল ঊর্দ্ধমুখী সচলতার প্রয়াস।[৪] শ্যামসুন্দরপুরের 'দত্ত' পদবীধারীরা আদপে উৎকল কায়স্থ। মহান্তী বংশীয়রা আসলে উৎকল কায়স্থ হলেও এখানে এরা ব্রাহ্মণ। রাজগোত্র 'কশ্যপ'-এর অনুকরণে এরা কশ্যপাহর হন বলে একটি মত আছে। 'শাহু' উৎকল কলু এখানে ব্রাহ্মণ স্বীকৃত 'তিলি'। বাঁকুড়ার গয়লা-গোপও ওড়িশাগত। আঞ্চলিক গবেষকদের মতে রাজবংশের আগমন ঘটেছিল উড়িষ্যার বীররামচন্দ্রপুর থেকে। অনুগামী উৎকলরা এসেছিলেন বীররামচন্দ্রপুর সন্নিহিত বীর গোবিন্দপুর, সেবকসাই, বাসুখেরা, নীলগিরি, ভীমাপুর, বেলাপান্ডা, পান্ডাপুর, ঘাটনি, কুসুমতি, হারিরাজপুর, বুধাপান্ডা সহ বিভিন্ন গ্রাম থেকে, যেখানের বেশিরভাগ মানুষ এখনও উৎকল ব্রাহ্মণ।

শুধু সামাজিক পটপরিবর্তনই নয়, চাষাবাদ ও ব্যবসা বাণিজ্যের ধারাও পরিবর্তিত হয়েছিল এই ওড়িয়া একাধিপত্যে। পূর্বতন ঝুম চাষের পরিবর্তে খুপড়ি

চাষ, সেচের ধারণা ও প্রসার শুরু হয়। এই অভিবাসিতদের একাংশ সুদ সহ ঋণ প্রদানের বৃত্তি প্রচলন করলে কৃষি ও বাণিজ্যে পুঁজির প্রাচুর্য আসে। রাজানুকূল্যেও বহু ভূমিদান ও ভূমি বন্দোবস্ত ঘটতে থাকে। রাজ চক্রবর্তী পুরুষোত্তম করকে প্রথম রাজা শ্রীপতি ডাঙ্গরসাই মৌজা দান করেছিলেন। এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন রাজার সময় অব্যাহত ছিল। এমনকি রাজপরিবারের বিভিন্ন রাজপুরুষ বিভিন্ন মৌজা বা মৌজাসমূহ ভোগদখল করতেন। যেমন ষষ্ঠ রাজা মোহনদাসের ভাই নবজীবন চিলতোড় মৌজায় ডেরা বেঁধেছিলেন। জড়িষ্যা গ্রামের ইতিহাসও একই রকমের।

দশম রাজা রাধানন্দের রাজত্বকালে সিমলাপালের সাথে মল্লরাজের বিরোধ ঘটে। রাজা রাধানন্দের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মল্লরাজ চকিতের অভিযানে রাধানন্দকে আটক করে নিয়ে যায়। এসময় রাজার সাথে বিরোধের কারণে রাজার বীরভ্রাতা রাধামাধব রাজ্য ছেড়ে রাইপুরে অবস্থান করছিলেন। রানীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মল্লসেনাকে তাড়া করে তিনি ধ্বাজোড়ের কাছে বাইকুলির বাগানে অবরুদ্ধ করে ফেলেন। তারপর সময় বুঝে অতর্কিতে হানা দিয়ে ভোজনরত মল্লসেনাকে কাবু করে ও বীরত্বের সাথে সিমলাপালের রাজাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। রাজ্য পুনরুদ্ধারে ভাইয়ের অবদানের স্বীকৃতিতে রাধামাধবকে রাজা মল্লভূম ও সিমলাপালের সীমান্তবর্তী ধাদকিডাঙ্গা, রাণিয়ারা, পাথরখামার, শ্রীরামপুর, লক্ষণপুর, চাকড়াশোল, মণিপুর ও রাজধানীর সন্নিকটের জড়িষ্যা মৌজার দায়িত্ব দেন।

ক্রমে রাধামাধবের বীরত্বের কাহিনী জোরালো করতে তার স্বেচ্ছায় সমর্পণ, মল্ল-কারাগার থেকে প্রত্যহ বাইরে বেড়িয়ে আসা, মল্লরাজের মুগ্ধতা ও মুক্তিলাভের কাহিনি, সিমলাপাল রাজের আদেশে ঘোড়ায় চড়ে সীমান্ত চিহ্নিত করার পুরান লোককথা শ্রীপতির অনুকরণে তাঁর জীবনীর সাথেও জুড়ে দেওয়া হয়। এর ঐতিহাসিক নথি তেমন না থাকলেও স্থানীয় লোককথায় বেঁচে আছে এসব কাহিনী। এ কাহিনী রাধামাধব না প্রতিষ্ঠাতা শ্রীপতির তা নিয়ে সংশয় রয়েই গেছে। ১৬১৭ সালে রাজ পরিবারের বিভাজন নিয়ে পরের অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

আরেকটি প্রামাণ্য নথি হল নটবর সিংহের ডায়েরী। রাজা চিরঞ্জীব সিংহ চৌধুরীর রাজত্বকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়। তাঁর মৃত্যুকালে পুত্র নটবর ছিলেন নাবালক। ১২৩৮ বঙ্গাব্দ থেকে ১২৫১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সিমলাপালের শাসন কোর্ট অব ওয়ার্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। তিনি ১৩১২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। এই সময় তিনি রাজপরিবারের ইতিহাস একটি ডায়েরীতে লিখে রাখেন যা 'নটবর সিং'এর ডায়েরী নামে পরিচিত। এর থেকে সিমলাপাল রাজবংশের অনেক অজানা

তথ্য জানা যায়। যদিও এর ঐতিহাসিক শুদ্ধতা নিয়ে অনেকের সংশয় আছে।

ঐতিহাসিক রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর মতে এই রাজবংশটি প্রজানুরঞ্জনের কোন সাক্ষ্য রাখতে পারেনি। ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনাপর্বে ফারগুসনের জঙ্গলমহল অভিযানের সময় বিনা বাধায় ব্রিটিশের বশ্যতা স্বীকার শুধু নয়, লোকবল ও অর্থবল দিয়ে সেই সামরিক অভিযানকে সাহায্য করেন।[৫] তবে তথ্য প্রমাণ থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এই পরিবার সিমলাপালের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে সদর্থক ভূমিকা নেয়নি। ১৮৯৪-৯৫ সাল পর্যন্ত এই থানায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল মাত্র আটটি। ২৯শে এপ্রিল, ১৮৮৫ সালে জেলা কালেক্টরের একটি পত্রে উল্লেখ আছে 'সিমলাপালের জমিদারের রায়তরা একজোট হয়েছে এবং এর ফল স্বরূপ চলছে নিরন্তর মামলা-মোকদ্দমা। খাতরা মুন্সেফ উভয় পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়া সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন।'[৬] অর্থাৎ প্রজাহিতৈষণা ও সামাজিক উন্নয়নে এই রাজবংশ তেমন ছাপ ফেলতে পারেনি। প্রজারাও ছিল সার্বিক ভাবে অসুখি। তবে কিছু ব্রিটিশ নথিতে ব্রিদ্রোহীদের সাথে সিমলাপালের রাজার যোগ নিয়ে সন্দেহ ও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সুতরাং সবসময় এই রাজবংশ ব্রিটিশ সহযোগী ভূমিকা নিয়েছে এটি অতি সরলীকরণ বলেই মনে হয়। আর স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে পরিবারটির ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

সিমলাপালে সেচের সুযোগ বাড়াতে কুলাই খাল প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল ব্রিটিশ শাসকের পরামর্শে। সেসময় পরগণায় বিঘা প্রতি রাজস্ব আদায় হত ৪-৭ পয়সা।

বিংশ শতকের প্রথমের দিকে সিমলাপালের রাজবংশের তালিকা ও রাজত্বকাল নিম্নরূপ। যদিও এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা কাল নিয়েও ভিন্ন মত আছে। যাইহোক রাজবংশে রক্ষিত বংশপঞ্জি নিম্নরূপ।

১) নকুড় তুঙ্গসমকালীন শ্রীপতি মহাপাত্র(১৪৬৩-১৪৯৪)
(রাজ চক্রবর্তী পুরুষোত্তম করকে প্রথম রাজা শ্রীপতি ডাঙ্গরসাই মৌজা দান করেছিলেন)

২) মাধব মহাপাত্র (১৪৯৪-১৫২৪)

৩) জগন্নাথ মহাপাত্র (১৫২৪-১৫৪৫)

৪) বাসুদেব মহাপাত্র (১৫৪৫-১৫৫৮)

৫) জগন্নাথ ভ্রাতা বলরাম মহাপাত্র (১৫৫৮-১৫৮০)
(বৈষ্ণব, শ্রীনিবাস ও হেমলতার অনুগামী ছিলেন।)

৬) মোহনদাস মহাপাত্র (১৫৮০-১৫৯৩)
(মোহনদাসের ভাই নবজীবন (প্রহরাজ) চিলতোড় মৌজায় ডেরা বেঁধেছিলেন, হেমলতার শিষ্য।)

৭) চিরঞ্জীব সিংহ (১৫৯৩-১৬১৫)

(কৃষক নেতা দ্বাবিংশ কাশ্যপের প্রজাবিদ্রোহের মুখে সাময়িক ক্ষমতাচ্যুতি ঘটে।)

৮) লক্ষ্মণ সিংহ (১৬১৫-১৬৫২)

(এই সময়ে রাজ্যের বিভাজন ঘটে, ভাই লস্করের হাতে ভেলাইডিহার পত্তন)[৭]

৯) কৃষ্ণদাস সিংহ (১৬৫২-১৬৯৩)

(১৬৬২ সালে আটচালা বলরাম মন্দির প্রতিষ্ঠা)[৮]

১০) রাধানন্দ সিংহ (১৬৯৩-১৭২৮)

(এর রাজত্বকালে সিমলাপালের সাথে মল্লরাজের বিরোধে রাজত্ব হাতছাড়া হয়)

১১) বলরাম সিংহ (১৭২৮-১৭৭৫)

(ফার্গুসনের অভিযানের সময় ব্রিটিশের অধীনতা স্বীকার ও অভিযানে সহায়তা। পার্শলা গ্রামের মল্লিকদের পটের দুর্গা পূজার অনুমতি দেন। ১৭৭৩ সালে পালকুণ্ডা প্রান্ত দিয়ে সন্ন্যাসীরা পলায়ন করে।)

১২) জগন্নাথ সিংহ (১৭৭৫-১৮২০)

(জমিদার শুধু নয়, পাইকান জমি অধিগ্রহণের পর পাইক ও সর্দাররা জমি থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে বিদ্রোহী হন। শুধু তাই নয়, জমিদারি হারানো বগরীর রাজারাও লুণ্ঠনের আশ্রয় নেন। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাস জুড়ে বগরীর রাজা যদু সিংহ প্রতিবেশী রাইপুর ও সিমলাপালকে লুণ্ঠনে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন।)

১৩) চিরঞ্জীব সিংহ চৌধুরী (১৮২০-১৮৩১)

(এর রাজত্বকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয় ৯৯৩ তৌজির জমিদারি ৮২২.২৫টাকা বাৎসরিক আদায়ের শর্তে। কান্ত মহারাজের আশ্রমে জমি দিয়েছিলেন কান্ত-গুরু সেবারামের আগের সাধু কাঙালীচরণ দাসমহন্তকে (পরের পরিচালক গঙ্গা ও দামোদর)। রাজা মদনমোহন ও শ্যামসুন্দরও জমিদান করেছিলেন।)

১৩ক) কোর্ট অব ওয়ার্ড (১৮৩১-১৮৪৪)

১৪) নটবর সিংহ চৌধুরী (১৮৪৪-১৯০৫)

(রাজপরিবারের ইতিহাস একটি ডায়েরীতে লিখে রাখেন, বিক্রমপুরের আটচালা রাধাকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৭০ সালে। রাজার বিরুদ্ধে বাদাগেড়িয়ার রাম মাশান্ত, রাজমাতুল কেশিকচার লক্ষণ পাত্র, ভূতশহরের শ্যাম যন্নিগ্রাহী খাজনা প্রত্যাহারের দাবিতে যে আন্দোলন করে তা কুমেট আন্দোলন নামে পরিচিত। রাজস্ব বৃদ্ধি প্রত্যাহার করা হয়। সিপাহী বিদ্রোহে ব্রিটিশকে সাহায্য করেন।)[৯]

১৫) মানগোবিন্দ সিংহ চৌধুরী (১৯০৫-

১৬) জগবন্ধু সিংহ চৌধুরী (১৯০৫-১৯০৯)

(১৯০৮ সালের দুর্ভিক্ষ ত্রাণে ১৯১ টাকা সংগ্রহ করা হয়, রাজস্ব অনাদায়ে ৯৯৩ নং তৌজি ক্রোক হয়, রাইপুর বলভদ্রের থেকে ১০০০ বিঘার জঙ্গল কেনেন)[১০]

১৭) মদনমোহন সিংহ চৌধুরী (১৯০৯-১৯২৭)

(বর্তমান বলরাম মন্দির ও শিব মন্দির ১৯৩৭ সালে পূর্ণতা পায় তাঁর হাতে। এলাকার জৈন

সহ বিভিন্ন প্রাচীন মূর্তি মন্দির গাত্রে গেঁথে দেওয়া হয়। ছয়টি মেলার মালিক।)

১৮) শ্যামসুন্দর সিংহ চৌধুরী (১৯২৭-১৯৫৫)

(মদনমোহন উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৯৩৮ সালে সিমলাপালের পূর্ববর্তী রাজা ও পিতা মদন মোহনসিংহ চৌধুরীর নামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন)

শেষ রাজা ছিলেন শ্যামসুন্দর সিংহ চৌধুরি। তাঁর তিন ছেলে। বড় ছেলে কল্যাণী প্রসাদ সিংহ চৌধুরি ১৯৮৪ সালে পথ দুর্ঘটনায় মারা যান। মেজো ছেলে অমিয় প্রসাদ সিংহ বিদেশে থাকতেন। আর ছোট ছেলে দেব প্রসাদ সিংহ বড় ঠাকুর এখন সিমলাপালেই থাকেন। চিরঞ্জীব এর পুত্র। সিমলাপাল রাজবংশের সাথে মল্লভূম ও ভেলাইডিহা রাজপরিবারের বিভিন্ন ঘটনাক্রমের যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল। সেই ঘটনাক্রম যথার্থ অনুধাবনে নিচের বংশ-তুলনা-চিত্র-সহায়ক হবে

| প্রজন্ম | সিমলাপাল রাজবংশ | ভেলাইডিহা রাজবংশ | মল্ল রাজবংশ |
|---|---|---|---|
| ১ম | শ্রীপতি মহাপাত্র (১৪৬৩-১৪৯৪) | | |
| ২য় | মাধব মহাপাত্র (১৪৯৪-১৫২৪) | | |
| ৩য় | জগন্নাথ মহাপাত্র (১৫২৪-১৫৪৫) | | |
| | বলরাম মহাপাত্র (১৫৫৮-১৫৮০) | | |
| ৪র্থ | বাসুদেব মহাপাত্র (১৫৪৫-১৫৫৮) | | হাম্বীর মল্লদেব (১৫৬৫-১৬২০) |
| ৫ম | মোহনদাস মহাপাত্র (১৫৮০-১৫৯৩) | | ধারীহাম্বী মল্লদেব (১৬২০-১৬২৬) |
| ৬ষ্ঠ | চিরঞ্জীব সিংহ (১৫৯৩-১৬১৫) | | রঘুনাথ সিংহদেব (১৬২৬-১৬৫৬) |
| ৭ম | লক্ষ্মণ সিংহ ১৬১৫-১৬৫২) | লস্কর সিংহ চৌধুরী | বীরসিংহদেব (১৬৫৬-১৬৪২) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৮ম | কৃষ্ণদাস সিংহ (১৬৫২-১৬৯৩) | গৌরমোহন | দুর্জনসিংহদেব (১৬৪২-১৭০২) |
| ৯ম | রাধানন্দ সিংহ (১৬৯৩-১৭২৮) | নন্দলাল | রঘুনাথসিংহদেব (১৭০২-১৭১২) |
| ১০ম | বলরাম সিংহ (১৭২৮-১৭৭৫) | কৃষ্ণলাল-ভবানী সিংহ হিকিম | গোপাল সিংহদেব (১৭১২-১৭৪৮) |
| ১১তম | জগন্নাথ সিংহ (১৭৭৫-১৮২০) | রামচন্দ্র সিংহ চৌধুরী | চৈতন্য সিংহদেব (১৭৪৮-১৮০১) |
| ১২তম | চিরঞ্জীব সিংহ চৌধুরী (১৮২০-১৮৩১) | হরলাল | মাধব সিংহদেব (১৮০১-১৮০৯) |
| ১৩তম | নটবর সিংহ চৌধুরী (১৮৪৪-১৯০৫) | চৈতন্যচাঁদ | গোপাল সিংহদেব (১৮০৯-১৮৭৬) |
| ১৪তম | মানগোবিন্দ সিংহ চৌধুরী (১৯০৫—) জগবন্ধু সিংহচৌধুরী (১৯০৫-১৯০৯) | প্রাণবল্লভ (১৯১০-১৯৪৯) | রামকৃষ্ণ সিংহদেব ২য় (১৮৮৫-১৮৮৯) |
| ১৫তম | মনদমোহন সিংহ চৌধুরী (১৯০৯-১৯২৭) | বিজয়চন্দ্র (১৯১০-১৯৪৯) | ধ্বজামণীদেবী (১৮৮৫-১৮৮৯) |
| ১৬তম | শ্যামসুন্দর সিংহ চৌধুরী (১৯২৭-(১৯৫৫) | প্রদ্যোৎকুমার | নীলমণি সিংহদেব (১৮৮৯-১৯০৩) |
| ১৭তম | কল্যাণীপ্রসাদ-দেবপ্রসাদ | রজতকান্তি | রাজানেই (১৯০৩-১৯৩০) |
| ১৮তম | চিরঞ্জীব | রাজর্ষি | কালীপদ সিংহঠাকুর (১৯০৩-১৯৩০) সলিল/জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ ঠাকুর |

## মল্লভূমের সাথে বিরোধ ও মিত্রতা

একটি সূত্রে প্রচারিত মল্লভূমের সাথে বিরোধের আবহে সিমলাপাল রাজ্যের পত্তন হয়েছিল। কিন্তু সেটি ছিল নেহাতই জনশ্রুতি। কারণ পঞ্চদশ শতকের মাঝভাগে যখন সিমলাপাল পরগণার পত্তন হয়, তখন মল্লভূমির শক্তিবৃত্ত স্থানিক পরিসরেই সীমাবদ্ধ ছিল। বরং বিরোধের ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলে দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের সাথে রাধানন্দ সিংহ মহাপাত্রের। এ সময় রাজা রঘুনাথ প্রতিবেশী রাজ্যগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করছিলেন। এসময় রাজা রাধানন্দের সাথে ঘোরতর বিবাদ চলছিল ভাই রাধারমণের, যিনি দেশত্যাগ করে রাইপুরে অবস্থান করছিলেন। চকিত আক্রমণে রাধানন্দকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার কালে রানীর অনুরোধে রাধামাধব মল্লসেনাকে তাড়া করে ধ্বজোজের বাইকুলি বাগানের লড়াইয়ে রাজাকে মুক্ত করতে সক্ষম হন। মল্লরাজের সাথে মিত্রতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। রাধারামণও জড়িষ্যা কেন্দ্রিক উপরাজ্যের দায়িত্ব পান। উল্লেখ করা যায় হাম্বির সমকালীন রাজা বলরাম ও মোহনদাস মহাপাত্রর সময়েও এই মিত্রতার সম্পর্ক জোরদার ছিল। সেকারণেই মল্লভূমির গোড়াশোল গ্রামে শ্রীনিবাস কন্যা হেমলতা প্রবর্তিত উৎসবে যোগ দিতেন সিমলাপালের রাজারা। উভয় রাজ্যের বৈষ্ণব ভাবধারার প্রতি আনুগত্য পরস্পরকে আরো কাছে এনেছিল।

## সিমলাপাল পরগণার বিভাজন

সিমলাপালের ষষ্ঠ রাজা মোহনদাসের সময়ে যেমন পরগণায় সুশাসনের আভাস পাওয়া যায় তেমনি মোহনদাস-পুত্র চিরঞ্জীবের সময়ে অপশাসন, প্রজানিপীড়ন, রাজস্ব বৃদ্ধিজনিত প্রজাপ্রতিরোধ, দশ পুত্রের পারস্পরিক বিরোধ রাজশক্তিকে পতনের কিনারায় নিয়ে যায়। মোহনদাসের দুইভাই হলেন দশরথি ও নবজীবন। হাম্বীরের(১৫৯১-১৬১৬) সমকালীন মোহনদাসের ভাই দশরথি বৈষ্ণব মল্লরাজ পরিবারের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। রাজবাড়ি সংলগ্ন অংশে তিনি স্থাপন করলেন কৃষ্ণ-বলরামের দক্ষিণমুখী মাকড়া পাথরের আটচালা মন্দির(মন্দিরের গাত্রে ক্ষোদিত জৈন-হিন্দু প্রাচীন মূর্তি থেকে এলাকার প্রাচীনত্ব ও রাজপরিবারের সংরক্ষণ স্পৃহা প্রমাণিত)। এই সময় রাইপুর পরগণা ছিল অন্তর্বিরোধ ও অভ্যন্তরীণ গোলযোগ জর্জরিত। এই বিবাদ নিরসনে ভূমিকা নিতে নবজীবন রাইপুরের চিলতোড় মৌজায় ডেরা বাঁধেন। উল্লেখ্য এই অশান্ত সময়েই স্থানীয় ভূমিজ দলপতির রাইপুর শাসন

বিক্ষোভ ও বহিরাক্রমণ (সম্ভবত আফগান আক্রমণ) কবলিত হয়ে পড়েছিল। এই সব আক্রমণে ভূমিজ শাসনের অবসান ঘটলে রাজপুরোহিত সেই সুযোগে রাজদন্ড ধারণ করেন। তবে শীঘ্রই মল্লরাজ বংশের ফতে বা রঘুনাথ সিংহ এই রাজবংশের উচ্ছেদ ঘটিয়ে বর্তমান রাজবংশের পত্তন ঘটান। এদিকে চিরঞ্জীব সিংহচৌধুরীর (মোহনদাসের সময় 'মহাপাত্র' পদবি 'সিংহচৌধুরী' উপাধিতে রূপান্তরিত হয়) শেষ দিকে বা তার জীবনাবসানের পর ব্যাপক প্রজা অসন্তোষের ফলে কার্যত মহাপাত্র বংশের জমিদারির অবসান ঘটে। প্রজাদের মধ্যে উৎকল ব্রাহ্মণ 'দ্ববিংশ কাশ্যপ' এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। ১৬১৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে প্রায় দুই বছর এই অরাজকতা চলতে থাকে। অবশেষে ঘোর অরাজকতা ও ভ্রাতৃবিরোধ কবলিত সিমলাপাল পরগণায় শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের বিচারক জন হার্বার্ট হ্যারিংটন মীমাংসা করে পরগণাকে তিন ভাগে বিভাজিত করেন। তিন ভাইয়ের লক্ষ্মণ পান ছয় আনা পরিমাণ সিমলাপাল (চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ৮২২ টাকা বার্ষিক খাজনার ৯৯৩ নং তৌজি), লস্কর পান ছয় আনা পরিমাণ ভেলাইডিহা (৯৯০ নং তৌজি)। লস্কর প্রথমে তরুপুর ও পরে ভেলাইডিহা মৌজায় রাজধানী তৈরি করেন। অন্য ভাই বিক্রম পান বর্তমান চার আনার বিক্রমপুর। রাজা বিক্রমের অকালমৃত্যু হলে রানী তারাসুন্দরী রাজা নির্দেশিত রাধাদামোদর মন্দির বিষ্ণুপুরের কারিগরদের দিয়ে নির্মাণ করেন ১৬২৩-১৬৩৩ সালের মধ্যে। এটি হয়েছিল কৃষ্ণপুর মৌজায় দাশ পরিবারের দানকৃত ৮২ শতক জায়গায়। ছিল অষ্টধাতুর রাধাকৃষ্ণ। দেবোত্তর জমি ছিল ১০০ বিঘা। অপুত্রক রানীর শাসনকালেই বিক্রমপুর মূল সিমলাপাল পরগণার সাথে যুক্ত হয়ে যায়। এই পরিবারের ধর্মীয় নিষ্ঠা-আচার বংশপরম্পরায় অব্যাহত ছিল। পরবর্তী রাজা চিরঞ্জীবের সময় চতুর্থ ভ্রাতা বীর সিংহের পত্নী রূপমঞ্জরী 'সতী' হয়েছিলেন বলে কথিত ও তাঁর পিতৃকুলকে রাজার দেওয়া নিষ্কর ২২ বিঘা জমি 'সতীর দান' নামে পরিচিত। রাজা মদনমোহন সিংহচৌধুরী ২২ বিঘা জমিদান করেছিলেন বিদ্যালয়, পাঠাগার ও আশ্রম নির্মাণের জন্য। তুঙ্গভূমরাজে বদান্যতায় শ্রীপতি মহাপাত্র নীলজড়া মৌজা সহ সাতটি মৌজার মালিক থেকে ক্রমে বড় পরগণার রাজা হন। তাঁর সাফল্য উৎসাহী উৎকলবাসীদের মধ্যে ছিল কাশ্যপ মহাপাত্র, জামদগ্নি পাত্র, মৌদগল পতি, বশিষ্ঠ সৎপথী, কাত্যায়নী পান্ডা, খুন্তিগাড়া পাইন, বাৎস্য ষন্নিগ্রাহী ও কাশ্যপ মহান্তী (সমগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ হলেও শাসক মহাপাত্র ও বিত্তবান মহান্তীদের মধ্যে এই সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল)। সেই অখন্ড সিমলাপাল পরগণা এভাবেই ত্রিধাবিভক্ত ও পরে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে।

## সিমলাপালের দুর্গাপূজার বিশেষ প্রথা

সিমলাপালের রাজবাড়ীর দুর্গাপূজা মহা সমারোহের সাথে পালিত হয়। প্রাচীন প্রথা মোতাবেক সপ্তমীর দিন তিনটি ছাগল, তিনটি কুমড়ো, অষ্টমীর সন্ধি পুজোয় ১১ টি ছাগল, ছাঁচি কুমড়ো ও আখ এবং নবমীর দিন পাঁচটি করে ছাগল, ছাঁচি কুমড়ো ও আখ বলি দেওয়া হত। এছাড়াও এলাকার বহু মানুষের মানত করা শতাধিক ছাগল বলি দেওয়া হত। অষ্টমীর সন্ধি পুজোয় বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের তোপধ্বনির পরে এখানেও তোপ দাগার রেওয়াজ ছিল। এখন অবশ্য রাজপরিবারের সদস্যদের পশু হত্যা বিরোধী মনোভাবের জন্য ছাগল বলির বদলে আখ ও ছাঁচি কুমড়ো বলি দেওয়া হয়। পুজোয় মল্লভূমির তোপধ্বনি অনুসরণের মধ্য দিয়ে মিত্রতামূলক আনুগত্য প্রকাশিত হয়।

জেলাবোর্ডের রেকর্ড মোতাবেক মদনমোহন সিংহচৌধুরীর মালিকানায় পরগনায় যে সমস্ত মেলা পরিচালিত হত তা হল রাজবাটীর দোলমেলা-দুর্গামেলা, দুবরাজপুরের গাজনমেলা, জামিরডিহার পৌষমেলা, নেত্রপালের নেত্রপালমেলা, বাণেশ্বরের চৈতগাজন মেলা। ছয়টি মেলা থেকে আয় ছিল ১২টাকা। সরকারকে দেয় ছিল মেলা প্রতি ১ টাকা।

## কুবেরের 'পেতে'র ইতিহাস

এই রাজবংশ উৎপত্তিগত কারণে ওড়িয়া প্রভাবিত বৈষ্ণব সাধনায় রত হলেও মল্লভূমের গৌড়ীয় ভাবধারা থেকে দূরে ছিল না। গোস্বামীদের শিষ্যত্বও গ্রহণ করেতেন। বিশেষত মল্লভূম শ্রীনিবাসের আগমন ও ভক্তিরস সিমলাপালের ভাবনায় আলোড়ন তুলেছিল ও শ্রীনিবাস আচার্যের সাথে রাজবংশের সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। এমনকি শ্রীনিবাস কন্যা হেমলতার সাথেও যোগাযোগ বজায় ছিল। ওন্দা থানার গোড়াশোল গ্রাম বৈষ্ণবীয় ভাবধারার এক কেন্দ্র হয়ে ওঠে। কারণ শ্রীনিবাস আচার্যের পৌত্র মুরলীধর গোস্বামী মল্লরাজার কাছে প্রভূত নিষ্কর ভূসম্পত্তি পেয়ে গোড়াশোলে স্থায়ীভাবে বাসস্থান গড়ে তুলেছিলেন। প্রতিষ্ঠিত হয় বংশীবদন, লক্ষ্মীনারায়ণ, রঘুনাথজীউয়ের মূর্তি। এখানে শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতার আরাধ্য রাধারমণ জীউয়ের রাস উৎসব পালিত হয় ফি বছর ১৯-২১শে অগ্রহয়ণ। তাছাড়া বিষ্ণুপুরের রাধারমণ জীউ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস ব্যাপী অবস্থান করে

গোড়াশোলে। রীতি মেনে গ্রীষ্মকালে ঠাকুরকে রাত্রে রাতভোগ হিসাবে জল ছাঁকা ভাত দেওয়া হয়। এই রীতি সম্পর্কে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। সমকালীন সিমলাপাল রাজ বলরাম বা মোহনদাস মহাপাত্র গোড়াশোলে সপার্ষদ হঠাৎ এক রাতে প্রসাদ পেতে হাজির হন। সবাই যখন নিঃশেষিত প্রসাদ নিয়ে চিন্তিত, তখন সাধিকা হেমলতা এক পিঁড়ির উপর বসে নিজে জল থেকে ছেঁকে ছেঁকে তুলে ভাত-প্রসাদ পরিবেশন করেছিলেন রাজা ও তাঁর অনুগামীদের। ফুরিয়ে যাওয়ার পর এত ভাত অলৌকিক ভাবে সংগৃহীত হওয়ায় ওই পিঁড়ি অদ্যাবধি গোস্বামী বংশ এলাকার বিভিন্ন মাঙ্গলিক কাজে 'কুবের পেতে' সম্পাদন করেন যাতে ভক্ত মন্ডলীর কুবেরের মত অফুরান সৌভাগ্য-ধন প্রাপ্তি ও বৃদ্ধি ঘটে। 'কুবের পেতে' অর্থাৎ সৌভাগ্য লাভের জন্য হেমলতা ব্যবহৃত 'পিঁড়ি' পূজায় ব্যবহার।

## পার্শ্বলা গ্রামের মল্লিকদের দুর্গা পূজার ইতিহাস

সিমলাপালের রাজারা অনেক সময় সাধারণ মানুষের ইচ্ছা পূরণেও নানা বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন। তার বড় উদাহরণ পার্শ্বলা গ্রামের দুর্গা পূজা পত্তনের কাহিনী। সিমলাপালের পার্শ্বলা গ্রামে পারিবারিক পটের পুজোই এখন সর্বজনীন রূপ পেয়েছে। প্রতিষ্ঠাতা ক্ষেত্রমোহন মল্লিকের বর্তমান বংশধররা ক্ষেত্রমোহনের নামে পূজা কমিটি বানিয়ে এই পুজো চালিয়ে যাচ্ছেন। ক্ষেত্রমোহনের সিমলাপাল আগমনের আগে গোঘাটের শ্যামবাজার ফুলুই গ্রামে এই পরিবারের পুজো হতো। পূর্বপুরুষরা থাকতেন সেখানেই। সেখানে দুর্গাপুজো হতো মাটির তৈরি প্রতিমাতেই। কিন্তু পুজো চলাকালীন পূর্ব পুরুষরা বাঁকুড়া জেলার সিমলাপালের পার্শ্বলায় তা স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা নেন। কিন্তু রাজা মূর্তি প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেননি। সেই সময় রাজা মূর্তির ছবি এঁকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ বা অনুমতি দেন। তার জেরে ক্ষেত্রমোহন মল্লিক ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা পার্শ্বলা গ্রামে পটের পুজো শুরু করেন। সম্ভবত এই ঘটনা ঘটেছিল রাজা বলরাম সিংহ (১৭২৮- ১৭৭৫)-এর সময়ে। সেই থেকে এখানে পটে এঁকে দেবী দুর্গার পুজো হয়ে আসছে। এই পুজোয় অষ্টমী ও নবমীতে এখনও পাঁঠা বলির রীতি রয়েছে। বংশ বিস্তারের ফলে পুজোটি অন্য জায়গাতেও ভাগ হয়েছে। পার্শ্বলার পাশাপাশি আকখুঁটা, কুকড়াকন্দরেও পুজো হয়। নিয়ম মেনে পুজোর পর ঘট ও কলাবউয়ের বিসর্জন দেওয়া হয়। কিন্তু পট থেকে যায়। বছরের পর বছর ঐ পটেই মা পূজিতা হন।

## জড়িষ্যা গ্রামের সিংহ মহাপাত্র

জড়িষ্যা গ্রামের সিমলাপাল রাজের অনুগৃহীত ভূস্বামী ছিলেন সিংহ মহাপাত্র বংশ। এই বংশ আদপে রাজার শাখা বংশ। সে সময় রাজা ছাড়া অন্য রাজকুমার বা রাজভ্রাতাদের বিভিন্ন মৌজার দায়িত্ব দেওয়া হত। রাজা রাধানন্দ সিংহ (১৬৯৩-১৭২৮)-এর ভাই রাধামাধবকে জড়িষ্যা সহ বিভিন্ন মৌজার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। রাজার শাখা বংশের রাজপুরুষদের পদবী ছিল মহাপাত্র, সিংহ মহাপাত্র, সিংহবাবু প্রভৃতি। একশ বছর আগে সিমলাপালের রাজকন্যার সাথে পুরুলিয়ার এক বিশিষ্ট পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু কোন কারণে পুরুলিয়াতে তাদের অবস্থান অসুবিধা হয়ে উঠলে সিমলাপালে এই দম্পতিকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস শুরু হয়। এই সময় জাড়িষ্যা গ্রামের সিংহ মহাপাত্র পরিবার এগিয়ে আসে গ্রামে ভূসম্পত্তি দিয়ে আত্মীয় এই পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করতে। শেষে রাজার অনুমোদন ক্রমে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাজকন্যা ও গ্রামের রাজার শাখা বংশ ভাই-বোন সম্পর্ক মেনে একত্রেই আনন্দে দিন যাপন করতে থাকেন। সিমলাপালের মধ্যে এমন ভাবে বিভিন্ন গ্রামের নিজস্ব ইতিহাস গড়ে উঠেছে।[১১]

## মহাপাত্র বংশের আদি বাসস্থান উড়িষ্যার বীররামচন্দ্রপুর

রাজপরিবার সূত্রে ও আঞ্চলিক গবেষকদের মতে মহাপাত্র রাজ বংশের আদি নিবাস ছিল বীররামচন্দ্রপুর।[১১ক] পুরী থেকে ভূবনেশ্বরগামী সড়কের ১৫ কিমি আগে ডান দিকের একটি প্রাচীন গ্রাম এই বীররামচন্দ্রপুর। এই গ্রামের তিন কিমি আগে সাক্ষীগোপালের মন্দির অতি প্রাচীন ও প্রখ্যাত। ওড়িষ্যা থেকে আগত উৎকল ব্রাহ্মণরা রাঢ় বাঁকুড়ায় এসেও এই সাক্ষীগোপালের ভক্তি মিশ্রিত স্মৃতি রোমাঙ্থন করতেন। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার একটি জনশ্রুতি আছে। কথিত আছে দুই ব্রাহ্মণের ঝগড়ার সাক্ষী দিতে বৃন্দাবন থেকে গোপাল এসেছিলেন। শর্ত ছিল তার আসার পথে তাকে পেছনে ফিরে কেউ দেখবে না। কিন্তু একজন ব্রাহ্মণ তার কৌতূহল চাপতে না পেরে পিছনে ফিরে দেখেন। তখনই গোপাল পাথর হয়ে যান। এটি দক্ষিণ ভারতের বিদ্যানগরের ঘটনা। সেখান থেকে এই গোপালকে পুরীর রাজা প্রথমে কটক, পরে বীররামচন্দ্রপুরে প্রতিষ্ঠা করেন। মূর্তির উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট। কষ্টি পাথরের তৈরি পাশেই চার ফুটের রাধার মূর্তি। এছাড়াও একটি অষ্টভুজ শ্রী

লক্ষ্মী নারায়নের মূর্তি আছে। সাক্ষীগোপাল বাজারের কাছে চন্দন পুষ্করিণী নামের একটি পুকুর আছে।পুকুরের মাঝে জলের ভেতর একটি মন্দিরও রয়েছে। চন্দনপুকুরে সাক্ষীগোপালের বিজয় বিগ্রহের চন্দন যাত্রা প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়। চন্দন যাত্রা এখানকার শ্রেষ্ঠ উৎসব। লক্ষ লক্ষ যাত্রী এই সময়ে শ্রীরাধার পাদপদ্ম দর্শন করতে আসেন।

বীররামচন্দ্রপুর গ্রামটি একশ শতাংশ উৎকল ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত। গ্রামে আছে একটি দুর্গা মন্ডপ ও পাশেই ছোট্ট পুরনো দেবী দুর্গার মন্দির। এটি মনিনাগ দুর্গা নামে পরিচিত। এছাড়াও মন্দিরের ভিতরে রয়েছে গোপীনাথ জীউর অষ্টধাতুর মূর্তি। তার পাশে রাধার মূর্তি। খুব ধুমধাম করে দুর্গাপূজা হয়। আশ্বিন মাসের প্রতিপদে শুরু হয়ে ষোল দিন পরে বিজয়া দশমীর দিন শেষ হয়। মন্দিরের পাশে একখানা রথ রয়েছে। প্রতিবছর এই সময়ে এই রথে করে মা মনিদুর্গাকে প্রতিটি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তার উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করা হয়। এছাড়াও এবং শীতল ষষ্ঠী ও আষাঢ় মাসে চম্পক উৎসব খুব ধুমধাম সহকারে পালন করা হয়। শীতল ষষ্ঠীতে আতশবাজির খেলা হয়। মনে হয় সিমলাপালে শ্রীপতি মহাপাত্রের আগমনের সূত্রে যেমন সেখানে বৈষ্ণবীয় ভাবধারা প্রচারিত হয়, তেমনি বীররামচন্দ্রপুরে বঙ্গদেশের দুর্গাপূজা প্রচলিত হয় পারস্পরিক যোগাযোগের প্রভাবে।

## সিমলাপালের দুর্ভিক্ষ ও ত্রাণ ভাবনা

ব্রিটিশ নথি থেকে দেখা যায় ১৮৯৭ সালে সিমলাপালে অনাবৃষ্টি, শস্যহানি, মন্বন্তর ও অনাহারের ঘটনা ঘটে। কালেক্টর কিরস্কলে ও কমিশনার এস এল ম্যাডক্সের হিসাবে ১৯০৮ সালে সিমলাপাল পরগণার প্রায় এক তৃতীয়াংশ দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়ে পড়েছে। সিমলাপালের ৩০০০০ ও তালডাংরার ২৫০০০ মানুষ এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই পৌনঃপুনিক অভিঘাত থেকে মুক্তি পেতে সরকারি ও গণউদ্যোগে সিমলাপালে ৮ টি সেচ সমবায় গঠন করা হয়। এসময় সিমলাপালের জমিদার ছিলেন নটবর সিংহ চৌধুরী ও পরে মানগোবিন্দ সিংহ চৌধুরী। তালডাংরা থানায় বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সরকারী উদ্যোগে আমজোড় ও রুক্মিনী সেচ খালের দুটি পরিকল্পনা রূপায়ণ হাতে নেওয়া হয়। ১৯২৪ সালে ৭ই জানুয়ারী বাঁকুড়া এসে লর্ড লিটন এর অগ্রগতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

## সিমলাপালের শিক্ষা ও সংস্কৃতি

পরগনার শিক্ষা সংস্কৃতির বিস্তারে রাজাদের অবদান ছিল লক্ষণীয়। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা মদনমোহন সিংহচৌধুরীর দানকৃত জায়গায় ও আর্থিক সহায়তায় যে বিদ্যালয় গড়ে ওঠে পরবর্তীতে দাতার নামে হয় 'মদনমোহন উচ্চবিদ্যালয়।' রাজা শ্যামসুন্দর সিংহ চৌধুরীর (১৯০১-১৯৫৫) দানকৃত ২৫ বিঘা জমিতে ২০০৩ সালে 'কল্যাণীপ্রসাদ স্মৃতি ছাত্রীনিবাস' গড়ে উঠেছে। এলাকার বিদ্যাচর্চার প্রাচীনত্ব বোঝা যায় ১৬৬৫ সালের বিষ্ণুপণ্ডিতের নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কিত 'তাৎপটদীপিকা' গ্রন্থ ভূতশহর ও সন্নিহিত অঞ্চল থেকে আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। আর মিলেছে ১৮৮৭ সালের তর্কশাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থ। ১৮৫৪ সালে রাজীবলোচন তর্কালঙ্কার লিখেছিলেন গৌরীচন্দ্রের ব্যাকরণের ধাতুসূত্রের ব্যাখ্যা। এই গ্রামে পাওয়া গেছে ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দের শঙ্কারাচার্যের 'ষটপদী স্তোত্রম', জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'যতি বোধক', দশবল সিংহের 'জ্যোতিষ কারক' ইত্যাদি। লোকদেবতার অস্তিত্ব মেলে হাতিবাড়ীর বনপাহাড়ী ও বলদ্যাবুড়ীর উপাসনার মাধ্যমে। প্রথমটির উপাসক মাঝি সম্প্রদায়, দ্বিতীয়টির মাল সম্প্রদায়। নিত্যসেবা ও নারায়ণ সেবার হয় খিচুড়ি ভোগ। বনবাহাড়ীর জন্য মাংসও। বলদ্যাবুড়ী নামটি এসেছে সম্ভবত ব্যবসায়ীদের বলদ রক্ষাকারীর অনুষঙ্গে। বনদেবতা বনপাহাড়ীর সাথী দেবতা হল বাঘুত ও কালাপাহাড়।

সিমলাপালের রাজারা সঙ্গীতানুরাগীও ছিলেন। বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ বিষ্ণুপুর ঘরানার জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী ছিলেন রাজা শ্যামসুন্দর সিংহের মন্ত্রগুরু। শিষ্যের অনুরোধে তিনি সিমলাপালে থাকতে শুরু করেন ১৯৫৪-৫৫ সালের প্রায় দেড় বছর। এসময় সিমলাপালে সঙ্গীত আবহ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। রাজভ্রাতা হরসুন্দর সিংহঠাকুর তাঁর কাছে এসময় তালিম নেন। রাজার মৃত্যুর পর তিনি বিষ্ণুপুরে ফিরে যান।[১২]

## জমিদারি উচ্ছেদ

ঔপনিবেশিক সময়কালে সিমলাপালের জমিদারি নিলামের মুখে পড়েনি। কারণ ব্রিটিশের ভূমি রাজস্ব পরিশোধে সিমলাপালরাজ তৎপর ছিলেন। স্বাধীনোত্তর সময়ে জমিদারি অধিগ্রহণ আইনে এই জমিদারির পতন ঘটে। ১৯৫৩ সালের এই আইনে প্রায় ৫০০ বছরের এই রাজশাসনের সমাপ্তি ঘটে।

তথ্যসূত্র :

১. **F W Robertson, Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Bankura, Calcutta, 1926, p.12.**

২. **L S S O'Malley, Bankura District Gazetteers, Calcutta, 1908, p.172.**

৩. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০, পৃঃ ২০২। রাজপুত্রেরা যুবরাজ (সিংহ চৌধুরী), সিংহ হিকিম, সিংহ বড়ঠাকুর, সিংহবাবু উপাধি পেত বয়ঃক্রমানুসারে। যুবরাজ রাজা হলে বাকিরা বিভিন্ন মৌজায় ভুসম্পত্তি পেয়ে স্থিতু হতেন। ভেলাইডিহা রাজপরিবারেও একই রীতি অনুসৃত হত।

৪. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০, পৃঃ ৭৪।

৫. তরুণদেব ভট্টাচার্য্য, পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ১৩৭।

৬. **Letter of Bankura Collector to Burdwan Divisional Commissioner No. 99D/50-4-85 dated 29th April, 1885.**

৭. **L S S O'Malley, Bankura District Gazetteers, Calcutta, 1908, p.563-64**

৮. **B Ray, Bankura District Census Handbook, Calcutta, 1961, p.161.**

৯. অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, কলকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ১২০-২১।

১০. **Collector's Famine Relief Report, Bankura, 1908, para 31.**

১১. রামামৃত সিংহ মহাপাত্র, শিলাবতী উপত্যকার লোকায়ত প্রত্নজীবন, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ১৮। লেখক এই গ্রামে (জড়িষ্যা) মাটির নিচে মাকড়া পাথর ও ইট-চুনের কাঠামোর কথা বলেছেন। স্থানীয় মানুষ এটিকে পতিঙ্গা রাজার পতিঙ্গাগড় বলেন। কেশাতড়া-ইঁটাগড়া-মিশ্রগেড়্যা-দুর্গাবাঁধ সহ সিমলাপাল পরগণার বিভিন্ন স্থানে ধাতুশিল্পের পরিমণ্ডলের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। জৈন সংস্কৃতির অবশেষ মিলেছে হাড়মাসড়া, জাড়িষ্যা, সিমলাপাল, রামনগর, গোতড়া, গাড়রা, অলকধরা, লক্ষ্মীসাগর, আঁবাড়, বাঁকিপাল, মন্দিরা, বাগাল, হরিহরপুর, বাগাল, হরিহরপুর, আমাকোন্দা, লায়েকপাড়া, জামদা, খাঁদাসিনি বন, কেলাতড়া, সুলগীতে ও ইন্দপুরের কলমী, জোড়দা, ফুলকুসমা, বাগালকুন্দি, পাঁচপোখরিয়া, বালিয়াড়া, কেঁন্দবনা, যাঁড়েরডিহি, ভোজদা, মালিয়ান, বামনি, পাইড়া, ঝড়িয়াকোচায়। সিমলাপাল রাজবংশ শৈব পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিল বিক্রমপুর, জাড়িষ্যা, সিমলাপাল, হাতিবারিতে।

১১ক. বিজয় পাণ্ডা, মানভূম লোকসংস্কৃতির বিবিধ প্রসঙ্গ, সিউড়ী, ২০০১ (পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৬), পৃ.১৯। বীররামচন্দ্রপুরের উৎকল ব্রাহ্মণদের পুরীরাজ যাজকবৃত্তিতে আহ্বান জানালে নারাজ আট ব্রাহ্মণ পরিবার দেশত্যাগ করে রাঢ়ে চলে আসেন। অন্য মতে নিষ্কর দেবোত্তর সম্পদের দাবি রাজা না মানাতে এই অভিবাসনের ঘটনা ঘটে। দেশত্যাগীরা হলেন হরিহর পাণ্ডা, উদ্দালক পাইন, বশিষ্ঠ শতপথি, জমদগ্নী পাত্র, মৌদ্গল পতি, গৌতম মিশ্র পাঠক, যন্নীগ্রহী।

১২. **Amiyakumar Bondyopadhyaya, Bankura District Gazetteers, Calcutta, 1968, p.432.**

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# ভেলাইডিহার কথা

### ভেলাইডিহার পত্তন

ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে তৎকালীন রাঢ় বাঁকুড়ায় বিভিন্ন ভূম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সমাচার পাওয়া যায়। দক্ষিণ বাঁকুড়ায় পূর্বতন রাজগ্রাম (তুঙ্গভূম) ভিত্তিক রাষ্ট্রভাবনা ত্রিধারায় বিভক্ত হয় চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে। রায়পুর কেন্দ্রিক শিখররাজ্য, শ্যামসুন্দপুর-ফুলকুসুমা কেন্দ্রিক তুঙ্গভূম, আর করদ সিমলাপাল-ভেলাইডিহা। সিমলাপাল ভৌমরাজ্যের জন্মকথা আবার বিতর্ক বিঘ্নিত। একটি মতে ১৩৫৮ সালে নকুড় তুঙ্গ উৎকল রাজ্য থেকে তুঙ্গভূম জয় করে গুরু শ্রীপতি মহাপাত্রকে সিমলাপাল ভৌমরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই হিসাব সত্যি হলে সিমলাপাল রাঢ় বাংলায় সবচেয়ে পুরান ভৌম্যরাজ্য।

আরেকটি ভাষ্য হল রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খী শ্রীপতিকে মল্লরাজ কারাগারে বন্দী করেন। রাজা জানতে পারেন প্রত্যেক সকালে শ্রীপতি জেল থেকে বেরিয়ে বাইরের সরোবরে স্নানাদি করে আবার জেলের কামরায় ফিরে যান। এর সত্যতা যাচাই করে মল্লরাজ এই বীরকে মুক্ত দিয়ে বলেন সিমলাপাল ও সন্নিহিত এলাকায় একদিনে অশ্বপৃষ্ঠে যত এলাকা ঘুরতে পারবেন সেটি তাঁর শাসনাধীন হবে। এই ভাবেই সিমলাপাল তালুকের জন্ম হয়। উল্লেখ্য ১৬১৭ সালে ভাতৃবিরোধ মেটাতে এই তালুকের ছয় আনা (২৬২৬৬ কের) নিয়ে তৈরি হয় ভেলাইডিহা।[১]

উৎকল থেকে রাঢ় বাঁকুড়ায় উৎকল ব্রাহ্মণ শ্রীপতি মহাপাত্রের আগমন সিমলাপাল ও সন্নিহিত এলাকায় নতুন সামাজিক সমীকরণ সৃষ্টি করে। সমরবিশারদ

ও কুটনীতিক শ্রীপতি মহাপাত্রের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বহু উৎকল দেশবাসী সিমলাপাল তালুকে হাজির হন। এর আগে ১১৩৫ সালে কলিঙ্গরাজ অনন্তবর্মণ চোরগঙ্গের রাঢ় আগমনের সাথে সাথে রাঢ়বঙ্গের এই অংশে ওড়িয়াভাষীদের বসতি গড়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় অভিবাসনের ঘটনা ঘটে নকুড় তুঙ্গের সাথে ২৫২ জন উৎকল ব্রাহ্মণ পরিবারের আগমনের সাথে। ওড়িয়া ব্রাহ্মণদের এযাবৎ অন্তর্বিবাহ সম্ভব হয়েছে এই বিপুল অভিবাসনের ফলে। এসেছেন দত্ত পদবীধারী কায়স্থ, গোপ-গোয়ালারা। উর্ধমুখী সচলতার ইঙ্গিত মেলে মহান্তি পদবীধারী ওড়িয়া কায়স্থ বাংলায় ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিত হওয়ার ঘটনায়। উৎকল 'কলু' বাংলায় হলেন 'তিলি'।

সিমলাপাল রাজের সম্পর্কে 'বেতসীবৃত্তি'র অভিযোগ উঠেছে একাধিক কারণে। মল্লরাজের বশ্যতা স্বীকার প্রথমত অনেক ঐতিহাসিকের মতে আদি ভূমরাজ্য তুঙ্গভূমের সাথে এই নাড়ীর যোগ অস্বীকারের ঘটনা ঘটেছিল অধিকতর প্রাপ্তির আশায়। এমনকি ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী শাসনের প্রারম্ভে জন এনসাইন ফারগুসন ভূমরাজ্য অভিযানে এলে সহজেই সিমলাপাল-রাজ কর প্রদানে সম্মত হন। শুধু তাই নয়, লোকবল যোগান দিয়ে অবাধ্য দেশীয় রাজাদের দমন-অভিযান জোরদার করেন। প্রজা হিতৈষণা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় এই বংশের কৃপণতা ছিল নিন্দিত। তবে এর বিপরীত মতও পাওয়া যায়। প্রজাদের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার অভিযোগ ও নথি বিভিন্ন সূত্রে খোঁজ মিলেছে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে ওঠার পেছনে রাজাদের সহায়তা ছিল না, এমন কথাও বলা যায় না।

বীর হাম্বিরের(১৫৯১-১৬১৬) সমকালে প্রতিবেশি তুঙ্গভূমের সাথে মল্লরাজের বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হাম্বিরের অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা শ্যামাসুন্দরীর সাথে বিবাহ হয় তুঙ্গরাজ লক্ষ্মী নারায়াণ (শ্যামসুন্দর) দেবের সাথে। কিন্তু এসময়ে ভ্রাতৃ বিবাদে তুঙ্গভূমি দ্বিখন্ডিত হয়ে পড়ে। ১৬১৬ সালে হাম্বিরের মৃত্যু মল্লরাজ্যে শূন্যতা সৃষ্টি করে। সিমলাপালের মাতৃরাজ্য তুঙ্গভূম বা মল্লভূম যাই হোক না কেন, এই দুই রাজ-পরিবারই ১৬১৭ সালে ছিল ভাঙ্গন কবলিত। এর ছোঁয়াচ লেগেছিল সিমলাপাল রাজপরিবারেও। সে ছিল সম্পর্কের মৌষলকাল।

অখন্ড সিমলাপাল তালুকের শেষ রাজা ছিলেন চিরঞ্জীব সিংহ(রাজত্বকাল ১০২৩-১০৫৯ বঙ্গাব্দ)। তিন পুত্র লক্ষণ (বড় রাণীর গর্ভজাত), লস্কর (ছোট রাণীর

গর্ভজাত) ও বিক্রমের (তরুপুরে থাকাকালীন ইনি নিহত হন) মধ্যে ৬ আনা, ৬ আনা, ৪ আনা হিসাবে তালুকটি বিভাজিত হয়ে পড়ে। অপুত্রক বিক্রম নিহত হলে তার বিক্রমপুর জমিদারি সিমলাপাল মৌজায় মিশে যায়।[২]

সম্পর্কের টানাপড়েন থেকেই ১৬১৭ সালে সিমলাপাল রাজ-পরিবারের বিভাজন ঘটে।[৩] দক্ষিণ রাঢ়ে সূচিত হয় এক নতুন অধ্যায়ের। সিমলাপাল-রাজ লক্ষ্ম ণ সিংহের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভাই লস্কর সিংহ চৌধুরী ভেলাইডিহাতে পূর্বতন সিমলাপালের ছ আনা এলাকা (২৬২৬৬ কের) নিয়ে নতুন রাজধারার প্রবর্তন করেন। এই রাজবংশ শিল্প-শিক্ষা-সংস্কৃতি আঙ্গিনায় নতুন জোয়ার আনে। দেশমাতৃকার মুক্তি সাধনার নতুন পীঠস্থান হয়ে ওঠে ভেলাইডিহা।

## রাজপরিবারের বংশলতিকা ও রাজকাহিনী

বংশের প্রতিষ্ঠাতা লস্কর সিংহ চৌধুরী থেকে শেষ রাজা প্রদ্যোৎকুমার পর্যন্ত ভেলাইডিহা রাজ পরিবারের বংশ তালিকা নিম্নরূপ।

প্রতিষ্ঠাতা রাজা লস্কর সিংহ চৌধুরী
(১৬১৭ সালে রাজবংশের সূচনা, রাধা-গোবিন্দ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা)

|

ছয় প্রজন্ম ? (গৌরমোহন-নন্দলাল)

|

রাজা কৃষ্ণলাল-ভবানী সিংহ হিকিম
(সেচপুকুর খনন)

|

রাজা রামচন্দ্র সিংহ চৌধুরী
(সিয়ারজোড়ায় ৫ চৌধুরী পুকুরের খনন)

|

রাজা হরগোবিন্দ
(বাঘের সাথে লড়াই। রসপালের সুন্দরনারায়ণকে ১৯০০ টাকা দিয়ে ১৮৭৩ সালের ১৭ বৈশাখ ফুলকুসুমার খয়েড়বনী, কড়াইডাঙ্গা, কৃষ্ণনগর মৌজার রাজস্ব অধিকার পান।)

|

রাজা চৈতন্যচাঁদ
(হরিদ্রাবলী, মুড়াগ্রাম প্রভৃতি মৌজা ছাড়াও রায়পুরের দখল, নীলচাষে যোগ)

|

রাজা প্রাণবল্লভ

(১৮৮৪-১৯৩২ লক্ষীসাগর শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয়ের সূচনা)

|

রাজা বিজয়চন্দ্র (১৯১০-১৯৪৯)

(রঙ্কিণী মন্দিরের প্রতিষ্ঠা, বাঘ নিয়ে গমন, নাটক পালা, বিদ্যালয় তৈরি)

|

শেষ রাজা প্রদ্যোৎকুমার (১৯৪৪-লক্ষীসাগর শিবমন্দিরের সংস্কার)

দুই শরিক রাজবংশ-লতিকার তুলনামূলক ছক নিম্নে দেওয়া হল।

| **প্রজন্ম** | **সিমলাপাল রাজবংশ** | **ভেলাইডিহা রাজবংশ** |
|---|---|---|
| ১ম | শ্রীপতি মহাপাত্র (১৪৬৩-১৪৯৪) | —— |
| ২য় | মাধব মহাপাত্র (১৪৯৪-১৫২৪) | —— |
| ৩য় | জগন্নাথ মহাপাত্র (১৫২৪-১৫৪৫)<br>বলরাম মহাপাত্র (১৫৫৮-১৫৮০) | |
| ৪র্থ | বাসুদেব মহাপাত্র (১৫৪৫-১৫৫৮) | —— |
| ৫ম | মোহনদাস মহাপাত্র (১৫৮০-১৫৯৩) | —— |
| ৬ষ্ঠ | চিরঞ্জীব সিংহ (১৫৯৩-১৬১৫) | —— |
| ৭ম | লক্ষ্মণ সিংহ (১৬১৫-১৬৫২) | লস্কর সিংহ চৌধুরী |
| ৮ম | কৃষ্ণদাস সিংহ (১৬৫২-১৬৯৩) | গৌরমোহন দাস ও নন্দলাল |
| ৯ম | রাধানন্দ সিংহ (১৬৯৩-১৭২৮) | কৃষ্ণলাল-ভবানী সিংহ হিকিম<br>(অপুত্রক কৃষ্ণচন্দ্রের পর রানী ব্রহ্মময়ী) |
| ১০ম | বলরাম সিংহ (১৭২৮-১৭৭৫) | রামচন্দ্র সিংহ চৌধুরী<br>(রানী বড়ঠাপুরের শ্যামলালকে রাজা করতে চাইলে আইনের সাহায্যে ভবানী হিকিমের পুত্র রামচন্দ্র রাজা হন) |
| ১১তম | জগন্নাথ সিংহ (১৭৭৫-১৮২০) | হরচন্দ্র বা গোবিন্দ |
| ১২তম | চিরঞ্জীব সিংহ চৌধুরী<br>(১৮৪৪-১৯০৫) | চৈতন্যচাঁদ |
| ১৪তম | মানগোবিন্দ সিংহ চৌধুরী<br>(১৯০৫— | প্রাণবল্লভ |

| | | |
|---|---|---|
| | জগবন্ধু সিংহ চৌধুরী (১৯০৫-১৯০৯) | |
| ১৫তম | মদনমোহন সিংহ চৌধুরী (১৯০৯-১৯২৭) | বিজয়চন্দ্র (জন্ম ১৯১০-১৯৪৯) |
| ১৬তম | শ্যামসুন্দর সিংহ চৌধুরী (১৯২৭-১৯৫৫) | প্রদ্যোৎকুমার |
| ১৭তম | কল্যাণীপ্রসাদ-দেবপ্রসাদ | রজতকান্তি |
| ১৮তম | চিরঞ্জীব | রাজর্ষি |

## রাজপরিবারের বীরত্বগাথা

ভেলাইডিহার রাজাদের বীরত্বের কাহিনী লোকমুখে প্রচারিত হয়ে বেঁচে আছে। রাজা হরলাল সিংহচৌধুরীর সিঁয়াজোড়া-ভেলাইডিহা যাত্রাপথে একদিন রাত্রে একটি চিতাবাঘ দাঁড়িয়ে বাধা তৈরি করলেও নিরস্ত্র অবস্থাতেই অনায়াসে তাকে রাজা পরাস্ত করেন। তিনি ছিলেন অমিত শক্তির অধিকারী। কথিত আছে একবার বড় পিয়াশাল গাছের দুটি শাখা টেনে নামিয়ে গবাদি পশুকে পাতা খাওয়াচ্ছিলেন। দুই পশ্চিমাদেশীয় পালোয়ান রাজার সাথে লড়াই দেখানোর মানসে সেইক্ষণে সেই জায়গায় হাজির হন। রাজা হরলাল পিয়াশালের ডালদুটি তাদের ধরতে বললেন এবং তার পরবর্তী দৃশ্য সহজেই অনুমান করা যায়। ভূপাতিত দুই পালোয়ানের লড়াই করার ও দেখানোর শখ সেখানেই শেষ।[৪]

হরলাল পুত্র চৈতন্যচাঁদ বুদ্ধি ও শক্তির মিশেলে ভেলাইডিহা রাজ্যের সীমা অনেকটাই বাড়িয়ে নেন। হরিদ্রাবলী, মুড়াগ্রাম প্রভৃতি মৌজা ছাড়াও রায়পুরের বন্ধকি স্বত্ত হাসিল করে তালুকের সীমা ও গরিমা বহুলাংশে বৃদ্ধি করেন। ১৮৮১ সালে নীলকরদের কাছ থেকে শ্যামপুর (লক্ষ্মীসাগর) মৌজা কিনে চৈতন্যচাঁদ রঙ্কিনীপূজার পুনঃপ্রচলন করেন।

রাজা বিজয় সিংহ পোষা চিতাবাঘ নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। হিড়বাঁধ এলাকায় বোনের বাড়িতে রাজার চিতাবাঘ সহ যাত্রা এখনও লোকমুখে প্রচারিত। এই চেনে বাঁধা চিতা অন্য পোষ্যদের তেড়ে গেলে সেটাকে বশে রাখতেন সব সময়ের সাথী দুই বলশালী ভাই ক্ষিতীশ চন্দ্র সিংহ বাবু ও ভবতোষ সিংহ বাবু। রাজারা সাধারণত হাতির পিঠে যাতায়াত করতেন। রাজা হরচন্দ্র সিংহচৌধুরীর পুত্র চৈতন্যচাঁদ

যুবরাজের বিষয়বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় ০৫.১০.১৮৮৩ তারিখের ১২৫০ নং দলিল থেকে। পরগণার অন্তর্ভুক্ত গোপালপুর মৌজার পঁচিশ বিঘা পরিমিত জায়গায় হাড়মাসড়ার পদ্মলোচনের পুত্র নদেরচাঁদ রায় ১৮৮০ সালের মার্চ মাসে গিসবর্ণ কোম্পানীর কাছ থেকে দুই বছরের ঠিকা বন্দোবস্ত নিয়ে পাকা ইমারৎ ও অন্যান্য কুঠি বাড়িতে নীল ব্যবসা করতেন। এই জমিটি, রাজাকে ছয় টাকা দুই আনা খাজনা দেওয়ার শর্তে গিসবর্ণ কোম্পানীর কাছ থেকে কিনে নেন চৈতন্যচাঁদ। চৈতন্যচাঁদের পিতা হরসিংহ চৌধুরী ১৮৭৩ সালের ১৭ বৈশাখ রসপালরাজ সুন্দরনারায়ণের কাছ থেকে ১৯০০ টাকা ঋণের বিনিময়ে খয়েবলী, কড়াইডাঙ্গা, কৃষ্ণনগর মৌজার খাজনা আদায়ের অধিকার পান।[৫]

## বিচারব্যবস্থা

রাজভবন থেকেই নিত্যদিন বিচারের প্রক্রিয়া পরিচালিত হত। দুটি সময়ে বিচার ব্যবস্থা চলত। কাছারির আটচালায় সকাল থেকেই জমিদারির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিচারপ্রার্থীরা ভিড় করত। রাজা নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করে রায় দিতেন। বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষই খুশি হয়ে রাজার নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে বাড়ি ফিরত। দেরি হলে হামার-বেড় থেকে মিলত চিঁড়ে-গুড়। জনগণের সুবিধার্থে বিকেন্দ্রীভূত বিচার-কেন্দ্রেরও ভাবনা ছিল।[৬] রাজা বিজয় সিংহের এমন বিচারের আস্তানা ছিল লক্ষীসাগরে। শিবথানের পাশে মন্ডলবাড়ি কাছারীতে মাসে একদিন বসত এই বিচারসভা।

## শিক্ষাবিস্তার ও সংস্কৃতির বিকাশ

রাজবংশ এলাকায় শিক্ষাবিস্তারের বিষয়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী এতদাঞ্চলে রাজানুকূল্যে টোল-চতুষ্পাঠীর কথা বলেছেন। ইংরেজ শাসনকালে পাশ্চাত্য শিক্ষা চালু হলে বেশ কিছু আধুনিক শিক্ষায়তন চালু হয়। এগুলিতে ছিল রাজার শিক্ষানুরাগের স্পর্শ। ভেলাইডিহা-লক্ষীসাগর সড়কের পাশে বিজয় বালক বিদ্যালয় ও বিজয় বালিকা বিদ্যালয় নির্মিত হয় প্রদ্যোৎনারায়ণের উদ্যোগে। আর রাজার দেওয়া জমিতেই প্রতিষ্ঠা হয় লক্ষ্মীসাগর উচ্চ বিদ্যালয়। প্রাণবল্লভের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত নিম্ন বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় রাজা বিজয়চন্দ্রের উদ্যোগে। ভেদুয়াতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়

রাজানুকূল্যে। রাজা বিজয়চন্দ্রের নামাঙ্কিত বিদ্যালয় তৈরি হয়েছিল সিংহবাবুদের জমিতে। ভেলাইডিহা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন রাজা প্রাণবল্লভ। প্রাণবল্লভ হাড়মাসড়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা নেন। পুত্র বিজয়কে সেখানে ভর্তি করেন। সেখানে বিজয়চাঁদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করেন রাজা। রাজার এই উদ্যোগ আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের ইঙ্গিত দেয়। যুবরাজের দেখভালের জন্য ছিলেন রাজভাগ্না কৃষ্ণচন্দ্র মহান্তি ও অলকাধরার ভোলানাথ রায়। রাজবাটীতে আশ্রয় পেয়েছিলেন আশেপাশের বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক। এমনকি তাদের খাদ্যও যোগাতেন রাজা। একই আনুকূল্য পেত অনেক পড়ুয়াও। বিজয়চন্দ্রের সময়ে রাজবাটীতে থেকে পড়াশোনা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুখুরিয়া গ্রামের চিন্তাহরণ রায়, শুশুনিয়ার অনুকূল চন্দ্র বিষুই, বাঁশকানালীর মদন মাঝি, গাঁড়রারের নীলকন্ঠ পান্ডা প্রমুখ। লক্ষ্মীসাগর বিদ্যালয়ের কমলাপতি ব্যানার্জী সহ বিভিন্ন শিক্ষকরা রাজবাটীতে থাকতেন। এমনকি ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের দায়ভার নিয়েছিলেন রাজা। এভাবে রাজপরিবার এলাকায় শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ঢাকার আটিগ্রাম থেকে আগত এস্টেট ম্যানেজার দীনেশচন্দ্র মিত্র ছিলেন একজন শিক্ষানুরাগী।[৭]

রাজা বিজয়চন্দ্রের উৎসাহে ভেলাইডিহাতে যাত্রা ও নাট্যচর্চার নতুন দিগন্ত খুলে যায়। কোলকাতা থেকে আসেন নাট্যবিশারদ ললিত মোহন গোস্বামী। তৈরি হয় স্থায়ী মঞ্চ। শিল্পী চয়ন ও অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের তৈরি করে নেওয়া, সবই রাজার নিরলস চেষ্টার ফল। পালা-গানের যুগ পেরিয়ে যাত্রা-থিয়েটারের যুগ শুরু হয় তাঁর একক প্রয়াসে। এমনকি রুচিশীল দর্শক-শ্রোতা তৈরিতেও ছিল তাঁর অবদান। তৎকালীন নাট্যসমাজের পুরোধা পুরুষ অহীন্দ্র চৌধুরীর সাহায্যে ও পরামর্শে ভেলাইডিহার নাট্য সমাজ গড়ে ওঠে। ভরত বিদায়, কারাগার, গৈরিক পতাকা, মহারাজ নন্দকুমার, মহারাজ রণজিৎ সিংহ, সীতা, কেদার রায়, বঙ্গে বর্গী, পথের শেষে, কর্ণার্জুন, চক্রব্যূহ, বভ্রুবাহু প্রভৃতি নাটক-যাত্রা কৃতিত্বের সাথে পরিবেশিত হয়েছে। এই নাটকগুলিতে রাজা অভিনয় করেছেন ভরত, কংস, ভাস্কর পন্ডিত, নন্দকুমার, রণজিৎ সিংহ, রাম, কার্ভালো, শিবাজী, দুর্গাশঙ্কর, কর্ণ, অভিমন্যু, অর্জুন-এর ভূমিকায়। দেবেন্দ্রনাথ পান্ডা, রামানন্দ মহান্তী, সুরেন্দ্র মোহন সিংহবাবু, মৃত্যুঞ্জয় পাত্র, প্রমথনাথ সিংহবাবু, নগেন্দ্রনাথ দাস, নলিনাক্ষ সিংহবাবু, শশাঙ্কশেখর পাত্র, শরৎচন্দ্র সিংহবাবুর মত অভিনেতারা রাজার হাতে তৈরি। দোলের সময়

তিন দিনের যাত্রা উৎসবের জন্য দুই মাস ধরে চলত প্রস্তুতি। কালীপুজোয় পনের দিন প্রতিমা থাকত, আর পনের দিন যাত্রানুষ্ঠান চলত।[৮]

যাত্রার প্রয়োজনে যন্ত্র ও যন্ত্রী যোগাড় করতেন রাজা। অর্গান-হারমোনিয়ামে ছিলেন বিভূতিভূষণ সিংহবাবু, বাঁশিতে যুগল রায়, কর্ণেটে ইন্দ্রনারায়ণ সিংহবাবু, ঢোল-তবলাতে গুঁইরাম কালিন্দী-খাঁদু দুলে।

পরগনার মেলাগুলো অনুষ্ঠিত হত রাজপরিবারের প্রত্যক্ষ পরিচালনার। ১৯৩৭ সালের জেলা বোর্ডের রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে রাজা বিজয়চন্দ্র সিংহ চৌধুরীর মালিকানাধীন মেলাগুলি হল পরকুল মরকমেলা, গোরাবার গাজনমেলা, আমচেঁদার পায়রাসিনি, ভেলাইডিহার শিবগাজন মেলা। এগুলি থেকে আয় ছিল যথাক্রমে ২টাকা, ১টাকা, ২টাকা ও একুনে পঁয়ত্রিশ টাকা। জেলা বোর্ডকে শুল্ক দিতে হয় শুধু পরকুল মেলার জন্য পাঁচ টাকা। সরকারি আদায় ছিল পরকুল মেলার আড়াই টাকা ও অন্য চার মেলার ১টাকা করে।

শেষ রাজা প্রদ্যোৎকুমার বেশ কয়েকটি নাটক লেখেন ও তা মঞ্চস্থও করা হয়।

## ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব

ভেলাইডিহা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা লস্কর সিংহ চৌধুরী ভেলাইডিহায় শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রাধাগোবিন্দ ছিল ভেলাইডিহা রাজ পরিবারের কুলদেবতা। পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত হন গাড়রা গ্রামের পাণ্ডা পরিবার। বিজয়চন্দ্র এই মন্দিরের আমূল সংস্কার শুরু করেন। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তৈরি হল সদর দরজা। বিষ্ণুপুর থেকে শিল্পী এনে নির্মিত অপূর্ব শিল্পসুষমা মন্ডিত চতুর্দোলা, এই মন্দিরের গরিমা বৃদ্ধি করেছিল। রাধা গোবিন্দ কুলদেবতা হিসাবে পূজিত হওয়ার বিষয়টি রাজপরিবারের ওড়িয়া যোগকেই ইঙ্গিত করে। উল্লেখ্য রাজপরিবারে 'দাদাগোঁসাই' (পিতামহ), 'দিদিগোঁসাই' (পিতামহী), 'জ্যাঠাগোঁসাই' (প্রপিতামহ), বাবা গোঁসাই নামে সম্পর্কগুলির মধ্যে উৎকল-বৈষ্ণবীয় ভাবধারার প্রভাব স্পষ্ট। দুর্গা পূজোর মত রাধাগোবিন্দ জীউ কেন্দ্রিক ভেলাইডিহা দোল উৎসব ছিল চার দিনের। যাত্রা ছাড়াও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বসত। জ্ঞান গোঁসাই, সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত প্রথিতযশা গায়করা এই আসর আলো করেছেন।

কালীপূজো চলত ১৫ দিন ধরে। এর সাথে চলত যাত্রার মত বিচিত্রানুষ্ঠান। বিভিন্ন রাজার সময়ে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান চালু ছিল। রাজা প্রাণবল্লভের আমলে

জমিদারির সমস্ত ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করে ভোজনের ব্যবস্থা চালু ছিল। তাছাড়া ছিল নটি মন্ডপে ন'দিন ধরে হরিনাম সংকীর্তনের 'নবকুঞ্জ' আয়োজন। বিজয়চন্দ্র রঙ্কিণী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর পূজারীদের নিষ্কর ভূমির ব্যবস্থা করেন। আর এই ধরণের ভূদানে উপকৃত হন জগদানন্দ মহান্তী (টিপানে), মথুরানাথ সিংহ মহাপাত্র (গোলাবাথান), কৃষ্ণচন্দ্র মহান্তী (নতুনগড়)। এছাড়া রাজা গাঁড়রা গ্রামে শান্তিনাথ শিবের নিত্য পূজার জন্য পূজারিদের ভূমিদান করেন। ১৯৪৭ সালের ৭ই আগস্ট রাজা বিজয়চন্দ্র চৌধুরী দুটি অর্পণনামা দলিলের মাধ্যমে (১) রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ ও (২) দুর্গা—কালিপূজার জন্য জমি নির্দিষ্ট করে দেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটির জন্য বরাদ্দ ছিল ১৩৪৪:৬১ একর জমি। দুটি দলিলেই ফর্দ বা উপাচার উল্লেখ করা আছে।[৮] দলিলে মন, সের, ছটাক, পাই, আড়া মাপের উল্লেখ আছে। জমিদারী উচ্ছেদের পর এই দুই দেবোত্তর জমির ক্ষতিপূরণ ছিল যথাক্রমে ৫৯২৪টা. ৯আনা ৩ পাই এবং ২০৬০ টাকা ৭আনা ৪ পাই।

## ভেলাইডিহা রাজপরিবারের দুর্গাপূজা

অভিন্ন সিমলাপালের সপ্তম ও শেষ রাজা চিরঞ্জীব সিংহচৌধুরীর পর রাজপরিবারের বিভাজন ঘটে মধ্যমপুত্র লক্ষণ সিংহচৌধুরী ছয় আনা, ছোট বিক্রম চার আনা, মেজ রানীর পুত্র বয়সে জ্যেষ্ঠ লস্কর সিমলাপালগড় ও গৃহদেবতা কৃষ্ণবলরামের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে বাকি অংশে ১৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে ভেলাইডিহাতে রাজ্যপাট প্রতিষ্ঠা করে বৃন্দাবন থেকে রাধাগোবিন্দ জীউয়ের মূর্তি (কষ্টিপাথরের গোবিন্দ জীউ ও অষ্টধাতুর রাধিকা জীউ) এনে কুলদেবতা হিসাবে মান্যতা দেন। পাশাপাশি চালু করেন দুর্গাপূজা। বঙ্গের এই সুপ্রাচীন দেবী আরাধনা শুরু হয় জিতাষ্টমীর পরদিন কৃষ্ণনবমীর দিনের এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে (নবম্যাদি কল্পারম্ভ)। এদিন সবাদ্য তোপধ্বনিসহ (রূপার আসাসোঁটা হাতে নামাতা চৌকিদার শোভিত) শোভাযাত্রা সহকারে শিলাবতী থেকে পূর্ণকুম্ভ এনে গোবিন্দ জীউ মন্দির প্রাঙ্গণে রাখেন ছত্রধারী সৎপতি ও চক্রবর্তী ব্রাহ্মণেরা। ডোমবাদ্য ও বৈষ্ণবগান সহযোগে চন্ডীগৃহে প্রতিষ্ঠিত হয় এই ঘট। কল্পারম্ভ থেকে মহাষষ্ঠী পর্যন্ত দুই পুরোহিত এখানে চন্ডীপাঠ ও নৈবেদ্য দিয়ে আরাধনা করে যান। স্থানীয় মালাকার প্রত্যহ দেন এক সাজি ফুল ও মল্লসম্প্রদায় থেকে আসে ১০ টি সনাল পদ্ম। মহাষষ্ঠীর বোধনে আবার নদীঘাট থেকে পূর্ণকুম্ভ শোভাযাত্রা, সংকীর্তন, ডোমবাদ্য, কাঁসরঘন্টা, তোপধ্বনি সহযোগে গোবর ও

আলপনায় শুদ্ধ নদীপারের বিল্ববৃক্ষমূলে স্থাপন করা হয়। সন্ধ্যায় দেবীকে পদ্ম ও নবপত্রিকা নিবেদন করে কর্গাডাঙ্গা গ্রামের মল্ল ধীবররা। সপ্তমীর দিন এই দুই ঘট দুর্গামন্ডপে ২৫ টি পানের উপর এনে রাখা হয়। পাঁচঘট ও কাপড়ের ঘেরার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নবপত্রিকা। চক্ষুদানের ডালা দেয় গ্রামের ডোম পরিবার। লক্ষ্মীসাগর গ্রামের কর্মকারেদের বা সূত্রধরদের নির্মিত দুর্গাপ্রতিমাতে প্রথাগত দেবতাদের পাশাপাশি থাকে নন্দীভৃঙ্গী, দুই সখী, গজারোহী ও অশ্বারোহী দুই সৈনিক। পূজায় থাকেন রাজপরিবারের একজন, হোমের দুই পুরোহিত, দুই ঋত্বিক, চণ্ডীপাঠের জন্য দুইজন। তিনদিন ধরে ঘিয়ের সাহায্যে অনির্বাণ থাকে হোমানল। দশমীর দিন এটি স্বর্ণখন্ড দিয়ে নির্বাপিত করা হয়। পূজায় বলিদান হয় সপ্তমীর দিন তিনটি ছাগ, তিনটি চাল-কুমড়া ও তিনটি আখ। অষ্টমীতে(সন্ধির সময়) বলি হয় নটি ছাগ, নতি কুষ্মান্ড ও নটি ইক্ষু। নবমীর দিন  তিনটি আখ, তিনটি চাল্কুমড়া, তিনটি ইক্ষু। এই দিন বিকালে রঙ্কিনীতলায় বলিদান উৎসবের কথা অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। বলির আগে পশুপ্রক্ষালন  করেন করখি গ্রামের বাড় ব্রাম্মণেরা। ধারক, বাহক ও হন্তারক সহযোগে এই বলিকাজ সমাধা করে অলকাধরার ছত্রী রায় পরিবার। বিজয়ার দিন দেবীর ভোগ হল পান্তাভাত ও চ্যাংমাছ পোড়া। লক্ষ্মী ঘরে এনে বাকি দেবতাদের বিসর্জনের আঙ্গিকে হয় শান্তিজল প্রদান, হোমাগ্নি জাত ভস্মতিলক প্রদান, কোলাকুলি, প্রণাম, সিন্দুর খেলা,মিষ্টান্ন গ্রহণ,  দধিপান। বিসর্জনের পর দেবীর সন্ধিপূজার শাড়ি পাগড়ির মত করে রাজাকে পরিয়ে দেন পুরোহিত। প্রত্যেকের হাতে অপরাজিতা তাগা। সবাই ফিরে রাধাগোবিন্দ মন্দিরে আড়াই পাক প্রদিক্ষণ করে ও চরণামৃত পান করে। সবশেষে মাটিতে প্রোথিত কলাগাছ তিরবিদ্ধ করে 'রাবণ বধ' করা হয়। রাজপরিবার ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে ও সাবেক রীতি-নীতি পালিত হওয়ার মধ্য দিয়ে অনন্যতার নজির রেখেছে এই পূজা।

## ভেলাইডিহাতে নীলচাষের প্রসার

রাজা চৈতন্য সিংহ চৌধুরীর আমলে রাজার প্রত্যক্ষ সংযোগে নীলচাষের প্রচলন হয়। রায়তদের এই চাষের জন্য দাদন দেওয়া হত বিঘা প্রতি ১-৪ টাকা। এই দাদন উৎপাদন পরবর্তী সময়ে ২৫ শতাংশ সুদ সহ ফেরত নেওয়া হত জমিদার নিযুক্ত তাগাদাদারদের মাধ্যমে। রাজার পাশাপাশি ভেলাইডিহা গ্রামের রায়ত  হরচন্দ্র এই নীল ব্যবসায়ে বেশ সমৃদ্ধি অর্জন করেছিলেন। ১৮৮০ সালের হিসাবে নীল চাষে মণ প্রতি উৎপাদন মূল্য দাঁড়িয়েছিল ১০০ টাকা। এর ওপর ১৫০-২০০ টাকা মুনাফা

রেখে বিক্রয়মূল্য ঠিক করা হত। মহাজনদের মাধ্যমে পুঁজির যোগান আসত। মাসিক শতকরা ১২ আনা হারে সুদ দিয়ে বৃন্দাবন দত্তের কাছে ঋণ নিয়েছিলেন রাজকর্মচারী ধন সিংহবাবু। দক্ষিণ লক্ষ্মীসাগরের লায়েকপাড়া দোলদেড়িয়া, ভূতশহরের তিনটি নীলকুঠির মালিকানা ছিল সিমলাপালের চীক সাহেবের। তবে এগুলি ছিল অলাভজনক।

## লক্ষ্মীসাগর পরিমন্ডল

ভেলাইডিহা রাজাদের প্রত্যক্ষ মদতে ক্রমে একটি শক্তিশালী ধর্মীয় পরিমন্ডল গড়ে ওঠে, যেটি লক্ষ্মীসাগর পরিমন্ডল নামে পরিচিতি পায়। দক্ষিণ বাঁকুড়ায় ধলভূম রাজার পূজিতা কুলদেবতা রঙ্কিণীদেবী ধবলভূমের আদি বংশ খাতড়া রাজাদের আনুকূল্যে খাতড়াতেও পূজিতা হন। তবে মহা ধুমধামের সাথে রঙ্কিণীদেবীর প্রতিষ্ঠা ও পূজা পাঠ হত ভেলাইডিহা পরগণার লক্ষ্মীসাগরে। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয় রাজা বিজয়চন্দ্র সিংহ চৌধুরীর (১৯১০-১৯৪৯) হাতে। এই মন্দিরে রঙ্কিণী পরগণার মূলত অন্ত্যজ ও সামগ্রিক ভাবে সব বর্ণের মানুষের কাছে জাগ্রত দেবী হিসাবে প্রচারিত ও পূজিতা হয়ে ওঠে।

১৬১৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ লস্করচন্দ্র সিংহচৌধুরী প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীসাগর গ্রাম কেন্দ্রিক ভেলাইডিহা রাজ্য গড়ে উঠলে এই পরিমণ্ডলের প্রত্ন নিদর্শন ও জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য-লোকিক ধর্ম-সংস্কৃতির প্রাচীন এক প্রবাহ পুষ্ট হয়ে ওঠে।

এই পরিমণ্ডলের প্রাচীন তিনটি প্রত্নস্থল হিসাবে শিলাবতীর দক্ষিণতীরের শ্যামপুর (লক্ষ্মীসাগর) মৌজার রঙ্কিনীতলা, নদীর উত্তর তীরের গাড়োরা, ভেলাইডিহা সংলগ্ন অলকধারা গ্রাম তিনটি উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্মীসাগর গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তসীমায় বিরাজমান কষ্টি পাথরে শিলাপট্টে খোদিত প্রায় সাড়ে তিন ফুটের বরাহমুখী, অষ্টভূজা (প্রায় লুপ্ত ও ক্ষয়িত) ও পার্বতীসাজ চালিযুক্ত শবাসনা রঙ্কিনী দেবী। অনেকের মতের এটি জৈন ভৈরব। এর অদূরেই ঝোপের মধ্যে পূজা পায় কালোসোনা নামের ভৈরব। আগে এই মূর্তিটি থাকলেও এখন এটি অপহৃত। প্রাচীন মাকড়া পাথরের মন্দিরটি বহু পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত। প্রাচীন বৃক্ষমধ্যে আটকে থাকা মাকড়া পাথর তার সাক্ষ্য। নিরাভরণ, মল্লকচ্ছপরিহিতা অনাবৃত দেহী এই শক্তিরূপের উদ্দেশ্যে আগে নরবলি হত বলে জনরব। যোদ্ধাবেশিনী রণ-রঙ্কিনী থেকে রঙ্কিনী নামের উদ্ভব বলে একটি মত প্রবল। বরাহভূম সংস্কৃতি প্রভাবিত রাইপুর পরগণার গোপালপুর সন্নিহিত এই শ্যামপুর মৌজায় বরাহ-জৈন সংস্কৃতির প্রাবল্য ছিল।

রাইপুরের মহামায়াও বরাহমুখী। কেওট বা জেলে, বাউরি, মাহাত সম্প্রদায় অধ্যুষিত এই অঞ্চলে প্রাচীন এই বনদেবী শালবৃক্ষের অন্তরালে পূজিতা ছিলেন। রাজপৃষ্ঠপোষকতার অভাবে একসময়ই পূজা বন্ধ হয়ে যায় ও আদি মন্দির ভেঙে পড়ে। ১৮৮১ সালে নীলকরদের কাছ থেকে শ্যামপুর মৌজা ভেলাইডিহার রাজা চৈতন্যচাঁদ কিনে নিয়ে দেবী পূজার পুনঃপ্রবর্তন করেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে সমতল ছাদের মন্দিরটি তৈরি করেন রাজা বিজয়চন্দ্র সিংহচৌধুরী। নিয়মিত পূজার জন্য মল্লভূমের জয়পুর থেকে রাজারা নিয়ে আসেন বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তীকে। ভরণপোষণের জন্য দেওয়া হয় ১২ বিঘা জমি। তাছাড়া লক্ষ্মীসাগর হাটের তোলা আদায়ের অধিকার। নিত্য পূজো ছাড়াও প্রতি বছর সারদীয়া নবমী তিথিতে বিশেষ পূজা ও উৎসব আয়োজিত হয়। নিত্য পূজো ও বিশেষ পূজার দায়ি দায়িত্ব ভেলাইডিহা রাজপরিবারই পালন করে। প্রতিদিনের ভোগ আতপ চাল ও সন্দেশ। বিশেষ পুজো শুরু হয় দুপুরে। বলি হয় অপরাহ্নে। সন্ধ্যায় অর্থাৎ রাক্ষসী বেলায় ভোগ আতপ চালের ভাত, ঘি ও মাংস। উপাচার হিসাবে রাজাকে দিতে হয় নয় পাই আতপ চাল, পাঁচ দৌঠী দাওয়া ঘি, একটি লালপেড়ে শাড়ি, বলির জন্য তিনটি চাল কুমড়া ও তিনটি আখ। ভৈরবী কালোসোনার ভোগ গাঁজা।

বলি প্রদান উপলক্ষ্যে অনেকগুলি প্রথা চালু আছে। বলি শুরু হওয়ার আগে ভেলাইডিহার রাজা নগ্নপদে শিবিকারোহণে বাদ্যযন্ত্র শোভাযাত্রা সহকারে মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। শোভাযাত্রার সামনে হাঁটতে থাকেন 'আঁশসোটা' বা 'ডাব্বাডোব্বা' নামে রৌপ্যনির্মিত দুটি ধর্মদণ্ড, একটি সিংহ মূর্তি, একটি বানর বা হনুমান মূর্তি নিয়ে চারজন নামাত চাকর। রঙ্গিনী গ্রামের হাড়ি-গুলিমাঝি সম্প্রদায়ের এই নামাতরা বংশানুক্রমে রাজপ্রদত্ত চাকরাণ জমির ভোগদখলকারী। মন্দির দ্বারে রাজাকে স্বাগত জানায় রাজা নিযুক্ত লক্ষ্মীসাগর গ্রামের সদগোপ মোড়ল। রঙ্কিনীর গলা থেকে একটি মালা তুলে রাজাকে পরিয়ে দেওয়া হয়। নামতরা বলিস্থান ঘিরে ধরে। পুরোহিতের সম্মতিতে ও রাজার আদেশ রাজপ্রদত্ত তিনটি পাঁঠার বলিদান পর্ব শুরু হয়। পাঁঠা বলি করে অলকধারা গ্রামের ক্ষত্রিয় 'রায়' পরিবার। কোরকী গ্রামের রায় ব্রাহ্মণ পশুপ্রক্ষালন করে দিলে তৃতীয় কৃষ্ণবর্ণ পাঁঠাটির সিংদুটিতে সিঁদুর মাখিয়ে সুতো দিয়ে বেঁধে ঠাকুরের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়। এই পাঁঠাটি পূর্বতন মহিষ (কাড়া) বলির দ্যোতক মানা হয়। এই পাঁঠাটির অধিকার 'ডোম' পরিবারের। প্রথম পাঁঠাটি পান মোড়ল ও দ্বিতীয়টি পায় নামত চাকরেরা। ঘাতক পায় তিনটি

মুণ্ড। এরপর অন্য 'মানসিক' করা পাঁঠাগুলোর বলি শুরু হয়। এই উপলক্ষ্যে মেলাও বসে। এরপর হয় উপস্থিত সাঁওতাল প্রজাসাধারণের দ্বারা প্রণাম অনুষ্ঠান। শিশু ও নবযন্ত্রে সজ্জিত সাঁওতাল রমণীরাও রাজ পদধূলি গ্রহণ করে। এটি পরে হয় সাঁওতালদের হামকুম বা মৃগয়া নৃত্য। মাথায় লাল শালুর ফেট্টিতে ময়ূরের পেখম গুঁজে এই নাচে অংশ নেয় সাঁওতাল পুরুষেরা।

লক্ষ্মীসাগর পরিমণ্ডলের গাড়রা গ্রামের গাজন উৎসব ও মেলা চারশ বছরের প্রাচীন। দুদিনের এই মেলা শুরু হয় নীল পুজার দিন ও পরের দিন চৈত্র সংক্রান্তিতে এর সমাপ্তি। গ্রামের শান্তিনাথ শিবের পূজা উপলক্ষ্যে এই গাজন। শান্তিনাথ চব্বিশ তীর্থঙ্করের ষোড়শ গুরু। জৈন দেবতা হিন্দু সংস্কৃতির অংশ হতে শুরু করলে এই দেবতাও শিব জ্ঞানে পূজিত হতে থাকে। এখানকার শান্তিনাথ চতুষ্কোণাকৃতি গোরীপট্ট সমন্বিত। এর অদূরেই পুকুরপাড়ে অর্ধপ্রোথিত একটি গণেশ মূর্তি মনে করিয়ে দেয় জৈন ও মহাযানী বৌদ্ধ মতে গণেশ উপাস্য। শিব মন্দিরের পরিচর্যা-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বে থাকে একজন গুলি-মাঝি সম্প্রদায়ভূক্ত রমণী 'পাটনি'। এই শিবের নিত্য পূজারী 'চক্রবর্তী' রাজপুরোহিত। রাজ পরিবারের পক্ষে গাজন শুরুর তিন দিন আগে একজন পাটভক্ত্যা, কেন কামিল্যা ও কামলে ও নয় জন ভক্ত্যাকে কামানো হয়। পাটভক্ত্যা বোষ্টম পরিবারের আর ভক্ত্যাদের আটজন খয়রা ও বাকি একজন মল্ল বা কেওট বা জেলে। এই উপলক্ষ্যে রাজপরিবার পাটভক্ত্যাদের দেয় একটি ধুতি, লাল পাড় শাড়ি, গামছা ও গম-চাল-চিড়া। সাথে কালো মুরগির ছয়টি ডিম। ভক্ত্যা পায় একটি গামছা, রাতের আহারের সিধা বাবদ চাল-গম-ছোলা-গুড়। গাজনের দু'দিন শিবপূজায় পৌরহিত্য করার অধিকারী কোরকী গ্রামের 'রায়' ব্রাহ্মণ। তিনি ধামাতকর্ণি নামে পরিচিত। দু'দিনের ভক্তদের নিবেদিত চাল-ফলমূল-টাকার প্রণামী ধামাতকর্ণির প্রাপ্য। গাজনের দু'দিন আগেই ভক্ত্যারা রাজাকে ফুলের মালা পরিয়ে 'পাট' ও 'কামলে' তোলার অনুমতি প্রার্থনা করে। কামিল্যা (কামলে) শিলাবতীতে স্নান করে নদীতটে প্রোথিত বংশদণ্ড এনে গাজন তলায় এই পতাকা সংযুক্ত শিবছত্র 'মহামেল' হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে। এটি শিবের কাছে সব মানুষের সমানাধিকারের দ্যোতক। এরপর শুরু হয় পাটস্নানের পর্ব। পাটস্নানের সময় কালো মুরগির ছয়টি ডিম ভাসিয়ে দেওয়া হয় ও উপস্থিত ডোমরা রীতি অনুসারে তা সংগ্রহ করে। ধামাতকর্ণি নদীঘাটে যাতায়াত করে ভক্ত্যাদের কাঁধে চেপে। পেরেক বিঁধানো পাটশয্যায় শায়িত পাটভক্ত্যাকে ঘাট থেকে কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে আসে ভক্ত্যারা।

রীতি অনুসারে শিলাবতীর 'মহালঘাট'-এ স্নান করে রাজপরিবারের সদস্যরা বিশেষত প্রবীণা সদস্যরা গাজনের এই ঘাট ফেরত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। উপবাসী এই সদস্যরা সন্ধ্যায় রাজবাড়িতে ফিরে আমছ্যাচা ও ভেজানো ছোলা খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করে। নীল তিথির এই উপবাস ভঙ্গের মধ্যে উর্বরতাবাদী সংস্কার প্রতিভাত। এমনকি দ্বিতীয় দিনের রাজভবনে ঢোল সহরৎ সহকারে শৈব পতাকা নিয়ে ভক্ত্যা ও ধামাতকর্ণিরা পৌঁছে পতাকায় ছড়ি দিয়ে বারবার আঘাত করতে করতে ঘোষণা করে রাজা, ষোল আনা ও চাষের জয়ের কথা।

এরপর ফিরে এসে মন্দির সংলগ্ন পুকুরপাড়ে 'সতীজায়গা'য় কাঠের অঙ্গারের উপর দিয়ে হেঁটে ভক্ত্যারা সন্ন্যাস ব্রত উদ্‌যাপন করে। এটি উর্বরতাবাদী সংস্কারে আত্মনিগ্রহমূলক রীতির উদাহরণ। ধামাতকর্ণি এদিন ভগবানের প্রতিনিধি গণ্য হন। তিনি বিবাহিত রমণীদের নাড়ি পাল্টানোর ওষুধ দেন। তাঁর কাছ থেকে বহু পুত্রের জননী কন্যা কামনায় ও বহুকন্যার জননী পুত্র কামনায় মন্ত্রপুত ওষুধ গ্রহণ করে।

সমাপ্তি অনুষ্ঠান 'সতীয় আগুন বহন'-এ লোহার, ডোম, কেওট, খয়রা, বাউরী, গুলিমাঝির মতো অন্ত্যজ শ্রেণির রমণীরা সূর্যাস্তের পর শিলাবতীতে স্নান করে সিক্ত বস্ত্রে মুখমণ্ডল ছাড়া দেহ আবৃত রেখে মাথায় খড়ের বিড়ায় মৃৎপাত্রে অঙ্গার ও ধুনো জ্বালিয়ে হাত না দিয়ে সতী জায়গায় প্রাচীন মন্দিরের আমলকের মতো ভগ্নচূড়ার চারপাশে তিন বার প্রদক্ষিণ করে শিবস্থানে মৃৎপাত্রগুলি স্থাপন করে। শেষ হয় গাজনের পর্ব। এখানে চড়কের চল নেই। ১৯৩৭ সালের জেলা বোর্ডের এক নথিতে রাজা বিজয়চন্দ্র চৌধুরীকে এই গাজন মেলার মালিক হিসাবে দেখান হয়েছে। মেলা থেকে তাঁর আয় দেখান আছে দুই টাকা। স্যানিটেশন ফি বাবদ এক টাকা জমা দিতে হত।

ভেলাইডিহা রাজারা নিম্ন বর্ণের মানুষের কাছে জনপ্রিয় দেব-দেবীদের প্রতিষ্ঠার বিষয়ে যত্নবান ছিলেন। যার ফলে রাজার প্রতি প্রজাদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। রাঢ়ে প্রায় গণদেবতার মর্যাদায় উন্নীত শিবঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল লক্ষ্মীসাগরে। ১৯২৮ সালে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজা প্রাণবল্লভ সিংহ চৌধুরী (১৮৮৪-১৯৩২)। এই মন্দিরের সংস্কার সাধিত হয়েছিল বিজয়চন্দ্র সিংহ চৌধুরীর (১৯১০-১৯৪৯) সময়ে। লস্কর সিংহ প্রতিষ্ঠিত কুলদেবতার মন্দির সংস্কার হয় বিজয়চন্দ্রের হাতে। বিষ্ণুপুরের মিস্ত্রি দিয়ে তৈরী হয় চতুর্দ্দোলা। ১৯৩৮ সালে তিনি তৈরী করেন রাজভবনের সদর দরজা।

## সঙ্গীত ও সংস্কৃতি চর্চা

ভেলাইডিহা রাজপরিবারের সংস্কৃতিমনস্কতা এলাকায় সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল তৈরিতে সহায়ক হয়েছিল। রাজা প্রাণবল্লভ ছিলেন সঙ্গীতের অনুরাগী এবং নিজে ছিলেন ভাল সেতার বাদক। সঙ্গীতাচার্য সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর সঙ্গীতগুরু। তাঁর রাজবাটীতে দীর্ঘকালীন অবস্থান ও সঙ্গীতাচর্চা এলাকায় সঙ্গীত আবহকে আরো জোরালো করে তোলে। আরেক সঙ্গীতগুরু জ্ঞান গোস্বামীর নিয়মিত রাজবাটীতে আগমন ও সঙ্গীত চর্চা এই পরিমন্ডলকে বলিষ্ঠ ধারায় পুষ্ট করে। প্রতি বছর রাধা গোবিন্দ জিউ-এর দোলযাত্রার সময় জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী ভেলাইডিহা আসতেন। দোল উৎসবের চাঁচরের দিন রাজবাটীতে বসত সঙ্গীতের আসর। তিনদিনের আসরে প্রতিদিন সন্ধায় প্রথমে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর, তারপর নৃত্য ও সবশেষে যাত্রা। শেষ হতে পরদিন সকাল ৮-৯টা হয়ে যেত হত। রাজপরিবারের সঙ্গীতানুরাগ ও পৃষ্ঠপোষকতার সম্মানে ১৯৪১ সালে ওন্দার মন্দারবনী সঙ্গীত মহাসম্মেলনে রাজা বিজয়চন্দ্রকে সভাপতি নির্বাচন করা হয়। এই আসরে জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, সত্যকিঙ্কর সহ বহু পন্ডিত যোগ দেন। রাজপরিবারের সদস্যরা পাখোয়াজে তালিম নিতেন অনন্তলালের শিষ্য মৃদঙ্গাচার্য গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, বীরপঞ্চকতাল, রাশতাল, মোহনতাল, দোবাহারতাল, লক্ষ্মীতাল-এর মত অপ্রচলিত তালেও অসাধারণ সুরঝঙ্কার তুলতে পারতেন। তিনি ভেলাইডিহা রাজপরিবার ছাড়াও অগ্রদ্বীপ, নাড়াজোল, নাটোর রাজের আচার্য হয়েছিলেন। ভেলাইডিহা রাজপরিবার মহানুভবতার নিদর্শন রেখে বহু বছর তাঁর কাছে বার্ষিক ভাতা পৌঁছে দিতেন। আর কালী পুজোতে তাঁর কাছে ভেলাইডিহা রাজার পক্ষ থেকে যেত একটি ছাগল, এক সের ঘি, আধমণ আতপ চাল, মর্তমান কলার কাঁদি ইত্যাদি। সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রাজবাটীতে তিন দিন অবস্থান কালে রাজপরিবার ও রাজ্যের প্রজাদের সঙ্গীতানুরাগ নিয়ে নিঃশংসয় আস্থা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'প্রত্যেক দিন দু'বেলাই পুরোদমে গান বাজনা হয়েছিল। অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছিল এখানের লোকগুলি যেন সঙ্গীত সমঝদার রূপে সৃষ্টি হয়েছে। এতে করে বেশ প্রমাণ পাওয়া যায় — বহু কাল ধরে সংগীত চর্চার ধারাবাহিকতা থাকলে তবেই এইরূপ মানুষের অন্তরে সুর-ছন্দের উপর স্বাভাবিক বোধ এসে যায়।' পরগণার সঙ্গীত অনুরাগ নিয়ে এর চেয়ে বড় মূল্যায়ন আর কিছু হয় না। উল্লেখ্য সত্যেন্দ্র-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যকিঙ্করকে 'দ্বিতীয় যদুভট্ট' বলে অভিহিত করেছিলেন।

রাজা ও প্রজাদের সঙ্গীতের প্রতি আবেগ ও আবেশ বোঝা যায় কিশোর সত্যকিঙ্করের ভেলাইডিহাতে আয়োজিত এক রাজ সঙ্গীত আসর সম্পর্কিত মন্তব্যে। তিনি লিখলেন, 'সেদিন সন্ধার কিছু পরে আসরের স্থানে গিয়ে দেখলাম ভিতরে শ্রোতায় ভর্তি এবং পৌষ মাসের দারুণ শীত উপেক্ষা করে চতুর্দিকের জানলার সামনে লোকজন ভিড় দাঁড়িয়ে আছে গান শুনার আগ্রহে। এই দৃশ্য দেখে সহজেই বুঝতে পারলাম এখানকার লোকেদের শাস্ত্রীয় সংগীতের উপর কত বেশি অনুরাগ। গায়কের বয়সের সংবাদ জেনে তার জন্যও বোধ হয় শ্রোতাদের বেশি করে টেনে এনেছিল। রাজাবাহাদুর গান আরম্ভ করবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা মাত্র তানপুরার সুর মিলিয়ে দাদুর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে এবং গুরুকে স্মরণ করে শুরু করলাম ইমন-কল্যাণ রাগের আলাপ। সেই রাগের গানের সঙ্গে সঙ্গত করলেন রাজাবাহাদুরের বৃদ্ধ পিশেমশায় রায়চরণবাবু।

তারপর পাখোয়াজ নিলেন ক্রমান্বয়ে রাজার বড়কাকা হিকিমসাহেব, ছোটকাকা, বড়ঠাকুর সাহেব, এবং রাজা নিজে।

তিন ঘণ্টা একাদিক্রমে ধ্রুপদ চলল, শেষে এক ঘন্টা সেতার সমানে একটা রাগের উপর বাজান হল।

গানের প্রথম সময় থেকেই সকলে খুব উল্লাস প্রকাশ করতে লাগলেন। সেতার শুনে রাজশিক্ষক মিশ্রজি খুবই বিস্মিত হলেন। অন্যান্যদের মন্তব্য বিশেষ করে আর কি জানাব। উল্লেখ্য এই মিশ্রজি ছিলেন বেনারস মিশ্র ঘরণা আগত প্রথিতযশা সেতার শিল্পী।'[১০]

সঙ্গীতাসরে আসার জন্য সত্যকিঙ্কর পেতেন ৪০ রৌপ্যমুদ্রা, প্রচলিত হারের চেয়ে আট গুণ বেশি। এর থেকে ভেলাইডিহা রাজপরিবারের সঙ্গীতানুরাগ ও তার পেছনে অবারিত ব্যয়ের মানসিকতা বোঝা যায়। নাট্যউৎসব হত কুলদেবতা রাধগোবিন্দ জীউয়ের দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে।

## শিকার সংস্কৃতি ও এখ্যান উৎসব

স্থানীয় উপজাতিদের বার্ষিক শিকার উৎসবের ধরণে ও প্রভাবে রাজ ঘরনাতেও শিকার উৎসব চালু হয়। বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে শুরু হয়ে আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত চলত এই শিকার উৎসব। এর ব্যাপ্তি ছিল ঝিলমিলের কাছে 'মহাদেব সিনান' জঙ্গল থেকে রায়কা-সুতান-শলজল-পাটাঘরা-ছুড়িমারা জঙ্গল হয়ে দলমা পাহাড়

পর্যন্ত। এছাড়া অগ্রহায়ণ থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত রাজাদের নিজস্ব জঙ্গলে শিকার চলত। বিজয়চন্দ্রের সময়কাল পর্যন্ত এই শিকার ধারা অব্যাহত ছিল।[১১] রাজা প্রাণভল্লভ সম্পর্কে সঙ্গীতাচার্য সত্যকিঙ্কর তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছিলেন, 'রাজাবাহাদুরের মাছ ধরা ও শিকারে অত্যন্ত সখ ছিল। একদিন তিনি নিজেই আগ্রহী হয়ে আমাকে বন্দুক চালনা শিখিয়ে দিলেন। পাহাড়তলির একটা বড় শালগাছের আগায় সাদা ঘুঘু বসে ডাকছিল, রাজাবাহাদুর আমাকে একটু দূরে দাঁড় করিয়ে বললেন — বন্দুকটা এইভাবে খুব শক্ত করে ধরে পাখিটার মাথা লক্ষ করে ঘোড়াটা টিপে দিন, নলের মাথায় যে ছোট চিহ্নটি আছে তার সঙ্গে পাখির মাথা এক করে নেবেন। আমি ঠিক সেই নিশানা ধরে বন্দুক বাগিয়ে ঘোড়াটা টিপে দিলাম। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে পাখিটা প্রাণহীন দেহ নিয়ে লট করে পড়ে গেল।' বোঝা যায় রাজপরিবারটির শিকার উৎসবে আগ্রহ ছিল ব্যাপক।[১২]

## ভূমিব্যবস্থা

এই রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠার আগের পর্বে অর্থাৎ সাঁওত নিয়ন্ত্রিত রাজগ্রাম কেন্দ্রিক শাসনে মূলত ঝুমচাষ ধরণের আদি আরণ্যক কৃষি ব্যবস্থা চালু ছিল। ওড়িয়া সংস্কৃতি জারিত সিমলাপাল-ভেলাইডিহার রাজশাসনাধীনে ক্ষেতি ব্যবস্থা বা খুপড়ি চাষ চালু হয়। আর উৎকল আগত বণিক-মহাজনদের প্রভাবে কৃষিতে পুঁজির যোগান বাড়ে। সেচের ধারণা তৈরি হয়। রাঢ় অঞ্চলে  প্রাক-উপনিবেশ পর্বে ও ঔপনিবেশিক শাসন ধারাতেও ঘাট ও ঘাটোয়াল ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। তবে ভেলাইডিহাতে এমন ব্যবস্থার নির্দিষ্ট প্রমাণ মেলেনি। কৃষির প্রসারে ও সেচের সুবিধার্থে রাজা রামচন্দ্র সিয়ারজোড়ায় 'চৌধুরী পুকুর' নাম একটি চারকোণা পুকুর খনন করেন।

## রাজধানীর হালহকিকত

দক্ষিণ বাঁকুড়ার এই ছোটো মফস্বল ভেলাইডিহা অচিরেই রাজধানীর গরিমা লাভ করে। দৈনিক বিচারব্যবস্থা, দৈনিক প্রশাসনিক তৎপরতা, রাজবাটীতে জ্ঞানচর্চার নিয়মিত আসর, শিকার অভিযান, কদাচিৎ বীরত্ব প্রদর্শনের আয়োজন রাজধানীকে কর্মতৎপর করে তোলে। সঙ্গীতাচার্য সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "সুরের পথে একটি জীবন" গ্রন্থে সুন্দর ভাবে চিত্রিত করেছেন বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভেলাইডিহা রাজনগরের হালহকিকত।[১৩] তিনি লিখলেন, "এই রাজার দেশটি শহর

সভ্যতার মত চাকচিক্য ও জমকালো একবারেই নয়। নিতান্ত অনাড়ম্বর একটি স্বল্পপরিচ্ছন্ন গ্রাম্য রূপের মতই। নামের সম্বোধনে রাজধানী না বলে রাজপল্লীই বরং বলা চলে। পল্লীর এই মূর্তি আমার খুব ভাল লাগত। এই দৃশ্য রূপ দেখে মনে হত যেন প্রকৃতি-দেবীরই এক সাধারণ বেশ যুক্ত সরম-সরসতা পূর্ণ আধঘোমটা টানা স্নিগ্ধ মধুররূপ।”

ভেলাইডিহার সুরম্য রাজবাটীর বিবরণ পাওয়া গেছে তাঁর এই প্রবন্ধে। রাজবাটীতে অবস্থান কালে রাজউদ্যানে ঘুরে বেড়িয়ে তিনি যথেষ্ট প্রসন্নতা লাভ করতেন। এর বর্ণনায় তিনি লেখেন, “বাগিচাটির চতুর্দিকে বিস্তৃত সীমার পরিধি ছিল প্রায় বিঘে কুড়ির মত জায়গা নিয়ে। থাক কাটা মেহদী গাছের বেড়ার ভেতরের প্রথম স্তরের চারিদিকে ছিল শ্বেত ও স্বর্ণচাঁপার গাছ। দ্বিতীয় সারিতে ছিল নাগেশ্বর ফুলের গাছ। —তার পর তৃতীয় সারিতে ছিল জুঁই ও কুন্দফুলের গাছ অতিসুন্দর করে সাজান। তার সামনের মধ্যস্থলে মাটির দ্বারা নানান অঙ্কনরূপ তৈরি করে তার এক একটিতে গোলাপ ও বেলফুলের গাছ ছিল। এক একটি গোলাপ গাছে এত বড় আকারের গোলাপ ফুল, যেন এক একটি রেকাবীর মত আকার বিশিষ্ট। যথাসময়ে এত বেশি বেলফুল ফুটত যে আমরা মালিকে দিয়ে তুলিয়ে সবুজ ঘাসের উপর স্তূপাকার করে রেখে তার চারদিকে বসে সৌরভের ঘ্রাণে মাতোয়ারা হয়ে যেতাম। খানিকক্ষণ পরে মনে হত যেন সারা দেহ হতেও বেল ফুলের সুগন্ধ বের হচ্ছে। বাগানের বেড়ার পশ্চিম দিকে খুব বড় বড় কয়েকটি শাল গাছ ছিল। সন্ধ্যায় সেই সব গাছের শাখায় নানান জাতের নানান রং ও গঠনের সুন্দর সুন্দর পাখিরা কুলায় এসে যখন সুন্দর ধ্বনি তুলত তখন মনকে অভিভূত করে দিত।” এই বিবরণ থেকে ভেলাইডিহা রাজ পরিবারের রুচি ও সৌন্দর্য ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। বোঝা যায় রাজধানীর গরিমা।

তবে বর্তমানে ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে লস্করচন্দ্র সিংহ চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত ভেলাইডিহা রাজবাড়ি ধ্বংসাবশেষে পরিণত। শিলাবতী নদীর দক্ষিণ তীরে গড়ে ওঠা এই রাজবাড়ীর সদর দরজা এবং কুলদেবতা যেখানে থাকতেন তার ভগ্নাবশেষ ছাড়া কিছুই আর নেই।

## মুক্তি আন্দোলন ও ভেলাইডিহা রাজার ভূমিকা

এই রাজপরিবার প্রথমাবধি কংগ্রেসী ধারায় মুক্তি আন্দোলনে অংশ নেয়। ইউনিয়ান বোর্ড গঠিত হলে ভেলাইডিহার রাজা বিজয়চন্দ্র অনিবার্যভাবেই বোর্ডের প্রেসিডেন্ট

হয়ে মানুষের সেবায় ব্রতী হন। দেশব্রতী এই রাজার নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতেন ম্যানেজার ললিত পাণ্ডা, নারায়ণ দাস, প্রাণকৃষ্ণ সিংহ মহাপাত্র, রামকৃষ্ণ বড়ঠাকুর (সিমলাপাল), চন্দ্রভূষণ শতপথী, রাজবল্লভ পাঠক, কালীকিঙ্কর কুণ্ডু, সত্যেন্দ্রনাথ পান্ডার মত সেকালের বিপ্লবীরা। এরা অনেক সময় ছদ্মবেশে বিভিন্ন নাটকের কাজে অংশও নিত। নাট্যমোদী ও দেশপ্রেমী রাজা সরকার নিষিদ্ধ দেশাত্মবোধক নাটক "কারাগার" মঞ্চস্থ করতেও পিছোপা হতেন না। এ জন্যে রাজরোষে পড়লেও তারা পিছিয়ে আসেননি। রাজ এষ্টেটের অন্তর্গত তাপলের জঙ্গল ছিল বিপ্লববাদীদের গোপন আখড়া। এখানে খাবার ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যোগান আসত রাজবাড়ী থেকে। স্বভাবতই মুক্তি আন্দোলনের আর্থিক, নৈতিক সাহায্য ও গণমত গড়ে তোলাতে এই রাজ বংশের ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। গৈরিক পতাকা, বঙ্গে বর্গী, মহারাজ নন্দকুমার, মহারাজ রনজিৎ সিংহ প্রভৃতি নাটকের মাধ্যমে এলাকায় দেশাত্মবোধক পরিমন্ডল তৈরি হয়। অভিনয় করতেন রাজা নিজে। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবীরা ঠাঁই পেতেন রাজবাটীতে। আহার ও নিরাপত্তা সহ। চুয়ার বিদ্রোহে এ রাজপরিবারের অবদান পরবর্তীকালে দেশমুক্তি আন্দোলনে এদের ভূমিকার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ।[১৪]

ভেলাইডিহার রাজপরিবার চুয়ার বিদ্রোহের সাথে যুক্ত ছিলেন। এই পরিবারের অচ্যুতানন্দ-দশরথি সিংহ হিকিম ভেলাইডিহা-খাতড়া সীমান্তে ব্রিটিশের সাথে দুর্গম ঘোড়াকাটা জোড়ের যুদ্ধে মৃত্যবরণ করেন। বরেণ্য স্বাধীনতা যোদ্ধা কালীকিঙ্কর কুন্ডু, সত্যেন্দ্রনাথ পান্ডা, রাজবল্লভ পাঠক, চন্দ্রশেখর সিংহবাবু ভেলাইডিহা রাজবাড়ীতে আশ্রয় ও সবরকমের সহায়তা পেতেন। ২৩/০২/২৪ তারিখে লক্ষ্মীসাগরের নারায়ণ চন্দ্র দাসের অস্ত্র ও কার্তুজ তৈরির অপরাধে ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

## প্রজাজীবন

ভেলাইডিহা তালুক সৃষ্টির পর প্রজাসাধারণের পূর্বতন সিমলাপাল তালুকের বিভিন্ন কৃষক-প্রজাবিরোধী ব্যবস্থা থেকে মুক্তি ঘটে। রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর মতে খাতড়া মুন্সেফ কোর্টে জমিদার-প্রজা বিরোধের অধিকাংশ মামলাই ছিল সিমলাপাল সংক্রান্ত। সত্যকিঙ্করের ভেলাইডিহা সংক্রান্ত বিবরণে দেখি বিংশ শতাব্দীর সূচনায় পাঁচ টাকায় দেড় মণ চাল পাওয়া যেত। ভেলাইডিহা থেকে নিকটস্থ নগর বিষ্ণুপুর যেতে সময় লাগত গোশকটে ১০ ঘন্টা। ভাড়া ৫ টাকা। রাজারা কৃষিক্ষেতের সেচ

ব্যবস্থা সম্পর্কে ছিলেন যত্নবান। বহুকাল পূর্বেই রাজা কৃষ্ণলাল সেচপুকুর দিয়ে জনস্বার্থে পুকুর খননের ধারা শুরু করেন। সিয়ারজোড়ায় এমন একটি চতুষ্কোণ পুকুরের খনন ছিল রাজা কৃষ্ণলালের ও পুত্র রামচন্দ্রের এই প্রজানুরঞ্জনের নিদর্শন। শিলাবতী সিঞ্চিত সেচ জমি ভেলাইডিহার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। রাজাদের উদার ও সংস্কারমুক্ত মানসিকতার কারণে শাসন ধারায় উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ জন্ম নেয়নি। রাজা বিজয়চন্দ্র নাটক-যাত্রা চর্চায় দুলে-কালিন্দী-মাঝিদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। রাজবাটীতে পড়াশোনার জন্য যারা আশ্রয় পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে নিম্নবর্ণীয়রাও ছিলেন। রাজা প্রাণবল্লভ পুত্রের বিবাহ দেওয়ার সময় ভূস্বামী পরিবার না দেখে খাতড়া আদালতের উকিল ভূতশহর নিবাসী রামবিষ্ণু ষন্নিগ্রাহীর কন্যা ঊষারাণীর সাথে বিবাহ দেন। পরবর্তীকালে জনৈক মৃত্যুঞ্জয় পান্ডা চাকুরিরত অবস্থায় প্রশিক্ষণের কারণে বিদেশ গেলে 'কালাপানি' পার করার অপরাধে সমাজচ্যুত হন। রাজা বিজয়চন্দ্র রাজবাটীতে তাদের আশ্রয় দেন। শুধু তাই নয়, তাঁর কন্যা আরতি দেবীর সাথে পুত্র প্রদ্যোতকুমারের বিবাহও দেন। এ থেকে রাজপরিবারের মুক্তমনের হদিশ মেলে। এছাড়া মহিলাদের সম্মান ও অধিকারের বিষয়েও ছিল রাজপরিবার সময়ের থেকে অগ্রসর। রাজা বিজয়চন্দ্র ২০ বছরে বিবাহিত হন। ২৩ বছরেই পিতৃহারা। এই যুবক রাজার পাশে থেকে সাহস যুগিয়েছেন রানী ঊষাদেবী। মাত্র ৩৯ বছরেই রাজা প্রয়াত হলে ৪ বছরের রাজকুমার প্রদ্যোতকুমারকে নিয়ে দক্ষতার সাথে রাজ্যপাট সামলান রাজমাতা ঊষাদেবী।

প্রজাদের খাবারের অভ্যাস নিয়ে সত্যকিঙ্কর সুন্দর একটি বিবরণ দিয়েছিলেন, 'ভেলাইডিহা অঞ্চলের বহু দূরত্বের বিস্তৃত অঞ্চলের বহু গ্রামের অবস্থাপন্ন ও সাধারণ শ্রেণির মানুষদের প্রধান খাদ্য হল চিঁড়ে...সাধারণ মানুষরা জলে ভিজিয়ে নুন-লঙ্কা দিয়েই পরম পরিতোষ সহকারে চিঁড়ে খায়। গুড় কোনো স্তরেরই জন্য দরকার হয় না। উপরের স্তরে চিঁড়ের সঙ্গে তরকারীর সহযোগে অপরিহার্য রূপে থাকে। রাজাবাহাদুরকে দেখেছি এইভাবে খেতে। চিঁড়ে প্রধান খাদ্যরূপে থাকার জন্য প্রত্যেকেরই শরীর স্বাস্থ্য খুবই শক্ত পোক্ত দেখেছি।'[১৫]

## ভেলাইডিহা রাজপরিবারের ভাঙ্গন

ভেলাইডিহা রাজপরিবারের জন্ম হয়েছিল শ্রীপতি মহাপাত্র প্রবর্তিত অখন্ড সিমলাপাল রাজপরিবারের বিভাজনের মাধ্যমে। এই ভাঙ্গন হয় ১৬১৭ সাল নাগাদ রাজা চিরঞ্জীবের দুই পুত্র লক্ষণ ও লস্করের মধ্যে (অন্য পুত্র বিক্রম অচিরেই অপুত্রক

অবস্থায় মারা গেলে তাঁর অংশটি সিমলাপালের সাথে সংযুক্ত হয়)। লস্কর সিংহ চৌধুরী অখন্ড সিমলাপাল পরগণার ১০ আনা (২৬২৬৬ কের) নিয়ে ভেলাইডিহা পরগণার পত্তন করেন। রাজা প্রাণবল্লভ সিংহচৌধুরীর (১৮৮৪-১৯৩২) সময়কালে একান্নবর্তী রাজ পরিবারের মতান্তর ও সম্পত্তির ব্যবহার নিয়ে বৈরিতার জন্ম নেয়। যেটির অবসান ঘটে পারিবারিক বিভাজনের সূত্রে। রথীন্দ্রমোহনের মতে এই বিভাজনের নেপথ্যে ছিল বাড়ির বধূদের পারস্পরিক ঈর্ষা ও বৈরিতা।[১৬] হয়ত রাজার তুলনায় কম রোজগারের ভাইদের পরিবারের অসূয়াভাব এই ভাঙনে ইন্ধন দিয়েছে। প্রাণবল্লভের সময় ভেলাইডিহার ঈশানচন্দ্র সিংহ হাকিম ও জগবন্ধু বড়ঠাকুরের যৌথ গোলদারি দোকান সেই আর্থিক অসমতার ইঙ্গিত দেয়। এর কর্মচারী ছিলেন জুনবাঁকড়া গ্রামের ছত্রী গতিগোবিন্দ রায় (১৯০৬-১৯১০)। রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী ভেলাইডিহার রাজা রাজগ্রামের বৃন্দাবন দত্ত-ফকির দত্তের কাছে টাকা ধার নিতেন এমন তথ্য দিয়েছেন।[১৬ক] এই সময়কার বৈকণ্ঠনাথ সিংহবাবুর সাথে আশুতোষ সিংহবাবুর একটি মামলায় এ সংক্রান্ত বিষয়ের ইঙ্গিত আছে। এটি রাজপরিবারের আর্থিক সংকটকে নির্দেশ করে।

পারিবারিক সম্পর্কের নিম্নগামিতা ও সম্পত্তির বন্টন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে আহুত এক আপোষ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি চিন্তামণি পান্ডা, হর মহাপাত্র, মহেশ মহাপাত্র, গোপী পাইন সহ কয়েকজন।[১৭] এই মজলিসের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিবারের নদীয়ার চাঁদ হিকিমের অনুগত অংশ রামগড়ে চলে গিয়ে ভেলাইডিহা পরিবারের শাখা বংশ স্থাপন করে। একই কারণে ১৯০৬ সালে ভেলাইডিহা রাজপরিবার দ্বিতীয়বার ভাঙন বিড়ম্বিত হয়ে পড়ে। পরিবারের নীলমণি, যুগল ও জগৎ সিংহ চৌধুরী পৃথগান্ন হয়ে সিংহজোড়ায় (কুমারশোল) বসতি স্থাপন করেন।[১৮] ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রামগড় শাখা বংশ ও সামাজিক ক্ষেত্রে অবদান রাখার ক্ষেত্রে সিংহজোড়া পরিবারের অবদান উল্লেখযোগ্য। আপোষ বন্টনের ফলে ভেলাইডিহা জমিদারির অন্তর্গত রামগড় জঙ্গলের মালিকানা পেয়েছিলেন নদীয়ার চাঁদ হিকিম, যুগল ও নীলমণি বড় ঠাকুর। এরা ছিলেন জঙ্গলের ব্যাপারী। ১৮৯২ সালে তিতাবনীর হরিচরণ পতি এই জঙ্গল থেকে দুই গাড়ি বোঝাই জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করেছিলেন। তদারকি করেছিলেন নদীয়ার ও নীলমণি।[১৯] পরবরর্তীকালে নদীয়ার চাঁদের কাছ থেকে এই জঙ্গল কিনে নেন গোবিন্দ পান্ডা (৪ আনা), বিপীনবিহারী দত্ত (৬ আনা), সারদা দত্ত (২ আনা) ও দোলগোবিন্দ পাল (৪ আনা)। নদীয়ার চাঁদের মহাজনী কারবার ছিল।[২০] রামগড়

জঙ্গলে চারটি পুরান আমবাগানের মালিক ছিলেন নদীয়ার। আম গাছগুলি ১৮৬৩-৬৪ সালেরও আগের। তিনি প্রতি বছর বৈশাখ মাসে বাগানে জলসত্রের আয়োজন করতেন। এখান থেকে নদীয়ারের আর্থিক অনুকূল্যে ব্রাহ্মণ শিবু ধর তৃষ্ণার্ত পথচারীদের ক্লেশ নিবারণের জন্য গুড় ও বুটভিজা সহ জল প্রদান করতেন।[২১]

সিংহজোড়ার শাখা বংশের সাথে প্রাণবল্লভের সুতোর টান কখনও ছিন্ন হয়নি। সিংহজোড়ার শরৎ সিংহ বাবু প্রাণবল্লভের আহ্বানে ভেলাইডিহা রাজবাড়িতে গানের তালিমে অংশ নিতেন। রাজবাড়ি আয়োজিত যাত্রায় গান গাইতেন। ১৯২৭ সালেও এই যাত্রা দলে বেশ রমরমা ছিল।[২২] বীরভানপুরের কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ শ্রীনাথ চন্দ্র পান্ডা বনকাটা চতুষ্পাঠীতে পড়াশোনা করার সময় ১৯০৩-১৯১৭ সময়কালে সিংহজোড়ার জগৎসিংহবাবুর বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলেন। আহার-পরিধেয়-বই দিয়ে সাহায্য করেছিলেন রাজা প্রাণবল্লভ, নদীয়ার চাঁদ, বনকাটার মহান্তিরা।[২৩] তিনি পরে ব্রাহ্মণডিহায় টোল খুলেছিলেন।

## রাজ বংশের পতন

রাঢ়ভূমিতে ভেলাইডিহা রাজপরিবার শিক্ষা-সংস্কৃতি, প্রজানুরঞ্জন ও ন্যায়-বিচার, কৃষি-সেচের উন্নয়ন, দেশভক্তি সহ বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ অবদান রেখে গিয়েছে।[২৪] এর ফলে ভেলাইডিহার প্রজাসাধারণ উন্নত সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল ও ন্যায় বিচার পেয়েছে। গড়পড়তা প্রজাজীবন ছিল স্বচ্ছল। আগামী দিনে এর সঠিক মূল্যায়ণ হওয়া দরকার। ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে তালুকের ইজারা গিসবর্ণ এয়ান্ড কোম্পানীর হাতে চলে গেলে এই প্রাচীন  রাজবংশটির পতন হয়।

**তথ্যসূত্র :**


১. **LSS O'Malley, Bankura District Gazetters, Calcutta, 1908 p.564**
২. **Amiyakumar Bondyopadhyaya, Bankura District Gazetteers, Calcutta, 1968, p.563-64**
৩. **B Ray, Bankura District Handbook, Calcutta, 1961, p.153.**
৪. **রজতকান্ত সিংহচৌধুরী, রাজা বিজয় সিংহ চৌধুরী (১৯১০-১৯৪৯), দুর্গাপুর, ২০১০, পৃঃ ৩২।**
৫. **রজতকান্ত সিংহচৌধুরী, রাজা বিজয় সিংহ চৌধুরী (১৯১০-১৯৪৯), দুর্গাপুর, ২০১০, পৃঃ ৩১।**
৬. **রজতকান্ত সিংহচৌধুরী, রাজা বিজয় সিংহ চৌধুরী (১৯১০-১৯৪৯), দুর্গাপুর, ২০১০, পৃঃ ৬।**
৭. **রজতকান্ত সিংহচৌধুরী, রাজা বিজয় সিংহ চৌধুরী (১৯১০-১৯৪৯), দুর্গাপুর, ২০১০, পৃঃ ৩০।**
৮. **রজতকান্ত সিংহচৌধুরী, রাজা বিজয় সিংহ চৌধুরী (১৯১০-১৯৪৯), দুর্গাপুর, ২০১০, পৃঃ ১৫।**
৯. **গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী (সঃ), বাঁকুড়ার খেয়ালী, বাঁকুড়া, ২০০৯, পৃঃ ১৬১, প্রভাত কুমার সাহার**

প্রবন্ধ মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরের দুর্গাপূজা : প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ। ভেলাইডিহা রাজবাড়ীর দুর্গাপূজার ফর্দে থাকত শালু কাপড় একহাত, শাড়ী ছয়খানা, ধুতি কুড়ি খানা, থান বত্রিশ হাত, ঘৃত কুড়ি সের, ময়দা চার কুড়ি, ছানা আধমণ, দুগ্ধ দুই কুড়ি, দধি এক আড়া, ধান্য এক আড়া, গুড় পাঁচ মণ, বিড়ি কলাই দুই মণ, অড়হর ডাল এক মণ, মুগ ডাল দশ সের, আতপ চাল আধ আড়া, সিদ্ধ চাল তিন আড়া, চিড়া ছয় আড়া, কাঁচা তরকারী পাঁচ মণ, সরিযার তেল এক মণ, কেরোসিন দুই টিন, পান পাঁচ হাজার, সুপারী দশ সের, লবণ আধ মণ, হরিদ্রা আড়াই সের, মিষ্টান্ন দশ সের, ডাব-রম্ভা-বাতাপী-আদি ফলাদি কুড়ি টাকা, পুষ্প-পল্লব-যজ্ঞ কাঠ তিন টাকা, মশলা, গন্ধ দ্রব্য, ধূপ, ধুনা, আসনাঙ্গুরীয়, মধুপর্কের বাটি ইত্যাদি কুড়ি টাকা, প্রতিমা নির্মাণ মূল্য পঞ্চাশ টাকা, চাঁদ মালা দুটি, পাঁঠা পনেরটি, কুমড়া পনেরটি, আখ পনেরটি, দক্ষিণা পঞ্চাশ টাকা, নৃত্য-গীত-বাদ্য দুশ টাকা, হাড়ি কাঠ-পাতার মূল্য ছয় টাকা, শঙ্খ ছয় জোড়া। এই ফর্দ ও খরচের খতিয়ান রাজা বিজয় সিংহ চৌধুরীর সমকালীন।

১০. সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরের পথে একটি জীবন, বাঁকুড়া, ১৯৭৪, পৃঃ ২০২।

১১. রজতকান্ত সিংহচৌধুরী, রাজা বিজয় সিংহ চৌধুরী (১৯১০-১৯৪৯), দুর্গাপুর, ২০১০, পৃ.১০।

১২. সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরে পথে একটি জীবন, বাঁকুড়া, ১৯৭৪, পৃঃ ২১৫।

১৩. সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরের পথে একটি জীবন, বাঁকুড়া, ১৯৭৪, পৃঃ ২১৩।

১৪. রজতকান্ত সিংহচৌধুরী, রাজা বিজয় সিংহ চৌধুরী (১৯১০-১৯৪৯), দুর্গাপুর, ২০১০, পৃঃ ১২।

১৫. সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরের পথে একটি জীবন, বাঁকুড়া, ১৯৭৪, পৃঃ ২১১।

১৬. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, ব্রিটিশ রাজপর্বে বাঁকুড়া জীবন, বাঁকুড়া, ২০১৭, পৃ.ঃ ১৪০।

১৬ক. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

১৭. **Paper Book : GplI pt I Appeal from Original Decree No. 238 0f 1927 Baikuntha nath Sighababu Vs Asutosh Singhababu P. 57.**

১৮. **ibid, P. 68.**

১৯. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, ব্রিটিশ রাজপর্বে বাঁকুড়াজীবন, বাঁকুড়া, ২০১৭, পৃ. ২০৫।

২০. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, ব্রিটিশ রাজপর্বে বাঁকুড়াজীবন, বাঁকুড়া, ২০১৭, পৃ. ১৯১।

২১. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, ব্রিটিশ রাজপর্বে বাঁকুড়াজীবন, বাঁকুড়া, ২০১৭, পৃ. ১৬৭।

২২. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, ব্রিটিশ রাজপর্বে বাঁকুড়াজীবন, বাঁকুড়া, ২০১৭, পৃ. ১৬৪।

২৩. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, ব্রিটিশ রাজপর্বে বাঁকুড়াজীবন, বাঁকুড়া, ২০১৭, পৃ. ১৬৬।

২৪. ভেলাইডিহা শাখা রাজবংশ সিংজোড়ার জগৎ সিংহবাবু (রাজবংশের ট্র্যাডিসন অনুসারে বড়াজকুমার সিংহ চৌধুরী, ২য় সিংহ হিকিম, ৩য় সিংহ বড়ঠাকুর ও বাকিরা সিংহবাবু নামে অভিহিত হতেন) বনকাটার শ্রীনাথ পান্ডাকে ১৯০৩-১৯১৭ সময়ে বনকাটা চতুষ্পাঠীতে পঠনকালে ১২ বছরই বই, খাবার ও আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেন। সিংজোড়ার নদীয়ার চাঁদ ও বনকাটার মহান্তিরাও সাহায্য করেন। শ্রীনাথ এরপর ব্রাহ্মণডিহায় একটি চতুষ্পাঠী খুলে পাঠদান শুরু করেন। একই রকম সাহায্য পেয়েছিলেন ভেলাইডিহার শৈলেন্দ্র বাগ(১৯০৮-১৯২১) এবং পাশ করে ১২-১৩ বছর বনকাটায় একটি পাঠশালা চালান। লক্ষ্মীসাগর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন জগবন্ধু কোটাল সহ গ্রামের অনেকে (সূত্র ঃ **Appeal from Original Decree No. 238 of 1927– p.110. Paper Book Gr. Part**). উক্ত নথিতে(পৃঃ৯১) রামগড় শাখাবংশের রামচন্দ্র সিংহ চৌধুরীর পুত্র গৌরের মৃত্যুও রহস্যখুন বলে সন্দেহ করা হয়েছে। সংস্কৃতি ও শিক্ষা প্রসারে যত্নবান ভেলাইডিহা রাজপরিবারের কুলদেবতার পূজা করেন কেন্দ্রবেড়িয়া গ্রামের পান্ডা পদবীর উৎকল ব্রাহ্মণ পরিবার ও দুর্গাপূজা সম্পন্ন করে গাড়রার সৎপথী ও চক্রবর্তী পরিবার।

সপ্তম অধ্যায়

# ধবলভূমের ইতিহাস

## (অম্বিকানগর ও খাতড়া)

রাঢ়ভূমিতে মল্লভূম, মানভূম, বরাহভূম, সিংভূম, শিখরভূম, গোপভূম, ছত্রীভূম, সামন্তভূম, ধলভূম, তুঙ্গভূমের মতো ভূমরাজ্যের পাশাপাশি সপ্তদশ শতকে ধবলভূমের সূচনা ও বিকাশ ঘটে। এই ধবল রাজ বংশের তথ্য ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা আঞ্চলিক ইতিহাসের অনুষঙ্গে অত্যন্ত জরুরি একটি কাজ। প্রায়শই ধলভূম (ঘাটশীলা-নরসিংহপুর) ও ধবলভূমের (সুপুর-খাতড়া-অম্বিকানগর) স্থানিক সীমারেখা মুছে ইতিহাস চর্চিত হয়। তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার পরিবর্তে তালগোল পাকিয়ে যায়, যখন এই ধলভূম ও ধবলভূমকে অখন্ড ও অবিচ্ছিন্ন ভৌগলিক সীমায় বেঁধে একই রকম ইতিহাস উপস্থাপিত করা হয়। অন্যদিকে ধবলভূম ও অম্বিকানগরকে অভিন্ন দেখিয়ে খাতড়া রাজশাখার ইতিহাসকে অবহেলা করা হয়েছে। নিচে ধবলভূমের দুই রাজধারার তথ্যনির্ভর খতিয়ান দেওয়া হল।

### ধবলভূমের পত্তন ও চিন্তামণি পাই

সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে ধবলভূমে ধোবা বা রজক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নরপতি ছিলেন চিন্তামণি রজক। ধবলভূম হল অধুনা পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত খাতড়া মহকুমার সুপুর ও অম্বিকানগর পরগণা দুটির ভৌগলিক এলাকা। অনেকে ধবলভূম রাজের প্রভাব ধলভূম (ঘাটশিলা-নরসিংহপুর), চিল্কিগড় সহ বিভিন্ন রাজসীমায় বিস্তৃত হয় বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, ধবলভূমের আদি রাজা ছিলেন চিন্তামণি ধোবা। তিনি ছিলেন রজক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি। জনশ্রুতি শিখরভূম থেকে রঙ্কিনী দেবী এক দৈত্যের তাড়া খেয়ে রজক পাড়ায় বস্ত্রের গাদার আড়ালে লুকিয়ে জীবন রক্ষা করেন।[১] সেই দেবীর আশীর্বাদেই চিন্তামণি রজকের রাজ্যলাভ। সুপুর ও অম্বিকানগর পরগনায় সুদীর্ঘকাল যে পরিমাপক পাই (শস্য কণার ওজন পরিমাপের জন্য) ছিল তার নাম ছিল চিন্তামণি পাই। এটি রাজা চিন্তামণির নামে। এর থেকে চিন্তামণির সমকালে রাজ্যে কৃষি উৎপাদন ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির প্রমাণ মেলে। ১১৩৫ খ্রিষ্টাব্দে জৈন ধর্মাবলম্বী চোড়গঙ্গরাজের দখলে আসে ধবলভূম সহ বাংলার বিস্তৃত অংশ। ধবলভূমে আজও বিভিন্ন জৈন স্মারকের প্রবল উপস্থিতি এই আধিপত্যের প্রমাণ দেয়। এই প্রভাবের অনুষঙ্গেই ধবলভূমে জৈন বণিক সরাক সম্প্রদায়ের আগমন ঘটে। তামাশিল্প, কৃষি-বাণিজ্য সহ বিভিন্ন বিষয়ে এদের লগ্নতা ও দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। তাই চিন্তামণির শাসনকালেও সেই বাণিজ্য ধারায় রাজানুকূল্য অব্যাহত ছিল।

চিন্তামণির রাজধানী ছিল পরগণার প্রায় কেন্দ্রস্থলে প্রাচীন জনপদ ভোজদায়। এখনও এখানে এক প্রাচীন শিব মন্দিরের অবস্থান গ্রামটির প্রাচীনত্বের নিদর্শন। অনেকের মতে জগন্নাথ ধবলের ও জগনাথোত্তর কাহিনীই ইতিহাস সিদ্ধ। চিন্তামণির কাহিনী জনশ্রুতি, যা মূলত ধবলরাজকে ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তীর্ণ করার প্রয়াসে রচিত। চিন্তামণির দুই বোন চিত্রা ও বিচিত্রাকে জগন্নাথ ধল্ল বিবাহ করেছিলেন বলে জানা যায়।

## জগন্নাথ ধল্ল রাজবংশে সূচনা

কয়েকশো বছর আগে রাজস্থানের ঢোলপুর থেকে আসা রাজপুত যুবক জগন্নাথদেব খাতড়ার সুপুর পরগনার রাজা চিন্তামনি ধোপাকে মল্লযুদ্ধে পরাজিত করে জগন্নাথ শাহাজাদা ধবলদেব নাম গ্রহণ করে ধবলভূমের রাজা হন। অস্থায়ী রাজধানী হয় কুলদেবতার নামে রামচন্দ্রপুরে। শিবভক্ত রাজা জগৎ দেব শিবের গৌর বা ধবল বর্ণকে স্মরণ করে নিজ নামের সঙ্গে ধবলদেব যোগ করলেন। নাম নিলেন পুরী জগন্নাথের নাম অনুসারে জগন্নাথ ধবলদেব। এই বংশের রাজাদের ওড়িয়া যোগ বোঝা যায় রাজানুকুল্যে ওড়িয়া অভিবাসনের ঘটনা থেকে। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের ১০ই বৈশাখ পুরী জেলার তুলসিচরা থেকে ঘৃত কৌশিক মহাপাত্রের বংশের পাঁচু

মহাপাত্রকে অম্বিকানগরের রাজা অনন্তলাল বড়কলা মৌজার পাট্টা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিনিময়ে রাজাকে তিনি ছয় টাকা বার্ষিক খাজনা, ত্রিসন্ধ্যা আশীর্বাদের প্রতিশ্রুতি দেন।[২] অনন্তলালের সেনাপতি ছিলেন কমো গ্রামের 'কপাট' পদবীধারী বাসিন্দা। বিজয়ী রাজা ধবলভূমের রাজধানী হিসেবে খাতড়া থেকে পাঁচ কিমি দূরত্বে এক জনপদ 'সুপুর'কে নির্বাচিত করেন। যদিও এর আগে জগন্নাথদেবের হাতে পরাজিত রাজা চিন্তামনি ধোপার রাজধানী ছিল ভোজদায়। জগন্নাথ শাহাজাদা ধবলদেব 'সুপুরে'র নাম পরিবর্তন করে রাখেন সুরপুর। এবং সেখানেই রাজমহল প্রতিষ্ঠা করে কুলদেবতা কালাচাঁদ জীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে বেশ কয়েকবার মন্দিরটির পুননির্মাণ হয়েছে। পুরীধাম দর্শনের পর কথিত আছে এই জগন্নাথকে সাহায্য করেছিলেন কটকের রাজা। যিনি তাঁকে 'শাহজাদা' উপাধি ও সৈন্য দিয়ে সহায়তা করেন।[৩]

এই কালাচাঁদ মন্দির প্রতিষ্ঠার সাথে মিশে আছে জগন্নাথের শাসন কালে এক রাষ্ট্রীয় বিপন্নতার কাহিনী। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বরাভূম (বড়বাজার) রাজ্যের সতেরখানি তরফের সর্দার ত্রিভুবন সিংহ প্রায়শই ধলভূম, বরাভূমের বিভিন্ন অংশে এবং বাঁকুড়ার অম্বিকানগর, সুপুর, শ্যামসুন্দরপুর রাজ্য আক্রমণ ও লুটপাট করতেন। এই ফলে রাজকোষ ও সাধারণের সম্পদ নিয়মিত অপহৃত হতে থাকে।[৪] অত্যাচারিত পরগণাগুলি একটি প্রতিরোধী রাষ্ট্রজোট গড়ে তোলে। বরাভূমের রাজা বিবেকনারায়ণ এর নেতৃত্ব দেন। সহায়তা দিয়ে যান অম্বিকানগর, সুপুর, শ্যামসুন্দরপুরের রাজা। সতেরখানি তরফের রাজধানী ছিল খাঁড়ি পাহাড়, কিতাডুংড়ি আর কাঁটারঞ্জা শৈলমালার মাঝে বাটালুকা গ্রাম। এই রাজাদের মিত্রজোট দীর্ঘদিনের যুদ্ধের পর কাটারঞ্জা পাহাড়ের সন্নিকটে ত্রিভন সিংহকে পরাজিত ও নিহত করে (১৭৫০-৭৫ সালের মধ্যে)। রাজপত্নী শিশু লাল সিংকে নিয়ে পালিয়ে যান। হাতেরখানি প্রজাগণ অশেষ নির্যাতনের শিকার হয়। পলাতক রাজপরিবারের খোঁজে ও নেহাত প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে সকল গবাদি পশুকে বল্লমের(বচ্ছি) খোঁচায় হত্যা করা হয়। অদ্যাপি গ্রামের সেই উচ্চ বধ্যভূমি 'বচ্ছিগাদা' বলে অভিহিত। লুণ্ঠিত সামগ্রী জয়ী রাজন্যবর্গ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন। সুপুররাজ নিয়ে আসেন ত্রিভূবন সিংহের কুলদেবতা কালাচাঁদকে।[৫] সুপুরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে কালাচাঁদকে সেখানে স্থান দেওয়া হয়। সাথে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ। পরে ধবলভূমের বিভাজন ঘটলে এটি অম্বিকানগরে স্থানান্তরিত হয়।

## মথুরানন্দ গোস্বামীর আগমন ও ধবলভূমের বিভাজন

ধবলভূমের রাজবংশ ও বংশলতিকা নিয়ে সঠিক কোন তথ্য মেলে না। বিশেষত খাতড়া শাখার রাজবংশের বিষয়ে। উক্ত রাজবংশের কাছে এই সম্পর্কিত কোন নথি পাওয়া যায় না। বিভিন্ন তথ্যের নিরিখে বলা যায়, জেলা গেজেটিয়ার্সে প্রকাশিত ও'ম্যালীর ৩২ পুরুষ রাজত্বের পর ধবলভূমের বিভাজনের তত্ত্ব সঠিক নয়। তাতে না মেলে বংশ লতিকা অনুসারী কালক্রম, না সমর্থিত হয় বিভাজনের সময় কাল। বরং গৌরগোবিন্দ বিরচিত 'শ্রীশ্রী শ্যামলীলামৃত' অনুসারে জগন্নাথ ধবলের সময়েই রাজ্যের বিভাজন অনেক বেশি গ্রহণীয় ও তথ্যসম্মত। মথুরানন্দের ধবলভূমি আগমনের পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ রাজ্য বিভাজনের কাহিনীর সাথে সাযুজ্য পূর্ণ।

কথিত আছে, অপুত্রক ধবলরাজ খাতড়া তথা সুপুরের রাজা জগন্নাথ ঢোল, সন্তান সুখ থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে বিষাদগ্রস্ত হয়ে তাঁর পরগনার ভার (ভাই বিশ্বম্ভরের পুত্র) ভাইপোকে দিয়ে সংসার ছেড়ে গঙ্গাস্নানে বেরিয়ে যান। বাড়ি থেকে গঙ্গা অনেক অনেক দূর। কয়েক দিনের হাঁটা পথ। পথে সেই সময় বিষ্ণুপুরের রাজা মল্লরাজ হাম্বির মল্লের আতিথ্য গ্রহণ করেন তিনি। এসময় বোলাড়া গ্রামে রাজারই তৈরী করে দেওয়া মন্দিরে, শ্যামসুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করেছেন চৈতন্য পরিকর শ্রীদাসগদাধরের পৌত্র মথুরানন্দ গোস্বামী।[৬]

গঙ্গা স্নান যাত্রার পথে, রাজা জগন্নাথ ঢোলের সাথে সাক্ষাৎ হয় মথুরানন্দের। রাজা নিজের কষ্টের কথা তাঁকে সব খুলে বললেন। মথুরানন্দ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, প্রভুই এবিষয়ে মঙ্গল করবেন। শ্রীমথুরানন্দের কাছে অভয় পেয়ে রাজা বাড়ি ফিরে এলেন। এবং সত্যি সত্যিই একবছরের মধ্যেই রানীর কোল আলো করে এলো এক পুত্র সন্তান। অভিভূত রাজা জগন্নাথ ঢোল রানীর কাছে প্রকাশ করলেন সেই যাত্রা পথের ঘটনার কথা। মথুরানন্দের সাথে সাক্ষাতের কথা ও প্রভু শ্যামসুন্দরের কাছে তার মনোকষ্ট ব্যক্ত করার কথা।

সব শুনে রানীও অধীর হলেন মথুরানন্দের সাক্ষাৎ লাভ করার জন্য ও প্রভু শ্যামসুন্দরের দর্শন লাভের জন্য। দর্শন লাভের পর রানী রাজাকে বলেন তার বড় সাধ, গোঁসাই যদি প্রভু শ্যামসুন্দরকে তাদের রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই মনোবাসনা ভাল ভাবে মেনে নেননি বিষ্ণুপুরের রাজা হাম্বির মল্ল। এজন্য তাঁদের বন্ধুত্বের সম্পর্কে চিড়ও ধরে। অবশেষে মথুরানন্দের মধ্যস্থতায় আনুমানিক

১০৩২-৩৩ বঙ্গাব্দে (১৬২৫-২৬ খ্রিষ্টাব্দে), বর্তমানে ইন্দপুর থানার ব্রজরাজপুর গ্রামে মথুরানন্দ শ্যামসুন্দরকে নিয়ে আসেন।[৭] দুই রাজার মৈত্রী বৈঠক হয় দামোদরবাটী গ্রামে। পূর্ব নির্ধারিত মন্দিরে প্রভুকে প্রতিষ্ঠা করেন মথুরানন্দ। তবে বর্তমান মন্দিরটি সেটি নয়, বর্তমান মন্দিরটি আনুমানিক ১০৪২ বঙ্গাব্দে (১৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে) স্থাপিত। মথুরানন্দ হলেন ধবল রাজপরিবারের রাজগুরু। মল্লভূম থেকে ধবলভূমে শ্যামসুন্দর ও মথুরানন্দের আগমন নিয়ে 'শ্রীশ্রীশ্যাম লীলামৃত' কাব্যের ভাষ্য,[৮]

"বিষ্ণুপুর হৈল এক মন্দির তৈয়ার/ তাহা পড়ে গেল সাত দিনের ভিতর
রামচন্দ্রপুর নামে গড় ছিল এক/ ধলভূঞাঁ রাজা অথা মন্দির গড়িল
ভাঙ্গাচুরা নাহি হয়ে তাহা রয়ে গেল / তাই রাধা-শ্যামচাঁদ সেখানে চলিল।"

আরেকটি মতে বাংলা ১০৫১ সনে (১৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে), মল্লভূম থেকে শ্রীচৈতন্য পার্ষদ দাস গদাধর পৌত্র শ্রী মথুরানন্দ গোস্বামী প্রভু শ্যামসুন্দর ও রাধারাণীর বিগ্রহ নিয়ে তৎকালীন সুপুর পরগনা তথা ধবলভূমের রাজা জগন্নাথ ঢোলের একান্ত অনুরোধে পদার্পণ করেন ধবলভূমে। ১০৫২ সনে (১৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে) সেই স্থানে প্রতিষ্ঠা হয় প্রভু শ্যামসুন্দরের মন্দির। মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এক জনপদ। ব্রজের রাজা শ্যামসুন্দরের নাম অনুসারেই গ্রামের নাম হয় ব্রজরাজপুর।

প্রথম জীবনে অপুত্রক থাকার কারণে রাজা এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিলেন যে, নিজের ভাতুষ্পুত্রকে অর্থাৎ ভ্রাতা বিশ্বম্ভরের পুত্রকে (খড়্গেশ্বর) দেবেন রাজ্যের ভার। পরবর্তী কালে মথুরানন্দের আশীর্বাদে রাজার পুত্র সন্তান (হরিশ্চন্দ্র) হলে, রাজা ধর্ম সংকটে পড়লেন। একদিকে প্রতিজ্ঞা, অন্যদিকে পুত্রের ন্যায্য অধিকার। রাজগুরু মথুরানন্দ বাতলালেন উপায়। ধবলভূম পরগণা তিনভাগে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত হল। একভাগ (৫৫ টি মৌজা) ব্রজরাজপুর দেব সেবার জন্য, যেটি প্রজাদের মধ্যে দেবোত্তর শর্তে বন্টিত হয়। নয় ভাগ দেওয়া হয় পূর্ণ রাজ্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া ভাতুষ্পুত্রের জন্য। বাকি ছয় ভাগ আপন পুত্রের জন্য।[৯] কিন্তু মহানুভব ভ্রাতুষ্পুত্র খড়্গেশ্বর সবিনয়ে রাজপুত্রকে নয় ভাগ দিয়ে নিজে ছয় ভাগ রাখলেন। মথুরানন্দ খড়্গেশ্বরের এই মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর নাম দেন ধর্মদাস। হরিশ্চন্দ্রের দীক্ষান্তে নাম হয় গোপীদাস। এইভাবে সাবেক ধবল ভূমি ত্রিধা বিভক্ত হয়ে পড়ল। সমগ্র রাজ্য হয়ে ওঠে বৈষ্ণব সাধনভূমি। গোপীদাসের রাজধানী সুপুর থেকে পরে স্থানান্তরিত হয় খাতড়ায়।[১০]

## খাতড়া-সুপুর রাজাঃ ব্রজরাজপুরের কাহিনী

ব্রজরাজপুরের মন্দির কাহিনী ধবলভূমের ইতিহাসের অনেকটা জুড়ে আছে। কিছু জনশ্রুতি, কিছুটা ইতিহাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। রাজা হরিশচন্দ্র ধবল দেব নিম কাঠের 'ললিতা' মূর্তি সংযোজন করেছিলেন ব্রজরাজপুরের শ্যাম-রাইয়ের সাথে। এর পেছনে গোস্বামী বংশের ষষ্ঠ পুরুষ সাধু গোস্বামী ও সতীবালা দেবীর মেয়ে ললিতা ওরফে প্রেমলতার কাহিনী জুড়ে গেছে।

এই বিষয়ে শ্রী দাসগোবিন্দের লেখা 'শ্রীশ্রীশ্যাম লীলামৃত' ও পার্থসারথি গোস্বামীর 'শ্রীশ্রীশ্যাম লীলাভূমি ব্রজরাজপুর'এ বিবৃত আখ্যান হুবহু তুলে ধরা হল।

সালটা আনুমানিক বাংলা ১১৪০ বঙ্গাব্দ (১৭৩৩ খ্রিষ্টাব্দ)। অতি অল্প বয়স থেকেই, গোস্বামী বংশের ষষ্ঠ পুরুষ সাধু গোস্বামী ও সতীবালা দেবীর মেয়ে ললিতা ওরফে প্রেমলতার অগাধ নিষ্ঠা ও টান ছিল কুলদেবতা প্রভু শ্যামসুন্দরের প্রতি।[১১]

রূপে-গুণে প্রেমলতাও সবার ভীষণ প্রিয় ছিলেন। সেই অল্প বয়স থেকেই যোগিনীর মত, প্রতিদিন একান্তে বসে মালা গাঁথতেন তাঁর প্রিয় প্রভু শ্যামের জন্য। ভক্তের ডাকে ভগবান সাড়া দিয়েছেন বারবার, প্রেমলতার ডাকও ফেরাতে পারেননি তাঁর আরাধ্য ভগবান।

একদিন অপরাহ্নে তাঁর সমবয়সী ছেলে মেয়েদের সঙ্গে মন্দির চত্বরে খেলায় মেতে উঠেছিলেন প্রেমলতা। হঠাৎ একজন অপরিচিত উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ বালক তাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দেয়। সেই বালক সকলকে বলল, 'এসো আজ আমরা এক নতুন খেলায় মেতে উঠি, চলো আজ আমরা সবাই বৃন্দাবন ভাবনার সেই রাধা-কৃষ্ণ খেলা খেলি।' সকলেই এক কথায় রাজি, সেই শ্যামল বালক সাজলো কৃষ্ণ আর প্রেমলতা সাজলো রাই। বাকি সব বালক বালিকা সাজলো সখা ও সখী। রাই-বেশী প্রেমলতা লজ্জায় রাঙা হয়ে রইল। সত্যিই যেন সৃষ্টি হল এক নব-বৃন্দাবন। খেলা শেষে সবাই মিলে প্রেমলতার মায়ের কাছে আবদার করল, দুধ-চিড়ে খাওয়ার।

হাসি মুখে সবার গুড়, কলা দিয়ে দুধ চিড়ে মেখে নিয়ে এলেন প্রেমলতার মা। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল সেই নতুন বালকের প্রতি। চোখ যেন ফেরানো যায় না আর। কি অপরূপ রূপ!

সকলের সঙ্গে সেই ছেলেটিও পরমানন্দে দুধ চিড়ে খেল প্রেমলতার মায়ের হাতে। সেই রাতে প্রেমলতার মায়ের স্বপ্নে এলেন শ্যামসুন্দর। বললেন, 'আজ

বাৎসল্য ভাবে তোর হাতে আমি দুধ চিড়া খেয়েছি, বড়ো মধুর সে স্বাদ। প্রতি অপরাহ্নে আমি দুধ চিড়ে খাব।' সেই থেকে শুরু হোল মধ্যাহ্নে মন্দিরে দুধ-চিড়া ভোগের প্রচলন।

স্বপ্নে শ্যামসুন্দর আরও বলেন, 'তোর কন্যা প্রেমলতা বড়ই ভক্তিমতি, ওকে একটু সাবধানে রাখিস।' ঘুম ভেঙে যায় প্রেমলতার মায়ের, প্রভুর মুখে নিজের মেয়ের গুনগান শুনে গর্বে ভরে উঠলো বুক, মনে পড়ল অপরাহ্নের তাঁর মেয়ের সঙ্গেই শ্যামের নায়ক-নায়িকা খেলা। সেই থেকে তাঁরা মনে মনে জামাই ভাবেন কুলদেবতা প্রভু শ্যামকে। এমনকি তাঁর কথা অন্যদের কাছে অবিশ্বাস্য হওয়ায়, সকলের কাছে উপহাসের পাত্রীও হতে হয় সতীবালা দেবীকে। তবু নিজ বিশ্বাসেই অটুট ছিলেন তিনি।

কথিত আছে, এরপর একদিন অপরাহ্নে হঠাৎ করেই নিরুদ্দেশ হয়ে যান প্রেমলতা। অনেক খোঁজাখুজির পরও সন্ধান মেলেনা তাঁর। প্রিয় মেয়েকে হারিয়ে কেঁদে কেঁদে ঘন ঘন মূর্ছা যেতে থাকেন প্রেমলতার মা সতীবালাদেবী। তাঁর সেই কান্না দেখে, কিছুক্ষন পর সেখানে উপস্থিত হলেন বৃদ্ধ নারায়ণ সেবাইত। তিনি বলেন, 'কাঁদিস কেন, তোর মেয়ে আছেন রাধা-শ্যামের কাছে। আমি এই মাত্র দেখে এলাম, শ্যামের পালঙ্কে বসে আছে প্রেমলতা। যা দেখ গিয়ে। তবে সাবধান, প্রভুর নির্দেশ প্রেমলতাকে প্রহার করবি না, এমনকি ভর্ৎসনাও না, নইলে সে কিন্তু আর থাকবে না।'

মায়ের মন, সব ভুলে অস্থির হয়ে মন্দিরের দিকে ছুটে গেলেন প্রেমলতার মা। গিয়েই মেয়েকে নির্দেশ দিলেন মন্দিরের বাইরে আসার জন্য। বাইরে আসতেই মা বলেন, 'বল কেন তুই না বলে এসেছিস, কেন কাঁদালি সবাইকে এতক্ষন ধরে?' হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে প্রেমলতার গালে তার মা মারলেন এক থাপ্পড়। মুহূর্তেই মূর্ছা গেল প্রেমলতা, মুখে দিয়ে বেরিয়ে এলো এক ঝলক রক্ত, অবশেষে বেরিয়ে গেল প্রাণবায়ু।

সেবাইতকে নাকি আবারও নির্দেশ দেন শ্যামসুন্দর। বলেন, খাতড়ার রাজা হরিশ্চন্দ্র ঢোল, আমারই নির্দেশে একটি নিম কাঠের মূর্তি প্রস্তুত করে এখানে আসবে, ততক্ষণ কেউ যেন প্রেমলতার দেহ স্পর্শ না করে।

অবশেষে সেই নিমকাঠের মূর্তিতে সঞ্চারিত হয় প্রেমলতার প্রাণ। প্রভুর নির্দেশে সেই মূর্তিকে ললিতা নাম দিয়ে স্থাপন করা হয় প্রভুর দক্ষিণ পার্শ্বে। ভক্ত ও ভগবান

যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। আরাধ্য দেবতার পাশে ললিতা নাম নিয়ে চির অমর হয়ে রইল প্রেমলতা।

আজও সেই কারণেই রাজগুরু গোস্বামীরা শ্যামকে তাদের বংশের জামাই বলে মনে করেন। প্রতি বছর 'জামাই বাঁদনা'র দিন বিশেষভাবে বন্দনা করা হয় প্রভু শ্যামসুন্দরের। জামাইয়ের মতো শ্যামসুন্দরকে দেওয়া হয় নতুন বস্ত্র। এই প্রথাটি আজও ভক্তিভরেই পালন করা হয়। ধারাবাহিকতা মেনে প্রভু সেবা করে আসছে গোস্বামী বংশ।

শ্যামসুন্দরের নিত্য সেবার সঙ্গে সঙ্গে সেই থেকেই শুরু হয় নানান উৎসব, যার মধ্যে অন্যতম প্রধান হল এই রাসযাত্রা। রাসযাত্রায় মূলমন্দির থেকে শ্যামসুন্দরকে এক সুন্দর পালকি করে নিয়ে যাওয়া হয় মন্দিরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত রাস মন্দিরে। পালকি ধরেন পার্শ্ববর্তী তেঁতুলিয়া গ্রামের তাঁতি সম্প্রদায়ের মানুষ এবং পালকির সামনে লাঠি হাতে হেঁটে যান তেঁতুলিয়া গ্রামেরই লায়েক (লাঠিয়াল) সম্প্রদায়। এই ধারাটি যুগযুগ ধরেই চলে আসছে।

তদানীন্তন খাতড়ার রাজা তেঁতুলিয়া গ্রামের লায়েক ও তাঁতি সম্প্রদায়কে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তা আজও তাঁরা ভক্তিভরে ও গর্বের সঙ্গে পালন করেন। নিয়ম অনুযায়ী গ্রামস্থ গোস্বামীরা ধারাটি অক্ষুন্ন রেখে আজও চিঠি দিয়ে উৎসবের আগের দিন লায়েক ও তাঁতীদের নিমন্ত্রণ করেন বলে জানা গিয়েছে।

এখানকার শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউর রাসযাত্রার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বিলম্বিত রাস। যা বৃন্দাবন বা নবদ্বীপের রাসযাত্রার পরের দিন শুরু হয়। অর্থাৎ, প্রতিপদ তিথিতে।

## অম্বিকানগরের গড়ে ওঠার ইতিহাস ও রাজকাহিনী

১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা জগন্নাথ ধবল দেবের পত্তন করা অখণ্ড ধবলভূমি ত্রিধা বিভক্ত হয়ে ছয় আনা পরিমাণ অম্বিকানগরের পত্তন হয়। অবিভক্ত পরগনার রাজধানী থেকে অম্বিকানগরের প্রথম রাজা খড়্গেশ্বর ধবলদেব প্রথমে গড়দুয়ারে চলে যান। তার কিছুকাল পরে কুমারী-কাঁসাই নদীর সংযোগস্থলের অদূরে আমাইনগর বা অম্বিকানগর নামক রাজধানী গড়ে তোলেন। আনুমানিক ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ অম্বিকানগরে এই গড় প্রতিষ্ঠিত হয়। নয় ভাগ নিয়ে খাতড়ায় গড়ে উঠতে থাকে খাতড়া জনপদ। আর বাকি এক আনা অংশ রাজা জগন্নাথ ঢোল

বর্তমান ব্রজরাজপুর গ্রামের শ্রী শ্রী শ্যামসুন্দর জীউ-র নিত্যসেবা পরিচালনার জন্য তাঁর গুরুদেব মথুরানন্দ গোস্বামীকে অর্পণ করেছিলেন। অন্যদিকে খড়্গেশ্বর ধবলদেব অম্বিকানগরে নিজ গড় তৈরীর পাশাপাশি তৈরি করেন দেব মন্দিরও। সেখানে ঠাঁই হয় দুই জাগ্রত দেবী-দেবতা অম্বিকা ও কালাচাঁদের। কথিত আছে, দেবী অম্বিকার নামেই রাজধানীর নাম হয় অম্বিকানগর। এক সময় রাজ পরিবারে শুরু হয় দুর্গাপুজো। সেই পুজো আজও চলছে। রাজবাড়িতে ছিল দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ, গৌরব তলোয়ার।

এক প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে অম্বিকানগর রাজ পরিবারের আদি পুরুষ জগন্নাথ দেব রাজস্থানের ঢোলপুর থেকে এসে চিন্তামণি ধোবার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ধবলভূম, যা স্থানীয়ভাবে সুপুর রাজত্ব বলে পরিচিত। পরে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে পৃথগন্ন হয়ে যান দুই ভাই হরিশ্চন্দ্র ধবল দেব ও খড়্গেশ্বর ধবল দেব। অম্বিকানগর কেন্দ্রিক ধবলভূমে খড়্গেশ্বর থেকে রাইচরণ পর্যন্ত সাত পুরুষ রাজত্ব করেন। এই বিভিন্ন রাজ পুরুষদের সমকালীন ঘটনা আলোচনা করলে বিভাজন উত্তর ধবলভূমের আর্থ-সামাজিক চালচিত্র বোঝা যাবে।

**১) খড়্গেশ্বর বা ধর্মদেব ধবলদেব :** ১৬৩৫-এ গড়দুয়ারে সুপুর ত্যাগের পর রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর সময়েই অম্বিকানগর স্থায়ী রাজধানীর জায়গা হিসাবে চিহ্নিত হয়। স্থানান্তরের জন্য পরিকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে রাজবাড়িতে দুর্গাপূজা চালু হয়। ষষ্ঠীর দিন রাতে যজ্ঞ ভস্ম থেকে তৈরি কালি দিয়ে দেবীর চক্ষুদান করা হয়। নবমীর দিন ছাগ বলি ও সন্ধিপূজায় তোপ দাগা হয়। এই প্রথা আজও যথাসম্ভব মেনে চলা হয়। বস্তুত রাজধানীর পরিকাঠামো নির্মাণের যাবতীয় কর্মকাণ্ড আয়োজিত হয় তাঁর সময়কালে। তাঁর সময়ে অম্বকানগরের ইন্দ্রকুড়িতে ইন্দ্রপরব চালু হয়। বর্তমানে এটি সাড়ম্বরে পালিত না হলেও রাজার আয়ব্যয়ের নতুন খাতা পত্তন উপলক্ষ্যে ফি বছর সোনার ছাতা উত্তোলন করে ইন্দ্রভিষেক ও হোমযজ্ঞ করা হয়। পরিচালনা করেন চট্টোপাধ্যায় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ। এদের আদিবাস ছিল কালনায়।[১২]

**২) অনন্তলাল (১৭৩২-১৮০৯) :** ১৭৪০ সালে আমাইনগরে বর্তমান রাজভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়। কিন্তু খড়্গেশ্বর ও অনন্তলালের মধ্যেকার সময়ের ব্যবধানের একমাত্র সমাধান এক পুরুষের সংযোজন। 'হিতোপদেশে' এর ভাষ্য গ্রহণ করে অনন্তলালের পিতা হিসাবে গোপীনাথকে গ্রহণ করলে এই কাল বিভ্রাট

এড়ানো যায়। অনন্তলালের সময়ে ধবলভূমে কোম্পানীকে দেয় রাজস্ব নির্ধারণ ও আনুগত্য আদায়ে ফার্গুসনের অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। তিনি সামরিক শিবির ফেলেন সুপুরে। ইন্দপুর-কুইলাপাল পর্যন্ত বিস্তৃত ৮৫২৬১ এককের এই পরগণার দেয় ভূমিকর নির্দিষ্ট হয় ৩১১ টাকা। আপন বীরত্বে ও বুদ্ধিতে রাজ্যের পরিসর বাড়াতে থাকেন অনন্তলাল। অর্থগৃধ্নু কোম্পানীর বিরুদ্ধে ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে দুর্জন সিংহ যে চুয়ার বিদ্রোহ সংঘটিত করেন, তাতে পূর্ণ সমর্থন ছিল অনন্তলালের। ১৭৮১ সালে এলাকায় বিদ্রোহের ঢেউ তোলেন কৃষক নেতা রুদ্র বাউরী। ইংরাজ নথিতে দেখা যায় অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে অম্বিকানগর পুরোপুরি চুয়ার ও পাইক বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে। দামোদর সিংহের মতো পাইক বিষ্ণুপুর সন্নিহিত তুঙ্গভূমে লুণ্ঠনের মতো কাজে মত্ত হয়ে পড়ে। ফারগুসনের সেনা এদের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। বিদ্রোহী সর্দার দামোদর সিংহরা অম্বিকানগর জঙ্গলে আশ্রয় নেন। এদের অত্যাচার পাশাপাশী কোম্পানীর রাজস্ব দাবির জাঁতাকলে পিষ্ট অম্বিকানগরের রাজাও জঙ্গলে আশ্রয় নেন। এই ঘটনায় রুষ্ট কোম্পানী শাসকরা রাজার হাজিরা ও কৈফিয়ত তলব করে। অবশেযে আইনি প্রতিনিধির মাধ্যমে মুচলেকা দেওয়া হয়। যদিও দামোদর সিংহের মতো বিদ্রোহী ও লুণ্ঠনরত পাইক এবং ততোধিক লুটেরা কোম্পানী ফৌজের একাংশের জন্য রাজস্ব আদায় ও পরিশোধ উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কোম্পানী নথিতে এনিয়ে লেখা আছে,

> “the Amyenagar and Chatna Zamindars fled to the jungles as the Bishnupur troops proceeded. Later on, the vakils of Ameyanagar offered to submit on behalf of their master. But owing to depredations committed simultaneously by the people of Damodar Singh and the Company's troops they were unable to satisfy the demands of the Company. On 6 March 1767, the five Zamindars came to a settlement with him."[১৩]

রাজা ছিলেন শিক্ষা সংস্কৃতির অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক। অনন্তলালের দুই স্ত্রী ছিলেন শিক্ষিতা। সম্ভবত ওড়িয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁদের দখল ছিল। অনন্তলালের আমলে রাজসভা আলো করে ছিলেন পন্ডিত সমাজ। এদের বিভিন্ন ভাবে তিনি সাহায্য ও উৎসাহ দিয়ে গেছেন। রাজা ১৭৭৩ সালের ১০ বৈশাখ সভাপন্ডিত পাঁচু মহাপাত্রকে বড়কোলা মৌজা দেবত্তোর পাট্টা দেন। রাজা গোপীনাথ ও তাঁর সময়কালে রাজ্যের সভাকবি ছিলেন কবি জগন্নাথ সেন। এই জগন্নাথ সেন বিখ্যাত

হিতোপদেশ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি পন্ডিত রাধাকৃষ্ণ পাঠককে যথাযোগ্য সম্মান দেন। রাজা সভাপন্ডিত কৃষ্ণচরণ পতির বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে 'সুবুদ্ধি' উপাধি দেন, যা আজও পরিবারের সদস্যরা ব্যবহার করে থাকেন। কথিত আছে ইনি গ্রহ-নক্ষত্র যোগ গণনায় ওস্তাদ ছিলেন। একবার রাজপুত্রের বজ্রপাতে বিপদের যোগ ও তার নিবারণের উপায় বাতলে তিনি রাজার প্রিয়পাত্র হন। রাজা ঝরিয়া, পরেশনাথ ও পূর্ণাপানি মৌজা তিনটি নিষ্কর হিসাবে সুবুদ্ধিদের দান করেন। কৃষ্ণচরণ পতির সহযোগী, ফুলকুসুমা গ্রামেরই রাধাকৃষ্ণ পাঠক পান বড্ডি মৌজার ঝড়িয়া গ্রামের (মতান্তরে ভালুবাসা মৌজা) নিষ্কর জমি। এরপর কৃষ্ণচরণ পতি (সুবুদ্ধি) ইন্দপুরের ফুলকুসমা গ্রামের আদি বাসস্থান ছেড়ে কুমারী নদী সংলগ্ন রানীবাঁধের বড্ডি গ্রামে বসতি স্থাপন করে 'লক্ষ্মীজনার্দন'কে একটি মাটির বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করে পূজা শুরু করেন। বাংলা ১৩৩৯ সালে(১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে) এই বংশের হরগোপাল সুবুদ্ধি ইঁট-সুরকি দিয়ে নতুন মন্দির তৈরি করেন। কিন্তু পরে কংসাবতী প্রকল্প এলাকার মধ্যে এই এলাকাটি পড়ায় এই মন্দির ও বাসস্থান ছেড়ে এরা ১৯৫৫-৫৬ সালে হিড়বাঁধ  ব্লকের দিঘী-ভগড়া আমবাগানে চলে যান। কুমারী অববাহিকায় থাকা সারেঙ্গগড়, চিয়াদা, কাটাকুমারী, ঘোলকুড়ি, পুড্ডি গ্রামের সঙ্গে বড্ডি গ্রামটিও জলের তলায় নিমজ্জিত হয়। এই বড্ডি গ্রামের সুবুদ্ধি পদবীধারী উৎকল ব্রাহ্মণদের কুলদেবতা 'লক্ষ্মীজনার্দন'। এই প্রকল্পের ফলে 'সুবুদ্ধি'রা বাস্তুচ্যুত হয়ে কুলদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনকে সঙ্গে নিয়ে বর্তমান হিড়বাঁধ ব্লকের দিঘী-ভগড়া আমবাগানে চলে যান। বর্তমানে সেখানে নতুন মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। কংসাবতী জলাধারের জল কমলে এখনও বিগ্রহ বিবর্জিত ইঁটের তৈরি এই প্রাচীন লক্ষ্মী-জনার্দন মন্দিরটি এখনও দেখা যায়। ইনি গড়দুয়ার থেকে অম্বিকানগরে রাজধানী স্থানান্তর করেন।

**৩) গোপীনাথ :** ইনি সম্ভবত অনন্তলালের পিতা, ১৬৬০ সালে জীবিত ছিলেন, ১৭১৩ সালে তাঁর প্রেরণাতেই সভাকবি জগন্নাথ হিতোপদেশ রচনা করেন। রাজপরিবারে রক্ষিত বংশতালিকায় গোপীনাথকে অনন্তলালের পুত্র হিসাবে দেখানো থাকলেও তা ঘটনাক্রমের নিরিখে বংশপঞ্জি নির্মাণের সময় ভুল বলেই মনে হয়। বরঞ্চ 'হিতোপদেশ'এর ভাষ্য অনুসারে গোপীনাথের পুত্র অনন্তলাল, সেই তত্ত্ব অনেক বেশি গ্রহণীয়। সম্ভবত তিনি বা বরাভূমরাজ, রাইপুরের সিংহ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতে সাহায্য করেন। বংশের  কন্যার সাথে রাইপুরের প্রতিষ্ঠাতা রাজার (ফতে সিংহ) বিবাহ হয়।

**৪) জগজীবনরাম :** বিভিন্ন কারণে অম্বিকানগরের রাজারা ব্রিটিশ বিরোধী অবস্থান বজায় রেখেছিলেন। রাইপুর কেন্দ্রিক চূয়ার বিদ্রোহের অভিঘাত দীর্ঘ দিন ধরে অনুভূত হয়। জগজীবনরামের সময়েও চূয়ার বিদ্রোহে অম্বিকানগরের সমর্থন জারি ছিল। কথিত আছে তাঁর সাথে মান রাজার কন্যা মুকুটমণির বিবাহ হলে রাজা অনন্তলাল পুত্রবধুর নামে গোড়াবাড়ি-ভালুক ছেড়ার পাশে মুকুটমণিপুর মৌজার পত্তন করেন।

**৫-৬) নিমাইচরণ-নীলমণি :** ১৮৩২ সালের গঙ্গানারায়ণী হামলার সময় বরাভূম চূড়ান্তভাবে অশান্ত হয়ে ওঠে। ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ বিরোধী এই লড়াইয়ে গঙ্গানারায়ণ বাঁকুড়ার ভূম রাজ্যগুলির সাহায্য প্রার্থনা করেন। ফুলকুসুমার রাজা দর্পনারায়ণ ও শ্যামসুন্দরপুরের রাজা প্রতাপনারায়ণ এই হাঙ্গামার সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়েন। শ্যামসুন্দরপুরের মটগোদা সন্নিহিত জঙ্গলে গঙ্গানারায়ণ ঘাঁটি গাড়েন। এসময় অম্বিকানগরের রাজারা গঙ্গানারায়ণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। ছাতনা, মালিয়াড়া পরগণা ব্রিটিশের পক্ষ নেয়। রুষ্ট গঙ্গানারায়ণের হাতে মালিয়াড়া লুণ্ঠিত হয়। বাঁকুড়া শহর অরক্ষিত হয়ে পড়ে।

ঠিক এর আগেই সতেরখানি তরফের সর্দার ত্রিভুবন সিংহের পুত্র লাল সিংহের পৌনঃপুনিক আক্রমণ ও লুণ্ঠনের মুখে পড়তে হয় ভূম রাজ্যগুলিকে। এ সময় সুপুর, শ্যামসুন্দরপুর, অম্বিকানগর, ঘাটশিলার রাজারা বরাভূমের বিবেকনারায়ণের নেতৃত্বে সতেরখানি তরফের সর্দার ত্রিভুবন সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হন। এর প্রতিশোধ নিতে ত্রিভুবনের ছেলে লাল সিংহ বিজয়ী রাজ্যগুলি গেরিলা আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। আক্রান্ত রাজ্যগুলি কিছু গ্রাম লাল সিংহকে প্রদান করে। এরপরেও কিছু ক্ষেত্রে সুখনিদী কর আরোপ করা হত (অনাক্রমণের বা রক্ষার বিনিময়ে কর)। ১৮৩২ সালের ২৫ শে জুলাই গঙ্গানারায়ণ কুইলাপালের জমিদার বাহাদুর সিং এর সাহায্য নিয়ে প্রায় এক হাজার বিদ্রোহী সমেত পুঞ্চাতে ইংরেজদের আক্রমণ করেন। ২৬ শে জুলাই একই ভাবে তিন হাজার বিদ্রোহী নিয়ে তিনি সুপুর, রাইপুর পরগনায় ইংরেজ সেনার মুখোমুখি হন। অম্বিকানগর থানা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। লড়াই এর দিনগুলিতে অম্বিকানগর, আঁকরো, সুপুর, ফুলকুসুমা, শ্যামসুন্দরপুর, কুইলাপাল, রাইপুর, ধলভুম প্রভৃতি এলাকার জমিদারও গঙ্গানারায়ণের পাশে দাঁড়ান। পরবর্তীকালে জঙ্গলমহলের বরদা পরগনা, শিলদা ও কুইলাপালের ভূমিজেরাও এই বিদ্রোহে যোগদান করেন। ইংরেজ সরকার অত্যন্ত নির্মম ভাবে

এই বিদ্রোহ দমন করে। দক্ষিণ রাঢ়ে জমিদার ও প্রজাদের মনে ভয় ঢোকাতে ব্রিটিশ শাসকরা এক সামরিক অভিযানে শ্যামসুন্দরপুরের রাজা দ্বিতীয় আইঠুদেব ছত্রনারায়ণ তুঙ্গ দেউ (সাথে ভাই প্রতাপনারায়ণ) ও ফুলকুসুমার দর্পনারাণণকে গ্রেপ্তার করে। এই দুই রাজাকে প্রকাশ্যে মটগোদা জঙ্গলে ফাঁসি দেওয়া হয়। এটি রাজাকাটা জঙ্গল নামে পরিচিত। সম্ভবত দুই রাজার ফাঁসির কারণে লোকমুখে এমন নাম হয়ে গিয়ে থাকবে।

৭) **গৌরধ্বজ :** কালপঞ্জী অনুসারে গৌরধ্বজের সময়েই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় আসে অম্বিকানগর। ১৮৭৩ সালের এই স্থায়ী বন্দোবস্তে ৮৫২৬১ একরের অম্বিকানগর এস্টেটের রাজস্ব নির্ধারিত হয় ৩৭২টাকা ১৪ আনা। ক্রমবর্ধমান রাজস্ব দাবি ও কৃষক দুর্দশা জনিত অনাদয় এই এস্টেটকে নিলামের দিকে এগিয়ে দেয়।

৮) **রাইচরণ (১৮৭৭-১৯২৬) :** রাইচরণ ধবল পরিচিত ছিলেন দেশভক্ত ও বিদ্রোহী রাজা হিসাবে।

১৯০৭ সালের শেষের দিকে ছেঁদাপাথর অম্বিকানগর রাজবাড়ীর অধীনে ছিল। তৎকালীন অম্বিকানগরের রাজার সঙ্গে মেদিনীপুরের রাজা দিগম্বর নন্দ বিদ্যানিকেতনের ভালো সম্পর্ক ছিল। সেইসূত্রে দিগম্বরবাবুর মতোই অম্বিকানগরের রাজাও বিপ্লবী আন্দোলনে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন। দিগম্বরবাবুর অনুরোধেই অম্বিকানগরের রাজা রাইচরণ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু সহ তাঁর সঙ্গীদের আত্মগোপনের জন্য জঙ্গল ঘেরা গ্রাম ছেঁদাপাথরের গুহায় থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। পানীয় জলের জন্য তৈরি করা হয়েছিল কুয়া। বর্তমান ছেঁদাপাহাড় স্কুলের ঠিক পিছনে এক টিলায় একটি গুহা ছিল। ওই গুহাতে এসে ক্ষুদিরাম বসু বিপ্লবীদের সঙ্গে আত্মগোপন করেছিলেন। বোমা বাঁধারও প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। যুগান্তর দলের বিপ্লবীদের দুটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল এই অঞ্চলের রাণীবাঁধ থানার ছেঁদাপাথর ও বর্তমান হীড়বাঁধ থানার মশিয়াড়ায়। এই কেন্দ্র দুটি গড়ে তুলেছিলেন মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা। উদ্দেশ্য ছিল আগ্নেয়াস্ত্রের নিশানা অভ্যাস করা, বোমা তৈরী এবং সেগুলিকে জঙ্গলের গভীরে লুকিয়ে রাখা। এই কেন্দ্র গুলির দায়িত্বে ছিলেন বিপ্লবী রুক্মিণী রায় এবং দুর্গাচরণ ঘোষ। এই কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন রাইচরণ ধবলদেব। শোনা যায় এই কেন্দ্রে অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য এসেছিলেন বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, বারিন ঘোষ, অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ। বিপ্লবীরা কৃষক এবং হরিতকী ব্যাবসায়ীর ছদ্মবেশে যাতায়াত

করতেন এই অঞ্চলে। অম্বিকানগর থেকে রাতের অন্ধকারে ধবলদেব ঘোড়ায় চড়ে পৌঁছাতেন ৩০ কিমি দূরে ছেঁদাপাথরে। সাহায্য করতেন অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে। অস্ত্র চালনায় দক্ষ ছিলেন তিনি নিজেও। রাজপ্রসাদেও গড়ে তুলেছিলেন মন্ত্রণাকক্ষ ও লুকিয়ে থাকার জায়গা। রাইচরণের সহযোগী ছিলেন পানু রজক, ঋষি দত্ত, পেলারাম চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এই বিপ্লবীদের রাইচরণ ছাড়াও রসপালের রাজা কালিপ্রসন্ন দেব সরাসরি সাহায্য করতেন। কৃষ্ণনগর ফাস্টট্র্যাক কোর্টে জবানবন্দি দেওয়ার সময়ে আলিপুর বোমা মামলায় অভিযুক্ত বিপ্লবী শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ জানান, ছেঁদাপাথরের প্রশিক্ষণ শিবিরে রসপাল রাজ পরিবারের সদস্যেরা নিয়মিত যোগ দিতেন। রাইচরণ ধবল দেবের আমলে রাজ্যে নিয়মিত যাতায়াত ছিল বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু, বারীন ঘোষ, প্রফুল্ল চাকী, ভূপেশ দত্ত, নরেন গোঁসাইদের মত বিপ্লবীদের।

ব্রিটিশদের অত্যাচার প্রতিরোধ করার জন্য রাইচরণ ও তার সহযোদ্ধারা গড়ে তোলেন দুশজনের এক প্রশিক্ষিত বাহিনী। এই বাহিনীর দাপটে ইংরেজ পুলিশ তার প্রজাদের নিপীড়ন করতে ভয় পেত। এই বিপ্লবী কাজকর্মের হদিশ পেতে ইংরেজ সরকার সক্রিয় হয়ে ওঠে।

পুরীর পাণ্ডার ছদ্মবেশে এক ব্রিটিশ গুপ্তচর অম্বিকানগরের রাজবাড়ির সিংহদ্বারের কুঠুরিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে বিপ্লবীদের গোপন কর্মকাণ্ডের নানা তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শেষে একদিন ব্রিটিশ পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্ট নিজে দলবল সহ অম্বিকানগরে উদ্দেশে অভিযান চালায়। তবে অভিযানে টেগার্টের নেতৃত্বে এই অভিযান হয়েছিল এমন প্রামাণ্য নথি নেই। রাঁচি থেকে ছোটনাগপুরের কোল সশস্ত্রবাহিনী এই অভিযানে অংশ নিয়েছিল। কাঁসাই ও কুমারী নদীর সঙ্গমের কাছে ছিল লাউলা পাড়া বস্তি। সেখানে এসে টেগার্ট ও তার দল থামতে বাধ্য হয়। কারণ বর্ষায় আক্রান্ত দুই নদীতেই ছিল তখন প্রবল বন্যা। সে সময় খেয়া পারাপারের নৌকো ছিল না। এদিকে রাজার অনুগত পানু রজক নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে, ভরা ও উত্তাল নদী সাঁতার দিয়ে পার হয়ে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী আসার খবর রাজার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এই সুযোগে সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র নদী তীরবর্তী এলাকার মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। অভিযান নিষ্ফল বুঝে টেগার্ট সে যাত্রায় ফিরে গিয়েছিল। আগাম খবর পেয়ে রাইচরণ ও হৃষিকেশ বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সমস্ত প্রমাণ লোপ করে

দেন। এর ফলে রাইচরণ এবং হৃষিকেশ গ্রেফতার হলেও প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে যান। এর মধ্যে নিজের দখলীয় সম্পত্তি শরৎকামিনী এস্টেটের কাছে বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ বৈপ্লবিক কাজে বিনিয়োগ করেন। কথিত আছে আরেকবার এই সম্পত্তি জাল দলিলের মাধ্যমে বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়ে তিনি কারাদন্ডে দন্ডিত হন।

মশিয়াড়ার নিকটবর্তী হাঁসাডাঙ্গায় হুগলির শ্রীরামপুরের গোস্বামী জমিদার পরিবারের একটি কাছারি ছিল। জমিদারীর কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য আসতেন নরেন্দ্র নাথ গোস্বামী। তিনি ছিলেন যুগান্তর দলের সক্রিয় কর্মী। এখানে যাতায়াতের সূত্রে তাঁর ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় রাইচরণ ধবলদেবের সঙ্গে। তাঁরা মিলিত ভাবে একটি বিপ্লবী গোষ্ঠী তৈরি করেন। যার সক্রিয় সদস্য ছিলেন হৃষিকেশ দত্ত, পেলারাম চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ প্রমুখের সঙ্গে। রাইচরণ ধবলদেব এই সময়ে এই অঞ্চলে একটা বড়সড় বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড ঘটাতে চাইছিলেন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কলকাতায় বিপ্লবীদের একটা গোপন মিটিং হয়। এই মিটিং এ নেতৃত্ব দেন অরবিন্দ ঘোষ। সভায় সিদ্ধান্ত হয় অর্থসংগ্রহের জন্য হাঁসাডাঙ্গার নিকটবর্তী এক গ্রামের এক ধনী ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতি করা হবে। এই ডাকাতির পরিকল্পনা দলের সদস্য ছিলেন বারীন ঘোষ, প্রফুল্ল চাকী, নরেন গোঁসাই, নিরাপদ রায়, হরিশ ঘোষ, সত্যেন্দ্র নাথ বসু, সত্যচরণ ঘোষ প্রমুখ। বাঁকুড়া থেকে সমর্থন দেন রামদাস চক্রবর্তী ও সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই ডাকাতির জন্য ধবলদেব বন্দুক ও তরবারি সরবরাহ করেছিলেন বিপ্লবীদের। যদিও এই ডাকাতি অসফল হয়। এবং কলকাতার বিপ্লবীদের এই অভিযানের খবর ইংরেজদের কাছে পৌঁছায়। পুলিশ ধরপাকড় শুরু হয়। ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন বিপ্লবীরা। ফলে ঐ গোষ্ঠী ভেঙ্গে যায়। এর মধ্যে ইংরেজ পুলিশ মানিকতলার বোমা তৈরির কারখানা আবিষ্কার করে ১৯০৮ সাল নাগাদ এবং নরেন গোঁসাই সহ বহু বিপ্লবীকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হয়ে নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হয়ে যান। রাজসাক্ষী হবার অপরাধে বিপ্লবী কানাই লাল দত্ত এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু জেলের মধ্যেই নরেন গোঁসাইকে গুলি করে হত্যা করেন। নরেন গোঁসাইকে জেরা করার ফলে ছেঁন্দাপাথরের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কথা জানাজানি হয়ে যায়। ইংরেজ পুলিশ তল্লাশি চালায় ছেঁন্দাপাথরে। তল্লাশির খবর আগেই পেয়ে যাওয়ায় বিপ্লবীরা ওই স্থান ছেড়ে পালিয়ে যান। ফলে তল্লাশি চালিয়ে ইংরেজ পুলিশ কিছু পায়নি। তবে

নরেন গোঁসাইয়ের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ১৯০৮ সালের ২৩শে জুলাই একটি এফ আই আর দায়ের করা হয় ও রামদাস, সুরেন্দ্রনাথ, রাইচরণ, হৃষিকেশ দত্ত, পেলারামকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯০৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর নরেন গোঁসাই খুন হওয়ায়, প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস পেয়ে যান মেদিনীপুর ও আলিপুর জেল কাটানো বন্দী রাইচরণ। তিনি যেদিন জেল থেকে ছাড়া পান সেদিন ছিল দুর্গা আরাধনার ষষ্ঠী তিথি। ছাড়া পেয়েই সঙ্গী সাথী নিয়ে বাড়ি ফিরে পুজোয় মাতেন রাইচরণ। জেলাশাসক রমেন্দ্রকৃষ্ণ দেব গ্রেপ্তারের আটদিন পর ডাকাতির ঘটনায় ৪০২, ৩৯৯ ধারায় "মিস্টেক অব ফ্যাক্টস" দেখিয়ে রাইচরণ ও সুরেন্দ্র মুখার্জীকে জামিন দিয়েছিলেন। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে এই বিপ্লবী রাজার মৃত্যু হয়।

৯) কালাচাঁদ : রাইচরণের সময় থেকেই অম্বিকানগর জমিদারির পতন শুরু হয়। কালাচাঁদের সময় সূর্যাস্ত আইনে রাজস্ব আনাদয়ের অভিযোগে পুরোপুরি অনাবাসী জমিদারদের হাতে এস্টেট চলে যায়।

পুত্রহীন নাট্যব্যক্তিত্ব কালাচাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের বিজয়া, জয়া, সুনন্দাদের মধ্যে জয়া ঝাড়গ্রাম রাজপরিবারের রাজবধূ হন। আর হাতের কাজের জন্য বিখ্যাত সুনন্দার বিবাহ হয় শ্যামসুন্দরপুর রাজপরিবারে। জেলা বোর্ডের রেকর্ড মোতাবেক অম্বিকানগরের রাজাদের মালিকানায় ছিল রুদ্রার গাজন মেলা ও ছাতাপরব। মেলা থেকে মোট আয় ছিল এগারো টাকা। সরকারি শুল্ক দিতে হত দুই টাকা। মালিক হিসাবে নাম দেখা যায় রাজবংশের পূর্ণচন্দ্র ধবলদেব।

## খাতড়া রাজ বংশ পরিচয়

আজ পর্যন্ত খাতড়া রাজ পরিবারের সঠিক বংশ তালিকা নিরূপিত হয়নি। বর্তমান রাজপরিবারের সদস্যদের কাছেও তা সংরক্ষিত নেই। ও'ম্যালী জগন্নাথ ঢোলের রাজত্বের ৩২ প্রজন্ম পরে এই বংশের বিভাজনের যে তত্ত্ব দিয়েছেন তাতে এই বংশতালিকা নির্মাণ আরো কঠিন হয়ে গেছে। প্রথম দিককার তিন জনের নাম এসেছে গেজেটিয়ার্স, গৌরগোবিন্দ গোস্বামী বিরচিত শ্রী শ্রী শ্যামলীলামৃত থেকে। নিম্নে একটি তুলনামূলক বংশ তালিকা দেওয়া হল।

| প্রজন্ম | কুলগুরু মথুরানন্দের বংশ | অম্বিকানগর রাজবংশ | খাতড়া রাজবংশ |
|---|---|---|---|
| ১ম | মথুরানন্দ (১৫৭৫-১৬৭২) | —— | |
| ২য় | শ্যামসুন্দর | জগন্নাথ ঢোল | জগন্নাথ ঢোল |
| ৩য় | মদন-বৃন্দাবন | খড়্গেশ্বর (১৬৩৫-) | হরিশ্চন্দ্র/টেকচাঁদ |
| ৪র্থ | চরণ-সাধু (১৭৩৩-) | অনন্তলাল (১৭৩২-১৮০৯) | জয়চাঁদ (-১৭৫১) |
| ৫ম | কিশোরী-দুলালচন্দ্র | গোপীনাথ (১৬৬০?) ৩য় পুরুষ? | অজ্ঞাত |
| ৬ষ্ঠ | দুঃখিত | জগজীবন (১৮০৭-৭১) | অজ্ঞাত |
| ৭ম | সৃষ্টিধর | নিমাইচরণ-নীলমণি (১৮৩২-) | হিতেশ্বর (?) |
| ৮ম | আনন্দমোহন | গৌড়ধ্বজ | হরিশ্চন্দ্র (২?) |
| ৯ম | নদেরচাঁদ | রাইচরণ (১৮৭৭-১৯২৬) | সুকুমার |
| ১০ম | অযোধ্যা-রাসবিহারী | কালাচাঁদ | হিতেশ্বর (গঙ্গেশ্বর) ১৯৩৪- |
| ১১তম | রবিলোচন | জয়া-বিজয়া-সুনন্দা | প্রবীর ধবলদেব |
| ১২তম | চণ্ডীদাস-কৃষ্ণদাস | প্রণব-গৌরীশঙ্কর | সূর্যকান্ত ধবলদেব |
| ১৩তম | পার্থসারথি | | |

কুলগুরু মথুরানন্দের (এই মথুরানন্দ ছিলেন চৈতন্য পার্ষদ গদাধর গোস্বামীর পৌত্র) বংশলতিকা ও তাঁর সমকালে সূচিত রাজবংশের বংশলতিকা পাশাপাশি রাখলে এই বিভ্রান্তির অনেকটাই নিরসন করা যায়। বর্তমান গুরুকুল বংশের জীবিত সদস্য পার্থসারথী গোস্বামী, অম্বিকানগর রাজবংশের গৌরীশঙ্কর ধবল, খাতড়ার

রাজপরিবারের সূর্যকান্ত ধবলদেব যথাক্রমে রাজগুরু বংশের প্রতিষ্ঠাতা মথুরানন্দের, অম্বিকানগর ও খাতড়া রাজবংশের আদিপুরুষ থেকে ১১-১৩ তম প্রজন্মের। যেটি সর্বজনগ্রাহ্য হতে পারে। শুধু খাতড়া রাজ বংশ তালিকায় দুই থেকে তিন প্রজন্মের নাম উদ্ধার করা যায়নি। এটি মেনে নিলে খাতড়া রাজপরিবারের বংশ তালিকাও মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব। সুতরাং এই তুলনামূলক বংশ ছক ও অন্যান্য তথ্য থেকে স্পষ্ট ও'ম্যালী ৩২ প্রজন্মের যে আনুমানিক তথ্য দিয়েছিলেন তা একদমই ভুল। অম্বিকানগরের রাজ সভাকবি জগন্নাথ সেনের হিতোপদেশ অনুসারে অনন্তলালের পিতা হল গোপীনাথ। রাজপরিবারে বর্তমানে রক্ষিত একটি বংশ তালিকা অনুসারে অনন্তলালের পুত্র হলেন গোপীনাথ। বিভিন্ন দিক বিচার করে মনে হয় হিতোপদেশে বর্ণিত বংশ তালিকা অধিকতর গ্রহণীয়।

দুইশত বছর প্রাচীন রঘুনাথ জীউয়ের মন্দির ও শিবমন্দির সহ চাঁপাশোল গ্রামের পত্তন ঘটেছিল খাতড়া রাজার কাছে বন্দোবস্ত নিয়ে জমিদার স্বরূপনারায়ণ পাইনের হাতে। আরেকটি প্রাচীন গ্রাম দুবরাজপুরের পত্তন ঘটেছিল সুকুমার শাহাজাদা ধবলদেব দ্বারা।[১৪]

খাতড়া রাজপরিবারের শেষ ছয় প্রজন্মের তালিকা সংগৃহীত হয়েছে বর্তমান রাজা বলে পরিচিত হিতেশ্বর বাবুর কাছ থেকে।

**১) হরিশ্চন্দ্র ধবল (দেবদাস) :** পিতার নাম ছিল জগন্নাথ ধবল। রাজা জগন্নাথের ভ্রাতা বিশ্বম্ভর ধবল। অনেকে মনে করেন সুপুরে জগন্নাথ ঢোলের আনীত কালাচাঁদ বিগ্রহের জন্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন রাজা হরিশ্চন্দ্র ধবল দেব।

রাজ্য বিভাজনের পর জগন্নাথ ধবলদেবপুত্র হরিশ্চন্দ্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র খড়্গেশ্বরের হাতে বিভাজিত রাজ্যভার তুলে দিয়ে, ব্রজরাজপুরের শ্যামরাইয়ের সেবায় নিজেকে সঁপে দেওয়ার জন্য সন্নিহিত রামচন্দ্রপুরের দুর্গে চলে যান। কিছুকাল পরে রাজা হরিশ্চন্দ্র সুপুর থেকে রাজধানী খাতড়ায় সড়িয়ে নেন। কথিত আছে হরিশ্চন্দ্র ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ায় সুপুরের রাজপাট চুকিয়ে খাতড়ার অনাড়ম্বর রাজত্ব শুরু করেন। কালাচাঁদ প্রতিষ্ঠিত হয় অম্বিকানগরে। খাতড়া রাজ বংশের কুলদেবতা হয় শ্যামরাই।

হরিশ্চন্দ্র ধবল সুপুরের কালাচাঁদ-শ্যাঁমচাদ মন্দির ছাড়াও তৈরি করেন কালি পন্ডিতের টোল বা চতুষ্পাঠী, যা এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রজাসাধারণের বিপণনের সুবিধার্থে ২৫০ বছরের পুরানো রাজবাড়ী সন্নিহিত রাজাপাড়া হাট তাঁর অবদান। ৩০০ বছর প্রাচীন শ্যামরাই মন্দির ও দুর্গা দলানও তাঁর অবদান।

কথিত আছে ব্রজরাজপুরের শ্যামরাই মন্দিরের রাধা-কৃষ্ণ মূর্তির ডান পাশে ললিতার নিম কাঠের মূর্তির সংযোজন করেছিলেন রাজা হরিশ্চন্দ্র, স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে। আর মথুরানন্দের পর চতুর্থ পুরুষ সাধু-সতীবালার কন্যা ললিতার শ্যাম প্রেমে বিভোর হয়ে মৃত্যু পরবর্তী ঘটনা, এই ললিতা মূর্তি প্রতিষ্ঠার কারণ বলে লোক সমাজে প্রচারিত।

রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর মতে খাতড়া সেনা বাহিনীতে আফগানী সেনার অন্তর্ভূক্তি ঘটতে থাকে। জগন্নাথ ধবল ও হরিশ্চন্দ্রের উপাধিতে 'শাহাজাদা' সংযুক্তি মনে হয় এই সেনা সম্প্রদায়ের আধিক্য ও প্রতিসম্মানের কারণে। তাদের খাতড়ায় বসতি গড়ে ওঠার কারণে এলাকার নাম 'খাঁদের তোড়া' বা খাতড়া হয় বলে রথীন্দ্রবাবুর অনুমান।[১৪ক] আরেক প্রচলিত জনশ্রুতি হল মরুরাজ্য থেকে আগত রাজপুরুষ পুরীর রাজদরবারে পৌঁছালে পুরীরাজ তাঁকে ভুল করে 'শাহাজাদা' নামে ডাকেন। বিনিময়ে এই রাজপুরুষ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে এই উপাধির সার্থকতা আনতে বলেন। পুরীরাজের প্রেরিত এক ক্ষুদ্র সেনাদলের সাহায্যে জগন্নাথ দেবের ধবলভূমি জয় বলে অনেকে মনে করে থাকেন।

প্রচলিত মত হল হরিশ্চন্দ্র ধবলই টেকচাঁদ নামে পরিচিত। এদের কুলপুরোহিত ছিল মহাপাত্র পরিবার (বর্তমানে চট্টোপাধ্যায়)। এদের প্রতিষ্ঠিত সুপুর নামোপাড়ার নবরত্ন কালাচাঁদ মন্দির, ভোজদার চাষবাড়ী, রামচন্দ্রপুরের ঘোড়াশাল, খাতড়ার সেনাশিবির প্রাচীন শক্তিশালী রাজবংশের পরিচয় দেয়। টেকচাঁদের সেনাপতি ছিলেন শ্যামপুর মৌজার কর্জন খাঁ। এদের 'তড়া' জমি ছিল চক বাজার থেকে রাজাপাড়া-খড়বন পর্যন্ত বিস্তৃত। মহাপাত্র বংশের নিজস্ব মাকড়া পাথরের বিরিঞ্চি নারায়ণ শিবের মন্দিরের অবস্থান ছিল সুপুরের পূর্বপ্রান্তে। আরেকটি মতে টেকচাঁদের পৌত্র হরিশ্চন্দ্র। একপুরুষ শাহাজাদা হরিশ্চন্দ্র ধবলদেব ও তারপর সুরকুমার (সুকুমার) ধবলদেব, ক্রমান্বয়ে এমন উপাধি বহন করে এই রাজবংশ।

ধলভূমের (ঘাটশীলা) রাজবংশের সাথে খাতড়ার ধবল বংশের অনেক মিল আছে। রজক পরিবার কর্তৃক রাজপরিবারের পত্তন, ক্ষত্রিয়ত্ব আরোপ, রঙ্কিণীকে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠার মত বিষয়ে উভয় পরিবারের ভূমিকা এক। রাজানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত খাতড়ার রঙ্কিণী দেবীর পূজারী হিসাবে বর্ধমান জেলা থেকে আনীত হন ভরদ্বাজ বংশীয় 'মুখুটী' পরিবার। রাজা তাঁদের ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি দান করেন। দেবতা ও সেবক পরিবারের জন্য। এখনও মুখুটী পরিবারের সদস্যরা পালা করে দ্বিপ্রাহরিক

পূজার আয়োজন করে থাকেন বছর ভর। বৃক্ষতলে আজও একই ভাবে পূজিতা হওয়ার পেছনে দেবীর ইচ্ছাকেই মান্যতা দেন এলাকার ভক্তরা। এবিষয়ে জামবনির চিল্কিগড়ের রঙ্কিণীদেবীর বৃক্ষতলে অধিষ্ঠানের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ধলভূমের মত এখানে রঙ্কিণীর উদ্দেশ্যে নরবলি হত এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে এক সময় এখানে ১০৮ টি ছাগ বলি হত বলে মনে করা হয়।[১৫]

**২) জয়চাঁদ :** ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সুপুর পরগণার আয়তন ছিল ১২২৫০০ একর। ১৮৩৭ সালে সুপুরের অস্তিত্ব লোপ করে অম্বিকানগর এস্টেটে সংযুক্ত করলে প্রাচীন সুপুর রাজবংশ শাখার অবসান ঘটে। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই সমগ্র খাতড়া এস্টেটের মালিকানা চলে যায় গিসবোর্ন এ্যান্ড কোম্পানীর হাতে। তিন দশক পরে হাত বদল হয়ে এটি যায় ভাগলপুরবাসী চন্দ্রশেখর সরকারের শরৎকামিনী এস্টেটের হাতে। ইংরাজ নথিতে দেখা যায় অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে সুপুর পরগণা পুরোপুরি চুয়ার ও পাইক বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে।

অম্বিকানগরের এ সময়কালে তিনজন রাজা রাজত্ব করেছেন। সুতরাং হরিশ্চন্দ্রের পৌত্রের সময়ে (অর্থাৎ জয়চাঁদের পুত্রের) এই রাজবংশের শাসনের অবসান ঘটা সম্ভব। জয়চাঁদের সময় সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটেছিল মারাঠা আক্রমণের অনুষঙ্গে। এই লড়াইয়ে জয়চাঁদ মারাঠা সেনাদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। মারাঠা সর্দার শিউভট্টের আক্রমণ ঘটেছিল ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে।

যেহেতু জয়চাঁদ পরবর্তী সময়ে খাতড়া রাজবংশের অবসান ঘটছিল, এদের বংশধারা ও কর্মধারা পুরোপুরি জন অন্তরালে চলে যায়। জগন্নাথ ও হরিশ্চন্দ্রের সমকালীন খাতড়ার শাসন ছিল অনেকটাই ঘাটোয়ালী প্রথা নির্ভর। সুপুর পরগণা অম্বিকানগরের মধ্যে অঙ্গীভূত হওয়ার ফলে ও অনাবাসী জমিদারদের হাতে পরগণার ভার চলে যাওয়ায়, খাতড়া মুন্সেফ কোর্টে ঘাটোয়ালী উচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। জটিলতাও বাড়ে অনেক। খাতড়ারাজের মতো বহু ঘাটোয়াল ও তাবেদারদের উচ্ছেদ হতে হয়। যারা ছিল স্বভাবতই রাজ্যহারা রাজার প্রতি সহনুভূতিশীল। ম্যাকালপিন প্রতিবেদন (১৯০৯) অনুসারে খাতড়া পরগনার বেশিরভাগটাই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। রাজার অধীনে প্রজারা মহাজন অধিকৃত জমি অপেক্ষা সুখে ছিল। এই ভাগচাষীদের জমিদার কর্মচারী, মহাজনদের 'ভেটবেগার' (শস্য-সব্জি-শ্রম বেগার দিতে হবে) দিতে হত। তিনি গোবেরদা ও

হরণাগুণী গ্রামের সাঁওতালদের 'ভেটবেগারের' কথা জানিয়েছেন।[১৬]

পরগণার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাতড়া ও রামচন্দ্রপুর সামরিক ঘাঁটি ছাড়া, প্রহরা-চৌকি বা ঘাটোয়ালী ঘাটগুলির অবস্থান ছিল লোহাত, মেহরাডি, কাজলকুঁড়া, মাকাসা ও দেউলিতে। এই ঘাটোয়াল ও তার অধীনস্থ তাবেদারগণ ছিলেন মূলত ভূমিজ সম্প্রদায়ের। এরা ঘাট নিরাপত্তার বিনিময়ে ভোগ করতেন নিষ্কর জমি। এগুলো ছড়িয়ে ছিল দামদি, নারকোলি, গোপীনাথপুর, ঝাটিপাহাড়, দেউলি ও বাউরিডিহা গ্রামে। তখন জমি বংশধারায় হস্তান্তর যোগ্য না হওয়ায় ঘাটোয়ালী সম্পত্তিগুলো ঘাটোয়াল-তাবেদারদের হাতছাড়া হতে থাকে।[১৭]

১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের একটি দেওয়ানী মামলায় দেখা যাচ্ছে পীতাম্বর লায়েককে ঘাটোয়ালী দায়িত্ব ও ভূমির অধিকার থেকে উচ্ছেদ করে বাঁকুড়ার কালেক্টর মতিলাল লায়েককে তার জায়গায় নিয়োগ করেছেন। মামলাকারীর বক্তব্য ছিল উপরোক্ত জমিতে পূর্বপুরুষ শোভারামকে মৌরসী পঞ্চকি পাট্টা দিয়ে তাদের স্থায়ী ও বংশ পরম্পরায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন খাতড়া-রাজ স্বয়ং এবং অবিচ্ছিন্ন ভাবে ঘাটোয়ালী দায়িত্ব পালন করে নিয়মিত প্রথমে রাজা ও পরে ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে পঞ্চকি দিয়ে আসছেন। অবশ্য মুন্সিফ কোর্ট, পরবর্তীকালে জেলা কোর্ট ঘাটোয়ালী স্বত্বকে স্থায়ী ও বংশগত অধিকার বলে মান্যতা দেয়নি। পীতাম্বরের বিরুদ্ধে কাজে অবহেলার দায়ে ও জরিমানা না দেওয়ার অভিযোগে বরখাস্তের রায় বহাল থাকে। ১৮৯৩ সালে ঘাটোয়ালী অধিগ্রহণ ও পুনর্বন্টনের সুবিধাও এই মামলায় প্রমাণাভাবে দেওয়া হয়নি। হাইকোর্টের আপিল মামলায় (রায় হয় ১২ মে ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে, বিচারক ছিলেন জে গ্রাহাম ও সুরবর্দী) নিম্ন আদালতের রায়ই বহাল থাকে।

জমিদারি অবসানের পর খাতড়ার রাজপরিবার অশেষ দারিদ্র্যে পতিত হয়। কথিত আছে রাজা হরিশ্চন্দ্র সুপুর থেকে খাতড়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করার সময়েই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আর্থিক অনটন ব্রিটিশ শাসনে বহুগুণিত হয় ও করভারে জর্জরিত রাজার কাছ থেকে রাজস্ব অনাদয়ের কারণে রাজ্যভার কেড়ে নেওয়া হয়। পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের কাছে পূর্ণাঙ্গ বংশ তালিকা নেই। বর্তমান পরিবারের সদস্য সূর্যকান্ত ধবলদেবের আগের প্রজন্মের প্রবীর ও তার পূর্ব প্রজন্মের অন্তর্গত বর্তমান রাজা হিতেশ্বর-গঙ্গেশ্বরের জন্ম ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের আশেপাশে। তিনি রাজগুরু মথুরানন্দ বংশের নদেরচাঁদ ও অম্বিকানগর রাজবংশের কালাচাঁদের সমকালীন। তার আগের প্রজন্মের সুকুমার ধবলদেব বা সুকুমার পিতা হরিশ্চন্দ্র

এবং হরিশ্চন্দ্র পিতা হিতেশ্বর-এর নাম বর্তমান রাজ পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা গেলেও তার আগের অন্তত দুই পুরুষের নাম অজ্ঞাত।[১৮] বিভিন্ন গ্রন্থ-সূত্র থেকে প্রাপ্ত তার আগের প্রজন্মের জঁয়চাদ ও হরিশ্চন্দ্রকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বংশ তালিকার অনেকটাই নির্মাণ করা যায়। যাই হোক খাতড়া রাজ পরিবার ছিল অনেক ভূম-রাজ পরিবারের মত ভাগ্য বিড়ম্বিত। তবে কুলদেবতা রাধা-শ্যামের নিত্যপূজা ও পারিবারিক দূর্গাপূজার কোন ছেদ পড়েনি। সম্প্রতি এই রাধা-শ্যাম মন্দির ও দুর্গাদালানের সংস্কারও করা হয়েছে। প্রাক-স্বাধীনতা ও স্বাধীনোত্তর কালের রাজা সুকুমার ধবলদেব শাহজাদা ছিলেন খাতড়ার শ্রীপঞ্চমী ও ইন্দমেলার মালিক। এ দুটি মেলা থেকে মোট আয় ছিল ২৩ টাকা। জেলা বোর্ডকে দিতে হত পাঁচ টাকা আর স্বাস্থ্য দপ্তরকে আড়াই টাকা।[১৯] রাজ অনুগ্রহে সাবেক সুপুর পরগনায় ও সুপুরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আগমন ঘটে ছিল। শ্যামসুন্দরের সেবাইত 'গোস্বামী' পরিবার। এমনভাবেই কাঁদুলির বন (বলরামপুর)-এর জমিদারি পান। দুইশত বছর ধরে সুপুরে পণ্ডিতদের পরিচালনায় ঝাপান উৎসব হয়। যেহেতু শ্রাবণ সংক্রান্ততে রাজবাড়িতে মনসা পূজা হয়, তার সম্মানে আগের দিনেই ঝাপান আয়োজন করে দেওয়া হত।[২০]

## ধবলভূমের প্রজা জীবন

অম্বিকানগরের রাজাদের আনুকূল্যে দেশজ শিক্ষা উৎকর্ষতায় উত্তীর্ণ হয়। ১৭১৩ খ্রিষ্টাব্দে সভাকবি জগন্নাথ সেন রাজ নির্দেশে 'হিতোপদেশ' অনুবাদ করেন। এই কাব্যে রাজপরিচিতি নিয়ে লেখা আছে,

> 'গোপীনাথ ধবল নৃপতি মহাবল।
> শাহিজাদা পদবী শোভিত ধরাতল।।
> তার পুত্র অনন্ত ধবল ধর্মশীল।
> সর্বলোকে গাত্র যাঁর গুণ নিরমল।।
> অনন্ত ধবল রাজা হরিপদ দেবী।
> (হী)রামণি নামে হার পাট মহাদেবী।।'

এই আখ্যানে দেখা যায় অনন্তধবলের পিতা ছিলেন গোপীনাথ। যেখানে রাজ পরিবারে সংরক্ষিত বংশ তালিকায় অনন্তের পুত্র গোপীনাথ। হিতোপদেশের বিবরণ

ঠিক ধরলে গোপীনাথ ১৬৬০ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। রাজপরিবার ছিল শিক্ষানুরাগী এবং শিক্ষায় আলোকিত। অনন্তলালের দুই মহিষী ছিলেন এমন আলোকপ্রাপ্ত। দেশে বাংলা ও ওড়িয়া দুই ভাষাতেই চর্চা হত। রাজারা দুটি ভাষাতেই সাবলীল ছিলেন। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ওড়িয়া ভাষা ছিল এদেশের দ্বিতীয় ভাষা। উৎকল দেশীয় মানুষের আধিক্য ছিল এর কারণ। এলাকার মানুষের শিক্ষানুরাগ ধরা পড়ে বেশির ভাগ পরিবারের কুলদেবতার সাথে 'মহাপ্রভু'র অস্তিত্ব। এই 'মহাপ্রভু' আদতে ধর্ম পুস্তকরাশি। ১৮৩০-৩২ সালের দুর্ভিক্ষে এমন অম্বিকানগর সন্নিহিত সারংগড় থেকে অভিবাসিত পরিবারগুলির কাছে এই জ্ঞানের ভান্ডার এখনও দেখতে পাওয়া যায়। অম্বিকানগরের সভাকবি ছিলেন জগন্নাথ সেন। যিনি হিতোপদেশ সহ বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। রাজসভার পন্ডিত ছিলেন রাধাকৃষ্ণ পাঠক ও কৃষ্ণচরণ সুবুদ্ধি। কৃষ্ণচরণের কৌলিক উপাধি ছিল পতি। রাজা অনন্তলাল তাঁকে অসাধারণ পান্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ সুবুদ্ধি উপাধি প্রদান করেন (একটি জনশ্রুতি মতে নিখুঁত জ্যোতিষ গণনায় বজ্রাঘাতে রাজকুমারের মৃত্যু যোগ নির্ণয় ও তা নিবারণের উপায় বাতলে রাজার কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হন)। এবং একই সঙ্গে ঝরিয়া, পরেশনাথ ও পূর্ণাপানি এই তিনটি মৌজা নিষ্কর দান করেন। তখন কৃষ্ণচন্দ্র পতি (সুবুদ্ধি) ইন্দপুরের ফুলকুসমা গ্রামের আদি বাসস্থান ছেড়ে কুমারী নদী সংলগ্ন রানীবাঁধের বড্ডি গ্রামে বসতি স্থাপন করে 'লক্ষ্মী জনার্দন'কে একটি মাটির বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করে পুজাপাঠ শুরু করেন। বাংলা ১৩৩৯ সালে (১৯৩২খ্রিষ্টাব্দে) এই বংশের হরগোপাল সুবুদ্ধি ইঁট-সুরকি দিয়ে যে নতুন মন্দির তৈরি করেছিলেন, তা কংসাবতী জলাধারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। কংসাবতী প্রকল্প এলাকার মধ্যে এই বসত এলাকাটি পড়ায় এই মন্দির ও বাসস্থান ছেড়ে হিড়বাঁধ ব্লকের দিঘী-ভগড়া আমবাগানে চলে যান সুবুদ্ধি পরিবার।

আরেক পন্ডিত ছিলেন পুয়াডা গ্রামের অবিনাশ চন্দ্র ঘোষাল। খড়্গেশ্বর ধবলদেবের কুলগুরু মথুরানন্দ ছিলেন ব্রজরাজপুরের শ্যামসুন্দর জীউয়ের সেবক। ইন্দপুর ব্লকের ব্রজরাজপুর গ্রাম প্রাচীন কাল থেকেই শ্রী শ্রী শ্যামসুন্দর মন্দির জীউ মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। ৩৭৫ বছরের প্রাচীন এই শ্যামসুন্দর মন্দির। স্থানীয় ভাবে এটি শ্যাম চাঁদের মন্দির নামে পরিচিত। ১৬৪৫ সালে চৈতন্য পার্ষদ শ্রী দাস গদাধর পৌত্র মথুরানন্দ গোস্বামী সুদুর বৃন্দাবন থেকে শ্যামসুন্দর ও রাধিকার বিগ্রহ নিয়ে এসে তৎকালীন খাতড়ার তথা ধবলভূমের রাজা জগন্নাথ ঢোলের সহায়তায় এই

মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ভালুকা গ্রামের গৌরগোবিন্দ গোস্বামী এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লেখেন দাস গোবিন্দ ছদ্মনামে, শ্যামলীলামৃত কাব্যে। ১৯৪৩ সালে ভালুকা গ্রামে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'গদাধর চতুষ্পাঠী'তে কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, পুরাণ পাঠ হত। সুপুরের বিশ্বরূপ চট্টোপাধ্যায় এখানে পড়াতেন। পার্শ্ববর্তী বলরামপুরে সংস্কৃত পাঠশালার অধ্যক্ষ ছিলেন রাখহরি চট্টোপাধ্যায়। স্বদেশ চট্টোপাধ্যায় সহ অনেক ছাত্র এখান থেকে কাব্যতীর্থ উপাধি পান। ভেদো গ্রামে কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ গুপ্তের প্রসন্নময়ী চতুষ্পাঠীতে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের চর্চা হত। খাতরার কাছে ধবনীতে ছিল যোগীন্দ্রনাথ রায়ের চাতুষ্পাঠী। অতএব খাতড়া ও অম্বিকানগর পরগণার শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিমন্ডল গড়ে উঠেছিল ভূম রাজত্বকাল থেকেই।

আধুনিক শিক্ষার বিস্তারে খাতড়ার মধ্যবিত্ত শ্রেণী ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। কালেক্টর ভ্যাসের কাছে খাতড়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের জন্য তদ্বির করা হয়। ক্ষমতাচ্যুত খাতড়া রাজা ছিলেন এসময় দারিদ্র কবলিত। এস্টেটের মালিকানা চলে গিয়েছিল ভাগলপুরের উকিল চন্দ্রশেখর সরকারের হাতে (শরৎকামিনী এস্টেট)। খাতড়ার উকিলদের অনুরোধে চন্দ্রশেখর খাতড়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ১০০০০ টাকা অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। বিদ্যালয়ের নাম হয় চন্দ্রশেখরের নামে। কিন্তু প্রতিশ্রুত টাকার অর্ধেক না পাওয়ার কারণে বিদ্যালয় থেকে তাঁর নাম বিযুক্ত করা হয়।

খাতড়া ও অম্বিকানগরে মন্দিরকেন্দ্রিক এক উৎসব সংস্কৃতির জন্ম নেয়।[২১] অম্বিকানগর রাজধানীতে জোড়া মন্দিরের একটিতে আছে কুলদেবতা কালচাঁদ (কষ্টিপাথরের, সঙ্গে অষ্ট ধাতুর রাধা)। আরেকটিতে শ্যামচাঁদ নামে শিলা বিগ্রহ, পিতল ও প্রস্তরের দুটি গোপাল ও কুলদেবতা রামচন্দ্র শিলা। উল্লেখ্য জগন্নাথ ঢোলের প্রথম রাজধানী খাতড়া-ইন্দ্রপুর সীমান্তের রামচন্দ্রপুর ছিল কুলদেবতার নামে। পরে স্থানান্তরিত হয় সুপুরে। বিভাজিত রাজ্য খাতড়ার রাজধানী হয় খাতড়ায় ও অম্বিকানগর পরগণার প্রথমে গড়দুয়ার-রুদ্রায়, পরে অম্বিকানগরে। অম্বিকানগরে নিত্যপূজা ছাড়াও কার্তিক পূর্ণিমায় রসযাত্রা ও ফাল্গুন পূর্ণিমায় দোলযাত্রা হয়। কালচাঁদের রাসমঞ্চটি অসাধারণ কারুকার্য শোভিত ও বর্তমানে ভগ্নপ্রায়। খাতড়ায় শ্যামচাঁদের (কুলদেবতা) মন্দির, দুর্গা মন্দির, রঙ্কিনী দেবী কেন্দ্রিক মেলা উল্লেখযোগ্য।

## ব্রজরাজপুরে বর্গি আক্রমণ ও প্রজা দুর্দশা

রাঢ় বাঁকুড়ায় বর্গি আক্রমণ একটি ঐতিহাসিক সত্য। এই বর্গিদের আবার কেউ কেউ দেশে না ফিরে এখানেই থেকে গেছেন। সন্নিহিত ছাতনা পরগণায় দেশমুখ পদবীধারী এমন অনেক মারাঠা সেনার বাস এখনও দেখা যায়।

ব্রজরাজপুর গ্রামে বর্গি হাঙ্গামা নিয়ে দাস গোবিন্দ রচিত 'শ্রী শ্রী শ্যাম লীলামৃত' নামক কাব্যে কবি লিখেছেন,[২২]

'এগার তেষট্টি সনে বৈশাখের অপরাহ্নে
শুক্ল পক্ষে তৃতীয়ার দিনে
একদল বর্গি এসে অত্যাচার কৈল যবে
এই ব্রজরাজপুর গ্রামে।'

অর্থাৎ ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে ব্রজরাজপুরে বর্গি আক্রমণ সংঘটিত হয়। তার অভিঘাত এসে পৌঁছায় খাতড়া পরগণায়। তবে ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বর্গি আক্রমণের কথা বলা হলেও ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে আলিবর্দী ও নাগপুরের মারাঠা সর্দার রঘুজি ভোঁসলের মধ্যে শান্তি চুক্তি সাক্ষরিত হওয়ার পর বাংলায় দীর্ঘ দিন মারাঠা আক্রমণ সংঘটিত হয়নি। তবে ১৭৬০ সালে মুঘল প্ররোচনায় মারাঠা সর্দার শিউভট্ট একবার ইংরেজ প্রভাবিত বিষ্ণুপুর পর্যন্ত পৌঁছে যান। এই সময়ে বিষ্ণুপুর সন্নিহিত ব্রজরাজপুরে মারাঠা আক্রমণ হয়েছিল ধরে নিলে ১৭৫৬ সালে বৈশাখ মাসের পরিবর্তে ১৭৬০ সালের বৈশাখে এই আক্রমণ রচিত হয়েছিল, ইতিহাসের নিরিখে এমন মনে করা যেতে পারে। কারণ মারাঠা আক্রমণগুলো বর্ষার ঠিক আগে সম্পন্ন হত।

সে সময় রাজা ছিলেন সুপুরবাসী জয়চাঁদ। ব্রজরাজপুরের সন্নিকটে প্রান্তিক দুর্গ ছিল রামচন্দ্রপুরে। যার দায়িত্বে ছিলেন রাজ ভ্রাতা বীরচাঁদ। খবর পেয়েই বীরচাঁদের বীর কিশোরী কন্যা বীরাঙ্গনা তৎক্ষণাত অশ্বপৃষ্ঠে হাজির হয়ে অসম সাহসিকতার সাথে বর্গি লুঠেরাদের নিধন করতে থাকেন। পেছনে বীরচাঁদও আরো সেনা সহ হাজির হন। ব্রজরাজপুর ও মন্দিরকে লুন্ঠন এবং ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচান সম্ভব হয়। অপহৃত ললিতা মূর্তি উদ্ধার হয় আকড়াকোল পুকুরে, যা এখন প্রেমকুন্ড নামে পরিচিত। রাধারাণীর বিগ্রহ উদ্ধার হয় চৌধুরী পুকুরে। যেটি রাধাকুন্ড নামে পরিচিতি পায়। বর্গির দল পরাজিত, নিহত ও বিতাড়িত হলেও এদের ধাওয়া করতে গিয়ে

ভেদুয়াশোলের কাছে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে গিয়ে বীরাঙ্গনা বীরগতি প্রাপ্ত হন।[২৩]

## মশক পাহাড়ের কথা

খাতড়া শহর সংলগ্ন পাহাড় হল মশক পাহাড়। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ও লোকগবেষকরা এই নামকরণের বিষয়ে আজও নীরব। একটি মত এই যে মশক পাহাড় মানে মৃতের পাহাড়। যদিও এমন সিদ্ধান্তের কোন ব্যাখ্যা নেই। এই পাহাড় ও পাহাড়ের এক গুহা ঘিরে তৈরি হয়েছে অনেক জনশ্রুতি।

পশ্চিমদিকে পাহাড়ের উচ্চতা আনুমানিক ১২২ মিটার। পাথরের সিঁড়ি ভেঙে দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে পাহাড়ে ওঠার পথ রয়েছে। প্রায় ১০০ মিটার উঁচু পাহাড় শীর্ষে ওঠার পর গুহার দেখা মিলবে। মাটি, গ্রানাইট ও অন্যান্য পাথর দিয়ে তৈরি এই মশক পাহাড়। পাঁচ ফুট উঁচু ও তিন ফুট চওড়া গুহামুখ পেরিয়ে আট বাই আট ফুট চওড়া গুহার ভেতর ঢোকা যায়। এর ভেতরটি সাত ফুটের বেশি উঁচু। পাহাড়ের ভেতর ভালো করে দেখলেই প্রাচীনত্বের ছাপ ধরা পড়ে। অনেকের অনুমান, এর মধ্যে বসবাসের ইতিহাসও আছে।

এই গুহার অদূরে পূর্বমুখী একটি সুপ্রাচীন শিবমন্দির কোন এক সময়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক সাধু।[২৩ক] স্থানীয় মতে প্রায় ১৫/২০ বছর তিনি এই গুহায় বসবাস করেছিলেন। তিনি গুহার প্রথম চাতালে যজ্ঞ-কুণ্ড তৈরি করেছেলেন সাধন-ভজনের জন্যে। এই বৃদ্ধ সাধু প্রতিদিন মাধুকরীবৃত্তি ও অন্নজল সংগ্রহের জন্য নীচে নেমে আসতেন। খাতড়ার বাসিন্দা দুঃখির চন্দ্র চন্দ ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এখানে কালী মন্দির নির্মাণ করেন।[২৪]

আরেকটি জনশ্রুতি এলাকায় বহুল প্রচলিত। স্থানীয় মতে গুহায় জনৈক মুনি বিজয় পতি বসবাস করতেন। এই মুনির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল জনৈক রাজা (সুপুরের, অম্বিকানগরের বা খাতড়ার রাজা আসতেন এমন প্রামাণ্য তথ্য নেই) যখনই দেখা করতে আসতেন, মুনি তার মাথার জটার ভিতর হাত দিয়ে মোহর বের করে রাজাকে উপহার দিতেন। এই ঘটনায় রাজার নিশ্চিত ধারণা হলো মুনির জটার মধ্যে প্রচুর মোহর লুকোনো আছে। লোভী রাজা সব মোহর এক সাথে পাওয়ার বাসনায় একদিন মুনির শিরচ্ছেদ করে বসলেন এবং কোন মোহর না পাওয়ায় অবশেষে চরম হতাশ হলেন। কিন্তু মৃত্যুকালে মুনি রাজাকে অভিশাপ দিয়ে যান নির্বংশ হওয়ার। এই অভিশাপের জন্য উক্ত রাজার বংশধরগণ

বংশানুক্রমিক পাগল হয়েছিল। তবে এমন কোন রাজপরিবার বা ঐতিহাসিক তথ্য না পাওয়া যাওয়ায় এই কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নেই বলেই মনে হয়। হয়ত এটি নেহাতই জনশ্রুতি।

## পতনের নির্ঘন্ট

১৭৬৭ সালে অম্বিকানগরের খাজনা ধার্য্য হয় ৩১১ টাকা, আর সুপুরের ৫৪ টাকা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে অম্বিকানগরের কর ধার্য্য হয় ৩৭২ টাকা ১৪ আনা। ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৮৮৪) সুপুর তালুকের ইজারা গিসবর্ণ এ্যান্ড কোম্পানীর হাতে চলে যায়। এরা ছিল মূলত নীল চাষের সাথে জড়িত একটি কোম্পানী। পরে ভাগলপুরের শরৎ কামিনী এস্টেটের কাছে।

সুপুর পরগণা ঋণ পরিশোধ জনিত আদালতের ডিক্রি বলে নিলাম হয়ে যায়। ১৮৭৮ সালে এটি ক্রয় করে শ্রীরামপুরের গোস্বামী পরিবার। রাজার প্রতি সহানুভূতিশীল ডেপুটি কমিশনার ডাল্টন এই বিক্রী ও নিলাম বাতিল করলে গোস্বামী পরিবারের বিধবা মালিক হাইকোর্টে এর বিরুদ্ধে আপিল করে বিজয়ী হন। রাজার রাজত্ব রক্ষার প্রয়াসে এরপর ডাল্টন পরগণাটি নয়টি তরফে বিভক্ত করে আদালতের নির্দেশ মানতে লোহাত, কুলাট, ভেদুয়া, হরেন্দ্রবাণী ও লালবাজার নিলাম করেন। সুপুর, কুণ্ডি, ইন্দপুর, মাসিয়াড়া তরফ রাজার নিয়ন্ত্রণে থাকে। ১৯০৮ সালের দুর্ভিক্ষের অভিঘাতে ক্লিষ্ট খাতড়ায় রাজাদের ত্রাণক্ষমতা প্রায় ছিল না। ত্রাণ সংগৃহীত হয়েছিল ১১৭ টাকা ৮ আনা ৬ পাই।[২৫]

১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে ঋণগ্রস্ত অম্বিকানগরের জমিদারি ডিক্রীমূলে চলে যায় সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের হাতে। অলাভজনক এই জমিদারি প্রথমে তিনি চিরস্থায়ী মোকাবরী সত্ত্বে ইজারা দিলেও ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে চন্দ্রশেখর সরকারের শরৎকামিনী এস্টেটকে বিক্রি করে দেন। পরে চলে যায় দ্বারভাঙ্গার মহারাজের হাতে।[২৬]

অম্বিকানগর রাজ্যে সূর্যাস্ত আইনের মারপ্যাঁচে অন্য ভূমরাজ্যের মত অনেক ক্ষুদ্র জমিদারি তৈরি হয়। এমনটি ছিল বর্তমান হীরবাঁধ ব্লকের গুণিয়াদা মৌজার পান্ডা জমিদার বাড়ি। পরে পুরুলিয়া জেলা সহ সন্নিহিত কিছু মৌজাও এদের জমিদারি বিস্তৃত হয়েছিল। উড়িষ্যা আগত এই পরিবারের সমৃদ্ধি ঘটেছিল কৃষিকাজ, মহাজনী বৃত্তিতে। বিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত এই জমিদারির বাড়ির সাবেকী দুর্গাপূজা এখনকার শরিকদের দ্বারা ভক্তিভরে এখনও আয়োজিত হয়। পরিবারের সদস্যদের

সূত্রে জমিদারির সময়কালে অম্বিকানগররের রানী সত্যভামার মাধ্যমে রাজস্ব পরিশোধের কাহিনী পাওয়া যায়।[২৭] এই সত্যভামার সঠিক সময়কাল ও পরিচয় নিশ্চিত না হওয়া গেলেও, অম্বিকানগরের অধীনস্থ জমিদারির বিষয়টি সঠিক হতে পারে। এসবই ছিল ভেঙে পড়তে থাকা এক প্রাচীন রাজত্ব ও রাজবংশের ইতিহাসের উপসংহার।

## শেষ কথা

ধবলভূমের ইতিহাস ছড়িয়ে আছে বিস্তৃত সময়ের ক্যানভাসে। এগারো শতকের ওড়িয়া শাসনে ঋদ্ধ ছিল এই জনপদ। ফলে মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম সেকালেই। চোরগঙ্গদের শাসনে জৈন প্রভাবের প্রবল অভিঘাত এখনও অস্তমিত হয়নি এই ভূখন্ডে। এখানে ওখানে জৈন সংস্কৃতির অবশেষের প্রবল উপস্থিতি। জৈন বাণিজ্যের ধরাও এই ভূমিখন্ডের আর্থ-সামাজিক বুনিয়াদ গঠন করেছিল। সেই শক্ত ভিতের ওপরেই গড়ে উঠেছিল সপ্তদশ শতকের ধবল ভূম রাজ্য কাহিনি।

**তথ্যসূত্র :**


১. বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৫০, পৃঃ ৯১।
২. কুমারশঙ্কর নারায়ণ দেউ, ইতিহাসের পথ ধরে অম্বিকানগর, খাতড়া, ২০০৬ (চণ্ডীচরণ দাস সম্পাদিত বিপ্লবী রাইচরণ মেলা স্মরণিকা)।
৩. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০ (পুনঃ মুদ্রণ ২০১০), পৃঃ ৩৭।
৪. হরিনাথ ঘোষ, লাল সিংহ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের এক অধ্যায়, পুরুলিয়া, ১৯১৩, পৃঃ ৪৯।
৫. অশোক মিত্র, পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ৪র্থ খণ্ড, দিল্লী, ১৯৭৪, পৃঃ ১৪১।
৬. গৌরগোবিন্দ গোস্বামী, শ্রী শ্রী শ্যামলীলামৃত, বাঁকুড়া, ১৯২৭, পৃঃ ১৫০।
৭. অশোক মিত্র, পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ৪র্থ খণ্ড, দিল্লি, ১৯৭৪, পৃঃ ৩৫।
৮. পার্থসারথী গোস্বামী, শ্রীশ্রী শ্যামলীলাভূমি ব্রজরাজপুর, দুর্গাপুর, ২০২০, পৃঃ ১৬।
৯. কৃষ্ণদাস গোস্বামী, শ্রীশ্রী শ্যামলীলাত্ত্ব, বাঁকুড়া, ১৯৮৪, পৃঃ ১৬।
১০. LSS O'Malley, Bankura District Gazetters, Calcutta, 1908 p.166
১১. পার্থসারথী গোস্বামী, শ্রী শ্রী শ্যামলীলাভূমি ব্রজরাজপুর, দুর্গাপুর, ২০২০, পৃঃ ৩৯।
১২. অশোক মিত্র, পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ৪র্থ খণ্ড, দিল্লী, ১৯৭৪, পৃঃ ১৪৪।
১৩. B S Das, Civil Rebellion in the Frontier Bengal, Calcutta, 1973, p. 39.
১৪. অশোক মিত্র, পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ৪র্থ খণ্ড, দিল্লী, ১৯৭৪, পৃঃ ১২১-২২।
১৪ক. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়া জনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০, পৃ. ৩৪।
১৫. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০ (পুনঃমুদ্রণ ২০১০), পৃঃ ৩৮।

১৬. **M. C. McAlpine, Report on the condition of the Santals in the Districts of Birbhum Bankura Midnapore and North Balasore, Calcutta, 1909, p.52.**
১৭. **M. C. McAlpine, Report on the condition of the Santals in the Districts of Birbhum Bankura Midnapore and North Balasore, Calcutta, 1909, p.52.**
১৮. ২০২২ সালের ক্ষেত্রসমীক্ষা ও রাজবংশের বর্তমান প্রজন্মের গঙ্গেশ্বর ধবলদেবের থেকে প্রাপ্ত।
১৯. **Bankura District Board Report, 1937.**
২০. সব্যসাচী মণ্ডল (সা.), রাঢ় বাংলার লোকসংস্কৃতি, ২০১৮, পৃঃ ২৮৮।
২১. অশোক মিত্র, পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ৪র্থ খণ্ড, দিল্লী, ১৯৭৪, পৃঃ ১৪৪।
২২. গৌরগোবিন্দ গোস্বামী, শ্রী শ্রী শ্যামলীলামৃত, বাঁকুড়া, ১৯২৭, পৃঃ ৯২।
২৩. পার্থসারথী গোস্বামী, শ্রীশ্রী শ্যামলীলাভূমি ব্রজরাজপুর, দুর্গাপুর, ২০২০, পৃঃ ৪৪।
২৩ক. রামানুজ কর, বাঁকুড়া জেলার বিবরণ, কলিকাতা, ১৯২৫ (পুনর্মুদ্রিত), পৃ. ১৩৪।
২৪. মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি ও ক্ষেত্রসমীক্ষা।
২৫. **Collector's Famine Relief Report, Bankura, 1908, para, 31.**
২৬. **F W Rpbertson, Final Report on the Survey and settlement Operations in the District of Bankura, Calcutta, 1926, p.17.**
২৭. জমিদার পরিবারের মানস পাণ্ডার থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

## অষ্টম অধ্যায়

# সামন্তভূম ছাতনায় সাঁওত রাজা ও সাঁওতাল জনসমাজ

ছাতনার সন্নিকটে শুশুনিয়া পাহাড় যতটা জনমানসকে আকৃষ্ট করে, ছাতনা রাজাদের স্মারক ও ইতিহাস ততটাই জন অন্তরালে রয়ে গেছে। মোলবনার শৈব তীর্থ, নতুন ও পুরান বাসুলী মন্দির, এক্তেশ্বর শিব মন্দির, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচয়িতা চন্ডীদাসের ভিটা তথ্যনিষ্ঠ গবেষণার দাবি রাখে। আর সময়ের সাথে ছাতনা তথা সামন্তভূম রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস হারিয়ে গেছে বিস্মরণের অতলে।

## সামন্তভূমের পত্তন

ছাতনার সুপ্রাচীন রাজবংশের উদ্ভব, সময়কাল, উৎস সন্ধান বিতর্ক বিঘ্নিত।[১] রাঢ়ের অন্যান্য ভূম রাজবংশের মত অন্ত্যজ উৎস অস্বীকার করে, পশ্চিম দেশের রাজবংশের সাথে নিজেদের সম্পর্কিত করে রাজকীয় কৌলিন্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ছাতনা রাজবংশে ক্ষেত্রেও জারি ছিল। এই রাজবংশের উৎসের বিবিধ কাহিনি প্রচলিত আছে। উর্ধমুখী সচলতার রাঢ়ীয় প্রবণতা সত্ত্বেও, ঘটনাক্রম ছাতনার রাজবংশের উপজাতীয় উৎসের প্রশ্নাতীত প্রমাণ দেয়। ছাতনা ছিল শুশুনিয়া কেন্দ্রিক গুপ্ত সমকালীন ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্মা রাজবংশের এলাকাভূক্ত। যদিও কল্পনা সিংদেও রচিত ‘ছাতনার রাজ কাহিনীতে দেবী বাসুলী’ গ্রন্থে উল্লেখ আছে শুশুনিয়ার রাজা কেশব বর্মা তাঁর জীবন রক্ষার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ শঙ্খ রায়কে একটি মুক্তার মালা ও সাকিম

গড় দান করেন। এ তথ্য মনগড়া ও ইতিহাস বিবর্জিত বলে মনে হয়। শঙ্খ রায় ও বর্মা রাজত্বের সময়ের ফারাক কয়েক যুগের। মোলবোনার শিবমন্দিরে রক্ষিত ধর্ম পুস্তক 'দিক ডাক ও দেব ডাক' পুঁথির ভাষ্য অনুসারে ওড়িয়া উপকূল এলাকা থেকে ওড়ডং ও মোড়ডং নামের দুজনের ছাতনায় প্রথম আগমন ঘটে এবং তাদের সাথী শঙ্খ রায় সামন্তভূমে শাসক বংশের সূচনা করেন। পুঁথিতে আছে, "লোনাপানি তীর্থবাসী/ওড়ডং, মোড়ডং রায়ের/নব দন্ড ছাতার আগুসার হইলো/জয় দিয়ো।" যদিও এ তথ্যের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

ও'ম্যালী তাঁর গেজেটিয়ার্সে শঙ্খ রায়কে দিল্লী বাদশাহের সেনাপতি হিসাবে চিহ্নিত করে বিবাদ জনিত কারণে কাজ ও রাজধানী ছেড়ে দূরবর্তী ছাতনায় রাজত্ব স্থাপনের কথা বলেছেন। যদিও এ তথ্যের আর অন্য কোন প্রামাণ্য নথি নেই।[১ক]

সামন্তভূমের এলাকা নির্ধারিত হয়েছে ১৫৬ বর্গমাইলের, লম্বা-চওড়া আট ক্রোশের। মহিষাড়া পরগণা, বর্তমান ছাতনা-বাঁকুড়া-মেজিয়া-শালতোড়া-বাঁকুড়া থানা ও শহর এলাকা এই রাজ্যভূক্ত ছিল। ছাতনা বা সামন্তভূমের অবস্থান দুই শক্তিশালী রাজ্য মল্লভূম ও পঞ্চকোটের মধ্যে হওয়ায় প্রায়শই তাদের প্রবল আধিপত্যের ছাপ অনুভূত হত সামন্তভূমে। সামন্তভূমের সূচনায় সংঘটিত রাষ্ট্রবিপ্লবের নেপথ্যে পঞ্চকোটের ভূমিকা যেমন ছিল প্রবল, তেমনি মল্লভূমের সাথে সীমান্ত বিবাদের ঐতিহাসিক ক্ষণে এক্তেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা আরেক দিকের আভাষ দেয়। গঙ্গরাজদের বা সুলতানদের শিখরভূম বিজয় এই রাজ্যকে পরাভূত করে বলে ঐতিহাসিকদের অভিমত।

ডোমিনিকো (বর্তমান ঝাড়খন্ডে) জেলা থেকে ঐতিহাসিক সাঁওতাল অভিবাসনের যাত্রাপথে যেমন ছাতনা ছিল, তেমনি শিলদা কেন্দ্রিক সাঁওতাল ভার কেন্দ্রেরে পাশাপাশি ছাতনায় সাঁওতাল জনজীবনের প্রাবল্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই যাত্রা পথের মধ্যেই।[২] ধর্মীয়-সামাজিক প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি রাষ্ট্রক্ষমতার অলিন্দে শঙ্খ রায়ের প্রবেশ সেই উপজাতীয় আধিপত্যের ইঙ্গিত দেয়।[৩] পঞ্চকোটের রাজার প্রত্যক্ষ মদতে ভবানী ঝরাইতের ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে তার বিরুদ্ধে সামন্তভূমে উপজাতীয় গণজাগরণ ঘটে। শঙ্খরায়ের প্রতিষ্ঠিত বাসুলীকে রাজদেবী হিসাবে অস্বীকৃতি রাজা ভবানীকে গণবিদ্রোহের মুখে ফেলে দেয়। ভবানী নিহত হলে উপজাতীয় আধিপত্য ও বাসুলি মায়ের প্রতিষ্ঠা ফিরে আসে।[৪] ভবানীর বাস ছিল বর্তমান ব্রাহ্মণকুলি বা বামনকুলির গড়েরডাং বা গোপালপুরের ঝরাতের

গাঁতে। ভোলাতে ছিল প্রান্তিক দুর্গ। বামন কুলির ব্রাহ্মণবসতি, খিড়কিপুকুর, ভাটবাড়ি সেই আধিপত্যের প্রমাণাবশেষ। আর প্রান্তিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি পায় দ্বারকেশ্বর নদের তীরবর্তী রাজগ্রাম। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে ছাতনা রাজের আনুকূল্যে বর্তমান বাকুড়া শহর লাগোয়া দ্বারকেশ্বর তীরের রাজগ্রামের শ্রীরামপুর মৌজার পার্শস্থ বনাঞ্চল পরিষ্কার করে মানবাজার, বেনারস আগত মোদক, নন্দী, বরাট, দাস, লক্ষণ পদবীধারী (কামাখ্যা তন্ত্রধারী) তন্তুবায় সম্পদায় রাজগ্রামে নতুন বাণিজ্যধারার সূচনা করে।

সামন্তভূমে ভবানীর আগমন ও বিদায় দুটোতেই লোকগাথা মিশে আছে। ভবানী ঝরাইত আদপে পঞ্চকোট (কাশীপুর) রাজার দেবী দুর্গামায়ের মন্দিরের পরিচালক মাধব ঝরাতের পুত্র। রাজা দেবী সিংহদেও এর পুত্র কল্যাণ-এর 'রাজতিলক' যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ভুল করে কল্যাণের পরিবর্তে মাধবের কপালে রাজতিলক পড়ে যায়। রাজা এই রাজতিলকের সম্মান রাখতে নৈরাজ্য কবলিত বা বিদ্রোহী সামন্তভূম অভিযান করে শঙ্খ রায়কে হত্যা করে, ভবানী ঝরাইতকে রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কৃষ্ণপ্রসাদ গাতাইত 'ছাতনার বংশ পরিচয়'এ লিখেছেন,

'সামন্তের আদিরাজা শঙ্খরায় মহাতেজা
শিখর ভূপেন্দ্র তায় জিনিল সমরে
বসাইলে অকপটে সামন্তের রাজপাটে
ভবানী ঝরাত নামে ব্রাহ্মণ কুমারে।'

নিহত রাজা শঙ্খের রানী বিরজা ধন সম্পত্তি সহ মোলবোনা গ্রামের ভোলা মৌজার জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। একমাত্র কন্যা বাসন্তীকে তুলে দেন সামন্ত সর্দারদের জিম্মায়। সামন্তরা সাঁওত প্রাণকেন্দ্র শিলদায় উপজাতীয় যত্নে তাকে বড় করে তোলে। ভোলা মৌজায় সম্পদ লুকানোর জায়গা 'ধনযখ' ও রানীর মৃত্যুর জায়গা 'বীরজাবুড়ির' থান হিসাবে এখনও পরিচয় পায়।

এই ভয়ানক পট পরিবর্তনের ফলে সাঁওতাল জনজাতির জাতিত্ববোধ ও ভাবাবেগে আঘাত লাগে। শুরু হয় প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের উদ্যোগ। রাজা ভবানী দেশে কঠোর ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন চালু করেন। তিনি বাসুলির পরিবর্তে রাজ্যব্যাপী পার্বতীর আরাধনা প্রচলনের ফরমান জারি করেন। মোলবোনা মৌলেশ্বরের পরিচালনা ভার প্রান্তিক মানুষ, উপজাতিদের হাত থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে তুলে

দেন। এতে বিক্ষোভ আলোড়িত হয়ে ওঠে অন্ত্যজন ও উপজাতি অধ্যুষিত ছাতনার জনজীবন।

সামন্তভূমির প্রান্তদেশে মোলবোনার প্রাচীন শিবমন্দির প্রাঙ্গণে ফিবছর শিবগাজনে সপরিবারে আসতেন রাজা। অন্যান্যদের হাত থেকে মেলার ভার তিনি উচ্চবর্ণীয় আর্যদের হাতে তুলে দেন। এর ফলে উদ্ভূত অসন্তোষ ও সুযোগ কাজে লাগিয়ে রাজাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র রচিত হয়। বাসলী মা স্বয়ং এই আজ্ঞা দিয়েছেন বলে প্রচারিত হয়। বারো জন সর্দার এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। 'ছাতনার রাজকাহিনীতে দেবী বাসুলী'তে কল্পনাসিংদেও এই সর্দারদের নাম করেছেন, মাধবশর্মা, ঝাঁটিপাহাড়ীর নগ্নজিৎ দেঘুরিয়া, সুধামন্যু পাৎসা, অখিল রায়, বনকাটির হাসনু করঙ্গা, অভিমন্যু সিংহ প্রমুখের। তবে এই তথ্যের কোন উৎস উল্লেখ না থাকায় এগুলি মনগড়া বলেই মনে হয়। বরং মুর্মু, কিস্কু, হেমব্রম, সরেন, মান্ডি, টুডু, বাস্কে, বেসেরা, চড়ে, পাউড়িয়া, সোয়েলি সাঁওতাল উপগোষ্ঠীপতিদের দ্বারা এই বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার তত্ত্ব অনেক বেশি গ্রহণীয়।[৫] এমনকি তৎকালীন সাঁওতাল ভূমি বা গড় শিলদা থেকে এই অভিযান নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল বলে অভিমতও জোরালো। এই বারো জন সাঁওতসর্দার পূর্বপরিকল্পনা মত বারবাথানে লুকিয়ে থাকার পর, সমেবত ভক্তাদের ভিড়ে মিশে গাজন গান শুরু করে। ঢাকের মধ্যে মধ্যে লুকিয়ে রাখে খঞ্জর। এর স্মরণে এখনও মোলবোনার গাজনে ঢাকের অন্য প্রান্তে কাঁটা গেঁথে রাখা হয়। সম্ভবত ১৪৮২ খ্রিষ্টাব্দের পয়লা বৈশাখ রাজাভবানী ও রানী মনোরমার গাজন মেলা যাবার পথে পরিকল্পনা মত পথ আটকে এক কাঁচকলা গাছের তলায় তাদের ঘিরে ধরে উদ্দাম গাজন গান ও নৃত্য করতে থাকে একদল মানুষ ও ষড়যন্ত্রীরা। আর সুযোগ বুঝে বারো জন সর্দার রাজাকে হত্যা করে ও ভক্তদের ভিড়ে মিশে যায়। এই হত্যাকান্ডের খবর মেলা প্রাঙ্গণে পৌঁছলে উত্তেজিত রাজভক্তরা বারো ঘাতকের খোঁজে নেমে পড়ে। গোপালপুরে কুম্ভকার পাড়ায় এক সন্দেহভাজন সর্দারের উপস্থিতি অনুমান করে রাজকর্মীরা ঘরে ঘরে খোঁজ শুরু করলে ষড়যন্ত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ধরা পড়া থেকে বাঁচতে তখন সর্দাররা বধূর বেশে অনুসন্ধানকারী ব্রাহ্মণদের সন্দেহ নিরসনের জন্যে সাঁওত-কুম্ভকারদের সাথে পংক্তি ভোজনে বসে পড়েন। এই ঘটনার স্মরণে প্রত্যেক বছর এখনও মৌলেশ্বর শিবের গাজন উপলক্ষে প্রত্যেক ১লা বৈশাখ শালডিহা-ঘাটতোড়- মোলবোনাতে রায়-সামন্ত-কুম্ভকার এক সাথে ভোজন করে

থাকে। এই পালা বদলকে স্মরণ করে ১২টি খঞ্জরকে রাজপরিবার আজও সংরক্ষণ করেছে, যা দেবীপক্ষে দেবীর পদতলে পূজিত হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণরা রাজকন্যা রোহিণীকে ঘাটশিলায় কিছুদিন রেখে, পরে মোলবোনার সনাতন রজকের বাড়িতে এনে প্রতিপালন করতে থাকেন। পরবর্তীকালে রোহিণী সহ উক্ত রজক পরিবার ছাতনায় বসবাস শুরু করে। প্রচলিত প্রবাদ, এই রাজকন্যাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচয়িতা চণ্ডীদাসের সাধনসঙ্গী রামী রজকিনী।

এর পর ১২ সামন্ত সর্দার আড়াই দিন করে রাজ্যশাসন করতে থাকেন। বিবাদ বাঁধলে সর্দাররা বারো মাটির ঢিপিতে বসে ঝগরাপুর নামক স্থানে মিলিত হয়ে বিবাদ নিরসন করত। কারো কারো মতে এই গ্রামের নাম আদিতে বৈকুণ্ঠপুর হলেও কলহ প্রবণ এই গ্রামের নাম বদলে হয় ঝগড়াপুর। স্থায়ী রাজার সন্ধানে এই বারো সর্দার সিদ্ধান্ত নেন এক প্রভাতে যাকে ছাতনার রাজপথে দেখা যাবে তাকে রাজা হিসাবে অভিষিক্ত করা হবে। আর রাজকন্যা বাসন্তীর সাথে তার পরিণয় হবে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন,

'মাসাব্ধি বিশিখ শকে হামির উত্তর লোকে
সামন্তের কন্যা দিয়া রাজ্য দিল দান
তাহারি সৌভাগ্যক্রমে বাসলী সামন্তভূমে
শিলামূর্তি ধরিয়া হলেন অধিষ্ঠান।'

হামির নামের এই ছত্রি যুবক মাকে নিয়ে পুরী থেকে তীর্থ করে ফিরছিলেন। রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর মতে এ যুবক ছিল ফতেপুর সিক্রির নিঃশঙ্ক নারায়ণ।[৬] এছাড়া আরো মত আছে এই যুবকের চিতোরের রাণা বংশ বা রাজপুতনার সেক্রোবা বংশের ক্ষত্রিয় সন্তান বলে।[৭] যাইহোক ৫০০ বছরের রাজত্বে এই বংশ ছাতনায় এক গৌরবোজ্বল ইতিহাস রচনা করে। ছত্রি বা ক্ষত্রিয় অভিধায় উত্তীর্ণ হামির উত্তরের রাজবংশ শঙ্খ রায়ের 'রায়' পদবী পরিত্যাগ করে 'সিংহদেব' বা 'সিংহদেও' পরিচয় গ্রহণ করে। সামন্তভূমের প্রতিষ্ঠাতা রাজা শঙ্খ রায় সম্পর্কে অনেকগুলি কাহিনী পাওয়া যায়। এই সামন্তভূমের অধীন মোলবোনা মৌলেশ্বর শিব (এটি আগে জৈন মন্দির ছিল বলে পুরাতাত্ত্বিক ইঙ্গিত আছে) মন্দিরের পুঁথি 'দিকডাক ও দেব ডাক' থেকে জানা যায় ওড়িষা উপকূল থেকে ওড়ডং, মোড়ডং রায়, শঙ্খ রায় নামক তিন ব্যাক্তি সামন্তভূমে আসে এবং সামন্তভূম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ও'ম্যালীর

ভাষ্য হল শঙ্খ রায় দিল্লী সম্রাটের একজন সেনানায়ক ছিলেন, মনোমালিন্যের কারণে দিল্লী দরবার ত্যাগ করে দেশে ফিরে সামন্তভূম রাজ্যের সূচনা করেন।[৮] কল্পনা সিংদেও 'ছাতনার রাজ কাহিনীতে দেবী বাসুলি' গ্রন্থে লিখেছেন শুশুনিয়া গড়ের রাজা কেশব বর্মার জীবন রক্ষার বিনিময়ে শঙ্খ রায় ছাতনার সিকিম গড় ও মুক্তার মালা পান। এই সব কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বারোজন উপজাতীয় সর্দার সহমতের মধ্যদিয়ে নির্বাচিত শঙ্খ রায়ের উত্তরসূরি হিসাবে হামিরের প্রতিষ্ঠা, এই তত্ত্বই অধিক গ্রহণীয়। শঙ্খরায়ের কন্যা বাসন্তী ও হামীরের বংশধারাই স্বাধীনোত্তর কাল পর্ব অবধি অব্যাহত ছিল। এই রাজ শাসনে বাসুলী কেন্দ্রিক ধর্ম-সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে ওঠে, ঘাটোয়ালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, কৃষি-বাণিজ্য নির্ভর অর্থনীতি গতি পায়। প্রবাসী পত্রিকায় (ষড়বিংশ ভাগঃ প্রথম খন্ড) প্রকাশিত প্রভাত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদনে হামিরের প্রতিষ্ঠা, চন্ডীদাস-দেবদাসের বাসুলী কেন্দ্রিক ধর্ম-সাংস্কৃতিক পরিসর গড়ে তোলার ইঙ্গিত আছে, "রাজপথের ধারে ছাতনার পুরানো "বাসলী" মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখে ছাতনার রাজবাড়ীতে উপস্থিত হলাম। বাজবাড়ীতে, রাজবংশের ইতিহাসজ্ঞ রামকিঙ্কর সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হল। তার সাহায্যে রাজদপ্তরে একখানি হাতে-লেখা খাতা দেখতে পাই। খাতাতে গুটি আষ্টেক পাতা আছে। তাতে পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দে ব্রাহ্মণ নগরের ছত্রিশ নগরে পরিণতি, হামির উত্তরের রাজ্যভিষেক, বেণের পুটুলিতে বাসলীর রাজবাড়ী আগমন, ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। তাতে চণ্ডীদাসের পরিচয়ের সম্বন্ধে লেখা ছিল, '—মানে না সমাজ প্রথা শুনে না কাহারো কথা /স্মরে মুখে মাত্র রাধা নাম সমুদ্র গৌড় সমাজ গোত্র শ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ/ হরে মিশ্র কুলের সন্তান। পুত্র হইল দুই জন উদ্ধব পদ্মলোচন।' শুনেছিলাম যে, মূল পুঁথি আনন্দময়ী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহাশয়ের কাছে আছে। সে-সময়ে তাকে পত্র দিতে পারিনি। সম্প্রতি তাকে যে চিঠি দিয়েছিলাম তার উত্তরে তিনি লিখেছেন যে, এই লাইন কটি তিনি অন্য পুঁথিতে দেখেছেন। তার কাছে যে পুঁথি আছে তা দেবীদাসের ছেলে পদ্মলোচন শর্মা কর্তৃক ১৩৮৭ শকাব্দে বিরচিত।[৯] পুথি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের কথা উঠতে পারে না, কেননা চণ্ডীদাসের কাল সম্বন্ধে আমাদের যা মোটামুটি জানা আছে তাতে এইটুকু জানতে পারা যায় যে, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক। বিভিন্ন প্রমাণে জানতে পারা যায় যে, বিদ্যাপতি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হ'তে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বর্তমান ছিলেন।

ছাতনার যে-রাজার সময়ে বাসলী দেবীর প্রতিষ্ঠা হয় তার নাম "উত্তর হামির"।[৯ক] ইনিই ছাতনা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ছাতনার রাজবংশের ইতিহাসজ্ঞ রামকিঙ্কর-বাবুর কাছে শুনেছিলাম এবং রাজবাড়ীর খাতার মলাটে লেখা দেখেছিলাম যে, উত্তর হামির বর্তমান রাজার ঊর্ধ্বতন একবিংশ পুরুষ। বর্তমান কাল-গণনার মতে এক পুরুষে ২৫ বৎসর ধরলে উত্তর হামির চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ কিংবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন বলা যেতে পারে। কাজেই ছাতনা রাজপরিবারের ইতিহাস হতে আমরা চণ্ডীদাসকে বিদ্যাপতির সমসাময়িক বলতে পারি। সত্যকিঙ্কর-বাবু আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে যে-পত্র দিয়েছেন তাতে তিনিও উত্তর হামির ১৩৫০ হতে ১৩৭৫ শকের মধ্যে বর্তমান ছিলেন এরূপ উল্লেখ করেছেন। চণ্ডীদাসের ভ্রাতুপুত্র পদ্মলোচন শর্ম। ১৪৬৫ খৃঃ অব্দে পুথি রচনা করেছিলেন, সুতরাং আমরা ওনার খুল্লতাতের পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান থাকবার সম্বন্ধে নিসংশয় হতে পারি। সত্যকিঙ্কর-বাবু যে-ইষ্টকের কথা বলেছেন, তাতে উল্লিখিত আছে 'শ্রী ছাতনা নগরের শ্রী উত্তররায়।' অবশ্য মন্দির-চত্বরে বহুবিধ রকমের ইট পাওয়া যায়। শুনলাম তার পাঠ উদ্ধারের চেষ্টা চলছে, কাজেই সে সম্বন্ধে বর্তমানে নীরব থাকাই যুক্তিসিদ্ধ। ছাতনার বাসলী যে তন্ত্রোক্ত বিশালাক্ষী নয়, রামকিঙ্করবাবুও সেবিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।"

শঙ্খ রায়ের শাসন নিয়ে বিস্তৃত কিছু জানা না গেলেও একথা সত্য গভীর অরণ্য রাজ্যে ঘাটোয়ালী ভূমি ব্যবস্থার পরিসরে তাঁর শাসন শুরু হয়। বাঁকুড়া বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী অনুমান করেছিলেন স্থানীয় উপজাতীয় বা ঘাটোয়ালী নেতৃত্বের থেকে এই স্থানিক ভূম রাজত্বের সূচনা হয়।[১০] এই অঞ্চল পঞ্চকোট রাজসীমা সন্নিহিত বা প্রভাবিত হওয়ায় এ রাজ্যের ঘটনা প্রবাহের উপর পঞ্চকোট রাজার তীক্ষ্ণ নজর ছিল। শঙ্খ রায়ের শাসনের ভিত্তি ছিল বারো উপজাতীয় সর্দারের সমর্থন।[১১] শলদার মত উপজাতীয় ভরকেন্দ্রের সাথে এই শাসন ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। উপজাতীয় অতি আচার, পথনিরাপত্তার ঘাটতি জনিত প্রজা অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে প্রতিবেশী পঞ্চকোটরাজ ভবানী ঝরাইত নামের এক ব্রাহ্মণকে রাজপদে বসতে সাহায্য করেন। তবে সে শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ছাতনার উপজাতীয় সমাজ সঙঘবদ্ধ হয়ে বাসুলী পূজার পরিবর্তে পার্বতীকে প্রতিষ্ঠার রাজ-প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রজা অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে ভবানী ঝরাইতের শাসনের উৎসাদন

করে।[১২]

প্রাথমিক অবস্থায় সাঁওতাল সর্দারদের যৌথ শাসন চালু থাকলেও অচিরেই সম্ভবত শঙ্খ রায়ের কন্যা সম্পর্কিত রাজধারার সূচনা ঘটে। শঙ্খ পরবর্তী ও চঞ্চলকুমারী পর্যন্ত শাসকদের নামে ও শাসনকালের ব্যাপক বিভ্রান্তি আছে।

## রাজবংশ পরিচয় ও রাজকাহিনী

জে ডি বেগলারের 'রিপোর্ট অব এ ট্যুর থ্রু দ্যা বেঙ্গল প্রভিন্সেস', ও'ম্যালীর গেজেটিয়ার্স, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের 'ছাতনার কথা' আখ্যানে, কৃষ্ণ সেনের চণ্ডীদাস চরিত, মেঘদূত ভুঁই-এর 'রাঢ়ের আলোকে মোলবোনা' ও অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঁকুড়ার গুরুত্বপূর্ণ জনপদ ছাতনা'য় যে সামন্তরাজ বংশ তালিকার আভাষ দিয়েছেন, তা থেকে নিম্নরূপ বংশপঞ্জি নির্মাণ করা যায়। সুবিধার্থে অন্য দুই প্রাচীন রাজবংশের তালিকাও দেওয়া হল।

| **প্রজন্ম** | **সামন্তভূমের রাজবংশ** | **প্রাচীন সিমলাপাল রাজবংশের কালপঞ্জী** | **মল্লরাজ বংশ** |
|---|---|---|---|
| ১ম | শঙ্খ রায় (১৪০৩—) | | |
| ২য় | শিবু-ভ্রমর-কালীচরণ | | |
| ৩য় | উত্তর হামীর (১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে) | | |
| ৪র্থ | বীর হামীর | শ্রীপতি মহাপাত্র (১৪৬৩-১১৪৯৪) | |
| ৫ম | নিঃশঙ্কু হামীর | মাধব (১৪৯৪-১৫২৪) | |
| ৬ষ্ঠ | নৃসিংহদেব | জগন্নাথ (১৫২৪-১৫৪৫) | |
| ৭ম | মোহন্ত রায় | বাসুদেব (১৫৪৫-৫৮) ও বলরাম (১৫৫৮-৮০) | |

| প্রজন্ম | সামন্তভূমের রাজবংশ | প্রাচীন সিমলাপাল রাজবংশের কালপঞ্জী | মল্লরাজ বংশ |
|---|---|---|---|
| ৮ম | শঙ্করনারায়ণ | মোহনদাস (১৫৮০-১৫৯৩) | হাম্বীর মল্লদেব (১৫৬৫-১৬২০) |
| ১০ম | চঞ্চলকুমারী | লক্ষ্মণ (১৬১৫-৫২) | রঘুনাথ সিংহদেব (১৬২৬-১৬৫৬) |
| ১১তম | হামীর উত্তর | কৃষ্ণদাস (১৬৫২-১৬৯৩) | বীর সিংহদেব (১৬৫৬-১৬৮২) |
| ১২তম | জটিল বিবেক, স্বরূপ নারায়ণ (১৬২৮-) উত্তরনারায়ণ (১৬৪৮-) | রাধানন্দ (১৬৯৩-১৭২৮) | দুর্জন সিংহদেব ১৬৮২-১৭০২) |
| ১৩তম | খড়্গ বিবেকনারায়ণ | বলরাম (১৭২৮-১৭৭৫) | রঘুনাথ সিংহদেব ২য় (১৭০২-১৭১২) |
| ১৪তম | স্বরূপনারায়ণ | জগন্নাথ (১৭৭৫-১৮২০) | গোপাল সিংহদেব (১৭১২-১৭৪৮) |
| ১৫তম | লক্ষ্মীনারায়ণ (১৭৫৮-) | চিরঞ্জীব (১৮২০-১৮৩১) | চৈতন্য সিংহদেব (১৭৪৮-১৮০১) |
| ১৬তম | দ্বিতীয় স্বরূপনারায়ণ | নটবর (১৮৪৪-১৯০৫) | মাধব সিংহদেব (১৮০১-১৮০৯) |
| ১৭তম | কানাইনারায়ণ, বলাইনারায়ণ (১৮০৩-) | মানগোবিন্দ (১৯০৫-) | গোপাল সিংহদেব ২য় (১৮০৯-১৮৭৬) |
| ১৮তম | আনন্দলাল (—১৮৬৭) | জগবন্ধু (১৯০৫-১৯০৯) | রামকৃষ্ণ সিংহদেব (১৮৭৬-১৮৮৫) |
| ১৯তম | অক্ষয়কুমারী (১৮৬০-৬৩) আনন্দকুমারী (১৮৬৩-) | মদনমোহন (১৯০৯-১৯২৭) | ধ্বজাধমণী দেবী (১৮৮৫-১৮৮৯) |

| প্রজন্ম | সামন্তভূমের রাজবংশ | প্রাচীন সিমলাপাল রাজবংশের কালপঞ্জী | মল্লরাজ বংশ |
|---|---|---|---|
| ২০তম | মহেন্দ্রলাল হেমেন্দ্রলাল | শ্যামসুন্দর (১৯২৭-১৯৫৫) | নীলমণি সিংহদেব (১৮৮৯-১৯০৩) |
| ২১তম | ত্রিগুণা | কল্যাণী/দেবপ্রসাদ | রাজানেই (১৯০৩-১৯৩০) |
| ২২তম | প্রদীপ | চিরঞ্জীব | কালীপদ সিংহঠাকুর (১৯৩০-১৯৮৩) সলিল/জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ ঠাকুর |

১) শঙ্খ রায় (১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দ) : শঙ্খ রায়ের শাসনের সূচনা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আগেই করা হয়েছে। ও'ম্যালীর মতে ১৪০৪ সালে তিনি শাসন ভার হাতে নেন।[১৩] স্বপ্নাদেশে বাহুল্যনগর থেকে ছত্রিবণা (ছাতনা)তে রাজধানী স্থানান্তর, বণিকের শিলায় উত্তরপুরুষের সময় প্রকটিত হওয়ার মতো জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

২) শিবু-ভ্রমর-কালীচরণ : শিবু-ভ্রমর-কালীচরণের শাসক হিসাবে কোন কোন তথ্য সূত্র পাওয়া যায়, যা সন্দেহাতীত নয়। এরা সম্ভবত শঙ্খ রায়ের রক্তের সম্পর্কের কেউ ছিলেন না। বরং রাজা ভবানী দ্বারা শঙ্খ রায়ের হত্যা যে রাজনৈতিক শূন্যতার জন্ম দেয় তা পূরণে উপজাতীয়দের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁরা সামন্তভূম শাসন করেন।

৩) উত্তর হামির (১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ) : শঙ্খ রায়ের মৃত্যুর পর রাজা ভবানী যে ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু করেন, তা উপজাতীয় বিপ্লবে উৎসাদিত হওয়ার কিছুকালের মধ্যেই শঙ্খ রায়ের জামাতা উত্তর হামির সিংহসন আরোহণ করেন। তিনি উপজাতীয় সর্দারদের নয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে, বাসুলী কুলদেবতার প্রতিষ্ঠা করেন। থানার কাছে এই মন্দিরটি আদি বাসুলী মন্দির। আর ১৪৬২ খ্রিস্টাব্দে চণ্ডীদাসের আগমন ও বাসুলী সাধক হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটলে সামন্তভূমে নতুন ধারার সূচনা ঘটে।[১৪] রাজানুকূল্যে চন্ডীদাসের ভক্তি গান ও পদ সারা দেশে আলোড়ন ফেলে। এই সময় চন্ডীদাসকে মল্লরাজ আহ্বান জানালে মল্ল-সামন্তভূমের সামরিক সংঘর্ষের ইঙ্গিত

মেলে। তবে ধর্মীয় উদার সহমতের অনুষঙ্গে চন্ডীদাস কিছুকাল বিষ্ণুপুরে অবস্থান করেন। 'বাসুলী মহাত্ম্য' কাব্যে পদ্মলোচন শর্মা উত্তর হামিরের বাদশাহের দ্বারা গ্রেপ্তার ও বাসুলীর কৃপায় মুক্তি লাভের কথা উল্লেখ করেছেন। বাসুলী মন্দির সংলগ্ন পবিত্র বোলপুকুরে দেবী এক শাঁখারীর কাছে শাঁখা পড়ে দুটি হাত অবিশ্বাসী পূজারীকে দেখিয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি।[১৫]

৪) বীর হামীর : উত্তর হামীরের পর বীর হামীর সামন্তভূমের শাসন ভার নেন। তিনি সাহিত্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত রাখেন। চণ্ডীদাসের ভাই দেবীদাসের পুত্র পদ্মলোচনশর্ম ১৪৬৫ খৃঃ অব্দে একটি ভক্তিমূলক পুথি রচনা করেছিলেন।

৫) নিঃশঙ্ক হামীর : বীর হামীরের মৃত্যুর পর ছাতনার রাজা হন তাঁর পুত্র নিঃ শঙ্ক হামীর।

৬) নৃসিংহদেব : নিঃশঙ্ক হামীরের মৃত্যুর পর ছাতনার রাজা হন তাঁর পুত্র নৃসিংহদেব।

৭) মোহন্ত রায় : নৃসিংহদেবের মৃত্যুর পর ছাতনার রাজা হন তাঁর পুত্র মোহন্ত রায়।

৮) শঙ্করনারায়ণ : মোহন্ত রায়ের মৃত্যুর পর ছাতনার রাজা হন তাঁর পুত্র শঙ্করনারায়ণ। তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে।

৯) বিরিঞ্চিনারায়ণ : শঙ্করনারায়ণ অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে ছাতনার রাজ্যভার পান তাঁর ভাই বিরিঞ্চিনারায়ণ।

১০) চঞ্চলকুমারী : বিরিঞ্চিনারায়ের অকাল মৃত্যুর পর নাবালক পুত্রের হয়ে রাজ্য শাসন করতে থাকেন রানী চঞ্চলকুমারী। ছাতনার ইতিহাসে চঞ্চলকুমারী, অক্ষয়কুমারী, আনন্দকুমারী—এই তিন রানীর শাসনের তথ্য আছে। চঞ্চলকুমারী ১৮ বছর রাজত্ব করেন। যোড়শ শতকের প্রথমার্ধে একজন নারী প্রশাসক ১৮ বছর সাফল্যের সাথে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর।

১১) ২য় হামীর উত্তর : পুত্র সাবালক হয়ে রাজ্য শাসন ভার তুলে নেয়। একটি মতে হামির উত্তরের (১৫৫২-১৫৫৫ খ্রি.) স্বনামাঙ্কিত ইঁট দিয়ে আদি বাসুলী মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তবে খুব সম্ভব এটি উত্তর হামিরের সময়ের ঘটনা।[১৬]

১২) জটিল বিবেক : হামীর উত্তরের মৃত্যুর পর নতুন শাসক হন তাঁর পুত্র জটিল বিবেক। উত্তর হামীর (২য়) বা জটিল বিবেকের শাসনাকালে মল্লরাজ হাম্বীরের সাথে যুদ্ধে সামন্তরাজের পরাজয় ঘটে বলে জনশ্রুতি আছে।

১৩) স্বরূপ নারায়ণ (১৬২৮ খ্রিস্টাব্দ) : জটিল বিবেক নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে ভাই স্বরূপ নারায়ণ রাজ্য ভার তুলে নেন। তিনি ছিলেন বীর যোদ্ধা। ১৬৩১ খ্রিস্টাব্দে, বর্গী আক্রমণ প্রতিহত করে ৭০০ বর্গীর মুন্ড নবাবের কাছে পাঠালে, নবাব এই বীরত্ব ও কৃতিত্বে খুশি হয়ে 'হিন্দুহারাম' নামক পাট্টা মূলে সামন্তভূমকে নিষ্কর ঘোষনা করেন।[১৭] যদিও এমন কোন ঐতিহাসিক দলিলের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। তাছাড়া বর্গী আক্রমণের উক্ত সময়কালও বিভ্রান্তিকর। অষ্টাদশ শতকের চারের দশকের আগে কোন বর্গী আক্রমণ বঙ্গে সংঘটিত হয়নি। অন্য কোন বহিরাক্রমণের কথা বলা হয়েছে কিনা গবেষণার বিষয়। রথীন্দ্রমোহনের মতে এই আক্রমণ ঘটেছিল ২য় স্বরূপনারায়ণের সময়ে।[১৮]

১৪) উত্তরনারায়ণ (১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দ) : ১৬৪৮ সালে স্বরূপ নারায়ণের অকাল মৃত্যুর পর আরেক ভাই উত্তরনারায়ণ রাজাসনে বসেন। রাজার আদেশে সভাকবি উদয়সেন চন্ডীদাস-চরিতামৃত রচনা করেন।[১৯] এটি বাংলার ভক্তি আন্দোলনে একটি অনন্য সংযোজন। কবিপুত্র আনন্দও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে থাকেন। তাঁর সময়ে বাসুলী মন্দিরের সংস্কার ও প্রাচীর নির্মাণ সম্পন্ন হয়। পুরানো বাসুলীমাতার মন্দিরের ইষ্টক প্রাচীরের ইঁটে হামিরের নাম খোদিত আছে, যাঁকে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। এই রাজার আরেক নাম নিঃশঙ্ক।

১৫) খঙ্গ বিবেকনারায়ণ : উত্তরনারায়ণের মৃত্যুর পর খঙ্গা বিবেকনারায়ণ সামন্তভূমের শাসন ভার নিলে নতুন যুগের সূচনা হয়। তিনি সামন্তভূমের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে যত্নবান হন। পঞ্চকোটের রাজপরিবারের আভ্যন্তরীণ বিবাদে ভাগ্য বিড়ম্বিত এক রাজ কুমার সামন্তভূমে আশ্রয় চাইলে, কেবল আদর্শের কারণে, পঞ্চকোট রাজের রোষানল উপেক্ষা করে তাঁকে আড়রা গ্রামে আশ্রয় দেন।[২০] তিনি দ্বিতীয় বাসুলী মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু করেন ১৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দে)। তার সময়ে পুরাতন মন্দির থেকে এই মন্দিরে বাসুলী মাতার মূর্তি সরিয়ে আনা হয় বা নতুন মূর্তি বসান হয়। এই মন্দিরটির ধ্বংশাবশেষ রাজগড়ে এখনও আছে।[২০ক] তিনি রাজ্যের বাসুলী কেন্দ্রিক ধর্মীয় ভাবনাকে আরো সংহত করে তোলেন। ১৭৪৩ সালে তিনি নিহত হন, খুব সম্ভব নিজের পুত্রের হাতে। খোঁড়া হওয়ায় তিনি 'খঞ্জ' বিবেক নামে পরিচিত ছিলেন।

১৬) ২য় স্বরূপনারায়ণ : খঙ্গা বিবেকনারায়ণের অকাল মৃত্যুর পর পুত্র ২য় স্বরূপনারায়ণ রাজ্যভার হাতে নেন। তাঁর সময়েই দুর্জন সিংহের লুন্ঠন কাজ সংগঠিত

হয়। রাজার সমকালীন দুর্বলতার কারণে প্রজাসাধারণকে অশেষ দুর্গতির মুখে পড়তে হয়। লুণ্ঠিত হয় জমিদারি ও সাধারণ মানুষের সম্পদ।

১৭) লক্ষ্মীনারায়ণ (১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দ) : স্বরূপনারায়ণের মৃত্যুর পর পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহাসনে বসেন। এই সময় ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত ঘটে। বিভিন্ন ভূম রাজ্যে অভিযান করে তাদের কোম্পানী নির্ধারিত রাজস্ব দিতে বাধ্য করা হয়।

১৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রাজকীয় সনদ বলে দখল কায়েম ও রাজস্ব নির্ধারণের উদ্দেশ্যে জন এনসাইন ফার্গুসনকে রাঢ় অভিযানে পাঠালে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের (সামন্তভূমাবনীনাথ) বার্ষিক ৮৭৯ টাকা ১১ আনা রাজস্বের বিনিময়ে কোম্পানীর অধীনতা মেনে নেন।[২১] এই অভিযান নিয়ে মেদিনীপুরস্থিত আঞ্চলিক শাসক গ্রাহাম ২রা মার্চ, ১৭৬৭ সালে অভিযানরত ফার্গুসনকে জানালেন,[২২]

> "…the Zemindars possessing the jungles to the westward of Midnapore and which hitherto supported a kind of independence, notwithstanding they were avowedly subordinate to the Province, their rents being entered in the Midnapore Cutchery books, and most of them having always paid a peshcush or tribute of acknowledgment; that the Chatna Zemindar is one of those,"

রাজা ছিলেন সাহিত্য অনুরাগী ও ধর্মপ্রাণ। তিনি রাধাকৃষ্ণ-লীলাগীত ও শ্যামাগীত রচনা করেছিলেন। সে মধুর রাধাকৃষ্ণ-লীলাগীত বিষ্ণুপুর পর্যন্ত প্রচারিত হয়েছিল। তাঁর সময় রানিজিপুর জমিদারির উপরে দখলদারি নিয়ে সুপুর (বীরভূমের) ও ছাতনা রাজের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। ফারগুসন চাইছিলেন সুপুরের মাধ্যমে এই জমিদারির রাজস্ব পড়ুক। ছাতনারাজ রাজস্ব ছাড় দিয়েও এই জমিদারিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে মরিয়া ছিল। এই রাজার খনন করা পুকুর 'লক্ষ্মীসায়র' নামে খ্যাত।

রাজস্ব আদায় ও পরিশোধ নিয়ে রাজার সাথে কোম্পানীর বিরোধ বাঁধে। বিষ্ণুপুর থেকে কোম্পানী সেনা এগিয়ে এলে এসময় কোম্পানী নির্ধারিত রাজস্ব অনাদয়ে রাজা জঙ্গলে আত্মগোপন করে। এনিয়ে কোম্পানী নথিতে আছে,[২৩]

> "The Amyenagar and Chatna Zamindars fled to the jungles as the Bishnupur troops proceeded. Later on, the vakils of Ameyanagar offered to submit on behalf of their master. But owing to depredations committed simultaneously by

the peoples of Damodar Singh and the Company's troops they were unable to satisfy the demands of the Company."

এই ব্রিটিশ নথিতে দেখা যায় ছাতনারাজ (সামন্ত অবনীনাথ) ফারগুসনের রাজস্ব দায় এড়ানোর জন্যে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছেন। কোম্পানী এতে রুষ্ট হয়ে কড়া ব্যবস্থা নিতে চাইলে, উকিলের মাধ্যমে তিনি মুচলেকা দিতে বাধ্য হন এবং উকিলকে এজন্য শারীরিক নির্যাতনেরও শিকার হতে হয়।

ছাতনার রাজস্ব কার মাধ্যমে আদায় হবে এনিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়। ফারগুসনের অভিযানের সময় ছাতনার রাজস্ব, পাঞ্চেতের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদের দরবারে পৌঁছাত। ওড়িষা সুবার মেদিনীপুর চাকলার অধীন ছাতনা জমিদারির ভূমিকর স্বাভাবিক ভাবেই মেদিনীপুর রেসিডেন্টের মাধ্যমে হওয়ার দাবি করেছিলেন, মেদিনীপুরের রেসিডেন্ট ভেরেলস্ট। এদিকে মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট সাইকস পাঞ্চেতরাজের মাধ্যমে ছাতনায় সামরিক অভিযানের হুমকি দিলে, বাংলার কালেক্টর জেনারেল ক্লড রাসেলকে ক্ষুব্ধ ভেরেলস্ট পত্রাচার করে লিখলেন,

"I have written the Raja that Chhatna belongs to the province Orrisa and that the rents are already settled and if presumes to send any his people into the pgs. I shall certainly punish him."

এর পর অবশ্য কোম্পানী হস্তক্ষেপ করে মেদিনীপুর রেসিডেন্টের মাধ্যমে ছাতনার রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থার মান্যতা দেয়।

১৮) দ্বিতীয় স্বরূপনারায়ণ : লক্ষ্মীনারায়ণের এই পরবর্তী প্রজন্মের শাসনকাল ছিল ঘটনা বহুল। চুয়ার বিদ্রোহের অভিঘাতে যখন কোম্পানী শাসন বিপন্ন, ছাতনারাজকে ২১৪৪ সিক্কা ও ১০০০ পাইক দিয়ে কোম্পানীকে সাহায্য করতে হয়।[২৪] রাজা সভা কবি কৃষ্ণ সেনের পিতা হীরালালের নামে লক্ষ্মীশোল গ্রামের নিষ্কর সনদ প্রদান করেন। এ সময় শুরু হয় রাজ দরবারে নানা ধরণের ষড়যন্ত্র। রাজার মৃত্যুর পর যোগ্য দাবিদার অগ্রজ বলাইনারায়ণের পরিবর্তে কনিষ্ঠ কানাইলাল সিংহাসন দখল করেন।

১৯) কানাইনারায়ণ : পারিবারিক চক্রান্ত ও আসাধু উপায়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতা কানাইলাল অগ্রজ বলাইনারায়ণের পরিবর্তে সিংহাসন হাসিল করেন। শুরু হয় দুই ভাইয়ের আইনি লড়াই। এই জোর পূর্বক রাজ্য দখল নিয়ে কৃষ্ণ সেন কবি দেশের

দুর্গতি বর্ণনা কালে লিখেছেন, “কালর হস্তেখরকরবাল, লালের সিংহাসন ।”

২০) বলাইনারায়ণ (১৮০৩-১৫) : সভা কবি কৃষ্ণ সেন রাজাদেশে উদয় সেনের সংস্কৃত চণ্ডীদাসচরিতের বঙ্গানুাদ করেন। কৃষ্ণ-সেন রাজা বলাইনারায়ণের অনুগামী ছিলেন। তিনি পুরুলিয়া ও উচ্চতর আদালতের সাহায্য নিয়ে ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে বলপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী কানাইনারায়ণকে হটিয়ে বলাইনারায়ণকে সিংহাসনে বসিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বলাইনারায়ণ অগ্রজ ২য় স্বরূপনারায়ণ ১৮১০, ১৮১১, ১৮১২ খ্রিস্টাব্দেও সনদ দিয়েছিলেন। সে সনদ আছে। কৃত্রিম হতে পারে। ১৭৬১ পর্যন্ত বলাইনারায়ণ প্রদত্ত সনদ আছে। বলাইয়ের পুত্র ২য় লছমীনারাণ ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে এক সনদ দিয়েছিলেন। ১৮৩৩ সালের গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামার অভিঘাত আলোড়িত ছিল সামন্তভূমি। এই উপদ্রব নিবারণে ব্রিটিশের সহযোগী হন সামন্তরাজ।

কৃষ্ণ সেনের বঙ্গানুবাদ ‘বাসলী ও চন্ডীদাস’ প্রকাশিত হয় ১৮১৩-১৪ সালে। পরে নাম হয় ‘চণ্ডীদাস চরিত’। কেঞ্জাকুড়া নিবাসী রামানুজ কর ১৮৩৩ সালের বৈশাখ মাসে লখ্যাশোল গ্রামের কৃষ্ণ সেনের নাতি মহেন্দ্রনাথের কাছ থেকে বইটি সংগ্রহ করে ১৮৩৭ সালে ‘বাসুলী মাহাত্ম্য’ সহ প্রবাসী প্রেস থেকে প্রকাশ করেন।[২৪ক] কৃষ্ণসেন রাজার প্রিয়পাত্র ও প্রভাবশালী হওয়ায় যুবরাজ ২য় লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁকে দেখতে পারতেন না। তবে ভক্তিগান, ব্রজবুলি, হিন্দি, সংস্কৃত চর্চার চল ছিল তাঁদের মধ্যে।

এই রাজার সময়ে ব্রিটিশ সেনার ব্যবহারের জন্য প্রশাসনিক ইজারার শর্তে বর্তমান বাঁকুড়া শহরের ১২৫ বিঘা ১১ কাঠা ১০ ছটাক জমি নেয় কোম্পানী শাসকরা।

২১) আনন্দলাল : বলাইনারায়ণের মৃত্যুর পর রাজ্য ভার সামলান পৌত্র (২য় লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র) আনন্দলাল। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৫৭ সালে নিত্যানন্দপুর গ্রামের পরমানন্দ-দাস (বৈদ্য ) “রসকদম্ব” কাব্য রচনা করেন। তাঁর শাসনকালে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয় ও তা দমনে কোম্পানিকে সাহায্য করতে পুরুলিয়ায় ৪০০ পাইক ও একটি কামান পাঠাতে হয়।[২৫] এসময় ছাতনা নগরীর অবস্থা ভাল ছিল বলেই মনে হয়।

আনন্দলালের সমকালীন কবি ছাতনা বাসী নিত্যানন্দপুরের পরমানন্দ-দাস (বৈদ্য) “রসকদম্ব” পুথির সমাপ্তিতে ছাতনা নগরীর প্রশংসায় লিখেছেন, (সূত্র ঃ

প্রবাসী, ষট্‌ত্রিংশ ভাগ, প্রথম খণ্ড)

“তাকোনিবাসস্থ ছাতনা মুনীর নগর সুঠাম।
চারুবর্ণ লোগ নিবসতুহেঁসভেদয়াঅঁরুদান।
তাকোভূপ প্রসিদ্ধ মহী লছমীনারায়ণ রাজ।
জাকোঘরমেবাশলী সদতকরত বিরাজ
রাজা সান্তশূধীরহে ধার্মিক গুণহী অনন্ত।
সন্তগণে প্রতিপালন কিজে দুষ্টজনহি দুরন্ত”

২২) অক্ষয়কুমারী (১৮৬০-৬৩) : আনন্দলালের গুপ্তহত্যা জনিত হঠাৎ মৃত্যুতে রাজ্যের দায়িত্ব ভার যায় রানী অক্ষয়কুমারীর হাতে। কিন্তু এর তিন বছরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হলে রাজ্যের দায়ভার গিয়ে পরে ছোট রানী আনন্দকুমারীর হাতে। মতান্তরে ১৭৫৭ সালে আনন্দলালের মৃত্যু হয় ও সে বছরই সিপাহে বিদ্রোহ দমনে সাহায্য পাঠাতে হয় তাঁকে। তিনি রাজবাড়ী সংলগ্ন মাঠে ১১ জৈষ্ঠ্য (দাগা দিন) গাজন মেলার সূত্রপাত করেন। এটি ‘রানী গাজন’ নামে পরিচিতি পায়। জেলা বোর্ডের রেকর্ডে রাজপরিবারের বামাসুন্দরী দেবীকে মেলার স্বত্বাধিকারী দেখান আছে। মেলা থেকে আয় হত ১০ টাকা। জেলা বোর্ড ও সরকার পেত ১টাকা করে। তিনি ছাতনার কয়েকটি চতুস্পাঠী চালু করেন।

২৩) আনন্দকুমারী (১৮৬৩) : রানী অক্ষয়কুমারীর পরে রাজ্য ভার সামলান আনন্দকুমারী। তিনি সমকালীন কবি মহেন্দ্র সেনকে সাহিত্য সৃষ্টিতে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা দেন। বাসুলী মাতার জন্য সংস্কৃত নতুন মন্দিরের সূত্রপাত ঘটে তাঁর আমলে।[২৬] বিবেক নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটি ভগ্নদশা প্রাপ্ত হলে এই নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৮৭১ সালে।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বরের এক দলিলে দেখা যায় সূর্যাস্ত আইনের থাবা থেকে রাজ্যপাট বাঁচাতে যে মহাজনী ঋণ দিতে হয়েছিল তা শোধ করতে জে ও বি স্কেলের গিসবর্ণ কোম্পানীর কাছে জামিদারী বন্দক রাখতে হয়। ১৮৭২ ও ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে নেওয়া কোম্পানী ঋণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২০০০০ ও ৮০০০ টাকা। এই ঋণের পরিবর্তে ইজারার মেয়াদ ছিল ১৮৭৩ থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত। ইজারার শর্ত অনুসারে জমা ৬১০৭ টাকা ও মালগুজারি ২২৮৭ টাকা বাদ দিয়ে রানীর প্রাপ্য ছিল ৩৮১৯ টাকা ১৫ আনা। ছাতনা পরগণার রাজপরিবারের

দুর্দশা বোঝা যায় ইজারা শর্তে ৯৩৮ নং তৌজিভুক্ত পরগণার ইজারা ছাড়াও মৌরুষ ও প্রজাবলি জমির দখলী স্বত্ব কোম্পানীর হাতে যাওয়া থেকে। আনন্দকুমারী বামনকুলীতে একটি 'হাট' ও চতুষ্পাঠীর পত্তন করেন।

২৪) মহেন্দ্রলাল : আনন্দকুমারীর পরে রাজ্য ভার সামলাতে হয় ভাতুষ্পুত্র মহেন্দ্রলালকে। তিনি ছিলেন সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক।

২৫) হেমেন্দ্রলাল : মহেন্দ্রলালের পর আনন্দকুমারীর সাবালক পুত্র হেমেন্দ্রলাল রাজ্য ভার পান। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রাজবাড়ী সংলগ্ন পঞ্চরত্ন মন্দিরটির নির্মাণকাজ শেষ হয়। হেমেন্দ্রলাল ছিলেন সামন্তভূমের শেষ রাজা। তাঁর পুত্র নাট্যকার ত্রিগুণাসেন ও পৌত্র প্রদীপ এলাকায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। এঁর সময়ে ছাতনা এস্টেট বেগডানলপ কোম্পানীর কছে নিলাম হয়ে যায়। জেলা শাসক, মহকুমা শাসক ও সমাজের বিশিষ্ট জনেরা জমিদারি সমবায় তৈরি করে জমিদারি বাঁচানোর চেষ্টা করলেও তা সফল হয়নি। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তালুকের ইজারা বেগডানলপ কোম্পানীর হাতে চলে যায়।

প্রবাসী পত্রিকায় (ষটত্রিংশ ভাগ, প্রথম খন্ড) একটি সামন্ত বংশ তালিকা ও রাজত্বকাল প্রকাশিত হয়। এটার ভিত্তি ছিল কবি কৃষ্ণ সেনের লিখিত বংশ লতিকা।[২৬ক] সেটি হল,

১) শঙ্খ রায় (১৩০৩/১৩০৪) ২। ভবানী ঝরাইত ৩। দ্বাদশ সামন্ত রায় ৪। জামাতা হামীর উত্তর (১৩৫৩) ৫। পুত্র বীর হামীর (১৪০৪) ৬। ভ্রাতা নিশঙ্কু হামীর (১৪৩৭ খ্রিস্টাব্দ) ৭। পুত্র নৃসিংহ নারায়ণ ৮। পুত্র মোহাস্ত রায় (১৪৫৫খ্রিস্টাব্দ) ৯। পুত্রশঙ্কর নারায়ণ (১৪৮২ খ্রিস্টাব্দ) ১০। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিরিঞ্চি নারায়ণ (১৫১৫খ্রিস্টাব্দ) ১১। রাণী চঞ্চলকুমারী (১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দ) ১২। পুত্র উত্তর নারায়ণ (১৫৫২ খ্রিস্টাব্দ) ১৩।পুত্র জটিল বিবেক (১৬০১ খ্রিস্টাব্দ) ১৪। স্বরূপ নারায়ণ ১৪ক) ভ্রাতা উত্তর নারায়ণ ১৫। ভ্রাতা খঞ্জ বিবেক নারায়ণ ১৬। ২য় স্বরূপনারায়ণ (১৬৩১ খ্রিস্টাব্দ) ১৭। লছমীনারায়ণ (১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ) ১৮। জেষ্ঠপুত্র ৩য় স্বরূপনারায়ণ (১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ) ১৯। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কানাইনারায়ণ ২০। আদালতের রায়ে মধ্যম ভ্রাতা বলরাম নারায়ণ (১৮০৩ খ্রিস্টাব্দ) ২১। পুত্র ২য় লছমীনারায়ণ ২২। পুত্রআনন্দলাল (১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে নিহত) ২৩। রাণী অক্ষয়কুমারী ২৪। রাণী আনন্দকুমারী ২৫। ভ্রাতুষ্পুত্র মহেন্দ্রলাল ২৬। পুত্র হেমেন্দ্রলাল (শেষ রাজা)।

কিছু বিভ্রান্তি ছাড়া দুটি তালিকা অনেকটাই এক। বিশেষজ্ঞ মহেন্দ্র সেন ধারণা

করেন, সংস্কৃত শ্লোকে একটা পর্যায় উলট-পালটা হয়েছে। তাঁর মতে জটিল বিবেকের পুত্র উত্তরনারাণ, অপর পুত্র স্বরূপ নারাণ। শ্লোকে আছে, 'ততোত্তর নারায়ণস্থবিজ্ঞ। ধার্ম্মিক গোবিপ্রসেবামুরক্ত।' এটির সঠিক পর্যালোচনা করলে এই কাল বিভ্রাট এড়ানো যাবে। সম্ভবত নিঃশঙ্কুনারায়ণ রাজপরিবারে প্রথম 'সামন্ত অবনীনাথ' অভিধা গ্রহণ করেন।

## জমিদারি রক্ষার সার্বিক প্রয়াস

ঔপনিবেশিক করভারে দেশীয় রাজন্যবর্গের ভূমিসত্ত্ব একে একে নিলাম হয়ে যেতে থাকে। একই ভাবে বিংশ শতাব্দী দ্বিতীয় দশকে করভার জর্জরিত (দুই লক্ষ টাকা বকেয়া পড়ে যায়) ছাতনা এস্টেটও বেগডানলপ কোম্পানীর কছে নিলাম হয়ে যায়। ছাতনা এস্টেটের কেঞ্জাকুড়া গ্রামের রামানুজ কর সহ বিভিন্ন মহানুভব ব্যক্তির নেতৃত্বে বাসুলী মাতার নামে একটি গণসমবায় গড়ে তুলে এই জমিদারি বাঁচানোর গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। জেলা প্রসাসনও এই ভাবনার শরিক ছিল। তৎকালীন জেলাশাসক গুরুসদয় দত্তকে সভাপতি করে ছাতনা পরগণার দশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত বোর্ড অব ডাইরেক্টর ও প্রজাদের ২৫ টাকা করে শেয়ার দিয়ে মোট দুই-তিন লক্ষ টাকা আদায়ের প্রস্তাব জমা দেওয়া হয় প্রাদেশিক সমবায় মহানির্দেশকের কাছে। পূর্বতন জেলা কালেক্টর ভ্যাস ও মহকুমা শাসক ভূপেন্দ্রনাথের সময়ে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। গুরুসদয় পরবর্তী কালেক্টর ফ্রেঞ্চ ও মহকুমা শাসক সত্যেন্দ্রনাথ এই প্রয়াসের শরিক হলেও, দীর্ঘমেয়াদী এমন ব্যবস্থা সরকারের কাছে মান্যতা পায়নি। কিন্তু প্রয়াস ছিল অভিনব।

## সামন্তভূমের ব্যবসা বাণিজ্য

ছাতনা পশ্চিম ভারত থেকে তমলুক পর্যন্ত প্রসারিত স্থল বাণিজ্য পথের মধ্যে পড়ায় তার কিছু আর্থ-বাণিজ্যিক সুফল ভোগ করতে পেরেছিল। ছাতনার বিখ্যাত বাসুলী মাতা মন্দিরের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসেও এই বাণিজ্যিক অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে। কথিত আছে রাজা শঙ্খ স্বপ্নে দেখেন এক বণিকের শকটে বাহিত প্রস্তর খন্ডের মধ্যেই দেবী বিরাজিত। পরদিন বণিকের কাছে সেই পবিত্র প্রস্তরের সন্ধান মেলে ও স্বপ্নাদেশ মত ছাতনায় দেবী বাসুলীর প্রতিষ্ঠা ঘটে। দেবীর নিত্য ভোগ অন্ন, কলাই ডাল, বিশেষ তরকারী, মাছের ঝোল দেবীর উপজাতীয় তাৎপর্যকে ইঙ্গিত করে।

স্বপ্নাদেশ অনুসারে উত্তর হামীরের সময় দেবীর প্রতিষ্ঠা পূর্ণতা পায়।

সড়ক বাণিজ্য ছাড়াও নদী বাণিজ্যের প্রসারের জন্যে সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে দ্বারকেশ্বর নদী তীরে বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। কৃষি ও কৃষিজ পণ্য, কুটির ও ধাতু শিল্প ছাড়াও লাক্ষা, বনজ ও ভেষজ দব্যাদি, তামাক ও তাম্বুল, ইক্ষু ছিল বাণিজ্যের বড় হিস্যা। কেঞ্জাকুড়া কাঁসা শিল্পের ও রাজগ্রাম-কেঞ্জাকুড়া গামছা-বস্ত্র শিল্পে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল।

১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে কোম্পানী শাসনে জেলার প্রশাসনিক ও সমর কেন্দ্র গড়ার তাগিদে সামন্তভূমের বর্তমান বাঁকুড়া শহর এলাকায় ৬৯ বিঘা ৩ কাঠা জমি সামন্তরাজের কাছ থেকে কেনা হয়। আর ১৮০৮ সালে ২৫০টাকায় আরো ১২৫ বিঘা ১১ কাঠা ১০ ছটাক জমি চিরকালীন ইজারায় নেওয়া হয়। বেনিয়া ইংরাজদের আনুকূল্যে সামন্তভূমের নদী বাণিজ্য শহর রাজগ্রাম লাগোয়া এই নব প্রবর্তিত বাঁকুড়া শহরে বাণিজ্যিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। রাজগ্রামের তন্তুবায় 'দত্ত' ও তাম্বুলি 'কুন্ডু' বংশীয়রা বাঁকুড়া শহরে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারিত করে। ক্রমে এই জেলা শহর অন্যতম প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। বাণিজ্যিক পরিবহনের অন্যতম মাধ্যম ছিল দ্বারকেশ্বর নদীর জলপথ।

এই সব বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধির ফলে ছাতনা রাজ্য আর্থিক ভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ফলে রাজনৈতিক সংকট ও রাষ্ট্রীয় দস্যুতার ক্ষেত্রে ছাতনা আক্রমণের কবলে পড়েছে কখনও কখনও। কোম্পানীর ১৫.০৬.১৭৭৩ সালের ১৪৯ নং প্রতিবেদনে দেখা যায় রাইপুরের দুর্জন সিং বিদ্রোহের রসদ সংগ্রহের জন্য কোম্পানী কুটি ছাড়াও ছাতনা পরগণা, মল্লভূমের বড়হাজারী, মালিয়াড়া, সাহারজোড়া রাজ্য লুণ্ঠন করছেন। ছিল ১৮৩৩ সালের গঙ্গানারায়ণী হামলার অভিঘাত।

ছাতনা পরগণায় মহাজনদের রমরমা ছিল। এমন একজন মহাজন ছিলেন গয়ারাম কর।[২৭]

## ঘাটোয়ালী প্রথা

ছাতনা পরগণায় তেরোটি ঘাট ছিল। ঘাটোয়ালের উপর ছিল সদিয়াল ও সদিয়ালের উপর ছিল দিগার। এই প্রথা ছিল প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে সেবা-ভিত্তিক ভূমি ব্যবস্থা। রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও সন্নিহিত এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার

জন্য রাষ্ট্র নিয়োজিত সুরক্ষা কর্মীরা ঘাটোয়াল নামে পরিচিত ছিল। এরা বেতনভূক ছিলেন না। সেবার বিনিময়ে এরা শর্ত সাপেক্ষে নির্দিষ্ট ভূমির ভোগদখলের অধিকার পেতেন। জেলা মহাফেজখানায় রক্ষিত নথি অনুসারে আলিঝড়া, ঝুঁঝকা ও চক পাহাড়ঘাটা তিনটি ঘাটের কথা জানা যায়। আলিঝাড়া ঘাট ছিল বর্তমান ছাতনার আলিঝাড়া, শালচুড়া, দুহেবেড়া, ফুলবেড়া মৌজা নিয়ে। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে ঘাটোয়ালী ব্যবস্থার পতনের ক্ষণে ঘাটোয়াল ছিলেন শশীভূষণ সিংহ। রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর মতে এখানে সামন্তশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই শশীভূষণের পূর্বজরা এই জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি খন্ডে বন পরিষ্কার করে, জমি হাসিল করে, রায়ত আনয়ন করে, বাঁধ—পুকুর খনন করে হিন্দু ধর্ম শাস্ত্র মতে শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ছাতনা রাজাদের শাসন প্রতিষ্ঠা হলে অধীনস্ত ছত্রী ও সামন্ত নিয়োগ করা হয়। শশীভূষণকে ঘাট প্রহরার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরা ২২ টাকা পঞ্চকী আদায় দেওয়ার শর্তে শালচুড়া ও দুহেবেড়া মৌজার স্বত্ব ভোগ করতেন। এর আগে এই মৌজা দুটির ঘাটোয়ালী অধিকার নিয়ে যা তথ্য পাওয়া যায়, তা হল, ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে ঘাটোয়াল মাধব সিংহ, ১৮৬৭ সালে হারাধন সিংহ ও মাধব-পূর্ব ঘাটোয়াল হিসাবে পারিবারিক তথ্য অনুসারে সাহেব সিংহের নাম পাওয়া যায়। এই ঘাট নিয়ে ১৮৬২ সালে ছোটনাগপুরের বিভাগীয় বিচার কমিশনের কাছে একটি দেওয়ানী মামলা রুজু হয়েছিল। ১৮৮৩ সালের ২৯ শে জানুয়ারী সেই মামলার রায়ে শোভা সিংহকে ১৭৮৯ সাল থেকে ঘাটোয়াল স্বত্বধারী বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়।। শোভা সিংহ ও পূর্বোক্ত সাহেব সিংহ ছিলেন একই ব্যক্তি।

আরেকটি নথিতে ঝুঁঝকা ঘাটের অন্তর্গত বেলাড়া মৌজার মৌরসী পঞ্চকী স্বত্বাধারী ছিলেন বড় কালী রায়ের পূর্বজরা।[২৮] কোম্পানী শাসনে তাদের ৫৯ সিক্কা টাকা আদায়ের শর্তে এই মৌজার অধিকার ও ঘাট পাহারার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯০০ সালে ব্রিটিশ শাসকদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই ঘাটোয়ালরা পুলিশি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে জমিদারের মোকাবরী রায়তে পরিণত হন। সম্পাদিত হয় নতুন পাট্টা —কবুলিয়ত। পঞ্চকী প্রদানকারী দুজন ঘাটোয়াল যে জায়গার দখল ভোগ করতেন তার জায়গীদার হিসাবে ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে অথু রায়-নকুল রায়; ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দে নকুল রায়; ১৮১৩ সালে গনুরাম রায়-অথু রায়; ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে অথু রায়-গোলাপ রায়; ১৮৪৯ সালে ফণী রায়-শিবু রায় ২৯ টাকা ৭ আনা পঞ্চকী মূলে ভোগদখল করত। শেষোক্ত দুইজন ঘাটোয়াল ও বাকিরা জায়গীদার হিসাবে

কাজ করতেন। পরে ছোটকালী ও বড়কালী রায়ের নাম ঘাটোয়াল হিসাবে পরিচিতি পায়। ১৮৮০ সালে গিসবর্ণ কোম্পানী ছাতনার জমিদারির অধীনে ইজারাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। পঞ্চকী অনাদায়ের কারণে বড়কালী রায়ের স্থলে ১৮৮৮ সালের জানুয়ারীতে নেওয়াজ শেখকে ঘাটোয়াল নিযুক্ত করা হয়। তিনি বেলাড়া মৌজার অর্ধাংশ পয়ান ও বাকি অংশ ছোটকালী রায়ের স্থলে দানু শেখ পান ১৮৮৮ সালে। ১৮৯৩ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বরের নথিতে দেখা যায়, গিসবর্ণ কোম্পানীর আবেদন মোতাবেক আবার এই রায় ভাতৃদ্বয় ঘাটোয়ালী দায়িত্ব ফিরে পেয়েছেন। তবে আবার পঞ্চকী আনাদয়ে ১৮৯৬ সালে বড়কালীর স্থলে ইন্দ্রনারায়ণ হালদার ও ১৮৯৭ সালে ছোটকালীর স্থলে মহানন্দ সেনাপতি ঘাটোয়াল নিযুক্ত হন।

আরেক ঘাটোয়াল হিসাবে শুশুনিয়া মৌজার পাহাড়ঘাটা ঘাটে সদর ঘাটোয়াল জরিলাল রায়ের নাম পাওয়া যায়। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ২৭ মাঘ তারাচাঁদ তাঁতি ৫০ টাকা সেলামী ও বার্ষিক ১২টাকা খাজনার শর্তে ২০০ বিঘা জমির পাট্টা ও কবুলিয়ত লাভ করে।

বাঁকুড়া শহরের কানকাটা অঞ্চলে সামন্তভূমের মীনাপুর ঘাট নামে একটি ঘাটের কথা জানা যায়। এই ঘাটের অন্তর্গত ছিল পাটপুর, কেন্দুয়াডিহি, লোকপুর, পার্বতীপুর মৌজাগুলি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে নীলু রায় নামের একজন ঘাটোয়ালের নাম শোনা যায়। তামাক সাজার কাজ করা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় নীলুর প্রতি আনুগত্য ও সেবার কারণে ঘাটোয়ালীর একাংশ হস্তান্তর করেন।

বিভিন্ন সূত্রে থেকে জানা যায় মল্লভূমের মত ভূমরাজ্যে যেমন শক্তিশালী ঘাটোয়ালী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, সামন্তভূমেও একই ব্যবস্থার সূচনা ও প্রসার ঘটে রাষ্ট্রব্যবস্থার অবিছিন্ন অংশ হয়ে উঠেছিল। ইংরেজ শাসনের কিছুকাল এই ঘাটোয়ালী ব্যবস্থা চলতে থাকে। ১৮৮০ সালে গিসবর্ণ কোম্পানী ছাতনা জমিদারির অধীন বেলিয়াড়া ঘাটের ইজারা নেয়। মনে হয় পরগণার বেশ কিছু ঘাটের কর্তৃত্ব এই কোম্পানীর হাতে চলে গিয়েছিল। কারণ ব্রিটিশ নথিতে দেখা যায়, গিসবার্ণ কোম্পানীর সুপারিশের ভিত্তিতে বেশ কিছু ঘাটোয়ালের পুনর্বহাল ঘটেছিল।

## ধর্মীয় পরিমন্ডল

ছাতনার রাজবাড়ির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় জড়িয়ে রয়েছে। এ বাড়ির কুলদেবতা হল দেবী বাসলী। সেই দেবীর পুরোহিত ছিলেন বড়ু চণ্ডীদাস।

তাঁর পরিচয় নতুন করে দেওয়ার নয়। তিনিই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনা করেছিলেন। তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে বাসলী দেবী ও ছাতনার রাজবাড়ি জড়িয়ে রয়েছে।[২৯]

এখানকার রাজবাড়ী সংলগ্ন মন্ডপে দুর্গা পুজো প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছরের প্রাচীন। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের মৃন্ময়ীদেবীর সঙ্গে এখানকার প্রতিমার অনেকটাই মিল রয়েছে। জিতাষ্টমীতে দেবীর বোধন হয়। সন্ধিপুজোয় তোপ ধ্বনি করার নিয়ম।

এ পুজোর আরও একটি বিশেষ নিয়ম হল, এখানে পুজোর শুরুতে রাজ পরিবারের প্রধানের নাম ও পুজোর সাল নতুন কাপড়ে লিখে দেবীর পায়ের কাছে রেখে দিতে হয়। সেই নিয়ম আজও চলে আসছে। পরে, ওই নাম লেখা কাপড় পূর্বপুরুষদের নাম লেখা কাপড়গুলির সঙ্গে এক জায়গায় বেঁধে রেখে দেওয়া হয়। এগুলি খোলার নিয়ম নেই। কেবল রাজারই দেবীকে অঞ্জলি দেওয়ার অধিকার আছে। পাশাপাশি অঞ্জলি নিবেদন করেন কুলদেবী বাসুলীকে।

এখানকার পুজোর অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল 'ডালাদৌড়' ও 'খাঁড়াদৌড়'। রাজাদের সঙ্গে প্রজা প্রথাও উঠে গিয়েছে। কিন্তু রাজবাড়ির পুজোর সেই ঐতিহ্য আজও অমলিন। রাজবাড়ির পুজোয় একটা সময় পর্যন্ত প্রজারা ভেট নিয়ে হাজির হতেন। তবে সে প্রথা এখন আর নেই। তবুও ছাতনা, দুবরাজপুর, কামারকুলি, ঘোড়ামুলি, হাতিশাল প্রভৃতি গ্রামের বাসিন্দারা ডালা ভর্তি খই-মুড়কির নৈবেদ্য সাজিয়ে সন্ধিক্ষণের পুজোয় আসেন। দেবীর কাছে তাঁরা আগে নিজের নৈবেদ্য দেওয়ার জন্য দৌড়ান। যা 'ডালাদৌড়' নামে পরিচিত। এখন এটি বাসুলী মাতার নতুন মন্দির থেকে দুর্গা দালানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে।

প্রতিমা বিসর্জনের সময় রাজপুরুষদের এক সময় ব্যবহার করা তরবারি, ছুরি, ঢাল ইত্যাদি বের করা হয়। সেই সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এলাকার বাসিন্দারা বিসর্জনের শোভাযাত্রায় যোগ দেন। প্রথা হল, বিসর্জনের পর ঘাটে ঘট-নবপত্রিকা রেখে সেই সব অস্ত্র হাতে নিয়ে কুলদেবী বাসলী মায়ের মন্দির পর্যন্ত দৌড়ে যেতে হয়। যা 'খাঁড়াদৌড়' নামে পরিচিত। এখনও বহুমানুষ এই রাজবাড়ির পুজোয় যোগ দেন এসব পুরনো ঐতিহ্যকে চাক্ষুষ করার জন্য। ইতিহাস এখানকার পুজোয় আজও বাঁধা পড়ে রয়েছে। বড়ু চন্ডীদাসের সময় নবমীর দিন পাঁঠা বলি করা হত। এখনও তাই করা হয়। জিতাষ্টমীর দিন থেকে পূজা শুরু হলে নবমী পর্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায়

সেদ্ধ চাল, মুগ ডাল, দুধ, আখের গুড়, কাঁচা কুমড়ো, ঘি আর পাতিলেবু দিয়ে দুর্গাদালানের রান্না ভোগ দেবীকে নিবেদন করা হয়। হয় পান্তাভাত, ন'রকমের পদ সমেত চ্যাং মাছের ঝাল। বিসর্জন হয় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজোর দিন। রাজপরিবারের সদস্যদের বিসর্জন দেখা নিষিদ্ধ। মল্লভূম ও সামন্তভূমের দুর্গাপ্রতিমার মধ্যে সাদৃশ্য আছে। চৌকো চালার উপরের দিকে আছে তিলক চিহ্নধারী সাদা সিংহের উপবিষ্ট শিব, উপরে দু'পাশে লক্ষ্মী-সরস্বতী, নীচের দু'পাশে গণেশ-কার্তিক। রাজপরিবারের মতে শৈব-শাক্ত সামন্তভূমে দুর্গা আরাধনা শুরু হয়েছিল বিবাদমান মল্লভূমের সাথে মৈত্রীচুক্তির অনুষঙ্গে। মৃন্ময়ীর আদলে দুর্গাপূজা শুরু তার অন্যতম শর্ত।[৩০]

মল্লভূম ও সামন্তভূমসীমান্তবিরোধ ও ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বীর হাম্বির-নৃশঙ্কু নারায়ণের যুদ্ধের পর এক্তেশ্বর সীমান্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা ও শান্তিচুক্তির অনুষঙ্গে মল্লভূমের পটদুর্গার অনুকরণে ছাতনায় দুর্গামূর্তিপূজা প্রচলন হয়। তবে বাসুলী মায়ের পূজায় বলিদান বন্ধের বৈষ্ণীয় আবদার শাক্তসামন্তরাজ মেনে নেননি। ১৮২১ সালে রানী আনন্দকুমারী এখানে স্থায়ী দুর্গামন্ডপ তৈরি করেন। অরুনাভ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণাপত্রে (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩) এই তথ্য সন্নিবেশিত করেছেন। প্রাণঘাতী যুদ্ধের স্মৃতি বেঁচে আছে পাশের গ্রাম নাম মানুষমুড়া, মুড়াকাটা, মাথাকাটা, বাঁশী, আড়ালবাঁশী প্রভৃতি গ্রাম নামের মধ্যে। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের মতে প্রথম সামন্তরাজা শঙ্খ রায়ের রাজধানী ছিল বারবাখড়া (ধনাগারের জন্য স্থানটি ধনযখ নামে পরিচিত, অন্যমতে বাহুল্যনগর থেকে পূবে ছাতনায় রাজধানী স্থানান্তরিত হয়), রাজা ভবানীর রাজধানী ছিল ব্রাহ্মণকুলি ও সীমান্ত গড়ভোলা। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সাথে ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর ১৬৭৭২১ একরের ছাতনা পরগণার ভূমিরাজস্ব চুক্তি হয়েছিল ২১৪৪ টাকায়। যে পরগণার ভগ্নাবশিষ্ট শেষ বিপন্ন রাজা হেমেন্দ্রলাল (হেমরাজা) ১৯২১ সালে সিংহাসন আরোহণের পর কলকাতার মিশ্রপরিবারকে বিক্রি করে দেন। এরপরের প্রতীকী রাজা ত্রিগুণাপ্রসাদ (ছোটরাজা), রানী আশালতা, রাজভ্রাতা নগেন্দ্রলাল(ছকুরাজা), তৎপুত্র প্রদীপ দুর্গাপূজার সাবেকি রীতি অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এই পূজার বৈশিষ্ট্যগুলি হল জিতাষ্টমীর বোধন নবম্যাদি কল্পারম্ভ, লবণ ছাড়া চাল-মুগ-কুমড়া-ছানা- পাটালি-ঘি-পাতিলেবুর রান্নাভোগ, নবমী রাত্রের আমিষ চ্যাংমাছের ভোগ (উল্লেখ্য বসুলী মায়ের নিত্যভোগ মদ-মাংস ও বাৎসরিক পূজায়

বিরিকলাইয়ের ডাল ও পোড়া চ্যাংমাছ), দশমীর সকালের বাসিপান্তা, নবপত্রিকা প্রবেশ থেকে 'জাগর' প্রদীপজ্বালিয়ে রাখা, রাঢ়ী ব্রাহ্মণ দেওঘরিয়াদের দ্বারা পালা-পার্বণ পূজা, পূজক রাজার বিবরণ-খরচ কাগজে লিখে রাজ বাড়ীর গোপন 'মোটগয়না' পুটুলুতে ঢোকানো, ছড়িদারের হাঁকের সাথে অষ্টমীর সন্ধিক্ষণে রাজার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান। পুষ্পাঞ্জলির পর রাজা সংকেত দিলে কৌলিকরা (কামার কুলির বেনে, দুবরাজপুরের ব্রাহ্মণ, নানুরের বাগানে বাসুলী মূর্তি 'নোড়া' হিসাবে ব্যবহারকারী বেনে পরিবার) মাথায় ডালা নিয়ে রাজদরবার থেকে মন্ডপ পর্যন্ত দৌড় লাগায়। এটি 'ডালাদৌড়' নামে পরিচিত। আগে রাজবাড়ীর পেছনে ও সিনেমাতলার অগ্নিকোণে ইন্দ্রকুঠি ডাঙ্গায় দুর্গাপূজা ও ইন্দ্রধ্বজ পূজার সময় রাজদরবার ও আসর বসত। বিসর্জনের প্রাক্কালে 'রাজাভবানীকে হত্যা করতে বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাকারী বারউপজাতীয় সর্দারের ব্যবহৃত বারটি খঞ্জর' নিয়ে পুকুরঘাট থেকে বাসুলি মন্দির পর্যন্ত 'খাঁড়াদৌড়' শুরু হয়। রাজাদের সামরিক কর্তব্য পালন করতেন কুম্ভকার 'খাউয়াস' পরিবার (খাউয়াসরাজ প্রদত্ত উপাধি ও সামরিক কর্তব্য পালনের জন্য তেঘরি, আমাফুঁদা, কামাকুলি মৌজা ও গুড়পুতা মৌজার খাওয়া মতিবনের স্বত্ব পেয়েছিলেন রাজার কাছ থেকে)। পানসজ্জা পেশা 'পানখাবাস' থেকে এই নাম উৎপন্ন হওয়ার কথা বলেছেন রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী। ছাতনা থেকে ঘোড়া মৌলিগ্রামে স্থানান্তরিত হয়ে যাওয়া খাউয়াস পরিবার পরম্পরাগত ভাবে অষ্টমীর দিন রাজ পূজায় ডালা দিতে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে দাঁড়ান অন্ত্যজ ধুন্যা সম্প্রদায়ের কাছ থেকে শীতল ডালার কিছু অংশ নিয়ে থাকে। তাছাড়া এদেরকে নবমীর বলির জন্য দিতে হয় একটি ছাগল। বিজয়ায় এদের রাজা পানের খিলি উপহার দিতেন। সন্ধিপূজায় তোপদাগা, মহানবমীতে শতবলি, বিজয়ায় রাজার হাতি-ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে শোভাযাত্রার বিষয়গুলি অবশ্য এখন বন্ধ হয়ে গেছে। এই প্রাচীন প্রথাগুলির অংশ হিসাবে মৌলেশ্বর শিবের গাজন উপলক্ষে ব্রাহ্মণ সেবাইতরা বাদ্যভান্ড সহকারে ছাতনার রাজ রাজবাড়ীতে এসে 'সিধা' দিতেন।

শঙ্খ রায়োত্তর ব্রাহ্মণ্য শাসনের অবসানে কুম্ভকার ও অন্ত্যজ শ্রেণীর অবদান রাজানুকূল্যে দুর্গা পূজার উপাচার ও প্রকরণের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। বারো সাঁওত সর্দারের যে বারো খঞ্জর দিয়ে ব্রাহ্মণ রাজাকে উৎসাদন করে, আজও সেই বারো অসির পূজোর মধ্য দিয়ে প্রতিমা আরাধনার চল অব্যাহত। ব্রাহ্মণ নিধনের অব্যবহিত পরে যখন সাঁওত সর্দারদের খোঁজ চলছিল, মোলবোনা-রামনগরের

কুম্ভকার পরিবারে আত্মগোপন করে ও স্বজাতির মত নিজেদের সাথে পংক্তি ভোজ করিয়ে তাদের রক্ষা করে। এই কুম্ভকার সমাজকে আজও সম্মান জানানো হয় পূজা প্রকরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ মেনে। রথীন্দ্রমোহন তাঁর বাঁকুড়া জনের ইতিহাস সংস্কৃতি গ্রন্থে বলেছেন[৩১], "কুম্ভকারের গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা সংক্রান্ত জনশ্রুতির ঐতিহাসিক সত্যতা অনস্বীকার্য। ছাতনায় 'খাউয়াস' পদবীধারী একটি কুম্ভকার পরিবার আছে। 'খাউয়াস' ছাতনা রাজপ্রদত্ত উপাধি। আদিতে এ পরিবারটি তাম্বুল চর্বণের জন্য পান সাজত। এজন্য এ পরিবারের পদবী নাকি এক সময়ে ছিল পান-খাবাস। একটি পরিবার কালক্রমে দশটি পরিবারে পরিণত হলে সাতটি পরিবার ছাতনা থেকে উঠে গিয়ে অদূরবর্তী ঘোড়ামৌলি (ঘোড়ামুল্লী) নামক স্থানে নূতন বসতি স্থাপন করে। ছাতনা ও ঘোড়ামূলীর খাবাস পদবীধারী কুম্ভকারদের আদিতে সামরিক কর্তব্য পালন করতে হত। এজন্য বাসুলীর বার্ষিক পূজার অষ্টমী দিনে খাবাসদের শীতলডালা দিতে হয় এবং নবমীর দিন ঘোড়ামূলীর খবাসদের বলির জন্য একটি ছাগ দিতে হয়। ডালা শীতল পৌঁছাতে যাওয়ার আগে তরবারি পূজা করতে হয়। খাবাসদের আদি পুরুষের সামরিক কর্তব্য পালনের জন্য খাবাস পরিবার রাজ প্রদত্ত তেঘরি, আমাফুঁদা ও কামাকুলি মৌজা ও গুড়পুতা মৌজার খাওয়ামতি বনের মালিকানা-স্বত্ব ভোগ করত। এ প্রসঙ্গে একটি কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় হলো যে, বার্ষিক পূজার সময় অষ্টমী পূজার দিন খাবাসগণ ডালা শীতল নিয়ে রাজবাড়ী সংলগ্ন বাসুলী মন্দিরে যাওয়ার সময় পথিপার্শ্বে দন্ডায়মান তথাকথিত অন্ত্যজ ধুন্যা সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেদের শীতলের কিছু অংশ দিয়ে থাকে।" রাজ পরিবারের পূজা ও অনুষ্ঠান পালন করতেন দেওঘরিয়া পদবাধারী রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, স্মৃতি বিধানে।

## মল্লভূমের সাথে বিরোধ ও ফলাফল

ধর্মীয় অনুষঙ্গে দুই দু'বার মল্লভূম ও সামন্তভূমের বিরোধ বেঁধেছিল। প্রথমবার চন্ডীদাসের মল্লভূমের আগমন নিয়ে। দ্বিতীয়বার ধূমায়িত হয় সীমান্তভূম ও মল্লভূমের সীমান্ত বিরোধ। কথিত আছে এই সীমান্ত-সংক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তি করার জন্য স্বয়ং শিব ধ্যানে বসেছিলেন এবং এক্তেশ্বরের মূর্তিতে দুই রাজ্যের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দণ্ডায়মান হন। দুই রাজ্যের সীমানায় সেই মিত্রতার স্মরণে নির্মাণ করা হয় এক্তেশ্বর মন্দির। এক্তেশ্বর মন্দিরে পূজিত দেবতা হলেন একপদেশ্বর।[৩২] এই ধরনের শিবমূর্তি অন্য কোনও শিব মন্দিরে দেখা যায় না। বেগলারের বিবরণে

মাকরা পাথরের এই মন্দিরটির বিস্তৃত খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে। এর সাথে বেলেপাথর ও ইঁটের কাঠামোও সংযুক্ত হয়।

এই ভাবে ছাতনা রাজ্যের বাসুলী মন্দির, মৌলেশ্বর শিব মন্দির, এক্তেশ্বর মন্দিরের সাথে মিশে আছে পৌরাণিক মিথ, জনশ্রুতি আর ইতিহাস। সেই মিশ্রণের নির্জাস এই আখ্যান, সামন্তভূমের ইতিহাস।

## পতনের সালতামামি

রাঢ় বাঁকুড়ার সবচেয়ে প্রাচীন ভূমরাজ্য সামন্তভূম বা ছাতনা পরগণার বার্ধক্য ঘনিয়ে আসে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। বিস্মরণের খাদের অভিমুখে উৎরাই পথে দ্রুত এগিয়ে চলে প্রাচীন রাজ বংশটি। ইংরেজ অনুগত রাজা আনন্দলালের ১৮৫৭ সালের নভেম্বরে (২৬ শে আশ্বিন) নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হলে পতনের লক্ষণগুলি ফুটে উঠতে থাকে।[৩৩] শাসনের ভার পাওয়া বড় রানী অক্ষয়কুমারী পাঁচ বছরের মধ্যেই (১৮৬১ বা ১৮৬২ সালে) ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর ক্ষুদ্র রাজত্বকাল ছিল আর্থিক দুর্দশা বিড়ম্বিত। অক্ষয়কুমারীর আমলে রাজভ্রাতা মুকুন্দলাল ছাতনা রাজ এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। এ সময় তিনিই রাজ্যের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। রানীকে অন্ধকারে রেখে অমিতব্যায়ী ও বেহিসেবী জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে রাজকোষ শূন্য করে তোলেন। ঋণজালে রাজ্যের দুর্দশা অন্তহীন হয়ে দাঁড়ায়। রানীর এমন অবস্থা হয় দৈনিক 'উথনা' (দৈনিক খরচে প্রাপ্য) ১৪-১৫ টাকাও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। নিয়মিত নিজের খাদ্য সংস্থানে অপারগ রানী কোম্পানীর কাছে রাজ্য ক্রোক করে নেওয়ার দরখাস্ত করেন! ১০-১২ বছরের জন্য জমিদারি বাজেয়াপ্ত অবস্থায় ছিল বলে জানা যায়।[৩৪]

অক্ষয়কুমারারীর মৃত্যুর পর রাজ্য ভার পান ছোট রানী আনন্দকুমারী। নিরক্ষর রানীর(নাগপুর থেকে হিন্দি শিক্ষিকা আনা হয়েছিল হিন্দি সাক্ষরতার উদ্দেশ্যে) অজ্ঞতার সুযোগে জমিদারি সম্পদ ও জমি লুঠে মেতে ওঠে এক শ্রেণীর আমলা ও আত্মীয়। রানী আনন্দকুমারীর পর্দানশীনতা প্রশাসনিক সংবাদ প্রপ্তি ও কঠোরতার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। পূর্ব ও দক্ষিণমুখী খড়ের চালাযুক্ত বৈঠকখানায় অবগুণ্ঠিতা রানী রাজদরবার পরিচালনা করতেন দরজায় টাঙ্গানো চিকের আড়াল থেকে। রাজবাড়ীর অন্দরে প্রায় কারও প্রবেশাধিকার ছিল না। কেবল দেওয়ান অন্দরমহলে ঢুকতেন অভিষেক উৎসব উপলক্ষে বছরে তিনবার সেলামী-নজরানা দিতে। দেওয়ান

ও  অত্যন্ত নিকটাত্মীয় ছাড়া অন্দরমহলে আর আসতেন গুরু ও বাসুলী পূজারী। বাসুলীর পূজারী বা পুরোহিত দেবীর গহনা  রোজ অন্দর মহলে রাখা লোহার সিন্দুকে একবার সকালে বের করা ও ঢোকানোর জন্য প্রবেশ করতেন। মাঝে দেবীর প্রসাদ রান্নাঘরে রেখে আসতেন। অন্দরমহলে যাতায়াত ছিল  ১৯৮৯ বা ১৮৯০ সাল থেকে রানীর মৃত্যুদিন ১৯১১ সালের এপ্রিল (পয়লা বৈশাখ) পর্যন্ত তাঁর পনেরো টাকা বেতনের দেওয়ান হিসাবে কাজ করা ঈশ্বরচন্দ্র বক্সীর। ঈশ্বরচন্দ্রের মতে রানীর না ছিল জমিদারি চালানোর জ্ঞান, না আর্থিক আদান প্রদানের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা।[৩৫] তবে ব্যক্তিগত অপছন্দ থাকলেও কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয় ফকির দত্তকে মোহরার নিযুক্ত করে তিনি প্রজ্ঞার পরিচয় রেখেছিলেন। ১৮৭০-১৮৯০ সালের মধ্যে ফকির দত্তের প্রভাবে ছাতনা পরগণায় নীল চাষের প্রসার ঘটে।[৩৬] কিছু ক্ষেত্রে তা রাজস্ব বৃদ্ধিতে তা সাহায়ক হয়। এসময় রাজপুরোহিত ছিলেন দেওঘরিয়া পরিবারের কুঞ্জবিহারী। পূজার জন্য তাঁর দৈনিক প্রাপ্য ছিল তিন সের চাল। তাছাড়া ছিল রাজ প্রদত্ত দশ-বারো বিঘা চাকরান জমি। দেবীর পূজার প্রয়োজনীয় শ্যামার্ঘ, চাল, চিড়া, গুড়, ধান, ছাগ, নগদ আসত ইজারা মহলের জমিভোগী নির্দিষ্ট রায়তদের কাছ থেকে। অনন্দকুমারীর সময়কাল ছিল অবিশ্বাস ও অনৈতিকতা বিড়ম্বিত অমনিশা। রানীকে অন্ধকারে রেখে রাজ তহবিল লুঠের বিষয়ে জড়িত ছিলেন খাজাঞ্জী বিহারীলাল সিংহ, রানীর দুই ভাই মালামী নিবাসী বিহারীলাল সিংহ ও হরিহর সিংহ।[৩৭] রাজভ্রাতা লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহদেবের দুই ছেলে বিনন্দলাল(ছোট রাজা), উপেন্দ্রলাল এবং কনিষ্ঠ রাজভ্রাতা মুকুন্দলাল এস্টেটের নির্ধারিত খরপোষ পেলেও রাজকোষ লুণ্ঠনে অকৃপণ ছিলেন। অমিতব্যায়ী ও নেশাখোর এই তিন জন গাঁজা সেবনে নেশাগ্রস্থ থেকে ও টাকা ফুরিয়ে গেলে প্রজাদের কাছে ‘মাঙ্গন’ বা দত্তদের কাছে ধার নিয়ে দুর্নাম কুড়োতে থাকতেন। রানীর অপছন্দের কারণে ১৮৮০-৮১ সালে মুকুন্দপুত্র মহেন্দ্রলাল রাজভবন ত্যাগ করে গিসবোর্ণ কোম্পানীর জামতাড়া কুঠিতে চাকরী নিয়ে চলে যান ও পাঁচ-ছয় বছর সেখানে অতিবাহিত করেন। রানীর মৃত্যুর পর হেমেন্দ্রলাল রাজা হন। রানী অনন্দকুমারীর সময়েই সামন্তভূম রাজশক্তির জীবনীশক্তি নিঃশেষত হয়ে পড়েছিল। রাজপরিবারের অনাচারের অংশ হিসাবে বিনন্দ, উপেন্দ্র, মুকুন্দলাল রাজবাটীর বারান্দায় বসেই গাঁজা ও গুলি সেবন করতেন। অনিয়ন্ত্রিত খরচ ও নেশার টাকা সংগ্রহে প্রজাদের কাছে ভিক্ষা ও ধার করতেও এরা পিছপা হত না। শুধু তাই নয় মুকুন্দ-বিনন্দ গিসবর্ণ কোম্পানীর কাছ থেকেও ঋণ নিতেন ও

কোম্পানীর অনুকূলে দলিলও সম্পাদন করতেন। খাস দখলী কেঞ্জাকুড়া সহ অন্যন্য মৌজা এই ঋণগ্রস্ততার মাশুল হিসাবে তাঁরা বন্ধক দিতে থাকেন। এমনকি বিনিন্দলাল-মুকুন্দলাল রানীর অগোচরে রাজগ্রাম (ইলমবাজার)-এর চিন্তামণি দত্ত ও ব্রজলাল দত্তের কাছ থেকে সাড়ে সাত হাজার টাকা কর্জ নেন, ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে(২০শে ভাদ্র)। এ কথা রানীর কানে যাতে না যায়, তার জন্য পাটপুরের রাস্তায় দেওয়ান ঈশ্বর বক্সীকে প্রহার করার হুমকি দিয়ে রাখেন।[৩৮] ১৮৭৯-৮০ সালের এই ঘটনার নথিও পাওয়া যায়। এই দুই ভায়ের দুর্নীতিমূলক কাজের পাশাপাশি তহবিল রক্ষক বিহারীলাল ও রানীভ্রাতা হরিহরের রাজকোষের তছরূপ রাজপরিবারের আর্থিক সক্ষমতায় পচন ধরিয়ে দেয়। যদিও পর্দানশীন রানীকে ঈশ্বর বক্সী সাবধান করার মানসে ১৮৯৪ সাল নাগাদ নাপতানী রঙ্গের মাধ্যমে খবর পাঠিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও দুর্নীত ও অনাচার রুখতে রানীর কোন সক্রিয়তা দেখা যায়নি।[৩৯] অবশ্য ঈশ্বর বক্সীর বিশ্বাসযোগ্যতা সন্দেহাতীত ছিল না, কারণ রানীর নাম করে রাজগ্রামের মহাজন বিজয় দত্তের কাছে ধার করার নথিতে সই ছিল তাঁর ও বিহারীলালের। শুধু তাই নয়, এই দুইজনের তদারকিতে ছাতনায় 'লক্ষ্মীনারায়ণপুর হেল্পিং ফান্ড কোম্পানী' নামে একটি চিডফান্ড গড়ে ওঠে। শেয়ার হোল্ডারদের কাছ থেকে ৫০০০০-৬০০০০ টাকা তুলে ডিরেক্টররা সে টাকা আত্মসাৎ করেন। ডিরেক্টররা ছিলেন বিহারীলাল সিংহ(রানীর তহবিল রক্ষক ও কোম্পানীর সচিব), রামজীবন কবিরাজ, জানকীনাথ বক্সী, মহেশচন্দ্র দেওঘরিয়া, উমাচরণ দেওঘরিয়া, মহেন্দ্রলাল দেওঘরিয়া, গোপেশ্বর দেওঘরিয়া, গঙ্গানারায়ণ পালিত সহ একুশ জন। শেয়ার হোল্ডারদের দায়ের করা ফৌজদারী মামলার প্রেক্ষিতে জেলাশাসক বি দে ১৮৯৯ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর ছাতনায় এসে তদন্ত করে কোম্পানী গুটিয়ে টাকা ফেরতের আদেশ দেন। বিহারীলালের কাছে ২৫০০ টাকা ও অন্যান্য ডাইরেক্টরদের কাছ থেকে ১৫০০ টাকা উদ্ধার করা হয়।[৪০] জেলাশাসকের নির্দেশ মত সমুদয় অর্থ পীতাম্বর দরিপা-বৈকুণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ১৮৯৯ সালের শ্রাবণ মাসে শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বিলি করা হয়। বিহারীলালকে এজন্য রাজগ্রামের দত্তদের কাছে হাত পাততে হয়েছিল। ছাতনা রাজ্যকে জামিন রেখে তিনি পাঁচ-ছয় হাজার টাকা বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করেন। এ ভাবে একের পর এক দুর্নীতির দুর্বিপাকে পিষ্ট ছাতনা রাজপরিবার সরকারকে দেয় রাজস্ব-রোড সেস প্রদান, ক্রমবর্ধমান ঋণভার লাঘব করতে ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই পৌষ গিসবর্ণ

ও কোম্পানীর ম্যানেজার জে ও বি স্কেলের কাছে ৬১০৭ টাকা খাজনা দেওয়ার শর্তে জমিদারির ইজারা পাট্টা দিতে বাধ্য হয়। তাছাড়া বকেয়া ঋণ মেটাতে আরো তিন হাজার টাকা কর্জ নিয়ে কোম্পানীর অনুকূলে 'উপভোক্তা বন্ধক দলিল' সম্পাদন করে। ১৮৭৯ সালের ১০ ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই দেনার দায় গিয়ে দাঁড়ায় ত্রিশ হাজার টাকা। কোম্পানী এটি আদায়ের জন্য মামলা করতেও বাধ্য হয়। ১৮৮৫ সালের ১০ই ডিসেম্বর কোম্পানী ইজারা চলাকালীনই রাজগ্রামের দত্তদের কাছে আর একটি ঋণের পরিবর্তে বন্ধকী দলিল সম্পাদন করে। যদিও এসব করে পরিবারটি পরিত্রাণ পাচ্ছিল না। কোম্পানীকে বার্ষিক ৬৪১২ টাকায় জমিদারি ইজারা দেওয়া হয়েছিল। রাজ সরকারকে দেয় ছিল ২২৮৭ টাকা ১ আনা রাজস্ব ও সাথে ৩০০০-৩৬০০ টাকা রোড সেস। বাকিটা ছিল কোম্পানীর লাভ। ১৮৯৮ সালে সরকার রানী জমিদারি ফিরে পেলেও সমলয়ে ও সময়ে রাজস্ব পরিশোধের ব্যর্থতার কারণে ১৮৯৯ সালে সরকার সেজোয়াল নিয়োগ করে। বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয় জমিদারি। অবশ্য মাস দুয়েক পরেই প্রজাদের অনুরোধে এই আদেশ তুলে নেওয়া হয়। ১৯০২-১৯০৫ সালে মধ্যে আয়োজিত ঘাটোয়ালী বিলোপ সমীক্ষা শুরু হয় ও এর জন্য ব্যায়িত ১৫০০ টাকা ছাতনার রানীকেই বহন করতে হয়েছিল। ঘাটোয়ালী ব্যবস্থার বিলোপের পর রানীকে ১০-১২ টি কবুলিয়ত স্বীকার করতে হয়েছিল। আর দিতে হয়েছিল ২০০ টির মত পাট্টা। ১৯০২-০৩ সালে যেখানে এস্টেটের রাজস্ব সংগ্রহ ছিল ১৮০০০ টাকা, ঘাটোয়ালী প্রথা বিলোপের পর তা দাঁড়ায় ২৪০০০-২৫০০ টাকা।[৪১] এসময় রানীর দেবসেবা সহ অন্যান্য খরচ বেড়েছিল ১০০ টাকা থেকে ২০০ টাকা। ১৯০৭ সালে আদায় গিয়ে দাঁড়ায় রাজস্ব খাতে ২১০০০-২২০০০ টাকা ও রোড সেস বাবদ ৭০০০-৭৫০০ টাকা। কিন্তু অযোগ্যতার সাথে রাজ্য পরিচালনার কারণে ঋণভার ও দায় ক্রমেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। রানীর উথনা কমে দাঁড়ায় ৫-৭ টাকায়। জানা যায় ছাতনার পীতাম্বর দরিপার গোলদারি দোকান থেকে রানী ধারে জিনিস কিনতেন! ঋণ নিতে হয় মহাজন বৃন্দাবন দত্তের কাছেও।

১৯০৪ সালের ১৫ই নভেম্বর রানীর রাজস্ব প্রদানে অক্ষমতা উপলব্ধি করে ব্রিটিশ প্রশাসন সিমলাপাল, খাতড়ার সাথে ছাতনা জমিদারিও ক্রোক করে নেন। এসময় এস্টেটের রাজস্ব আদায় বাবদ খরচ ছিল রাজস্বের ১০ শতাংশ অর্থাৎ দুই হাজার টাকার আশেপাশে। মাসিক ৭৫ টাকা বেতনের দুইজন তহশীলদার, ২৫

টাকা বেতনের দুই জন নায়েব তহশীলদার, ৭ টাকা বেতনের ৪ জন পিয়ন নিয়োগ করা হত এই বরাদ্দের মধ্যে। মুখ্য তহশীলদারেরা ৯০ শতাংশের বেশি কর আদায় করতে পারলে সেই আদায়ের ২ শতাংশ কমিশন হিসাবে পেতেন। ছাতনার রাজারা নিম্নবর্ণীয় ও মুসলিমদেরও তহশীলদার হিসাবে নিয়োগ করতেন। বাদুলাড়া জামা মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা কিয়ামদী মিদ্যার পৌত্র ও সাহেবজানের পুত্র ইব্রাহিম ছিলেন এমন এক তহশীলদার। কিয়ামদী ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ শে শ্রাবণ রানী আনন্দকুমারীর কাছ থেকে বাদুলাড়া গ্রামের পাঁচ আনা ছয় গন্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি অংশ মোকাবরী স্বত্ত্ব স্থিত প্রজানি স্বত্বে ক্রয় করে নেন। এছাড়াও আরো ৩৩৭ বিঘা ৯৫ শতক জমি নিয়ে মোট ১০১৪ বিঘার ওয়াকফ সম্পত্তি তৈরি করেন। ১৮৮২ সালে এর থেকে আয় ছিল ৬০০ টাকা। এই জমির ৯ একর ৩৬ শতক ছিল নতুনগ্রাম মৌজায়। বাদুলাড়া থেকে আরেক জন এমন তহশীলদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি হলেন নেসারুদ্দিন। তাঁর পৌত্র ও গৌসী মিদ্যার পুত্র হেরাসতুল্লাহ ১৯৪৮ সালের ৬ ডিসেম্বর ৪৫৭৩ নং দলিল মূলে দশ বিঘা জমি কিনে কিয়ামদী ওয়াকফ সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন।

এসব সত্ত্বেও ১৯১২ সালে কর আদায় কমে দাঁড়ায় ১১০০০-১২০০০ টাকা। গিসবর্ণ কোম্পানীর থেকে আসত ৮০০০ টাকা, শ্রীমন্ত কুমারের কাছ থেকে ২০০ টাকা, রাজগ্রামের দত্তদের কাছ থেকে ২০০০ টাকা। গিসবর্ণ সরাসরি সরকারকে দিত ২০০০ টাকা। রানী আনন্দ কুমারী এই গুরুতর আর্থিক সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে ১৯১১ সালের ১৩ই জানুয়ারী তৃতীয়বার রাজগ্রামের মহাজন ফকির দত্তর কাছ থেকে ভাবী রাজা মহেন্দ্রলালের সম্মতি-স্বাক্ষর মোতাবেক আচুড়ি সহ ১১ টি মৌজা বন্ধক দিয়ে ঋণ গ্রহণ করেন। এর আগে ১৯০৫ সালের জানুয়ারী মাসে প্রথম ঋণ নিয়েছিলেন ২৪৯৯ টাকা। ১৯০৯ সালের ১২ই জানুয়ারী মাসে মাসিক শতকরা ১ টাকা সুদে দুশো টাকা ধার করেছিলেন। উক্ত বন্ধক দেওয়া আচুড়ি মৌজা আকবরের নিয়মে ইতিমধ্যেই পাটপুরের উদ্ধবচন্দ্র পাল-দিগম্বর পালকে চারটি ত্রৈমাসিক সমান ৪৬৬ টাকা ১১ আনা ৫ পাই কর আর ৮৮ টাকা ১ আনা সেসের কিস্তিতে বন্দোবস্ত দেওয়া ছিল।[৪২] এই রকম বিবিধ জটিলতার মধ্যে বিপন্নতার চোরাবালিতে নিমজ্জিত রানীর লোকান্তর ঘটে ১৯১১ সালের ১ লা বৈশাখে। এর পরের রাজা মহেন্দ্রলাল ও তারও পরের হেমেন্দ্রলাল, ত্রিগুণাপ্রসাদ ছিলেন নেহাতই খেতাবী রাজা। একটি প্রাচীন রাজপরিবারের ক্ষীণ স্রোতের অস্তিত্ব জানান দিতে।

তথ্যসূত্র :


১. অশোক মিত্র, পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ৪র্থ খণ্ড, দিল্লী, ১৯৭৪, পৃঃ ৬৪ **(with reference to Descriptive Ethnology of Bengal, E T Dalton)**

১ক. ও'ম্যালীর জনশ্রুতি নির্ভর বিবরণে উল্লেখ করেছেন বাসুলীর স্বপ্নাদেশের ফলে শঙ্খ রাজা প্রতিষ্ঠিত রাজধানী বাহুলীনগর বা বাসুলী নগর থেকে পূর্বের ছত্রিশনগর বা ছাতনায় সরিয়ে আনা হয়। শঙ্খকে আরো স্বপ্নাদেশ দেন, পৌত্রের (উত্তর হামীর রায়) শাসনকালে তিনি ছাতনার বোলপুকুরে আবির্ভূত হবেন।

২. **F W Robertson, Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Bankura, Calcutta, 1926, p.9-10.**

৩. **L S S O'Malley, Bankura District Gazetteers, Calcutta, 1908, p. 144.**

৪. **F W Robertson, Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Bankura, Calcutta, 1926, p.64.**

৫. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, বঙ্গ সংস্কৃতিতে প্রাকবৈদিক প্রভাব, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ২০০৬, পৃঃ ৮৭।

৬. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০ (পুনঃমুদ্রণ ২০১০), পৃঃ ৪৬।

৭. **Amiyakumar Bondyopadhyaya, Bankura District Gazetteers, Calcutta, 1968, p. 531-32.**

৮. **L S S O'Malley, Bankura District Gazetteers, Calcutta, 1908, p. 538.**

৯. তরুণদেব ভট্টাচার্য্য, পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ১৫১।

৯ক. চণ্ডীদাসের (১৩২৫-১৪০০*) সমকালীন ছিলেন উত্তর হামীর রায়। কৃষ্ণদাস গাতাইতের ছাতনার রাজবংশ পরিচয় অনুসারে তাঁর রাজকাল ১৩৫৩-১৪০৪। অন্যদিকে বেগলারের মতে ১৫৫৪ সালে তিনি রাজত্ব করতেন। হয়তো একই নামে ইনি অন্য কোনো রাজা ছিলেন। চণ্ডীদাসের সময় মল্লভূম সমেত ওড়িষ্যা ফিরোজ শাহ তুঘলক দ্বারা আক্রান্ত হয়। পদ্মলোচন শর্মা ও রাধানাথ দাসের ভাষ্যে ছাতনা রাজের আক্রান্ত হওয়ার বার্তা আছে।

১০. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০ (পুনঃ মুদ্রণ ২০১০), পৃঃ ৪৫।

১১. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, বঙ্গ সংস্কৃতিতে প্রাকবৈদিক প্রভাব, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ২০০৬, পৃঃ ৪৬।

১২. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সঃ), প্রবাসী, ২৬ ভাগ, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৩৩।

১৩. অশোক মিত্র, পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ৪র্থ খণ্ড, দিল্লী, ১৯৭৪, পৃঃ ৬১।

১৪. অশোক মিত্র, পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ৪র্থ খণ্ড, দিল্লী, ১৯৭৪, পৃঃ ১৩০।

১৫. অশোক মিত্র, পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ৪র্থ খণ্ড, দিল্লী, ১৯৭৪, পৃঃ ৬৫।

১৬. **Amiyakumar Bandyopadhyaya, Bankura District Gazetteers, Calcutta, 1968. p.91.**

১৬ক. **Amiyakumar Bandyopadhyaya, Bankura District Gazetteers, Calcutta, 1968. p.91.** সালের ফাল্গুন-চৈত্র 'প্রবাসী' সংখ্যায় ১৫৫৩ সালে উত্তর হামীর দ্বারা মন্দির প্রতিষ্ঠার আলোচনা আছে।

১৭. **L S S O'Malley, Bankura District Gazetteers, Calcutta, 1908, p. 174.**

১৮. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০ (পুনঃ মুদ্রণ ২০১০), পৃঃ

৫৪।
১৯. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়ার গুরুত্বপূর্ণ জনপদ ছাতনা, বাঁকুড়া, ২০০৮, পৃঃ ২৭।
২০. অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়, বাঁকুড়ার গুরুত্বপূর্ণ জনপদ ছাতনা, বাঁকুড়া, ২০০৮, পৃঃ ২৭।
২০ক. দুবরাজপুরের নতুন বসুলী মন্দির প্রাঙ্গনে প্রাচীন ক্লোরাইড আমলক শিলা ধ্বংসপ্রাপ্ত বাসুলী মন্দিরের বলে মনে করা হয়। অধ্যাপক অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় সন্নিহিত জঙ্গল থেকে উদ্ধার হওয়া প্রতিষ্ঠালিপিতে দেখেছিলেন, 'ব্রাহ্মাশেষ সুরেশ বন্দ্যচরণ শ্রী বসুলী প্রীতয়ে শর্ব্বাস্য স্মরশায়কত্র্তু শশভৃৎ সংখ্যে শকাব্দে শুভে। সামন্তান্বয় সাগরেন্দুররিদন্তীশাজি সৎকেশরী ভূভুগবৃঙ্গবরো বিবেকনৃপতিঃ সৌধংদদৌ দার্শদ্ম।" অর্থাৎ ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে বিবেকনারায়ণ এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। ধর্মঠাকুরের ধ্যানমন্ত্রে পূজিতা এই শক্তিদেবী দ্বিভূজা, মুখমণ্ডল চতুষ্ক, দেহ শীর্ণ, ডান হাতে খাঁড়া, বাম হাতে খর্পর, গলায় মুণ্ডমালা, কানে দীর্ঘ কুন্তল, পায়ে নূপুর, পুরুষদেহের উপর দণ্ডায়মান। অরবিন্দবাবু রাজগাঁ ও আলিঝাড়ার বসুলীথান ও কিছু প্রত্নপ্রমাণের নিরিখে সেগুলিকে সামন্তভূমের প্রান্তিক শাসনকেন্দ্র বলেছেন। আলিঝাড়ার 'রায়' পদবিধারীরা ছাতনারাজের জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কিত।
২১. **F W Robertson, Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Bankura, Calcutta, 1926, p. 28.**
২২. **Letter from Ferguson to Graham Dated 2nd March, 1767.**
২৩. **B S Das, Civil Rebellion in the Frontier Bengal, Calcutta, 1973, p.38.**
২৪. **L S S O'Malley, Bankura District Gazetteers, Calcutta, 1908, p. 164.**
২৪ক. ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে গুপ্তঘাতকের হাতে রাজা মহেন্দ্রলাল নিহত হলে দ্বিতীয় রানী আনন্দকুমারী কৃষ্ণসেন রচিত পুঁথি রক্ষা করার তাগিদে দারোয়ান শিবু বাগদীর বাড়িতে গোপনে পাঠিয়ে দেন। ১৯১১ সালে শিবুর মৃত্যু হয়। ১৯২১ সালে গিরি বাগদীর কাছ থেকে ল্ধ্যাশোল নিবাসী মহেন্দ্রলাল সেন (কৃষ্ণসেনের প্রপৌত্র) এই পুথি সহ একটি সিন্দুক কিনে নেন। পরে এটি কেঞ্জাকুড়ার রামানুজ করের হাতে আসে। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের আষাঢ়-ফাল্গুন 'প্রবাসী' সংখ্যায় এর উল্লেখ আছে। এর সাথে সংযুক্ত 'বাসুলী মহাত্ম্য' লিখেছিলেন চণ্ডীদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র পদ্মলোচন শর্মা।
২৫. **L S S O'Malley, Bankura District Gazetteers, Calcutta, 1908, p. 164.**
২৬. **L S S O'Malley, Bankura District Gazetteers, Calcutta, 1908, p. 538.**
**A K Bhattacharya, A corpus of dedicatory inscriptions from Temples of bengal \, Calcutta, 1982, p. 231.**
২৬ক. ছাতনার রামতারক নামের এক কবিরাজ ১৮৭০ সালে একটি পুঁথি রচনা করেন, যেটিতে উদয় সেন-কৃষ্ণ সেনের পুথির কিছু পাতা ও ছাতনা রাজবংশ তালিকার উল্লেখ আছে। এটি লাখ্যাশোল নিবাসী সৃষ্টিধর কবিরাজের কাছে পাওয়া যায়। ১৯৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ্য-আষাঢ় 'প্রবাসী' সংখ্যায় এর উল্লেখ আছে।
২৭. **M.C. McAlpine, Report on the condition of the Santals in the Districts of Birbhum Bankura Midnapore and North Balasore, Calcutta, 1909, p.51.**
২৮. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০, পৃঃ ৫৬।
২৯. **A Mitra, District Handbook, Bankura, 1951, p-IXVI-IXVII.**
৩০. ক্ষেত্র সমীক্ষা ও রাজপরিবারের প্রদীপ সিংহদেবের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য।
৩১. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০ (৩য় সং ২০১৩), পৃঃ ৫০।

৩২. বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৫০, পৃঃ ১১১।
৩৩. L S S O'Malley, Bankura District Gazetteers, Calcutta, 1908, p. 175.
৩৪. Proceedings of the Collector, Bankura, I. N. Gupta, dt 15.11.1904 (Deposition of Pitambar Daripa)
৩৫. Paper Book II, Pt II Tittle Suit No. 139 of 1912. Appeals from original order No. 222 & 223, 1921. Sub-Judge Court, Bankura, P. 320-327. Dewan Lswar Bakshi Stated, 'Ranee did not understand any of the business of the estate, She did not transact any business."
৩৬. ibid, p. 322. The record substantiated the contribution of mohra. Fakir Chandra Dutta (1890-1897) in ingeasing intigo cultivation in Chatna 'under his orders the tenant showed more indigo.'
৩৭. ibid, P.311. বিহারীলাল সিংহ ও হরিহর সিংহের রানীর অন্দরমহলে অবাধ প্রবেশাধিকার নিয়ে লিখিত তথ্য হল, 'were privileged to enter the Andar and used to pass orders relating to the entire estate.' অর্থাৎ রাজ্য শাসনে রানীকে স্পষ্টতই পরিচালনা করতেন এই দুই জন।
৩৮. ibid, P. 380. হিকিম মুকুন্দলাল ও ছোট রাজা বিনিন্দলালের অনাচার যাতে রানীর কানেনা যায়, তার জন্য তাঁরা দেওয়ান ঈশ্বর বক্সীকে 'forbade...to speak to the Ranee about the loans. They threatened him with asault and personal injury if he had spoken to the Ranee... made the first threat at patpur in Bankura.'
৩৯. ibid, P.311. দেওয়ান খাজাঞ্চি বিহারীলাল ও রানীভ্রাতা হরিহরের তদারকিতে, 'the Zamindary business was not property managed' রাণীকে জানালেও, রাণী, 'Sent no word in reply.'
৪০. ibid, P.333. Deposition of Brindaban Ch. Dutta Dt. 27.02.13 (P. 176-77), Fakir Ch. De Modak Dt. 11.03.13 (P.311), Pitambar Daripa Clt. 12.03.13 (P. 318-19) 'Shareholders brought criminal cases against the secretary and the directors.' জমিদারি গোমস্তা ফকিরচন্দ্র দেমোদক এই কোম্পানীর মোহরা হিসাবে দুর্নীতিতে যুক্ত ছিলেন।
৪১. Decree in bankura Sub-Judge Court dated 29.07.98 in Suit No. 48 of 1898. P. 328, 329. Deposition of Fakir Chandra Dey Modak dt. 11.03.13 (p.310).
৪২. Appeal from Original Decree No. 39 of 1914. (Raja Hemedralal Singh Deo vs. Fakir Chandra Dutta & Others) Bankura, Paper Book, p. 17-20.

## নবম অধ্যায়

# মালিয়াড়া কথা

### মালিয়াড়ার পত্তন

বাংলায় আফগান শাসনের অবসান ঘটিয়ে মোঘল শাসনের প্রতিষ্ঠাকল্পে ভারত সম্রাট সেনাপতি মানসিংহের নেতৃত্বে বড় সামরিক বাহিনী পাঠান। এই দলে ছিল কন্যাকুব্জ বংশীয় অনেক লড়াকু সেনা। ১৫৯০ সাল নাগাদ বাংলায় এই বাহিনী আধিপত্য বিস্তার করে ফেলে। মান সিংহের ওড়িয়া দেশ অভিযান ছিল রাঢ়ের উপর দিয়ে। এই অভিযানে অংশ নিয়েছিল দেব অধ্বর্য্যু নামক এক কন্যাকুব্জ বংশীয় সেনানায়ক। সেনাদল বাঁকুড়ার মালিয়াড়া অঞ্চলে অবস্থান কালে এলাকার জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগ দেব অধ্বর্য্যুকে আকৃষ্ট করে। তিনি মান সিংহের কাছে এই তালুকটির শাসনভার চেয়ে নিলে সূচিত হয় বাংলার এক নতুন রাজ বংশের যাত্রা। পত্তন হয় দামোদর নদ থেকে শালীনদী পর্যন্ত ৫২ মৌজার এই মালিয়ারা এস্টেট। মল্লরাজত্বের অবসানের পর মালিয়াড়া স্বতন্ত্র তালুক ঘোষিত হলে ৩২০৪৩.৫ একরের এই তালুকের রাজস্ব নির্ধারিত হয় ৫৫০২টাকা ৮ আনা ৯ গন্ডা।

### রাজবংশ লতিকা

মল্ল রাজবংশের পত্তনের প্রায় সমকালে এই রাজবংশের সূচনা হয়। নিচে তুলনামূলক বংশতালিকা দেওয়া হল।

| প্রজন্ম | সামন্তভূমের রাজবংশ | প্রাচীন সিমলাপাল রাজবংশের কালপঞ্জী | মল্লরাজ বংশ |
|---|---|---|---|
| ১ম | দেব অধ্বর্য্যু (১৫৯০-) | বাসুদেব (১৫৪৫-১৫৫৮) ও বলরাম (১৫৫৮-১৫৮০) | হাম্বীর মল্লদেব (১৫৬৫-১৬২০) |
| ২য় | ঘরবাস অধ্বর্য্যু | মোহনদাস (১৫৮০-১৫৯৩) | ধারীহাম্বীর মল্লদেব (১৬২০-১৬২৬) |
| ৩য় | মণিরাম অধ্বর্য্যু | লক্ষ্মণ (১৬১৫-১৬১৫) | বীরসিংহদেব (১৬২৬-১৬৪২) |
| ৪র্থ | গোপালদাস অধ্বর্য্যু | লক্ষ্মণ (১৬১৫-১৬৫২) | বীরসিংহদেব (১৬৫৬-১৬৪২) |
| ৫ম | ধরণীধর সিংহ | কৃষ্ণদাস (১৬৫২-১৬৯৩) | দুর্জনসিংহদেব (১৬৪২-১৭০২) |
| ৬ষ্ঠ | পরমানন্দ সিংহ | রাধানন্দ (১৬৯৩-১৭২৮) | রঘুনাথ সিংহদেব ২য় (১৭০২-১৭১২) |
| ৭ম | মান সিংহ | বলরাম (১৫৪৫-৫৮) | গোপালি সিংহদেব (১৭১২-১৭৪৮) |
| ৮ম | জয় সিংহ | জগন্নাথ (১৭৭৫-১৮২০) | চৈতন্য সিংহদেব (১৭৪৮-১৮০১) |
| ৯ম | আমান সিংহ | চিরঞ্জীব (১৮২০-১৮৩১) | মাধবসিংহদেব (১৮০১-১৮০৯) |
| ১০ম | দামোদর চন্দ্র সিংহ (১৮৫৪-৭৫) | নটবর (১৮৪৪-১৯০৫) | গোপালসিংহদেব ২য় (১৮০৯-১৮৭৬) |
| ১১তম | ব্রজেন্দ্রগোপাল চন্দ্রাধ্বর্য্যু | মানগোবিন্দ (১৯০৫-) জগবন্ধু (১৯০৫-১৯০৯) | রামকৃষ্ণ সিংহদেব (১৮৭৬-১৮৮৫) |

| প্রজন্ম | সামন্তভূমের রাজবংশ | প্রাচীন সিমলাপাল রাজবংশের কালপঞ্জী | মল্লরাজ বংশ |
|---|---|---|---|
| ১২তম | রাজনারায়ণ চন্দ্রাধ্বর্য্যু (১৯২০-) | মদনমোহন (১৯০৯-১৯২৭) | ধ্বজামণীদেবী (১৮৮৫-১৮৮৯) |
| ১৩তম | নৃপেন্দ্রনারায়ণ চন্দ্রাধ্বর্য্যু (-১৯৬২) | শ্যামসুন্দর (১৯২৭-১৯৫৫) | নীলমণি সিংহদেব (১৮৮৯-১৯০৩) |
| | গোপালচন্দ্র | কল্যাণীপ্রসাদ-দেবপ্রসাদ | রাজা নেই (১৯০৩-১৯৩০) |
| | হিমাদ্রিনারায়ণ | চিরঞ্জীব | কালীপদ সিংহঠাকুর (১৯৩০-১৯৮৩) |
| | | | সলিল/জ্যোতিপ্রসাদ সিংহঠাকুর |

## বিভিন্ন রাজা ও তাদের কাহিনী

দেব অধ্বর্য্যু

(১৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে মানসিংহের বাহিনীর সাথে রাঢ়ে আসেন। তিনি বিজয়ী বাহিনীর সাথে দেশে ফিরে না গিয়ে, মান সিংহের অনুমতি নিয়ে বড়জোড়া-মালিয়াড়া অঞ্চলে তিনি বসতি স্থাপন করেন। এলাকা ছিল দস্যু অধ্যুষিত। তিনি তাঁর সাথী সামরিক কর্মীদের সাহায্যে দস্যু আকুড়ে ডোমদের দমন করেন। এই দস্যুদের আরাধ্য দেবী ছিলে কালী। ক্রমে এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি কালীর পূজার জন্য নিযুক্ত ব্রাহ্মণকে 'পরীক্ষা' উপাধি ও ব্রহ্মোত্তর ভুসম্পত্তি দান করেন।)

|

ঘরবাস অধ্বর্য্যু

(দেশাগত স্বজাতিদের প্রচুর নিষ্কর ভূমি দেওয়া হয়। সেবার জন্য আনীত ধোপা-নাপিত, মশালচি বাগদিদের চাকরাণ জমি দেওয়া হয়।)

|

মণিরাম অধ্বর্য্যু

(বেগলার ও অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ভুলে বাসুদেব বলেছিলেন? মল্লরাজ বীর সিংহের (১৬৫৬-৮২) সমকালীন)

|

গোপালদাস অধ্বর্য্যু

(তাঁর প্রতিষ্ঠিত গোপালজীউ মন্দিরে ভোগ রান্নায় নিযুক্ত 'ঘোষাল' দের ভান্ডারী উপাধি ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি দান করেন।)

|

ধরণীধর সিংহ

|

পরমানন্দ সিংহ

|

মান সিংহ

(সম্ভবত তাঁর সময়ে মালিয়াড়ায় রাইপুরের দুর্জন সিংহের হামলা ঘটে)

|

জয় সিংহ

(দশশালা বন্দোবস্ত করেন)

|

আমান সিংহ

(বিদ্যানুরাগী এবং সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের বিকাশ ঘটান)

|

দামোদর চন্দ্র সিংহ

(১৮৫৪-৭৫ সময়কালে বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়, সাহিত্য রচিত হয়)

|

ব্রজেন্দ্রগোপাল চন্দ্রাধ্বর্য্যু

(দাদা ব্রহ্মের স্ত্রী চন্দ্রকুমারী তেওয়ারীপাড়া শিব মন্দির করেন, বড়রাজকুমার ব্রহ্মগোপালের অকালমৃত্যু ঘটে ও কনিষ্ঠ কৃষ্ণ ব্রজবাসী হন, কৃষ্ণগোপালের সংকলিত অনেক পুঁথি পুঁথিশালায় পাওয়া গেছে। এর অন্যতম 'রাধাদামোদরার্চন')

|

রাজনারায়ণ চন্দ্রাধ্বর্য্যু

(রানী দুর্গাগতি দেবী (১৯১২ তে শরিকানা নিয়ে মামলা হয়), ৩য় ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ চন্দ্রাধ্বর্য্যু, ১৯২৬ শালে কৃষ্ণগোপাল মন্দির সংস্কার,২য় ভ্রাতা যোগেন্দ্র শরিকি বিবাদ শুরু করেন, কনিষ্ঠ গোকুলনারায়ণ)

|

নৃপেন্দ্রনাথ চন্দ্রাধ্বর্য্যু

(নাট-দুর্গা মন্দির সংস্কার। ১৬১০ সালে মালিয়াড়া রাজবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হলে তারা মালিয়াড়ার আকুড়ে ডোমদের কালী মন্দিরের পুজোর দায়িত্ব নেন। আগে এটি একটি খড়ের ঘর ছিল। ১৯২৫ সালে সেই ঘরটি আগুন লেগে পুড়ে যায়। তখন রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ চন্দ্রাধ্বূর্য্য এই মন্দিরটি তৈরি করিয়ে দেন। রাজপরিবার ২৫১ নং তৌজির মাধবপুর, কুলডিহা, পিংরুই-পটি ইত্যাদি ও ৮নং তৌজির মালিয়াড়া সহ বিভিন্ন মৌজায় বহু দেবোত্তর ভুসম্পত্তি দান করেছিলেন।)

## ১) দেব অধ্বর্য্যু

ঊনবিংশ শতকে মালিয়াড়া পরগণার উত্থান হলেও এই রাজবংশের ধারা কিন্তু কয়েক শতাব্দী প্রাচীন। শোনা যায়, 'গৌড় বঙ্গ উৎকল অধীপ' মানসিংহের অধীনে পদস্থ রাজ কর্মচারী ছিলেন এই বংশের আদিপুরুষ দেব অধ্বর্য্যু। পাঠান-দমনে আকবর সেনাপতি মানসিংহের সঙ্গে এই অঞ্চলে আসেন কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ দেব অধ্বর্য্যু। পরে মানসিংহের সহায়তায় এই পরগনার শাসন অধিকার লাভ করেন। দস্যুদল কবলিত মালিয়াড়া এলাকায় দস্যুশাসন উচ্ছেদ করে সপরিবার এসে বসবাস করতে শুরু করেন দেব অধ্বর্য্যু। মালিয়াড়া রাজপরিবারের রাজত্ব শুরু তখন থেকেই।

এই বসতি স্থাপনের আগে এলাকা ছিল ডাকাত অধ্যুষিত। কথিত আছে মল্লভূমের প্রান্তিক এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আকুড়ে ডোমদের মল্লরাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই আকুড়ে ডোমদের কালী মূর্তি আজও পূজিতা হন।[১] সারা মালিয়াড়া গ্রামের একমাত্র পূজিতা কালীমাতা। শোনা যায় মালিয়াড়া গ্রাম পত্তনের আগে এখানে একটি ডাকাত দল বাস করত। সেই ডাকাত দল এই কালীমাতাকে প্রতিষ্ঠা করেন। যখন আঁকুড়ে সম্প্রদায়কে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বির মালিয়াড়ায় বসালেন ; তখন তাদের এই শর্ত দিয়েছিলেন যে তারা মালিয়াড়া গ্রামের ডাকাত দলকে উচ্ছেদ করবেন। আঁকুড়ে সম্প্রদায়ের নেতা হুটু সিং ডাকাত দলের সর্দারকে হত্যা করেন এবং ডাকাত দলকে বিতাড়িত করেন। তখন থেকে এই কালীমাতা পূজিতা হয়ে আসছেন। পরে ১৬১০ সালে মালিয়াড়া রাজবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হলে তারা এই কালীমন্দিরের পুজোর দায়িত্ব নেন। পূজারী ব্রাহ্মণদের মালিয়াড়ারাজ 'পরীক্ষা' উপাধি দেন। দেবোত্তর ভূসম্পত্তি দান করা হয়। আগে কালীবাড়িটি একটি খড়ের ঘর ছিল। ১৯২৫ সালে সেই ঘরটি আগুন লেগে পুড়ে যায়। তখন রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ চন্দ্রাধ্বর্য্যু এই মন্দিরটি তৈরি করিয়ে দেন। বর্তমানে সারা গ্রামের লোক এই পুজোয় অংশ গ্রহণ করেন।

কারো মতে মন্দিরের সামনে যে কূয়োটি আছে সেখান থেকে নাকি মায়ের মূর্তি উত্থিত হয়। মায়ের মূর্তি দেখা যায় না। ঢাকা দেওয়া থাকে। শুধু মূর্তির মাথার ওপর একটি গালার মুখ বসানো আছে। সেখানে রুপোর চোখ, ও রুপোর জিহ্বা দেওয়া আছে। এই মূর্তিই সকলে দর্শন করে শুধুমাত্র স্নান করানোর সময়। অন্য সময় মায়ের মূর্তি পুরোহিত দেখতে পাওয়ার অধিকার আছে। বহু আগে এখানে

নাকি নরবলি হয়েছিল। তবে জমিদারী আমলে এখানে মহিষ বলি হত। বর্তমানে শুধু ছাগ বলি হয়।

মল্লরাজ ও নবপ্রতিষ্ঠিত মালিয়াড়া-রাজের প্রচেষ্টার ফলে এলাকায় শান্তি ফিরে এসে। চৈতন্য পরবর্তী কালে শ্রীনিবাস আচার্য বৈষ্ণব ভাবধারা প্রচারের জন্য যখন বৃন্দাবন থেকে বাংলায় আসছিলেন, এই অঞ্চলটির প্রশান্তি-ভাব বিবৃত করেছেন। মালিয়াড়া জনপদের তৎকালীন সমৃদ্ধির প্রমাণ মেলে নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থের ভাষ্য থেকে। এই সময়ে বৃন্দাবন থেকে শ্রীনিবাস আচার্য বাংলায় ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভ্রমণকালে এখানে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে রাত্রিবাস করেন। নিত্যানন্দ এ নিয়ে লিখেছিলেন,

"মালিয়াড়া বলি গ্রামে ভৌমিক এক হয়।
রহিলা স্বচ্ছন্দে তাহা হইয়া নির্ভর।।"

এই রাজত্ব পত্তনের সময় স্বদেশ থেকে বিভিন্ন বৃত্তির ও স্বজাতির আগমন ঘটলে তিনি তাঁদের ভূমিদান করে বসবাস ও জীবিকার ব্যবস্থা করেন। ধোপা-নাপিত-মশালচি- বাগদিদের সেবা বিনিময়ে 'চাকরাণ' জমি দানের কথা জানা যায়। দেব সেবায় ভূমিদানের ঐতিহ্য মেনে ২৫১ নং তৌজির কুলডিহা, পিংরুই পটি, মাধবপুর ইত্যাদি মৌজা, ৮ নং তৌজির মালিয়াড়া মৌজা ও আরো অন্যান্য মৌজা দেবোত্তর হিসাবে উৎসর্গীকৃত হয়। স্বজাতি কন্যাকুব্জদের আগমনের ফলে পৃথক বৈশিষ্ট্য ও ধারার সামাজিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। রাজারা ব্রাহ্মণ্য মিতক্ষরা আইনে উত্তরাধিকার ও পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। রাজা ছিলেন বিশালাক্ষীর উপাসক। মানসিংহের সুপারিশে রাজা ও রাজত্ব দুটিই নবাব ও বাদশাহের অনুমোদন পায়। ফলে সমকালীন মল্লরাজাও দামোদর নদ থেকে সাহারজোড়া পর্যন্ত বিস্তৃত এই জমিদারিকে মেনে নেয়। তবে তৃতীয় প্রজন্মের সময় তালুকটি মল্লপ্রভাবের অন্তর্গত হয়ে পড়ে।

## ২) ঘরবাস অধ্বর্য্যু

প্রায় জনবিরল প্রদেশে দেব অধ্বর্য্যু রাজ্যপাট স্থাপন করার পর তাকে সংহত করতে ঘরবাস অধ্বর্য্যু বড় ভূমিকা নেন। কন্যাকুব্জ থেকে অনেক মানুষ নতুন তালুকে আসতে থাকেন। এইসব দেশাগত স্বজাতিদের প্রচুর নিষ্কর ভূমি দেওয়া হয়। সেবার জন্য আনীত ধোপা-নাপিত, মশালচি বাগদিদের চাকরাণ জমি দেওয়া হয়। গ্রামের

প্রাচীনতম প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত নবরত্ন বিষ্ণুমন্দির ঘরবাসের তৈরি ছিল বলে অনেকে মনে করেন।[২] অনেকে মনে করেন রাজপরিবারের দুর্গা আরাধনা শুরু হয় এই রাজার সময়ে।

## ৩) রাজা মণিরাম অধ্বর্য্যু ও মল্ল-মালিয়াড়া বিবাদ

ষোড়শ শতাব্দী থেকে নানা পট পরিবর্তন ঘটেছে বাঁকুড়ার ইতিহাসে। তার ছোঁয়া লেগেছিল মালিয়াড়াতেও। প্রথমে মল্লভূমের শাসনের বাইরে থেকে স্বাধীন থাকলেও, পরে মালিয়াড়া পরগনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মল্লভূমে। প্রথমদিকে এই ভূভাগ মল্লনিয়ন্ত্রণে ছিল এবং তাঁরা ডাকাতদের জব্দ করে অকুড়ে ডোমদের সাহায্যে শান্তি স্থাপন করেন। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহ আকবরের সেনাপতি মানসিংহের অভিযানের সময় মানসিংহের সহায়তায় এটির দখল পায় দেব অধ্বর্য্যু। মল্লরাজ বীরসিংহ দেব অধ্বর্য্যুর তৃতীয় উত্তরপুরুষ মণিরাম অধ্বর্য্যুকে পরাভূত ও নিহত করে মালিয়াড়া অধিকার করেন।

দেব অধ্বর্য্যু-এর নাতি মণিরামের সাথে মল্লরাজ (বিষ্ণুপুর) বীরসিংহের (১৬৫৬-৮২) বিবাদ শুরু হয়।[৩] একদল সেনা কর সংগ্রহের জন্য রাজপ্রাসাদ অভিমুখে এগোলে রাজদ্বার বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাজসেনা দরজা ভাঙার চেষ্টা করলে সংঘর্ষে রাজস্ব দল আহত হয়ে ফিরে যায়। রুষ্ট মল্লরাজের বিরাট সেনাদল পরবর্তী কালে রাজপ্রাসাদ তছনছ করে মণিরামকে টানতে টানতে নিকটস্থ সাবিয়াড়া গ্রামে কয়েক টুকরো করে হত্যা করে।[৪] বীরসিংহের নিষ্ঠুরতা জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এরপর থেকে বিষ্ণুপুরের অনুগত তালুক হিসাবেই মালিয়াড়া পরিচিতি লাভ করে। একটি সূত্রে বিবাদের কারণ মালিয়াড়াতে প্রজাদের উপর অত্যাচার রোধ বলা হলেও, এটি মল্লভূমকে দেয় রাজস্ব অনাদায় থেকেই ঘটেছে বলে মনে হয়।[৫]

## ৪) গোপালদাস অধ্বর্য্যু

মণিরাম-পুত্র গোপালদাস রাজপাটে বসলেও এরপর থেকে মল্ল ভূমের করদ পরগনায় পরিণত হয় মালিয়াড়া। শোনা যায়, এই অধীনতা স্বীকারের নিদর্শন স্বরূপ কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ হয়েও মালিয়াড়ার রাজারা 'সিংহ' বা 'সিংহাধ্বর্য্যু' উপাধি ব্যবহার শুরু করেন। এর চল ছিল ঊনবিংশ শতকের মধ্যবর্তী দামোদরচন্দ্রের আমল পর্যন্ত।

আবার দামোদরচন্দ্রের আমল থেকে 'চন্দ্রাধ্বর্য্যু' উপাধি ব্যবহার দেখা যায়।[৫ক] তিনি রাজভবনে গোপালজিউ মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ভূমিকা নেন। তিনি গোপালজীউ মন্দিরে ভোগ রান্নায় নিযুক্ত 'ঘোষাল' দের ভান্ডারী উপাধি দেন ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি দান করেন।[৬] গোপালদাস মল্লভূমের সাথে মিত্রতা বজায় রেখে মালিয়াড়া শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠায় জোর দেন।

## ৫-৮) ধরণীধর সিংহ, পরমানন্দ সিংহ, মান সিংহ, জয় সিংহ

এই চার রাজার সম্পর্কে বিস্তৃত কিছু জানা জানা যায় না। সম্ভবত মান সিংহের সময় এই পরগণায় দুর্জন সিং-এর আক্রমণ ঘটে। কোম্পানীর ১৫.০৬.১৭৭৩ সালের ১৪৯ নং প্রতিবেদনে দেখা যায় রাইপুরের দুর্জন সিং বিদ্রোহের রসদ সংগ্রহের জন্য কোম্পানী কুঠি ছাড়াও মল্লভূমের বড়হাজারী, মালিয়াড়া, ছাতনা, সাহারজোড়া রাজ্য লুন্ঠন করছেন। জয় সিংহ কোম্পানীর সাথে দশশালা বন্দোবস্ত করে নেন।[৭]

## ৯) আমান সিংহাধ্বর্য্যু

মাতৃভক্ত আমান সিংহাধ্বর্য্যু আদ্যাশক্তি দেবী দুর্গার পূজা শুরু (মতান্তরে ঘরবাসের আমলে) করলে সাবেকী মেলাগুলির সূচনা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম মালিয়াড়ায় বারোয়ারী সার্বজনীন দুর্গাপুজা শুরু হয়। এরপর বিভিন্ন জাতি নিজ সুবিধার্থে নিজ নিজ মেলা-মন্দির তৈরী করেন। প্রতিটি মেলা-মন্দির বিশিষ্টতা ও ঐতিহ্যপূর্ণ। যেমন বড়োবুড়ির মেলা। যাকে সবাই বড়োমেলা বলে জানে। এই মেলার মাতৃমূর্তি পুঁথির ডাকে সুসজ্জিত। একসময় এই মেলায় মহাঅষ্টমীর পূর্ণক্ষণ বয়ে নিয়ে আসতো এক উড়ন্ত শঙ্খচিল। তারই শব্দে মেলায় বলিদানের প্রথা ছিল। কিন্তু পরিবেশ দূষণের ফলে, বৃক্ষ ও পক্ষী বিলোপের ফলে সে প্রথায় ছেদ পড়েছে।[৮] মালিয়াড়ায় মাত্র দু'টি সিংহবাহিনী মূর্তির দর্শন পাওয়া যায়।

প্রথমটি মালিয়াড়া রাজবাড়ীর সিংহবাহিনী, দ্বিতীয়টি পঞ্চাননতলায় রাজ কর্মচারী বিশ্বাস পরিবারের সিংহবাহিনী। তবে বিশ্বাস পরিবারের সিংহবাহিনীতের কার্তিক, গনেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী থাকে না। জয়া, বিজয়াকে সাথে নিয়ে মা সিংহের উপর অবস্থিত হয়ে অসুর বধ করছেন। একসময় এই মেলায় মানত করে গৃহবধূরা পুত্র সন্তান লাভ করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই মল্ল-প্রভাব আস্তে আস্তে বিলীয়মান হতে থাকে। রাজা জয় সিংহের আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লাভ করে মালিয়াড়া। জয়সিংহের পুত্র আমান সিংহ খুব অল্পকাল রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালেই নির্মিত হয় রাজপরিবারের কুলদেবতা গোপালজীউর দালানমন্দির। দেবীপক্ষের চারদিন প্রজাদের ভোগ রান্না করে খাওয়ানো হত।

## ১০) দামোদর সিংহ

আমন সিংহের পর রাজপাটে বসেন পুত্র দামোদরচন্দ্র। তাঁর সময়কাল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী অংশ। দামোদরচন্দ্রের আমল মালিয়াড়ার রাজ-ইতিহাসে সুবর্ণযুগ বলে অভিহিত করা যায়।

দামোদরচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন ধার্মিক, পণ্ডিত ও কবি। মালিয়াড়া রাজপরিবারের যে সমস্ত মন্দিরগুলি দেখা যায়, সেগুলির বেশিরভাগ দামোদরচন্দ্রের আমলেই নির্মিত। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে দামোদরচন্দ্র নির্মাণ করেন কুলদেবতা গোপালজীউয়ের মন্দির সংলগ্ন একটি বৃহৎ নাট্যশালা। বিভিন্ন সময় এই নাট্যশালায় হত কীর্তন, রামায়ণ, পুরাণপাঠ, কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে দামোদরচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন নবচূড়া বিশিষ্ট রাসমঞ্চ, ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় রাম মন্দির। তিনি কাশীতেও একটি পাথরের শিবমন্দির গড়ে সেখানে সাতটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দামোদরচন্দ্র ছাড়াও দামোদরচন্দ্রের মাতা, স্ত্রী শ্রদ্ধাবতী, পুত্র ব্রহ্মগোপাল ও পুত্রবধূ চন্দ্রকুমারীও মন্দিরস্থাপন করেন। এগুলিও পরোক্ষ ভাবে দামোদরচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতাতেই নির্মিত হয়েছিল। সে যুগে নারী প্রতিষ্ঠিত মন্দির বিরল। সেই আবহেও মালিয়াড়ার রাজপরিবারের নারীগণ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, বাঁকুড়ার মন্দির-মানচিত্রে যা বিশেষত্বের দাবি রাখে। জনহিতকর কাজের নমুনা পাওয়া যায় মালিয়াড়া ও সন্নিহিত অঞ্চলে তাঁর বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রচেষ্টা থেকে। মালিয়াড়া, সারামা, বড়জোড়াতে বহু চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজা দামোদরচন্দ্র কবিও। একাধিক শাস্ত্র থেকে শ্লোক সংগ্রহ করে তিনি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেন। আধ্যাত্ম রামায়ণ তাঁর প্রিয় গ্রন্থ ছিল। এই রামায়ণের নিত্যপাঠযোগ্য সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছিলেন তিনি। উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে লিখেছেন,

> "নিত্য রাম ভক্তগণ করিবে পঠন।
> সেই হেতু সংক্ষেপে বর্ণিব রামায়ণ।।"

'রামায়ণ সুধোদয়', 'ভাগবতামৃতবিন্দু' 'হরিনামামৃতসার' প্রভৃতি একাধিক গ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন, যাদের মধ্যে প্রথম দু'টি সেই সময় মুদ্রিতও হয়েছিল। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'রামায়ণ সুধোদয়' সম্ভবত বাঁকুড়ার কারও লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ! এটি প্রকাশিত হয়েছিল 'নিউ বেঙ্গল প্রিন্টিং প্রেস, ৮৯-ক আহিরীটোলা থেকে। 'ভাগবতামৃতবিন্দু' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। বইটি 'শ্রীমধুসূদন শীলের চৈতন্য চন্দ্রোদয় যন্ত্রে কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত হয়েছিল। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত গ্রন্থের মধ্যে ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত 'হরিনামামৃতসার' সবচেয়ে প্রাচীন। এটি মুদ্রিত হয়নি। তাঁর আর সংকলিত গ্রন্থ হল 'কার্ত্তিকৃত্যম'(১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ), 'মাঘমহাত্ম্যম'(১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দ)। দামোদরচন্দ্র, কৃষ্ণগোপাল, ঈশ্বরচন্দ্রের এমন অনেক সংকলন পাওয়া গেছে। কয়েকটি মাত্র অনুদিত হয়েছে।১৮৪৮ সালে দামোদরচন্দ্রের আদেশে লিখিত একটি মহাভারতের আদিপর্বের(ভাগবত শ্লোক) পুঁথি পাওয়া গেছে। দামোদরচন্দ্রের গ্রন্থগুলির প্রাচীনতম হল ১৮৫৯ খ্রিষ্টব্দে রচিত 'নামামৃতসারঃ'। ১৮৭৫ সালের অনুলিখিত এই গ্রন্থের একটি নকল রাইপুরের গুড়েপাড়া থেকে উদ্ধার করেছিলেন অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়। এই চলমান প্রাচীন ধারা থেকে বোঝা যায় এই বৈষ্ণব পরিবারটির অসীম ভাগবত প্রেম। মান সিংহের সময় থেকে এই ধর্মপুস্তকের সংগ্রহ ও চর্চা অব্যাহত ছিল। সংকলিত পুস্তকগুলির টীকা সংগ্রহ দেখলে এই চর্চার গভীরতা বোঝা যায়।

দামোদর চন্দ্রকে সাহায্য করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্ন বা সার্বভৌমের মত সভাপন্ডিতরা। তিনি প্রকাশিত গ্রন্থে এই সাহায্যের উল্লেখও করেছেন। দামোদরচন্দ্র অনুদিত রামায়ণের উত্তরকান্ডের শেষ ভণিতায় উল্লেখ আছে,

> "রামায়ণোত্তরকান্ড সুধারসময়। সংক্ষেপেতে ভূপ দামোদর চন্দ্র কয়।।
> নৃপের আদেশ পেয়ে আনন্দিত মন। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দ্বিজ করিল শোধন।।"

এছাড়া দামোদরের 'শ্রীভাগবতামৃতবিন্দুঃ', ছোটরাজকুমার কৃষ্ণগোপালের 'রাধাদামোদরার্চন চন্দ্রিকা'(১৮৮১ সালের) ও 'বাচস্পত্যভিধান' সংশোধনেও এই সভাপন্ডিতের অবদান আছে। তিনি নিজেও অনেক পুঁথি অনুলিখন করেন। কুলপুরোহিত ছিলেন মালিয়াড়ার ভট্টাচার্য পরিবার।

দামোদরচন্দ্র তাঁর রাজত্বকালে একাধিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান 'মালিয়াড়া রাজনারায়ণ উচ্চবিদ্যালয়'-এর সূচনাও তাঁর হাত ধরে। তখন বিদ্যালয়টি 'বঙ্গ বিদ্যালয়' হিসেবে পরিচিত ছিল। ক্ষেত্র সমীক্ষায় জানতে পারা গিয়েছে,

দামোদরচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় মালিয়াড়া ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে একাধিক চতুষ্পাঠী গড়ে উঠেছিল।[৮] লোকনাথ ঘোষের লেখায় দামোদরচন্দ্রের 'good heart' ও 'liberal views' নিয়ে উচ্চ প্রশংসা ছিল। মালিয়াড়া প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয়ে গ্রামবাসীদের চিকিৎসা ও টিকাকরণ পরিষেবা মিলত। ইংরাজ চিকিৎসক Dr. Cannoly না এখানে পরিষেবা দিতেন। লোকনাথ ঘোষ লিখেছেন, "(Damodarchandra) opened a dispensary which he still maintains for the good of the people." দামোদরের আমলে ১৮৬৬ ও ১৮৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি প্রজা সাধারণকে প্রভূত সাহায্য করেন। তিনি রাজগৃহে সুবিশাল পুঁথিশালা তৈরি করেন, যেখানে সাধারণের অবারিত প্রবেশাধিকার ছিল। সেযুগে গ্রন্থালয়ের ধারণা সত্যিই প্রশংসনীয়। এই এলাকা থেকে পরবর্তীকালের কলকাতা উচ্চ আদালতের প্রখ্যাত বিচারক দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় এটি ব্যবহার করতেন।

দামোদরচন্দ্রের আমলে দু'বার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। সেই সময়ে তিনি মালিয়াড়া পরগনার প্রজাদের প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। প্রজাদের জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খুলেছিলেন। ইংরেজ চিকিৎসক ক্যানোলি বেশ কয়েক বছর মালিয়াড়ায় থেকে চিকিৎসা করেছিলেন। প্রজাবৃন্দদের টীকাকরণের কাজেও দামোদরচন্দ্র সাহায্য করেছিলেন বলে জানা যায়। এখন রাজবাড়ির সন্নিকটে দ্বিতল চিকিৎসালয়ের কাঠামোটি ভগ্নপ্রায় অবস্থায় পড়ে রয়েছে। (সূত্র ঃ লোকনাথ ঘোষ)

মালিয়াড়া পরগনার শাসনকেন্দ্র ছিল মালিয়াড়া গ্রাম। ঊনবিংশ শতকে এই গ্রামের সার্বিক উন্নতি তৎকালীন বাঁকুড়ার ইতিহাসে বিস্ময় সৃষ্টি করে। আর এই প্রয়াসের মূল হোতা ছিলেন মালিয়াড়া পরগণার রাজা দামোদর চন্দ্রাধ্বর্য্যু।

## ১১) ব্রজগোপাল চন্দ্রাধ্বর্য্যু

দামোদরচন্দ্রের উত্তরসূরি হিসেবে ব্রজেন্দ্রগোপাল রাজপদে অভিষিক্ত হন। উল্লেখ্য দামোদর পুত্র ব্রহ্মগোপাল ছিলেন বড়রাজকুমার। দামোদরচন্দ্রের মৃত্যুর আগেই তিনি প্রয়াত হন। কনিষ্ঠ কৃষ্ণগোপাল ছিলেন ধার্মিক ও শিক্ষানুরাগী। রাজা দামোদর মালিয়াড়াতে বিদ্যা চর্চার যে ধারা প্রবর্তন করেন তা পরবর্তী কয়েক প্রজন্ম অব্যাহত ছিল। পুত্র কৃষ্ণগোপাল ছিলেন এমন এক সারস্বত সাধক। কৃষ্ণগোপালের সংকলিত অনেক পুঁথির মধ্যে অন্যতম 'রাধাদামোদরার্চন' উল্লেখের দাবি রাখে।

১৯৩২ সালের পর কোন সময়ে বিচারক দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়ের দাদা এ্যাডভোকেট পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায় মালিয়ারা এস্টেটের কৃষ্ণগোপালের ভরণ পোষণ সম্পদের স্বত্ব ক্রয় করেন। কৃষ্ণগোপাল রাজনারায়ণ বিদ্যালয়কে ১৮ বিঘা জমি দান করেন। ধার্মিক কৃষ্ণগোপাল বাকি জীবন বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন বলে কথিত।

## ১২) রাজনারায়ণ চন্দ্রাধ্বর্য্যু

ব্রজেন্দ্রগোপালের পরে রাজা হন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজনারায়ণ। তিনিও জনকল্যাণমূলক নানা কাজ করেছিলেন। দামোদরচন্দ্রের আমলে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গ বিদ্যালয়টি তাঁর আমলেই উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ছাত্রদের সুবিধার্থে ছাত্রাবাস-সহ বিদ্যালয়ের নানা উন্নতিসাধন করেন তিনি। এ ছাড়া, নানা স্থানে ধর্মশালা নির্মাণ করেন। দামোদরের বুকে একটি 'বোটের পুল'ও জনকল্যাণে নির্মিত হয়েছিল। বাঁকুড়ার প্রথম রেল বা বিডিআর রেললাইন স্থাপনেও তাঁর সাহায্যের কথা জানতে পারা যায়। দামোদরের শুরু করা চিকিৎসালয় তাঁর আমলে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা রাজনারায়ণের চেষ্টায়, বাঁকুড়া মেথোডিস্ট মিশনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ সরকারের অবদান এই হাসপাতাল বাঁকুড়া জেলার প্রথম চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি। রাজ নারায়ণের জনহিতকর কাজের সম্মানে মালিয়াড়া রাজনারায়ণ উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস গড়ে তোলা হয়, তার পরের প্রজন্মের জমিদারের দ্বারা। এটির এখন অবস্থা ভালো নয়, অযত্নের কারণে। এর সংলগ্ন কৃষ্ণ সায়র নামে একটি সুন্দর পুষ্করিণী রয়েছে, যেটি রানী দুর্গাগতিদেবী ছাত্রদের বিনামূল্যে মাছ খাওয়ার উদ্দেশ্যে দান করে ছিলেন। রাজা রাজনারায়ণের সাথে রাণী দুর্গাগতি দেবী সমানতালে জনহিতকর কাজে অংশ নিতে থাকেন। জেলাশাসক গুরুসদয় দত্তের সহধর্মিণী সরোজনলিনী জেলার মহিলাদের উন্নতিকল্পে সমিতি গড়ে তোলার যে উদ্যোগ নেন তাতে সামিল হয়েছিলেন দুর্গাগতিদেবী। এই সমিতির কাজকর্মের জন্য তিনি ১০০ টাকা দান করেন।[৯] গ্রামের উত্তরের ৪ বিঘা জমি তিনি উচ্চবিদ্যালয়কে দান করেন। বিদ্যালয়টি রাজনারায়ণের নামে করার তাঁর প্রস্তাব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট অনুমোদন করে।

এই ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশোনা করেছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পুরুষোত্তম চট্টোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্ব।

## ১৩) দুর্গাগতি দেবী ও রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ

রাজনারায়ণ অপুত্রক অবস্থায় গত হলে তাঁর স্ত্রী দুর্গাগতিদেবী কিছু কাল রাজ্য পরিচালনা করেন। রাজনারায়ণের তৃতীয় ভ্রাতা নগেন্দ্রনারায়ণের পুত্র নৃপেন্দ্রনারায়ণকে দত্তক নিয়েছিলেন দুর্গাগতিদেবী। দুর্গাগতিদেবী পারিবারিক প্রজাবৎসল ভাবনার শরিক ছিলেন। মালিয়াড়া উচ্চ বিদ্যালয় রাজনারায়ণের নামাঙ্কিত হয়। এর সংস্কার সাধনে তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন। ছাত্রাবাসে চালু করা ও আবাসিকদের জন্যে সান্নিহিত মাছ পুকুর দান ছিল তাঁর মহানুভবতার পরিচয়। দুর্গাগতি দেবীর পরে নৃপেন্দ্রনারায়ণ হন মালিয়াড়ার রাজা। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হিসেবে নৃপেন্দ্রনারায়ণের খ্যাতি ছিল। তাঁর আমলেই রাজন্যপ্রথা অবলুপ্ত হয়। নৃপেন্দ্রনারায়ণ মালিয়াড়ার শেষ রাজা। জানা যায় তিনি রাজবাড়ী সংলগ্ন নাট-দুর্গা মন্দির সংস্কার করেন। ১৬১০ সালে মালিয়াড়া রাজবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হলে রাজা মালিয়াড়ার আকুড়ে ডোমদের কালী মন্দিরের পুজোর দায়িত্ব নেন। আগে এটি একটি খড়ের ঘর ছিল। ১৯২৫ সালে সেই ঘরটি আগুন লেগে পুড়ে যায়। তখন রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ চন্দ্রাধ্বর্য্যু এই মন্দিরটি তৈরি করিয়ে দেন। তিনি মালিয়াড়া উচ্চ বিদ্যালয়কে ৩ বিঘা জমিদান করেন।

রাজবংশ সূত্রে জানা যায় রাজনারায়ণের মৃত্যুর পর অপুত্রক রানী দুর্গাগতি দেবী উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মধ্যম ভ্রাতা যোগেন্দ্রনারায়ণের পুত্র অবনীনাথকে উপেক্ষা করে নগেন্দ্রনারায়ণের পুত্র নৃপেন্দ্রনারায়ণকে নির্বাচন করলে কার্যত রাজপরিবারের বিভাজন ঘটে। অবনীনাথ প্রতিপালন জমিস্বত্ব ও রামলালা-কমলা লক্ষ্মী নিয়ে মূলরাজবাড়ী সংলগ্ন যোগেন্দ্র ভবনে চলে যান। অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় এই আপোষ-মীমাংসাতে সাহায্য করেছিলেন বলে কথিত। এই সময় ঔপনিবেশিক করভারে জর্জরিত এই রাজবংশ বিভিন্ন বন্ধকি মামলা, শরিকি বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। নিম্ন আদালত, জেলা আদালত, হাই কোর্ট পর্যন্ত মামলা গড়ায়। হাজারিমল বাবু বনাম অবনী নাথ অধ্বর্য্যু মামলার রায়ে উচ্চ ন্যায়ালয় মালিয়াড়া রাজম্পত্তির বিভাজন মিতাক্ষরা নীতি মেনেই হবে বলে জানায় (১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে ৫ই সেপ্টেম্বরের রায়। এই মামলা হয় হাজারিমল বনাম আবনীনাথ অধ্বুর্য্যুর, বিচারক আশুতোষ মুখার্জী-ব্রীচক্রফ)। অর্থাৎ বড় সন্তান জমিদারির অধিকারী হবেন ও বাকিরা ভরণপোষণ সম্পদ বা বৃত্তির যোগ্য হবে।

## মন্দির প্রতিষ্ঠা ও মালিয়াড়ার ধর্মীয় পরিমন্ডল

রাজা মণিরাম হত্যা উত্তর শান্তি প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন মন্দির স্থাপত্যের জোয়ার আসে মালিয়াড়ায়। রাজবাড়ীর কুলদেবতা কৃষ্ণগোপাল-ব্রহ্মগোপাল, কুলদেবী অষ্টধাতুর দুর্গা। বর্তমান রাজনারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশে প্রায় ধ্বংশ প্রাপ্ত বেলে পাথরের পঙ্খের কাজ করা নবরত্ন মন্দির এলাকার প্রচীনতম মন্দির। অনেকে বিশ্বাস করেন এটি বিজয়ী মোঘল সেনাপতি মানসিংহ প্রতিষ্ঠিত। তবে মালিয়াড়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা দেব অধ্বর্য্যু বা ঘরবাস এটি তৈরি করেন বলে অনেকের অনুমান ('বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি'তে অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে যে বাসুদেবের কথা বলেছেন তিনি সম্ভবত ঘরবাস অধ্বর্য্যু। ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন একই নাম অনুমান করেছিলেন)। সন্নিহিত এলাকা চট্টোপাধ্যায় পরিবারের দখলে। আমন সিংহ কুলদেবতা কৃষ্ণগোপালের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন (রাজবাড়ী প্রাঙ্গণে নবম পুরুষ আমন সিংহ নির্মিত কৃষ্ণ গোপাল মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ফলকে লেখা আছে "প্রাদাতপ্রাসাদরাজনর পতিমলংশ্রীমদামনসিংহঃ")। এর পর একেরপর এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করে গেছেন দামোদর সিংহ বা তাঁর অনুপ্রেরণায় রাজমাতা, রানী, রাজবধু।

এমন মন্দিরের তালিকা হল ১) ১৮৫৪ সালে কৃষ্ণগোপালের মন্দির সংলগ্ন বারো খিলানের মীনাকারির কারুশোভা যুক্ত নাট্যশালা। তাম্রফলকে প্রতিষ্ঠা লিপি আছে,

> "শ্রীগোবিন্দ পদারবিন্দ যুগলং সংচিত্ত
> চিত্তেনিশং শ্রীকৃষ্ণায় সরাধিকায়
> সমাদাত সন্নাট্যশালাং মুদা শকে স্কন্দমু
> খাব্ধিসাগরসামানে শুভে বাহুলে শ্রীদা
> মোদর দাসভূসুরনৃপঃ সদ্ভক্তিলাভেচ্ছয়া।।"

২) ১৮৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত ছয় খিলানের ষটকোণাকার সপ্তচূড়া বিশিষ্ট পঙ্খ অলংকৃত রাসমঞ্চ শ্বেত পাথরের প্রতিষ্ঠাফলকে লেখা আছে,

> "শাকে যুগ্মকালাদি বসুধামানে মৃগস্থে রবৌ শ্রীবৃন্দাবঙ্কুঞ্জমঞ্জুসদনো বক্রীড়তে রাধয়া। শ্রীকৃষ্ণায় বিধীশবন্দিত পদদ্বন্দ্বায় তৎপ্রীয়তে শ্রীদামোদরচন্দ্র ভূপতিরদাদ্রম্যং নবং মন্দিরং।"

৩) রাস মঞ্চের কাছে ১৮৬৩ সালের কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের শুক্রবার রাজমহিষী শ্রদ্ধাবতী টেরাকোটা কাজ বিশিষ্ট চারচালার শৈলীতে ত্রিখিলানের সমতলের ছাদের একটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দালান রীতির এই মন্দিরে সুন্দর পঙ্খের কাজ করা আছে। শ্বেত পাথরের প্রতিষ্ঠা ফলকে লেখা আছে,

> "শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং গৌরীশাস্যকুলাচলার্ণব ধরামানে শকাব্দে শিতে পক্ষে শুক্রদিনে চ তোয় বিষুবে সুরে তুলারশিগে।
> শ্রীদামোদরচন্দ্রভূপ মহিষী শ্রদ্ধাবতী শ্রীমতী প্রাদাত শ্রীশ সুতুষ্টয়েহমৃতমধীসম্মন্দিরং শূনে।"

৪) ১৮৭০ সালে প্রতিষ্ঠা ফলক ছাড়া (দামোদর সিংহের বড়কুমার ব্রহ্মগোপাল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলে প্রচারিত) মালিয়াড়া-রাজ প্রতিষ্ঠিত ছয়টি খিলানের একমাত্র পঞ্চরত্ন মন্দির। সম্ভবত এটি ব্রহ্মগোপালের মন্দির ছিল।

৫) ১৮২৫ সালে রাজবাড়ীর বাইরে শ্যামকুণ্ডের তীরে ষটকোণার তিনটি শিব দেউল পরপর 'দামোদরচন্দ্রভূপ জননী' কর্তৃক 'প্রীত্যৈনন্দসুতস্য' অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রীতির জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬) ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে দামোদরে পুত্র ব্রহ্মগোপালের মহিষী চন্দ্রকুমারী তেওয়ারীপাড়ায় টেরাকোটা ও পঙ্খে কাজ করা চন্দ্রমৌলী শিবের শিখর দেউল নির্মাণ করেন। শ্বেতপাথরের প্রতিষ্ঠালিপিতে আছে,

> "শ্রাদ্রিসাপ্তসশিমে শাকে সহসি সিন্ধুজে।
> প্রাদাচ্চন্দ্রকুমারীদং মন্দিরং চন্দ্রমৌলয়ে।।"

৭) ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে সমতল ছাদের কারুকার্যহীন চারচালা রীতির রাম মন্দিরটি তৈরি করেন দামোদর সিংহ রাজবাড়ী থেকে সমান্য দূরে। বর্তমানে রামের স্থলে জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের দারুবিগ্রহ পূজিত হয়। সম্ভবত যোগেন্দ্রনারায়ণের আলাদা তরফ করার সময় এই রাম বিগ্রহ এখান থেকে যোগেন্দ্রভবনে যায়। প্রতিষ্ঠালিপিতে আছে,

> "দামোদর চন্দ্র মনে সীতারাম শ্রীচরণে সমর্পিল নবীন মন্দির।
> ছয় নয় সাত একে পরিমাণে অব্দে শকে মিহির।।"

৮) ১৮৭১ সালের দেবোত্তর হিসাবের খাতা থেকে দেখা যায় কাশীধামে ধর্মূপ

মহাল্লায় তিনি পাথরের শিবমন্দিরে দামোদরেশ্বর আদি রূপ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই ভাবে একে একে প্রতিষ্ঠিত হয় সপ্তচূড়া বিশিষ্ট রাসমঞ্চ, টেরাকোটা কারুকার্য খচিত শিব মন্দির এবং বৃহৎ আকৃতির পঞ্চরত্নমন্দির।

৯) মীনকারির কাজ করা দুর্গা মন্দিরটি নৃপেন্দ্রচন্দ্র ১৯৫০ সংস্কার করলেও এর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে অজানা। তবে দামোদর সিংহের দ্বারা এটি প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নয়। রাজকুলদেবী ধাতব দুর্গা কার্তিকহীন। সারা বছর কৃষ্ণগোপালের সাথে পূজা পেলেও দুর্গোৎসবের সময় এই দুর্গা মন্দিরে দেবী রীতি মেনে পূজিতা হন।

এই রাজ্যের দুর্গা আবাহন ঐতিহ্য মন্ডিত। কিছু মতে ঘরবাস সিংহ এর প্রবর্তন করেন। তবে অনেকে মনে করে আমন সিংহই এর প্রবর্তক।

শরতে মালিয়াড়া রাজবাড়ির আলো-অন্ধকার পেরিয়ে আসা নাটমন্দিরে বেজে ওঠে মাদল। বলির বাজনা। অষ্টমীর রাতে। সন্ধি মূহুর্তে দেগে ওঠে বন্দুক। আজো সমস্ত নিয়ম নীতি মেনেই দুর্গাপুজো হয় মালিয়াড়া রাজবাড়িতে।

শুরুতে ছিল তিন দিনের পুজো। তারপর রাজত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপদ থেকে পুজো শুরু। রাজবাড়ির ভিতরে বিশাল ঠাকুর দালানে জমজমাট দুর্গা আরাধনা। কুলডিহা, জালানপুর, পিংরুই, মাধবপুরের মত বাহান্নটি মৌজা থেকে আসত প্রজারা। খাওয়া দাওয়া, বাইজি নাচ, যাত্রার আসরের প্রচলন ছিল।

বাইজি নাচ ছিল রাজবাড়ির বিশেষ আকর্ষণ। বেনারস, লখনৌ, কলকাতা থেকে আসতেন নামী বাইজিরা। ঠাকুর দালান জমে উঠত যাত্রা, রাম লীলার আসরে। রাজন্য প্রথা ও মধ্যসত্ত্ব প্রথা বন্ধের পর টান পড়ে রাজকোষে। ধীরে ধীরে কমে জৌলুস। তবু রাজবাড়ির পুজো দেখতে আজও ভিড় করেন গ্রামের মানুষ।

বিশাল আকারের বেলজিয়াম কাঁচের ঝাড়বাতি, দুর্গামন্দির, নাটমন্দির। সবই আছে। আজও। অতীত বৈভবের স্মৃতি হয়ে। পূর্ব পুরুষদের হাতে লেখা প্রাচীন পুঁথির পদ্ধতি অনুসারেই নিয়ম মেনে আজও প্রতিপদ থেকেই টানা নয় দিন চলে ত্রিনয়নী দেবীর আরাধনা। অতীতের প্রথা মেনে দেবীর পদতলে রক্ষিত দুমুখো তরবারি তোলার পর পূজা শুরু হোত। এখন রাজ পরিবারের সদস্য বা রাজ পুরোহিত স্পর্শ করে কাজ সারেন। কালের কবলে অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে। যেমন রত্ন খচিত রাজ মুকুট, হাতির দাঁতের নানা খেলনা, রূপোর নৌকা এরকম কত কি। আজও কিন্তু বজায় রয়েছে সন্ধি পুজোর সময় কামান দাগানো। যার

আওয়াজ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট এলাকায় অন্যান্য দুর্গা পুজোর সন্ধিপূজা শুরু হয়। পুজো উপলক্ষে দুটি কামান রাজবাড়ির অন্দর মহল থেকে ঠাকুর মন্দিরের সামনে আনা হয়। সন্ধিপুজোর সময় রাজ পরিবারের কোনো সদস্য বন্দুকের ট্রিগার টিপে কামান দাগানোর সংকেত দেন।[১০]

## অধীনস্থ জমিদারি চৈতন্যপুরের দুর্গাপূজা

অধীনস্থ জমিদারি যেমন চৈতন্যপুরে মালিয়াড়া রাজের আনুকূল্যে পূজা শুরু হয়েছিল। অতীতে এই পরিবার ছিল বাঁকুড়ার মালিয়াড়া রাজার অধীনস্থ জমিদার। আদি পুরুষদের পদবি ছিল চট্টোপাধ্যায়। আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে প্রথম দুর্গাপুজোর সুচনা হয়েছিল চৈতন্যপুরের পাশেই তড়কাবাইদ গ্রামে। পুজো শুরু করেন সেই গ্রামের মাধব আচার্য। তাঁর মৃত্যুর পর পুজো ঘিরে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। মালিয়াড়ার রাজা চৈতন্যপুরের জমিদার পরিবারকে পুজোর দায়িত্ব দেন। খরচ বহন করার জন্য দেওয়া হয় কিছু নিষ্কর সম্পত্তি। চট্টোপাধ্যায় পরিবারকে আচার্য পদবিতে ভূষিত করেন রাজা। তাঁর অনুগ্রহে আড়ম্বরপূর্ণ ভাবেই শুরু হয় পুজো।

চৈতন্যপুর গ্রামের আচার্যদের মূল পরিবার ছ'টি। পালা করে এক-একটি পরিবার পুজোর ভার নেয়।

আচার্য পরিবারের পুজো হয় বৈষ্ণব মতে। মায়ের অন্নভোগ হয় প্রতিদিনই। নবমীর অন্নভোগ গ্রহণ করেন গ্রামের সকলে। পুজোয় দেবীর কাছে মানত করেন অনেকে। দণ্ডিও কাটেন কেউ কেউ। অষ্টমীতে হয় মাসকলাই বলি। তবে খড়্গ দিয়ে নয়। এখানে বলিদান হয় মন্ত্র দ্বারা। সন্ধিক্ষণে প্রায় ছ'কিলোমিটার দূরের মালিয়াড়া রাজবাড়ি থেকে তোপধ্বনির আওয়াজ ভেসে আসে। রীতি অনুযায়ী সেই শব্দ চৈতন্যপুরে আসার পরই মন্ত্র দ্বারা মাসকলাই বলি দিয়ে শুরু হয় মাতৃ আরাধনা।

মালিয়াড়ার রাজাদের দেওয়ান ছিলেন কায়স্থ বংশীয়রা। স্থানটি কায়স্থপাড়া নামে পরিচিতি পেয়েছে। এদের পদবী 'রায়'। এখানে এখন একটি মাত্র পরিবার আছে। এদের কাছে পারিবারিক ইতিহাস, দেওয়ানদের তালিকাও নেই। এদের প্রাচীন ভগ্ন গৃহ, প্রাচীন দুর্গা মন্দির, সাড়ে তিনশো বছর আগে প্রতিষ্ঠিত চন্ডী মন্দির, প্রায় একই সময়ে নির্মিত প্রতিষ্ঠালিপি সহ বিষ্ণু মন্দির সেই অতীত গরিমার নিদর্শন। চন্ডী মন্ডপ যেমন পরিবারটির অর্ধউপজাতীয় শিকড়ের ইঙ্গিত দেয়, তেমনিই বিষ্ণু

মন্দিরটি চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব ভাবধারায় রাঢ়ের মাটি প্লাবিত হওয়ার সাথে সঙ্গতি পূর্ণ। একট মতে চন্ডী মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা এখানকার আরেক অভিজাত রাজকর্মচারী 'পাত্র'দের প্রতিষ্ঠিত বলে প্রচারিত। এই অতি প্রাচীন চন্ডী মন্দিরটি প্রায় বিলুপ্ত। ধাতুর চন্ডী মন্দিরটি 'পাত্র' পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পূজিতা। দুর্গা মন্দিরটিও প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। কোন রকমে টিকে আছে বিষ্ণু মন্দিরের অংশটি।

মালিয়াড়া রাজাদের সময়কালে যেকটি পরিবার আর্থিক ভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে আইন ব্যবসায়ে সফল চট্টোপাধ্যায় পরিবার অন্যতম। রাজাদের কোন সিংহদুয়ার না থাকলেও এদের গৃহ পরিসীমায় সিংহদুয়ার গড়ে ওঠার মধ্যে পরিবারটির গরিমা ও প্রতিষ্ঠা বোঝা যায়।

গ্রামের মধ্যে দুইশত বছর প্রাচীন কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এই জঙ্গল গ্রামের আদি বাসিন্দা আকুড়ে ডোমেদের দ্বারা। আদিতে এটি ডাকাতদের আরাধ্য ছিল। কান্যকুব্জ রাজাদের শাসন মালিয়াড়াতে প্রতিষ্ঠিত হলে এই মন্দিরের পূজার দায়িত্বও রাজারা নেন। এই দেবীর সম্মানে গ্রামে আর অন্য কালী পুজো হয় না।[১১]

## শেষ কথা

সেই ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত মালিয়াড়া রাজশক্তির বিস্তার ঘটে।[১২] রাজারা শুধু অত্যাচারী বা প্রজাপীড়ক হন না, দামোদরচন্দ্র বা রাজনারায়ণের প্রজাহিতৈষী মনোভাব ও কাজ থেকেই সেটা প্রমাণিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বাংলা থেকে অস্তমিত হচ্ছে প্রাচীন এক রাজবংশের রাজত্ব! মল্ল রাজবংশ। মল্লভূমের বেশিরভাগ পরগনা কিনে নিলেন বর্ধমান রাজ। আর দু'টি পরগনা স্বতন্ত্র হিসেবে ঘোষিত হল। মালিয়াড়া ও সাহারজোড়া। 'বোর্ড অব রেভিনিউ'-এর অধীনস্থ হলেও নিরঙ্কুশ শাসনভার পেলেন পরগনা দু'টির জমিদারেরা। এই দু'টি পরগনার অন্যতম মালিয়াড়া।

**তথ্যসূত্র :**


১. অশোক মিত্র, পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ৪র্থ খণ্ড, দিল্লী, ১৯৭৪, পৃঃ ৯০।
২. **B Ray, District Census Handbook, Calcutta, 1961, p.157.**
৩. অশোক মিত্র, পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ৪র্থ খণ্ড, দিল্লী, ১৯৭৪, পৃঃ ৯১।
৪. **B S Das, Changing Profile of the Frontier Bengal, Delhi, 1984, p.58.**
৫. **A Mitra, District Handbook, Bankura, 1951, p-XVIII.**

৫ক. প্রচলিত কাহিনী অনুসারে বর্ধমানে দেশীয় রাজাদের আহুত এক বিদ্বজ্জন সভায় সভাপতিত্ব সম্পর্কিত আলোচনাপর্বে সৌমদর্শন ঋষিতুল্য চেহারার মালিয়াড়া-রাজ দামোদর চন্দ্রের প্রবেশ ঘটলে সকলে তাঁকে সভা পরিচালনার অনুরোধ করেন। তাঁর সেই চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ চরিত্রের সম্মানে সভা তাঁকে 'চন্দ্রাধ্বর্য্যু' উপাধি দেয়।

৬. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০, পৃঃ ৩৯।

৭. **A Mitra, District Handbook, Bankura, 1951, p-XVIII.**

৮. **Loknath Ghosh, The Modern History of Indian Chiefs, Rajas, Jamindars, Calcutta, 1879, Part II, p. 3, 4.**

৯. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি, কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত, ১৯২৩, পৃঃ ৫৫।
অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের (স.), বাঁকুড়া লক্ষ্মী (১৩২৯-১৩৩০), বিষ্ণুপুর, ২০১৬, পৃঃ ১২৪।

১০. রাজপরিবারের সদস্য হিমাদ্রিনারায়ণ চন্দ্রাধ্বর্য্যুর কাছে প্রাপ্ত তথ্য।

১১. অশোক মিত্র, পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা, ৪র্থ খণ্ড, দিল্লী, ১৯৭৪, পৃঃ ৯০।

১২. শুভম্ মুখোপাধ্যায়, মল্লভূমের মন্দির—লেখ, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ১৪৪।

# দশম অধ্যায়

# মল্লভূম

## লাউগ্রামের সায়লা উৎসব ও মল্ল রাজবংশের সূচনা পর্ব

অরণ্য অন্তরালে 'জয়পুর কেন্দ্রিক রাজপুতানা' আগত পূণ্যার্থী রাজপরিবারের (তখন পুরীগামী পশ্চিমা ভক্তদের সড়ক পথ ছিল মল্লভূম দিয়ে) সন্তান জন্মের ও পরিত্যাগের কাহিনী ও জনশ্রুতির মধ্যে মল্ল রাজবংশের আদি ইতিহাস নিহিত। এই বালকের (যিনি মল্লবংশের প্রতিষ্ঠাতা আদিমল্ল) রাজ চিহ্নের বহিঃপ্রকাশ ও ক্রমে রাজত্ব স্থাপনের অনুষঙ্গে লাউগ্রামের নাম রাজধানী হিসাবে উঠে এসেছে।[১] এটির প্রামাণিক তথ্য না থাকলেও লাউগ্রামে অতীত স্মৃতিচিহ্ন আজও বহমান। পৈরাগ বলে আদি জলাভূমি বা খাত সংলগ্ন বন আদিমল্লের জন্মঅরণ্য বলে চিহ্নিত। পূর্ব পাড়া সন্নিহিত রাজডাঙ্গা ছিল সেই রাজবাটী। আর দন্ডেশ্বরী মন্দির ছিল রাজার পূজিত দেবালয়। দেবীর আশীর্বাদে রাজদন্ড পাওয়ার জন্য দেবীর এই নাম কিনা তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। তবে আজ তিনি সর্বসাধারণের পূজিতা দেবী। পৈরাগের জল থেকেই বালক রঘুনাথ নারায়ণ শিলা ও সোনার ইট পেয়েছিলেন। তখন থেকে সেই পুকুর পাড়টি 'সোনা ডহরি' বলে চিহ্নিত।[২] আদ্যাবধি দণ্ডেশ্বরী মল্লদের কুলদেবতা। দন্ডেশ্বরীর বর্তমান পঞ্চরত্ন মন্দিরটি অবশ্য ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত। এটির আদি মন্দির রাজা রঘুনাথ বা তান্ত্রিক পঞ্চানন ঘোষালের প্রতিষ্ঠিত বলে জনশ্রুতি।

দন্ডেশ্বরী মন্দির ঘিরে সবচেয়ে বড় উৎসব 'সায়লা' বা 'সাইলা'। সই (বন্ধু) থেকে এই নামের উৎপত্তি। ফি বছর দেবীর বন্ধু খোঁজার অনুষঙ্গে নাকি এই উৎসবের প্রচলন। সেই জন্য প্রত্যেক বছর কোন মহিলা, দেবীর স্বপ্নাদেশ পান

সই হওয়ার। আর দেবী তার মাথার কাছে রেখে আসেন ফুল-বেলপাতা। মহিলা তখন মন্দির পুরোহিতকে প্রথম জানাবেন এ ঘটনা। পুরোহিত গ্রাম সমাজকে তা জ্ঞাত করে প্রকাশ্য সভায় তার সত্যতা যাচাই করেন। অবোধ শিশুকে স্নান করিয়ে 'সায়লা হবে' ও 'সায়লা হবে না' লেখা কাগজের চিরকুট তুলতে দেওয়া হয়। তিনবার 'সায়লা হবে' কাগজ উঠলে তবেই মহিলাকে সায়লা(মায়ের সই) হিসাবে মান্যতা দেওয়া হয়। স্পষ্টতই যে বছর এমন স্বপ্নাদেশ ও সায়লা চিহ্নিত সম্ভব হয়, সে বছরই সবাই এই উৎসবে মেতে ওঠে। শ্রাবণ মাসে এমন ঘটনা ঘটে ও শ্রাবণ-সংক্রান্তি থেকেই 'গুয়া' চালাচালি শুরু হয়। 'মায়ের সই' যাকে আবার তার সই পাতাতে চান তাকে পান, সুপারি, হরিদ্রা, খইচড়া, দধি, নোয়া, শাঁখা, সিন্দুর, আলতা প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য সম্ভারের বরণডালা (যা 'গুয়া' নামে পরিচিত) পাঠান। একই ভাবে গ্রামের অন্যান্য মহিলারা নিজেদের মধ্যে গুয়া চালাচালি করে। প্রাপক মহিলা ফল-মূল মিষ্টান্ন হলুদ-তেল মাখিয়ে প্রেরকের কাছে ফেরত পাঠান। ভাদ্র-আশ্বিন দুই মাস ধরে চলে এই গুয়া চালাচালি। তারপর কার্তিক মাসের এক শুভ দিনে এই উৎসবের সমাপ্তি হয়। ময়নাপুর ও আকুই গ্রামেও এমন উৎসব ছড়িয়ে পড়ে।[১ক]

কয়েক বছরের সায়লা উৎসবের সইদের বিবরণ নিম্নরূপ যা থেকে উৎসবের সর্বজনীনতা ও অন্ত্যজ মানুষদের প্রাধান্য প্রামাণিত হয়,

১) ১৯৩০ সালে হান্দারচকের দেবেন মাজির মা

২) ১৯৪৩ সালে লাউগ্রামের চন্ডী রুইদাসের স্ত্রী

৩) ১৯৫৫ সালে লাউগ্রামের পশুপতির মা

৪) ১৯৫৯ সালে মালিক পাড়ার যমুনা দুলে

৫) ১৯৬৯ সালের লাউগ্রামের কমল পালের স্ত্রী

৬) ১৯৭৭ সালে লাউগ্রামের শোভাকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী

৭) ১৯৮৫ সালে লাউগ্রামের কানাই মাঝির স্ত্রী

৮) ১৯৯৪ সালে লাউগ্রামের রামপদদের স্ত্রী। তালিকা থেকেই পরিষ্কার অন্ত্যজ, উচ্চ সব শ্রেণীর মানুষই দেবীর সই হওয়ার স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন।

জনশ্রুতি অপেক্ষা মল্লরাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আদিমল্ল স্থানীয় অর্ধ-উপজাতীয় সর্দার থেকে নিজগুণে এক রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই মত অনেক বেশি গ্রহণীয়। পরে অবশ্য এলাকার ভৌম রাজবংশগুলির মত পশ্চিম

দেশীয় রাজপুত রাজবংশের সাথে রক্তের সম্পর্ক প্রমাণ করতে পুরীগামী পশ্চিম দেশীয় এক রাজপুরুষের সন্তান সম্ভবা রাজমহিষী লাউগ্রামে সন্তান প্রসব করে স্থানীয় এক ব্রাহ্মণের কাছে গচ্ছিত রেখে আবার তীর্থযাত্রায় চলে যান, এমন কাহিনী প্রচারিত হয়। রাঢ় বাঁকুড়ার উপজাতীয় বা অর্ধ-উপজাতীয় শ্রেণীর ভূম রাজাদের ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তীর্ণ হতে এমন কাহিনীর আবশ্যিক অনুষঙ্গ ছিল।[১খ]

## প্রাক-মল্ল সলদা-গোকুলনগর পরিমন্ডলের তাৎপর্য ও প্রদ্যুম্নপুর কথা :

মল্লভূমে বৈষ্ণব ভাবধারার বিষ্ণুপুরকেন্দ্রিক ভক্তিপরিমন্ডল গড়ে ওঠার আগে জয়পুরের সলদা (পূর্বতন স্বর্ণদহ)-গোকুলনগর শৈব-শক্তিপীঠ গড়ে উঠেছিল মল্ল শক্তি সুসংহত হওয়ার অনেক আগেই। এটি শৈব শশাঙ্কের সামন্ত শাসনাধিষ্ঠান হিসাবে বা সেন আনুকূল্যে গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু এই শৈব পরিমন্ডলেই মল্লরাজবংশের উত্থান ঘটেছিল ও সে কারণে মল্লরা প্রথমাবধি শৈব ছিলেন। হাম্বিরের সময় কাল থেকে বৈষ্ণব ভাবধারা ও স্থাপত্য ক্রমে মল্লভূমে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে।

সেই প্রেক্ষিতে প্রাথমিক ভাবে শৈব-শাক্ত ও পরবর্তীতে প্রাচীন শক্তিশালী ভক্তি রস সিক্ত বৈষ্ণবধারা দিয়ে সলদা-গোকুলনগর পরিমন্ডল গড়ে ওঠা ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কুড়ি বর্গকিলোমিটার পরিসরে জয়পুরের গোকুলনগর ও স্বর্ণদহ (সলদা) সংশ্লিষ্ট এলাকায় বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, শাক্ত, ভাগবৎ ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন এই অঞ্চলের অতীত সমৃদ্ধির প্রমাণ দেয়। এর প্রমাণ মেলে গোকুলচাঁদ মন্দিরের নাটমন্দিরে প্রাপ্ত বৌদ্ধ মূর্তি, জৈন মূর্তি, অনন্তশয্যায় শায়িত ভগবান বিষ্ণুর অপরূপ মূর্তি থেকে।

গোকুলনগরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের 'লাট দেওয়ান বেড়া' এলাকায় বেশ কিছু ধ্বংশপ্রাপ্ত মন্দিরের উপর শায়িত ছিল ক্ষয়িত দিগম্বর ও তীর্থঙ্করের বড় মূর্তি। আর ভাগবৎ যুগের বিষ্ণুর বরাহ ও বামন অবতার মূর্তি। বরাহ অবতারের মূর্তিটির সাজসজ্জা বা অস্ত্রশস্ত্রর কারুকার্য অদ্ভুত সুন্দর ও জীবন্ত। গোকুলনগরের ২ কিমির মধ্যে বাসদেবপুর-রাজগ্রামে আছে নৃসিংদেবের মূর্তি। একই স্থানে তিন অবতার মূর্তির (বরাহ, নৃসিংহ, বামন) এমন প্রাপ্তি ভূভারতে বিরল। রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এই অঞ্চলে বিরল শৈব প্রচারক লকুলীশ মূর্তি দেখে অবাক হয়েছিলেন। এর থেকে এই শৈব পরিমন্ডলের ব্যাপ্তি ও প্রাচীনত্ব বোঝা যায়।

এই পরিমন্ডলে শৈব সংস্কৃতির বড় দৃষ্টান্ত গোকুলনগরের (১) গন্ধেশ্বর শিবমন্দির ও (২) শলদার ভুবেনেশ্বর শিব মন্দির। জনশ্রুতি ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কী আক্রমণে ভুবনেশ্বর শিবমন্দির ধূলিস্যাৎ হয় ও গন্ধেশ্বর শিব মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গোকুলনগরে গন্ধেশ্বর মন্দিরে আছে কারুকার্য খচিত গৌরীপট্ট সহ বৃহদাকার এক শিবলিঙ্গ যা পশ্চিম বঙ্গের বৃহত্তম শিবলিঙ্গ বলে অভিহিত। কারুকার্য খচিত গৌরীপট্টসহ অত্যন্ত বৃহদাকার এই শিবলিঙ্গ শুধু বাঁকুড়া জেলারই বৃহত্তম নয়, সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহত্তম শিবলিঙ্গ। এই শিবলিঙ্গটির দৃশ্যমান অংশের উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট, গৌরীপট্টভেদকারী লিঙ্গটির নিম্নাংশের পরিধি ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং উর্ধাংশের পরিধিও ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি। বৃত্তাকার গৌরীপট্টটির পরিধি ১৩ ফুট ৩ ইঞ্চি। ভগ্নাবিষ্ট চূড়া ও অন্যান্য জ্যামিতিক হিসাবে মূল সপ্তরথ দেউল রীতির এই মন্দিরটি উচ্চতা ছিল ৮০ ফুটের কাছাকাছি।

শুধু তুর্কী আক্রমণই নয়, প্রদ্যুম্নগড়ের রাজপাট,সলদা-গোকুলনগর  শৈব ও বৈষ্ণবধাম সহ এ অঞ্চল বাংলার আফগান শাসক সুলেমান কররানি, কালাপাহাড় আক্রমণ থেকেও রেহাই পায়নি।[৩] এ বিষয়ে ইতিহাস গবেষক মাণিক লাল সিংহ 'পশ্চিম রাঢ় তথা বাকুড়া সংস্কৃতি' পুস্তকের  ১৫৩-১৫৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সুলেমান কররানি, সেনাপতি কালাপাহাড় প্রমুখ প্রবল পরাক্রান্ত আফগান নায়কদের পুনঃপুনঃ আক্রমণে রাঢ, বঙ্গ, উড়িষ্যা সর্বদা ত্রস্ত। সমগ্র উড়িষ্যা হিন্দু-দেবদেবীর বিগ্রহ ভাঙিয়া তছনছ করিতেছেন... জয়পুর ইত্যাদি থানাগুলির উপর যে প্রবল ঝড় বহিয়া গিয়াছিল তাহা স্পষ্ট বোঝা যায় জয়পুর থানার শলদা গ্রামের অগণিত দেবালয়ের ধ্বংসস্তূপ এবং দেবদেবী মূর্তিগুলির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া।"[৪]

প্রদ্যুম্নপুর সংলগ্ন সুবিশাল সলদা-গোকুলনগর পরিমন্ডলে গড়ে উঠেছে শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব আবহ। একের পর গড়ে উঠেছে শিব মন্দির, শক্তি আরাধনার স্থল ও ভক্তিমন্দির। এই মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাকাল ও প্রতিষ্ঠাতা নিয়ে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি। ঐতিহাসিকদের অনুমান এগুলি প্রাকমল্ল বা প্রাকমুসলিম যুগের। গোকুলনগর সন্নিহিত দেউলভিড়া এলাকায় ১০৮ টি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা শিবভক্ত কোন নরপতির অনুকূলে হয়েছিল অনুমান করা যায়। বৈষ্ণব ভাবধারা প্রচলনের আগে মল্লরাজারা শৈব ছিল, কিন্তু হাম্বিরের আগে কোন মল্ল রাজার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সন্দেহাতীত নয় (হয়ত তখন জঙ্গল গ্রামের

অর্ধ-উপজাতীয় সর্দার হিসাবে এঁদের অস্তিত্ব ছিল)। অনেকের মতে শৈব শশাঙ্কের অধীনস্থ প্রদ্যুম্নপুরের সামন্তরাজারা এই অঞ্চলে রাজত্ব করতেন ও সেই শৈব সামন্তরাজাদের অবদান এই শৈবধাম। সেটা সত্যি হলে ৬১৯-৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এর প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। তখন রাজ্যে শাক্ত শশাঙ্কের জামানা। সম্ভবত গোকুলনগর শশাঙ্কের প্রান্তিক প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে এই সময়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই অঞ্চল পরিদর্শনের সময় ওড়িযা ও দক্ষিণী রীতির পশুপতি মূর্তি লকুলীশ দেখে এর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে নিসংশয় হয়েছিলেন।[৫] শৈব ধারার অনুষঙ্গে গোকুলনগর পরিমন্ডলে শাক্ত সাধনারও প্রাবল্য অনুভূত হয়। পাওয়া গেছে গন্ধেশ্বর মন্দিরের মহিষমর্দিনী মূর্তি, শঙ্খসুর, মন্দির গাত্রে প্রোথিত যড়ভূজা কালী বা ভৈরব, ভূবনেশ্বর মন্দির চত্বরে অধুনা প্রাপ্ত বরাহী ও কালী মূর্তি।

গোকুলনগর-সলদা পরিমন্ডলের স্থাপত্য মানচিত্র পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় শৈব প্রাবল্য অস্তমিত হচ্ছে আর তার জায়গায় এই অঞ্চল ক্রমে গুপ্তবৃন্দাবন হিসাবে গড়ে ওঠছে। একদিকে পরিখা বেষ্টিত প্রদ্যুম্নগড়। কিলোমিটার দূরে সমুদ্রবাঁধ। এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে উৎপন্ন যমুনা নদী গোকুলনগর গ্রামের দক্ষিণ বরাবর এক কিমি প্রবাহিত হয়ে কুচিয়াকোল থেকে আগত এক স্রোতের সাথে মিলিত হয়ে আমোদর নাম নিয়ে জয়রামবাটী-গোঘাট হয়ে দ্বারকেশ্বর নদীতে মিশেছে। এই পূণ্যস্রোতা নদীর জল নিয়ে গঙ্গাসম পবিত্রতা জ্ঞানে দেব পূজা সারতেন মা সারদামণি। যমুনার দক্ষিণে দেউলভিড়া গ্রামে আছে শৈব সংস্কৃতির ধ্বংশাবশেষ।

জয়পুর থানার গোকুলনগরের মধ্যমণি হলেন গোকুলচাঁদ। বিষ্ণুপুরকে বলা হয় বৈষ্ণব ভাবধারায় গড়ে ওঠা আরেক বৃন্দাবন। কথিত আছে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা মল্লরাজারা বনবিষ্ণুপুরের ১২ মাইল পূর্বে তৈরি করেন গোকুল মন্দির। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান। যমুনাধারার (জয়পুর-এর সমুদ্র বাঁধ থেকে নিঃসৃত ঝরনা) তীরে গোকুলচাঁদের অবস্থান। মন্দিরের দুই পাশে দুটি বাঁধ, একদিকে যেমন দৃষ্টিসুখের রসদ যোগায়, অন্যদিকে তেমনই গোকুলচাঁদের প্রহরীরও কাজ করে। গোকুলনগর, মথুরানগর বৃন্দাবন ধামের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে একে একে স্থান পায় গোকুলচাঁদ, কালোসোনা, বৃন্দাবন চন্দ্র প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহ। তৈরি হয় শ্রীমন্দির, দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ, ঝুমুরমঞ্চ, নাম-সংকীর্তন মঞ্চ ইত্যাদি। এই ভাবেই গোকুলনগর পরিমন্ডলে বিরাজিত হয় শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর —এই

পঞ্চভাবের। গোকুলচাঁদ মন্দিরের সুরক্ষা ও শোভাবর্ধনার্থে যমুনা নদীর পাশে তৈরি হয়েছিল যমুনাবাঁধ ও জবারবাঁধ জলাধার। দেউলভিড়ার নিকটেই গড়ে উঠেছে যাদবপ্রধান মথুরানগর। শ্রীকৃষ্ণের সেবায় প্রয়োজনীয় দুধ আসত এখান থেকে। গোকুলনগরের দক্ষিণে আছে পুষ্পনগর (ফুলনগর)। পূজার প্রয়োজনীয় ফুলের সরবরাহের উদ্দেশ্যে রাজা পত্তন করেছিলেন এই ফুলনগর। এই পুষ্পনগরের পাশেই গড়ে ওঠে মথুরানগর। গোকুলচাঁদ মন্দিরের এক কিমি উত্তরে রয়েছে গন্ধেশ্বর শিবের মন্দির ও বিগ্রহ। ভুবনেশ্বর শিবের পূর্ব দিকে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন অধুনা প্রাপ্ত বরাহী ও প্রাচীন কালীমূর্তি। গন্ধেশ্বর শিবমন্দিরের উত্তর দিকে মন্দির সংলগ্ন অবস্থায় রয়েছে কাতরা নামক পুষ্করিণী এবং উক্ত শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করে তার চতুষ্পার্শ্বে নির্মিত হয়েছিল, বাণেশ্বর, দানেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, সর্বেশ্বর, পাতালেশ্বর সহ বিভিন্ন নামাঙ্কিত অসংখ্য শিবলিঙ্গের জন্য অসংখ্য ছোট ছোট শিবমন্দির। মন্দিরের সামনে বাগান, পিছনে বটগাছের তলায় ভৈরবস্থান রয়েছে। ক্লোরাইট পাথরে নির্মিত বিশাল এক বরাহ মূর্তি পড়ে রয়েছে গোকুলচাঁদ মন্দির লাগোয়া কর্মকার পুকুরের পাশে। ইনি বিষ্ণুর দশ অবতারের এক অবতার। স্থানীয় মানুষ মূর্তিটিকে ক্ষেত্রপাল জ্ঞানে পুজো করেন। জয়পুরেরই গোকুলনগর লাগোয়া সলদায় মাটির তলা থেকে মিলেছে দেবী বারাহী ও দেবী চণ্ডীকার প্রাচীন মূর্তি। সলদার সামন্ত পাড়ায় আছে একটি বাসুদেব মূর্তিও।

সুবিশাল গোকুলচাঁদ জীউয়ের মন্দির প্রাঙ্গণ হল বাংলা তথা ভারতের অন্যতম বৃহৎ মন্দির প্রাঙ্গণ।[৮] প্রাচীর বেষ্টিত প্রাঙ্গণের উত্তর-দক্ষিণ বিস্তৃতি ১৭৯ ফুট ও পূর্ব-পশ্চিম বিস্তৃতি ১৩১ ফুট। ৪ ফুট চওড়া এবং ১২ ফুট উচ্চ। পূর্বদিকের প্রবেশ পথে ২৫ফুট x ১৪ফুট ১০ইঞ্চি দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বিশিষ্ট কারুকার্য বিশিষ্ট খিলান-আচ্ছাদন ও প্রকোষ্ঠ সমন্বিত তোরণদ্বারটি বিশিষ্টতার দাবি রাখে। এর মধ্যেকার প্রবেশ পথে দুটি প্রস্থে ৪ ফুট ও উচ্চতায় সাত ফুট। ৬ ফুট উচ্চতায় ৩ফুট ২ইঞ্চি প্রস্থ, ৩ফুট ৮ইঞ্চি উচ্চতা, ১ফুট ৬ইঞ্চি গভীর কুলুঙ্গিতে ছিল অনন্ত শয়ানে বিষ্ণু। সন্নিহিত উপমন্দিরে সংরক্ষিত ছিল জৈন ও বৌদ্ধ মূর্তি, যা বর্তমানে অপহৃত।

ল্যাটেরাইট নির্মিত গোকুলচাঁদের মন্দিরটি (বাঁকুড়া জেলার বৃহত্তম পঞ্চরত্ন মন্দির) ৩′৬″ উচ্চ, পূর্ব বাহু ৫৭′, পশ্চিম বাহু ৫৬′৭″ উত্তর বাহু ৫৬′৪″, দক্ষিণ বাহু ৫৫′১০″ পরিমিত ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। পঞ্চরত্ন মন্দিরটি পরিসর পূর্বে ৪৪′১০″, পশ্চিমে ৪৪′১১″, উত্তরে ৪৪′৪″ এবং দক্ষিণে ৪৪′৩″। উচ্চতায় ৬১ ফুট।

দক্ষিণমুখী এই মন্দিরটির দেওয়ালের দুই পাশে আছে দশাবতার ও বুদ্ধদেবের খোদাই করা মূর্তি। মধ্যস্থলে তিনটি প্রবেশদ্বার। উপরিভাগে রয়েছে ক্ষয়িত ও দুর্বোধ্য শিলালিপি। এছাড়া পঙ্খের কাজের লতাপাতা, জোড় হস্তে ভক্তের দল। পূর্বদিকে রাসলীলার চিত্র ও পশ্চিমে একটি তীর্থঙ্করের মূর্তি। বাঁকুড়ায় নির্মিত হিন্দু মন্দিরে আগের বৌদ্ধ ও তীর্থঙ্কর মূর্তি আকছার দেখা যায়। গোকুলনগরেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। মন্দিরের চারকোণের চারটি চূড়ার মধ্যে অগ্নিকোণের চূড়াটি অক্ষত আছে। বাকি তিনটি চূড়া রয়েছে আমলক ও শীর্ষদন্ড বিহীন অবস্থায়। কেন্দ্রস্থলে আছে অষ্টকোণ আকৃতির নয়নাভিরাম শীর্ষ চূড়াটি। নয়নাভিরাম কারুকার্য-খচিত বিশাল এই মন্দিরটি প্রায় ৬০ ফুট উঁচু মোটা মোটা পাথরের দেওয়াল, থাম আর খিলান যুক্ত। মন্দিরের গর্ভগৃহটি এক কথায় অপূর্ব। এর চারদিকে আছে অনেকগুলি খিলান। খিলানে ছোট ছোট নক্সা। মন্দিরের গায়ে দশাবতারের মূর্তি খোদাই করা রয়েছে। এরই সঙ্গে দেওয়া বিভিন্ন অংশে খোদাই করে রাসলীলা আর মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনা চিত্রায়িত হয়েছে। মন্দিরের উপরে পাঁচটি চূড়ার মাঝেরটি সবচেয়ে বড় আর উঁচু। চূড়ার উপরের অংশ ক্রমশ ছুঁচালো হয়ে উপরে উঠে গিয়েছে। চূড়ার একেবারে উপরে একটি করে কলস বসানো রয়েছে। পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ১৮০ ফুট আর উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১৪০ ফুট উঁচু মাকড়া পাথরে তৈরি প্রাচীরঘেরা এই মন্দির। এটি জেলার প্রাচীনতম বাংলা মন্দির।[৭]

পূর্ব দিকে ১৯′৫″ ও ২৪′ প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যের ধ্বংসপ্রাপ্ত রন্ধনশালার ভিত্তিভূমি এখনও অক্ষত আছে। অগ্নিকোণে আছে শস্যাগারের ভিত্তিভূমি। নৈঋত কোণে পাঁচ ফুট ব্যাসের পাথরের কূপের ভগ্নাংশ। তখনকার দিনে এসব থেকে মন্দির কর্মী, ভক্ত, অতিথি ও সাধু-মহন্তদের ভোগ-অন্ন পরিবেশিত হত। চত্বরের দক্ষিণ দিকে ৪৪′ x ২৭′৮″ পরিমাপের একটি মুক্ত/অতিথি মঞ্চ ও পূর্ব-পশ্চিমের ৫৯’৯” দৈঘ্যের ও ৪৪′৯″ প্রস্থের কীর্তন মঞ্চটি অন্যতম দর্শনীয় স্থাপত্য। প্রবেশ দ্বার তিনটির মধ্যবর্তী ৯′৪″ x ৭′৬″ আয়তাকার স্তম্ভ দুটির দুই পাশের মূল দেওয়াল সংলগ্ন স্তম্ভ নিয়ে রচিত হয়েছে ৯′৪″ খিলান বিশিষ্ট দ্বার তিনটি। উত্তর দিকের দেওয়াল প্রস্থে ৯′৪″ এবং আভ্যন্তরের উন্মুক্ত অংশ ২৫′২″ x ৪১′২″। এই অভিনব গঠন শৈলীর ভবনের ঈশান, নৈঋত, বায়ু কোণে আছে তিনটি প্রকোষ্ঠ, অগ্নিকোণে ছাদে ওঠার সিঁড়ি এবং দক্ষিণ দেওয়ালে কুলুঙ্গি ধাঁচে আলমারী যেখানে দেবমূর্তি রাখা থাকত।

এই মন্দিরের বিশালতা ও প্রাচীনত্বে অবাক হতে হয়। জনশ্রুতি এই যে মল্লরাজ

চন্দ্র মল্ল(১৪৬০-১৫০১) এর প্রতিষ্ঠাতা, যদিও তার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। স্পষ্টতই চৈতন্য পরবর্তী সময়ে স্থানীয় নরপতিরা (মল্ল সর্দার ও প্রদ্যুম্ননগর শাসক সহ) বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসে সিঞ্চিত হয়ে এই গুপ্ত বৃন্দাবন গড়ে তুলেছিলেন বা সমৃদ্ধ করেছিলেন।[৭ক] গোকুলনগর ছিল তখনকার রাঢ়ের অন্যতম প্রধান সমৃদ্ধ জনপদ। এই গোকুলনগর ধরেই তৎকালীন রাজধানী তাম্রলিপ্ত যাতায়াত করতেন বহু সওদাগর, রাজা-মহারাজারা। যাওয়ার পথে যাত্রীদের জিরিয়ে নেওয়ার জায়গা ছিল এই মন্দিরটি। পশ্চিমা বণিক, রাজা ও তীর্থযাত্রীদের আনুকূল্যে এই প্রতিষ্ঠানটির সমৃদ্ধিও অসম্ভব কিছু নয়। বাঁকুড়ায় এমন ভাবে অনেক মন্দির গড়ে উঠেছিল ও ভক্তদের দানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। উল্লেখ্য এটি ছিল পুরীগামী সড়ক সন্নিহিত জনপদ। বিশাল এই দেবালয়ে এখন আর গোকুলচাঁদ অর্থাৎ কৃষ্ণের বিগ্রহ নেই। ছবিতেই চলে নিত্য পুজো, ভোগ, সন্ধ্যারতি। পূর্ণিমায় এখনও বড় মেলা বসে এখানে। এছাড়াও রাস, ঝুলন ও জন্মাষ্টমীতেও বিশেষ অনুষ্ঠান হয়।[৮]

সমুদ্র বাঁধের কাছে গড়ে ওঠা গোকুলনগর পরিমন্ডলের অন্যতম ঐতিহাসিক নিদর্শন প্রদ্যুম্নগড় রাজবাটী। এই প্রদ্যুম্নগড় রাজবাটীর চারপাশে ছিল দুটি সুউচ্চ বাঁধ ও তৃতীয় একটি সীমান্ত পরিখা। এই পরিখা ঘেরা গড় কুম্ভস্তল বলে পরিচিত। পরিখার হনুমান তোড়ণ পার হয়ে রাজবাটী ও শ্যামচাঁদ মন্দির পৌঁছতে হত। আর ছিল রাজবাটী সংলগ্ন কানাই সায়র। কথিত আছে ১৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দে আফগান সুলতান সুলেমান করোরানীর সেনাপতি কালাপাহাড়ের আক্রমণে মন্দিরগুলি একই ভাবে লাঞ্ছিত হয়।[৯] প্রদ্যুম্নগড় ওড়িয়া অধিপতিদের রাঢ়ে আধিপত্য বিনষ্ট হওয়ার পর তুর্ক-আফগান শাসনের সূচনা পর্বে গড়ে ওঠা শাসন কেন্দ্র বলে মনে হয়। চতুর্থ অনঙ্গভীমের রাঢ় বিজয়ের পর ১২৪৪ খ্রিষ্টাব্দের মার্চে অনঙ্গ পুত্র জাজনগরের প্রথম নরসিংহদেব বাংলার শাসক তুঘান খানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান করেন। কাটাসনের (অনেকের অনুমান এটি বিষ্ণুপুরের অদূরের কাটাসঙ্গ)যুদ্ধে ওড়িয়া শাসকের হাতে তুর্ক বাহিনীর পরাজয়ে দক্ষিণ রাঢ়ে ওড়িয়া আধিপত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় ১২৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল। প্রথম নরসিংহদেবের জামাতা পরমারদিন বা প্রদ্যুম্ন গড়মন্দারণে প্রান্তিক প্রশাসনিক ও সামরিক ঘাঁটি তৈরি করেন। কিন্তু ১২৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বঙ্গ-বিহারের শাসন কর্তা মুঘিসউদ্দিন ইউজবেক গড়মন্দারণ একাধিকবার আক্রমণ করে ১২৫৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রদ্যুম্নকে পরাজিত করেন। অধ্যাপক পি মুখার্জী এই যুদ্ধের ফলে প্রদ্যুম্নের মৃত্যুর কথা বলেন, যেখানে অধ্যাপক

নুরুল হাসান মনে করতেন সব কিছু ছেড়ে তিনি পলায়ন করেন।[১০] ঐতিহাসিক রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর মতে গড়মন্দারণে পরাজয়ের পর পশ্চাদপসারণ করে প্রদ্যুম্ন বা তার বংশধরেরা জয়পুর জঙ্গলে প্রদ্যুম্নপুর কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন (প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যুম্নের নামে এই গড়ের নাম প্রদ্যুম্নপুর নামকরণ সম্ভব)। গবেষকদের মতে কান্তরে প্রাপ্ত অষ্টভূজা নটরাজ (যেটি স্থানীয়ভাবে ষটক্রবাহিনী নামে পরিচিত) প্রদ্যুম্নপুর রাজাদের গৃহদেবতা ছিল। নটরাজ মূর্তি দক্ষিণ ভারতেই পাওয়া যায়। তাই ওড়িয়া নৃপতিদের অনুষঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় দেবীর রাঢ়ে আগমন রথীন্দ্রমোহন বর্ণিত ইতিহাস ভাবনাকে স্বীকৃতি দেয়।[১০ক] উল্লেখ্য লাউগ্রামের বাগদী বংশীয় এক সর্দার (আদি মল্ল/রঘুনাথ, ৬৯৪-৭১০) নিজের শক্তি সংহত করে প্রদ্যুম্নপুর রাজ্যের উৎসাদন করে মল্লবংশের সূচনা করেন। পরে (জগৎ মল্ল, ৯৯৪-১০০৭?) লাউগ্রাম থেকে বিষ্ণুপুরে মল্লরাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

## মণিপুর-বীরসিংহ-কোড়াসুরগড়ের তাৎপর্য :

সন্ধাকর নন্দী রচিত রামচরিত গ্রন্থ থেকে জানা যায়, হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারে যে সব সামন্তরাজার সাহায্য নিয়েছিলেন পাল রাজা রামপাল তাদের মধ্যে দক্ষিণ-সিংহাসন-চক্রবর্তী বীরগুণ অন্যতম।[১১] তিনি ছিলেন কোটাটবীর রাজা। নলিনীকান্ত ভট্টশীল, নীহাররঞ্জন রায় বিষ্ণুপুরের পনের মাইল পূর্বে কোটেশ্বরের সাথে একে এক করে দেখিয়েছেন।[১২] অন্যদিকে যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি পাত্রসায়ের থানার কাকটিয়া গ্রামের সাথে কোটাটবীর মিল খুঁজে পেয়েছেন। এর সন্নিহিত ডুমনিগড়ের বা কোড়াসুরগড়ের ধ্বংশাবশেষকে অনেকে বীরগুণের (কৈবর্ত রাজা ভীমের বিরুদ্ধে পাল রাজা রামের যুদ্ধ যাত্রায় যে সামন্ত রাজারা রামপালকে সাহায্য কারেছিলেন তাদের মধ্যে বীরগুণ অন্যতম) প্রশাসনিক কেন্দ্র মনে করেন। অনেকে এটি মল্লদের প্রতিরক্ষা গড় বা ঘাঁটি বলে থাকেন।

গড় অভ্যন্তরস্থ চারটি ঢিবি থেকে প্রাচীন কৌলাল, ইট সহ বিভিন্ন প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। দুর্গ সন্নিহিত জলাশয়ের পাড় থেকে প্রাপ্ত পাথরের মিথুন মূর্তি একাদশ-দ্বাদশ শতকের। তাই এখানকার সমৃদ্ধিকাল ওই সময়ের। তবে বীরগুণের এখানেই শাসনাধিষ্ঠান ছিল এমন কথা প্রামাণিত করার মতো যথেষ্ট উপাদান এখনও সংগৃহীত হয়নি। সন্নিহিত বীরসিংহ গ্রাম, মনিপুরও প্রত্নসমৃদ্ধ জনপদ। এই মনিপুরের জঙ্গলে উড়িষ্যা রীতির মাকড়া পাথরের দক্ষিণমুখী এক শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল

বিনোদ পালের পুত্র মনিরাম পালের দ্বারা ১৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে। মনিরামের নামেই মনিপুর জঙ্গল ও জনপদ বলে কথিত। দুর্জন সিংহের সমকালীন এই এলাকায় এক শক্তিশালী পরিবারের অবস্থান সামাজিক ও ঐতিহাসিক নিরিখে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। মল্লরাজসীমার মধ্যে রাজা ছাড়াও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের উত্থান বেশ চমকপ্রদ। এখানে রাজদহ, রানির বাঁধ, সেনাপত বাঁধ, কোটাল বাঁধ, পালেদের নামে এমন সরোবর-বাঁধ এই শক্তি কেন্দ্রেরই আভাস দেয়। মন্দির সংলগ্ন স্থানে ছেদিত তালকাঠ ফসিল, বিভিন্ন বর্ণের মৃৎপাত্র এলাকার প্রাচীনত্ব নির্দেশ করে। প্রথম নরসিংহ ও তুঘান খানের সমর সংঘর্ষের স্মৃতি বিজরিত কাটাসন এই গড়ের অদূরেই। সন্নিহিত রামপাঞ্জ নিয়ে অনেক জনশ্রুতি আছে। এখানে প্রত্নসন্ধানে পাওয়া গেছে ক্ষুদ্রাশ্ম, পুরান কৌলাল ইত্যাদি। প্রাক হাম্বির যুগে এই পরিমন্ডলে বীরসিংহ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দির ও দুর্গ-মন্দির পরিমন্ডলের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্বকে প্রমাণিত করে। সন্নিহিত অরণ্যে একটি বিরল শৈলীর ইদাঁরার অবশেষ ও ভগ্ন শিবিরের চিহ্ন, মন্দির ও এই জঙ্গল শিবিরমুখী (জামকুড়ির দিক থেকে আগত) প্রশস্ত সড়কের অবশেষচিহ্ন এই এলাকার মল্ল সমকালীন এক রাজকীয় বিশ্রাম বা প্রশাসনিক কেন্দ্রের ইঙ্গিত দেয়। ডুমনীগড় লোহারপাড়া, ভৈরব পুকুর, মড়াচৈতা, শিবকুন্ডা অরণ্য মধ্যে অনেক প্রত্নসামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। ডুমনীগ্রামে বিহার থেকে আগত (আদি বাস রাজস্থান) পাত্রসায়েরের হাজরা জমিদারদের রাজপুত প্রহরী হিসাবে নিষ্কর ভূমি লাভ করে বসতি স্থাপন করে। চৈতন্য সিংহের সময়কালে আগত সেই আদি পুরুষ ছিলেন গোবিন্দ সিং। তার পরবর্তী পুরুষরা হলেন ভবতারণ, উমাপদ, গৌরীপদ, প্রবীর।

আলোচ্য গড়টির মোট আয়তন ১৩১.৮০ একর। পোড়া পাতলা ইটের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব দিকের প্রাকার দৈর্ঘ্য ৪৬২০ ফুট আর পশ্চিম প্রাকারের দৈর্ঘ্য ৪৬৮৬ ফুট। অবশিষ্ট প্রাকার পাঁচ ফুট উঁচু ও স্থানে স্থানে ১০ ফুট চওড়া। চার কোণে ও প্রাকারের মাঝে মাঝে প্রতিরক্ষা বা নজরদারি মাচান ছিল। প্রাকার অন্দরে তিনটি টিপি। রাজগৃহ ও রাজমন্দির সহ। উত্তর-দক্ষিণ দিকের অংশে বৈঁচি কাঁটা সহ গুল্মের বন প্রাচীর। অন্য দিকে বড় দিঘি যা প্রতিরক্ষার কাজ করত। বনদুর্গটি বীরগুণের কিনা এটি নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। কারণ কেবল কোতলপুর-ইন্দাস-পাত্রসায়ের নিয়ে এমন এক শক্তিশালী সামন্তরাজার এটি সামন্তরাজ্য ছিল, এমনটি ভাবা কঠিন। রামপালের যুদ্ধসহযোগী অন্য রাজাদের মধ্যে মন্দারণের শূর রাজা

ও আসানসোলের তেলকুপির রাজা ছিলেন। এই দুই শক্তিশালী রাজ্যের মধ্যবর্তী, বিশেষত মন্দারণের এত কাছে বীরগুণের মত শক্তিশালী রাজার রাজত্ব ছিল কিনা সন্দেহ জাগায়। অবশ্য প্রথমে এটি শূর রাজাদের প্রান্তিক প্রতিরক্ষা দূর্গ ও পরবর্তীকালে মল্লরাজাদের, এমন সিদ্ধান্ত করলে বিতর্ক ও সংশয় অনেক কম হয়। এনিয়ে অনেক গবেষণার প্রয়োজন আছে।

## বীরসিংহ পরিমন্ডল

বিষ্ণুপুরের অদূরে বীরসিংহ গ্রাম একটি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ। এর প্রাচীনত্ব প্রাক-মল্ল সময়ের। বীরসিংহ গ্রামের আরেকটি বিশেষত্ব হল শ্রীনিবাস প্রবর্তিত বৈষ্ণব ভাবধারা প্রচলনের পূর্বেই চৈতন্য পার্ষদ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আদর্শ প্রচারিত হয়েছিল সোনামুখী-বীরসিংহ গ্রামের বৈষ্ণব সমাজের মাধ্যমে। এদের বৃহদংশ ছিল তন্তুবায় সহ শ্রমিক জনসমাজ। চৈতন্য পরিকর গোপাল ভট্টের শিষ্য শ্রীনিবাস প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধারা মূলত উচ্চকোটির সমাজেই আবদ্ধ ছিল।[১৩] সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করেনি। গণধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিতে নিত্যানন্দের তিরোধানের পর দ্বিতীয়া পত্নী জাহ্নবীদেবী বিভিন্ন জায়গায় বৈষ্ণব মহামহোৎসব আয়োজন করেন। মল্লভূমের বিভিন্ন প্রান্তে মহাপ্রভু, অভিরাম গোস্বামী, বসুধা-জাহ্নবী, আউল মনোহর, বৈরাগী ঠাকুর, রামদাস বাবাজী, মানিক দাস, উদ্ধারণ দত্ত, রামদাস, মাণিকদাসের নামে এমন মহামহোৎসব আয়োজিত হতে থাকে। শুধু বীরসিংহ গ্রামেই ছটি প্রাচীন মহামহোৎসবের সন্ধান পাওয়া যায়। এই এলাকায় মহাপ্রভু, অভিরাম গোস্বামী, বসুধা-জাহ্নবী, আউল মনোহর, বৈরাগী ঠাকুরের নামে এমন উৎসবের প্রাচীনতা আছে। সোনামুখীতে যেমন জাহ্নবী শিষ্য মনোহরদাসের (নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র অনুরাগী) অনুগামী ছিলেন তন্তুবায়রা। বীরসিংহ গ্রামের তাঁতীরা জাহ্নবী পিতা সূর্যদাস ও পিতৃব্য গৌরীদাসের মন্ত্রশিষ্য গোকুলদাস মহাশয়ের বংশ সম্পর্কিত বৈষ্ণববাদী। মল্ল রাজধানীর বাইরে এই প্রান্তিক জনপদে নিত্যানন্দ-খড়দহ ঘরানার বৈষ্ণব ভাবধারার প্রসার ও একাধিক মন্দির-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। এই প্রাচীন বৈষ্ণব চর্চা কেন্দ্রে সপ্তদশ শতক থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ত্রিশটি বাসুদেব মন্দির গড়ে ওঠে। বৈষ্ণবীয় মেলা ও উৎসবগুলি পালনের সুবিধার্থে গড়ে ওঠে দোলমঞ্চ, রাসমন্ডল, নাটমন্ডপ, পঞ্চরত্ন পিতল রথ, চারচালা, আটচালা, একতল, দ্বিতল, রেখ দেউল, দালান ও গোম্বুজ প্রকৃতির

মন্দিরাজি। এই গ্রামে হাম্বির পুত্র রঘুনাথ ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণমুখী মাকড়া পাথরের বৃন্দাবন চন্দ্রের পঞ্চরত্ন শৈলীর দুর্গা মন্দির গড়ে তোলেন। এই মন্দিরটি মল্ল রাজ বংশের মুল শাখা, কুচিয়াকোল, ইন্দাস ও জামকুড়ি শাখার আনুকূল্য পেয়ে এসেছে। এই মন্দিরে দুই বেলায় প্রদত্ত অন্নভোগেও বৈচিত্র আছে। কাঁচা শালপাতায় পরিবেশিত অন্নভোগে থাকে কাঁচা বিড়িকলাইয়ের ডাল ও পোস্ত পোড়া। ১৬৩৮ সালের পর মাকড়া পাথরের টালি ও চুন-সুরকি ছাদের অলিন্দ যুক্ত দালান মন্দির গড়ে ওঠে। সতের শতকে গড়ে ওঠা আদি দোলমঞ্চ ও রথঘর, যা অধুনা বিলুপ্ত। ১৮৫৫ সালের আগে গড়ে ওঠা চারচালা লাটাই কুমড়ী গঠন শৈলীর রাধাদামোদর মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত। ১৮৫৫ সালে কৃষ্ণচন্দ্র, গুরুচরণ, রামহরি পালের তৈরি টেরাকোটা মাকড়া পাথরের নবরত্ন রাধাদামোদর মন্দির এখনো অক্ষত আছে। ১৮৬০ সালের রাধাদামোদর পঞ্চরত্ন (ইট-চুর-সুরকির) মন্দিরটি ভগ্নদশা প্রাপ্ত। এইভাবে বহু মন্দির এই বৈষ্ণব জনপদটিতে গড়ে উঠেছে। বৃন্দাবন চন্দ্রের ব্যয় নির্বাহের জন্য কাকটিয়া ও বীরসিংহ গ্রামের দেবোত্তর সম্পত্তি ধার্য ছিল। তন্তুবায় সম্প্রদায়ের অনুষঙ্গে বীরসিংহ গ্রামে বৈষ্ণব ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া নিয়ে এলাকায় প্রচলিত প্রবাদ হল, 'বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি/ বৈষ্ণব চিনিতে পারে বীরসিংহের দু'এক তাঁতি।' এই গ্রামে বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও সমকালীন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বিবৃত আছে ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে শ্রী রাইচরণ দাস বিরচিত "শ্রী অভিরাম বন্দনা" নামক একটি পুঁথিতে।

রাস, রথ ও দোল উৎসবের মত চাঁচরও এটি জনপ্রিয় উৎসব। দোলের আগের দিন এই উৎসব পালিত হয়। সন্ধ্যার পর নাম সংকীর্তন করতে করতে রাধা কৃষ্ণকে পাল্কিতে শায়িত করে সারা রাত নগর পরিক্রমা করা হয়। পরিক্রমার শেষে পর্বে তন্তুবায় মন্ডল পরিবারের কর্তাকে মাল্যদান করে সম্মান জানান হয়। এখন এই পরিবারের কেউ না থাকায় কন্যা-জামাতা বংশীয় বাড়িতে এই প্রথা মেনে পালকি নামান হয়। নগর সংকীর্তন শেষে মন্ডলপাড়ার অদূরে বাগদী পরিবারের আয়োজিত 'চাচুরী পোড়া' অনুষ্ঠান দেখতে হাজির হয় দেবতার পালকি। ২৫-৩০ ফুট উঁচু বাঁশের কাঠামো ও তালপাতার ছাউনিতে বাগদী পরিবারের কর্তা অগ্নি সংযোগ করেন। এটি 'মেড়াঘর' নামে পরিচিত। প্রজ্জ্বলিত মেড়াঘর রাধকৃষ্ণ দর্শন কারার মধ্যে কংস প্রেরিত মেদ্রাসুরকে কৃষ্ণের আগুনে পুড়িয়ে মারার অনুকরণ মনে করা হয়। এই বাগদী পরিবার কাসাই কুল কালঋষি গোত্রের নয়টি গ্রামের (আঁতড়া,

শালনা, বলরামপুর, শেওড়াবুলি, কামারবেড়া, জামকুড়ি, ডুমনি, বীরসিংহ, ভড়া) মুখ্যা বা মোড়ল ছিলেন। মনসা ও বারোভূঁঞার মত দুই লৌকিক দেবতা এদের কুলদেবতা। সম্ভবত ঘাটোয়াল সর্দার চূড়ারাম এদের পূর্বজ। এখানকার চাঁচর সহ বিভিন্ন উৎসবের অনুরূপ উৎসব হত অদূরের বালসী গ্রামে।

মন্ডলরা ছিলেন গ্রামের শ্রদ্ধেয় আদি বনেদী পরিবার। মহোৎসব তলায় প্রাচীন বাস্তু ভিটা, মাকড়া পাথরের বিশাল দেব চত্বর, সন্নিহিত জমিদারী মোড়ল পুকুর সেই অতীত সমৃদ্ধির অবক্ষেপ। উল্লেখ্য বিজয়া দশমীর পরদিন শুক্ল একাদশীর দিন এরা কুলদেবতা শিব-দুর্গার পূজা করে (কুলপূজা) তাঁতের কাজ বন্ধ রেখে। এদের সাথে মল্লরাজের মান্যতার সম্পর্ক ছিল। শৈব তন্তুবায়রা মল্লভূমের বৈষ্ণবীয় ধারার প্লাবনে ক্রমে বৈষ্ণব মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন।

প্রাচীন গঞ্জ কিশোরীগঞ্জ ছাড়াও গড়ে উঠেছিল রথতলা, দোলতলা, মহোৎসবতলার মত প্রাচীন পল্লী। লিখিত ও অনুলিখিত হয়েছে বহু পুঁথি। এখানে প্রাপ্ত বৈষ্ণবীয় ফরমানে কীর্তনীয়াদের নাম উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় একটি ফরমানে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আনন্দ মহাশয় ও নিতাই কর নাম্নী দুই কীর্তনীয়ার নাম পাওয়া যায়। এখানকার বৈষ্ণব সমাজের সাথে প্রদ্যুম্নপুরের বৈষ্ণব সমাজের পুঁথির আদানপ্রদান ও অনুলিখন হত।

## ছান্দার পরিমন্ডল

নিশ্চিত ভাবেই সেন পূর্ববর্তী সময়ে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চল শূর শাসিত ছিল। গড়মন্দারণে শূরবংশের নাম পাওয়া যায়। সেন বংশের উত্থান ঘটেছিল শূর শাসনের প্রভাব অস্তমিত হওয়ার পর। সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেন (১০৯৫-১১৫৭) শূরবংশীয় রাজকন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ করেছিলেন। এই কন্যা সম্ভবত আরম্যনগরের প্রন্তিক দুর্গনগরী গড়মন্দারণের। পাল বংশের অন্তভাগের রাজা রামপালের (১০৭৭-১১২২) সমকালীন অপরমন্দারের রাজা ছিলেন লক্ষ্মীশূর। বিলাসদেবী এই পরিবারেরই মনে করা হয়। এর আগে রাজেন্দ্র চোলের (১০১২-১০৪৪) বাহিনীর হাতে পরাজিত বাংলার রাজাদের মধ্যে ছিলেন দক্ষিণ রাঢ়ের রণশূর। এর থেকে বোঝা যায় রণশূর, লক্ষ্মীশূর, বিলাসদেবীরা দক্ষিণ রাঢ়ের শূর বংশের রাজধারার অংশ। ছান্দার পরিমন্ডলকে অনেকে শূরভূম বলেন।[১৩ক]

ঐতিহাসিক মাণিকলাল সিংহ সহ অনেকের ধারণা ছান্দারেই ছিল শালিবাহনের

গড়। তার সাথে দামোদরের অপর পাড়ের গোপভূমের লড়াই ছিল। শালিবাহন পুত্র প্রথম নৃসিংহবাহন ওরফে শীতল মল্লের সাথে ইছাই ঘোষের লড়াই বাঁধলে শীতল মল্ল ও সেনাপতি কালুবীর নিহত হন (১৩ই বৈশাখ)। ইছাই ঘোষ ছিলেন গোপভূমের রাজা (মহীপালের সমকালীন, ৯৭৭-১০২৭ সালের মধ্যে)। সেই হিসাবে প্রথম নৃসিংহবাহন ওরফে শীতল মল্লের সময়কাল ১০০০ খ্রিষ্টাব্দের আশেপাশে হওয়া উচিত। এরেকটা জনশ্রুতি হল শীতল মল্লের সাথে মল্লরাজ বীরসংহের লড়াই। রণিয়াড়া গ্রামে শীতল মল্লের প্রতিষ্ঠিত 'দুধ কোঙার' নামে রাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহ ও মন্দির জয়ের স্মারক হিসাবে বীরসিংহ ১৬৭০ সালে (মদনমোহন মূর্তিসহ) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালিপি তাঁর নামেই। চালু হয় বাৎসরিক পৌষালী উৎসব বা কেন্দুলীর মেলা। কিন্তু এই যুদ্ধ ও সময় সম্পর্কিত জনশ্রুতি মানলে কালবিভ্রাট আরো বাড়ে। মাণিক সিংহের মতে ২য় শালিবাহনের পুত্র ২য় নৃসিংহবাহনের সাথে সামন্তভূমের প্রথম উত্তর হামিরের(১৫৫৪ খ্রিষ্টাব্দের আশেপাশে) যুদ্ধ লেগেছিল। তবে এনিয়ে কাল বিভ্রাট (তিন প্রজন্মের কালসীমা ৫০০ বছরের) তথ্যভিত্তিক ইতিহাস রচনায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হয়ত সবটাই জনশ্রুতি।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে ছান্দার পরিমন্ডলের অন্তর্গত সাহারজোড়া অঞ্চলে শূর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দক্ষিণ রাঢ়ে শূর আধিপত্যের ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। মনে হয় ছান্দার পরিমন্ডল থেকে শূর আধিপত্য পূর্ব দিকে সরে আসে এবং তিনটি শক্তি কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এগুলি হল হুগলীর গড় মন্দারণ, বর্ধমানের শূরনগর ও বাঁকুড়া-জয়পুরের প্রদ্যুম্ননগরে। অষ্টম শতকের শেষপাদ থেকে নবম শতক পর্যন্ত ছান্দার পরিমন্ডলে শূর রাজত্ব ছিল বলে জনশ্রুতি। ছান্দার-সাহারজোড়া পরিমন্ডলে রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের আগমন ও বিষ্ণু-বাসুদেবের আরাধনা শুরু হয়।[১৪]

ছান্দার পরিমন্ডলে শালিবাহনের রাজত্ব গড়ে উঠেছিল বলে একটি জোরালো মত আছে। ২য় নরসিংহের রাঢ় অভিযানের সময় সেনানায়ক শালিবাহন (১২৯৬-১৩১৬) এখানে রাজ বংশের পত্তন করেন বলে কথিত। এর পরের রাজা নৃসিংহ বাহন (১৩১৬-১৩৩৬)। দ্বিতীয় শালিবাহন (১৩৩৬-১৩৫০) ও দ্বিতীয় নৃসিংহ বাহন (১৩৫০-১৩৮০) তার পরবর্তী রাজা। দ্বিতীয় শালিবাহন ইছাই মল্ল নামে পরিচিত ও ইছারিয়া গ্রামে শাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিক গৌরপদ সেনের এই কালক্রম মানলে গোপভূমি অধিপতি ইছাই ঘোষ, সামন্তরাজ প্রথম উত্তর হামিরের সাথে এই পরিবারের যুদ্ধের ঘটনা ঘটার সম্ভবনা নেই।[১৪ক]

## মল্লভূমের পত্তন ও মল্ল রাজবংশের ইতিহাস

ভূমরাজ্যগুলির মধ্যে মল্লভূমির ইতিহাস অতীব প্রাচীন। শূররাজ্যের প্রভাব ছিল মল্লভূম জুড়ে। শূর প্রভাবের প্রাবল্য অন্তর্হিত হয় উদীয়মান শৈব সেন রাজাদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার পরিসরের মধ্যে। লক্ষ্মণ সেনের সময় থেকে বাংলায় তুর্ক-আফগান শাসনের ছায়াপাত মল্লভূমকেও অশান্ত করে তোলে। ক্রমে দক্ষিণ রাঢ়ের এই অংশে ওড়িয়া আধিপত্যের শেষ চিহ্ন অপসৃত হয়। গড়মন্দারণের ওড়িয়া শাসক ওড়িয়া বংশীয় সামন্ত প্রদ্যুম্ন এদের হাতে আক্রান্ত ও পরাজিত হয়ে অরণ্য অভ্যন্তরে জয়পুরে প্রদ্যুম্নপুরের পত্তন করে স্থানীয় শাসক হয়ে পড়েন। পরে লাউগ্রামের স্থানীয় দলপতি এই রাজত্বের অবসান ঘটালে দীর্ঘ মল্ল শাসনের সূচনা ঘটে। মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরে স্থানান্তরিত হয় ও এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সূচনা ঘটে। ইতিহাসে মল্লভূমের প্রথম রাজার নাম পাওয়া যায় বীর হাম্বিরের। সম্ভবত স্থানীয় দলপতি থেকে বীর হাম্বিরের সময়ে মল্লবংশের নেতৃত্বে শক্তিশালী রাজত্বের সূচনা ঘটে।

মল্লভূমে রাজা হাম্বির থেকে রাজবংশের ইতিহাস ও কার্যকলাপ বিভিন্ন নথিতে উল্লেখিত। হাম্বির পূর্ব মল্লরাজাদের নাম ও কীর্তি মূলত জনশ্রুতি। মল্লরাজাদের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত খতিয়ান নিম্নে আলোচিত হল।

### বীর হাম্বির (১৬২০ - ১৬২৬) :

বীর হাম্বিরের শাসন মল্লভূমের এক উজ্জ্বল ঐতিহাসিক ক্ষণ। তিনি মোঘল সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের সমকালীন ছিলেন। মোঘলের বাংলা বিজয়ে তিনি সক্রিয় অংশ নিয়ে তাদের আনুকূল্যে মল্লভূমিকে একটি শক্তিশালী ভূমরাজ্যে পরিণত করেন। আকবরের বিভিন্ন অভিযানের সহায়ক হিসাবে মল্ল পদাতিক, অশ্বারোহী, তীরন্দাজ বাহিনী, গোলন্দাজ বাহিনী সামরিক শক্তিতে মল্লভূমকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে।

১৫৯০ সালে মোঘল-আফগান দ্বন্দ্বে উড়িষ্যার আফগান শাসক কোতল খাঁর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে মোঘল সেনাপতি মানসিংহ আরম্যনগর-মন্দারণে শিবির স্থাপন করলে আফগান দলপতি কোতলপুরে নিজের শক্তি সংহত করেন।[১৪খ] এ যুদ্ধে মল্লরাজ মোঘলের পক্ষে থাকেন। রাইপুরে আফগানদের একটি সেনাশিবিরে অভিযান করতে গিয়ে মানসিংহ পুত্র জগৎ অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে মল্লরাজের তৎপরতায় তাঁর প্রাণ রক্ষা হয় ও তাঁকে মল্লসেনা বিষ্ণুপুরে অক্ষত অবস্থায় সরিয়ে

নিয়ে আসে। মানসিংহ-কোতল খাঁ চূড়ান্ত যুদ্ধ হয় ২১মে ১৫৯১ বা ১৫৯২ খ্রিঃ।[১৫]

এই ঘটনায় কৃতজ্ঞ মান সিংহ মোঘল ফরমানের সাহায্যে হাম্বিরকে বেশ কিছু সুবিধা দেন।[১৫ক] যেমন মল্লরাজকে কামান নির্মাণ ও গোলন্দাজ বাহিনী রাখার অধিকার প্রদান। হাম্বিরের তত্ত্বাবধানে আফগান প্রভাবিত উড়িষ্যা থেকে ভবিষ্যতে আক্রমণ প্রতিহত করতে হাম্বিরের অধীনে মেদিনীপুরের (মন্দারণ ও জলেশ্বরের) ২৯টি কেল্লা তুলে দেওয়া হয়। সঙ্গে সন্নিহিত কিছু জমিদারি।[১৬] এমনি ভাবে সাতটি জমিদারির খাসদখল ও তমলুক, মহিষাদল, বামনভুম, রায়পুর, মানভূমের জমিদারি পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে আসে। আকবরের রাজ সভা পন্ডিত আবুল ফজলের "আইন-ই-আকবরী" বইতে উল্লেখ আছে যে বিষ্ণুপুরের রাজার নিজের পনেরটি এবং তার অধীনে বার জন সামন্ত রাজার বারটি দুর্গ বা গড় ছিল। সব গড়গুলির সঠিক বিবরণ এখনও জানা যায় নাই। তবে ওন্দা থানার মধ্যে করাসুর গড়, কৃষ্ণগড়, অসুরগড়, শ্যামসুন্দর গড়, হোমগড়; মেদিনীপুর জেলার মধ্যে রামগড়, বেত্রগড় (গড়বেতা), গোহালতোড়, ধরাপাট; হুগলী জেলার মধ্যে মন্দারগড়, কাকটার নিকট ডুমনীগড় প্রভৃতি গড়গুলির ধ্বংসাবশেষ বিষ্ণুপুরের রাজার অতীতকালের প্রতাপ প্রতিপত্তির প্রমাণ।[১৭]

তিনি সম্ভবত পঞ্চকোটও দখল করেছিলেন। বেগলারের মতে পঞ্চকোটের তোরণ দুর্গে হাম্বিরের এই বিজয় লিপি ক্ষোদিত ছিল।[১৮] এসময় তাঁর প্রতি সামন্তভূম মিত্রতামূলক অধীনতা স্বীকার করে থাকতে পারে বলে অনেকের অনুমান। রথীন্দ্রবাবুর মতে সমকালীন ভূমরাজ্যগুলোর লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে ঝটিতি আক্রমণে আধিপত্য বিস্তারের অনুষঙ্গে ছাতনাসহ শিখরভূমে (পঞ্চকোট) মল্লভূমের প্রভাব অব্যাহত ছিল ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। খড়িবাড়ি ও দুয়ারবন্দ তোরণদ্বারের (পঞ্চকোট) লিপি তার ইঙ্গিত দেয়।[১৯] শ্যামসুন্দরপুরও এই সময় মল্লের মিত্রতামূলক অধীনতায় বাঁধা পরেছিল। হাম্বির কন্যা শ্যামাকুমারীর সাথে শ্যামসুন্দরপুরের রাজার বিবাহ হলে এই বন্ধন দৃঢ় হয়। তখন থেকেই মল্ল বাহিনীতে শ্যামসুন্দরপুরের যুবকদের যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হত। রাইপুরে মল্লসেনার গতিবিধি থেকে এলাকায় মল্লরাজের প্রাধান্য প্রমাণিত হয়। সিমলাপালের রাজাও এ সময় সম্ভবত মল্লরাজার আনুগত্য মেনে নিয়েছিল। মোট কথা হাম্বিরের সমকালে মল্লভূম শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। তবে পরবর্তী সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে মল্ল-মোঘল সম্পর্কের অবনতি ঘটে। পেশকাশ না দেওয়ার অভিযোগে ১৬০৮

সালে বাংলার সুবেদার ইসলাম খাঁ, শেখ কামালের নেতৃত্বে মল্লভূমে সামরিক অভিযান করেন। পেশকাশ দিয়ে (এক লক্ষ সাত হাজার টাকা?) হাম্বির মোঘলের অধীনতা স্বীকার করে নেন এবং কামাল শিবির-এর সাথে পূর্ব বঙ্গে বিদ্রোহ দমনে অংশ নেন। শরিক হন বীরভূম ও হিজলি অভিযানের। ১৬১৪ সালে আরেকবার সুবেদার কাশিম খাঁ কাছারে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকলে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সুবেদার এর পর কাছার থেকে মল্লভূমের দিকে অভিযানের প্রস্তুতি নিতে থাকলে তিনি পুনরায় মোঘলের অধীনতা স্বীকার করেন। হাম্বির ঘাটোয়ালী ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেন।

১৭৭৮ সালের একটি নথি থেকে জানা যায়, বীর হাম্বির তার জমিদারী ২২ সন্তানদের কয়েকজনের মধ্যে ভাগ করে তদারকির দায়িত্ব দেন। জ্যেষ্ঠ ধর হাম্বির পান কপুকেশিয়া (এটি গঙ্গাজলঘাটির কেশিয়াড়া মৌজা কেন্দ্রিক, এখানে ১৭১৮ সালে মল্লসেনা পরিবারের তিলক চন্দ্র এক পঞ্চরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন), দ্বিতীয় সন্তান শীতল মল্ল গড় রণিয়াড়া (এখানে একটি ল্যাটেরাইট মন্দির আছে), তৃতীয় সন্তান বীর বাঁকুড়া জয়বেলিয়া (এর নামে শহর বাকুড়ার প্রতিষ্ঠা বলে জনশ্রুতি), চতুর্থ মাধব সিংহ পদমপুর (প্রদ্যুম্নপুরে প্রাপ্ত একটি লেখতে মাধবের নাম পাওয়া গেছে), পঞ্চম কুমার রূপনারায়ণ পান গোকুলনগর (ইতিমধ্যেই মন্দিরনগরী হিসাবে খ্যাত)ও অষ্টম (ষষ্ঠ ও সপ্তম কুমারের নাম ও মহল অজ্ঞাত) রঘুনাথ পান বৈতল (এখানে গড়ধার বলে একটি সামরিক কেন্দ্র বা কেল্লা গড়ে উঠেছিল রঘুনাথের হাতে, যিনি ১৬৫৯ সালে এখানে ঝগড়াইচন্ডী মন্দির স্থাপন করে দেন)। তাঁর সময়ে এক্তেশ্বর মন্দিরের সংস্কার সাধিত হয়।

কথিত আছে হাম্বির 'বীর' উপাধিতে ভূষিত হন পাঠান দাউদ খাঁর আক্রমণ প্রতিহত করে। সিংহাসন আরোহণের কিছু সময় পরে সুলেমান পুত্র বঙ্গেশ্বর দাউদ রাজধানী সন্নিহিত রানীসাগরে লক্ষ সেনা সমাবেশ করে মল্ল সেনার মুখোমুখি হয়। মুণ্ডমালা ঘাটের এই যুদ্ধে দাউদের পরাজয় ঘটে। পরজিত পাঠানদের মুন্ডের স্তুপ জমেছিল বলে অনেকে তার থেকে এই ঘাটের মুন্ডমালা নামকরণ বলে বিশ্বাস করেন।[১৯ক]

চৈতন্য পরবর্তী সময়ে চৈতন্য পার্যদ নিত্যানন্দের অনুগামী ও পরবর্তীকালে শ্রীনিবাস আচার্য মল্লভূমিকে বৈষ্ণব ভাবধারায় প্লাবিত করলে লৌকিক দেবতা ও শিবের পূজক রাজবংশ এই নবপ্রবর্তিত ভক্তি ধর্মের অনুসারী হন। দেশে বৈষ্ণব

স্থাপত্যের জোয়ার আসে। দেশ জুড়ে রাজানুকূল্যে এবং অনেক ক্ষেত্রে বণিক সম্পদায়ের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় একের পর এক মন্দির। শুরু হয় রাশ, চাঁচর, দোল উৎসবের মত ভক্তি উৎসব। সাথে মাতৃআরাধনাও। পরবর্তীকালে মল্লরাজ সহ সব অধীনস্ত জমিদার বাড়িতে মাতৃআরাধনা সহ ভক্তি উৎসবগুলি সাধারণের বিপুল অংশ গ্রহণের ফলে সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করে।

হাম্বিরের সময় বৈষ্ণব ভাবধারা মল্লভূমে জমাট বাঁধছিল। পরমেশ্বর মল্লিকের মত বৈষ্ণব প্রচারক ও নিত্যানন্দের অনুগামীরা ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে এই ভাবধারার প্রচার শুরু করেছিল। রাজ সভাপন্ডিত ব্যাসাচার্য ভাগবদ গীতার পাঠ সহ বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে রাজসভা ও রাজ্যে ভক্তিমূলক পরিমন্ডল রচনায় ব্যাপ্ত ছিলেন। এই অবস্থায় বৃন্দাবন থেকে আগত শ্রীনিবাস অপহৃত তিন গোশকট পূর্ণ বৈষ্ণব পুঁথির সন্ধানে রাজসভায় হাজির হলে রাজা এই পরম বৈষ্ণবকে আপন রাজ্যে স্থায়ী অতিথি করে বিষ্ণুপুরকে দ্বিতীয় বৃন্দাবন বা গুপ্ত বৃন্দাবন করার সাধনায় মেতে উঠলেন।

খুব সম্ভব ধারাপট শ্যামচাঁদ মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় ১৬০৩ খ্রিষ্টাব্দে, তাঁর হাত দিয়ে। ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে রাসমঞ্চ প্রতিষ্ঠা তাঁর অমর কীর্তি। ৫ ফুট উঁচু ও ৮০ বর্গফুট আয়তনের দেশী লাল মকরা পাথরের আসনের উপর ইটের তৈরি ৩৫ ফুঁট উঁচু প্রধান মন্দির। সম্পূর্ণ মন্দিরটি রোদে পোড়ানো ইটে গাঁথা। তবে গাঁথার জন্য লোহার রড বা সিমেন্টের ব্যবহার করা হয়নি। প্রচুর পরিমাণে চুন,গাছের আঠা এবং কাদামাটির মিশ্রণ ও সুরকি ব্যবহার করে মন্দিরের ইট গুলিকে গাঁথা হয়েছিলো। মন্দিরটি তৈরি হওয়ার পর, সৌন্দর্যায়নের জন্য ইটের গাঁথুনির উপর দেওয়া হয় টেরাকোটার আচ্ছাদন। সমগ্র মন্দির গাত্রে বসানো হয়েছে অসংখ্য টেরাকোটার ফলক এবং পাথরে খোদাইকৃত নকশা। অলঙ্করনের বিষয়বস্তু হল মানবমানবী, সমাজজীবন, ঘোড়া, পালকী, ফুল, পাতা, রামায়ণ ও রাধা কৃষ্ণের আখ্যান ইত্যাদি।

রাসমঞ্চে শ্রীনিবাস ও রাজ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ভক্তিমূলক পালা পরিবেশিত হত (দক্ষিণ ও পূর্ব প্রান্তে)। বিষ্ণুপুরের মল্লেশ্বর (১৬২২ খ্রিষ্টাব্দে) ও বীরসিংহ গ্রামের বৃন্দাবন চন্দ্র মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাঁর নাম উঠে আসে (আদপে এটি শেষ হয় ১৬৩৮ সালে, রাজা প্রথম রঘুনাথের আমলে)। কুলদেবতা মদনমোহনের আগমন তাঁর সময়েই বলে জনশ্রুতি। একট মতে দ্বারকেশ্বর নদী থেকে সোনার ইঁট, তৈজসপত্র সহ এটি কুড়িয়ে পাওয়া যায়। অন্য মতটি হল বর্ধমানের বীরসিংহ গ্রামের ধরণী ব্রাহ্মণের বাড়ি থেকে।[২০] আরেকটি মতে

বৃষভানপুরের এক ব্রাহ্মণের গৃহ থেকে।[২১] তিনি বৃন্দাবন থেকে এটি সংগ্রহ করে এনেছিলেন, সেই মতও প্রবল। মদনমোহনের বর্তমান মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় বীরসিংহের আমলে।

হাম্বিরের সময়ে প্রচলিত প্রশাসনিক কাঠামো ও ঘাটোয়ালতন্ত্র পরবর্তী মল্লরাজাদের সময়েও প্রায় অবিকৃত ছিল। রাজধানীর সদর কাছারিতে রাজস্ব বিষয়ে দায়িত্ববান ছিলেন দেওয়ান। সদর নায়েবও থাকত। কিছু মফস্বল কাছারিও ছিল। দেওয়ান ও নায়েবদের সাহায্য করার জন্য ছিল কারকুন, খাজাঞ্জী, সেরেস্তাদার, আমিন, মুন্সী প্রমুখ। মল্লভূমে দশটি পরগণা ও ঊনআশিটি হুদা বা তরফ ছিল। কয়েকটি ডিহি নিয়ে তরফ গঠিত ছিল। ডিহি হল কয়েক গ্রামের সমষ্টি। পরগণার দায়িত্বে থাকতেন নায়েব বা চৌধুরী। নিযুক্ত করতেন রাজা। নায়েবের ছিল বিবিধ দায়িত্ব। তানিয়াৎ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে খেলাপী রায়ত বা কুতকিনদারদের (সম্পন্ন কৃষক) কাছে পাইক বা বরকন্দাজ পাঠান হত। রায়তদের নিরাপত্তা, ডাকাতি বন্ধ, রায়তদের দেশান্তরী হওয়া বন্ধ, খেলাপীদের শাস্তি, শস্য-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা ছিল এদের কাজ। প্রয়োজনীয় নোটিশ (মহুশীল) পাঠানো হত এদের মাধ্যমে। পরগণার বিচারের ভারও ছিল নায়েবদের হাতে।

প্রতিটি তরফে থাকত পাটোয়ারী, মন্ডল, পাইক। ডিহিদার পদের কথা শোনা গেলেও মল্লভূমে এটির বিশেষ চল দেখা যায়নি। প্রতিটি গ্রামের মাথা হিসাবে মন্ডলকে বা মুখ্যাকে মানা হত। এদের কাজ ছিল রায়তের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে কুটকিনাদারদের মাধ্যমে জমার ব্যবস্থা করা। কর অনাদায়ে সাময়িক ভাবে শস্য-সম্পত্তি অধিগ্রহণের অধিকার এদের ছিল। কোন জমি যাতে পতিত পড়ে না থাকে তাও এদের নিশ্চিত করতে হত। পরগণার শাসনভার থাকত রাজার আস্থাভাজন বা আত্মীয় ফৌজদারের হাতে এবং মহলের দায়িত্ব পেত কোন যুবরাজ বা রাজপরিবারের বরিষ্ঠ কেউ।

মল্ল শাসনে পর্যটক ও পথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন জায়গায় ঘাট বা চৈকি তৈরি ও ঘাটোয়াল নিয়োগ করা হত। এদের ভরণপোষণের জন্য নিষ্কর জমি দেওয়া হত। এদের কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠা নিয়ে ফরাসী পর্যটক এ্যাবে রেনল উচ্চ প্রশংসা করেছেন। এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে পৌছে দেওয়ার দায়িত্বে থাকতেন ঘাটোয়াল। কারো কোন কিছু পথিমধ্যে খোয়া গেলে ঘাটোয়ালরা তা প্রদর্শিত করে রাখতেন এবং ঘাটগুলিতে খবর পৌছে দেওয়া হত। আর এদের আর একটি দায়িত্ব

ছিল পঞ্চকি আদায়। ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন ঘাটের তালিকা ও অধীনস্থ লোকেদের থেকে পঞ্চকির আদায় পরিমাণ নিম্নরূপ। ১) বলরাপপুর ঘাটে হারাধন চৌধুরীর অধীনস্থ ১০৩ লোকের পঞ্চকি ১২৪-৮-০ (২) মকরন্দপুর ঘাটে গোবিন্দ সিংএর অধীনস্থ ২০০ লোকের পঞ্চকি ৬৮৩-১০-০ (৩) বাঁকাদহ ঘাটে সামসুর বাহাদুরের অধীনস্থ ২০৪ লোকের পঞ্চকি ২৫৯ (৪) বেলসুলিয়া ঘাটে নেত্য দিগরের অধীনস্থ ৪১ লোকের পঞ্চকি ৭৫৯-১২-০ (৫) কান্তোর ঘাটে বাকলার বঙ্গীর অধীনস্থ ১৬৭ লোকের পঞ্চকি ৩৬০ (৬) জয়বেলিয়া ঘাটে রতন সিংএর অধীনস্থ ১৬০ লোকের পঞ্চকি ৮১৮-৪-০ (৭) মুনিপুর/মুনিনগর ঘাটে গৌর হাজারির অধীনস্থ ৩০ লোকের পঞ্চকি ২২৭-০-০ (৮) দিগপাড়া/ পাল তেতুল ঘাটে নন্দ কিশোর দিগরের অধীনস্থ ১৫৪ লোকের পঞ্চকি ২৭৭-৪-০ (৯) তালসাঁকো ঘাটে লালু রায় ও শত্রুঘ্ন হাজারির অধীনস্থ ৩৪ লোকের পঞ্চকি ২৩৯-১৪-১১। পাত্রসায়েরের বীরসিংহ গ্রামে একটি ঘাট ছিল বলে অনুমান করা যায় গ্রামের মধ্যেকার স্থাননাম থেকে। এই গ্রামে ফাঁড়ির বটতলা স্থাননামে একটি ঘাট বা চৌকি ছিল। বাহাদুরপুর মৌজায় ২০০ বিঘা নিষ্কর জমির মালিক মুহুরী (উপাধি)-লোহার পরিবার ১৮৮ নং বীরসিংহ ঘাটের দায়িত্বে ঘাটোয়াল কাজ সমাপন করত। বীরসিংহ গ্রামে চূড়ারাম সর্দার নামের ঘাটোয়ালের পরিচয় পাওয়া যায়। এর উত্তরসূরি পরিবার আঁতড়া, শালনা, বলরামপুর, শেওড়াবুনি, কামারবেড়া, জামকুড়ি, ডুমনি, বীরসিং, ভড়া গ্রামের মোড়ল ছিলেন। এরা ছিলেন কাঁসাইকুল থাকের বাগদী পরিবার। আদি বাস কাঁসাই নদী অববাহিকায়। মল্লভূমির ঘাটোয়ালদের অধীনে থাকত দিগর বা সর্দার এবং সবশেষে তাবেদার। পঞ্চকি আদায় ও পথনিরপত্তা ছিল এদের মুখ্য কাজ। সামন্ত, বাগদী, বাউরী, লোহার সম্প্রদায় এই কাজে জড়িত থাকত। বীরসিংহ গ্রাম সংলগ্ন বাহাদুরপুরে লোহার সম্প্রদায়ের ২০০ বিঘা নিষ্কর জমির মালিক এক ঘাটোয়ালী পরিবারের সন্ধান পাওয়া যায়। এদের রাজদত্ত পদবী ছিল মুহুরী। এদের পরিবারে রক্ষিত পিতলের একটি ডিম্বাকার (১১ ১/২ সেমি *৮ ১/২ সেমি) ঘাটোয়ালী পরিচয় চাকতিতে লেখা আছে বিস্টুপুর ঘাট, ফাঁড়ি বীরসিংহ, নং ১৮৮। জানা যায় বারোজাহারী তরফে এমন ২১০ জন ঘাটোয়ালী রক্ষক বা সর্দার পুলিশ নিযুক্ত ছিল।

১৭৯৮ সালের একটি ব্রিটিশ নথিকে ভিত্তি করে মল্লভূমের ঘাট ও ঘাটোয়ালদের তালিকা হল ১) বলরামগড় (হারাদুর চৌধুরী) ২) মুকুন্দপুর (গোবিন্দ সিং), ৩)

বাঁকাদহ (সামসুর রহমান) ৪) বেলশুলিয়া (নিতাই দিগর), ৫) কোতল (মুকতাল বুনি) ৬) জয়বেলিয়া (রতন সিং) ৭) মণিপুর (গৌর হাজারী) ৮) দেগপরপাল (তেতুল নন্দকিশোর সিং) ৯) তৈলসঞ্চরা ও জামকুড়ি (বিনোদ সিং) ১০) পৈতুমোড়া (কোড়ারাম সর্দার) ১১) বীরসিং (কোড়রাম সর্দার) ১২) চুয়াসমিনা (পাণ্ডু সর্দার) ১৩) বেলিয়াড়া সবক (বৈজু ফেটি) ১৪) বেলুর-বসন্তপুর (গোকুল বেরা) ১৫) নাকবাঁধ মুচি (মোচারাম) ১৬) ভোঙ্গী (কার্তিক দিগর) ১৭) বালসী (রামকান্ত সিং ও গোলাব রায়) ১৮) চাতরা (কালু সর্দার) ১৯) গোপালপুর (চৈতন্য সর্দার) ২০) ঘুটকুল (ভুরুট সর্দার)।

মাণিকলাল 'পশ্চিমরাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন, মল্লভূমে ২২০০ ঘাটোয়াল ছিলেন। প্রত্যেকের ১৫ বিঘা হিসাবে মোট ৩৩০০০ বিঘা নিষ্কর জমি রাজা এদের দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে দিয়েছিলেন। তাঁর হিসাবে গঙ্গাজলঘাটি থানার বাইশ গ্রাম তরফে ২২ জন, ছান্দার তরফে ২৭ জন, চুয়ামসিনা তরফে ৫৪ জন ঘাটোয়াল ছিল।

ঘাটোয়াল, তার নিচে সদিয়াল ও সর্বনিম্ন স্তরে দিগর সহ ঘাটোয়ালী ব্যবস্থা সমন্বিত ঘাটের নাম পাওয়া গেছে (১) বলরামপুর (২) মুকুন্দপুর (৩) বাঁকাদহ (৪) বেলসুরিয়া (৫) কোতুল (৬) জয়বেলিয়া (৭) মনিপুর (৮) দিগপাড়া (৯) তালসোকরড়া জামকুড়ি (১০) ডিহি জামকুড়ি (১১) পাথরমোড়া (১২) বীরসিংহ (১৩) চুয়াসমিনা (১৪) বালিয়াড়া (১৫) ডিহর বসন্তপুর (১৬) নক বাঁধ মুচি ডাঙ্গা (১৭) বালসি (১৮) চাতরা (১৯) গোপালপুর (২০) ভাটচুল ইত্যাদি।

প্রভাত কুমার সাহা পাত্রসায়েরের বীরসিংহ গ্রামের ঘাট সম্পর্কে বলতে গিয়ে এখানকার ঘাটোয়াল চূড়ারাম সর্দার, তার অধীনস্ত ৮৩ জন সহ ঘাটোয়াল, ৩৮ জন সহযোগীর কথা বলেছেন। এদের জন্য ৬০২ বিঘা জমির ব্যবস্থা করা হয়। পঞ্চক ছিল ২১ টাকা, হুজুরী সেলামি ১৬ টাকা ৬ আনা, রাজা মাঙ্গন ৪৫ টাকা ১০ আনা।[২২]

হাম্বিরের সময়ে মল্লভূম শক্তিশালী ভূমরাজ্যে পরিণত হলেও বাদশাহী ও নবাবী শাসনে থাকা মল্লভূম প্রচলিত রাষ্ট্রীয় মুদ্রাই ব্যবহার করত। নিজে কোন মুদ্রা প্রচলন করেনি। তবে এই সময় দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমেই লেনদেন হত বেশি।

**ধর হাম্বীর :** হাম্বিরের পরবর্তী রাজা নিয়ে দ্বিমত আছে বিভিন্ন তথ্য সূত্রে। একটি মত আছে জ্যেষ্ঠ ধর হাম্বীরের পক্ষে (নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তি রত্নাকর ও

যদুনন্দনের কর্ণানন্দ), অন্যটির মতে অষ্টম পুত্র রঘুনাথ। ধারী হাম্বীরের রাজত্ব কাল ১৬২২-১৬২৮। এদিকে হাম্বিরের মৃত্যু ১৬২৮ সালে হয়েছিল বলে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। মনে হয় শেষ জীবনে পরম বৈষ্ণব রাজা হাম্বির বৃন্দাবনে কাটিয়েছিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর হাম্বীরের হাতে রাজত্ব ভার দিয়ে। তাই এই সময় কালটি অনেক গ্রন্থে বীর হাম্বিরকেই রাজা হিসাবে মান্যতা দেওয়া আছে। ভারপ্রাপ্ত রাজা ধরকে নয়। কুমারদের মধ্যে রঘু বীর ছিলেন উচ্চাকাঙ্খী, যিনি দায়িত্বে থাকা মহল বা তালুক বৈতলের 'গড়ধার' নামক স্থানে সামরিক শক্তি সংহত করছিলেন। তাই হাম্বিরের মৃত্যুর পর অন্য ভাইদের উৎসদন করে তিনি সিংহাসনে বসেন বলে মনে হয়।

**রঘুনাথ সিংহ (১৬২৬ - ১৬৫৬) :** হাম্বির পুত্র রঘুনাথের রাজত্বকালে মল্লভুমে মন্দির স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষতা অর্জিত হয়। ১৬৫৯ সালের বৈতলের ঝগড়াই চন্ডীর মন্দির ছাড়াও নিম্ন বর্ণিত মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১) ১৬৩৮ সালে বৃন্দাবন চন্দ্র জীউয়ের মন্দির ২) ১৬৪৩ সালের গোকুলচাঁদের মন্দির ৩) ১৬৪৩ সালের শ্যামরায়ের পাঁচচূড়া মন্দির ৪) ১৬৫৫ সালের কৃষ্ণরায় বা জোড় মন্দির ৫) ১৬৫৬ সালে কালাচাঁদের মন্দির ৬) রানীর নামে রাধাবিনোদ মন্দির বা ঘরবাংলা, ১৬৫৯ সালে ৭) ১৬৫৪ সালে ওন্দা-বিক্রমপুরে গোপাল জীউয়ের মন্দির ৮) ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দের যাদবনগরের যাদবরায়ের মন্দির ৯) ১৬৬৩ সালে গিরিধরলাল মন্দির ১০) বৈতলের শ্যামচাঁদ মন্দির ১৬৬০ সালে ১১) ১৬৫৮ সালে পুত্রের নাম সমন্বিত লেখতে রাধালাল জীউয়ের মন্দির।

জনশ্রুতি ১৬৫৯ সালের ঝগড়াইচন্ডীর মন্দির প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল বর্ধমান রাজার সাথে এক বিবাদের অনুকূল সমাধান পাওয়ার আনন্দে। এই বিবাদ কেউ কেউ আবার চেতুয়া-বরদার সাথে বলেছেন। কিন্তু চেতুয়া-বরদার সাথে মল্লরাজ্যের বিবাদ হয়েছিল দ্বিতীয় রঘুনাথের আমলে।

রঘুনাথের সময়ে পেশকাশ জমা না পড়ায় শাহজাহান পুত্র বাংলার সুবেদার সুজা রাজাকে ডেকে পাঠিয়ে অন্তরীণ করেন। রাজধানী রাজমহলের ঘোড়াশালের এক মত্ত ঘোড়াকে বাগে আনা ও অশ্বপৃষ্ঠে আট দিনের পথ আট ঘণ্টায় অতিক্রম করায় মল্লরাজের বীরত্বে মুগ্ধ বাংলার শাসক সুজা ১৬৫৮ সালে মল্লভূমের পেশকাশ কমিয়ে করেন ৫৯১৪৯ টাকা মাত্র। বীরত্ব সূচক 'সিংহ' উপাধি তাঁর সময়েই ব্যবহার শুরু হয়। অনেকের মতে এটা বাংলার শাসক প্রদত্ত।

**বীর সিংহ (১৬৫৬ - ১৬৪২) :** রঘুনাথের মৃত্যুর পর মল্লভুমের রাজা হয় পুত্র বীরসিংহ। এই মল্লরাজার নাম দুটি মন্দির লিপিতে পাওয়া যায়। ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত রাধিকা-কৃষ্ণ শৈল মন্দির, যেটির এখন অস্তিত্ব নেই। শুধু প্রতিষ্ঠা লিপি পাওয়া গেছে। মুনিনগরের রাধাকান্তদেবের মন্দিরটি এই রাজার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে। মল্লরাজাদের সাথে চন্দ্রকোণার রাজাদের বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চন্দ্রকোণার ১৬৫৫ সালে নির্মিত লালজী মন্দিরের প্রতিষ্ঠা লিপি থেকে মল্লপ্রভাবের ইঙ্গিত মেলে। বীরভান বংশের রাজা হরিনারায়ণের রানী লক্ষ্মণাবতী মল্লরাজবংশীয়। রাজার মৃত্যুর কিছুকাল পর রাজপুত্র মিত্রসেনের অকাল মৃত্যু হলে রাজ্য পরিচালনায় রানী মল্লদের সহায়তা পেয়েছেন।[২৩]

বীর সিংহ নিষ্ঠুর রাজা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি রাজভ্রাতাদের হত্যায় অভিযুক্ত ছিলেন। এক ভাই ফতে ওরফে ধর্ম সিংহ ধবলভূমে পালিয়ে জীবন রক্ষা করেন ও পরে রাইপুরে এক নয়া রাজ বংশের পত্তন করেন। দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানকে রাজা করার চক্রান্তে দ্বিতীয় রানী প্রথম পক্ষের সব সন্তানদের (দুর্জন, সুর সিংহ, কৃষ্ণ সিংহ) হত্যা করার জন্য রাজাকে প্ররোচিত করেন। জ্যেষ্ঠ কুমার দুর্জন রাজ কর্মচারীদের সাহায্যে পালিয়ে বাঁচেন। আরেকটি মতে আঠারো পুত্রকে তিনি হত্যা করেন। এদিকে দ্বিতীয় পক্ষের রাজসন্তান (বলদেব সিংহ) অপঘাতে মারা যান। চক্রী রানী শোকে পাগলপ্রায় হন। অবশ্য এগুলি অনেকটাই জনশ্রুতি। অনাদয়ী রাজস্ব ও বিদ্রোহের কারণে মালিয়াড়ার জমিদার মণিরামকে মল্লসেনা রাজার নির্দেশ মত নির্দয় ভাবে হত্যা করে। এসময় রাজমন্ত্রী ছিলেন অযোধ্যা মহাপাত্র। রাজার সবচেয়ে বড় কীর্তি ছিল জলসংরক্ষণের জন্য রাজধানীতে একাধিক বাঁধ বা জলাশয় খনন। রাজার নামে খনন করা হয় বীরবাঁধ। এছাড়া তৈরি হয় যমুনা বাঁধ, কালিন্দী বাঁধ, চৌকান বাঁধ, লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, কজ্জলা বাঁধ, শ্যাম বাঁধ, গাতাইত বাঁধ ইত্যাদি। ১৬৫৬ সালে বীর সিংহ বর্তমান দুর্গ ও লালজি মন্দির নির্মাণ করেন। গঙ্গাজলঘাটির রাণিয়াড়া গ্রামে মাকড়া পাথরের এক ভিত্তি ভূমি ও প্রতিষ্ঠা লেখ থেকে জানা যায় ১৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে এই গ্রামে শ্রী রাধিকা মদনমোহন মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বীরসিংহ। এছাড়া তিনি লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, গনতাতবাঁধ, যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, শ্যামবাঁধ ও পোকাবাঁধ নামে সাতটি বড়ো জলাধারও নির্মাণ করেন। ১৬৬৫ সালে তাঁর মহিষী শিরোমণি বা চূড়ামণি মদনমোহন ও মুরলিমোহন মন্দির দুটি নির্মাণ করেন।

দশ বর্গ ক্রোশের রাজধানী বিষ্ণুপুরের কচ্ছপ পৃষ্ঠের মত উত্তর-দক্ষিণ ঢাল ও সচ্ছিদ্র ভূপৃষ্ঠের কারণে জলধারণ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই অবস্থায় উত্তর-দক্ষিণে জলধারা আটকে বাঁধগুলি (পর্যায়ক্রমে আটটি) তৈরি করা হয়েছিল। যমুনা ও কালিন্দীর অতিরিক্ত জল কোচবিরাই খালের মাধ্যমে বিড়াইতে এবং কৃষ্ণবাঁধ পর্যন্ত অতিরিক্ত জল বড় নদী বা দ্বারকেশ্বরে ফেলা হয়। দরবার ঘিরে পরিখা, মূল প্রবেশ পথে জল ভাসান নালা, শহরের মধ্যে নিকাশী গির নালা বিজ্ঞান সম্মত ভাবনার ও পরিকল্পনার প্রকাশ। একদল ইতিহাসবিদদের মতে রাজহাট-বীরসিংহপুর বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা ছিল বীর সিংহের।

**দুর্জন সিংহ (১৬৪২ - ১৭০২) :** বীর সিংহ যতটা নিষ্ঠুর ছিলেন, দুর্জন সিংহ ছিলেন ততটাই প্রজানুরাগী ও দয়ালু। মদনমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাঁর নাম পাওয়া যায়। গড়বেতা মন্দির লেখ থেকে বোঝা যায় রাইপুর, গড়বেতা, বগরী, চন্দ্রকোণার উপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[২৪] এই অভিযান পরিচালিত হয় যুবরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের নেতৃত্বে। কবিচন্দ্র রামচরণ চক্রবর্তীর কাব্যে দুর্জনের রাজত্বের সপ্রশংস বিবরণ আছে। দুর্জন সিংহের পুত্রদের নাম রঘুনাথ, গোপাল, চামর, গাজী, যশোবন্ত, অমর, গজরাজ, নয়রাজ, দ্রোণ সিংহ। রঘুনাথ সিংহের হত্যাকান্ডের পর গোপাল সিংহদেব রাজা হন।

দ্বাদশবাটী গ্রামের জমিদার বংশ নিজেদের কুমার গোপাল সিংহের বংশধর বলে দাবি করে। এই পরিবারের বংশ তালিকা হল শ্যামসুন্দর-নন্দদুলাল-আনন্দ-বিনোদ-জীবনবল্লভ-শরৎ-জগবন্ধু-স্বপন ও স্বজন। শ্যামসুন্দর সিংহদেব গোপাল সিংহদেবের কততম উত্তর পুরুষ তা জানা যায়নি। তাঁর সময়ে এক্তেশ্বর মন্দিরের সংস্কার সাধিত হয়।

এই রাজার সময়ে কুচিয়াকোলের অদূরে মনিপুরের জঙ্গলে উড়িষ্যা রীতির মাকড়া পাথরের দক্ষিণমুখী এক শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বিনোদ পালের পুত্র মনিরাম পালের দ্বারা ১৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে। মনিরামের নামেই মনিপুর জঙ্গল ও জনপদ গড়ে ওঠে বলে কথিত। দুর্জন সিংহের সমকালীন এই এলাকায় এক শক্তিশালী পরিবারের অবস্থান সামাজিক ও ঐতিহাসিক নিরিখে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। মল্লরাজসীমার মধ্যে রাজা ছাড়াও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের উত্থান বেশ চমকপ্রদ। রাজার জনকল্যাণমুখী কাজের কারণে রাজ্যের সমৃদ্ধি ও উদার নীতির ফলে স্থানীয় শক্তির উত্থান ঘটেছিল বলে মনে হয়। মনিপুর গ্রামে রাজদহ, রানির বাঁধ, সেনাপত

বাঁধ, কোটাল বাঁধ, পালেদের নামে সরোবর-বাঁধ এই শক্তি কেন্দ্রেরই আভাস দেয়। মন্দির সংলগ্ন স্থানে ছেদিত তালকাঠ ফসিল, বিভিন্ন বর্ণের মৃৎপাত্র ওই এলাকার প্রাচীনত্ব নির্দেশ করে।

প্রথম রঘুনাথ ও বীরসিংহের সময় থেকেই চন্দ্রকোণা, বগড়ি রাজ্য যে মল্ল প্রভাবিত ছিল তার বিভিন্ন প্রমাণ পাওয়া যায়। বগড়ি রাজ্যে ১৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দে গড়বেতায় আটচালা রাধাবল্লভজীউয়ের মন্দির, ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে উড়িয়াশাই গ্রামে রাধাকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা সহ বিভিন্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা তার প্রমাণ। ১৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ভানরাজা হরিভানের রানী ও মিত্রসেনের মাতা লক্ষ্মণাবতী (যিনি চন্দ্রকোণার গিরিধারীলাল জীউ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন) ছিলেন (সম্ভবত হাম্বিরের পুত্র) মল্লবংশীয় হরিনারায়ণের কন্যা। অপুত্রক মিত্রসেনের রাজ্য মল্লশাসনের আওতায় থাকে বর্ধমানের কীর্তিচাঁদের অধিকারের আগে পর্যন্ত। (সূত্রঃ প্রণব রায় (সঃ), মেদিনীপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবরণ, কলকাতা, ২০১০, পৃঃ৭২)

**দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ (১৭০২ - ১৭১২) :** দ্বিতীয় রঘুনাথের শাসক জীবন আবর্তিত হয়েছিল চেতুয়া বরদার ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে। দুর্জন সিংহের আমলে চেতুয়া-বরদার বিজয়ে যুবরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথের নেতৃত্ব ছিল। এই বিজয়ে দেওয়ান সতত্বরাম গুহ, জয় ও বিজয় নামে দুই বীর সহোদর সেনানায়ক মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। ১৭০১ সাল নাগাদ চন্দ্রকোণায় দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ মল্লশাসনের প্রতিনিধিত্ব করতেন। বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম ঔরঙ্গজেবকে খুশি করার জন্য জমিদারি এলাকায় অমুসলিম প্রজাদের উপর জিজিয়া কর আরোপ করলে প্রজাসাধারণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। মল্লরাজের সহযোগিতায় চেতয়া-বরদার জমিদার শোভা সিংহ এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়ে বর্ধমান আক্রমণ করেন। জমিদার কন্যার ছুরিকাঘাতে শোভা নিহত হলে, শোভা সিংহের ভাই হিম্মত সিংহ বিদ্রোহ চালিয়ে যান এবং উড়িষ্যার আফগান দলপতি রহিম খানের সাহায্য নিতে মনস্থ করেন। এই বিদ্রোহে আফগান যোগ দেখে মল্লরাজ সতর্ক হয়ে বিদ্রোহী জোট থেকে বেরিয়ে আসেন। রহিম খানের শক্তি বৃদ্ধি মল্লরাজ্যের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক ছিল। ১৭০১ সালেই চেতুয়া-বরদা আক্রমণ করে দখল করে নেয় মল্লরাজ।

চেতুয়া-বরদা থকে অপহৃত রাজগৃহদেবতা বিশালক্ষী জয়-বিজয়ের দ্বারা মল্লরাজ্যের ওন্দার সূর্পানগরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখনও বরদা থেকে মঙ্গল ঘট এলে তবেই এই দেবীর পূজা শুরু হয় দেবীপক্ষে। রঘুনাথ পরাজিত রাজার কন্যা

চন্দ্রপ্রভাকে বিষ্ণুপুরে এনে বিবাহ করেন। সাথে আনেন লালবাঈ নাম্নী এক বাঈজীকে। অনেকে বলেন ইনি ছিলেন রহিম খানের ভগ্নী। লালবাঈয়ের সাথে রাজার অবৈধ সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্ককে মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টায় রাজ পরিবারে ও প্রজাসাধারণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ভোজনটিলায় রাজ্যবাসীকে এমন এক অনুষ্ঠানে ভোজন ও উৎসবে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানালে এই সন্দেহ আরো দৃঢ় হয়। রানী চন্দ্রপ্রভা ও অনুজ গোপাল সিংহের সম্মতিতে রাজধর্ম পালনে ও বংশের পবিত্রতা বজায় রাখতে লালবাঈকে ও রাজাকে হত্যা করা হয়। বিক্ষুব্ধ জনতা লালবাঈয়ের নতুন মহল ধূলিসাৎ করে দেয়। রাজাকে তীরবিদ্ধ করে ও লালবাঈকে লালদিঘির জলে নৌকা সহ ডুবিয়ে মারা হয়।[২৫]

রাজা রঘুনাথের বড় অবদান বিষ্ণুপুরে সঙ্গীত আবহ তৈরি করা। তানসেনের বংশের বাহাদুর খানকে জমি ও মাসোহারা দিয়ে রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। সঙ্গে আসেন বিখ্যাত তবলা বাদক মীর বক্স। তবে রাজার অনাচার মূলক কাজের প্রতিবাদে তিনি পরে বিষ্ণুপুর ত্যাগ করেন। এই সময় বিষ্ণুপুর ঘরানার হাল ধরেন শ্রীনিবাসের বংশধর গোস্বামী পরিবার।

মল্লরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিমলাপালরাজ রাধানন্দ (১৬৯৩-১৭২৮) ও ভাই রাধামাধবের তীব্র বিরোধের সুযোগ নিয়ে সাময়িক ভাবে রাজ্যটি দখল করেন। তবে রাইপুর থেকে অভিমানী রাধামাধব রানীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মল্লরাজের বিরুদ্ধে লড়াই করে সিমলাপালের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করতে সক্ষম হন।

**গোপাল সিংহ (১৭১২ - ১৭৪৮) :** রঘুনাথের মৃত্যুর পর রানী চন্দ্রপ্রভা সতীকুন্ডে সহমরণে যান ও অনুজ গোপাল সিংহ রঘুনাথের স্থালাভিষিক্ত হন। গোপাল সিংহের রাজত্ব ছিল বিবিধ ঘনঘটায় পরিপূর্ণ। ধার্মিক রাজা গোপাল সিংহের অতিরিক্ত ধর্ম প্রবণতা, রাজকাজে অবহেলা মল্লরাজের ক্ষাত্রতেজ নির্বাপিত করে।[২৬] তাঁর আমলে রাধালাল জীউয়ের মন্দির স্থাপিত হয় (১৭২৬ সালে)।

তাঁর আমলে বহিরাক্রমণে দেশ জর্জরিত হয়ে পড়ে। মুর্শিদকুলি খাঁয়ের নতুন জমাবন্দী প্রয়োগের ফলে মল্লরাজ্যের দেয় রাজস্ব বহুগুণিত হয়। ১৭১৫ সালের এই ব্যবস্থা মোতাবেক খাজনা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় নবাব সেনারা মল্লভূম অভিযান করে। নবাব সুজা, জাফর খানের নেতৃত্বে যে অভিযান করে তা জলদুর্গের পথে প্লাবন সৃষ্টি করে রুখে দেওয়া সম্ভব হয়। দ্বিতীয়বার সুজা নিজে বিশ হাজার বাছাই করা সেনা নিয়ে মল্লভূম অভিযান করলে তার ফলাফল নিয়ে সংশয় আছে। মনে

হয় মল্লরাজ সন্ধির মাধ্যমে নবাবকে শান্ত করেন।[২৬ক] তবে বর্ধমান-জমিদার কীর্তিচাঁদ মল্লভূম আক্রমণ করে ফতেপুর মহল দখল করে নেন।[২৬খ] পরাজিত মল্লরাজের তরবারি যুদ্ধ জয়ের স্মৃতি হিসাবে বর্ধমান রাজবাড়ীতে সংরক্ষিত করা হয়। কাঞ্চননগরে এই বিজয়ের স্মৃতিতে রাজা একটি বিজয় তোরণ (বড়দুয়ার) নির্মাণ করেন। এই পরাজয়গুলি ছিল রাজ্যের পক্ষে অশনি সংকেত। উর্বর ফতেপুর মহল হাতছাড়া হওয়ায় মল্ল রাজস্বের বড় ক্ষতি হয়। চেতুয়া-বরদা (দাসপুর-ঘাটাল), বগরী (ঘাটাল), চন্দ্রকোণা, রাইপুরের মতো পরগনাগুলোর নিয়ন্ত্রণও বর্ধমানরাজের কাছে চলে যায়। ডাচ-ফরাসি-ইংরেজ বাণিজ্যের এলাকা (দামোদর-রূপনারায়ণ মধ্যবর্তী দোয়াব) ক্ষীরপাই-চন্দ্রকোণা-ঘাটাল-রাধানগর (নুন উৎপাদক ও তন্তুবায় অধ্যুষিত) বর্ধমানরাজের অধিকারের মধ্যে চলে আসে। রাজ্যে ভাস্কর পন্ডিতের নেতৃত্বে মারাঠা আক্রমণ ব্যাপক বিপর্যয় ডেকে আনে। মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরকে দলমাদল সহ বিভিন্ন কামানের গোলায় গোলন্দাজ বাহিনী রক্ষা করতে পারলেও রাজ্যের সমৃদ্ধ জনপদগুলি লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। রাজধানীর যুদ্ধে বড়কুমার কৃষ্ণ সিংহ নিহত হন বলে জনশ্রুতি। ধারাপাট, যাদবনগর, রামসাগর, পাইকপাড়ার সহ বিভিন্ন সমৃদ্ধ জনপদে এই ধ্বংসলীলার উল্লেখ রিয়াস-উস-সালাতিন, মদনমোহন বন্দনা, গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণ সহ বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। গোপাল সিংহের সময়ে আগত ফরাসী পর্যটক আবে রেনল ও ব্রিটিশ প্রশাসক হলওয়েল সুশাসনের উল্লেখ করে তাঁর রাজত্বের প্রশংসা করেছিলেন।

গোপাল সিংহের সময়ে মন্ত্রী শুভঙ্করের রচিত আর্যা গণিত শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। তাছাড়া শুভঙ্করের নেতৃত্বে বড়জোড়ার পতিত এলাকায় একটি সেচ খাল খননের পরিকল্পনা ও রূপায়ন হওয়ার ফলে বিস্তৃত এলাকা সেচ সেবিত ও শস্যশ্যামলা করা সম্ভব হয়েছিল।

ব্রাহ্মণ ও পন্ডিতদের প্রতি মল্লরাজের আনুকূল্য রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারের সহায়ক হয়েছিল। এই সময় রাজ্য ও রাজধানী জুড়ে বহু সংস্কৃত ও ফার্সী চর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। অনেক টোল, চতুষ্পাঠী, মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বহু ব্রাহ্মণ পরিবার গোপাল সিংহের ভূমিদানে উপকৃত হয়। যেমন ধর্মমঙ্গলের রচয়িতা দ্বিজ রামচন্দ্র ১৭৩২ সালের আগে ভূমিদান পান। প্রভুরাম নামে আর এক ধর্মমঙ্গল রচয়িতাও ভূমিদানে উপকৃত হন।[২৬গ] কবিচন্দ্র বহু কাব্যে গোপাল সিংহের প্রশংসা করেছেন। তবে জনসাধারণের ওপর বাধ্যতামূলক নাম সংকীর্তন, একাদশী পালনের বাড়াবাড়ি

রাজ্যের পক্ষে ভাল হয়নি। প্রজারা বিক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন এবং দিন শেষের এই বাধ্যতামূলক হরিনাম জপ 'গোপাল সিং বেগার' নামে জনমনে খ্যাতি লাভ করেছিল। বিষ্ণুপুরী রামায়ণের রচয়িতা কবিচন্দ্রকে পানুয়া—লেগো গ্রামে ব্রহ্মোত্তর ভূমিদান করেছিলেন গোপাল সিংহ। ১৮৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এই সংক্রান্ত দলিল কালেক্টরী অফিস থেকে সংগ্রহ করেছিলেন অধস্তন পুরুষ হারাধন চক্রবর্তী।[২৭]

ধার্মিক মল্লরাজ গোপাল সিংহের (১৭১২ - ১৭৪৮) আমলে কৃষি সেচের প্রসারে বড় ভূমিকা নেয় মন্ত্রী শুভঙ্কের পরিকল্পিত ও রূপয়িত ২০ কিমি দীর্ঘ সেচ খাল। শুভঙ্কর শুধু রাজমন্ত্রীই ছিলেন না, ছিলেন একজন গণিতজ্ঞ ও বাস্তুকার।[২৮] এটি পরে তাঁর নাম অনুসারে শুভঙ্করী দাঁড়া নামে পরিচিতি লাভ করে। দামোদর ও শালী নদীর মধ্যবর্তী উচ্চ অনুর্বর ভূমিকে কচ্ছপ পিঠের ন্যায় ৮০ বর্গমাইল জমিকে সেচ সেবিত করতে এটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। এই কচ্ছপ পিষ্ঠের ন্যায় ভূমিভাগে জল না দাঁড়ানোয় ও জল ধারণ ক্ষমতা কম থাকার কারণে হাজার হাজার বিঘা অনুর্বর পরে থাকত (এই এলাকাটি পরে বারোহাজারী মহল নামে পরিচিত হয়)। প্রস্তাবিত ও রূপায়িত দাঁড়ার উত্তরে ১০ আনা আর দক্ষিণের ৬ আনা জমি নিয়ে ছিল এই সেচ এলাকা। এই সেচসেবিত মহলটির মোট কর নির্ধারিত হয় ১২০০০ টাকা ও যার থেকে এলাকাটি ক্রমে বারোহাজারী মহল নামে রাজস্ব রেকর্ডে পরিচিতি লাভ করে।

ক্রমে নিয়মিত সংস্কার ও সচেতন জল বিভাজন-জলকর নীতির অভাবে চৈতন্য পরবর্তী সময়ে এই সেচ ব্যবস্থা অকেজো হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ শাসনে এটির সংস্কারের ব্যাপারে মতান্তর তৈরি হয়। ১৮৮৬ সালে ব্রিটিশ সুপারিন্টেনডেন্ট ম্যাকেঞ্জি সাহেব এটির বিনিয়োগ ও উৎপাদন-এর আনুপাতিক খতিয়ান দিয়ে বোঝান এই প্রকল্প অলাভজনক। কিন্তু কৃষকদের তরফ থেকে ক্রমাগত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হতে থাকে। অবশেষে জেলাশাসক ম্যানেষ্টি এই কাঙ্খিত সংস্কারের প্রস্তাবিত ১০৫০০ টাকার মধ্যে ২০০০ টাকা দুর্ভিক্ষ ত্রাণ তহবিল থেকে বরাদ্দ করলে সংস্কার কাজে গতি আসে। পরে জেলাশাসক বি দে চাঁদা তুলে হলেও এই প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প করেন। ১৯১৩ সালে প্রকল্প রূপায়ণে বিষ্ণুপুর মহকুমা শাসক, ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ও পলাশডাঙ্গার কালিনাথ চ্যাটার্জীকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৯১৫ সালে কালেক্টর কুকের উৎসাহে শুভঙ্কর দাঁড়া সংস্কারে চাঁদা সংগ্রহ অভিযানে রাজ্যপাল দেন ২০০০টাকা, বর্ধমান রাজ ১০০০ টাকা, কাশিপুর রাজা

২০০ টাকা, জনগণ ৩১৮ টাকা। মুখ্যত ত্রাণ তহবিলের সাহায্যে ৩৩০০০ টাকা খরচ করে এই প্রকল্পটি সম্পন্ন করা হয় ১৯১৬ সালে। কুকের প্রস্তাব ছিল ভবিষ্যতে নিয়মিত সংস্কারের জন্য প্রতি নাঙ্গল চাষ এলাকা থেকে ১টাকা করে সেচকর আদায় করা ও আদায়কৃত অর্থে তহবিল তৈরি করে নিয়মিত দাঁড়াটি সংস্কার করা। যদিও সেটি ভাবনাই রয়ে যায়।

আর চৈতন্য পরবর্তী সময়ে অনাবাসী বর্ধমানরাজ মল্লভূমের জমিদারি কিনে পত্তনিদারদের মাধ্যমে জমিদারি পরিচালনা করলে এই সেচ ব্যবস্থার আরো অবনতি হয়। সংস্কারের অভাবে। আর্থিকভাবে দীন রাজা দুর্ভিক্ষের সময় যথাসাধ্য ত্রাণ কাছে অংশ নিয়েছেন। তিনি ছিলেন দানশীল রাজা। দেবোত্তর, পিরোত্তর, ব্রহ্মোত্তর জমিদান ছিল বিপুল। বালসি লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরেও তাঁর দান ছিল বলে ১৯১৯ সালের এক দেওয়ানী মামলা থেকে জানা যায়। এর আগে মল্লরাজারা বালসির নিরাসক্ত মৌলী সাধক দিগম্বর ভট্টাচার্য মদনমোহনের মাতৃমূর্তি দর্শন করে এখানে একটি জলদানের জন ‘বাগীশ’ পুকুর খনন করেন।

**চৈতন্য সিংহ (১৭৪৮ - ১৮০১) :** চৈতন্য সিংহ ছিলেন একজন ভাগ্য বিড়ম্বিত রাজা। জ্ঞাতিভাই দামোদর সিংহের সাথে সিংহাসন নিয়ে প্রায় চার দশকের আইনি লড়াই (১৭৫৭-১৭৯৪) রাজাকে সর্বস্বান্ত করে তোলে। গোপালপুত্র কৃষ্ণ সিংহের পুত্র চৈতন্যের মল্লভূমের অধিকারকে চ্যালেঞ্জ জানায় রাজা গোপালের অন্য পুত্র গোবিন্দের সন্তান দামোদর। জ্ঞাতিভ্রাতা দামোদর সিংহের সাথে এই বিবাদ ১৭৫৬ সালে চরমে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত পূর্বসূরীদের মত তিনিও মন্দির স্থাপত্যে মন দিয়েছিলেন। ১৭৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রাধাশ্যাম মন্দির। তবে শরিকি বিবাদ ও কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান রাজস্ব দাবির সামনে সেই ধারা রুদ্ধ হয়ে যায়।

চৈতন্য সিংহ ও জ্ঞাতিভ্রাতা দামোদর সিংহের বিবাদ এমন চরমে ওঠে যে, ১৭৫৬ সালে দামোদর নবাব দরবারে পৌঁছে সিরাজকে মিথ্যা করে বোঝান চৈতন্য সিংহ ইংরেজের সাথে নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করার চক্রান্তে জড়িত। জনরব তৈরি হয় নবাবী সেনা মল্লরাজ্য আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।[২৯] তবে এই আক্রমণ আর সংঘটিত হয়নি। তবে এই সময়কালে দামোদর সিংহ সিংহগোলার যুদ্ধে (খুব সম্ভব কিছু নবাবী সেনার উপস্থিতিতে) মল্লরাজের মুখোমুখী হন। মন্ত্রী কমল বিশ্বাসের নেতৃত্বে মল্লবাহিনী এই যুদ্ধে হয়ী হয়। ১৭৬০ সালে মারাঠা আক্রমণ মল্লজীবনী শক্তিকে আরো নিঃশেষিত করে। ১৭৬১-১৭৬৪ সালব্যাপী দামোদর সিংহ রাজা

চৈতন্য ও মন্ত্রী কমল বিশ্বাসের অনুপস্থিতিতে (সম্ভবত মির্জাফরের বা মীরকাশিমের কিছু বাহিনীর সাহায্যে) বিষ্ণুপুর দখল করে চার বছর দখল কয়েম রাখে।[৩০] ভারপ্রাপ্ত চৈতন্য সন্তান রাজকুমার মদনগোপাল কুচিয়াকোল দুর্গে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন এবং ময়ূরভঞ্জে অবস্থানরত পিতাকে এই আক্রমণের সংবাদ পাঠান। চৈতন্য সিংহ সিংহাসন ফিরে পেতে আইনের আশ্রয় নেন।

পাঁচশালা ব্যবস্থায় সুযোগে মল্ল জমিদারি নিলামে উঠলে কলকাতার কানাই দাশ সর্বোচ্চ নীলাম ৪৫২৮৫০ টাকা ১৫ আনা ১১ গন্ডা ডাক দিয়েও ও ৩৫৪৪৫ টাকা কর ছাড় পেয়েও রাজস্ব পরিশোধে ও জমিদারি রক্ষায় ব্যর্থ হন (সূত্র ঃ কানুনগো শিব প্রসাদ মজুমদারের প্রতিবেদন)। ১৭৬৮, ১৭৭০, ১৭৮৭ সালের অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ মল্লের কৃকদের মেরুদন্ড ভেঙে দেয় অথচ কোম্পানী কোন ছাড় ছাড়াই বছর বছর করভার বাড়িয়ে ও অনাদয়ে জমিদারি খন্ড খন্ড করে নিলামের মধ্যমে মল্লরাজ্যের পতন ডেকে আনে। অথচ ঋণগ্রস্ত দানশীল রাজা এই অনটনের মধ্যেও দুর্ভিক্ষ কবলিত প্রজাদের যথাসাধ্য রাজকোষের সাহায্য দিয়েছেন। মামলা চলাকালীন পুত্র মদনগোপালের মৃত্যু হলে ১৮০১ সালে মল্লরাজ চৈতন্য পৌত্র মাধব সিংহকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। বিফল মনোরথ হতোদ্যম রাজার ১৮০২ সালে মৃত্য হয়। শেষ হয় মল্ল বংশের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের। রেখে যান পুত্র নিমাই, গৌরমোহন, ফতেবাহাদুর, কুমার ক্ষেত্রমোহন, লাল ক্ষেত্রমোহনদের। আর পৌত্র মাধব (জ্যৈষ্ঠপুত্র প্রয়াত মদনমোহনের সন্তান)।

## চৈতন্য বিরোধী দামোদর সিংহের বিদ্রোহ ও মল্লভূমের দুর্গতি

চৈতন্য সিংহকে মল্লভূমের রাজ পদ থেকে অপসারিত করতে দামোদর সিংহ যত রকম পথ অবলম্বন করা সম্ভব তা করছিলেন (১) পলাশী যুদ্ধের আগে নবাব সিরাজদৈলাকে বোঝান চৈতন্য সিংহ কোম্পানীর সাথে নবাব বিরোধী চক্রান্তে জড়িত এবং তাঁকে অন্যায়ভাবে চৈতন্য সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করেছেন। দামোদরের ভাষ্যে বিশ্বাস করে মল্লভূমির বিরুদ্ধে সিরাজ যুদ্ধ যাত্রার অয়োজন করেছিলেন বলে সংবাদ পাওয়া যায়। তবে এমন অভিযান শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি। (২) সিরাজ নিজে অভিযান না করলেও একদল নবাবী সেনা দিয়ে দামোদরকে সাহায্য করেছিলেন বলে জানা যায়। এই সেনাদল দামোদর নদী পেরিয়ে মল্লভূমে প্রবেশ করলে নদীপাড়ের সিংহগোলা নামক স্থানে মন্ত্রী কমল বিশ্বাসের

নেতৃত্বাধীন মল্লবাহিনীর মুখোমুখি হয় ও যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ইতিমধ্যে চৈতন্য সিংহ নবাবের কাছে প্রকৃত সত্য তুলে ধরতে সক্ষম হন। দামোদরের নবাব দরবারে চক্রান্তের সুযোগ বন্ধ হয়। (৩) তবে নবাবের কান ভারী করার প্রয়াস অব্যাহত থাকে। পলাশী পরবর্তী কালে নবাব মিরজাফরকে বা মীরকাসিমকে ভুল বুঝিয়ে একদল সেনা সাহায্য পেতে দামোদর সক্ষম হন। এদের নিয়ে রাজধানীতে রাজা চৈতন্য সিংহ ও মন্ত্রী কমল বিশ্বাসের অনুপস্থিতে অতর্কিতে হানা দেন। রাজধানীর দায়িত্বে থাকা মদনগোপাল কুচিয়াকোল দুর্গে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। সংবাদ পাঠান হয় ময়ূরভঞ্জে অবস্থানকারী চৈতন্য সিংহের কাছে। ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জবরদস্তি মল্লরাজধানী দখল করে রাখেন। চৈতন্য সিংহ কোম্পানীর স্মরণাপন্ন হন। ১৯৬৪ সালে এক কোম্পানী কর্ণেলের নেতৃত্বে একটি ব্রিটিশ সেনাদল পুনরায় চৈতন্য সিংহের হাতে রাজ্যভার তুলে দেয়। (৪) দামোদর ইতিমধ্যেই নিম্ন আদালতে জমিদারির মালিকানা নিয়ে মামলা করেছিলেন। নিম্ন আদালতের রায় দামোদরের পক্ষে যায়, যেটি নিয়ে অনেক ব্রিটিশ প্রশাসকের সমালোচনা ছিল। চৈতন্য সিংহ আপিলে যান। (৫) ১৫৫৭ সাল থেকে শুরু হওয়া মামলা নিম্ন আদালত, আপিল আদালত ও সর্বোচ্চ আদালত হয়ে ১৭৯৪ সালে যখন নিষ্পত্তি হয়, তখন দামোদর প্রয়াত হইয়েছেন ও সপক্ষে রায় পেয়েও চালানোর মতো জমিদারি আর বৃদ্ধ রাজা চৈতন্যের হাতে ছিল না। (৬) বর্ধমান রাজার মল্লভূমি গ্রাস করার যে প্রবণতা ছিল তাতে দামোদরের প্ররোচনা কতটা ছিল তা আলোচনা সাপেক্ষ। তবে দামোদর সব সময়ই চৈতন্যের ক্ষতি চেয়েছেন। (৭) চৈতন্যের সমকালীন শিউভট্টের নেতৃত্বে মারাঠা আক্রমণ মল্লভূমির প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। বিশেষত ব্যবসায়ী ও কৃষকদের। অভিযোগ দামোদরের সাহায্য পেয়েছিলেন মারাঠারা। এই ভাবেই মল্লভূমির পতন তরান্বিত করেন মল্ল সিংহাসনের দাবিদার দামোদর সিংহ। একেই ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভিঘাতে একের পর এক জমিদারি সাবেকি জঙ্গল মহলের ভূমরাজাদের হাতছাড়া হতে থাকছিল। তার উপর অতিরিক্ত রাজস্ব দাবি মল্লরাজাদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেয়। ১৭৬৫ সালে সারা বাংলার দেওয়ানী লাভের পর কোম্পানী ১৭৬৬ সালে মল্লভূমের রাজস্ব নির্ধারণ করেন। ৫৫১৪৪ টাকা ১ আনা ৮ পাই। অসংখ্য নিষ্কর জমি কোম্পানী খাস দখলে নেওয়ায় রাজার পক্ষে ভূমিকর পরিশোধ আরো কঠিন হয়ে পড়ে। বিপন্ন রাজা ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার বার্ষিক রাজস্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোন

রকমে রাজ্যপাট বজায় রাখেন। এই বেপরোয়া চেষ্টার পেছনে ছিল নিলামে দামোদর সিংহের কাছে পরাজয়ের আশঙ্কা। তবে কোন ভাবেই তিনি আর রাজস্ব আদায় ও পরিশোধ বজায় রাখতে পারেননি। ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে মল্লরাজ্য নিলামে উঠলে বার্ষিক ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা রাজস্ব শোধের শর্তে বর্ধমানের রাজা মল্লভূমি কিনে নেন।

## মল্লরাজ্যের পতনের নির্ঘন্ট

প্রাক ব্রিটিশ শাসনে মল্লরাজের কখনও রাজস্ব আদায় এমন পর্যায়ে পৌঁছায়নি যেখানে পরিশোধ করা কঠিন হবে। প্রাকব্রিটিশ যুগে পেশকাশ ব্যবস্থা অনেকটাই স্বেচ্ছাধীন ছিল। ফলে চাপ মুক্ত মল্লরাজেরা রাজস্বের একাংশ স্থাপত্য ও শিল্পকলা, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং উৎসবের পৃষ্ঠপোষকতা করে এক স্বর্ণযুগ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। কিন্তু কোম্পানী আমলে সমগ্র জমিদারির জরিপ ও হিসাবের নিগড়ে এমন রাজস্ব আরোপ করা হয় যে, সেই ভূমিকর আদায়ের পরিকাঠামো বা আদত জনকল্যাণমুখী মল্লরাজ্যের ছিল না। জ্ঞাতি ভ্রাতা দামোদরের সাথে চৈতন্য সিংহের সিংহাসনের অধিকার নিয়ে আইনি লড়াই চলে প্রায় চার দশক! এই সুযোগে অধস্তন রায়ত ও ভূম্যধিকারীরা রাজাধিকার চূড়ান্ত না হওয়ার অজুহাতে অনেক সময়ে রাজস্ব প্রদান বন্ধ করে। এর সাথে যোগ হয়েছিল সর্বস্তরে দুর্নীতি। ওয়ারেন হেস্টিংসের পাঁচশালা বন্দোবস্তের ফলে বাংলার অন্যান্য জমিদারির মত অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় মল্ল জমিদারিতেও। রাজস্ব দাবি বাড়তে থাকে। দুর্নীতি মাত্রা ছাড়ায়।

১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সূর্যাস্ত আইন বাঙ্গলার সাবেক জমিদার পরিবারগুলিকে বিপর্যয়ের মুখে দাঁড় করায়। ১৭৯৪ সালের ৩ নং রেগুলেশন ও ১৭৯৬ সালের ৫ নং রেগুলেশন এই পতন আরো তরান্বিত করে। এই সব ধারায় অনাদায়ী খাজনার সমানুপাতে জমিদারিগুলি খন্ড খন্ড করে নিলাম করা শুরু হতেই সাবেক জমিদারিগুলি দুর্বল ও হীনবল হতে শুরু করে। ক্রমিক সীমানা সঙ্কোচনের ফলে অনেক জমিদারির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। যেখানে মল্লরাজ নবাবী রাজস্ব আদায়ে ও পরিশোধেই খেলাপী ছিলেন, সেখানে ক্রমবর্ধমান কোম্পানীর রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হয়ে মল্ল রাজসীমা সঙ্কোচনের মুখে পড়েন চৈতন্য সিংহ। ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই মল্ল রাজত্বের অন্তরাগ রচিত হয়ে যায়।

মল্লরাজাদের ধারাবাহিক ভূমিদান এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে ভূমি রাজস্বের

মূল জমা কমে যায়। পঞ্চকি, বেপঞ্চকি ব্যবস্থা, ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর, দেবোত্তর, আইমা, মহোত্তরান ভূমি দান পরোক্ষে রাজস্ব আদায়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। এমনকি লৌকিক দেব-দেবীর উদ্দেশ্যেও দেবোত্তর সম্পত্তি প্রদানের চল ছিল। চৈতন্য সিংহ নবাসনের বাসুলীর পূজারী শ্রীরাম পন্ডিতকে দেবোত্তর ভূমি দান করেছিলেন।

তাছাড়া মন্ডলদের ও সর্ব শ্রেণীর কর্মচারীর যোগসাজসে, প্রতিবেশী বর্ধমানরাজ ও কোম্পানীর একশ্রেণীর প্ররোচনায় গড়ে ওঠা দুষ্ট চক্র রাজার কাছ পর্যন্ত রাজস্ব পৌঁছানোয় অন্তরায় হয়ে ওঠে।[৩১] রাজা সামাজিক, আর্থিক ও প্রশাসনিক ভাবে ক্রমেই অসহায় হয়ে পড়েন। এই দুষ্ট চক্রে এমনকি পেশকার দর্পনারায়ণ কর, দেওয়ান চন্ডীচরণ মুখার্জী, মন্ত্রী কমল বিশ্বাসের মত উচ্চ পদস্থ আমলাদের জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে। ভূমি রাজস্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে সেচের সুযোগ, উপকরণ, বাজার, লাভ, ক্রয়ক্ষমতা যেমন কমছিল তেমন আদায়কারীদের অত্যাচার কৃষি সমাজের উৎপাদন ক্ষমতাকে তলানিতে পৌঁছে দিয়েছিল। ব্রিটিশ রাজস্ব নির্ধারণের সময় কৃষকের ও জমির উৎপাদন ক্ষমতাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয়নি, বরং রাজাকে বিপদে ফেলায় সক্রিয় দুষ্ট চক্রের কাছ থেকেই বিভিন্ন মহালের সম্ভাব্য রাজস্ব হিসাব নিয়েই মোট দাবি তৈরি করা হয়। যা পরিশোধ করার ক্ষমতা স্বভাবতই রাজার ছিল না। তার ওপর পাহাড়ীয়া উপদ্রব, দু'বারের মারাঠা আক্রমণ, মন্বন্তর (শুধু ১৭৭০ সালের মন্বন্তরেই এক তৃতীয়াংশ মানুষের অনাহারে মৃত্যু হয়), কৃষক অভিবাসন, সন্ন্যাসীদের আগমন কৃষি ও কৃষি সমাজের অশেষ ক্ষতি করে। এই সব উপদ্রবের কারণে কোম্পানী রাজস্ব ছাড় দিতেও অসম্মত হয়, যা মল্লদের পতন তরান্বিত করে। পাশাপাশি রাজার চাকরাণ সহ বিভিন্ন সেবা জমির কর ছাড় কোম্পানী মান্যতা দেয়নি, সেস বসানোর অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। জমিদারের ভূমিদান আটকাতে জমিদারি শীলমোহর কেড়ে নিয়ে যার কাছে রাখা হয় তিনিই জাল দানপত্র করে রাজার রাজস্ব আদায় আরো ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে। এসব সত্বেও জ্ঞাতিভ্রাতা দামোদরকে আটকাতে ৫ লক্ষ টাকা বার্ষিক রাজস্বে জমিদারি বন্দোবস্ত নেওয়ার সিদ্ধান্ত মল্লরাজাকে ধ্বংশের কিনারে নিয়ে যায়। এই দুঃসময়ে বর্ধমানরাজ সক্রিয় হয়ে খন্ড নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে জমিদারির ৯৩.৩৭ ভাগ কিনে নেন। এমনকি কালেক্টর অরনষ্টকে অভিযোগ জানিয়ে চৈতন্যপৌত্র রাজা মাধব সিংকে বিষ্ণুপুর থেকে বহিষ্কারের চক্রান্ত করেন যা পরবর্তী কালেক্টর ব্লান্টের আমলে

ফলপ্রসূ হয়! ভারতবর্ষের প্রাচীন এক রাজবংশের এমন পরিণতি যেন ইতিহাসের এক মর্মান্তিক ক্ষতচিহ্ন।

গোপাল সিংহের আগে পর্যন্ত মল্লরাজের সুদিন ছিল। রাজ্য সীমার ক্রমিক সম্প্রসারণ হয়েছে। চেতুয়া-বরদা, বগড়ী, চন্দ্রকোণা, রাইপুর, ছাতনা, মালিয়াড়ার মত রাজাদের আনুষ্ঠানিক আনুগত্য বা মিত্রতামূলক অধীনতা বজায় ছিল। এই সময়কালে রাজ্যে স্থাপত্য, শিল্পকলা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের মত বিষয়গুলিতে রাজ্য চরম সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। কিন্তু ধার্মিক রাজা গোপাল সিংহের সময় থেকেই পতনের আভা দেখা দিতে থাকে। রাজার ধর্মে চরম মতি ও রাজকাজে অবহেলার কারণে আমলাকুল শক্তিশালী হয়ে ওঠে। দুর্নীতি রাজ্যের প্রাণশক্তি নির্বাপিত করতে উদ্যোগী হয়। বস্তুত চৈতন্য সিংহ দ্রুত অবক্ষয়িত একটি রাষ্ট্রযন্ত্র হাতে নিয়ে রাজ্য শাসন শুরু করেছিলেন।

গোপাল সিংহের সময় থেকেই মল্লভূমির ব্যবসায়িক ভারকেন্দ্র ক্রমে ইংরেজদের হস্তগত হতে শুরু করে। ১৭৫০ সালের মধ্যেই চীপ ও পরে এরস্কিনের পরিচালনায় সোনামুখী বাণিজ্যকুঠি মল্লভূমের বস্ত্র বয়ন সহ বিভিন্ন শিল্পে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করতে থাকে। সোনামুখীর অধীনে শাখাকুঠি তৈরি হয় গোপালপুর, ধারিমপুর, আসুড়িয়া, নারায়ণপুর, দেসুরিয়া, রামপুর, তামুলি, কৃষ্ণনগর, হদল, পারুলিয়া। ইতিমধ্যে বাঁকুড়া শহরের লোকপুরে বড় একটি বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। বাঁকুড়া কুঠির অধীনে শাখাগুলি ছিল জয়পুর, কোতলপুর, অযোধ্যা, আমডাংরা, চম্পাতলা, ঘাটনগর, ভরা, জামুড়িয়া, কাঁকিলা, পাত্রসায়ের। ছোট কিছু কুটি গড়ে উঠেছিল সাঁতুড়ি, দীঘা, কুপায়, রোল, ওন্দা, নিকুঞ্জপুর, লোকপুর, সারেঙ্গা, দেউলি, ইন্দপুর, সুরুল প্রভৃতি গ্রামে। স্পষ্টতই ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোম্পানীর একাধিপত্যের জাল জেলা জুড়েই বিস্তার লাভ করে ফেলেছিল। পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ইংরেজের দেওয়ানী লাভ ও নিষ্কর বাণিজ্য করার অধিকার মল্লরাজ চৈতন্য সিংহের কাছে যুগান্তরের বার্তা হিসাবে যতটা গুরুত্ব পাওয়ার কথা ছিল তা পায়নি। ফলে কোম্পানী বাণিজ্য থেকে আগের মত কর আদায়ের চেষ্টা করলে চৈতন্য সিংহ কোম্পানী শাসকদের চক্ষুশূলে পরিণত হন, যা পরবর্তীকালে মল্লরাজের স্বার্থরক্ষার পরিপন্থী হয়।

১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের পালাবদল মল্লরাজের কাছে কোন সুসংবাদ বয়ে আনেনি। বরং ভাগ্যাকাশে ক্রমেই কালো মেঘ ঘনীভূত হচ্ছিল। ১৭৪২ সালের

ভাস্কর পন্ডিতের মারাঠা আক্রমণ, ১৭৬০ সালে শিউভট্টের বিষ্ণুপুর অভিযান মল্লরাজ্যের প্রাণশক্তি নিংড়ে নেয়। এমনকি জ্ঞাতিভ্রাতা দামোদরের অতর্কিত আক্রমণে মল্লভূম চৈতন্যের হাতছাড়া ছিল ১৭৬১-১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দ সময়কাল ধরে। এই গৃহবিবাদ, চার দশকের আইনি লড়াই (১৭৫৭-১৭৯৪) মল্লশাসনের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে আরো দুর্বল করে তোলে। মামলায় জর্জরিত রাজাকে কুলদেবতা মদনমোহনকে পর্যন্ত বন্দক দিতে হয়, মামলার অর্থ সংগ্রহের জন্য।

মল্লভূমির উর্দ্ধমুখী রাজস্ব গ্রাফ পর্যালোচনা করলেই পতনের আভাস পাওয়া যাবে। মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে বাৎসরিক রাজস্ব ছিল ১২৯৮০৩ টাকা। ১৭৬২ সালে এটি দাঁড়ায় ১৩৬০৪ টাকা। ১৭৬৫ সালে নয়া রাজস্ব দাঁড়ায় ১৬১০০৪ টাকা। ১৭৬৬ সালে আরো ৫৬৪৫৫ টাকা যুক্ত করে ৭৪৯৮ টাকা মুস্কারাত ছাড়ের শর্ত রাখা হয়।

কোম্পানী নথি থেকে জানা যায়, ১৭৬৬ সালে বিষ্ণুপুরের রাজার রাজস্ব বকেয়া পড়ায়, ৫৫১৪ টাকা ৯ আনা ৮ গন্ডা আদয়ের ব্যয় হিসাবে রাজাকে দিয়ে বাকি সমস্ত রাজস্বের দায়িত্ব নিজে হাতে নেয় ইংরেজরা। ১৭৬৭ সালে চৈতন্য সিংহ কোম্পানীকে বার্ষিক ৩৭৫০০০ টাকা রাজস্ব পরিশোধের সম্মতি দিয়ে জমিদারি ফিরে পান। রাজস্ব আদায় সন্তোষজনক না হওয়ায় কোম্পানী কর্মচারী গুলাম মুস্তাফা ১৭৬৯র ১১ এপ্রিল থেকে ১৭৭০র ১০ ই এপ্রিল পর্যন্ত ১৫০৫০১ টাকা লক্ষ্যমাত্রা ছড়িয়ে ২৪০৮৫১ টাকা আদায় করেন। মন্বন্তর ও অনাহরের বছরে এই জোর-জবরদস্তি ছিল ভবিষ্যতের পক্ষে বিপর্যয়কর। মন্বন্তর জনিত মৃত্যু ও রাজস্ব অত্যাচারের দরুন অভিবাসনের ফলে সৃষ্ট রায়তশূন্যতা পূরণ হতে মল্লভূমে সময় লেগেছিল আরও কয়েক দশক।[৩২]

১৭৭০সালের জনক্ষয়মূলক ও বিপর্যয়কর মন্বন্তরের পরও রায়তদের কোন রাজস্ব ছাড় না দিয়ে মর্মান্তিক নিপীড়ন ও আদায় চলতে থাকে।[৩৩] এর পরের ১৭৮৪ সাল ও ১৭৮৭ সালে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ জনিত কষ্টেও রাজস্ব ছাড় দিতে কোম্পানী অস্বীকার করে। সুপারভাইজার, আমিল, এদের সহযোগীরা নাজাই বা বাড়তি আদায়ের প্রতিযোগিতা শুরু করে। নাজাইয়ের মত অন্যায় কর আরোপ করা হত পার্শ্ববর্তী জমিমালিকের মৃত্যু বা অভিবাসনের কারণে রাজস্ব আনাদায়ী থাকলে। ১৭৬৯ সাল থেকে জমিদারদের ওপর ১২ শতাংশ বেশি খাজনা নেওয়া শুরু হয় যা তকভি নামে পরিচিত ছিল। ১৭৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সুপারভাইজার

হিগিনস দুর্ভিক্ষ জনিত কারণে করভার লাঘবের প্রস্তাব দিলেও তা কোম্পানী অগ্রাহ্য করে।

মল্লরাজের রাজাস্ব আদায়ের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে ১৭৭৩ সাল নাগাদ কলকাতা নিবাসী জনৈক কানাই দাশ ৪৫২৮৫০ টাকা ১৫ আনা ১১ পাই দিয়ে নিলামের মাধ্যমে বিষ্ণুপুরের জমিদারি ক্রয় করেন (সূত্র : হেসিল রিজের ১৭৮৮ সালের পত্রাচার)। কোম্পানী ৩৫৪৪৫ টাকা ছাড় দিয়েও কানাই বাবুকে রাজস্ব পরিশোধে সমর্থ করতে পারল না। কানাইবাবুকে বাদ দিয়ে চৈতন্য সিংহকেই আবার জমিদারির দায়িত্বে ফিরিয়ে আনা হয়। ভিতরজোত সমেত মল্ল জমিদারির রাজস্ব নির্ধারিত হয় ৪০৬৭৮৩ টাকা ৬ আনা ৭ গন্ডা। এর পর থেকেই বিভিন্ন সেবা মহলের ওপর খাজনা আরোপ চলতে থাকে। যেমন ১৭৭৬ সালে সেনাপত মহল ও ১৭৮৮ সালে কেরানি মহলে। ১৭৮০ সালে ৬৪২৪৫ টাকা ৯ আনা ৪ গন্ডা খাজনা অনাদয়ে মল্লরাজের মাসোহারা, কেরানি মহলের আদায় ও থানাদার সেলামির টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই সময় (১৭৮১) সেজোয়াল নিয়োগ করা হয় রামলোচন রায়কে। প্রতিশ্রুত খাজনা না মেলায় ও ৬৪২৪৫ টাকা বকেয়া থাকায় তিনি রাজার মাসোহারা বন্ধ ছাড়াও তানিয়াৎ কাছারি, তোপ খানা, ভিতরজোতের আয়, থানাদার সেলামী, চাকরান মহল আয়, আবোয়াবের কিয়দংশ বাজেয়াপ্ত করেন। ১৭৮৩ সালে সেজোয়াল (কর আদায় পর্যবেক্ষক) পদ্মলোচন রায়কে রীতিমত রাজার ঘাড়ে চাপান হয়। কালেক্টর শেরবোর্ণ জানাচ্ছেন মন্ডলদের ক্ষমতার অপব্যবহার রাজস্ব ক্ষতি ডেকে আনছে। সংঘবদ্ধতার সূত্রে খাজনা আদায় এদের শর্তাধীন হয়ে পড়ে। এই দুর্নীতির সাথে মুকদ্দম, শিকদার, পাটোয়ারী, গোমস্তা, হালসানার মত রাজকর্মচারীরা জড়িত হয়ে পড়ে। আমিনি রিপোর্টে দেখা যায়, ডিহি, তরফ, পরগণা, মহলের কর্তারা প্রত্যেকেই রাজস্বের অংশ বিশেষ হাতিয়ে নিচ্ছে। তরফের দায়ত্বে থাকা মল্লরাজদের সম্পর্কিত ব্যক্তিদের অস্বচ্ছ, শ্লথ ভূমিকার কারণে সদরে যথাযথ রাজস্ব জমা হচ্ছিল না। তানাইৎ মহলের কর্মীরাও জানত কাগজে-কলমে দেখান খাজনার চেয়ে আদায় অনেক বেশি। কিন্তু কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার মত পরিসর আর অবশিষ্ট ছিল না। এর ফল ছিল কোষগারে ক্রমাগত ঘাটতি। উচ্চ পদস্থ আমলা কমল বিশ্বাস, দর্পনারায়ণ, চন্ডীচরণ কর যতটা রাজার স্বার্থের কথা ভাবতেন, ব্রিটিশ স্বার্থের কথা ভাবতেন অনেক বেশি। অনেকটা আগামী দিনের লিখন পড়তে পেরে নিজের আখের গোছানোর তাগিদে। এই অব্যবস্থার কারণে আশির দশকে দুই বার

চৈতন্য সিংহকে অন্তরীণ করা হয়। আগেই বলা হয়েছে সেবা জমি মালগুজারি কর সুবিধা প্রত্যাহার ছাড়াও, নতুন করারোপের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে রিজ সাহেব স্বার্থান্বেষী মানুষদের বেশি নির্ভর করে ফেলেছিলেন। অবার এদিকে ১৭৮১-১৭৮৫ সালের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়ার কারণে সেজোয়ালদের খাজনা আদায়ে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে।

১৭৮৫ সালে চৈতন্যের পরিবর্তে দামোদরকে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিয়েও অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। ২ লক্ষ টাকা দেনা নিয়ে চৈতন্য সিংহকেই আবার জমিদারি দায়িত্বে ফিরিয়ে আনা হয়। ১৭৮৬ তে দামোদর সিংহ জমিদারি দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত দিয়েছিলেন পুরানো বকেয়া মুকুব ও কোন জামিন না চাওয়া। ফলে কোম্পানী চৈতন্য সিংহকেই মল্ল জমিদারিতে বহাল রাখে, ৩৯৮৭১৯ টাকার বিনিময়ে। ১৭৮৮ সালে করভার কিছু লাঘব করে রাজস্ব ধার্য করা হয় ৩৮৬৭০৭ টাকা ১২ আনা ১২ গন্ডা, যেটিও আদায়ে রাজা ব্যর্থ হন। ফলে আবার সেজোয়াল ও আবার রাজার বন্দীদশা। এই অবস্থায় হেসিল রিজ দ্বিতীয় বারের জন্য ১৭৮৯ সালে বিষ্ণুপুর জমিদারির কর আদায়ের দায়িত্ব নেন।[৩৪]

এই বার রিজ সাহেব যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করেন তা হল[৩৫] ১) সমস্ত এস্টেট খাস করে নেওয়া (২) দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর হিসাবে ভূমি ঘোষণা ও হস্তান্তর বন্ধ (৩) কুলেলতা মহল ও সায়ের মহল থেকে প্রাপ্য আদায়ের ভার নিজেদের হাতে নেওয়া (৪) রাজার ব্যক্তিগত ব্যয়ভার কমানোর উদ্দেশ্যে সহায়ক কর্মী মহাশিবন, চৌকিদারের সংখ্যা অর্ধেক করা (৫) তানিয়াৎ কাছারির কর্মী সংখ্যা ১০৯ থেকে ৫০ করা (৬) রাজার মাসিক ব্যয় ১৫০০ টাকা নির্দিষ্ট করা (৭) রাজার ব্যক্তিজমি বাজেয়াপ্ত করা। পারিবারিক অনুষ্ঠান নির্বাহ করতে রাজা যে 'মাঙ্গন' আদায় করত তার উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি হলে রাজা সামাজিক জৌলুসহীনতা ও নিঃসঙ্গতার দিকে এগিয়ে যান। ইতিমধ্যে সেস বা আবওয়াব আদায়ে বিধি নিষেধ আরোপিত হয়েছিল। (৮) তিনটি খাস পরগণা থেকে নির্ধারিত খাজনা আদায়ের উদ্যোগ নেওয়া হলেও চাষীরা তা মাত্রাতিরিক্ত অভিযোগে দিতে অস্বীকার করে।[৩৫ক] রিজ সাহেব বর্ধমানের কালেক্টরকে বিষয়টা অবগত করান। হেসিল রিজ বিভিন্ন সেবা মহলের যে হিসাব তৈরি করেন তা এই রকম, (১) তানাইৎ কাছারি (সদর, মফস্বল) জমি ৯৭৩৪ বিঘা, কর্মচারী ৭৩৮ ও মোট আয় ১০৯৯ টাকা। (২) মহুল বেরা, মোট জমি ৪১৭২৩ বিঘা, জমা ৪৭৬৯ টাকা ১১

আনা ৯ গন্ডা। (৩) সেনাপতি মহল, মোট জমি ১৪১১৮ বিঘা, পঞ্চকি দেয় ২৮ বিঘা প্রতি চার টাকা। (৪) ক্রোট মহল, ৪৪৩৪ বিঘা, মোট আদায় ৫১০১ টাকা। (৫) হরকরা ও পিয়ন, ৩১২২ বিঘা, মোট দেয় ২৪৩৬ টাকা। (৬) শাগীরদি পেশা মহল (প্রাসাদের ভৃত্যদের), মোট জমি ১৩০৭৯ বিঘা, বছরে দেয় ৩৩৫৮ টাকা। (৭) ঘাটোয়ালী মহল, মোট জমি ৩৫২৮২ বিঘা, আদায় ৪৬৯০ টাকা ১২ আনা ৭ গন্ডা। (৮) বক্সী মহল (৯) ছড়িদার মহল (১০) কাষ্ঠভান্ডার মন্ডল (১১) তোপখানা (১২) ডোমমহল (১৩) কাহারান মহল (১৪) বেতলবী মহল (দাতব্য ও ধর্মীয় কারণে, অনেকটাই নিষ্কর, মোট আদায়ের সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই)। জঙ্গল থেকে কাঠ, মধু, তসরগুটি, কাঠ-কয়লা, ওষধি-ভেষজ সংগ্রহ বাবদ একটি আয়ের উৎস ছিল। মল্লরাজ্য জুড়ে তন্তুবায়দের কাছ থেকে ‘খোন্না তাকি’ নামে ২৪৫৮ টাকার একটি আদায়ের তথ্য পাওয়া যায়। অম্বরী ও বালখানা তামাকের উৎপাদন ও বিপণন মল্লভূমে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছিল। এর থেকেও রাজস্ব আদায়ের সমাচার মেলে। ১৭৭৩ সালের এক নথি থেকে জানা যায় ছাদ বিশিষ্ট গৃহের জমিদারি অনুমোদন দরকার হত। এবিষয়ে অনুমোদিত ঘরের জরিমানা আদায় বাবদ একবার ১৪০০০ টাকা আদায়ের কথা জানা যায়।

মন্দিরগুলিতে ভক্ত-প্রণামী বাবদ কত আয় হয় তার সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। আবওয়াব, মাথোট থেকে বছরে অতিরিক্ত আয় ৩৮৯৯-১৫-১২ ( হুদা সেলামী, মৌজা সেলামী মিলিয়ে)। ১৭৭৩ সালে মামুলি, জয়দাদ, মাঙ্গন, বাজে জমিন বাবদ আয় ছিল ১৬০০০ টাকার আশেপাশে। হাট, বাজার, গঞ্জ, বৃত্তিকর, পরিবহন কর বাবদ ১৭৮৯ সালে আদায় ছিল প্রায় ১০৪০০ টাকা। পুণ্যাহ, ইন্দ্র পরব, অভিষেক, শিকার ও অন্যান্য সামাজিক-পারিবারিক উৎসবে সংগৃহীত অর্থের নির্দিষ্ট হিসাব ছিল না। কয়েকটি নথি থেকে সেবাজমির একটি হিসাব বোঝা যায়। (১) বক্সি মহলের জন্য ৫৬৮১৭ বিঘা (২) ছড়িদার মহলের জন্য ৩১২২ বিঘা (৩) কাষ্ঠ মহলের জন্য ১০১২ বিঘা (৪) তানাইৎ মহলের ১০৭ কর্মীর জন্য ১৫৭.৫ বিঘা (৫) মহলবেড়ার কর্মীদের জন্য ৪১৭২৩ বিঘা (৬) কাহারান মহলের জন্য ১২৪৪ বিঘা জমি বরাদ্দ ছিল। সেনাপত মহলের পূর্ণাঙ্গ হিসাব পাওয়া যায়নি। মালি-মালাকার-গোয়ালাদের জন্য বরাদ্দ ছিল ১৩০৭৯ বিঘা। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দের এক হস্তাবুদে দেখা যায় রাজার বাড়ির রক্ষী, বাবুয়ান ভৃত্য, জমিদারের খাস ভৃত্য, দেহরক্ষী ও সহকারীদের বেতনের পরিবর্তে বরাদ্দ জমি ছিল। যার থেকে আয়

ছিল ১১০০১টাকা ১০ আনা ৬ পাই। বীরসিংহ গ্রাম সন্নিহিত মেঠেনা গ্রামের লোহার (রাজদত্ত উপাধি ক্ষত্রিয় 'খাওয়াস') পরিবার মল্লরাজাদের কামানের বারুদের উপযোগী 'চিড়চিড়া গাছের' হাল্কা কাঠ কয়লা সরবরাহ করত, যার জন্য চাকরান জমির ব্যবস্থা ছিল। গ্রামের লোহার সম্প্রদায়ের মগন লোহার পর্যন্ত বংশপরম্পরায় মল্লরাজাদের পাখির জন্য নিয়মিত ১০৮ টি করে ফড়িং যোগান দিতে হত যার জন্যেও চাকরান জমি দেওয়া ছিল।

১৭৯৩ সালে ঘাটোয়ালী অধিকারভুক্ত প্রজাদের থেকে হুজুরী সেলাম ও রাজা মাঙ্গন আদায়ের খতিয়ান ছিল যথাক্রমে বলরামপুর ঘাট ০ ও ৮৭ (২) মকরন্দপুরে ১৯২ও ৮৬ (৩) বাঁকাদহ ২০ও ৮৫ (৪) বেলসুলিয়া ১৮ও ৬০ (৫) কান্তোড় ১১৩-৬-১০ ও ৫০-২-০ (৬) জয়বেলিয়া ২২১-০-০ ও ৪৮-০-০ (৭) মুনিপুর ৫৩-০-০ ও ৩৯-০-০ (৮) দিগপাড়া ৪৬-০-০ ও ৭০-১০-০ (৯) তালসাঁকো ৬৯-০-০ ও ৪০-১৪-১১।

মল্লরাজের অযৌক্তিক রাজস্ব ধার্য করার বিষয়ে বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ আমলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৭৮০-১৭৯০ সালের মধ্যে যখন অনাদায়ী রাজস্বের দায়ে জমিদারি খন্ডে খন্ডে নিলামে তোলা হচ্ছিল, তখনও বহু খন্ডে মল্লরাজের উপর আরোপিত পূর্বের খাজনার অনেক নিচে দর উঠেছিল। এই প্রেক্ষিতে ১৭৯৪ সালে বর্ধমানের কালেক্টর স্যামুয়েল ডেভিস, বোর্ড অব রেভেনিউকে জানান ১৭৯০ সালের দশশালা বন্দোবস্তে মল্লরাজের ওপর আরোপিত খাজনা ছিল অতিরিক্ত, অন্যায্য ও অযৌক্তিক। অনাদয়ের জন্য নিলামী অংশের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য তিনি সুপারিশ করেন, যা বলাবাহুল্য বোর্ড গ্রহণ করেনি। একই ভাবে পাঁচশালা বন্দোবস্তের সময়ও মল্লরাজের ভূমি-কর নির্ণয়ে হাট-বাজার থেকে আদায় 'সইরতি' পরে নিষিদ্ধ হলেও এটি ভূমি রাজস্বের সাথে জুড়ে দেখান হয়েছিল। রবার্টসন তাঁর ভূমি সমীক্ষায় এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দেখান। এর আগে এমন অতিরিক্ত রাজস্ব কালেক্টর ডসন ছাড়ের ব্যবস্থা করেছিলেন (যা ইতিহাসে 'ডসনি ছাড়' নামে খ্যাত)। গ্রাম স্তর পর্যন্ত জমির রেকর্ড রাখতেন পাটোয়ারী নামে কর্মচারী। ডিহির মন্ডল/মুখ্যা ও কুটকিনারাদার (মহলে একেকটি খন্ডের দায়িত্বে) এই পাটোয়ারীদের সাথে সুসম্পর্ক রেখে চলতেন। পাটোয়ারীদের সাথে হালসানা নামের আমিনদের কথাও জানা যায়। পরগণার দায়িত্ববান ফৌজদার বা 'সদর ভূম্যধিকারী' (সদর ফার্মার) নিযুক্ত গোমস্তা নিম্নস্তরের কর্মচারীদের সাথে

তালমিল ও নজরদারির ভূমিকা নিতেন। মহলের দায়িত্বে থাকতেন মহলদার, যিনি সাধারণভাবে রাজকুমার বা বরিষ্ঠ রাজপুরুষ হতেন।

১৭৮৯ সালে হেসিল রিজ বিষ্ণুপুরের রাজস্ব সংগ্রহ ও সংস্কারের দায়িত্ব নিয়ে রাজস্বের বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করেন এবং সে বছর তাঁর তদারকিতে ৪১৯৫৩৯ টাকা আদায় করা সম্ভব হয়। মালিকানা হার এগারো ভাগের এক ভাগ বাদ দিয়ে কোম্পানীর ঘরে জমা পড়ে ৩৮১৩৯৯ টাকা। কালেক্টর কিটিং হেসিল রিজের প্রতিবেদনের ওপরে চৈতন্য সিংহকে অত্যন্ত 'অপদার্থ শাসক' ও রানীকে 'কুচক্রী' মনে করতেন। রিজ সাহেব কিটিংকে জানান, চৈতন্যের ১১ সন্তান নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করেছেন রাজ্যের বিভিন্ন অংশে নিজেদের অধিকার বলবৎ করার জন্য। এবং তার ফলে রায়ত ও ভূম্যধিকারীরা কাকে খাজনা দেবেন তা নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

বিভিন্ন দিক থেকে আঘাত ও অভিঘাতে বিদ্ধ-অবসন্ন বৃদ্ধ রাজা ১৭৯৪ সালেই রাজধর্ম থেকে মাসোহারা সমেত অবসর নিয়ে একাকী জীবন কাটানোর জন্য কোম্পানীর কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।[৩৬] হেসিল রিজ মল্লরাজের যে খরচগুলো বিলাসিতা ও অপব্যয় বলে চিহ্নিত করেছিলেন, সেগুলি আদপে ছিল রাজ বংশের ঐতিহ্য ও উদারতার প্রকাশ। যেমন বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দান, ব্রাহ্মণ-মহত্তর-পীরদের লাখেরাজ ও খেরাজ শর্তে জমিদান, দাতব্য প্রতিষ্ঠান টোল-চতুষ্পাঠী-কবিরাজখানায় দান ও মন্দির স্থাপত্যে তথাকথিত অনাবশ্যক খরচ। স্থাপত্যের খরচ অনাবশ্যক নয় বরং তা স্থানীয় অর্থনীতিকে পরোক্ষে চাঙ্গা করে ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। সংগৃহীত রাজস্বে বাঁধ, দিঘি, সেচনালা তৈরির দৃষ্টান্ত মল্লভূমে বহু আছে। বিষ্ণুপুরে চৌকান বাঁধ, লাল বাঁধ, শ্যাম বাঁধ, কৃষ্ণ বাঁধ, কালিন্দী বাঁধ, যমুনা বাঁধ, বীর বাঁধ, গাঁতাইত বাঁধ, পাটপুকুর, রঘুনাথ সায়র, মহালবেড়ার সীমানা নালা, মন্দির সংলগ্ন পুকুর সহ বহু জলাশয় মল্ল আমলের সৃষ্টি। গঙ্গাজলঘাটির কুন্তল বাঁধ, চারুরি বাঁধ, শালতোড়ার বৈষ্ণব বাঁধ, বড়জোড়ার শুভঙ্কর দাঁড়া তৈরি হয় মল্ল সময়ে। রাজধানীর এই জল সংরক্ষণ, সরবরাহ ব্যবস্থা ও জলাশয়-নালার স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য ২০০ কোড়া বা খনক নিযুক্ত থাকত।

চৈতন্য সিংহের সময়ে মল্লভূমির সঠিক রাজস্ব নির্ণয়ের তাড়নায় বিভিন্ন রাজ কর্মচারীদের সংখ্যা ও টঙ্কা, রাজার বিভিন্ন খরচ ও বিবিধ আয়ের উৎসের তথ্য তল্লাশ শুরু হয় মূলত হেসিল রিজের তত্ত্বাবধানে। ১৫/০৩/১৭৭১ তারিখে রাজা

ও রাজার উপর নির্ভরশীল ১৬৩ জন সদস্যের তালিকা হল (১) রাজা-১ (২) রানি-৫ (৩) রাজ-পিতা-১ (৪) মাতা-২ (৫) ভ্রাতা-১ (৬) ভগিনী-১ (৭) পুত্র-৬ (৮) পুত্রবধু -১ (৯) খুল্লতাত ভাই-১২ (১০) মাতুল-২ (১১) মাতামহী-১ (১২) শ্বশুমাতা- ২ (১৩) জামাতা-২ (১৪) পিতার খুল্লতাত ও ভাইদের সন্তান-১১ (১৫) মাসতুতো বোনেদের সন্তান-৬ (১৬) দরিদ্র দূর সম্পর্কের আত্মীয়-১৫ (১৭) স্ত্রীদের খুল্লতাত-২ (১৮) মাতুল পক্ষের স্ত্রী-৩ (১৯) বিধবা ভাতৃবধু-১ (২০) কন্যা-৩ (২১) খুল্লতাত ভাইদের স্ত্রীগণ-১৩ (২২) জ্যেষ্ঠতাত বিধবা -১ (২৩) মাতুল সম্পর্কে জ্যেষ্ঠ/খুল্লতাত ভাই-১২ (২৪) খুল্লতাত মাতামহের সন্তান (২৫) দূর সম্পর্কের আত্মীয় -১১ (২৬) অন্যান্য আত্মীয়-৪১, মোট -১৬৩। কাজের বিনিময়ে সেবা জমি ছাড়াও মাসিক বেতন পেতেন (১) নায়েব জয়রাম চক্রবর্তী ১২৪ টাকা (২) পেশকার কালীচরণ মিত্র ৩০ টাকা (৩) কারকুন জগমোহন নন্দী ২০ টাকা (৪) মোহরার রাধাকান্ত দত্ত ১০ টাকা (৫) মোহরার রামহরি রায় ১০ টাকা (৬) ফার্সী মোহরার কিষেন রায় ৩০ টাকা (৭) খাজাঞ্চী গঙ্গারাম ঘোষ ১৫ টাকা (৮) মোহরার নয়ন ঘোষ ১০ টাকা (৯) পোদ্দার জগু রায় ৩০ টাকা (১০) নার চেরি (?) ১৫ টাকা (১১) মুন্সী নয়ন ঘোষ ২৫ টাকা (১২) মোহরার (আদালত) রামগোবিন্দ সাধু ১০ টাকা (১৩) মোহরার (আদালত) রাজুধর ঘোষ ১০ টাকা (১৪) আমিন রুধির রায় ২০ টাকা (১৫) মোহরার বৈদ্যনাথ পাল ৩০ টাকা (১৬) মুন্সী কিষেন মিত্র ১৫ টাকা (১৭) জমাদার ৪ টাকা (১৮) ৪ জন পিয়ন ১৬ টাকা।

চৈতন্য সিংহের কোম্পানী রাজস্ব পরিশোধে আন্তরিকতার কোন অভাব ছিল না। রাধানগর গ্রামের জানকী পোদ্দার ও ক্ষীরপাই গ্রামের বলরাম হালদারের মত মহাজনদের কাছে মোটা টাকা ঋণ নিয়েও তিনি জমিদারি বাঁচাতে পারেননি। উল্টে নিচু স্তরে আদায়কারীদের জলুমের ভাগীদার হতে হয়েছে (বালসি গ্রামের এক কৃষক কোম্পানীর কাছে মল্ল রাজ কর্মচারীর রাজস্ব জুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান)। যদিও সেসব আদায়কৃত করের বেশীর ভাগই তছরূপ হয় ও মল্লরাজের পতন তরান্বিত করে। মন্দির স্থাপনের ফলে প্রণামী থেকে আয় ও মন্দির কেন্দ্রিক বিভিন্ন পেশার মানুষের সমাগম মন্দির অর্থনীতির এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে মল্লভূমে। বীরভূম-বাঁকুড়া যুক্ত জেলার মন্দির থেকে মোট আয়ের একটি খতিয়ান পাওয়া যায় ১৭৮৯ সালে ৪৩০ স্টারলিং, ১৭৯০ সালে ৯০০ স্টারলিং ও ১৭৯১ সালে প্রস্তাবিত ১২০০ স্টারলিং। ১৭৮৭ সালে কালেক্টর শেরবোর্ণ আবগিরি আদায়ে

যত্নবান হয়ে মল্লভূমে দোকান প্রতি কর বসান ২-৪ সিলিং।[৩৭] খেলাপী দোকানদারদের মহামেডান বিচারকের (নবাবী দেওয়ানী আদালতের অধীন) কাছে পাঠান হত। ১৭৮৯ সালে এই খাতে যুক্ত জেলার আয় ছিল ৩৩০ স্টারলিং। এসময় প্রথম শ্রেণীর পাক্কির (মদের) দাম ছিল কোয়ার্ট (বোটল) প্রতি ১ ১/২ ডি, দ্বিতীয় শ্রেণীর পাক্কি ৩/৪ ডি, পাচুই প্রতি গ্যালন ১/২ ডি। অন্ত্যজ মানুষদের মধ্যে এই কম দামী পাচুইয়ের প্রভাব ছিল অত্যন্ত খারাপ। কিটিং ১৭৯০ সালের ২২ মে কোম্পানীকে ডাকাতি সহ বিভিন্ন অপরাধের আগে এই মাদক গ্রহণের ঘটনা অবগত করান। এই সময় মোট নথিভূক্ত অপরাধের এক দশমাংশই ছিল মারপিট ও মারধরের ঘটনা ও মাদকের সাথে সম্পর্কিত।

## মল্লভূমে ব্রিটিশ প্রতিনিধি : বর্গী ও পাহাড়ী উপদ্রব সংবাদ

১৭৪২-১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মারাঠা সর্দার ভাস্কর পন্ডিতের নেতৃত্বে বাংলায় মারাঠা আক্রমণ ছিল অপ্রতিহত। গোপাল সিংহের শাসনকালে বিষ্ণুপুর রাজ্য আক্রান্ত হলে রাজধানী শহরের প্রবেশপথে দলমাদল কামানের সাহায্যে মারাঠা বাহিনীকে পর্যুদস্ত করা হয়।[৩৮] তবে গ্রামীণ বিষ্ণুপুরে এর অভিঘাতে কৃষক ও প্রজা সাধারণের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এর আগে আফগান-পাঠান সেনাপতি কালাপাহাড়ের বিষ্ণুপুর, সলদা-গোকুলনগর পরিমন্ডলের ও সোনামুখীর মন্দিরগুলির লুন্ঠনের ঘটনা হাম্বির পূর্ববর্তী সময়কালে ঘটেছিল বলে জনশ্রুতি। হাম্বিরের সময়ে কোতলপুর ও রাইপুরে আফগান-মোঘল সংঘর্ষের সমাচার মেলে।

বাংলায় ইংরেজের শাসন প্রতিষ্ঠার পর মল্লভূম ব্রিটিশ শাসনের অভিঘাতে অশান্ত হয়ে ওঠে। ক্রমেই কোম্পানী শাসনের জাঁতাকল মল্লরাজবংশকে পিষ্ট করতে থাকে। এই অশান্ত সময়ে পাহাড়ী উপদ্রব, সন্ন্যাসী আগমন, বর্গী আক্রমণ ও মন্বন্তর মল্লভূমের আর্থ-সামাজিক অবস্থা শোচনীয় করে তোলে। এই অভিঘাতগুলি মল্লরাজ চৈতন্য সিংহের ও তাঁর শাসনের গোধূলি লগ্ন বয়ে আনে। চৈতন্য-রাজত্বে বড় ঘটনা মারাঠা আক্রমণ। ১৭৬০ সালে মারাঠা দলপতি শিউভট্ট মেদিনীপুরে খুসল সিংকে পরাজিত করে মল্লভূমে হাজির হন।[৩৯] অন্যদিকে মারাঠা সহযোগী হিসাবে ভারত সম্রাট শাহ আলম মুর্শিদাবাদ অভিযানের উদ্দেশ্যে বর্ধমানের দিকে এগোতে থাকে। অন্যদিকে নবাব-ইংরেজ যৌথ বাহিনী এই আক্রমণ প্রতিহত করতে প্রয়োজনীয় কৌশল রচনা করতে থাকে। মুর্শিদাবাদ সুরক্ষায় ফিসারের নেতৃত্বে

২০০ গোরা ও ৩০০ সেপাইয়ের পল্টন অগ্রসর হতে থাকে। ক্যাপ্টেন স্পিয়ার ও মীরকাসিমের যৌথ বাহিনী সম্রাটকে আটকাতে কাটোয়ায় সেনা শিবির সন্নিবেশ করেন। মেজর ক্যালাউড ও মিরণের যৌথ বাহিনী বাদশাহের আগমন পথের দিকে এগিয়ে যায়। যৌথ বাহিনী  মঙ্গলকোট থেকে ৪ঠা এপ্রিল রওনা হয়ে ৬ই এপ্রিল বীরপুরের শত্রু ঘাটিতে পৌছে দেখেন, তারা দামোদর পেরিয়ে বিষ্ণুপুরের মারাঠা শিবিরের সাথে যোগ দিয়েছে। বিশাল যৌথ বাহিনী বিষ্ণুপুরের দিকে রওনা দিলে বাদশাহ-মারাঠা বাহিনী পাটনায় পশ্চাৎ অপসারণ করে। আর বিষ্ণুপুরের রেখে যায় ক্ষুদ্র এক মারাঠা বাহিনীকে। ১০ ই এপ্রিল যৌথ বাহিনী বর্গীদের মল্লভূম তথা বাংলা ছাড়া করে।[৩৯ক]

আটের দশকে একবার মল্লভূম পাহাড়ীয়াদের দখলে চলে যায়।[৪০] বীরভূমের পশ্চিম প্রান্তের রাজমহল সন্নিহিত পার্বত্য অঞ্চল থেকে শ'য়ে শ'য়ে পাহাড়ী উপজাতির মানুষ ঠিক বর্ষার পর বীরভূম ও মল্লভূমে নেমে এসে লুঠতরাজে অংশ নিত। ব্রিটিশ কুঠির লুণ্ঠন ছাড়াও কৃষি ফসল ও কৃষকের ক্ষতি ভূমিরাজস্ব আদায়কে কঠিন করে তুলত। ১৮৮৪ সালে বিষ্ণুপুর ও বীরভূমের শাসন পরিচালিত হত মুর্শিদাবাদের কালেক্টরের মাধ্যমে। এর ফলে ব্রিটিশ প্রশাসনের পক্ষে পাহাড়ীয়া দৌরাত্ম্য সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। ১৭৮৪ সালের ১৫ই আগষ্ট মুর্শিদাবাদের কালেক্টর এডোয়ার্ড অটো গভর্নর জেলারেলকে জানান, 'বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের রাজারা পার্বত্য পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সমতলে নেমে আসা পাহাড়ী লুঠেরাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে  প্রজাসাধারণের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ১৭৮৪ সালের পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে ব্রিটিশ প্রশাসনের তরফে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ জরুরি হয়ে পড়েছে।' পাহাড়ী দস্যুদলের লুণ্ঠন মাত্রাছাড়া হয়ে পড়লে ২৬ শে মার্চ গভর্ণর জেনারেলের কাছে চার শতাধিক লুঠেরাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সেনা সাহায্য চাওয়া হয়। ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ মে জেলাশাসক কোম্পনীকে জানান লুঠেরার সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে। এদের দৌরাত্ম্যে কোম্পানীর ব্যবসা বন্ধ হওয়ার মুখে। কৃষি ফসলের ক্ষতির মুখে দাঁড়িয়ে রাজস্ব মুকুবের জন্য কৃষিসমাজের দাবি জোরালো হতে থাকে। এই দাবির প্রেক্ষিতে মুর্শিদাবাদ থেকে এক আধিকারিককে তদন্তে পাঠান হয়।

এদিকে মুর্শিদাবাদ থেকে এই দুই দূরবর্তী প্রদেশের প্রশাসনিক কাজ অসম্ভব বুঝে ১৭৮৬ সালের ২৫ শে এপ্রিল পাহাড়ী দস্যু কবলিত বিষ্ণুপুরের কালেক্টর

নিয়োগ করা হয় ডব্লু পাই সাহেবকে ও দস্যু আক্রমণে বিধ্বস্ত বীরভূম জেলায় জি আর ফোলিকে।[৪১] এই প্রথম বিষ্ণুপুরে জেলাশাসক পর্যায়ের একজন বরিষ্ঠ আধিকারিক নিযুক্ত হলেন। ব্যায় সংকোচনের জন্য পাই সাহেবকে বীরভূম-বিষ্ণুপুর যুক্ত জেলার জেলাশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয় ১৭৮৭ সালের ২৯শে মার্চ।[৪২] জেলা সদর হয় বিষ্ণুপুর। পাই সাহেবের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী পাহাড়ীয়াদের তাড়া করে বীরভূমের পশ্চিম সীমান্ত পার করে দিয়ে আসে। হঠাৎ বদলির আদেশ আসায় ১৯শে এপ্রিল তিনি বিষ্ণুপুর ছেড়ে চলে যান। ২৯ শে এপ্রিল নতুন জেলাশাসক শেরবর্ণ কার্যভার নেন এবং তাঁর সময়ে যুক্ত জেলার জেলাসদর বিষ্ণুপুর থেকে সিউড়িতে স্থানান্তরিত হয়। পাহাড়ী উপদ্রব অব্যাহত থাকে ও ব্রিটিশ প্রতিরোধও চলতে থাকে। ১৬ই অক্টোবরের এক সরকারি প্রতিবেদনে দেখা যায় বীরভূম ট্রেজারিমুখী একটি রাজস্বদলকে পাহাড়ীয়ারা আক্রমণ করেছে। পাঁচজন নিহত হয় এই সংঘর্ষে। এই ঘটনায় ৩০০০০ সিক্কা টাকা ও ৩০০০ পাউন্ড মূল্যের রূপা লুণ্ঠিত হয়।[৪৩] দুর্নীতির অভিযোগে শেরবোর্ণ কালেক্টর পদ থেকে অপসারিত হলে ১৭৮৮ সালের ২৯ শে অক্টোবর ক্রিষ্টোফার কিটিং যুক্তজেলার(বীরভূম-মল্লভূম) কালেক্টরের দায়িত্বে আসেন।[৪৪]

তাঁর অনেকটা সময় ব্যয় হয় পাহাড়ী উপদ্রব ও রায়পুর কেন্দ্রিক চুয়ার বিদ্রোহ সামলাতে। ২২/১১/৮৮ তারিখের এক নথিতে দেখা যায় গুরুত্বপূর্ণ সিউড়ি-বিষ্ণুপুর সড়ক সুরক্ষিত রাখতে বিভিন্ন ঘাট ও চৌকিতে সেনা রাখা হয়েছে। এসব সত্বেও ১৭৮৯ সাল নাগাদ পাহাড়ীয়াদের আক্রমণের ঝাঁঝ তীব্রতর হয়। ৫ই জুন রাজধানী শহর রাজনগর লুণ্ঠিত হয়। এই শহরের পতনের পর পাহাড়ী দল জুন মাসেই বাণিজ্য শহর ইলমবাজার ও সাকারোকোডা লুণ্ঠন করে। বস্তুত সদর শহর সিউড়ি পাহাড়ীয়া আক্রমণের আতঙ্কে ভুগতে থাকে। জেলাশাসকের আবাসে দুই ক্রোশের মধ্যে লুঠেরার দল পৌঁছে যায়। ২৫ শে নভেম্বর সদরের কমান্ডিং অফিসার জানান সদর কার্যালয় রক্ষা করতে তার কাছে মাত্র চার জন সেনা অবশিষ্ট আছে।[৪৫] এই অবস্থায় বিষ্ণুপুর অরক্ষিত রেখে সব সেনা সদরে আনা হয়।

এই সুযোগে ১৭৯০ সালে বিপুল সংখ্যক পাহাড়ী দস্যু সিউড়ি আক্রমণ না করে অরক্ষিত বিষ্ণুপুর শহর ও পরগণা দখল করে নেয়। ১৭৮৯ সালে মল্লরাজ চৈতন্য সিংহ রাজস্ব অনাদয়ের কারণে কারারুদ্ধ ছিলেন। এসময় কালেক্টর কিটিংয়ের মুখ্য সহায়ক আর্থার হসিল রিজ বিষ্ণুপুরের প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত হন। এ ঘটনার ফলে

মল্ল প্রজারা বিক্ষুব্ধ থাকায় এই বছর পাহাড়ীরা সাধারণ মানুষের সমর্থনে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে লড়তে পেরেছিল। তবে এদের লুণ্ঠন প্রবৃত্তির কারণে অচিরেই মল্লভূমের প্রজাসাধারণ এদের উৎসাদনে ব্রতী হন। এই সুযোগে বছর ঘুরতেই ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে পাহাড়ীদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। সদরে দস্যুদের ছিন্ন মস্তকরাশি পাঠান হয়। পাহাড়ী আক্রমণে জেলায় দুই মাসের রাজস্ব ক্ষতি ছিল ৬৬৬৬৬ঃ১০ঃ ১০ সিক্কা টাকা। এর থেকে অবরুদ্ধ মল্লভূমের ১৭৮৯ ও ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দের মোট ক্ষতি অনুমান করা যায়।[৪৬]

মল্লভূমে ইংরেজদের নির্দেশে বিভিন্ন ভূমি-রাজস্ব সংস্কারের সাথে সাথে প্রশাসনিক সংস্কারও চলতে থেকে। তার অনুষঙ্গে প্রশাসনিক অধিকার ও সীমাও বারবার পরিবর্তিত হয়েছে।

ইংরেজ আগমন ও শাসন প্রতিষ্ঠার পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে মল্লভূমি বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগ ও জেলায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। কোম্পানী শাসনের সূচনা লগ্নে মল্লভূম ছিল বর্ধমান চাকলার মধ্যে। বীরভূম, হুগলী, বর্ধমান ও পরগণা বিষ্ণুপুর ছিল এই চাকলার মধ্যে। বর্ধমান জেলা, পরগণা বিষ্ণুপুর, বীরভূম ও হুগলী জেলার বিস্তৃত অঞ্চল ছিল চাকলা বর্ধমানের অন্তর্গত। ১৮০৫ সালে জঙ্গল মহল জেলা গঠিত হওয়ার সময় চাকলা বর্ধমানের বিরাট অংশ জুড়ে দেওয়া হয় তার সঙ্গে। আবার এ অংশ জেলা বর্ধমানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় ১৮৩৩ সালে। অবশ্য বর্ধমানের কিছু অংশ ১৮২০ সালে হুগলী জেলা গঠনের সময় নতুন জেলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৮৩৫-৩৬ সালে পশ্চিম বর্ধমান নতুন জেলা গঠিত হয়। জেলা সদর হয় বাঁকুড়া। জেলার অন্তর্ভূক্ত হয় বিষ্ণুপুর পরগণা, ইন্দাস ও কোতলপুর। ১৮৭২ সালে পরগণার কয়েকটি অঞ্চল পশ্চিম বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও, ১৮৭৯ সালে পশ্চিম বর্ধমান বা বাঁকুড়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই সময় আরামবাগ মহকুমা চলে যায় হুগলীতে।

## মল্লভূমে মন্বন্তর

মল্লভূমে এমন বহিরাক্রমণের ঘনঘটা ছাড়াও মন্বন্তরের অভিঘাত ছিল ব্যাপক।[৪৭] ১৭৭০ সালের কালান্তক দুর্ভিক্ষ ছাড়াও অনটনের বছরগুলো হল ১৮৬৬, ১৮৭৪, ১৮৮৫, ১৮৯৭, ১৯০৮, ১৯১৬, ১৯১৯, ১৯২৫, ১৯২৭-১৮, ১৯৩০-৩১, ১৯৩৭, ১৯৪৩, ১৯৪৭। অনাবৃষ্টি, শস্যহানি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অপ্রতুলতা ও দামবৃদ্ধি

সাধারণের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। ১৯২৩-২৪ সালে কালেক্টর বি ডি হাজরার উদ্যোগে বিড়াই খাল সেচ প্রকল্প রূপায়িত হলে মল্লের শস্য ভাণ্ডার বলে পরিচিত ওন্দার মাঠে সেচের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়।[৪৮] এসময় পাত্রসায়েরে দুটি, গঙ্গাজলঘাটিতে ছয়টি, সোনামুখীতে দুটি সেচ সমবায় গড়ে তোলা হয়। ১৯২৪-২৫ সাল নাগাদ তাঁতিদের জন্য ৫৫ টি সমবায় সমিতি গড়ে উঠলে মহাজনী শোষণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্যান্য শিল্প সমবায় ছিল ১১ টি। আমানত, ঋণ সংগ্রহ ছাড়াও কাঁচামাল সংগ্রহে ও বিপণনে এই সমবায়গুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। ১৯২২-২৩-এ গড়ে উঠেছিল জেলা কৃষি ও হিতসাধনী সমিতি।

## মল্লভূমে চুয়ার বিদ্রোহ

চৈতন্য সিংহের সময়ে কোম্পানীর রাজস্ব দাবীর সাথে তাল মেলাতে না পেরে মল্লরাজ পরগণার অধিকার হারাতে থাকেন। অষ্টাদশ শতকের অন্তভাগেই মল্ল রাজত্বের অন্তরাগ রচিত হয়ে যায়। মল্ল বংশের বিভিন্ন শরিক, অধীনস্ত ভূম্যধিকারী, প্রজাসাধারণ কোম্পানী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। রাজস্ব আদায়ের তাড়নায় ও এলাকা দখলের জন্য পারস্পরিক হানাহানির ঘটনাও ঘটতে থাকে।

বর্ধমান মহারাজ নিযুক্ত পত্তনিদাররাও জমিদারি দখল নিতে বাধা পান। সেজোয়াল রামকান্ত দাসের প্রতিবেদনে এর বিবরণ আছে। এক কথায় এই শতকের শেষ তিন দশক মল্লভূম ছিল অরাজকাতা কবলিত। ১৭৯৯ সালে সেজোয়াল জীবনলাল সরকার জানাচ্ছেন লুণ্ঠনের আশঙ্কায় বিষ্ণুপুরবাসী আতঙ্কে রয়েছেন। ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে রাজস্ব বোর্ডের কাছে ভাগবত শর্মা, দোস্ত মহম্মদ, জীবনরাম চন্দ্র প্রমুখ মল্লরাজের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে রাজা অতিরিক্ত ২ টাকা করে গৃহকর আদায় করছেন এবং অনাদায়ে জোরজুলুম শুরু হয়েছে। বালসির রায়ত নন্দদুলাল মিত্র বর্ধমান কালেক্টরকে অভিযোগ করেন খাজনা আদায়কারী রামনারায়ণ রায়ের মারের চোটে তিনি সংজ্ঞা হারিয়েছেন। ১৮৯০ সালে বেলিয়াতোড়ের লালমোহন রায়েরা অভিযোগ করেন যে দেওয়ান রামকানাই কর নিষ্কর মোকাবরী সহ বিভিন্ন মহল থেকে কর আদায় শুরু করেছেন। রাজার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ আসে, কর ফাঁকি দেওয়ার মতলবে তিনি বিভিন্ন সম্পত্তি দেবোত্তরে পরিণত করছেন। ডমন সিংহ ঠাকুরকে দেওয়া ১৯ টি গ্রাম ও পুত্র নিমাই সিংহের অনুকুলে দেবোত্তর সম্পত্তিগুলো এই অভিযোগের আওতায় আসে।

কোম্পানীর রাজস্ব নীতির ফলে ভূমি উচ্ছিন্ন রায়ত, মন্ডল-থানেদারদের সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। কোম্পানী কুঠি, কোম্পানী আশ্রিত জমিদার কুঠি, আমলাদের কুঠি লুণ্ঠনে এই বিপ্লবী দল জেলা জুড়ে আতঙ্ক তৈরি করে। বর্ধমানের জেলাশাসক এল মার্শার বিষ্ণুপুর-বীরভূমের কালেক্টর কিটিংকে ১৭৯০ সালের ৭ই এপ্রিল এক পত্রে জানান এই শক্তি জোট বিষ্ণুপুরে অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা অর্জন করেছে। ১৭৮৬সাল থেকে ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত এই শক্তি জোটের নেতৃত্বে ছিলেন জীবন নাম্নী পাঞ্চেতের এক কৃষক ও থানেদার। অন্যান্য কৃষক নেতার ছিলেন জীবনের ভাই বিষ্ণু, ভবানী সিং, ভুবন হাঁড়ি, গৌর হাঁড়ি, শিব হাঁড়ি, ভবানী সিং, উদিত লাল। প্রতিরোধ হত তীর, ধনুক, ঢাল, তলোয়ার নিয়ে। ২১/১০/৮৯ সালে ফৌজদার আদালতে ব্রিটিশ আধিকারিক জি এইচ বার্লোর পেশ করা প্রতিবেদন থেকে জানা যায় বর্ধমান, পাঞ্চেত, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ও পশ্চিম বীরভূমে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল, পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে।[৪৯] ১৮৮৯ সালে বিদ্রোহের নায়ক জীবন গ্রেপ্তার হলে এই আন্দোলন স্থিমিত হয়ে পড়ে। এর আগে শয়ে শয়ে-হাজারে হাজারে কৃষক ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে সিউড়ির কালেক্টর অফিস ঘেরাও করে। সে বছর ১২ই নভেম্বরের জেলা শাসক ফোলি সাহেব জানাচ্ছেন, প্রজারা জমি চাষ না করে হাজারে হাজারে উপস্থিত হয়ে জেলা শহর অবরোধ করে রেখেছেন। কিন্তু চাষ করার মত রসদ ও মনের অবস্থা, কোনটাই  কৃষকদের ছিল বলে মনে হয় না।[৫০]

নতুন ভূমি ব্যবস্থায় মল্লভূমে এই গুরুতর অশান্তির জন্য কাশীনাথ ব্যানার্জী, বিশ্বনাথ ব্যানার্জী, গৌরীচরণ চৌধুরীরা জমিদারির দখল নিতে পারছিলেন না। বর্ধমানরাজের ক্রীত অংশেও একই সমস্যা হয়। জামতাড়ার হরিদাস পাঠাকেরও একই সমস্যা হয়। এজন্য চৈতন্য পুত্র নিমাই, ক্ষেত্রমোহন প্রভৃতি মল্লবংশীয় বা মল্লানুরাগীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়। ১৮০২ সালে চৈতন্য সিংহের মৃত্যু হয় আর অবশিষ্ট ২০৬৪৭১.৫ একরের বাকি জমিদারিও বর্ধমানের তেজচাঁদ ১৩৬৯৮৯ টাঃ ৬ আনা ৫ গন্ডা দরে কিনে নিলে দীর্ঘ মল্ল শাসনের অবসান ঘটে। কিন্তু বিদ্রোহের আগুন আরো ছড়িয়ে পড়ে। ফোর্ট উইলিয়ামের রেকর্ডে জানা যায় বিষ্ণুপুর, ওন্দা, সুরুল, সোনামুখী, পাত্রসায়েরে মল্লরাজার প্ররোচনায় বিদ্রোহী ও চুয়াররা সংঘটিত হচ্ছেন। এমনকি চৈতন্য সিংহ যখন ঋণের বোঝা নিয়ে ইন্দাসে অবস্থান করছিলেন, তখন সেজোয়াল সেখানে গিয়ে রাজস্ব সংগ্রহের চেষ্টা করলে, পরবর্তী প্রজন্মের মাধব সিংহ—নিমাই সিংহরা তীর-ধনুক নিয়ে  তাদের বাধা দেয়।

বিরোধ জোরাল হয় সেজোয়াল রামকান্ত দাসের সাথে।

১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী ওন্দার ক্যাম্প অফিস থেকে লেঃ কমান্ডার স্পটিশউড বিষ্ণুপুরের শাসক সি আর ব্লান্টকে বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি নিয়ে লিখলেন, 'আমাকে জানান হয়েছে যে ডোমপাড়া জঙ্গলে ওন্দার পশ্চিম দিকে কয়েক ক্রোশ দূরে দুই শতাধিক চুয়ার সমবেত হয়ে এই জেলায় অভিযান করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সকাল হওয়ার পূর্বেই তাদের হতভম্ব করার নিমিত্ত আমি তৎক্ষণাৎ অভিযান করলাম। আমার হরকরা রাস্তা ভুল করার জন্য সূর্যোদয়ের আগে আমি পৌঁছাতে পারলাম না। পৌঁছে দেখলাম অধিকাংশ চুয়ার স্থানত্যাগ করেছে। কেবলমাত্র ২৫-৩০ জন চুয়ার আছে। তাদের সাথে একটি বালক আছে। বালকটি হচ্ছে বিষ্ণুপুর রাজার পরিবারের ছেলে। ঘোড়া দ্রুত ধাবমান হওয়ায় ৭ জনকে ও বালকটিকে ধরে ফেলতে সক্ষম হলাম। যাদেরকে প্রথমে বিষ্ণুপুর পাঠিয়েছি তাদেরকে পরে বর্ধমান চালান করা হবে।' তাঁর প্রতিবেদন থেকে বিষ্ণুপুর লুন্ঠনের সমাচারও পাওয়া যায়। তিনি লিখলেন, 'আমাকে জ্ঞাত করা হয়েছে যে এই জেলায় আক্রমণের জন্য ডোমপাড়া জঙ্গলের চারপাশে একটি ভয়ানক শক্তিশালী দল তৈরি হচ্ছে। যদি তাই হয় তাহলে দেশের দেশের এই অংশের রক্ষার নিমিত্ত অতিরিক্ত সৈন্যদলের অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন আছে। বিষ্ণুপুর রাজার ছেলে মাধব সিংহ নিম্নলিখিত জমিদারদের সাথে মিলে এই কাজ করছে। তারা বর্তমানে দেশলাই কাঠি ও লোহার টুকরো বা যন্ত্রাংশ হাতে গোলা তৈরি করছে। এগুলি তারা নিকটবর্তী স্থান হতে বহন করে নিয়ে গেছে এই ভেবে উল্লেখিত মাধো সিং দুদিন পূর্বে বিষ্ণুপুর হতে তার পরিবারকে স্থানান্তরিত করেছে।

আমি হঠাৎ একটি সংবাদ পেলাম যে চুয়াড়গণ আগামীকাল বিষ্ণুপুর লুঠপাঠ করতে মনস্থ করেছে। এই স্থানের নিরাপত্তার জন্য ৪৬ জন সঙ্গীসহ একজন সুবেদার সেখানে রাখলাম। আমি তড়ার দারোগার সহায়তার জন্য সঙ্গীদের পাঠাতে সুবেদারকে নির্দেশ দিয়েছি, যেহেতু দারোগা আমাকে জানিয়েছে যে চুয়াড়গণ সেথায় হাজির হয়ে কর্মস্থলের নিকটে একটি গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে।' এই অবস্থায় এক কোম্পানী সেনাকে বিদ্রোহ দমনে স্পটিশউডের কাছে পাঠান হয়। এই পর্বে মল্ল রাজপরিবারের পক্ষে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন চৈতন্যপৌত্র মাধব সিংহ।

চৈতন্য পরবর্তী সময়ে দুটি বড় বিদ্রোহের খবর পাওয়া যায়। ১৮০৮ সালের ৫ই মার্চ সি আর ব্লান্ট বিচার সচিবকে লিখলেন ৩ রা মার্চ ৩০০ চোয়াড় বিষ্ণুপুর

সন্নিহিত জঙ্গলে সমবেত হয়েছে। খবর পেয়ে ২০ জন ঘাটোয়াল এদের সন্ধানে গেলে মুখোমুখি সংঘর্ষ শুরু হয় এবং সংঘর্ষে ৩ জন হত ও ৪ জন আহত হয়। বাকিরা জলে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে বাঁচে। পুলিশ পরে এদের আর খুঁজে পায়নি। বিষ্ণুপুর কালেক্টর মারাত্মক আহতের জন্য ৫০ টাকা, আহতদের জন্য ২০ টাকা, মৃতদের পরিবারকে বৃত্তি, চোয়াড়দের ধরার জন্য ১০০ টাকা পুরস্কার সুপারিশ করেন। ৯ মার্চ বিচারসচিবকে জানান হয় যে এই আক্রমণ সংঘটিত হয় রাইপুরের ডোমপাড়ার সর্দার বৈদ্যনাথ সিংহের লোকেদের দ্বারা। সেনাপত মহলের সর্দারের এই আক্রমণে হাত আছে সন্দেহে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৈদ্যনাথকে জেল বন্দী করা হয়।[৫১]

এদিকে রাজ পরিবারের সদস্য নিমাই সিংহ, ক্ষেত্রমোহন সিংহ, গৌরমোহন সিংহ প্রমুখ নিজ নিজ এলাকায় বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে ধরেন। এতে সাধারণ মানুষেরও যোগদান ছিল। বর্ধমান রাজ তেজচাঁদের একটি অভিযোগ থেকে জানা যায় ১৮০৮ সালের ২৫ মার্চ পাত্রসায়েরের নামকড়ি হাজরার দল, বাড্ডা থেকে থেকে বাঞ্ছারামের নেতৃত্বে ২৫ জন, মনসুরপুর থেকে রামকানাই ঘোষের নেতৃত্বে ৫০ জন, বলরামপুর থেকে ৫০ জন, হামিরপুর থেকে ভীমদিগরের নেতৃত্বে ৫০ জন, সেনাপত মহল থেকে ২৫০ জন মোট হাজার খানেক চুয়ার পাত্রসায়েরের কোম্পানী কুঠি আক্রমণ করে  আর কোম্পানী কুঠির খোসল সিংকে মারাত্মক ভাবে আহত করে। খোসল সহ অনেকে কোম্পানী কুঠিতে আশ্রয় নিয়ে বিদ্রোহীদের হাত থেকে রক্ষা পায়।[৫২] ঠাকুরসেবা মহল ও সেনাপত মহলের জমি অধিগ্রহণ করলে ভূমি উচ্ছিন্ন মানুষেরা বিদ্রোহী হন। সেনাপত মহলের জমি ৪০ জন সর্দারের অধীনে ৩০০০ মানুষ ভোগ দখল করতেন।

মল্ল ভূমে ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে রাখেন চৈতন্য পৌত্র মাধব সিংহ। প্রতিবেশী ভূমরাজ্যগুলি, মল্লরাজের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন জনতা ও সাবেক ভূম্যধিকারীদের সংঘবদ্ধ করে কোম্পানী ও বর্ধমান রাজের বিরুদ্ধে একটি শক্তিজোট গড়ে তোলেন। এদিকে অনেক পত্তনিদার আগামী অশান্তির আঁচ পেয়ে রায়তদের উপর অত্যাচার ও আদায় বাড়িয়ে দেয়। ফলে রায়তরাও নয়া শাসন ব্যবস্থায় বিক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন। ১৮০৭ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বিষ্ণুপুর জঙ্গলে পাঁচ শতাধিক সশস্ত্র ব্যাক্তি বিদ্রোহের শপথ নিয়ে সমবেত হন। তবে কুড়ি জন সশস্ত্র সিপাহী নিয়ে এক দারোগা এদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। এর পরে ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ ফেব্রুয়ারী

পাত্রসায়ের, বলরাপুর, মনসুরপুর, বাড্ডা, হামীরপুরের হাজারের বেশি চুয়ার নাও সিং হাজরা, নামকড়ি হাজরা, রামকড়ি ঘোষের নেতৃত্বে পাত্রসায়ের কাছারি আক্রমণ করলে বর্ধমান রাজের পত্তনিদার খোশল সিং ও তার দুজন সহযোগী অস্ত্রাঘাতে মারাত্মক জখম হয়। স্থানীয় সাজোয়াল কোম্পানী কুঠিতে পালিয়ে রক্ষা পান।

মাধব সিংহ বুঝতে পেরেছিলেন শক্তিশালী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থের সংস্থান জরুরি। এই উদ্দেশ্যে ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে বাঁকুড়ার ট্রেজারি লুণ্ঠনের পরিকল্পনা করা হয়। এজন্য ওন্দায় বিভিন্ন দেশাগত বর্ণেতর সর্দারদের সমাবেশ ঘটাতে থাকেন। কিন্তু ধলভূম/ধবলভূম থেকে আগত সর্দারদের সীমান্তে প্রবেশ মুখে গ্রেপ্তার করলে এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। ওন্দাতেও ব্যাপক ধরপাকড় করা হয়। এমময় জেলায় কালেক্টর ছিলেন ব্লান্ট সাহেব। ১৮০৮ সালের ৯ ই মার্চ কোম্পানীকে লেখা কালেক্টরের একটি চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে মাধবকে চুঁচড়ায় ১০০০ টাকা মূল্যের একটি নেটিভ গৃহে বন্দী করা হয়েছে।[৫৩] এর আগে মাধব সিংহের ক্রমাগত বিদ্রোহের চেষ্টা ও বর্ধমান রাজের অভিযোগের মুখে বর্ধমানের কালেক্টর এরনষ্ট মাধব সিংহের মল্লভূম থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখলেও, কালেক্টর ব্লান্ট বর্তমান বিদ্রোহের আবহে মাধব সিংহকে মল্লভূম থেকে দূরে রাখাই সঙ্গত মনে করলেন। চুঁচড়ায় মাধব সিংহের বসবাস ও ৪০০ টাকা মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করেন। তাঁকে মল্লভূমে প্রবেশ করলে মাসোহারা বন্ধের শর্ত দেওয়া হয়। ১৮০৯ সালে মাধবের মৃত্যু হলে রাজমাতাকে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের জন্য কোম্পানীর কাছে হাত পাততে হয়।[৫৪] জেলা থেকে কোম্পানীর কাছে তাদের মাধব উত্তর পারিবারিক মাসোহারার সুপারিশ ছিল রাজমাতা ও চার রাজকুমারের জন্য ২০০ টাকা, রানী ধ্বজামণির জন্য ২০ টাকা, পরিবারের অন্য ছয় পোষ্য (প্রহ্লাদ, প্রতাপ, স্বরূপ, চন্দ্র, কিশোরী, দুলাল) এর জন্য ১২ টাকা করে ৭২ টাকা, মোট ২৯২ টাকা মাত্র। এই ভাবে একটি প্রাচীন রাজবংশের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

## মল্লভূমে সন্ন্যাসী আগমন

১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী কাউন্সিলের সভাপতি কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স-এ চিঠি লিখে বাংলায় সন্ন্যাসীদের আগমন ও উপদ্রব নিয়ে যে প্রতিবেদন পাঠান, তার থেকে সন্ন্যাসী আগমন ও উপদ্রবের প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। মন্বন্তর পরবর্তী সময়ে (১৭৭১-১৭৭২) কৃষকদল যাদের কাছে চাষ করার মত রসদ, অর্থ, উদ্যম

আর অবশিষ্ট ছিল না, তারাও সন্ন্যাসীদের সাথে যোগ দেন। উত্তরের প্রদেশ, বিহার থেকে আগত এই ফকির-সন্ন্যাসীদের একাংশ ছিল ভেঙে যাওয়া বাদশাহী ও নবাবী সেনা দলের, আর সাথে জীবিকা উচ্ছিন্ন কারিগর ও কৃষক দল। এসময় নয়া ঔপনিবেশিক শাসনে কোম্পানী প্রতিনিধিদের অত্যাচারে রায়তরা ছিল বিক্ষুব্ধ। ফলে প্রথম দিকে স্থানীয় জন সমর্থন ছিল এদের পেছনে। ইংরেজ কুঠি ও তাবেদার জমিদারদের ভূসম্পত্তি চিনিয়ে দেওয়ার কাজ করত এই সব স্থানীয়রা। এই ভাবে ক্ষীরপাইয়ের কোম্পানী কুঠি, ইলমবাজার কুঠি, ছাতনা ও মল্লভূমির কাছারি বাড়িগুলো লুণ্ঠিত হয়। এরা তীর্থ যাত্রার আছিলায় পুরীগামী রাস্তার দুই পাশের গ্রামগুলিতে লুঠতরাজ চালাত। ফলে অনেক সময় সাধারণ রায়তরাও এদের হাতে অত্যাচারিত হয়েছেন। ফলে রায়ত ও জমিদাররা রাজস্ব পরিশোধেও বিপন্ন বোধ করেন। কোম্পানী সেনা এই অবস্থায় মল্লভূম থেকে এই সন্ন্যাসী দলকে বিতাড়িত করার আয়োজন করে। ক্যাপ্টেন ফোর্বসের নেতৃত্বে এক সেনাদল মল্লভূম-সামন্তভূমে অবস্থানরত ৩০০০ সদস্যের সন্ন্যাসী দলকে বিতাড়িত করার অভিযান হাতে নেয়। কোম্পানী সেনার তাড়া খেয়ে সন্ন্যাসীদল বিষ্ণুপুর-রায়পুর-ফুলকুসুমা-শিলদা-আলমপুর পথে গোপীবল্লভপুরের মারাঠা নিয়ন্ত্রিত এলাকায় আশ্রয় নেয়।[৫৫] এই সম্পর্কিত প্রতিবেদন বোর্ড অব রেভেন্যু প্রধান চার্লস স্টুয়ার্টকে মেদিনীপুরের রেসিডেন্টকে পাঠান। তবে ১৭৭৩ সালের ১৫ ই জানুয়ারীর কোর্ট অব ডাইরেক্টর্সকে লেখা কোম্পানী কাউন্সিলের প্রতিবেদনে দেখা যায় কোম্পানী ক্যাপ্টেন থমাস এই বিদ্রোহীদের সাথে লড়াইয়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। যাই হোক এর পর মল্লভূমে আর সন্ন্যাসী আগমনের খবর পাওয়া যায় না।

## মল্লভূমে মন্বন্তরের অভিঘাত ও ফলাফল

১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে সারা বাংলা দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়ে ছারখার হয়ে যায়। মল্লভূমও এই মারণযাত্রার বাইরে ছিল না। বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রাস্তা ঘাটে মৃতদেহ পড়ে থাকে। সৎকারের লোকও ছিলনা। জন্তু জানোয়ারের দ্বারা ভক্ষিত হতে থাকে মৃতদেহ। এই জনক্ষয় ব্রিটিশ শাসকের অনুসৃত ভূমি ভিত্তিক অর্থনীতির পক্ষে ছিল বড় আঘাত। গ্রামগুলো জনশূন্য হয়ে পড়ে। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। জমি অকর্ষিত থেকে জঙ্গলে পরিপূর্ণ হতে থাকে। যে কজন মানুষ বেঁচে ছিল তারা দেশ ছাড়া হয়।[৫৬] অনেক সময় দেশত্যাগী এই সব কৃষককে

পেয়ে ভূস্বামীরা তাদের জমিতে চাষ করতে উৎসাহিত করতে আবয়াবের (অতিরিক্ত সেস) ৫০ শতাংশ ছাড় ও ভূমি রাজস্বের ২৫ শতাংশ ছাড় দিয়ে সে সব পরিত্যক্ত জমিতে চাষ করার আহ্বান জানাতেন। এই পাইকস্ত রায়তদের সাহায্যে নতুন নতুন গ্রামের পত্তন হয় বীরভূম-বিষ্ণুপুর যুক্ত জেলায়। ১৭৯২ সালের মধ্যে এমন ৩২৮ টি গ্রাম গড়ে উঠেছিল। ১৭৬৫ সালে যেখানে যুক্ত জেলায় গ্রামের সংখ্যা ছিল ৬০০০, সেখানে দুর্ভিক্ষের পরের বছর (১৭৭১-৭২) গ্রাম সংখ্যা কমে হয় ১৫০০। ১৭৮৫ সালে দুর্ভিক্ষের অভিঘাত কাটিয়ে গ্রাম সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬০০। এই মোট ক্ষতি পূরণ হতে পাঁচ দশকেরও বেশি সময় লেগে যায়। বহু গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়ে। বীরভূম-বিষ্ণুপুর জেলায় দুর্ভিক্ষপূর্ব জনবসতি পূর্ণ গ্রাম সংখ্যা যা ছিল তা ফিরিয়ে আনতে লেগে যায় ১৮২২ সাল পর্যন্ত সময়কাল। এসময় গ্রামের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৯৯৩।[৫৭]

তবে পাইকস্ত (বহিরাগত) রায়তদের আগমন ও কর ছাড়ের সুবিধা দেওয়ায় আদি কৃষকরা (খুদকস্ত) অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। কারণ তাদের রাজস্ব যেখানে ছিল নগদে বিঘা প্রতি পাঁচ টাকা আট আনা তেরো গন্ডা, পাইকস্ত রায়তদের ক্ষেত্রে তা মাত্র শস্য মূল্যে বিঘা প্রতি চার থেকে আট আনা। ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে জেলাশাসক কিটিং বোর্ড অব রেভেনিউকে জানান জেলায় পাইকস্ত ও খুদকস্ত রায়তদের বিরোধ তীব্রতর হয়েছে।[৫৮] এই বিরোধ মেটাতে তিনি এই দুই শ্রেণীর কৃষকের রাজস্ব হারের সমতা আনার পক্ষে সওয়াল করেন। সরকার তাঁর আর্জি মেনেও নেয়।

তবে এই সমতার ঘোষণা নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে। পাইকস্ত রায়তরা প্রবল কায়িক পরিশ্রমে জঙ্গলে পরিণত হওয়া জমিগুলো চাষযোগ্য করে তুলেছিলেন। হঠাৎ এই জমিতে ৬-১২ শতাংশ কর বৃদ্ধি পাইকস্ত প্রজাদের বিদ্রোহী করে তোলে। তারা এই হারে রাজস্ব পরিশোধ করতে অস্বীকার করেন। অনেকে উৎপাদিত ফসল নিয়ে সাবেক জন্মস্থান-গ্রামে পালিয়ে যান। ১৭৯০ সালে পাইকস্ত রায়তদের এমন প্রস্থানের ফলে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৩২৩৯৭ টাকা ৫ আনা ৭ গন্ডা (মোট রাজস্ব বকেয়ার ১০ শতাংশ)। ইতিমধ্যে কর্ণওয়ালিশের দশসালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মোতাবেক জেলাশাসকরা 'নিরিখ' নির্ধারণ করে ফেলেন। পাটোয়ারীরা সেই অনুসারে জমাবন্দী পাট্টা কৃষকদের মধ্যে বিলি করতে থাকেন। কিন্তু প্রায় দ্বিগুণ রাজস্ব নির্ধারণের অভিযোগে এই পাট্টা নিতে অস্বীকার করেন বেশির ভাগ প্রজা। ১৮৯২ সালের ১ লা জানুয়ারী কিটিং বোর্ড অব রেভেনিউকে জানান জেলার

মাত্র ৩৮৬৭ জন রায়ত এই পাট্টা নিতে রাজি হয়েছেন। জেলা শাসকের আশঙ্কা ছিল এর ফলে দুর্ভিক্ষ ও পাঁচশালা বন্দোবস্ত জনিত প্রজা দুর্দশা ও দেশ ত্যাগের ঘটনা আবার শুরু হবে। তিনি নিজ উদ্যোগে অতিরিক্ত সেস প্রত্যাহার করে কর ভার লাঘবের চেষ্টা করেন। এই হ্রাসের (বেলমুক্তা নামে পরিচিত) ফলে রাজস্ব টাকায় ১ গন্ডা কম হয়। ১৭৮৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী ফলনের পর অতিরিক্ত রাজস্ব আরোপের ফলে কৃষকদের সেই বর্ধিত কর দেওয়ার অনীহার কথা জানান। শুধু তাই নয়, এর ফলে দেশত্যাগী রায়তের সংখ্যা বৃত্তি পাচ্ছিল। রাজস্ব সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে এই রায়তদের জেলায় ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত জরুরি ছিল। ১৭৮৮ সালে কিটিং বর্ধমানে পালিয়ে যাওয়া কৃষকদের ফিরিয়ে দিতে জেলাশাসক টি ব্রুককে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তাতে সাড়া দেননি। ১০/০৫/৯০ এ বোর্ড অব রেভেনিউকে জানিয়েও তিনি কোন সুরাহা পেলেন না। এর কারণ হল সবাই চাইছিল রাজস্ব আদায় বাড়াতে আগত কৃকদের ধরে রাখতে।[৫৯]

দুর্ভিক্ষ পরবর্তী জনক্ষয়ের কারণে জেলা জঙ্গলাকীর্ণ ও শ্বাপদ সঙ্কুল হয়ে পড়ে। ১৭৮০ সালের প্রতিবেদনে দেখা যায় সিউড়ি-বিষ্ণুপুর সড়ক সেনাদের যাতায়াতের পক্ষেও সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে। সেনা শিবির করার উপযুক্ত পরিসরের জায়গাও মিলছিল না। ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ৯ ই অক্টোবর বোর্ডকে কিটিং জ্ঞাত করেন, জংলী জানোয়ারের উপদ্রবে বহু গ্রাম জন শূন্য হয়ে গেছে। শিল্প শহর পরিত্যক্ত হয়েছে, গরু হাটগুলো বন্ধ হয়েছে এবং গোচারণভূমি পতিত ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। কোর্ট অব ডাইরেক্টরকে লেখা লর্ড কর্ণওয়ালিশের ২ রা আগষ্ট, ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের পত্রে দেখা যাচ্ছে প্রদেশের এক তৃতীয়াংশ শ্বাপদ সঙ্কুল হয়ে পড়েছে। বাঘের মত ক্ষতিকারক জন্তুদের নিধন করার জন্য পুরস্কার ও পারিশ্রমিক ঘোষণা করা হয়। ১৭৯০ সালের ২৯ শে ডিসেম্বর ও ১৭৯১ সালের ২৮ শে জানুয়ারী বীরভূমের কালেক্টরকে রাজ্যের একাউন্টেন্ট জেনারেল আশ্বস্ত করছেন যে সরকারের আর্থিক অনটন ও বিধিনিষেধ থাকলেও জন্তু-নিধন তহবিল বন্ধ করা হবে না। বীরভূম কালেক্টর বোর্ড অব রেভেন্যুকে ১১/০২/৮৯, ৩০/০৪/৯০ এ জন্তু ও জঙ্গল জনিত সমস্যার ব্যাপকতা নিয়ে পত্রাচার করেন।

বিষ্ণুপুরের রাজস্ব সংকট নিয়ন্ত্রণে হেসিল রিজকে সেখানে কোম্পানী প্রতিনিধি করে পাঠান হয়। রাজা চৈতন্য সিংহকে আটের দশকে দুইবার ও নয়ের দশকে একবার কারারুদ্ধ করেও রাজস্ব অনাদায় আটকানো গেল না।[৬০] ১৭৮৯ সালেই রাজার অনাদায়ী রাজস্ব ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা। পরের বছর দশসালা বন্দোবস্তে রাজার

দেয় ভূমিকর দাঁড়ায় চার লক্ষে। কিন্তু এই বিপুল রাজস্ব পরিশোধ চৈতন্য সিংহের পক্ষে কোন ভাবেই সম্ভব ছিল না। রাজস্ব আনাদয়ের কারণে বড়হাজারী ও করিসুন্ডা মহল দুটি নিলাম হয়ে যায়। বর্ধমানের রাজা ২১৪১৪৭টাকা ২ আনা ২২ গন্ডায় মহল দুটি কিনে নিলেন। নিলামী রাজস্ব বাদ দিয়ে বাকি ১৮৫৮৫৩ টাকা পরিশোধেও রাজা ব্যর্থ হলেন। কালেক্টর ডেভিস দশশালা বন্দোবস্তকালীন অতিরিক্ত জমা ২০৪৬৭ টাকা বাদ দিলেও রাজস্ব পরিশোধে মল্লরাজ ব্যর্থ হলেন। কালেক্টর ব্লান্টের অভিযোগ ছিল নিষ্কর লাখেরাজ সম্পদের মাধ্যমে মল্লরাজের কর ফাঁকি ছিল ৪০০০০ টাকা। আসলে ডামাডোলের মধ্যে অধীনস্ত মন্ডল ও প্রজাদের রাজাকে কর ফাঁকি দেওয়ার ঘটনা ও প্রবণতা বাড়তে থাকে। বাড়ে পারস্পরিক মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা। ১৭৯৮ সালের মধ্যে কোম্পানীর নিলাম নীতির অঙ্গ হিসাবে মল্ল জমিদারির অধিকাংশ নিলামের মাধ্যমে বর্ধমান রাজার হাতে আসে। তিনি ১৮০৬ সাল নাগাদ জমিদারির ভগ্নাবশিষ্ট কিনে নিলে মল্ল রাজবংশ ও মল্ল রাজত্বের অবসান ঘটে।[৬১] সেই পতনের বর্ষলিপি নিম্নরূপ।

| সাল | মহলের নাম | এলাকা (একর) | ক্রেতা (একর) | নিলামী দর (টা/আ/গ) |
|---|---|---|---|---|
| ১৭৯১ | বড়হাজারী | ১৩১৯৪৩-৫ | তেজচাঁদ, বর্ধমান | ১৯২৬৩৩-৫-৯ |
| ১৭৯১ | কড়িমুণ্ডা | ১৩১২৯ | ” | ২৩৩৯৫-৫-০ |
| ১৭৯৮ | জঙ্গলমহল | ১২২৩৫৪-৫ | ” | ৩৪৯৯-৪-৬ |
| ১৭৯৮ | কুচিয়াকোল | ৮৫৪২-৫ | নিমাই সিংহ | ৮২৩৭-১০-০ |
| ১৭৯৮ | পাঁচাল | ৪৯৩ | —— | ৪০৮-৯-৯ |
| ১৭৯৮ | জামতাড়া | ৯৫৭৫-৫ | —— | ৬৩১০-৯-৯ |
| | মালিয়াড়া | ৩২০৪৩-৫ | বোর্ড অব রেভেন্যু | ৫২০২-৮-৯ |
| | সাহাড়জোড়া | ১৬৬২৩ | অধীন স্বাধীন তালুক | ৩১১০-০-৫ |
| | কিসমত | ৪৬৬৫ | তেজচাঁদ, বর্ধমান | ১১৫৬-১০-৮ |
| ১৮০৬ | বিষ্ণুপুর | ২০৬৪৭১-৫ | তেজচাঁদ, বর্ধমান | ১৩৬৯৮৯-৬-৫ |

## মল্লভূমে রাজ উৎসব

মল্লভূমে রাজারা রাজকীয় গৌরবগাথার সাথে সাযুজ্য রেখে ফিবছর (১) ইন্দ্র পরব (২) শিকার উৎসব (৩) পূণ্যাহ উৎসব পালন করত। এই তিনটি উৎসবেরই রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল। বিশেষত অধীনস্ত রাজন্যবর্গ ও প্রজাদের কাছে শক্তি ও সংহতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে।

প্রত্যেক বছর পয়লা ভাদ্র রাজা ইঁদ-কাঠ নির্বাচনের জন্য সপার্ষদ মল্লরাজ বাসদেবপুর সংলগ্ন কানগড় জঙ্গলে যাত্রা করতেন। থাকতেন শাঁখারিবাজার মহল্লার ফৌজদার বংশের বিশিষ্ট রাজকর্মচারী, বাজনা-বাদ্যি সহ সেনা দল, পূজোপকরণ সহ পুরোহিত ও প্রজাবৃন্দ। জঙ্গলে গিয়ে সুঠাম দুটি শাল গাছ নির্বাচন করে পূজা করা হত। ফৌজদার শাল গাছ দুটির মূলে কোপ দেওয়ার পর সবাই ফিরে আসতেন। ইন্দ্র পরবের দুই দিন আগেই জঙ্গল থেকে কেটে শালকান্ড দুটি মন্দিরের আদলে বাঁশ-বাতা দিয়ে চূড়া-কলস-আমলক স্তর বিন্যাসে নতুন কাপড় দিয়ে মুড়ে, শীর্ষে ছাতা লাগিয়ে প্রস্তুত করা হত।[৬২]

ভাদ্র মাসের শুক্লা-দ্বাদশী তিথিতে (ইন্দ্র দ্বাদশী) প্রত্যুষে রাজপ্রাসাদ থেকে বেজে উঠত 'ইঁদ-ভেরী'। রাজার হতির পিঠে যাত্রা শুরু হত কাটানধার মহল্লার ইঁদতলায়। পালকিতে চলত কুলদেবতা অনন্তদেব। ঘোড়ায় চড়ে রাজপুরুষগণ, পদব্রজে রাজকর্মচারী ও প্রজারা এই যাত্রায় অংশ নিতে । শোভাযাত্রার আগে থাকত বাউরী, বাগদী লাঠিয়ালের দল। বাজত কাড়া, নাকাড়া, রণভেরী ও বাজনা-বাদ্যি। রাজা ইঁদতলায় ইঁদকাঠের দড়ি ছুঁয়ে দিলে ৪৫ ডিগ্রী কোণে কাঠ দুটিকে উত্তোলন করা হত। ইঁদ সওয়ারীর দলটি সন্ধ্যায় ফিরে রাজবাড়ির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে রাজদরবারে 'সনপেটা' অনুষ্ঠানে হাজির হতেন। রাজা সভাসদ পরিবেষ্টিত সিংহাসনারূঢ় থাকেন আর শাঁখারি বাজারের বুড়ো ধর্মঠাকুরের পূজারি জনৈক কর্মকার রাজবাড়ীর পাকা মেঝে উপর হাতুড়ির ঘা দিয়ে মল্লাব্দের দিন ও সাল ঘোষণা করতেন। এই প্রথম দিনটি হত 'বামন দ্বাদশী' তিথি। অনুষ্ঠান শেষে সাঁওতাল সর্দারদের রাজা হলুদ পাগড়ি ও বস্ত্র দিয়ে সম্মানিত করতেন ও বাকি সমাগত প্রজাদের 'আরসা' নামক মিষ্টান্ন খাইয়ে বিদায় দিতেন।

পয়লা মাঘ ফিবছর রাজা 'এখান শিকার' উৎসবে বেরোতেন। গন্তব্য হত রাজধানীর সন্নিকটের কাটরার জঙ্গল। সাত আটদিন আগে থেকেই সেনাপতি,

ফৌজদার, দিকপতি, দিগর, সদিয়াল, ঘাটোয়াল, পাইক, সর্দার, প্রতিহারগণের কাছে শিকারের বার্তা পাঠান হত। শিকারের দিন রাজা হাতির পিঠে, দুপাশে সেনাপতি, ফৌজদার, দিকপতি, দিগররা ঘোড়ার পিঠে, বাকিরা পদব্রজে চলতেন। সঙ্গী সেনারা কলরব, দামামা, কড়া-নাকড়া, কাঁসর-ঘন্টা, ঢাক-ঢোলের নিনাদে আকাশ বাতাস মুখরিত করে চলতে থাকত। আর বনে জানোয়ারদের ছোটাছুটি ও দিনশেষে শিকার নিয়ে প্রত্যাবর্তন। শিকারলব্ধ পশুপাখি সব রাজার কাছে জমা হত ও মর্যাদা অনুসারে বিভাজিত হত।

পুণ্যাহ বাংলার রাজস্ব আদায়ের বার্ষিক বন্দোবস্তের একটি উৎসব। এই উৎসব বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত। এটি ছিলো রাজস্ব আদায় এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত বিষযের প্রাক-ব্রিটিশ সময়ের পদ্ধতি। যে ব্যবস্থায় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সকল জমিদার, তালুকদার, ইজারাদার এবং অন্যান্য রাজস্ব প্রদানকারী ব্যক্তিদের বছরের নির্দিষ্ট দিনে একটি অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণের মাধ্যমে পূর্ববর্তী বছরের রাজস্ব আদায় এবং নতুন বছরের বন্দোবস্ত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। রাজদরবারে অনুগত ও অধীনস্থ রাজা, জমিদার, ভূম্যধিকারীরা এখানে এসে রাজার কাছে বিগত বছরের রাজস্ব ও আগামী বছরের দেয় বুঝে নিত। সাধারণ ভাবে পয়লা বৈশাখ বা শস্য ওঠার পর এই ধরণের আদায় উৎসব হত। মল্ল রাজদরবারে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে রাজকীয় গরিমা রক্ষিত হত।

## সামাজিক কুসংস্কার

বাংলার অন্য অংশের মত গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, সতীদাহের মত মর্মান্তিক ঘটনার কথা বাঁকুড়া তথা মল্লভূমে পাওয়া যায়। কালেক্টর কেলভিনের মতে জেলায় বিভিন্ন বছরে সতীর সংখ্যা হল (ক) ১৮১৫ সালে ৩১(খ) ১৮১৬ সালে ৩৯ (গ) ১৮১৭ সালে ৪৩ (ঘ) ১৮১৮ সালে ৬২। কেলভিন এর জন্য সরকারী নিয়মের পরিবর্তন দাবি করেন। তাঁর মতে ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে সতীর অনুমোদন অনেক স্বার্থান্বেষী শ্রেণীকে উৎসাহিত করেছিল। অশিক্ষিত ও নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে সতী প্রথার প্রকোপ বেশি ছিল। সতীদের বেশির ভাগই ছিল পঞ্চাশোর্ধ। ১৮২২, ১৮২৩, ১৮২৪, ১৮২৫, ১৮২৬ সালে জঙ্গল মহল জেলায় সতীর সংখ্যা ছিল ২৪, ২৭, ১৬, ৯, ১১ জন।[৬৩] ১৮২২ সালের নিজামৎ আদালতের নির্দেশে প্রত্যেক সতীর ঘটনায় সতী, স্বামী-সন্তানদের বিস্তৃত খতিয়ান সংগ্রহ করতে বলা হয়। সরকারি

বাধাও শুরু হয়। ১৮২৪ সালের একট সতীর ঘটনায় মৃতের দেড় বছরের শিশু সন্তান থাকা সত্বেও সতীদাহ করা হয়, সরকারি আপত্তি অগ্রাহ্য করে। এই ঘটনায় দায়ী নিকটাত্মীয়দের ২০০ টাকা জরিমানা ও অনাদয়ে ৩ মাসের জেল দেওয়া হয়। জেলাশাসকের এই আদেশ কোর্ট অব সারকিটও অনুমোদন করে। ১৮২৬ সালে পুলিশি উপস্থিতি ও আপত্তি সত্বেও এক সতীর ঘটনায় ক্ষুব্ধ জেলাশাসক তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দেন। কালেক্টর কেলভিন জোরজবরদস্তি না করে বুঝিয়ে সতী হওয়া থেকে বিরত করার পক্ষপাতী ছিলেন। যাই হোক ১৮২৮ সালে সতীদাহ নিষিদ্ধ হওয়ার পর সতীর ঘটনা আর শোনা যায়নি। গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জনের সুনির্দিষ্ট খতিয়ান পাওয়া যায় না।

## মল্লশাসনে সঙ্গীত সমাজ ও বিষ্ণুপুর ঘরানার জন্ম

মল্লরাজ হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্যের সংস্পর্শে আসার পর মল্লভূম বৈষ্ণব ভাবধারায় প্লাবিত হয়। কৃষ্ণপ্রেমে ভাবাবিষ্ট হাম্বির দীর্ঘদিন বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর নাম দেন চৈতন্য দাস। কোন এক আষাঢ় মাসের পঞ্চমী তিথিতে (মতান্তরে ৩রা আষাঢ়) শ্রীনিবাসের কাছে দীক্ষা নেন হাম্বির, জ্যেষ্ঠ পুত্র ধাড়ি হাম্বির এবং রাজমহিষী শিরোমণি দেবী। তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন বিষ্ণুপুরকে গুপ্তবৃন্দাবনে পরিণত করতে। বিপুল অর্থব্যয়ে খনন করা হয় যমুনা বাঁধ, কালিন্দী বাঁধ, শ্যামকুন্ড, রাধাকুন্ড, কালীদহ প্রভৃতি এবং বিষ্ণুপুর সন্নিহিত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করেন যাদবনগর, মথুরা, দ্বারকা, মধুবন সহ বৃন্দাবনের স্মৃতিবাহী বিবিধ গ্রাম। প্রতিষ্ঠিত হয় বিশালায়তন রাসমঞ্চ। আর শুরু হয় গুরু পরিবারের (আচার্যদেব শ্রীনিবাস, গুরু পত্নী পদ্মাবতী, গুরুপুত্র গীতগোবিন্দ, গুরুকন্যা হেমলতা দেবী) সাথে সারস্বত সাধনা। রচিত হয় একের পর এক বৈষ্ণব পদ। পদ, গান আর নাটক। রাস মঞ্চে সে ভক্তিমূলক অভিনয়ে অংশ নিতেন রাজা, রাজগুরু, হেমলতা প্রমুখ। এই সাধনা বহু প্রজন্ম ধরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। জন্ম হয় বিষ্ণুপুর ঘরানার। দ্বিতীয় রঘুনাথের সময় তানসেনের বংশধর বাহাদুর খাঁ ও তবলা-মৃদঙ্গ বাদক পীর বক্সের আগমন বিষ্ণুপুরের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ধারারকে পুষ্ট করে। শ্রীনিবাসের বংশের যারা এই ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তাদের মধ্যে মৃদঙ্গবাদক জগৎচাঁদ গোস্বামী, কীর্তিচাঁদ গোস্বামী, সঙ্গীত বিশারদ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, গুরু জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী অন্যতম। পরিবারের বাইরের প্রবাদপ্রতিম যদুভট্ট এই ধারাকে

সমৃদ্ধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও যদুভট্টের জ্ঞানের আলোকে আলোকিত ছিলেন।

৯৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত চর্যাপদ রচয়িতাদের মধ্যে বৌদ্ধ শিষ্য লুইপাদ সমকালীন বৌদ্ধ প্রভাবিত মল্লভূমের অধিবাসী বলে অনেক গবেষক মনে করেন। গানের আদলে তৈরি চর্যাপদ ছিল রাগাশ্রয়ী। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মানুষ লোচন পন্ডিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বিশারদ ও ধর্মঠাকুরের অনুগামী ছিলেন। সেই হিসাবে খুবসম্ভব তিনিও মল্লভূমের। বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমের জনপদ বাসদেবপুরে লোচনপুর নামাঙ্কিত একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে, যা থেকে এই গ্রামের আদি নাম লোচনপুর ও তা লোচন পন্ডিতের স্মৃতি বিজড়িত বলে অনেকে বিশ্বাস করেন।[৬৪] দ্বাদশ শতকের সাধক কবি জয়দেব মল্লভূমের এক সঙ্গীত সাধকের কাছে গানে তালিম নিয়েছিলেন। বড়ু চন্ডীদাসের 'কীর্তন' মল্ল-রাগ চেতনায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। জয়পুর থানার ময়নাপুরের রামাই পন্ডিতের শূন্যপুরাণের গান লোকসঙ্গীত চর্চাকে সমৃদ্ধ করেছিল। এছাড়া বাউল গান, তুসু, ভাদু, ঝুমুর, তর্জা, কথকতা, পাঁচালী, কৃষ্ণযাত্রা, খেউড় সঙ্গীতের মত লোকগান মল্লভূমে সমৃদ্ধি লাভ করে ঐতিহ্যের অংশ হয়ে ওঠে।

মল্লভূমে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কদর বোঝা যায়, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে এর ব্যবহার থেকে। মৃন্ময়ী মায়ের মহা সপ্তমীর মহাপূজার দিন নবপত্রিকা (কলাবউ) আগমনের দিব্য অনুষ্ঠানে আটটি ঘট পূজা করার বিধি ছিল। অষ্টকলস বরণে মন্ত্রোচ্চারণের পাশাপাশি আটটি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হত। রাগের ক্রম ছিল মালব, ললিত, বিভাস, ভৈরব, কোড়া, বড়াড়ী, বসন্ত, ধানসী। বিষ্ণুপুরের মহাপাত্র উপাধিধারী বৈদিক ব্রাহ্মণগণ একাজ সম্পন্ন করত। বীর হাম্বির ও শ্রীনিবাস আচার্যের নব মল্লভূমের সারস্বত সাধনায় যোগ দেন বহু পদ রচয়িতা, কবি ও সুরকার।[৬৫] মল্লভূমের কবিচন্দ্রের শিবমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, বিষ্ণুপুরী রামায়ণ আর জগদ্রাম রায়ের অদ্ভুত রামায়ণ ও দুর্গা পঞ্চরাত্রি সেই পরিমন্ডলে উন্নত সংযোজন।

দ্বিতীয় রঘুনাথের সমকালে বিষ্ণুপুরে আগত সেনী ঘরানার তানসেনের অষ্টম পুরুষ বাহাদুর খাঁ এক ঝাঁক সুরসাধক তৈরি করেন।[৬৬] সভাগায়ক বাহাদুর খাঁয়ের রাজা প্রদত্ত ভাতা ছিল মাসিক ৫০০ টাকা। সেযুগে যা ছিল যথেষ্ট। তিনি থাকতেন বর্তমান বাহাদুরগঞ্জে। যে নামের উৎস তিনিই। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন গদাধর চক্রবর্তী, অনন্তলাল চক্রবর্তী, দ্বারিকানাথ চক্রবর্তী, নিতাই নাজির, বৃন্দাবন নাজির। রাজার চারিত্রিক পতন ঘটলে, প্রতিবাদ জানিয়ে বাহাদুর খাঁ মল্লভূম ছেড়ে দেশে ফিরে যান। এর পর সভাপন্ডিত হন গদাধর চক্রবর্তী। তাঁর অকাল মৃত্যুতে এই

আসনে বসেন কৃষ্ণমোহন গোস্বামী। গদাধর বা কৃষ্ণমোহনের শিষ্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর অনন্য সাধারণ প্রতিভা নিয়ে বিষ্ণুপুর ঘরানার সৃষ্টি করেন। এই ঘরানাকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত করেন রামশঙ্কর পুত্র রামকেশব, শিষ্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, দীনবন্ধু গোস্বামী, কেশবলাল চক্রবর্তী, যদুভট্ট, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকল্প মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।[৬৭]

অনন্তলালের শিষ্য ছিলেন রাজা দ্বিতীয় গোপাল সিংহের দুই পুত্র রামকৃষ্ণ ও রামকিশোর সিংহদেব। রামকৃষ্ণ সিংহদেব (১৮৭৬ - ১৮৮৫) রাজা হওয়ার পর বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রাতিষ্ঠানিক প্রসারে একটি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে অনন্তলালকে তার আচার্য পদে অভিষিক্ত করেন। ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী (সঙ্গীত ব্যাকরণের স্রষ্টা ভাতখণ্ডে এনার কাছে সঙ্গীত শিখতে চেয়েছিলেন, রাধিকার পিতা ছিলেন প্রখ্যাত মৃদঙ্গশিল্পী জগৎচাঁদ), তিন পুত্র রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর, সুরেন্দ্রনাথ। রাধিকাপ্রসাদের শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের খ্যাতির ছটা সমকালীন সমাজকে আলোড়িত করেছিল। তাঁর শিষ্যকুলের মধ্যে ছিলেন ধীরেন ঘটক, জয়কৃষ্ণ সান্যাল, সত্যেন ঘোষাল প্রমুখ। এমনি করেই রাজা হাম্বিরের গুরু শ্রীনিবাস আচার্যের বংশ পরম্পরায় ও অগণিত গুণী মানুষের মধ্য দিয়ে আজও বিষ্ণুপুর ঘরানা অমলিন হয়ে বেঁচে আছে।

## শুভঙ্কর কথা ও মল্ল শাসনে সামাজিক চিত্র

কয়েকটি বিষয়ে রামপুরের জগন্নাথ চৌধুরী ওরফে শুভঙ্করের (এটি মল্লরাজ প্রদত্ত উপাধি) অবদান মল্লভূমের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি শুধু গোপাল সিংহের মন্ত্রী ছিলেন না, ছিলেন অষ্টাদশ শতকের একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও স্রষ্টা। শিক্ষা বিশেষত গণিত শিক্ষার জন্য প্রাক-ব্রিটিশ যুগে গাণিতিক আর্যা রচনা একটি বড় ঘটনা। বহু কাল ধরে এই আর্যা দেশের গণিত শিক্ষার মুখ্য মাধ্যম হয়ে থেকেছে। এই আর্যা থেকে বড় প্রাপ্তি সমকালীন সমাজজীবন ও অর্থনৈতিক চালচিত্র। আর্যার বিবরণ অনুসারে কৃষিক্ষেত্রে মূল ফসল ছিল ধান ও অন্যান্য ফসল গম, মুগ, মটর, মুসুর, বিড়ি, খাসারি কলাই, সরিষা, তিল, তিসি তেল বীজ, কার্পাস, ইক্ষু, পান। সেকালে আখ থেকে রস, গুড় তৈরির ব্যাপক প্রচলন ছিল। বিপণন, বাজার, দ্রব্যমূল্য, পরিমাপ নিয়ে বিস্তৃত ভাষ্য ছিল আর্যায়। অর্জুনের হাটে চালের দাম ছিল কড়ায় পাঁচ সের, আটা তিন কড়ায় এক সের। বলদের পিঠে ছালায় চাল-গম-কলাই-

সরিষা-হরিতকি নিয়ে রাজ্যে ও রাজ্যান্তরে চলত বাণিজ্য। ‘কর্জ, সুদ ও হার’ শব্দের মাধ্যমে তিনি সমকালীন মহাজনি তত্ত্বের তথ্য সামনে এনেছেন। মাসিক টাকা প্রতি সুদের হার ছিল এক বা আধ পাই থেকে আড়াই বা তিন পাই। বন্ধকী কর্জের ক্ষেত্রে সুদের হার ছিল কম। মাসে টাকায় এক আনা সুদ অতিরিক্ত ধরে বছরে বারো আনা সুদ ধার্য হত। দিন প্রতি সুদও নেওয়া হত। টাকা, আনার মত পাকা কড়ি দ্রব্য কেনা বেচায় ব্যবহৃত হত। অবশ্য দ্রব্য বিনিময়ই ছিল বিপণনের মূল বৈশিষ্ট্য। কৃষি অর্থনীতির কারিগর ছিলেন কৃষক, ক্ষেতমজুর, কলু, তিলি, বারুই, গোয়ালা, তন্তুবায়, মহালদার। রাজস্ব কর্মী ছিলেন কানুনগো, আমিন, গোমস্তা, তহশীলদার। জঙ্গল জমির ক্ষেত্রে মালগুজারি, লাখেরাজ, খায়ের জমা সংক্রান্ত ব্যবস্থার কথা জানা যায়। বিঘা প্রতি ভাল জমির রাজস্ব ছিল এক টাকা।[৬৮]

গোপাল সিংহের মন্ত্রী শুভঙ্কর ভাস্কর পন্ডিতের নেতৃত্বে মল্লরাজধানীতে বর্গী আক্রমণ রুখতে কামানের সহযোগে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন বলে কথিত। রতন কবিরাজ ‘মদন মোহন বন্দনা’য় লিখলেন,[৬৯]

> “আইলেন ভাস্কর খবর কহে শুভঙ্কর,
> তিন লক্ষ ঘোড়া সঙ্গে কর্যা....”

ভূম রাজ্যে এদের অত্যাচার ছিল মাত্রা ছাড়া।[৭০] অগ্নিসংযোগ, লুঠ, হত্যা, অপহরণ, অঙ্গহানি, মহিলাদের উপর অত্যাচার ছিল বর্গী অভিযানের অনুষঙ্গ। শুভঙ্কর তাঁর আর্যায় লিখেছেন, “সাগর ঘোষ নামে এক গোওআলা আছিল।/দৈবের কারণে বর্গী আসিয়া পড়িল।।/সর্বস্ব হইল গোপের না লইল গাই।/সাত ভাই মধ্যে তার রহিল তিন ভাই।।”

সেনভূম, গোপভূম ছারখার করে মল্লভূমে বর্গী উপদ্রব শুরু হয়। মল্লভূমে বিশেষত রাজধানীতে প্রতিরোধের মুখে পড়ে আশেপাশের ধারাপাট, রামসাগর, পাইকপাড়া, যাদবনগর, ব্রজরাজপুর সহ বিভিন্ন জনপদ বর্গী হানায় ছারখার হয়ে যায়। শুভঙ্করের আরেক কীর্তি সেচের প্রসারে ‘শুভঙ্কর দাঁড়া’র খনন ইতিমধ্যেই বিবৃত হয়েছে।

## শ্রীনিবাস আচার্য ঘরানা

বৈষ্ণব সাধক শ্রীনিবাস আচার্য-এর আবির্ভাব আনুমানিক ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়

দশকে। দীনেশচন্দ্র সেন, ড. রাধাগোবিন্দ নাথ প্রমুখরা ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর জন্ম দাবী করলেও ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, অনুরাগবল্লী প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থানুসারে এবং বিমানবিহারী মজুমদার, অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়, পুলীনবিহারী দাস, জীমূতবাহন রায় প্রমুখ পণ্ডিত গবেষকদের মতে তাঁর জন্ম সন ১৫১৮ বা ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দের বৈশাখী পূর্ণিমায়।

বৃন্দাবনের সঙ্গে গৌড়ের নিবিড় সংযোগ সাধন করেছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। অবশ্যই মধ্যবর্তী বিষ্ণুপুরের সাথে। সাধনার শেষে তিনি বৃন্দাবন থেকে সতীর্থ শ্যামদাস ও নরোত্তমের সাথে অমূল্য গ্রন্থরাজী নিয়ে আসছিলেন গৌড় বাংলার পথে। তারপরের ইতিহাস সকলের জানা। পথিমধ্যে মল্লরাজের দস্যুদল কর্তৃক মূল্যবান রত্নভ্রমে শ্রীনিবাসদের সকল গ্রন্থ চুরি — মল্লরাজসভায়-শ্রীনিবাসের ভাগবতপাঠ— গ্রন্থ উদ্ধার ও মল্লরাজকে দীক্ষাদান ইত্যাদি নানা ঘটনামালায় অঙ্কিত তাঁর মহাজীবনের পৃষ্ঠাগুলি। ঘটনাগুলির ঐতিহাসিকতা নিয়ে কম-বেশি বিতর্ক থাকলেও বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এর গুরুত্ব অপরিসীম।[৭১]

বাংলার ইতিহাসে মল্লরাজবংশের উল্লেযোগ্য দুটি অবদানের একটি হল টেরকোটা মন্দিরস্থাপত্য আর দ্বিতীয়টি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা। দুটিই শ্রীনিবাস আচার্য-এর পরোক্ষ প্রভাব পুষ্ট। হাম্বির মহিষী সুলক্ষনার সঙ্গে যাজিগ্রাম এর এক ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। তিনি গুরুদেবের জলবিহারের জন্য খনন করেছিলেন এক সুবিশাল সরোবর। এর নাম ছিল রানীদিঘি। এই দিঘির পাড়েই ১৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মারাঠাবর্গি ও নবাব আলিবর্দির বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল।[৭২] এই যুদ্ধে মারাঠা নায়ক রঘুজি সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রানীর দিঘি সিপাইদিঘি নামে সুপরিচিত হয়ে ওঠে।

মহাপ্রভুর তিরোধানের পর অখন্ড বাংলায় বৈষ্ণবধর্মের নানা দল উপদলের সৃষ্টি হতে থাকে। উল্লেখযোগ্যগুলি হলো নিত্যানন্দগোষ্ঠী, অদ্বৈত গোষ্ঠী, শ্রীখণ্ডের নরহরি গোষ্ঠী ইত্যাদি। শুরু হয়েছিল মতবাদ জনিত চাপা অন্তর্কলহ। এছাড়া বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীদের অনেকে আলাদা মতামতও ব্যক্ত করছিলেন। এইসব দল উপদলগুলিকে সর্বপ্রথম একত্রিত করেছিলেন বৈষ্ণব সাধক শ্রীনিবাস আচার্য। বিশেষ করে কাটোয়ায় দাস গদাধরের ও শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকারের প্রয়াণ উৎসব উপলক্ষে তৎকালীন বিরুদ্ধ গোষ্ঠীগুলিকে একত্রিত করেছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। পরবর্তীকালে খেতুরি বৈষ্ণব ধর্ম সম্মেলনে সেই মহামিলনের ছবিটি সুস্পষ্ট হয়ে

ওঠে, অবশ্যই তাঁর সুযোগ্যে নেতৃত্বে।[৭৩]

মণিমঞ্জুষা নামের ১২১ খানি পুঁথি নিয়ে শ্রীনিবাস আচার্য মল্লভূমে হাজির হলে নতুন যুগের সূচনা হয়।[৭৪] তিনি রাজার হৃদয় জয় করেন শ্রীমদ ভাগবত, ভ্রমরগীতার মত গ্রন্থের পাঠ ও চৌষট্টি প্রকার ব্যাখ্যা শুনিয়ে। তাঁর পান্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে সভাপন্ডিত ব্যাস চক্রবর্তী সপরিবারে তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে হলেন ব্যাসাচার্য। একে একে দীক্ষা নিয়ে সুধী সমাজের বল্লভ ঠাকুর, বল্লভী কবিরাজ, করুণাকর দাস ও দুই পুত্র জানকীরাম-প্রসাদ রাম, শ্রীরাম মজুমদার, গোপাল মজুমদার প্রমুখ মল্লভূমে গড়ে তুললেন নতুন বৈষ্ণব সমাজ। এই ভাবে রাজপরিবার, রাজপুরুষ, সুধী সমাজ, সাধারণ প্রজাদের দীক্ষার মাধ্যমে ও বৈষ্ণব সঙ্গীত-সাহিত্যের সাধন-ভজন ও রচনার মাধ্যমে মল্লভূমে দ্রুত বৈষ্ণব ভাবধারার প্রসার ঘটতে থাকে। এর আগে বৈষ্ণব সাধক পরেমেশ্বর মল্লিক কাদাকুলি-চাকদহ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে ভক্তি রসে সিক্ত করেছিলেন মল্লভূমিকে। তাঁর পরবর্তী প্রজন্মও এই এলাকা থেকে বৈষ্ণব সাহিত্য সাধনায় রত থাকে।

শ্রীনিবাসের মল্লে আগমন ও অবস্থান রাজ্যের শিল্প ও ধর্ম মানচিত্রে মৌলিক ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। একের পর এক স্থাপিত হয় ভক্তিমন্দির। রচিত ও গীত হতে থাকে ভক্তি গান। মন্দির কেন্দ্রিক অর্থনীতির মোড়কে মন্দির, মন্দির নির্মাণ, পট নির্মাণ শিল্পে জোয়ার আসে। পূজার অনুষঙ্গে মালাকার,বাদক, শোলাকার, শাঁখারী, স্বর্ণকার, যন্ত্রক, পূজক, গায়ক, কর্মকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার, মিষ্টান্ত প্রস্তুতকারক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এদের আগমনে ও অবস্থানে রাজধানীর অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

শ্রীনিবাসকে ঘিরে যে সাহিত্য ও সঙ্গীতের মহল গড়ে ওঠে তার মধ্যমণি হয়ে ওঠেন রামচন্দ্র কবিরাজ।শ্রীনিবাস নিজে খুব একটা পদ রচনা না করলেও, পারিষদবর্গ উচ্চবর্গের বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের সৃষ্টি করে। রাজা হাম্বিরের অনুরোধে গুরু শ্রীনিবাস মল্লভূমে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন।এই গোপালপুরের রঘুনাথ চক্রবর্তীর কন্যা  পদ্মাবতী দীক্ষান্তর গৌরাঙ্গপ্রিয়া নাম নিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্য ও সঙ্গীতে মেতে ওঠেন। শিষ্য গুরুচরণ দাস তাঁর নির্দেশে রচনা করেন 'প্রেমামৃত' কাব্য। শ্রীনিবাস-পদ্মাবতী পুত্র গীতগোবিন্দ ও কন্যা হেমলতা ছিলেন যথার্থ অর্থে বৈষ্ণব সাধক ও সাধিকা। তাঁরা মল্লভূম কেন্দ্রিক বৈষ্ণব ধারাকে বহুভাবে পুষ্ট করেন। গীতগোবিন্দ রচিত 'বীররত্নাবলী' এক অনন্য বৈষ্ণব ভক্তিকাব্য। এই কাব্যে প্রথম বিষ্ণুপুরকে 'বন বিষ্ণুপুর' হিসাবে অভিহিত করা হয়। শ্রীনিবাসের ভক্তিরস ও

সঙ্গীতের ধারা প্রবাহিত হয়ে 'বিষ্ণুপুর' ঘরানার জন্ম হয়। বংশ পরম্পরাগত চর্চা ও অজস্র শিষ্যমন্ডলী তৈরির মাধ্যমে। এই উজ্জ্বল ধারাকে বাঁচিয়ে রাখেন গোস্বামী বংশের জগৎ গোস্বামী, কীর্তিচাঁদ গোস্বামী, রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের মত সঙ্গীত প্রবররা।

শ্রীনিবাসের আগমনে মল্লভূমে বৈষ্ণব ঘরানা গড়ে ওঠা নিয়ে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তার বৃহৎ বঙ্গ গ্রন্থে (২য় খণ্ড) লিখেছেন,

> "গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রধান কেন্দ্র সর্বপ্রথম ছিল নবদ্বীপ। চৈতন্যের সন্ন্যাসের পর নবদ্বীপের আলোক নিভিয়া যায়। চৈতন্যদেব অষ্টাদশ বৎসর পুরীতে ছিলেন। তাহার তিরোধান পর্যস্ত সেই আলোককেন্দ্র পুরীধামে প্রবর্তিত হয়। তারপর কয়েক বছর ১৫৩৩ হইতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্ধ শতাব্দীর কিছু অধিককাল সেই আলোক বৃন্দাবনে জ্বলিতে থাকে। ষড় গোস্বামীরা এই আলোক জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাদের স্বর্গারোহণে বিশেষতঃ জীব গোস্বামীর তিরোধানের সহিত সেই আলোক বৃন্দাবনে নিষ্প্রভ হইলে শ্রীনিবাস আচার্য সেই আলোক বিষ্ণুপুরে প্রজ্জ্বলিত করেন। সেই থেকে পূর্ণ দুই শতাব্দীকাল বিষ্ণুর রাজসভাই বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও বৈষ্ণব শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র স্বরূপ ছিল।---বন বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে দুই শতাব্দীকাল বাংলার শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ নূতনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং এদেশের শিক্ষা দীক্ষার যে ঘৃতের প্রদীপটি নিভু নিভু হইয়া জ্বলিতেছিল, বিষ্ণুপুরের রাজবংশ তাহা প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন।'

এনিয়ে মল্লভূমের গবেষক চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয়ের লিখেছেন, "বিষ্ণুপুরে জ্ঞানচর্চার যে কি বিপুল আয়োজন সে যুগে হয়েছিল তা এখনও অনুমান করা যায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' বিষ্ণুপুর শাখায় সংরক্ষিত সাত হাজারেরও বেশি পুঁথির সংগ্রহ দেখে। একথা সহজেই বলা যায় ৩/৪শ বছর পরের এই সংগ্রহ মোট পুঁথির সামান্যতম ভগ্নাংশ মাত্র। এই সংগ্রহে শুধু বাংলা বৈষ্ণব পুঁথিই নেই ; প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য, দর্শন, অলঙ্কার আর রসশাস্ত্রের প্রচুর পুথি রয়েছে। বৈষ্ণব ধর্মকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে সংস্কৃত কাব্য, দর্শন, পুরাণ, অলঙ্কারশাস্ত্রের যে বিপুল চর্চা হয়েছিল তা সহজেই বুঝা যায়।"[৭৫]

## মল্ল রাজবংশের পতনোত্তর কুচিয়াকোল, জামকুড়ি ও ইন্দাস মল্লশাখা বংশের উদ্ভব

১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে মল্ল রাজ বংশের মূল শাখাটির বিনাশ ঘটলে মল্লবংশের শাখা বংশগুলি মল্লভূমির অন্তর্গত বিভিন্ন জমিদারিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, মূলত নিলাম প্রক্রিয়ার অংশ নিয়ে বা ব্রিটিশ শাসকদের সাথে নির্দিষ্ট রাজস্বে চুক্তিবদ্ধ হয়ে। রাজা চৈতন্য সিংহের প্রথম পুত্র মদনগোপালের অকাল মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় পুত্র নিমাই সিংহ নেন কুচিয়াকোলের জমিদারি। তৃতীয় পুত্র ক্ষেত্রমোহন নাটকাঞ্চনপুর পরগণা, চতুর্থ পুত্র গৌরমোহন ইন্দাস, বিষ্ণুপুরের অবশিষ্ট জমিদারি পঞ্চমপুত্র লালক্ষেত্রমোহন দখলে রাখেন। চৈতন্য ভ্রাতা গোবিন্দ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র দামোদর সিংহ লাভ করেন জামকুড়ির জমিদারি। নিম্নে এই সব জমিদারির ইতিহাস আলোচিত হল। চৈতন্য সিংহের অন্য এক পুত্র ফতেবাহাদুর ইন্দাসেই অবস্থান করতেন। ক্ষেত্রমোহন কিছুকাল পরে বিষ্ণুপুরে ফিরে আসেন।

## কুচিয়াকোল পরিবার

তরুণ দেব ভট্টাচার্য তাঁর 'বাঁকুড়া' গ্রন্থে জানিয়েছেন, মল্ল রাজত্বের শেষের দিকে চৈতন্য সিংহের আমলে (১৭৯৮) যখন টুকরো টুকরো হয়ে নিলাম হয়ে যাচ্ছিল মল্ল রাজ্য, তখন চৈতন্য সিংহের দ্বিতীয় পুত্র নিমাই সিংহদেব জয়পুরের কুচিয়াকোলের ৮৫৪২.৫ একরের ২২ টি মৌজার জমিদারি কিনেছিলেন ৮২৩৭ টাঃ ১০ আনা ভূমি রাজস্বের বিনিময়ে। পরে তিনি পাঁচাল পরগণারও অধিকারী হন। নিলামে অংশ নিয়ে ৪০৮ টা ৯ আনা ৯ গন্ডা বার্ষিক রাজস্বে ৮৯৩ একরের পাঁচাল জমিদারির স্বত্ব কিনে নেন। ৯৫৭৫.৫ একরের জামতাড়া দখল পান হরিহর প্রসাদ পাঠক ৩৬১০টাঃ ৯ আঃ ৯ গন্ডা মূল্যে। কুচিয়াকোল এলাকার শিক্ষা-সংস্কৃতিতে সেই থেকে নিমাই সিংহের পরিবারের অবদান অসীম। ১৮৬১ সালে এলাকার ইংরেজি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাধাবল্লভসিংহ দেব। যার শিলান্যাস করেছিলেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ষোড়শ-সপ্তদশ শতক থেকে শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষ্ণুপুর রাজবাড়ির যে আনুকুল্য পেয়েছিল জয়পুর, মল্লরাজত্বের শেষ লগ্নেও তার অভাব ঘটেনি।

রাজা নিমাই সিংহ (১৮০৬-১৮৩২) ১৭৯০ সাল থেকেই কুচিয়াকোলে থাকতে

শুরু করেন ও স্থানীয় সামাজিক কর্মকান্ডে অংশ নিতে শুরু করেন। তিনি 'রাগমালা' নামে একটি সংস্কৃত পুঁথি রচনা করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় রাগ সঙ্গীতে সুপন্ডিত ছিলেন।

নিমাইয়ের মৃত্যুর পর পুত্র বীরসিংহ (১৮৩২-১৮৪১) জমিদারি পেলেও তিনি ধর্ম-কর্ম নিয়েই সারাদিন ব্যাপ্ত থাকতেন। সারাদিনই প্রায় বীরসিংহ মৌজার বৃন্দাবন জীউয়ের মন্দিরে ধ্যানস্থ থাকতেন। রাজার আদেশে এস্টেটের গোমস্তা মন্দির সংলগ্ন ভগ্ন কাছারি বাড়ি সংস্কার করেন। প্রথমাবস্থায় মল্ল রাজারা সরাসরি এটির ব্যয় নির্বাহ করতেন ও পরবর্তী কালে কুচিয়াকোল এস্টেটের মধ্যে এটি কুচিয়াকোল জমিদারের অধীনে এলে তার ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব মল্ল শাখার এই জমিদারদের হাতে ন্যস্ত হয়। মল্লরাজ গোপাল সিংহ (১৭১২-১৭৪৮) ও চৈতন্য সিংহের (১৭৪৮-১৮০৫) সময়কালে সেবাইতদের ভূমি দানের ইঙ্গিত মেলে। ১৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মাঘ ও ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ বৈশাখের এমন দুটি দলিল পাওয়া গেছে। দলিল দুটিতে গোপাল সিংহের সিল ব্যবহার করে চৈতন্য সিংহ দ্বারা সম্পাদিত হয়। জমিদারি অধিগ্রহণের পর কুচিয়াকোল এস্টেটের একটি দেবার্পণনামা (এস্টেটের পক্ষে শান্তিপ্রসাদ ও ভুবনেশ্বর প্রসাদ স্বাক্ষরিত ২৩/০৫/৬৯ সালের ৩২৩৭ নং দলিল) থেকে জানা যায়, "উক্ত সেবাকার্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য আমাদের বীরসিংহ মৌজায় ৬১৪ নং খতিয়ান ভূক্ত ও কাকটীয়া মৌজায় ৭৬৭ নং খতিয়ান ভূক্ত দখলী প্রজাবিলি সম্পত্তির আয় বরাদ্দ ছিল, কিন্তু বর্তমান সরকারের জমিদারী গ্রহণ আইনে সমস্ত প্রজাবিলি সম্পত্তি সরকারের গত হওয়ার জন্য এবং পূর্বোক্ত রেকর্ড দেবোত্তর বলিয়া পরিমাপিত না হইলেও ইহার আয় দেবসেবাতেই ব্যয়িত হইত।"

১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে (৩রা মাঘ) বীরসিংহ গ্রামে নিমাই সিংহ একটি লাখেরাজি বন্দোবস্ত করতে গিয়ে প্রথাগত মল্লাব্দের পরিবর্তে বাঙ্গাব্দ লিখছেন ও 'রাজন' এর পরিবর্তে 'বাবু' শব্দটি ব্যবহার করছেন। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় রাজার তকমা ছেড়ে সাধারণ আদব কায়দায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছিলেন। দলিলে স্বাক্ষর করছিলেন সংস্কৃতে। এই সময় বীরসিংহ গ্রামের তন্তুবায় পাল বংশীয়রা প্রভুত ধন সম্পত্তির অধিকারী হয়। গ্রামে এই বংশের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল শালগ্রাম শিলার তিনটি বিষ্ণু মন্দির। প্রথমটি অষ্টাদশ শতকে শচীদুলাল পালের তৈরি (অধুনা বিলুপ্ত)। দ্বিতীয়টি শচীদুলাল পালের তিন পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র, গুরুচরণ, রামহরি দ্বারা যৌথ ভাবে ১৮৫৫ সালে। তৃতীয়টি সম্ভবত পাল বংশীয় সেবারাম পালের দ্বারা ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে। কৃষ্ণচন্দ্র

আর একটি মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু করলে বীরসিংহের কাছারির লোকজন সন্নিহিত জঙ্গল থেকে ল্যাটেরাইট তুলতে বাধা দেয়। ধার্মিক রাজা একথা জানতে পেরে পালদের মাকড়া পাথর তোলার অনুমতি দেন এবং দেব কাজে বাধা দেওয়ার জন্য রাজকর্মচারীদের ৭দিনের বাধার জন্য ৭ টাকা জরিমানা করেন। এই বদান্যতায় আপ্লুত পালেরা মন্দির তৈরির কাজ মূলত রাজার আশীর্বাদধন্য মনে করতে থাকেন। রাজাও গ্রামের মূল দেবতা বৃন্দাবনচন্দ্র রথযাত্রায় মাসি বাড়ি হিসাবে পালেদের নির্মিত মন্দিরে যাবে বলে ঘোষণা করেন। ১৮৫৫ সালে এই নবরত্ন মন্দিরটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। জমিদারি নথিতে দেখা যায় বৃন্দাবন জীউয়ের দৈনিক নিত্যসেবায় ভোগ তালিকা হল প্রাতে বাল্যভোগ, চিড়াগুড় ও শালগ্রামের আমান্ন চাউল, মধ্যাহ্নে বীরসিংহ গ্রামের প্রচলিত বাঁকড়ী পাই এর এক সের চাউলের অন্ন ও তার উপযোগী ডালাদি, সন্ধ্যায় মিষ্টি ভোগ ও রাত্রে ওই মাপের আধসের চাউলের অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোগ। এছাড়া ছিল বৈশাখ মাসে বৈকালিক ছানাগুড়, বুট ফলাদি, শ্রাবণ মাসে ঝুলন যাত্রা ভোগাদি, ভদ্রের জন্মাষ্টমীর মিষ্টি, লুচি, নৈবেদ্য, ভাদ্র মাসে কৃষ্ণা চতুর্দশীতে কালীয়দমন কীর্তন ও ভোগ, কার্তিক মাসে দীপাবলি ভোগ, অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে ছাতু ভোগ।

নিমাই সিংহের পৌত্র রাধাবল্লভ সিংহ ও প্রপৌত্র যোগেন্দ্রনাথ সিংহ কুচিয়াকোল ও বাঁকুড়া জেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। আধুনিক ও ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে জমিদার রাধাবল্লভ সিংহ কুচিয়াকোলে ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে ময়নাপুরের পরমানন্দ মুখোপাধ্যায়ের (তখন বাঁকুড়া জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক) সাহায্যে একটি উচ্চ (মধ্য) বিদ্যালয় স্থাপন করেন। আর তাঁর পাশে দঁড়ান বর্ধমান বিভাগীয় কমিশনার হ্যারিসন সাহেব। বিদ্যালয়ের অংশ ছিল একটি বালিকা বিদ্যালয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এটিকে বর্ধমান বিভাগের মধ্যে সেরা বিদ্যালয় হিসাবে অভিহিত করে। ১৮৭৬ সালে রাজা কাজের স্বীকৃতিতে 'রায় বাহাদুর' উপাধি পান (০১-০১-৭৭)। সঙ্গীতানুরাগী রাজার দরবার আলো করে থাকতেন যদু ভট্টের মতো সঙ্গীতজ্ঞ। ১৮৯০ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অবদানের স্বীকৃতিতে বিদ্যালয়টির নাম রাখা হয় 'কুচিয়াকোল রাধাবল্লভ ইনস্টিটিউশন'। এই সব বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে সঙ্গীতাচার্য রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'মৃদঙ্গ দর্পণ' গ্রন্থে। বইটি কুমার যোগেন্দ্রর নামে উৎসর্গীকৃত। রামপ্রসন্ন বসন্ত পরবর্তী জমিদার যোগেন্দ্রর সভাগায়কও ছিলেন। যোগেন্দ্র এই মহাগায়ককে 'সঙ্গীত নায়ক' অভিধায় ভূষিত

করেন। দান করেন বনগেলিয়া নামের জঙ্গলমহল। বরোদার রাজার আহ্বান ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর সঙ্গীতাচার্য হওয়ার ডাক উপেক্ষা করে তিনি কুচিয়াকোলে আসেন। রাজকুমার বসন্তকে সুগায়কে পরিণত করেন। বসন্তের মৃত্যুতে শোকাহত গুরু রামপ্রসন্ন এর পর কুচিয়াকোল ত্যাগ করে নারাজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খানের কাছে আশ্রয় নেন। উল্লেখ্য বসন্তের দৌহিত্র বংশীয় পৌত্র দেবব্রত সিংহ ঠাকুর ছিলেন একজন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী। সঙ্গীত রসিক রাজা যোগেন্দ্র বিষ্ণুপুর ঘরানার পন্ডিত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'সুররাজ' অভিধায় ভূষিত করেন।

কুচিয়াকোলের রাজারা গুণীজন ছাড়াও সাধারণ শিল্পী ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতাও করেছেন। ডুমনীগড়ের ধানসিমলা গ্রামে এক সময় ঢোকরা কর্মকারদের বাস ছিল। গ্রামে প্রতিষ্ঠিত লোকদেবতা ভৈরবের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে এদের মুখ্য ভূমিকায় দেখা যায়। গ্রামে ঘুরে লৌহদ্রব্য নির্মাণ ও সংস্কারই ছিল এদের পেশা। এদের কাছে থাকত শোলার কাঠি ও রূপার মল। ১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে ভূমি নথিতে এই বসতির প্রমাণ আছে। সম্ভবত এই সময়েই শুশুনিয়ার ডেকো পাবড়া থেকে গোরাচাঁদ কর্মকার ও তার ভাই এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। ১৯১৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর যোগেন্দ্রনাথ দ্বারা রামনাথ কর্মকারকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার মধ্য দিয়ে এই শিল্পী শ্রেণীর রাজপৃষ্ঠপোষকতার প্রমাণ মেলে।

রাধাবল্লভ-পরবর্তী সময়ে কুচিয়াকোল একই ভাবে এলাকার উন্নয়নে রাজবাড়ীর সাহায্য পেতে থাকে। নতুন রাজা যোগেন্দ্রনাথ সিংহ এলাকার উন্নত চিকিৎসার প্রসারে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অকালমৃত রাজকুমার বসন্তকুমারের স্মৃতিতে গড়ে তোলেন 'বসন্ত কুমার পাঠাগার'। সংস্কৃত ভাষার প্রসারে ১৯২০ সালে গড়ে তোলেন একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী। প্রথমে কুচিয়াকোলের, পরে নাড়াজোলের রাজদরবারের সভাগায়ক রামপ্রসন্ন বাবু 'সঙ্গীত মঞ্জরী' লিখে বিখ্যাত হন। এই পুস্তক প্রকাশের ব্যয়ভার ছিল কুচিয়াকোলের রাজার। তিনি বিষ্ণুপুরে অবস্থান করে সঙ্গীতের প্রয়োজনে যেমন বাংলায় পাঠ নেন, কুচিয়াকোল রাজবাড়ীতে অবস্থান করে রাজপন্ডিত বরদানাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা নেন। এই ঘটনা ঘটেছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। অর্থাৎ কুচিয়াকোল যোগেন্দ্রনাথের সময়ে সংস্কৃত শিক্ষার একটি উৎকর্ষ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তাঁর জনদরদী ভাবনা ও কাজের প্রমাণ তাঁর উইল। এই উইল-এ (১) কৃষিতে আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার ও পরামর্শ দানের জন্য 'কৃষি শিল্প বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা (২) বসন্তকুমার পাঠাগারের জন্য

এক বিঘা নিষ্কর জমি দান ও বার্ষিক ব্যায় নির্বাহ বই-সংবাদপত্র ক্রয়ের জন্যে ২০০ টাকা করে বরাদ্দ আর ভবন নির্মাণের জন্য ১২০০-৩০০০ টাকার সংস্থান (৩) দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য জেলা বোর্ডের বার্ষিক ১৫০ টাকা বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যায় নির্বাহের জন্য ৪৮০ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি দান (৪) বিদ্যালয়ের জন্য জেলা বোর্ডের ১৫০ টাকা বার্ষিক বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যায় নির্বাহের অঙ্গীকার ও সংস্কৃত ভাষার প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করার কথা লেখা ছিল। সোনামুখীর ধুঁকতে থাকা বস্ত্রবয়ন শিল্পকে চাঙ্গা করার জন্য ১৯১০ সালে বিষ্ণুপুরে যে 'বয়নশিল্প শিক্ষণ বিদ্যালয়' স্থাপিত হয় তাতে যোগেন্দ্রনারায়ণের আর্থিক সহায়তা ছিল। তাঁর এই জনহিতকর কাজের জন্য ভারত সরকার তাঁকে বিভিন্ন শংসাপত্র ও অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মান দেয়। এছাড়া তাঁকে বিষ্ণুপুর লোকাল বোর্ডের সদস্য মনোনীত করে। কুচিয়াকোল রাজবাড়ী প্রতিষ্ঠিত উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন প্রখ্যাত প্রশাসক সূর্যকুমার অগস্তি (১৮৭৩), কৃতি কন্দর্পমোহন রায় (১৯১৮), স্বাধীনতা সংগ্রামী ভবতারণ চক্রবর্তী (১৯২৩), সাধক হরনাথ (১৮৮৫) সহ বহু বিখ্যাত ব্যক্তি। যোগেন্দ্র সিংহদেবের আমলেও বীরসিংহগ্রামের দেবসেবাতে রাজাদের দান ও অবদান অব্যাহত ছিল। তিনি এখানে একটি নিমগাছের তলে মহাপ্রভুকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যোগেন্দ্র সিংহদেব নয়টি ভূম রাজ্যের মধ্যে (মল্লভূম, সুপুর, শ্যামসুন্দরপুর, অম্বিকানগর, গড়রাইপুর, ঝাড়গ্রাম, জামবনী, ধলভূম, বরাহভূম, মানভূম) বৈবাহিক সম্পর্কের রীতি অনুসারে পুত্র বসন্তের বিবাহ দিয়েছিলেন জামবনীর রাজকন্যা শশীকুমারীর সাথে। বসন্ত কুমারের মধ্যম কন্যা ব্রজঙ্গনার সাথে বিবাহ হয়েছিল মেওয়ার থেকে আগত সিসোদিয়া রাজপুত বংশের পুরাকুন্ডার জমিদার ক্ষেত্রমোহন সিংহ ঠাকুরের। বসন্ত কুমার অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে কুচিয়াকোলের এস্টেটের দায়িত্ব পান এই ক্ষেত্রমোহন।

রাজা যোগেন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রীতির পরিচয় মেলে সঙ্গীতাচার্য রামপ্রসন্ন ব্যানার্জীর 'মৃদঙ্গ দর্পণ' ও অভয়পদ মল্লিকের 'History of Bishnupurraj' পুস্তক দুটির প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে।

যোগেন্দ্রনাথের মৃত্যর পর এই জমিদারির ভার পান মৃত পুত্র বসন্তের তিন কন্যা বীরাঙ্গনা, ব্রজঙ্গনা, দেবাঙ্গনার মধ্যে ব্রজঙ্গনার স্বামী ক্ষেত্রমোহন সিংহ ঠাকুর। ১৯৩০ সালে। জমিদারির তদারকিতে থাকা ক্ষেত্রমোহন বরাবর ব্রিটিশ সরকারের অর্থগৃধ্নু ভূমিকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ভূমিকা নিয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন শিল্প

দরদী মানুষ। জমিদার বাড়িতে রক্ষিত বহু অমূল্য চিত্র শিল্প তিনি দেশের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় দান করার ফলে আজও মল্লভূমির চিত্রকলা সংরক্ষিত হচ্ছে ও গবেষণার কাজে লাগছে। এই এস্টেটের ব্যবস্থাপনা দেখতেন (পরিচালক) যোগেন্দ্র নারায়ণ নিযুক্ত ভাগ্নে শান্তিপ্রসাদ (১৯৭৩ রাজবাড়ীর একাংশে তৈরি হয় কুচিয়াকোল শান্তিপ্রসাদ সিংহ উচ্চবিদ্যালয়)ও জ্যেষ্ঠ নাতনীর স্বামী ভুবনেশ্বর নারায়ণ সিংহ। কিন্তু তাঁরা এস্টেটের পতনের সাক্ষী হিসাবেই থেকে যান। স্বাধীনতোত্তর ভূমি সংস্কার কালে রাজদিঘির দখল নিয়ে বীরসিংহ ইউনিয়ন বোর্ডের সাথে বিরোধ মামলায় পেরে না উঠে এঁরা অসম্মান জনক আপোষে বাধ্য হন। এমনকি রাজ মন্দিরের পুরোহিত অনিলকৃষ্ণ ও সেবাইত গোপেশ্বর জমিদারদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন। অনিয়মিত আদায়, অনিয়ন্ত্রিত খরচ, দুর্নীতি, মামলা-মোকদ্দমা রাজবংশটিকে পতনের কিনারায় নিয়ে যায়। অবশেষে জমিদারি অধিগ্রহণ আইনে রাজবাটী-মন্দির অংশ (৬.৮৩ ও ১.৮৩ একর) রাজার নামে বর্তালেও শেষ দুই পরিচালক স্থানীয় পাঁচজন মন্দির পরিচলকের নামে তা হস্তান্তর করেন ১৯৬৯ সালের ২৩ শে মে। শেষ গোমস্তা মোতিলাল বিশ্বাস সবার অজ্ঞাতে বহু স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি জমিদারি অধিগ্রহণের আগেই বিক্রি ও আত্মসাৎ করে বলে অভিযোগ। এইভাবে কুচিয়াকোল জমিদারির শেষ চিহ্নও অপসৃত হয়। বিষ্ণুপুরের ফৌজদারদের আঁকা মৃন্ময়ীর পটচিত্রে আজও পূজা হয় দেবীর। দশমীর দিন তিলিবাঁধে পুজোর ঘট ও পট বিসর্জিত হয় রাজপরিবারের সদস্যদের দ্বারা। সাথে থাকে তরবারি ও ছত্রধারী রক্ষী। তোপধ্বনি শুনে মন্দিরে সবাই ফিরে আসে।

## ইন্দাস মল্ল রাজবংশ

মল্লরাজ চৈতন্য সিংহের চতুর্থ পুত্র গৌরমোহন সিংহ ইন্দাসে বসতি পত্তন করেন। ভাগ্য বিড়ম্বিত মল্লরাজ মাঝে মাঝেই ইংরেজের রোষানলে পড়ে ইন্দাসে আশ্রয় নিতেন। বর্ধমান রাজার ক্রমবর্ধমান প্রভাব আটকাতে প্রজা অসন্তোষ ধূমায়িত করাতে গৌরমোহনের ভূমিকা ছিল বলে অনেকে মনে করেন। তাঁর বংশধর বলীন্দ্র সিংহদেব ছিলেন 'বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সঙ্গীতজ্ঞ ও ইংরেজি ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি অর্জনকারী'। ১৮৯০ সালে ইন্দাস উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনে তিনি বিশেষ ভূমিকা নেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিশিষ্ট মানুষদের জীবনী ও গীতসংগ্রহের একটি বড় কাজ হাতে নেন। এই কাজের শরিক ছিলেন বলীন্দ্র সিংহদেব। তিনি ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সংগীত

প্রকাশিকা' পত্রিকার মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় বিষ্ণুপুর ঘরানার দুই প্রখ্যাত সঙ্গীতাচার্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য ও অনন্তলাল বন্দোপাধ্যায়ের জীবনী রচনা করেন। এই পরিবারের রণধীর সিংহদেব ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি।

১৮৯০ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে চার লক্ষ টাকা খাজনার বিনিময়ে চৈতন্য সিংহ ইন্দাস সহ মল্লভূমের জমিদারি বন্দোবস্ত নেন। তার পর বাকি জীবন এখানেই বেশি অতিবাহিত করেন মল্লরাজা। ইন্দাসের নন্দীপাড়া ও হরিপুরের মাঝে তাঁর সমাধি মন্দির রয়েছে। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণে রক্ষিত একটি ইন্দাস মল্লরাজ শাখা বংশের তালিকায় বিভিন্ন প্রজন্মের সদস্যরা হলেন নিম্নরূপ—

গৌরমোহন সিংহদেব—উদয়—গোপাল/কৃষ্ণ—শ্যামচাঁদ(সাবরেজিস্ট্রার)—নীলমণি/বলীন্দ্র/গোকুল—রণধীর/সুধর—প্রবোধ/গুরুচরণ/অজয়/ওঙ্কারনাথ/সত্যরঞ্জন/বিজয়/রবীন্দ্রনাথ/শঙ্কর/উমা/দয়াময়ী। বলীন্দ্র ইন্দাস উচ্চ বিদ্যালয় ও রণধীর রোল উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

## কাঞ্চনপুর মল্লরাজ বংশ

চৈতন্য সিংহের পুত্রদের মধ্যে গোরমোহন ইন্দাস জমিদারি, নিমাই সিংহ কুচিয়াকোল জমিদারি, পৌত্র মাধব ও পুত্র লালক্ষেত্রমোহন বিষ্ণপুরের জমিদারি লাভ করলে অখণ্ড মল্লভূম স্থানিক ক্ষমতাবৃত্তে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ইন্দাস ও কুচিয়াকোলের এই জমিদারিগুলির সংবাদ পাওয়া গেলেও লাটকাঞ্চনপুর বা কাঞ্চনপুর জমিদারি নিয়ে কোনো তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা দেখা যায় না।

বাঁকুড়া-২ ব্লকের কাঞ্চনপুরের সিংহদেব পদবীর ছয়-সাতটি পরিবার এখনও থাকেন ও তাঁরা নিজেদের মল্লশাখা বংশ বলে দাবি করেন। এদের আট পুরুষের বংশতালিকা পাওয়া গেছে বর্তমান প্রজন্মের বসন্ত সিংহদেবের কাছে। চৈতন্য সিংহ পরবর্তী এক-দুই পুরুষ পর থেকেই। অবশ্য এই কাঞ্চনপুর লটের দায়িত্বে ছিলেন চৈতন্যপুত্র ক্ষেত্রমোহন। ক্ষেত্রমোহন সিংহের বংশধর পার্থসারথী সিংহদেবের দেওয়া বংশতালিকা থেকে অবশ্য এটি আলাদা। মনে হয় ক্ষেত্রমোহন একটি পর্যায়ে বিষ্ণুপুরে ফিরে গিয়েছিলেন। রয়ে গিয়েছিলেন নিকটাত্মীয়রা। এদের কুলদেবতা কেশবমোহনের মন্দির নির্মাণ হয়েছিল এই জমিদারির আমলে। অন্যান্য মল্লশাখাবংশের মতো এখানে দুর্গাপূজা হত কিনা সে তথ্য এখন মেনে না। অবশ্য বর্তমান পূজারী মদন বন্দোপাধ্যায়ের (৮০) দাদু বনমালী বাবু কেশবমোহনের

নিত্যপূজা ও দুর্গাপূজার কথা বলতেন। মনে হয় দারিদ্রের কারণে ক্ষেত্রমোহন প্রতিষ্ঠিত দুর্গাপূজার অবসান ঘটে। কেশবমোহনের সেবাকাজ এখনও করে খেড়াশোল গ্রামের গ্রামের ব্রাহ্মণবংশ। প্রাচীন মল্লবংশের বর্তমান বসতির কাছে অবস্থিত তিন খিলানের দালান রীতির প্রাচীন মন্দিরটি ভগ্ন ও পরিত্যক্ত হওয়ায় বর্তমানে কেশবমোহন বিগ্রহ কাঞ্চনপুর বিদ্যালয় সন্নিহিত নবনির্মিত দালান মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়েছে। নতুন দালান মন্দিরটি অনেকটাই পরিত্যক্ত দালান-মন্দিরের অনুকরণে তৈরি। এক সময় দেবোত্তর সম্পত্তি থাকলেও এখন তার সন্ধান মেলে না। পার্থসারথী সিংহদেবের দেওয়া এই বংশের জ্যেষ্ঠের বংশ তালিকা হল ক্ষেত্রমোহন-হরি সিংহ-দামোদর সিংহ-রাজবল্লভ সিংহ-বীরেন্দ্র সিংহ-পার্থসারথি-নন্দিনী। বসন্ত সিংহদেবের দেওয়া বংশতালিকা (জ্যেষ্ঠপুত্রদের) হল রঞ্জিত-নন্দলাল-যোগেন্দ্র-কালীপদ দামোদর-উত্তম। এছাড়া এখনও কোনো বিশেষ তথ্য উদ্ধার হয়নি।

## জামকুড়ির ইতিহাস ও দামোদর সিংহ

চৈতন্য ভ্রাতা ও গোপাল ভ্রাতা গোবিন্দ সিংহের পুত্র দামোদর সিংহের বিষ্ণুপুর রাজসিংহাসনের উপর দাবী পুরোপুরি নাকচ হলে তিনি স্থায়ী ভাবে জামকুড়ি চলে গিয়ে সেখানে রাজ্যপাট গড়ে তোলেন। তিনি জামকুড়িকে অনেকটা বনবিষ্ণুপুরের আদলে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। মৃন্ময়ী দেবীর আদলে প্রতিষ্ঠিত রাজরাজেশ্বরী সেবা করেন নিষ্ঠাভরে। আজও পূজিত হয় জমিদার বাড়ির ঠাকুরদালান মন্দিরে রাজরাজেশ্বরী। বিষ্ণুপুরের ফৌজদার পরিবারের মত উৎসাহিত করেন অধীনস্থ বীরসিংহ গ্রামের কর্মকার পরিবারের ঠাকুরানি পট তৈরিকে। এই কর্মকার পরিবারকে শিল্পকর্মে উৎসাহিত করার অন্যতম প্রমাণ দামোদর সিংহ প্রদত্ত ভূমিদান সংক্রান্ত দলিল। বীরসিংহ গ্রামের বাৎসরিক মহোৎসব ও বৈষ্ণবীয় ফরমান এই পরিমন্ডলে বৈষ্ণব ভাবধারার সফল অবস্থানের প্রমাণ দেয়। রাজা গোপাল সিংহ জীবিত থাকতেই এই এস্টেটের দেখাশোনা করতেন দামোদরের পিতা গোপাল পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা) গোবিন্দ সিংহ। জামকুড়ির রাজরাজেশ্বরী বড়মা, নারিচার সর্বমঙ্গলা মেজমা, বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী ছোটমা হিসাবে পরিচিত। অর্থাৎ এরা তিন বোন হিসাবে সমাদৃত। অনেক আগে জামকুড়ির তোপধ্বনি শুনে মৃন্ময়ীর অষ্টমীর পূজা শুরু হত।[৭৫ক] খচ্চরবাহিনী মহামারীর অনুরূপ পূজা জামকুড়িতেও প্রচলিত আছে। বীরসিংহের

ঠাকুরানীপাটের দূর্গা ছবির পাশে জয়া-বিজয়া যুক্ত ছিল। এখানে মৃন্ময়ী মূর্তির সাথে পটের পূজাও হয়। দামোদর সিংহ বীরসিংহপুরের পটুয়া গুণ কর্মকারকে "কারিকর" ও গুণ 'সমুদ্র' কর্মকার নামে ভূষিত করেন। ১৭৬৩ সালে রাজা তাঁকে পট নির্মাণের জন্য দেবোত্তর সিংহাজারী তরফে বীরসিংহ মৌজায় মহেশপুর মোকামে ২১ বিঘা নিষ্কর জমি বংশপরম্পরাগত ভোগদখল স্বত্বে দান করেন। এটি 'পাড়ের কোন্দা'র কাছে 'কামার কোন্দা নামে পরিচিত। গুণ সমুদ্রের চতুর্থ অধস্তন পুরুষ মধুসূদনকে দামোদরের উত্তরপুরুষ রাম সিংহ, ১৮৪৪ সালে ১৪ বিঘা অতিরিক্ত জমি ও দুই বিঘা বাস্তু জমি দান করেন। এই পরিবার এমন মোট ৩৭ বিঘা দেবোত্তর জমি ভোগ করতেন। মধুসূদনের উত্তরপুরুষরা হলেন রামদয়াল, কিরীটি, নিতাই, গোপাল, অরূপ। গোপালের স্ত্রী কৃপাময়ী প্রথম মহিলা পটুয়া বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। দামোদরের পর জমিদার হন চেতা সিং ও তারপর পৌত্র নরসিংহ।[৭৬]

দামোদরের উত্তরপুরুষ জামকুড়ির রাজা নরসিংহ সিংহদেবের সন্তানহীন অবস্থায় মৃত্যু হলে বিধবা রানি কুচিয়াকোলের রাজা রাধাবল্লভের তৃতীয় পুত্র সুরেন্দ্রনাথ সিংহদেবকে দত্তক নেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের ১৮৮৮ সালে সাবালক প্রাপ্তির আগেই অকালমৃত্যু ঘটে। রানীকেই রাজ্যপাট সামলাতে হয়।

মল্লভূমে শ্রীনিবাস প্রবর্তিত ও খড়দহের নিত্যানন্দ অনুসারী এই দুই ধারায় বৈষ্ণব ভাবনা প্রচারিত হতে থাকে। দামোদর সিংহের জামকুড়ির পরিবার নিত্যানন্দ ভাবনাকে আনুকূল্য দিয়েছেন অনেক স্থানে। কেশিয়াকোলের ক্ষত্রিয় খাওয়াস গোষ্ঠীর পরিচালিত মহাপ্রভুর থানে বাৎসরিক মহোৎসবে এই রাজ বংশের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। অনুষ্ঠান শেষে প্রথম মান্যতা পেতেন জামকুড়ির পাটরানি। দামোদরের পৌত্র রাজা নরসিংহের পাটরানি শিরোমণির এমন সম্মান পাওয়ার বিবরণ আছে। বৈষ্ণবীয় ফরমানে খড়দহ গোস্বামী প্রভাবিত এই উৎসবের উল্লেখ আছে। বীরসিংহের ফৌজদারদের আঁকা পটে রাজরাজেশ্বরী দুর্গোৎসবের দশমীর দিন বড় করে রাজকীয় শিকার উৎসব আয়োজিত হয়। এখনও রাজপরিবারের সদস্য রাজবেশে রথের মতো গাড়িতে তীর-ধনুক নিয়ে তরবারি হাতে রক্ষী ও টাঙ্গী-বল্লম-লাঠি হাতে বাগদী সেনাদের সাথে মন্দির থেকে মাঠে গিয়ে তীর দিয়ে খড়ের ঘর আঘাত করলে, বাকিরা তা আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। তারপর সবাই মণ্ডপে ফিরে আসে।

বীরসিংহ গ্রাম কুচিয়াকোল রাজপরিবার নিয়ন্ত্রিত হলেও এখানে জামকুড়ির জমিদারদের দান ও অংশগ্রহণের কোন খামতি ছিল না। বীরসিংহ গ্রামের পটুয়া

গুণসমুদ্র কারিগর তাঁদের দেবী পূজার পট আঁকতেন। এজন্য মহেশপুর মৌজায় ২১ বিঘা নিষ্কর জমি দিয়েছিলেন পটুয়া কাজের জন্য। রাজবাড়িতে রক্ষিত রাজা দামোদরের প্রতিকৃতি ও বাঈজীর চিত্র এই পটুয়া পরিবারের সৃষ্টি। রাজা দামোদর সিংহ ১৮৭২ সালে বাঁকুড়া পৌরসভার দাতব্য চিকিৎসালয়ের ছাদ সংস্কারে ও ১৮৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ ত্রাণে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। নবাব ও ইংরেজদের সাথে চক্রান্ত করে মল্লরাজ চৈতন্য সিংহকে পদচ্যুত করার চক্রান্তে লিপ্ত থাকার জন্য দামোদর সিংহকে ভিলেনের চোখে দেখা হয়। কথিত আছে বালসীর চৌধুরীদের জমিতে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংস্কার করেছিলেন জামকুড়ির রাজা।[৭৬ক]

দামোদর সিংহ প্রতিষ্ঠিত জামকুড়ি জমিদারির অস্তিত্ব ছিল স্বাধীনোত্তর কালসীমার পরিসরেরও। দামোদরের পর জমিদার হন চেতা সিংহ ও তারপর নরসিংহ (সূত্রঃ অভয়পদ মল্লিক, হিষ্ট্রি অব বিষ্ণুপুররাজ, পৃঃ৫৫-৫৬)। অপুত্রক নরসিংহের মৃত্যুর পর কুচিয়াকোলের রাজা রাধাবল্লভ সিংহদেবের পুত্র দত্তক সুরেন্দ্র সিংহদেব। কিন্তু তিনি সাবালকত্ব অর্জনের আগেই ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে অকাল প্রয়াত হলে রানীমাকেই (ধ্বজামণি পট্টমহাদেবী) আবার রাজ্যপাট সামলাতে হয়। সম্ভবত রানীর পর জমিদারি লাভ করেন নীলমণি সিংহদেব। শেষ তিন রাজা ছিলেন চুনীলাল সিংহদেব (১৯১৪ সালের ২০ শে এপ্রিলের একটি দলিল থেকে বোঝা যায় এই সময়ের আগেই চুনীলাল প্রয়াত হয়েছেন), তাঁর পুত্র কিরীটীভূষণ ও পৌত্র কালীকুমার সিংহদেব। দামোদর সিংহ বিষ্ণুপুর থেকে জামকুড়ি জমিদারিতে পাকাপাকি চলে যান ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে। কালীকুমার সিংহ প্রয়াত হন ১৯৫৫ সালে। রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর মতে শেষ তিন রাজা দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন। সেই হিসাবে নরসিংহ মহিষীর পরের প্রজন্মে সম্ভবত নীলমণি ও নীলমণির পরের প্রজন্মে চুনীলাল জমিদারির দায়িত্ব পেয়েছিলেন। এদের বর্তমান প্রজন্ম জামকুড়ি ও মানবাজারে বসবাস করেন। কালীকুমারের পর পুত্র শিবরাম-পৌত্র অমর, পুত্র বিশ্বরূপ-পৌত্র প্রবীর, পুত্র অজিত-পৌত্র স্বপন এই ত্রিধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠাতা জমিদার দামোদরের তরবারি ও খঞ্জর সযত্নে রক্ষিত আছে প্রবীর সিংহদেবের কাছে।

জামকুড়িতে এসে দামোদর সিংহ ইটের বসত বাড়ি তৈরি করেন। একটি দুর্গ নির্মাণের কাজ শুরু হলেও পরে তা আর সম্পূর্ণ হয়নি। বর্তমান বংশধরেরা এখানে বসবাস না করায় জঙ্গলে ঢাকা পড়েছে সাবেক রাজবাড়ি ও দুর্গ। সেসময় মাটির ঘরেই স্থান পেয়েছিল রাজরাজেশ্বরী ও রণচণ্ডী। পরে অবশ্য প্রজাদের উদ্যোগে

পাকা মন্দির তৈরি হয়। কুলদেবতা ছিল শ্রীশ্রীরাধানাথ জীউ। কুলদেবতা এবং রাজরাজেশ্বরী ঠাকুরানীর সেবা পূজার জন্য বিষ্ণুপুর থানার রংসায়র মৌজায় দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দিষ্ট করা হয় (সূত্র ঃ ১৯৩৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বিষ্ণুপুর দ্বিতীয় মুন্সেফ দামোদর সিংহের জামকুড়ি জমিদারি ছিল পতিত জমি ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ১৮৭১ সালের একটি দলিল ও তার পরবর্তী কিছু দলিলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত ১৮৭১ সালের ৯ মে নিবন্ধীকৃত দলিলে দেখা যায় বিষ্ণুপুর পরগণার সিংহহাজারী তরফের বাজে মান্ডী সাতগেছিয়া মৌজার ১২২৫২ বিঘা জমির ৬৭৭৪ বিঘাই (পঞ্চাশ শতাংশের বেশি) ছিল 'অকর্মণ্য জঙ্গল পতিত' শ্রেণীর। রাজা ও রানীদের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত থাকত বিশেষ সম্প্রদায়ের উপযুক্ত রক্ষীদল। বীরসিংহ গ্রাম সন্নিহিত 'রানীর জঙ্গল' ছিল রানীদের প্রমোদ উদ্যান। এখানে রানীরা এলে সঙ্গে নিরাপত্তা, দেখভাল ও তদারকির জন্যে থাকত খাওয়াস পদবীধারী ঝাড়খন্ড আগত ছত্রী (ক্ষত্রিয়) পরিবার। এদের বসতি ছিল আদিবাসী ও নিম্ন বর্ণের গ্রাম মেঠানা মৌজার মেধানা গ্রামে। একাংশ থাকত কেশিয়াকোল গ্রামে। সেখানে প্রাচীন শিবমন্দির, মল্লরাজ প্রদত্ত অস্ত্রাদি এখনও সংরক্ষিত আছে। এদের রাজসেবার বিনিময়ে জামকুড়িতে 'খাওয়াস' সেবা জমি দেওয়া হয়েছিল। এধরণের শ্রেণীভূক্ত জমির সন্ধান অন্যত্র পাওয়া যায় না। এরা ছিল রাজার খাস লোক অর্থাৎ বিনা অনুমতিতে অন্তঃপুরে যাওয়ার অধিকারী। এদের গুরুত্ব বোঝা যায় ঊনবিংশ শতকের সাতের দশকে রানী ধ্বজামণি পট্টমহাদেবীর আমমোক্তার হিসাবে গিরীশচন্দ্র খাওয়াসের পিতা অযোধ্যানাথের আমমোক্তার হিসাবে নিয়োগ থেকে (সূত্রঃ ১৮৭২ সালে নিবন্ধীকৃত একটি আপসনাম দলিল)। উল্লেখ্য গিরীশচন্দ্রকে রাজা কিরীটীভূষণ বার্ষিক আড়াই টাকা জমাতে বাঁকুড়া কালেক্টরের ৪৭৭ নং তোজির ২০ বিঘা জঙ্গল জমি বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন।

দামোদর সহ পরিবারের মৃতদের দাহ করা হত জামকুড়ি সন্নিহিত 'সমাধি জঙ্গল'এ। এখানে কালীপূজার সন্ধ্যায় প্রত্যেক বছর প্রদীপ জ্বালান রাজপরিবারের সদস্যরা। উল্লেখ্য অনুরূপভাবে ইন্দাসে রাজা চৈতন্য সিংহ প্রয়াত হলে 'রাজার পুকুর' পাড়ে তাঁকে দাহ করে প্রত্যহ সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালানোর জন্যে মাঝি পদবীধারী বাগদি পরিবারকে ছয় বিঘা জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল।

দামোদর উত্তর তৃতীয় প্রজন্মের শাসক রানী ধ্বজামণির সময়ে (ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ) জামকুড়ির জমিদারি ছিল মামলা-মোকদ্দমা জর্জরিত। রানীর আমমোক্তার

ছিলেন ব্রজগোপাল অধিকারী (১৮৮১) ও অযোধ্যানাথ খাওয়াস (১৮৭১)। তিনি ব্রিটিশ সরকারের সাথে বিভিন্ন আপসনামা দলিলে রাজস্ব আদায় দেওয়ার অঙ্গীকার করে জমিদারির একাংশ বাঁচাতে সক্ষম হন। অন্তত এমন দুটি আপসনামা দলিল থেকে সমকালীন জমিদারির সংকটের আঁচ পাওয়া যায়।  একটি আপসনামা সম্পাদিত হয় ১৮৭১ সালের ৮ই মে ও অন্যটি ১৮৮১ সালের ৬ই মার্চ। ০৮/০৫/১৮৭১ তারিখের নথি থেকে জানা যায় ১৮৬৮ সালের ১ লা এপ্রিল জমিদারের পক্ষ থেকে সরকারকে সিংহহাজারী তরফের বাজে মন্ডী সাতগেছিয়া মৌজার মোট ১২২৫২ বিঘা ১ কাঠা ১ ছটাক ৭ গন্ডা জমির (এর মধ্যে অকর্মণ্য জঙ্গল পতিত জমি ৬৭৭৪ বিঘা ৮ কাঠা ১১ ছটাক ও হাসিল পতিত জঙ্গলাদি ছিল ৫৪৭৭ বিঘা ৮ কাঠা ১১ ছটাক ৬ গন্ডা) জন্য ৭৫৩ টাকা ৩ আনা ৭ পাই রাজস্ব জমার অঙ্গীকার করা হয়েছে। এই অঙ্গীকার রক্ষার তাগিদে মে, আগষ্ট, নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারী মাসে চার কিস্তি যথাক্রমে ৭০ টাকা, ১৪০ টাকা, ১৭০ টাকা ও ৪৮ টাকা জমা দেওয়া হত বর্ধমানের বিভাগীয় কমিশনারের কাছে। এই অর্থ সংগ্রহের স্বার্থে তাদের ৪৮৩৬ বিঘা ১ কাঠা ৩ ছটাক ১ গন্ডা জমি বন্ধক রাখতে হয়। এছাড়া তাঁদের ১৮৮১ সালের ৬ই মার্চ এমনি একটি অঙ্গীকার দলিলে সরকারকে সিংহহাজারী তরফের রাধানগর চৌকির ১২১ নং বাজে মান্ডী ময়ূর নাচনা মৌজায় জরিপী মরতলী ১৫৩১ বিঘা ৮ কাঠা ৩ ছটাক ৬ কড়া জমির জন্য ১৬৫ টাকা ৮ আনা ৬ পাই রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হতে হয়। জামকুড়ি তালুকের ১৮৬৩-৬৪ সাল থেকে ১৮৭৫-৭৬ সাল পর্যন্ত ১০০ বিঘার কাত ১২ টাকা নির্দিষ্ট হয়। ১৮৭৬-৭৭ অর্থবর্ষ থেকে বর্ধিত হার ৮৩ টাকা ৮ আনা করে  পরিশোধ করার চিরকালীন কবুল মঞ্জুর করতে হয়। রানী ধ্বজামণির সময়ে রাজপরিবার মামলা মোকদ্দমায় এতটাই জর্জরিত ছিলেন বস্তুত তাঁরা পালিয়ে বেড়াতেন অনেক সময়। ১৮৯৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়া সাব-জজকোর্টের একটি সমন বিবাদী রাজপরিবারকে ধরাতে গিয়ে রাজপরিবারের নলিনী সিংহদেব (সেসময় আপন কার্যে অন্যত্র ছিলেন), রানী ধ্বজামণি (সেসময় পিত্রালয় বরাভূমে অবস্থান করছিলেন), রানী তারামণি (সেসময় পিত্রালয় নতুনগ্রামে অবস্থান করছিলেন) সহ পরিবারের কাউকে না পেয়ে কাছারীবাড়িতে  কুচিয়াকোলের জনৈক অনন্ত ঘোষের উপস্থিতিতে  সেটি  'লটকাইয়া' জারি করতে হয়।

এই সংকট অব্যাহত থাকে পরবর্তী জমিদার নীলমণি চুনীলাল, কিরীটীভূষণ ও কালীকুমারের আমলেও। কিরীটীভূষণের সময়ে প্রদত্ত জমি বন্দোবস্ত ছিল সম্ভবত

আয় সংহত করার প্রয়াসে। ১৯১৪ সালের ২২ শে এপ্রিলের দলিলমূলে জানা যায় বাঁকুড়া জেলার ৪৭৭ নং তৌজি বিনোদনগরের অধীন ২০ বিঘা পত্তনি জমির খাস দখলে থেকে বন্দোবস্ত চেয়েছিলেন জয়রামপুর থানার মেঠানা নিবাসী গিরীশচন্দ্র খাওয়াস। রাজাকে বছরে আড়াই টাকা আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ, চৈত্রের চার কিস্তিতে শোধের শর্তে ও খেলাপী কিস্তির জন্য বার্ষিক দুই টাকা সুদের শর্তে এই বন্দোবস্ত পাকা হয়। বন্দোবস্তের শর্ত ছিল ১) প্রদত্ত জমিতে চারিটি আম গাছ ও শাল সহ অন্যান্য বৃক্ষাদির ভোগদখল থাকবে রাজার। ২) মাটির নিচের পাথর ও খনিজের অধিকার থাকবে রাজার। ৩) জমির উপর দিয়ে রেলপথ নির্মাণ হলে অধিগ্রহণের দরুন ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হবে রাজার। শেষ শর্ত থেকে বোঝা যায় তখন বাঁকুড়া জেলায় রেলপথ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

শেষ রাজা কালীকুমার বেহিসেবি জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ফলে যে জটিলতার সৃষ্টি করেন তা আদালতের রায় মানতে ও রাজপরিবারের সম্মান রক্ষার্থে অবশেষে এক সোলেনামার মধ্য দিয়ে নিষ্পত্তি করতে হয়। বীরসিংহ গ্রামের রামবিষ্ণু কর্মকার ১৯৩৪ সালের ১৬ই আশ্বিন নিবন্ধীকৃত পাট্টামূলে সোনামুখী থানায় রংসায়র মৌজার ৬ একর ৯০ শতক জমি সনাতি ৪ টাকা ১২ আনা 'জমা জামাই' স্বত্ত্বে রাজা কালীকুমারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত পান। কিন্তু ইতিমধ্যেই উক্ত জমি ১৯২৩ সালের ২৫ শে ভাদ্র রাজপরিবার দ্বারা নিবন্ধীকৃত এক অর্পণনামামূলে শ্রীশ্রী রাধানাথ জীউ ও রাজরাজেশ্বরীর সেবা পূজার নিমিত্ত অর্পিত হয়েছিল। স্বাভাবিক কারণেই জমির দখলদার সোনামুখী থানার মানিকবাজার নিবাসী কুড়ান চৌধুরী, নবকুমার দত্ত, রসরাজ দত্ত, গোপীনাথনাথপুর নিবাসী রাখালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজু গড়াই, ফকির দত্ত, রতনচন্দ্র গড়াই রামবিষ্ণুকে খাজনা দিতে অস্বীকার করে ও রামবিষ্ণুকে বেদখল করে। রামবিষ্ণু এর বিরুদ্ধে বিষ্ণুপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফ কোর্টে দেওয়ানী মামলা দায়ের করেন। রামবিষ্ণুর আবেদনের ভিত্তিতে আদালত ডিক্রী জারি করে বিবাদী রাধালাল জীউ, রাজরাজেশ্বরী দেবী (পরিচারক নাবালিকা বিদ্যুৎকুমারী দেবী, প্রদ্যোৎকুমার সিংহদেব, হিকিম শিবরাম সিংহদেব) এবং প্রজা রাধু গড়াই ও রতনচন্দ্র গড়াইয়ের বিরুদ্ধে। বাস্তবে এই ডিক্রী রূপায়ণ করতে একটি সোলেনামা স্বাক্ষরিত হয়। রামবিষ্ণু রাধালাল জীউ, রাজরাজেশ্বরী দেবীর নামে দেবোত্তর সম্পত্তির চিরস্থায়ী স্বত্ত্ব ত্যাগ করলে তিন পরিচারক সম্পত্তিটি ১৯৩৪ সাল থেকে ২০ বছরের জন্য বন্দোবস্ত গ্রহণ করে রামবিষ্ণুর পূর্বেকার দেয় বার্ষিক খাজনা ৪ টাকা ১২ আনা

পরিশোধের দায়িত্ব নেন। এছাড়াও এর উপর অতিরিক্ত ৫ টাকা ৮ আনা তাঁরা রামবিষ্ণুকে দিতে সম্মত হন। বাকি জমির জন্য পরিচারক ও রাজাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে রামবিষ্ণু রাখালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাধু গড়াই, রতনচন্দ্র গড়াইদের কাছ থেকে ১৯৩৪ সাল থেকে পরবর্তী ২০ বছর ৭৪ খতিয়ানের জমির কাত ২ মাপ ৩ মাল 'এলাকা রাখে', ৮৭ নং খতিয়ানের জমির কাত ৬ মাল ১৩ পাই 'সাজা ধান', ৮৬ নং খতিয়ানের জমির ২ মাপ ৩ মাল 'ধানের এলাকা রাখে' ও বাকি খতিয়ানের জমির ১ মাপ ৪ মাল 'সাজা ধানের এলাকা রাখে' আদায় পাবেন বলে ঠিক হয়। এই সোলেনামা তৈরির ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন বিষ্ণুপুরের রসিকগঞ্জের পত্তনকারী রসিক বিশ্বাসের পুত্র বিবাদী উকিল গুরুদাস বিশ্বাস, সাথে উকিল হরভূষণ মন্ডল। বাদী পক্ষের উকিল ফকিরচন্দ্র ঘোষও এগিয়ে এলে সোলেনামা সম্পাদন সহজ হয়। এই আপসে রামবিষ্ণু যেমন চিরকালীন স্বত্ত্ব ত্যাগ করে বিশ বছরের মেয়াদী অধিকার মেনে নিয়েছিলেন, রাজপরিবার ও দখলদার প্রজারা রামবিষ্ণুকে বিশ বছর প্রাপ্য আদায় দিতে সম্মত হয়েছিল।

বাগদি সম্প্রদায়ের উপর মল্ল ও জামকুড়ির জমিদারদের প্রভাব ও রাজার প্রতি এই সম্প্রদায়ের মান্যতা বোঝা যায় সম্প্রদায়টি চারিত্রিক সুচিতা বজায় রাখার ব্যাপারে ঘোষণাপত্র (একরারনামা) জারি করার মধ্য দিয়ে। এই একবারনামা সম্পাদিত হয় মল্ল রাজা নীলমণি সিংহদেবের মহিষী চূড়ামণি পট্টমহাদেবী ও পরে রাজা কালীকুমার সিংহদেবের কাছে। এছিল বিষ্ণুপুর, জয়পুর, পাত্রসায়র থানার অধীন 'গ্রামসমূহের সমস্ত বাউরী মহলের দেশ্যালীগণ ও ডিমুখ্যেগণ, ছড়িদারগণ, অষ্টপৌরীগণ ও সাধারণ বাউরীগণ কতৃক প্রদত্ত 'একরারনামা পত্র।' বাউরী সম্প্রদায় নিজেদের সূচিতা ও সামাজিক সংহতি বজায় রাখতে মাঝেমাঝেই এমন একরারনামা রাজাদের প্রদান করতেন বলে মনে হয়। উক্ত ঘোষণাপত্রে যে ৩১ জন নেতৃত্বস্থানীয় লোকের টিপসই ও নাম আছে তারা হলেন রামজীবনপুরের রজনী মুখ্যে, পায়রাশোলের গিরীশ মুখ্যে, হীরাপুরের উদ্ধব বাউরী, গোকুলনগরের হারু মুখ্যে, গোপালনগরের জীবন বাউরী, ভরার চন্দ্র বাউরী ছড়িদার, মুড়াকাটার গিরিজা বাউরী, কাঁকরবেড়্যার গোপীনাথ মাজী, বালসীর মাখন বাউরী, মাওড়াবনীর পাঁচু বাউরী, সান্তোরের কালীপদ মুখ্যে, মুড়াকাটার বিপিন বাউরী, ভরার জীবন বাউরী, হাঁসপুকুরের সুচাঁদ অষ্টপ্রহরী, সাহাপুরের নটবর মুখ্যে, বীরসিংহের নটবর মুখ্যে। অঙ্গীকারপত্রে বাউরীদের বক্তব্য ছিল, 'মল্লভূমধীশ্বরের আদিম আমল হইতে আমাদের পূর্বপুরুষগণ জাতীয় বিষয়ে

যে সমস্ত নিয়মে বা শাসনাধীনে থাকিবার জন্য আমাদের জাতিগত ধর্ম ও মর্যাদা রক্ষার জন্য পূর্ব-পূর্ব একরারনামা দ্বারা নিচের লিখিত শর্তসমূহে স্বীকৃত ও অঙ্গীকৃত হইলাম। ১) আমরা ও আমাদের স্বজাতিগণ কেহ কখনও ভিন্ন জাতীয় দুষ্টা রমণীকে উপপত্নী রূপে গ্রহণ করিব না ও করিবে না। ২) আমরা আমাদের স্বজাতিগণ কেহ কখনও চৌর্যবৃত্তি করিব না ও করিবে না। ৩) আমরা আমাদের স্বজাতিগণ কেহ কখনও বিবাহিত স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে পারিব না ও পারিবে না এবং বিবাহিতা বর্তমানে কেহ কখনও সাঙ্গা কি বিধবা বিবাহ বা নিকাহ করিতে পারিব না ও পারিবে না। যদি কোন সঙ্গত কারণে সাঙ্গা করি বা করে তবে উভয় পত্নীকেই ভরণপোষণ করিব বা করিবে। ৪) আমরা আমাদের স্বজাতিগণ মধ্যে কেহ কখনও মুসলমান নারী কি কখনও শিখর্‍্যাব নারী কি মুচি নারী সাঙ্গা করে তবে তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিব। আমরা কোন দাসী বা নারী উদার করিলে যথারীতি রাজসমক্ষে দাখিল করিয়া হুজুরের নিকট ছাড়সন্তক গ্রহণ করিব। ছাড়পত্র না লইয়া পুনরায় হুজুরের আদালতে বিচার পূর্বক সমাজচ্যুত ও নিচের লিখিত নিয়মে বাধ্য করিতে পারিবেন।' উক্ত একরারনামাটি এর পর ছিন্ন থাকায় শর্ত অমান্যের শাস্তি জানা যায়নি। ১৯১৪ সালের পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে এই অঙ্গীকারপত্রটি তৈরি হয়। রানী চূড়ামণি নীলমণি, কিরীটীভূষণ ও কালীকুমারের সময়কালব্যাপী জীবিত ছিলেন বলে মনে হয়।

জামকুড়ি জমিদারদের জমি দান ও দান গ্রহণের কিছু তথ্য মিলেছে। আগেই বীরসিংহ গ্রামের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বালসীর মন্দির, রাজরাজেশ্বরী, কুলদেবতার জন্য জমি দান ও আর্থিক সহায়তার কথা বলা হয়েছে। রাজরাজেশ্বরীর পূজায় নিয়োজিত পটুয়াদের ভূমিদানের কথাও বিবৃত হয়েছে। পারিবারি সূত্রে জানা যায়, রামাউৎ সম্প্রদায়কে রাজপৃষ্ঠপোষকতার সূত্রে বিহারের ছাপরা থেকে আগত মহন্ত সর্বেশ্বরানন্দ দাসকে ৩০০ বিঘা জমি দান করে একটি অস্থল প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা হয় জামকুড়িতে। প্রতিষ্ঠা হয়েছিল রঘুনাথ জীউয়ের বিগ্রহ। দেবোত্তর এই জমির ৬০ বিঘা ছিল কাটামালা মৌজায় এবং ৬৫ বিঘা ছিল ঠাকুরহাটি মৌজায়। পরে স্থানীয় এক রাজনৈতিক বিরোধে মহন্ত পালিয়ে যান ও জমিগুলি বেদখল হয়ে যায়। ১৯৩৭ সালের জেলা বোর্ডের রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে জামকুড়িতে রামনবমী উপলক্ষে তিন দিনের রাজরাজেশ্বরী মেলা উপলক্ষে পাঁচ হাজার মানুষের সমাগম ঘটেছে।

ভূমিদান গ্রহণের ঘটনা ঘটেছিল ১৯১৬ সালের ২১ শে ডিসেম্বর। জামকুড়ির

জনৈক দুর্গাচরণ সিংহদেব, পিং- সীতানাথ, অপুত্রক থাকার কারণে কুলদেবতা শ্রীশ্রী শ্যামকিশোর জীউয়ের সেবাকাজ অব্যাহত রাখার জন্য ৭০ বছর বয়েসে রাজা কালীকুমার সিংহকে পদুয়া মৌজায় ১৬ বিঘা, খেজুরমুড়া মৌজায় ১৮ বিঘা ১৯ কাঠা, মুকুন্দপুর মৌজায় ২ বিঘা ১০ কাঠা, জামকুড়ি মৌজায় ৬ বিঘা অর্থাৎ উপরিস্থ গাছ সমেত মোট ৪৩ বিঘা ৯ কাঠা নিষ্কর শালি জমি দান করেন। শর্ত ছিল অব্যাহত নিত্য সেবা ও পূজারী গদাধর সিংহ ঠাকুরের প্রাপ্য অক্ষুন্ন রাখা।

বিভিন্ন দলিল, নথি, একরারনামা, আপসনামা থেকে জামকুড়ি জমিদারির অধীন বিভিন্ন কর্মীর সন্ধান পাওয়া যায়। খাওয়াসরা যেমন ছিলেন রানীদের রক্ষী, ছড়িদার হিসাবে নিযুক্ত হতেন বাউরি সম্প্রদায়ের মানুষেরা। অন্যান্য পদের নাম মুখ্যা, মন্ডল, রাহাদার, জমিদারি চাকর, মহাল চৌকিয়াত, মাকারী, মাহিন্দার, জানদার চাকরান প্রভৃতি। ঘাটোয়ালদের সন্ধান না পাওয়া গেলেও অষ্টপ্রহরীদের কথা জানা যায়। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দের মাঘ মাসে জামকুড়ির অদূরবর্তী বালসীর লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের অষ্টপ্রহরী ছিলেন বংশানুক্রমিক চাকরান জমিভোগী নারায়ন বাগদির পুত্র বাবুলাল বাগদি। ১৯৩২ সালে চৈত্র মাসে জামকুড়ির অষ্টপ্রহরীকে দিয়ে বজরুপোতা গ্রামের রুস্তম আলি মনিবের কাছে টাকা পাঠিয়েছিলেন বলে জানা যায়। পথঘাটের নিরাপত্তা রক্ষা করতেন রাহাদারগণ। রাস্তার বিশেষ স্থানে চৌকি স্থাপন করে শুল্ক আদায় করতেন চৌকিদারেরা। বাউরিদের সমাজপতি ছিলেন ডিমুখ্যাগণ। রাজাদের খাস জমি চাষ করতেন মাহিন্দার। এর পাহারাদার হতেন চৌকীয়াত ও ফসলের মাপ নিতেন মাপকারী। বাউরিদের ‘দেশয়ালী’ ছিলেন আদপে ‘লগদি’। জানাদার চাকরান হলেন সংবাদবাহক চাপরাশী। মুখ্যারা ছিলেন গ্রাম প্রশাসক।

জামকুড়ি ও বীরসিংহ গ্রাম সন্নিহিত মেধেনা, বাহাদুরপুর, পুরুন্ডি সহ বিভিন্ন গ্রামে ছিল লোহার, মল্ল, খাওয়াস গোষ্ঠীর মানুষের বাস। অদূরের বাহাদুরপুরে মল্লরাজাদের ঘাটোয়াল হৃদয় ও অধর লোহার ছিলেন ঘাটোয়াল। গ্রামে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন হয়েছিল মল্লানুকূল্যে। বীরসিংহ ও জামকুড়ির অন্তর্বর্তী অংশ ছিল মাকড়া পাথর মিশ্রিত অনুর্বর জঙ্গল জমি। জঙ্গলের ‘চিড় চিড়া কাঁটা’ গাছ থেকে হালকা কায়লা ও বারুদের উপকরণ তৈরি হত। মল্লরাজ ও জামকুড়ির জমিদারেরা এটি ব্যবহার করত। এজন্য সংশ্লিষ্ট সংগ্রাহকদের চাকরান জমিও দেওয়া হত। মেধেনার শশী লোহার ও তাঁর পূর্বপুরুষরা একাজ করতেন। হৃদয় ও অধর লোহাররা বংশপরম্পরায় ঘাটোয়ালের কর্তব্য পালন করত নিষ্কর জমির বিনিময়ে। এদের

রাজদত্ত পদবী ছিল 'মহুরী'। হৃদয় পুত্র প্রহ্লাদ তেভাগা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। হদল-নারায়ণপুরে কৃষক ও মৎস্যজীবীদের নিয়ে আন্দোলন-বয়কট তীব্রতর করে তোলায় পুলিশের খাতায় অভিযুক্ত নেতা ননীগোপাল রায় প্রহ্লাদের বাড়িতে আত্মগোপন করেন ও সেখান থেকেই গ্রেপ্তার হন। প্রহ্লাদের পুত্র নিমাইয়ের বাড়িতে আজও রক্ষিত ঘাটোয়ালী নথি ও অস্ত্রাদি থেকে সে যুগের অন্ত্যজ জীবন ও প্রশাসনে তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। স্থানীয় গোষ্ঠ লোহারের কাছে জানা যায় তাঁর প্রপিতামহ মাধব লোহার ছিলেন জামকুড়ি রাজার দারোয়ান। অবশ্যই চাকরান জমির বিনিময়ে। এই জঙ্গল থেকে মগা লোহার ও তাঁর বংশধরেরা রাজাদের পাখিরালয়ের খাদ্য হিসাবে ফরিং-পতঙ্গ ধরে যোগান দিতেন। এজন্য দেওয়া চাকরান জমি, গ্রামের মগারডাঙা, মগারবাঁধ অতীতের সেই সংস্কৃতির অবশেষ।

এইরূপ বিবিধ ধারায় জামকুড়ির মত ছোট একটি পরগণায় একটি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সৃষ্টি হয়েছিল।

## মল্লভূমের কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবার ও গণ উৎসব

মল্ল রাজ বংশের আনুকূল্যে মল্লভূমে কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবার রাজ কাজে সহায়তা করার সূত্রে ও রাজানুকূল্যে স্থানিক ক্ষমতায়িত গৌরবের স্থান দখল করে।[৭৭] এদের অনেকেই ছিলেন মল্লরাজের অধীনে স্থানীয় ভূম্যধিকারী। অনেকে রাজবৃত্তের বাইরে থেকেও শিল্প-বাণিজ্য জনিত আর্থিক সমৃদ্ধির কারণে সমাজিক প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল। আর নিলামী প্রথা চালু হলে সাবেক জমিদারির স্থলে বিভিন্ন বৃত্তির মানুষ নয়া জমিদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। মল্লভূম বর্ধমানের প্রভাব বলয়ে এলে পত্তনিদার হিসাবে অনেকে স্থানীয় প্রতিপত্তির অধিকারী হন। এমন বিভিন্ন পরিবার সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের সাথে নিজেদের জড়িয়ে নিয়ে প্রচলিত গ্রামীণ জীবনচর্চার শরিক হয়ে পড়ে। এই শ্রেণীর আর্থিক আনুকূল্যে পালিত গ্রামীণ মেলা, পার্বণ, উৎসব সাধারণ গ্রামীণ মানুষের যোগদানের ফলে সর্বজনীন চেহারা নেয়। এমন কিছু পরিবারের ইতিহাস ও পরিবার সংশ্লিষ্ট উৎসবের আলোচনা করা হল।

### ১) মল্লরাজবাড়ির ঐতিহ্যবাহী দূর্গাপূজা

বিষ্ণুপুর-সংলগ্ন অঞ্চলটিকেই অতীতে মল্লভূম বলা হত। মল্লভূম রাজ্যের কেন্দ্রীয় এলাকা ছিল বর্তমান সোনামুখী, জয়পুর, পাত্রসায়র, ওন্দা, বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর ও

ইন্দাস। তবে প্রাচীন বিষ্ণুপুর রাজ্যের আয়তন আরও বড়ো ছিল। উত্তরে সাঁওতাল পরগনার দামিন-ই-কোহ থেকে এই রাজ্য দক্ষিণে মেদিনীপুর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। পূর্বে বর্ধমানের পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমে ছোটো নাগপুরের কিছু অঞ্চলও এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবাড়ির পুজো জিতাষ্টমীর পরের দিন তোপধ্বনির মাধ্যমে শুরু হয়। রাজপরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে রাজা জগৎ মল্ল দেবী মৃন্ময়ীকে প্রতিষ্ঠা করেন। গঙ্গামাটির সেই বিগ্রহ আজও অক্ষত। পুরনো জৌলুস না থাকলেও প্রচলিত পুজোর আচার অনুষ্ঠান আগের মতোই একেবারে তিথি-নক্ষত্র মেনেই হয়। এখানে মূর্তিপুজো ছাড়াও পটে আঁকা দেবীর আরাধনা হয়। মা মৃন্ময়ীর তিনটি রূপে পূজিতা হন। বড়ঠাকুরানি মা কালী, মেজো ঠাকুরানি সরস্বতী এবং ছোট ঠাকুরানি লক্ষ্মীরূপে। রাজবাড়ির পুজো হয় নিজস্ব বলিনারায়ণী পদ্ধতিতে। সেই সময়ের হাতে লেখা পুঁথি আজও রয়েছে। যা পাঠ করেই হয় মল্লরাজ পরিবারের পুজো।

মন্দিরলিপিতে লেখা পুজোর প্রতিষ্ঠাকাল ৯৯৭খ্রিস্টাব্দ। প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা জগৎমল্ল। গঙ্গা মাটিতে তৈরি এই মূর্তি বিসর্জন হয় না। স্বপ্নাদেশ পেলে অঙ্গরাগ বা রং করা হয়।

শারদীয়া দুর্গোৎসবের পনেরো দিন আগেই পুজো শুরু হয়ে যায় বিষ্ণুপুর মল্লরাজবাড়িতে। জিতাষ্টমীর দিন বিষ্ণুপুর শহরের ফৌজদার পরিবারের পটশিল্পীর ঘর থেকে রাজবাড়িতে আনা হয় পটেআঁকা দুর্গা, 'বড়ঠাকুরানি'। দেবী মৃন্ময়ীর ডান পাশে তাঁর অধিষ্ঠান। মানচতুর্থীর দিন আসেন পটদুর্গা মেজো 'ঠাকুরানি'। তাঁর জায়গা বড়ঠাকুরানির ডান দিকে। আর সব শেষে পুজোর দিন পটদুর্গা ছোট ঠাকুরানিকে বসানো হয় দেবী মৃন্ময়ীর একেবারে গা ঘেঁসে। সেখানে একই সঙ্গে থাকে 'খচ্চরবাহিনী'।

সাবেকি প্রথা অনুসরণ করে মহাষ্টমীতে এখনও রাজবাড়ি লাগোয়া মুর্চার পাহাড়ে কামান দেগে সন্ধি পুজো শুরু হয়। মহানবমীতে মধ্যরাতে হয় খচ্চর বাহিনীর গোপন পুজো। সেখানে রাজপরিবারের প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কারও প্রবেশ নিষেধ। ইতিহাস গবেষক চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্তের কথায়, "মল্লরাজাদের পুজো বহু প্রাচীন। ফলে নানা বৈচিত্র্য রয়েছে এই পুজোর আচার-অনুষ্ঠানে।"

পুজোর শেষে আকর্ষণ একাদশী ও দ্বাদশীর দিন রাবণ বধ নৃত্য। হনুমান, জাম্বুবান,

বিভীষণ, সুগ্রীবের মুখোশ পরে শহর জুড়ে রাবণকাটা নৃত্য পরিবেশন করেন লোক শিল্পীরা। সবশেষে রঘুনাথ মন্দিরের সামনে রাবণবধ এবং কাটারাবণের মাটি ঘরে রাখার জন্য মানুষের আগ্রহ আজও অমলিন

নানা প্রকার মিষ্টি ও পায়েসের সঙ্গে পুজোর চারদিনই থাকে খিচুড়ি ভোগের আয়োজন। ভেঙে পড়া রাজবাড়ি লাগোয়া পুজো প্রাঙ্গন জিতাষ্টমীর দিন থেকে থাকে উৎসব মুখর।

জিতাষ্টমীর সন্ধ্যায় হয় বিল্ববরণ। পরদিন সাতসকালে পটপুজো ও তিন দফায় ন'টি তোপধ্বনির মাধ্যমে রাজ দরবারে সূচনা হয় শারদোৎসবের। বিজয়াদশমী পর্যন্ত পুজো চলে টানা ১৮ দিন। এখানে পূজিতা দেবী মৃণ্ময়ী। রাজ পরিবারের এই পুজোই বিষ্ণুপুরের আদি ও প্রধান দুর্গোৎসব।

এক সময় দেবী মৃণ্ময়ীর স্বপ্নাদেশে প্রদ্যুম্নপুর থেকে রাজধানী বিষ্ণুপুরে সরিয়ে আনেন মল্লরাজ জগতমল্ল। এরপর ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে রাজ পরিবারের ঊনবিংশতম রাজা জগৎমল্ল বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে প্রতিষ্ঠা করেন দেবী মৃণ্ময়ীর মন্দির। গঙ্গামাটির তৈরি বিগ্রহ সেই সময় থেকেই পূজিতা এখানে।

কালিকাপুরাণ মতে অন্যান্য পুজো হলেও এ রাজ্যে একমাত্র বিষ্ণুপুর রাজ পরিবারেই দুর্গাপুজো হয় বলিনারায়ণী মতে। এক সময় পুজোয় বলি দেওয়ার প্রচলন থাকলেও পরে তা বন্ধ হয়ে যায় মল্লরাজাদের রাজত্বকালেই। কোন কোন আখ্যানে নরবলির কথাও পাওয়া যায়। কথিত আছে, রাজা হাম্বির মল্ল বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরে বন্ধ হয় সব রকমের বলিদান প্রথা। আর তখন থেকে শব্দকে ব্রহ্ম হিসেবে দেখার শুরু, চালু হয় তোপধ্বনি দেওয়ার রীতি। সেই প্রাচীন ঐতিহ্য ধরে রেখে আজও ফিবছর দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে নির্ঘণ্ট মেনে গর্জে ওঠে কামান।

রাজ পরিবারের পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পটপুজো। বড় ঠাকুরানি, মেজ ঠাকুরানি ও ছোট ঠাকুরানি নামে তিনটি পৃথক পট আঁকেন বিষ্ণুপুরের ফৌজদার পরিবারের শিল্পীরা। মন্দিরে দেবী প্রতিমার পাশেই তিনটি নির্দিষ্ট জায়গায় পুজো হয় তিন পটের। বড় ঠাকুরানির ক্ষেত্রে মহাকালী, মেজর ক্ষেত্রে মহালক্ষ্মী আর ছোটর ক্ষেত্রে মহাসরস্বতীর স্তোত্র পাঠ করা হয়। মল্লরাজ পরিবারে বড় ঠাকুরানির পুজো শুরু নবমীর কল্প থেকে। সেই মতো মৃণ্ময়ী মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় বড় ঠাকুরানির পট।

প্রভাতে গোপালসায়র পুকুরে পট স্নান করান রাজপরিবারের পুরোহিত। স্নান

শেষে পুকুর থেকে মন্দিরে প্রবেশের সময় তিনবার তোপধ্বনি করা হয়। গর্ভগৃহে ঢোকার সময় আবারও তোপধ্বনি দেওয়া হয় তিনবার। ফের তা হয় দেবীকে অন্নভোগ দেওয়ার সময়। দেবী পক্ষের চতুর্থীর দিন থেকে শুরু হয় মেজ ঠাকুরানির পুজো। আর ছোট ঠাকুরানির পুজো শুরু সপ্তমীতে।

মল্লভূমের এই পুজো ঘিরেই বিষ্ণুপুরবাসীর উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো। ঐতিহ্য বজায় রেখে এখানে অষ্টমী পুজোও হয় বেশ ধুমধাম করে। কামানের গর্জনে আরম্ভ হয় সন্ধিপুজোর। মাসকলাই বলি হয় অষ্টমীর সন্ধিক্ষণে। আবার অষ্টমীতে কামান ফাটানো এই দুর্গোৎসবের অন্যতম আকর্ষণ। যদিও রাজতন্ত্র বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে কামানের আকার—আয়তনও অনেক ছোট হয়ে গিয়েছে এখন। রাজবাড়ি সংলগ্ন মুরচার পাহাড়ে সেই কামান ফাটানো বেশ দর্শনীয় বিষয়।

অষ্টধাতু নির্মিত বিশালাক্ষী দেবীর পুজো হয় অষ্টমী থেকে। সন্ধিক্ষণে আজও সোনার তৈরি চাঁপা ফুল দিয়ে অঞ্জলি দেন পরিবারের সদস্যরা। বিজয়াদশমীর দিন দেবী মৃণ্ময়ীর ঘট বিসর্জনের পর বড় ঠাকুরানি, মেজ ঠাকুরানি ও ছোট ঠাকুরানির ঘট বিসর্জন হয়। তারপর পটগুলি চলে যায় রাজবাড়ির অন্দরমহলে।

৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ বাংলার ১০১ বঙ্গাব্দে আজকের বাঁকুড়া জেলার প্রদ্যুম্নপুরে রাজা রঘুনাথ মল্ল, মল্ল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মল্ল কথাটির অর্থ বাহু-যুদ্ধে নিপুণ ব্যক্তি। মল্লশাসিত রাজ্যটির নতুন নামকরণ হয় মল্লভূম। রঘুনাথের রাজ্যাভিষেকের কালটিকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে সূচনা হল নতুন এক অব্দের, রাজা রঘুনাথের পদবি অনুসারে তার নাম হল 'মল্লাব্দ'। অর্থাৎ মল্লাব্দ 'এক'-এ শুরু হল মল্লরাজাদের রাজত্বকাল। মল্ল বংশের আদিপুরুষ হিসাবে রঘুনাথ 'আদিমল্ল' নামে পরিচিত হলেন।

৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে মল্ল বংশের ১৯তম রাজা জগৎ মল্ল মল্লভূমের রাজধানী লাউগ্রাম থেকে বিষ্ণুপুরে স্থানান্তরিত করলেন। ঈশ্বরবিশ্বাসী রাজা জগৎ মল্ল এক দৈববাণী অনুসারে মাটি খুঁড়ে পেলেন এক দেবীমূর্তির মুখমণ্ডল। দেবীর ইচ্ছানুসারে ওই মুখমণ্ডলটি মাটির প্রতিমার অন্তরালে ঢাকা রেখে গঙ্গামাটি দিয়ে তৈরি করালেন এক দুর্গামূর্তি। দেবীর নাম হল মৃণ্ময়ী।

৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে বা ৪০৪ বঙ্গাব্দে, ৩০৩ মল্লাব্দে রাজা জগৎ মল্ল বিষ্ণুপুরে মন্দির তৈরি করে মা মৃণ্ময়ীর মূর্তি স্থাপন করলেন। মা মৃণ্ময়ী হলেন মল্ল রাজপরিবারের কুলদেবী। তিনিই দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। এভাবে শুরু হল মল্ল রাজপরিবারের দুর্গাপুজো।

সেই থেকে আজও রাজা জগৎ মল্লের তৈরি দুর্গা মন্দিরে প্রতি বছর একই মূর্তিতে মল্লরাজবাড়ির দুর্গাপুজো হয়ে চলেছে। মায়ের স্বপ্নাদেশে দেবী মূর্তির অঙ্গরাগ হয়। অর্থাৎ যে বছর মা স্বপ্নাদেশ দেন, সেই বছরে মৃণ্ময়ী দেবীর মূর্তিকে নতুন করে রং করা হয়। মল্লরাজবাড়ির দুর্গাপুজো হয় আঠারো-উনিশ দিন ধরে। জিতাষ্টমীর দিনে জীমূতবাহন পুজোর পবিত্রলগ্ন থেকে সূচনা হয় রাজবাড়ির দুর্গাপুজো। পরদিন কৃষ্ণানবমী তিথিতে দেবীর কল্পারম্ভ। ওই দিন মায়ের বেলবরণ অনুষ্ঠান হয়।

এখানে মা মৃন্ময়ী দেবীর সঙ্গে পটে আঁকা আরও তিনটি দুর্গারও পুজো হয়। এঁরা হলেন বড় ঠাকুরানি, মেজো ঠাকুরানি ও ছোট ঠাকুরানি। তিনটি পট একইরকম দেখতে হলেও বড় ঠাকুরানি লক্ষ্মীবিলাস শাড়ি পরিহিতা, মেজো ঠাকুরানির শাড়ি লাল রঙের এবং ছোট ঠাকুরানির শাড়ির রং কমলা। বংশপরম্পরায় ফৌজদার পরিবার এই পটগুলো অঙ্কন করেন। জিতাষ্টমীর পরের দিন অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে কৃষ্ণবাঁধে স্নান করিয়ে বড় ঠাকুরানির আগমন হয় দুর্গামন্দিরে। ওইদিনই মৃন্ময়ী দেবীর মন্দিরে নবপত্রিকার পুজো করা হয়।

শারদীয়া চতুর্থীর দিন মেজো ঠাকুরানির পট দুর্গামন্দিরে নিয়ে আসা হয়। দেবীপক্ষের ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার পর রাজপুরোহিত শোভাযাত্রা সহকারে ছোট ঠাকুরানির পট শ্যামকুণ্ডে নিয়ে যান। সেখান থেকে বোধনস্থল বিল্ববৃক্ষ তলায় পুজো করে ছোট ঠাকুরানির পট দুর্গামন্দিরে স্থাপন করা হয়।

মহাষ্টমীর দিন সকালে মল্লরাজবাড়ির অন্দরমহলে অবস্থিতা বিশালাক্ষী দেবীর মূর্তিকে দুর্গামন্দিরে নিয়ে এসে মেজ ঠাকুরানির সামনে একটি রুপোর থালার ওপর রাখা হয়। মহাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধিক্ষণে কামানে তোপ দেগে সন্ধিক্ষণের পুজো শুরু হয়। মহাদণ্ড উপাধিধারী পরিবার বংশানুক্রমে আজও মল্লরাজবংশের কামান দাগেন। রাজবাড়ির তোপধ্বনির শব্দ কানে এলে তবেই সারা বিষ্ণুপুর শহরের সব পুজোমণ্ডপে শুরু হয় মা দুর্গার সন্ধিক্ষণের পুজো, সঙ্গে ফাটতে থাকে বাজি। মল্লরাজ্যের শাখা বংশ বা মিত্র রাজপরিবারের দুর্গাপূজার সন্ধিপূজাও শুরু হত বিষ্ণুপুরের এই কামানের আওয়াজ শুনে। যেমন শ্যামসুন্দরপুর, সিমলাপাল, রাইপুর, অম্বিকানগর, অযোধ্যা, কুচিয়াকোল রাজ্য। আবার জামকুড়ির সন্ধিপূজার কামান দাগা শুনে আগে মল্লরাজার এই পূজার সন্ধি পূজা শুরু হত এমন জনশ্রুতি প্রবল। এই প্রক্রিয়ার সাথে নারিচা, জামকুড়ি,বিষ্ণুপুরের দেবীর তিন বোন হিসাবে পূজিতা হওয়ার তত্ত্বের সম্পর্ক থাকতে পারে। অন্য রাজবংশগুলো তোপধ্বনিকে মান্যতা

দিত কারণ তারা ছিল মল্লভূম মিত্ররাজ্য।

মহানবমীর নিশিরাতে দুর্গামন্দিরে মহামারীর অধিষ্ঠাত্রী 'খচ্চরবাহিনী' দেবীর পুজো হয়। দেবীর মূর্তি পটে আঁকা, রাজবাড়ির অন্তঃপুরে গোপনে রাখা থাকে। অনেক বছর আগের আঁকা এই পটে কী রূপ আছে, খুলেও দেখা হয় না। নবমীর গভীর রাতে রাজবাড়ি থেকে দুর্গা মন্দিরে এনে তাঁকে পুজো করা হয়। রাজপুরোহিত পটের দিকে পিছন ফিরে বসে বাঁ-হাতে পুজো করেন। শুধুমাত্র রাজা ও রাজপুরোহিত ছাড়া মন্দিরে আর কেউ থাকেন না। জনশ্রুতি আছে, যে পুরোহিত এই পুজো করেন তিনি নির্বংশ হন। পুজো শেষ হলে ওই রাতেই পটটিকে রাজবাড়ির অন্দরমহলের গোপনকক্ষে গিয়ে রেখে আসা হয়।

বিজয়া দশমীর সকালে নবপত্রিকাকে গোপালসায়রে বিসর্জন দেওয়া হয়। দেবীমূর্তি বা কোনও পট বিসর্জন করা হয় না। নবপত্রিকাতে থাকা ধান ও মান গাছকে খুলে রেখে বিসর্জন দেওয়া হয়।

এরপর দশমী থেকে দ্বাদশী পর্যন্ত তিনদিন ধরে চলে রাবণ-কাটা উৎসব। হনুমান, সুগ্রীব, জাম্বুবান আর বিভীষণের মুখোশ ও লোমের পোশাক পরে চারজন মানুষ সারাদিন ধরে নেচে নেচে ঘোরেন সারা বিষ্ণুপুর শহর। সঙ্গে থাকেন বাজনদার। দশমীর দিন রঘুনাথ জীউয়ের মন্দিরে রাম, লক্ষ্মণ, সীতার পুজোর পর মুখোশ নাচের অভিষেক হয়। দশমীতে কুম্ভকর্ণ বধ উৎসব, একাদশীতে ইন্দ্রজিৎ বধ উৎসব এবং সবশেষে দ্বাদশীর রাতে হয় রাবণ বধ উৎসব। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে জিতাষ্টমীতে শুরু হওয়া মল্লরাজবাড়ির ঊনিশ দিনের দুর্গোৎসবের সমাপ্তি ঘটে। লোকায়ত শৈব ভাবনার পৃষ্ঠকোষকতাতেও এই মল্ল রাজবংশের কৃপণতা ছিল না। গাজন মেলাতেও এদের অংশগ্রহণ ছিল। রাজা কালীপদ সিংহ ঠাকুর ছিলেন (১৯৩০-১৯৮৩) ডিহর-জন্তার-ষাড়েশ্বর মেলার মালিক আর আয় ছিল ২০ টাকা। জেলা বোর্ডকে দেয় আট টাকা ও স্বাস্থ্যদপ্তরকে ১২ টাকা।

বিনয় ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থে বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারের দুর্গাপূজার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। নিচে হুবহু তা তুলে দেওয়া হল।

'বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের দুর্গোৎসব অনেক আগে থেকে আরম্ভ হয়। জিতাষ্টমীর পরের নবমীতে প্রথমে আসেন 'বড়ঠাকরুণ'। রূপার-পাতে মহিষ-মর্দিনী মূর্তি, নাম বড়ঠাকরুণ। রাজগৃহেই থাকেন এবং নবমীর দিন রাজার ঘর থেকে তাঁকে এনে কৃষ্ণবাঁধে স্নান করিয়ে, নবপত্রিকা সহ পুজো করে 'দুর্গা-মেলায়' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

নবপত্রিকা হল--ধান্য, মান, রম্ভা, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বল্ব, দাড়িম ও অশোক। নবপত্রিকা দুর্গার স্বরূপ বা নবদুর্গা। বড়-ঠাকরুণকে এনে মৃন্ময়ীতলার সামনে শিরীষ গাছের তলায় স্থাপন করে 'পাটে' পূজা করা হয়। পরে মেলার উপর পূজা হয়। তারপর থেকে প্রতিদিন নিত্যপূজা হতে থাকে। চতুর্থীর দিন আসেন 'মেজঠাকরুণ', একটি 'ঘট' মাত্র। গোপালসায়র থেকে রাজ-পুরোহিত ঘটে জল ভরে নিয়ে আসেন। পরে পুজো হয় মেজঠাকরুণের। ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার পর রাজ-পুরোহিত ক্ষীরকুলতলায় যান। ক্ষীরকুল এক রকমের ফলের গাছ, রাজবাড়ির পিছনেই ক্ষীরকুলতলা। এই ক্ষীরকুলতলায় আগে বিষ্ণুপুরের রাজাদের অভিষেক হত। আজও অভিষেকের স্থানটি বাঁধানো আছে গাছতলায়। জঙ্গলাকীর্ণ ক্ষীরকুলতার দিকে চেয়ে বিষ্ণুপুর রাজবংশের অভিষেক-উৎসবের চিত্রটি আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সাঁওতাল, ধীবর, বাউরী, হাঁড়ি, ডোম ও আদিবাসীদের বাদ্যভান্ডসহ নৃত্য-গীতোৎসবের কথা মনে হয়। এই ক্ষীরকুলতলায় রাজ-পুরোহিত ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার পর যান রাজা-রানীকে দুর্গার পট দেখাতে। একে 'পটদর্শন' বলে। রাজবাড়ির পিছনেই ক্ষীরকুলতলা। ঘরের ভিতর থেকে খোপের ফাক দিয়ে রাজা ও রানী পটদর্শন করেন। তারপর দুর্গাপট নিয়ে রাজ-পুরোহিত বাদ্যভান্ড সহ ক্ষীরকুলতলা থেকে শ্যমকুণ্ড পার হয়ে বিশ্ববৃক্ষতলায় আসেন। বিল্বতলায় বোধন হয়। পরে দুর্গাপটসহ দুর্গামেলায় এসে পট স্থাপন করা হয়। এই দুর্গাপটই হলেন 'ছোটঠাকরুণ। বড়ঠাকরুণ, মেজঠাকরুণ ও ছোটঠাকরুণ এইভাবে দুর্গামেলায় প্রতিষ্ঠিত হন। বড়ঠাকরুণ মহিষমর্দিনী, মেজঠাকরুণ জলভরা ঘট এবং ছোটঠাকরুণ দুর্গাপট। বিষ্ণপুরের ফৌজদার-বংশের শিল্পীরা এই দুর্গাপট আঁকেন।

সপ্তমীর দিন রাজবাড়ীর অন্দর থেকে দশভূজা মূর্তির 'স্বর্ণপট' বাইরে আনা হয়। স্বর্ণপটের এই দশভূজ মূর্তিকে বলা হয় 'পটেশ্বরী'। নবপত্রিকা ও দুর্গাপটসহ পটেশ্বরীকে কৃষ্ণবাঁধের ঘাটে নিয়ে পূজা করা হয়। পরে দুর্গামেলায় নিয়ে এসে প্রথম নিচে মাটিতে রেখে 'পাটে' পুজো হয়। তারপর উপরে তুলে যথারীতি বড়পুজো করা হয়।

মহাষ্টমীর দিন সকালে অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডী বিশালাক্ষী দেবী রাজবাড়ির অন্দর থেকে বেরিয়ে ঘরের মধ্যেই স্নান করেন, বাইরের কোন সায়রে যান না।

তারপর তিনি সিংহাসনে উপবেশন করেন। মহা-স্নানের পর পুজোর আয়োজন করা হয়। পুজোর কিছুক্ষণ আগে রাজপোযাক পরে, তলোয়ার হাতে নিয়ে রাজা

আসেন,- এসে মহাপাত্রের (পুরোহিত) কাছা ধরে দাঁড়ান। মহাপাত্র পুষ্পাঞ্জলি দেন। দু'বার পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হলে রাজা তোপধ্বনি করার হুকুম দেন। বংশানুক্রমে মাদোড়রা তোপ দাগে এবং তার জন্য রাজবৃত্তি পায়। কামানের কাছে তারা তোপ দাগার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। রাজার আদেশ গেলেই তোপ দাগা হয়। সমগ্র মল্লভূমের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত তোপধ্বনির প্রতিধ্বনি শোনা যায় এবং শোনা মাত্রই সর্বত্র মহিষমর্দিনীর মহাষ্টমীর পুজো আরম্ভ হয়। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের দুর্গোৎসবের এটা বংশানুক্রমিক রীতি। রাজৈশ্বর্য ও রাজত্ব আজ কিছুই নেই, তবু রীতিটি রয়েছে। সারা মল্লভুমব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষ আজও মহাষ্টমীর দিন মল্লরাজাদের এই তোপধ্বনির সঙ্কেত শোনবার জন্য কান পেতে উৎসুক হয়ে থাকেন। তোপধ্বনির পর মহাষ্টমী পুজো আরম্ভ হয়, শুধু রাজবাড়িতে নয়, সারা মল্লভূমে। পূর্বে 'তামির' সঙ্কেতে মহাষ্টমী পুজোর তোপধ্বনি করা হত। বড় একটা জলভরা গামলায় তামার কুড়ি ভাসিয়ে দেওয়া হয় এবং তাম্রকুড়িটি নাকি আপনা থেকেই ডুবে যেত জলে। ডোবার মুহূর্তে মহাষ্টমীপূজার শুভক্ষণ সূচিত হত এবং তোপধ্বনি করা হত সঙ্গে সঙ্গে। এখন ঘড়ি দেখে রাজার আদেশে করা হয়।

নবমীর দিন এক বিচিত্র পূজানুষ্ঠানের রীতি আছে বিষ্ণুপুরে। নিশোভোর (রাত বারোটার পর) এক দেবীর পূজা হয়, দেবীর নাম 'খচ্চরবাহিনী' (সিংহবাহিনী নন)। ঘটে ও পক্ষে খচ্চরবাহিনীর পূজা হয় কিন্তু দুর্গার ধ্যানেই পূজা হয়। পূজার পদ্ধতিটি বিচিত্র। ঘটের দিকে পিছন ফিরে বসে পুরোহিত পুজো করেন এবং পুজোর সময় কেবল ছ'জন পুরোহিত ছাড়া আর কেউ থাকেন না। কিংবদন্তী আছে, যিনি পুজো করেন তার বংশে বাতি দিতে আর কেউ থাকে না।

দশমীর দিন সকালে রাজা দুর্গামেলায় আসেন, এসে নিজে হাতে ধরে 'নবপত্রিকা' বিসর্জন দিয়ে আসেন। সন্ধ্যার পর রাজা রাজপোষাক পরে পাল্কী চড়ে ইদতলায় যান। ইন্দ্রপুজা বা ইদপরব যেখানে অনুষ্ঠিত হয়, তাকেই ইদতলা বলে। রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে ইদপরবের খানিকটা সম্পর্ক আছে।

অভিষেক-উৎসবই বলা চলে। ক্ষীরকুলতলায় রাজা ও রানীর নবমীর দিন 'পক্ষ-দর্শন' এবং দশমীর দিন রাজার ইদ্‌তলায় অনুষ্ঠান, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রধানত নবপত্রিকা দিয়ে ইদতলায় একটি তোরণ তৈরি করা হয়। নাম 'সরক-দরজা'। দরজার কাছে অনন্তদেবের পাষাণমূর্তি স্থাপন করা হয়। দরজার একদিকে রাজা দাঁড়ান, অন্যদিকে দাঁড়ান পুরোহিতরা। তারপর রাজা একে-একে দরজা পার করিয়ে

দেন। পারানি মন্ত্রটি হল,

‘এঁড়ে গরু। উখান থালা। তলোয়ার। ডোমদের ঢোল। ঢোল।।’

এপার থেকে রাজা হাতে ধরে দরজা পার করে দেন, ওপার থেকে পুরোহিতরা টেনে নেন। তারপর পাল্কি চড়ে রাজা বিষ্ণুপুর শহরের মধ্যে শাখারিবাজারে ‘বুড়া-ধর্মতলায়’ যান। বুড়াধর্ম বা ‘বৃহদ্ধাক্ষ’ বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ধর্মরাজ ঠাকুর। বুড়োধর্মের স্থান থেকে ঘুরে রাজার বাড়ি ফিরে যাওয়া অর্থহীন নয়। বাড়ি ফিরে গিয়ে ঢাল-তলোয়ার লাঠি নিয়ে রাজা নিজে ফৌজদার ও সেনাপতিদের সঙ্গে খেলা করেন, নৃত্যবাদ্যোৎসব হয়। অতঃপর রাজা তার চৌকিতে এসে বসেন এবং ব্রাহ্মণরা তাঁকে আশীর্বাদ করেন।

রাজবাড়ির বাইরে দশমীর দিন কুম্ভকর্ণ-বধের উৎসব হয়। দশমীর পরদিন হয় ইন্দ্রজিৎ-বধের উৎসব। দ্বাদশীর দিন রাবণ-কাটার উৎসব। বিসদৃশ বাঁদরের সং সেজে বাঁদরনৃত্য নেচে দলে লোকে ভিক্ষা করে বাড়ি বাড়ি। রাজা রঘুনাথের সময় থেকে রায়বাঘিনী গ্রামে একই রকম অনুষ্ঠান চালু হয়।

উল্লেখ্য মল্লরাজের এই তোপধ্বনি শুনে অষ্টমী পূজো শুরু হয় শ্যামসুন্দরপুর, রসপাল, রাইপুর, সিমলাপালের মত ভূমরাজ্য ও অযোধ্যা কুচিয়াকোলের মত জমিদার বাড়ির পূজার। এর থেকে এই সব রাজবংশের মল্লভূমের প্রতি আনুগত্য ও মিত্রতা বোঝা যায়।

## ২) অযোধ্যার বন্দোপাধ্যায় পরিবার ও উৎসবের কথা

বিষ্ণুপুর থেকে বারো কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর পাড়ে অবস্থিত এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম অযোধ্যা। এই গ্রামে ক্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের জমিদারি। এই বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ইতিহাস অতি প্রাচীন। তার সূচনা অষ্টাদশ শতকের সূচনা লগ্নে। আনুমানিক ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে কনৌজ পঞ্চব্রাহ্মণ ভট্টনারায়ণের ৩৩তম উত্তর পুরুষ হরি বন্দ্যোপাধ্যায় ভগ্যান্বেষণে অযোধ্যায় আসেন। শোনা যায় যশোর থেকে এসে গ্রামের প্রচীন বৈষ্ণব গোস্বামী পরিবারের জামাতা সূত্রে অযোধ্যায় বন্দোপাধ্যায় পরিবারের প্রতিষ্ঠা ও ক্রমিক সমৃদ্ধি ঘটে। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের বর্তমান ৪৫তম উত্তর পুরুষ মনোহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা থেকে জানা যায়, হরি বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত পূজার্চনা করে সংসার নির্বাহ করতেন। বিরাট কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তি তাঁর ছিল না। ওই বংশের ৩৭তম উত্তর পুরুষ নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের

চার পুত্র ও এক কন্যা। দ্বিতীয় পুত্র রামমোহন ছিলেন যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমী। তিনি নিজেদের পূজার্চনা পেশায় যুক্ত না থেকে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলেন। হুগলীর শ্রীরামপুরে এক নীলকর সাহেবের অধীনে কাজ পান। সেই কাজে নিজের দক্ষতা এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারায় একসময় নীলকর সাহেবের জমিদারির দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে নীলকর সাহেব কলেরা রোগে অসুস্থ হয়ে পড়লে নিজের আত্মীয়স্বজন তাঁকে ছেড়ে গেলেও রামমোহন তাঁর সেবা শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলেন। এতে তিনি নীলকর সাহেবের আরও আস্থাভাজন হয়ে পড়েন। জানা যায়, নীলকর সাহেব নিজের সম্পত্তির অর্ধেক দিয়ে গিয়েছিলেন রামমোহনকে। বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির করিৎকর্মা সন্তান এই রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অযোধ্যা জমিদারীর পত্তন করেন ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে। ক্রমে তা আভিজাত্য এবং ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ এক জমিদারিতে পরিণত হয়। সেইসব ধনসম্পদ ও প্রভাব কাজে লাগিয়ে তিনি বড় দাদা কৃষ্ণমোহন, অন্য ছোট দুই ভাই লালমোহন এবং গদাধরের সহযোগিতায় আনুমানিক ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে অযোধ্যায় কিছু গ্রামের জমিদারি নেন। ধীরে ধীরে জমিদারির বহর বাড়তে থাকে। একসময় সারা বাঁকুড়া জেলা এবং আশপাশের দু-একটি জেলার ৮৫টি গ্রামে তাঁদের জমিদারি বিস্তার লাভ করেছিল। রামমোহনের দক্ষতা এবং অন্য তিন ভাইয়ের সহযোগিতায় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের জমিদারি যথেষ্ট পরিচিতি ও বিস্তৃতি লাভ করে। জমিদারি কৌলীন্য প্রতিষ্ঠা করতে রামমোহন অযোধ্যার জমিদারিতে দেবোত্তর এস্টেট প্রতিষ্ঠা করেন।

রামমোহনের পর এই জমিদারি সম্প্রসারণে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন অন্য তিন ভাই কৃষ্ণমোহন, লালমোহন ও গদাধরের মধ্যে গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলে অত্যন্ত কুশলী, ঔপনিবেশিক শাসক ও বণিকদের অনুগত ব্যক্তি। তিনি অর্থবান ভূস্বামী বংশের হলেও নীলকর চীক সাহেবের সান্নিধ্যে ও সেবায় নিয়জিত থাকেন আর প্রভুর কল্যাণে ক্রমে প্রভুত ধন সম্পত্তি ও জমি লাভ করেন। এই নীলকর ডাঃ জি এন চীক সাহেবের 'রাধুনী বামুন' থেকে নিজগুণে দেওয়ান পদে উত্তরণ ঘটে গদাধর বন্দোপাধ্যায়ের। এটাও শোনা যায় চীকের নীল কোম্পানীর অর্ধেক মালিকানা পেয়েছিলেন গদাধর। এই অর্জিত সম্পত্তির বিনিময়ে বহু পত্তনি কিনে বড় এক জমিদারির মালিক হন বন্দোপাধ্যায় পরিবার। গদাধর ছিলেন ব্রিটিশের অনুগামী। বিভিন্ন ভাবে তাদের সাহায্য করেছিলেন।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে বাঁকুড়ার শেখওয়াত বাহিনীতে যখন অসন্তোষ

দানা বাঁধছিল, গদাধর দুদিন ধরে নিজ ব্যায়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই সেনা দলকে মাতিয়ে রাখেন ও এই দু'দিনের মধ্যে প্রশাসন রাণীগঞ্জ থেকে অনুগত সেনা এনে এই বিদ্রোহের সম্ভবনা অঙ্কুরে বিনাশ করে। গদাধর নিজের 'প্রভু ও বন্ধু' চীক সাহেবের স্মৃতিতে বাঁকুড়া শহরের বাণিজ্য কেন্দ্র চকবাজারের (চীকের বাজার) পত্তন করেন। ও'ম্যালীর হিসাবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৬ সালে, ১৮৫৬ সালের ২০ নং আইন মোতাবেক। গদাধর নিজ গ্রামে ধর্মীয় স্থাপত্যগুলি গড়ে তোলার পাশাপাশি অতিথি আবাস গড়ে তুলে নিয়মিত অতিথি সেবা, গণ ভোজন, ব্রাহ্মণ সেবার রীতি চালিয়ে যান। একবার পূণ্য অর্জনের জন্য চার জায়গায় ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা করে রেকর্ড লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি সংগ্রহ করেছিলেন। গদাধরের লক্ষ্মী লাভে উৎসাহিত হয়ে আদি জন্মস্থান যশোর-বরিশাল থেকে অনেকে বৈবাহিক ও কাজের সূত্রে অযোধ্যা গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করে। জমিদারি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে এলাকায় বসতি গড়ে ওঠে কুম্ভকারদের। সাহায্যের স্বীকৃতিতে সরকার গদাধরকে ১৮৬০ সালে 'রায়বাহাদুর' খেতাব দেয়।

সূচনা পর্বে যেমন এই পরিবার আইনি বিড়ম্বনায় পড়েছিল, পরবর্তীকালেও তার ছয়াপাত ছিল। নীলকর চীকের পরবর্তী উত্তরসূরী ভাগিনেয় ডেক্সটার সাহেব মাকড়া মৌজার চামটা কুঠিতে গুম খুন হয়ে যান। প্রিয় মনিব চীকের বদান্যতায় তাঁর সম্পদের আট আনা মালিক হয়েছিলেন গদাধরের। বাকি অর্ধাংশের সম্ভাব্য মালিক ডেক্সটার হওয়ায় এই হত্যাকান্ডে গদাধরের উপর স্বাভাবিক ভাবেই শাসকের সন্দেহ গিয়ে পড়ে। প্রমাণ সে ভাবে না হলেও জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ডব্লু এস ওয়েলস সাহেব গদাধরের নামমাত্র প্রতীকী কারাবাসের নির্দেশ দেন। গদাধরের পরবর্তী প্রজন্মের কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আমডাংরা নীলকুঠিতে স্থানীয় উগ্রক্ষত্রিয় প্রজাদের হাতে খুন হয়ে যান। এই গণরোষের অনুসন্ধানে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়। বাঁকুড়া শহরের হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের দুই উত্তরাধিকারী কালীকুমার ও আনন্দকুমার আদালতে অভিযোগ করেন অযোধ্যার জমিদার গদাধর ও অগ্রজ রামমোহন মৌজা নিত্যানন্দপুরের (লাট সাহেব গঞ্জ) রায়তী ৫০৯ বিঘা জঙ্গল ও বাগান জবর দখল করে রেখেছে। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ২৭ আগষ্ট সেসন জাজ পিয়ার্স গেলট এডওয়ার্ড অযোধ্যার জমিদারদের বিপক্ষে রায় দিয়ে বেদখল জায়গাটি মুখোপাধ্যায় পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দেন।

গদাধরের মৃত্যুর পরই এই পরিবারের ভাগ্য রবি অস্তমিত হতে থাকে। ১৮৯৪

খ্রিষ্টাব্দে এদের ৫০০ তৌজির ৫৩৮টি পত্তনি নিলাম হলে কিনে নেন শিয়ারশোলের শ্যামসুন্দর মালিয়া। লাট সেনাপতি মহল কিনে নেন বর্ধমানের উকিল দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। আট দশকেই এই জমিদারি শেষ হয়ে যায়। অবক্ষয়িত এই পরিবারের হাতে দেবসেবার ভার নির্বাহ সম্ভব না হওয়ায় জেলা জজ আছি সদস্য হিসাবে একজন ম্যানেজারের মাধ্যমে এটির দেখভাল করতেন। এই ম্যানেজার হতেন পরিবারের সদস্যদের থেকে নির্বাচিত। গদাধরপুত্র মহেশ ও বেণীমাধব মহাজনী ব্যবসায় নামেন।

প্রায় চার একর জমির ওপর দেবোত্তর এস্টেটে বিভিন্ন স্থাপত্য আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এস্টেটের উভয় দিকের প্রবেশ পথে বিরাট সিংহের মূর্তিখচিত তোরণ বা সিংহদুয়ার, যা এখন অনেকটা ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিম দিকের প্রবেশ পথের ডানদিকে নকশা খচিত আট ফুট উঁচু পিতলের রথ রাখা আছে। প্রতিবছর আষাঢ় মাসে ধুমধাম করে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে ইঁটের তৈরি দক্ষিণমুখী বারোটি একই মাপের সুদৃশ্য শিবমন্দির পাশাপাশি অবস্থিত। মন্দিরগুলিতে দৈনিক নিত্যসেবা হয়। এস্টেটের উত্তর-পূর্ব কোনে রয়েছে অপূর্ব কারুকার্যখচিত গিরি-গোবর্ধন মন্দির। ভিতরে গিরিগোবর্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণ দেওয়ালে প্রোথিত অবস্থায় আছে। মন্দিরের পাশের বোর্ড থেকে জানা যায়, মন্দিরটি ১৮৩৫ সালে নির্মিত হয়েছিল। বছরে একবার কালীপূজার পরদিন এই মন্দিরে পূজা হয়। এস্টেটের উত্তর-পশ্চিম কোনে প্রান্তসীমা থেকে একটু দূরে রয়েছে সতেরো চূড়া সমন্বিত রাসমঞ্চ। বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ ছাড়া এত বড় রাসমঞ্চ আর জেলায় নেই। কার্তিক মাসে রাস পূর্ণিমায় এস্টেটের সকল দেবদেবীকে এই রাসমঞ্চের বাইরের চারদিকে সাজিয়ে তিন দিন ধরে উৎসব পালন করা হয়। এছাড়া পশ্চিম দিকে ছিল জমিদারি দেখাশোনার জন্য অফিসঘর এবং নিরাপত্তাবাহিনী বা লেঠেলদের জন্য আবাস গৃহ। বর্তমানে সেটির ধ্বংসাবশেষ টিকে আছে।

একইভাবে এস্টেটের মাঝে ছিল একটি নাটমন্দির। একসময় সেখানে বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হত। প্রজাদের যাত্রা দেখে ফিরে যাবার সুবিধার্থে ওই নাটমন্দিরে একসময় দিনের বেলায় যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হত। বর্তমানে সেই নাটমন্দিরটিও প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় আছে। প্রাঙ্গণের পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে রয়েছে দোলমঞ্চ এবং ঝুলন মঞ্চ। তারও দক্ষিণে রয়েছে শ্রীরাধা দামোদর এবং বংশীগোপাল জীউয়ের দোতলা মন্দির। প্রতিদিন এখানে ভোগ নিবেদনের জন্য সেবায়েত আছেন।

তার পূর্ব দিকে রয়েছে দুর্গামন্দির সহ বড় দালান। প্রতি বছর মহাসমারোহে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া সকল স্থায়ী দেবদেবীর নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। সেজন্য সেবাইত, বাদক, ফুল সংগ্রাহক-সহ সকল রকমের লোক নিয়োগ করে গিয়েছিল জমিদার পরিবার। এই সকল ব্যয় সংকুলানের জন্য তাঁদেরকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূসম্পত্তি দান করে গিয়েছিলেন। মন্দিরের দেবতার অবস্থান ও গমনের জন্য ৯৮ ভরি ওজনের সোনার সিংহাসন, ৪০ কেজি ওজনের রূপোর পালকি এখনও বিদ্যমান। এছাড়া দেবসেবার জন্য, কলসী, ঘড়া, বাটি, থালা, কোশাকুশি ইত্যাদি সকল আসবাবপত্র রূপোর তৈরি। সারা বছরে রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, দুর্গাপূজা, রাসযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, দোলযাত্রা ইত্যাদি সকল রকম অনুষ্ঠান এই এস্টেটে এখনও অনুষ্ঠিত হয়। অযোধ্যা ছাড়াও কাশী-বারানসীতেও বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের জমিদারি ছিল। এখনও সেখানে জমিদারি মহল রয়েছে এবং বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের এক কুলপুরোহিত সেখানে পূজার্চনা করেন।

অযোধ্যায় প্রাসাদোপম বাড়ির বাইরের প্রাঙ্গনে পর পর গড়ে ওঠে উঠেছিল দ্বাদশ শিবমন্দির, গিরিগোবর্ধন মন্দির, দোলমঞ্চ, ঝুলন মঞ্চ, উৎসব দালান, সতের চূড়া বিশিষ্ট অষ্টকোণাকৃতি রাসমঞ্চ (আনুমানিক ১৮১১ সালে নির্মিত), পিতলের রথ (১৮৬৭ সালে তৈরি), ব্রাহ্মণ ভোজনালয়, সংস্কৃত চর্চা কেন্দ্র।

এইভাবে এই প্রান্তিক জনপদ অযোধ্যা স্থাপত্য ও বিবিধ উৎসবের প্রচলনের মধ্য দিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু কালের নিয়মে এর পৃষ্ঠপোষক বন্দ্যোপাধ্যায়দের জমিদারি চিরস্থায়ী হয়নি। রাজতন্ত্র অবসানের পর এতবড় এলাকা নিয়ে যে রাজবাড়ি তার এখন পরিণতি অত্যন্ত করুণ। সিংহদুয়ার থেকে রাজবাড়ী, সবই আজ ধ্বংসের মুখে। সিংহদুয়ার সংলগ্ন নহবতখানা, পাইক বরকন্দাজদের জন্য নির্দিষ্ট ঘর, বিভিন্ন মহল নিয়ে একসময় জাঁকজমকপূর্ণ ছিল এই অযোধ্যার রাজবাড়ি। তবু তাঁরই মধ্যে দ্বাদশ শিবমন্দির, তাঁদের কুলদেবতা রাধা-দামোদরজীউর মন্দির, দুর্গাদালান, নাটমন্দির, রাসমঞ্চ, ঝুলনমঞ্চ, দোলমঞ্চ এখনো অক্ষত আছে। আর আছে এখানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় গিরিগোবর্ধন মন্দির। অদ্ভুত তার স্থাপত্য। পোড়া ইঁটকে পাথরের আকারে ও বিভিন্ন পাথরের রঙে রঙিন করে এই মন্দির তৈরী হয়েছে। প্রতিটি মন্দিরে নিয়মিত পুজো হয়। বছরে কয়েকটি দিন এখনো ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয়। যেমন দুর্গাপূজার সময়ে এই জমিদার বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা সদস্যরা একত্রিত হয়ে এই পুজোয় অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া রাস উৎসব পালিত

হয় সাড়ম্বরে। সেই সময় তিনদিন যাত্রা পালা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য তার মধ্যে একদিন দিনের বেলা যাত্রাভিনয় হয়। এই রীতি বহু বছর ধরে চলে আসছে নিকটবর্তী গ্রামের মানুষদের তথা প্রজাদের সুবিধার কথা ভেবে। সেসময় যাতায়াতের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কথা ভেবেই এমন সিদ্ধান্ত। এছাড়াও রথযাত্রার ব্যবস্থা আছে। দুর্গাদালান ও তৎসংলগ্ন নাটমন্দিরের পাশে বসতবাড়ির কিছু অংশ এখনো বাসযোগ্য আছে। এই অংশ পূর্বে বাড়ির মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট অন্দরমহল ছিল। সবই আজ অতীত।

রাজবাড়ির বাইরেও আরো প্রাচীন স্থাপত্য আছে এই গ্রামে। তার মধ্যে গোস্বামী বাড়ির জনার্দন মন্দির উল্লেখযোগ্য।

## ৩) সোমসার জমিদার বাড়ির ইতিহাস ও পূজা

চাঁদপাল ঘাট বাঙালীর কাছে অতি পরিচিত নাম। এই ঘাট যার নামে সেই পাল পরিবার আদপে বাঁকুড়া জেলার সোমসার গ্রামের জমিদার ছিলেন। ইতিহাস বলে, তখন বিলিতি বস্ত্রের ব্যবসায় ফুলেফেঁপে উঠেছিলেন পালেরা। বিদেশ থেকে জলপথে বিদেশি বস্ত্র বোঝাই করে পালেদের বজরা এসে ভিড়ত কলকাতার গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে। পালেদের পূর্বপুরুষ চন্দ্রমোহন পালের কলকাতায় বিভিন্ন ব্যবসা ছিল। ব্যবসার বিস্তারে গঙ্গার তীরে তিনি একটি ঘাট তৈরি করেন। আজও কলকাতার সেই ঘাট চাঁদপাল ঘাট নামে পরিচিত। বিলিতি বস্ত্রের ব্যবসার মুনাফায় সেই সময় কলকাতার অভিজাত এলাকাগুলোতে ১০ থেকে ১২টি, বর্ধমানে ২০ থেকে ২২টি ও সোমসার গ্রামে পালেরা তৈরি করে বিশাল বাড়ি। সোমসারেই মোট ৬ টি তালুক কিনে পালেরা শুরু করে জমিদারিও। দামোদর আর শালী নদীর সংযোগ স্থলে ৩০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয় সোমসার রাজবাড়ী। আদি পুরুষ নফরচন্দ্র।

ইন্দাসের সোমসার জমিদারবাড়ির দুর্গা পুজো আড়াইশো বছরের প্রাচীন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পাল বংশের চন্দ্রমোহন পাল দুর্গা পুজোর স্বপ্নাদেশ পেয়ে ২৫০ বছর আগে এই পূজা শুরু করেন। আগের নকশা করা ঠাকুর দালানে বৈষ্ণবমতে পুজো হয়। বলি হয় চালকুমড়ো। একটা সময় জমিদারবাড়ির পুজোয় যাত্রাপালা সহ অন্যান্য অনুষ্ঠান হতো। প্রচুর মানুষজনকে খাওয়ানো হতো। জমিদার বাড়িতে একসময় দুর্গাপুজোর আড়ম্বর ছিল দেখবার মত। নহবত বসত। বিলাতি বস্ত্র এনে জমিদাররা প্রজাদের মধ্যে বিলি করতেন পূজা উপলক্ষে। যাত্রাপালা, রামলীলা,

পুতুল নাচ, কবিগানের আসরে হইহুল্লোড়ে মেতে উঠত হিন্দু-মুসলিম সবাই। অর্থসঙ্কটের কারণে আগের সেই জৌলুসও নেই। তবে পুরানো ঐতিহ্য আজও অটুট।

বাঁকুড়ার সোমসার গ্রামে পাল বংশের বংশের পূর্বপুরুষ চন্দ্রমোহন পাল ব্যবসার সুবিধায় গঙ্গায় ঘাট তৈরি করেছিলেন।[৭৭ক] সেই ঘাটই কলকাতার চাঁদপাল ঘাট। পালেদের ভাঙা দুর্গা দালানে স্মৃতির ধ্বংসস্তূপ। পালেদের সম্পদের খোঁজে ব্রিটিশের হানা দেওয়ার গল্পও প্রচলিত আছে।

পাল বংশের তিন ভাইয়ের মধ্যে দুই ভাইকে সন্নিহিত এলাকার দে বংশের এক জমিদার দত্তক নেন। তারপর পদবী এদিক ওদিক হলেও পাল ও দে বংশের একটাই পুজো অনুষ্ঠিত হয়।

## ৪) সাহারজোড়া জমিদারি

বড়জোড়া থানার সাহারজোড়ার এই প্রাচীন জমিদারির খুব একটা তথ্য পাওয়া যায় না। গ্রামে আর জমিদার পরিবার ও জমিদার বাড়ির কোন অস্তিত্ব নেই। অশোক মিত্র সম্পাদিত 'পশ্চিম বঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা (৪র্থ খন্ড)' গ্রন্থে এই গ্রামটি সম্পর্কে ১০৩-১০৪ পাতায় আছে, "সিং উপাধিধারী ক্ষত্রিয়রা গ্রামের প্রাচীন জমিদার। গ্রামটি গোয়াল ও ছত্রি প্রধান। ইহা ব্যতীত, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, ছুতার, কামার, কুমার, গন্ধবণিক, মালাকার, জেলে, ধোপা, নাপিত, বাগদী, লোহার, ভূঁইয়া, আকুড়ে ডোম এবং মাত্র তিন ঘর বাউরী পরিবারের বসবাস আছে। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, ছত্রিপাড়, কর্মকারপাড়া, মন্ডলপাড়া, মালাকারপাড় প্রভৃতি কয়েকটি পাড়ায় বিভক্ত।'

মদনমোহন মন্দির ও একটি মহামায়া মন্দির এই প্রাচীন রাজবংশের ধর্মীয় পরিচিতির আভাস দেয়। মদনমোহন মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি থেকে বোঝা যায়, ১৬৭৪ সালে হরিনারায়ণ সিংহ নাম্নী জমিদার কর্তৃক এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিংশ শতকের প্রথমেই সম্ভবত এই জমিদারি সাবেক রাজাদের হাত ছাড়া হয়। এই সময় থেকেই আসানসোলের বেলরুই গ্রামের রাধাগোবিন্দ রায় এই তালুকটির মালিকানা লাভ করেন। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মহামায়া ও মদনমোহন মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। ১২ মার্চ, ১৮৪২ এ বাঁকুড়া কালেক্টরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আর পি হ্যারিসনের একটি নিলাম নোটিশে দেখা যাচ্ছে, সাহারজোড়ার রাজা শঙ্করনারায়ণের সিংয়ের বাকি পড়া সরকারী মালগুজারি রাজস্বের কারণে পরগণাটি নিলাম করা হচ্ছে। এই

তালুকে এখনও সিং ও অন্যান্য পদবীধারী ক্ষত্রিয় বসতি আছে। শঙ্করনারায়ণের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রকাশিত একটি নিমন্ত্রণ পত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। রীতি মেনে আমন্ত্রণ পত্রে পিতার নাম না থাকায় সাবেক জমিদার বংশের বংশ তালিকা নির্মাণ আরো কঠিন হয়ে গেছে। দুই জমিদারের (হরিনারায়ণ সিংহ ও শঙ্করনারায়ণ) সময়কালের বিচারে এই প্রাচীন জমিদারি অক্ষত ছিল প্রায় দুই শতাব্দীর বেশি সময়। অথচ এদের ইতিহাস প্রায় অজ্ঞাত! এটি ছিল মল্লরাজাদের অনুগত একটি সামন্ত তালুক। ২৩-১২-১৮৭৩ সালের ১৮৭৩ নং দলিলমূলে জানা যাচ্ছে ১৮৭১ সালের এপ্রিলে (২৫শে চৈত্র) এখানকার জমিদার প্রয়াত ধর্মসিংহবাবুর পুত্র বনোয়ারীলাল অযোধ্যার জমিদার গদাধর পুত্র মহেশ ও বেনীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জমিদারি বন্ধক রেখে ৮০০০ টাকা ধার নিয়েছেন। শতকরা মাসিক আটটি আনা সুদে ১৮৭২-৭৩ সালে সুদ দাঁড়িয়েছিল ৯০০ টাকায়।

এখানে মহামায়া মন্দিরের ইতিহাস নিম্নরূপ। বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া ব্লকের সাহারজোড়া গ্রামে মল্লরাজা প্রতিষ্ঠিত মহামায়ার শিলামূর্তি আজও পূজিতা হয়ে আসছেন। এই গ্রামে অন্য কোনও মূর্তির পুজো নিষিদ্ধ। মহামায়ার এই শিলামূর্তির পুজো শুরুর পিছনে রয়েছে এক জনশ্রুতি। শোনা যায় এক প্রান্তিক চাষী নিজের জমিতে চাষ দেওয়ার সময় লাঙলের ফলায় পেয়েছিলেন একখন্ড শিলা। লাঙলের আঘাতে শিলার কিছুটা অংশ ফেটে গিয়েছিল। তখন ওই কৃষক লক্ষ্য করেন শিলাখন্ডের ফাটা অংশ থেকে চুঁইয়ে পড়ছে তাজা রক্ত। সে রক্ত জমির মাটি ভিজিয়ে দেয়। অলৌকিক এই ঘটনা দেখে ভয় পেয়ে যান কৃষক। তিনি তখন জ্ঞান হারান।

সে খবর পেয়ে তড়িঘড়ি গ্রামবাসীরা মাঠে ছুটে যান। তারপর খবর পৌঁছে যায় রাজার কাছে। বিষ্ণুপুরে তখন মল্লরাজার রাজত্ব। মহারাজা নিজে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। বিষয়টি নিজের চোখে দেখে বিহ্বল হয়ে পড়েন রাজা। শোনা যায় সেদিনই রাজা স্বপ্নাদেশ পান শিলারূপে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করে পুজো করতে হবে। ধার্মিক মল্ল রাজা তখন গ্রামে শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠা করে এর পুজো শুরু করেন। মল্লরাজার হয়ে সাহারজোড়ার সামন্তরাজারা নিষ্ঠাভরে এর পূজা কাজ চালিয়ে যান। সেই থেকেই আদ্যাশক্তি মহামায়ার পুজো চলে আসছে। তবে এই দেবীমূর্তির প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে গ্রামে বন্ধ হয়ে যায় অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তির পুজো। শুধুমাত্র ঘটে পুজোর চল রয়েছে। সাহারজোড়া গ্রামে আজও কোনও দেবদেবীর মূর্তির পুজো হয় না।

সূর্যাস্ত আইনের চক্করে স্থানীয় সিংদের কাছ থেকে জমিদারির দায়িত্ব অনাবাসী

আসানসোলের বেলেরুই জমিদারদের হাতে চলে গেলে, তখন থেকে সমগ্র গ্রামবাসীরাই দেবীর পুজোর দায়িত্ব নেন। সেই পুরনো রীতি-নীতি মেনে আজও সাহারজোড়া গ্রামে ওই শিলাখণ্ডকে মা মহামায়া রূপে পুজো করে আসছে গ্রামবাসীরা। প্রথা মেনে ঠাকুর দালানে আজও ১০৮ টি থালায় ভোগ সাজিয়ে দিতে হয়। মহামায়ার অবস্থানের কারণে এই গ্রামে দুর্গা পূজা হয় ঘট ও পটে। সাবেক মাকড়া পাথরের মন্দিরটি বিনষ্ট হওয়ায় একটি ইটের তৈরি চারচালা মন্দিরে মহামায়া পূজিত হন। নিত্যভোগ ছাড়াও দেবীপক্ষের দশমীর দিন মহা ধুমধাম করে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। হোম, যজ্ঞ, ব্রাহ্মণ ভোজন, বলি এই উৎসবের অঙ্গ ছিল। ১৯৫৫ সালে মহিষ বলির সংবাদ জানা যায়। গ্রামের দেওঘরিয়া পরিবার এটির পূজারী। অদূরে একটি মাকড়া পাথরের ভিত্তিভূমি মহামায়ার সাবেক মন্দিরের অংশ বলে চিহ্নিত করা হয়।

মহামায়া মন্দিরের উত্তরে প্রাচীন মদনমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যে আছে পিতলের মূর্তি, নাড়ুগোপাল ও নারায়ণ শিলা। এটি মাকড়া পাথরের একটি একরত্ন মন্দির ছিল। বহুল সংস্কারের ফলে সেটি বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই মন্দিরে একটি প্রতিষ্ঠালেখ বর্তমান, যা থেকে বোঝা যায় ১৬৭৪ সালে হরিনারায়ণ সিংহ নাম্নী জমিদার কর্তৃক এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তখন মল্লরাজ ছিলেন বীর হাম্বির। এছাড়াও গ্রামের নন্দলাল ও কালাচাঁদ মন্দিরের প্রাচীনত্ব ও পুরাতাত্ত্বিক গুরুত্ব চোখে দেখেও বোঝা যায়। নন্দলাল মন্দিরটি একটি ত্রিখিলান দালান যুক্ত মাকড়া পাথরের দক্ষিণমুখী একরত্ন মন্দির। চূড়াটি ৩০ ফুট উচ্চতার, দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ১৭ ফুটের ত্রিরথ শৈলীর। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দে। কালাচাঁদের ইটের পঞ্চরত্ন মন্দির হিসাবে নির্মিত হলেও চারটি পার্শ্বচূড়া ভূপতিত হওয়ায় এখন এটি একরত্ন মন্দিরের রূপ পরিগ্রহ করেছে। ত্রিখিলান দালান যুক্ত এই মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ২৫ ফুট, দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ১৪ ফুট ৩ ইঞ্চি। টিনের চালার মধ্যে মনসা ও শিবও পূজিত হন।

গ্রামের চারুবালা দেবী ১৯৬৮ সালে সংলগ্ন নাটমন্দিরটির সংস্কার করেন। গ্রামের মাঝে সুউচ্চ প্রাচীরের ঘেরাটোপে মহামায়া ও মদনমোহন মন্দির দুটির অবস্থান। পুরান নহবতখানাটি ভগ্নপ্রায় যা অতীত সময়ে সঙ্গীত মুখর উৎসবের ইঙ্গিত দেয়। আগে কালাচাঁদ মন্দিরে রাস উৎসব পালিত হলেও এখন তা বন্ধ হয়ে গেছে।

## ৫) কোতলপুরের ভদ্র পরিবার ও উৎসব

কোতলপুরের ভদ্র পরিবার লবণ, সরিষা, সুতা, পাথর ইত্যাদি ব্যবসা লব্ধ লাভ থেকে বর্ধমান রাজার কাছ থেকে উপযুক্ত মূল্যে কোতলপুরের পত্তনি লাভ করেন। লোকমুখে প্রচারিত, কোতলপুরের ভদ্র পরিবারের সদস্যরা মনসামঙ্গল-খ্যাত চাঁদ সওদাগরের প্রকৃত উত্তরপুরুষ। মনসামঙ্গল উপাখ্যানে বর্ণিত ব্যবসার মতো সুদূর অতীতে এই ভদ্র পরিবারের লোকজনেরাও সাত সাগর আর তেরো নদীতে ডিঙা ভাসিয়ে ব্যবসা করতে যেতেন দূর দূরান্তে। বর্ধমানের রাজা উদয়চাঁদ মহাতবের কাছে ১৭টি তালুকের পত্তনি কেনেন সদারাম ভদ্র। এটি প্রায় সাড়ে ৩০০ বছর আগের কথা। শুধু দুর্গা পুজো নয় সারা বছর নানান উৎসব পালন করতেন জমিদাররা। জমিদার বাড়ির উঠোনে তৈরি হয়েছিল দুর্গা মণ্ডপ। বিভিন্ন পুজোতে এক সময় গমগম করত জমিদার বাড়ির উঠোন। ১৮৮০ সালের ১০ অক্টোবর কোতুলপুরের এই ভদ্র বাড়ির দুর্গা দালানে সপ্তমীর সন্ধ্যায় আরতি দেখেছিলেন রামকৃষ্ণ। দুর্গা দালানকে ঘিরে রয়েছে সেই স্মৃতিও। আছে এই মর্মে এক স্মৃতিফলক।

মল্লরাজাদের আমলে বণিক ও ঔপনিবেশিক সময়ে তৎকালীন কোতুলপুরের ভদ্র পরিবারের সদস্যরা জমিদার ছিলেন। গৌরহরি ও জগন্নাথ ভদ্রের আগে যৌথ পরিবার থাকলেও তাদের সময় ভদ্র পরিবারটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। দুই পরিবারেই পৃথকভাবে ১৮৭৫ সালে দুর্গাপুজোর প্রচলন হয়। এখানে শিবদুর্গা মূর্তির একত্রে পুজো হয়। কথিত আছে, ১৮৮০ সালের ১০ অক্টোবর সপ্তমীর সকালে কামারপুকুর থেকে বিষ্ণুপুর যাওয়ার পথে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই পরিবারের পুজোয় আরতি দর্শন করেছিলেন। তারপর থেকে ভদ্রবাড়ির দুর্গাপুজোর খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে ভদ্র পরিবার দু'টি ভাগে ভাগ হয়ে যায় (ছোট তরফ ও বড় তরফ)। আগের জৌলুস হারালেও পুজোর রীতি ও আচারের কোনও হেরফের হয়নি আজও। দু'টি পুজোই হয় একই নিয়মে এবং আন্তরিকতায়। নহবতখানা, খাজাঞ্চিখানা, গোবর্ধন মন্দির, রাসমঞ্চ, দুর্গা মণ্ডপ সবই রয়েছে সেখানে। তবে সবই জৌলুস হারিয়ে ফেলেছে। প্রায় ভগ্ন অবস্থাতেই সেগুলি পড়ে রয়েছে। কুলদেবতা হল রাধাদামোদর। গৌরহরি-জগন্নাথরা সদারামের পুত্র।

## ৬) কোতলপুরের দে পরিবার ও বাসন্তী পূজা

কোতলপুরের ভদ্র পরিবারের দুর্গা পূজার মত দে পরিবারের বাসন্তী পূজা অন্যতম বিশিষ্ট উৎসব। এই পূজার ব্যাতিক্রমী রীতি ‘জাগ-প্রদীপ’। পুজোতে জাগ প্রদীপকে জাগিয়ে রাখেন দে পরিবারের সদস্যরা। দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা জাগ প্রদীপ নিভে গেলে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। আর তাই ঘৃত ও তেলের পাথরের প্রদীপকে নিভতে দেন না কোতুলপুরের দে বাড়ির সদস্যরা। বহু প্রাচীন কোতুলপুরের দে বাড়ির বাসন্তী পুজা। প্রাচীন নিয়ম মেনে আজও এই বাড়ির মন্দিরে পুজিতা হন বাসন্তী দেবী।

বাঁকুড়ার কোতুলপুরের দে বাড়ির বাসন্তী পুজোর বয়স প্রায় ২৫০ বছর। পুজো শুরুর পিছনে রয়েছে ইতিহাসও। দে বাড়ির পুর্বপুরুষের আদিবাস ছিল ওড়িশায়। সেখান থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবাদে কোতুলপুরে হাজির হন তাঁরা। কোতুলপুরে শুরু হয় দে পরিবারের গন্ধদ্রব্য ও মশলার ব্যবসা। একদিকে কোতুলপুরে ভদ্র জমিদারদের বিশাল বড় লবণের ব্যবসা, আর অন্যদিকে দে পরিবারের গন্ধদ্রব্যের কারবার।

কোতুলপুর এলাকায় প্রথম দুর্গাপুজো শুরু করেন ভদ্র পরিবার। দে পরিবারও তাদের ব্যবসার সুবাদে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে এলাকায়। আর্থিক বলে বলীয়ান হয়ে বিশাল বিশাল বাড়িও নির্মাণ করে। জমিদারি না থাকলেও দে পরিবারের ফুলেফেঁপে উঠার মূল কারণ ছিল ব্যবসা। আগে কলকাতা থেকে গরুর গাড়ি করে ব্যবসার জিনিসপত্র এনে তা এলাকায় বিক্রি করা হত। ব্যবসার সৌজন্যে আর্থিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল দে পরিবার। তাঁরাও শুরু করেন পুজো-অর্চনা। যেহেতু ভদ্র বাড়িতে দুর্গাপুজো হয়, তাই দে পরিবার দুর্গা পূজার পরিবর্তে শুরু করে বাসন্তী পুজো।

প্রায় ২৫০ বছরের প্রাচীন এই পুজো আজও প্রাচীন নিয়ম মেনে আয়োজন করে চলেছেন দে পরিবারের সদস্যরা। রয়েছে মন্দির, সেখানেই পূজিতা হন দেবী বাসন্তী। প্রতিমা এখানে মাটির। একচালাতেই দুর্গা, শিব, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী বিরাজ করছেন। এখানে পুজো হয় বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে।

এই পুজোতে সপ্তমীর দিনে একটি ঘি ও একটি তেলের প্রদীপ উৎসর্গ করা হয়। সেই প্রদীপ পুজোর কটাদিন নিভতে দেওয়া হয় না। এই দুই প্রদীপকে ‘জাগ প্রদীপ’ বলা হয়। রামনবমীতে বিশেষ পুজো এবং গ্রাম্য দেবী শীতলা মাকে মন্দিরে নিয়ে

এসে পুজোপাঠ করা হয়। দশমীতে সিঁদুর খেলা ও দেবী বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় দে বাড়ির বাসন্তী পুজো। পরিবারের লোকজনও পুজোর কটা দিন যে যেখানেই থাকুক, মাটির টানে তাঁদের প্রাণের পুজোয় ছুটে আসেন কোতুলপুরে। দে বাড়ির এই বাসন্তী পুজোকে কেন্দ্র করে মেতে ওঠে এলাকার মানুষও।

## ৭) ওন্দার দামোদরবাটির চৌধুরি জমিদার

ওন্দার দামোদরবাটী গ্রামের জমিদারি পত্তন হয় মল্লরাজাদের আনুকূল্যে চৌধুরীদের হাত দিয়ে। স্থানীয় জামডোবা মৌজায় ছিল ৪০০ একরের জঙ্গল। পরিবারের পূর্বপুরুষ বদনচন্দ্র চৌধুরী সেই সময় পালকি করে বিভিন্ন মৌজা ঘুরে ঘুরে জমিদারি দেখতেন। একদিন তিনি স্বপ্নাদেশ পান, জামডোবা মৌজায় একটি নিমগাছ রয়েছে। সেই নিমগাছের কাঠ দিয়ে দেবীর মূর্তি বানিয়ে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করে যেন পুজো করা হয়। স্বপ্নাদেশে আরও বলা হয় সেই মূর্তিতে যেন কোনও জোড় না থাকে। অর্থাৎ নিমগাছের একখণ্ড কাঠ থেকেই যেন খোদাই করা হয় গোটা মূর্তিটি। সময়টা তখন ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ। স্বপ্নাদেশ পেয়ে সেই মতো জামডোবা মৌজার নিমগাছের একখণ্ড কাঠ দিয়ে দেবীর মূর্তি বানিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন বদনচন্দ্র চৌধুরী। তাঁর হাত ধরেই পরিবারে সূচনা হয় দুর্গা পুজোর। নিয়ম মেনে যা হয়ে আসছে আজও। নিম কাঠের তৈরি এই প্রতিমার গায়ে রঙের প্রলেপ পড়ে প্রতি ১২ বছর অন্তর।

দামোদরবাটি গ্রামের পুরোনো জমিদার বাড়ির ঠাকুর দালানে উমা-সহ অন্যান্য দেবদেবীর নিত্যসেবা হয় সারবছরই। তবে বিশেষ আয়োজন করা হয় দুর্গা পুজোয়। নিয়ম মেনে পাঁচ দিন পুজো হয় এখানে। দেবীর বোধন হয় পঞ্চমীতে।

মহালয়ার পরের দিন থেকেই জমিদার বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে বেজে উঠে নহবতের সুর। আজও সেই সুর জানান দেয় শুরু হলো চৌধুরী জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজা। অন্য একটি জনশ্রুতি এই যে  পুকুর খননে পাওয়া প্রায় সাড়ে তিনশ বছরের বেশি প্রাচীন নিম কাঠের দ্বিভুজা দুর্গা আজও জমিদার বাড়িতে পুজিতা হন দেবীরূপে। কালের স্রোতে বিলীন হয়েছে জমিদার ও জমিদারী। ভাঙা চুন-সুরকির তৈরি জমিদারদের সুবিশাল ইমারত মনে করিয়ে দেয় চৌধুরী জমিদারদারদের ইতিহাসের ব্যাপকতা। সেই ইতিহাসের এক স্মৃতি জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজো। আজও নিয়ম মেনে চৌধুরী বাড়িতে দেবী আরাধনায় মেতে ওঠেন বর্তমান জমিদার বাড়ির সদস্যরা ও সাধারণ মানুষ।

বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের চৌধুরী জমিদার দামোদর নারায়ণ চৌধুরী-এর নাম অনুসারেই গ্রামের নামকরণ হয় দামোদরবাটি। কথিত আছে চৌধুরী পরিবারের আদি পুরুষ তৈলক্যনাথ গুহ বাংলাদেশের যশোরের জমিদার ছিলেন। বর্গিদের (আদপে মগ বা অন্যকোন উপদ্রব থেকে) হাত থেকে বাঁচতে যশোর ছেড়ে হাজির হয়েছিলেন মল্লগড় বিষ্ণুপুরে। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা পরম যত্নে আশ্রয় দিয়েছিল ওই জমিদারকে। পরবর্তীকালে এদের চৌধুরী উপাধি দেন মল্লরাজারা। মল্লরাজাদের সৌজন্যে দামোদরবাটিতে পত্তন হয় চৌধুরী জমিদারদের জমিদারি। মল্লরাজারা ওই চৌধুরী জমিদারদের প্রচুর জমি জায়গা দান করেন। পরবর্তীকালে দামোদর নারায়ণ চৌধুরীর সময় মল্লরাজাদের সৌজন্যে ফুলে ফেঁপে ওঠে চৌধুরী জমিদারির বহর। মল্লরাজারা ১৩টি মৌজার তালুকদারি অর্পণ করেন চৌধুরী জমিদারদের হাতে। আর্থিক ভাবে চৌধুরী জমিদাররা সমৃদ্ধি লাভ করে। দামোদরবাটিতে শুরু হয় চৌধুরী জমিদারদের বড় বড় বাড়ি তৈরির পর্ব এবং নানান পুজো অর্চনার চল।

শোনা যায় গ্রামের বড়পুকুর খননের সময় নিম কাঠের দুর্গার দ্বিভুজা মূর্তি কুড়িয়ে পান চৌধুরী পরিবারের বংশধর। তারপর থেকেই চৌধুরী পরিবারে শুরু হয় দুর্গাপুজা। পরিবারের দাবি তাঁদের এই পুজো প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের প্রাচীন। জমিদার বাড়ির ভাঙাচোরা বড়ো বড়ো বাড়ি আজও জানান দিচ্ছে তাঁদের ইতিকথা। ভাঙাচোরা, চুন সুরকি খসে পড়া জরাজীর্ণ জমিদার বাড়ির অন্দরে রয়েছে দুর্গাদালান। সেখানেই প্রাচীন নিয়ম মেনে আজও দুর্গাদেবীর আরাধনায় মেতে ওঠেন জমিদার বাড়ির বর্তমান সদস্যরা। আজও জমিদার বাড়ির দুর্গা দালানে বেজে ওঠে নহবতের সুর মুর্ছনা। এখানের প্রতিমা একটু অন্য ধরনের। এখানে নিমকাঠের দেবী দুর্গা দ্বিভুজা। উপরে মহাদেব। দেবীর পাশে কার্তিক, গনেশ, লক্ষ্মী সরস্বতী। মল্লরাজাদের মৃন্ময়ীর কাঠামোর অনুরূপ চৌধুরী জমিদার বাড়ির দুর্গা। বৈষ্ণব মতে পুজো পাঠ, সপ্তমাদি কল্পারম্ভে এখানে দেবীর আরধনা করা হয়। প্রাচীন তালাপাতার চন্ডীপাঠ করা হয় জমিদার বাড়ির দুর্গাদালানে।

গ্রামের অম্বিকাদেবীর পূজা নিয়ে জনশ্রুতি যে এইগ্রামেই বীরহাম্বির ও ধবলভূমের রাজা জগন্নাথ ঢোলের বিবাদের নিরসন ঘটে ও একত্রে অম্বিকাদেবীর পূজা করেন। এই পূজা আজও চালু আছে। শ্যামসুন্দরের মূর্তি সমেত মথুরানন্দ মল্লভূম ছেড়ে ধবলভূমের ব্রজরাজপুরে চলে এলে মল্লরাজ হাম্বিরের সাথে ধবলভূমের রাজার বিরোধ তৈরী হয়েছিল।[৭৮]

## ৮) কুচিয়াকোল রাজবাড়ী ও পূজা

খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি। বিষ্ণুপুর মল্লরাজ পরিবারের এক পুরুষ নিমাই সিংহ দেব তাঁর পরিবার ও বেশ কিছু লোকজন নিয়ে এসে পাকাপাকি বসবাস শুরু করলেন বিষ্ণুপুর থেকে বেশ কিছুটা দূরে জয়পুর জঙ্গল সংলগ্ন কুচিয়াকোলে। কুচিয়াকোলও তখন ঘন জঙ্গল। জঙ্গল কেটে তৈরি হল চাষজমি। তৈরি হল রাজপ্রাসাদ। যা আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। বিশাল চওড়া লাল রঙের দেওয়াল পড়ে রয়েছে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে। রাজপ্রাসাদ তৈরির সঙ্গে গড়া হয়েছিল ঠাকুরদালানও। সেই ঠাকুরদালান অবশ্য আজও অটুট। এই ঠাকুরদালানে প্রায় চারশো বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে হয়ে চলেছে কুচিয়াকোলের মল্লরাজবাড়ির দুর্গাপুজো।[৭৯]

এই বাড়িতে কোনও দুর্গামূর্তির পুজো হয় না। পুজো হয় পটে আঁকা দুর্গার। ঠাকুরদালানের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পটদুর্গাকে রাখা হয়। বিষ্ণুপুর মল্লরাজবাড়ির মতো তিনটি পটদুর্গার পুজো হয় না। আয়তাকার পটদুর্গাটি প্রায় চার ফুট উচ্চতার ও প্রস্থে প্রায় তিন ফুট। অসাধারণ সুন্দর এই দুর্গাপটটি। অসুরদলনী দশভুজা মা দুর্গা লাল রঙের শাড়ি পরিহিতা। মাথার মুকুট থেকে শুরু করে হাতের গহনা ও অস্ত্র সবই আঁকা। মায়ের একদিকে লক্ষ্মী, গণেশ ও আরেকদিকে সরস্বতী, কার্তিক ওপর-নিচে করে রয়েছেন। মায়ের মাথার ওপর রয়েছেন মহাদেব, নন্দীভৃঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে। বিষ্ণুপুরের ফৌজদার পরিবার বংশপরম্পরায় বিষ্ণুপুর মল্লরাজবাড়ির সঙ্গে কুচিয়াকোলের মল্লরাজবাড়ির দুর্গাপট এঁকে চলেছেন। বিষ্ণুপুরের শাঁখারি বাজারের এই ফৌজদার পরিবারই বিষ্ণুপুর মল্লরাজাদের বিখ্যাত দশ-অবতারের তাসখেলার তাস তৈরি করেন।

দেবীপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে বেলতলায় গন্ধঅধিবাসের মধ্য দিয়ে এই বাড়ির পুজো শুরু হয়। সপ্তমীর সকালে কাপড়ের দোলায় নবপত্রিকাকে তেলিবাঁধে স্নানে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে নবপত্রিকা পুজোর সময় তোপধ্বনি করা হয়। সেখানে অন্নভোগ দেওয়া হয়। তারপর ঢোল বাজিয়ে নবপত্রিকাকে নিয়ে আসা হয় ঠাকুরদালানে। রাখা হয় দুর্গাপটের পাশে। পুজোয় এ বাড়িতে ঢাক বাজে না, বদলে ঢোল বাজানো হয়।

একসময় বাঁকুড়া জেলার এই জয়পুর জঙ্গল ছিল কুচিয়াকোল মল্লরাজ পরিবারের অধীন। চাষের আয় ছাড়াও জঙ্গলের সম্পদ ছিল জমিদারির আয়ের মূল উৎস। ১৭৮৬ সালের একটি কোম্পানী নথিতে দেখা যায় ৪০ টি বন-গ্রামে মোট খাজনা

আদায় ছিল বছরে ৪০০০ টাকা। আজ রাজত্ব নেই, রাজাও নেই, তবুও চারশো বছর ধরে চলা গ্রামের মানুষের দেওয়া পুজোর উপকরণে মা দুর্গার পুজো আজও হয়ে চলেছে। যেমন, পুজোর পদ্ম আজও আসে মাঝি পরিবার থেকে, পুজোর ফুল মালাকার পরিবার থেকে, বিনিময় তাদের কিছু পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। আর পুজোর পুরোহিত, তোপদ্বার থেকে শুরু করে পরিচারিকা পর্যন্ত চলছে বংশ পরম্পরায়। জমিদারির স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে মায়ের পাশে একটা তরবারি রাখা থাকে আর থাকে ছোট একটা কামান। অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে সেই কামান থেকে আজও তোপধ্বনি করা হয়। সারা গ্রাম জানতে পারে রাজবাড়িতে শুরু হয়েছে সন্ধিক্ষণের পুজো। তবে এই কামান দাগা হয় বিষ্ণুপুর মল্লরাজবাড়ির তোপধ্বনির পর। মায়ের পাশে তরবারি থাকলেও এখানে পুজোয় কোনও বলি হয় না। পুজো হয় সম্পূর্ণ বৈষ্ণব মতে। মল্লরাজ পরিবার বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর উপাধি নেন সিংহদেব, পরে হয় সিংহঠাকুর।

## ৯) হদলনারায়ণপুরের মন্ডল পরিবারের পত্তন ও দুর্গাপূজার বিশেষত্ব

বর্ধমানের নীলপুর থেকে মুচিরাম ঘোষ নামে এক ব্যক্তি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ভাগ্য অন্বেষণে (অনেকে বলেন তিনি বর্ধমান রাজার দেওয়ান ছিলেন, যদিও এনিয়ে তথ্যের প্রয়োজন। তিনি ছিলেন খ্যাতনামা কালীচরণ ঘোষের বংশধর।)। রাজ্যের নানা প্রান্ত ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে তিনি ঠাঁই নিয়েছিলেন বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার হদল-নারায়ণপুরে। এখানকার মনোরম পরিবেশ এবং নদীমাতৃক গ্রাম দেখে মুগ্ধ মুচিরাম মনস্থির করেন এখানেই তিনি বসবাস করবেন।

দীর্ঘদিন বসবাস করার পরে পাশের গ্রাম রামপুরের গণিত আচার্য জগন্নাথ চৌধুরীর সাথে বন্ধুত্ব হয়। যিনি মল্ল রাজাদের দেওয়া উপাধি 'শুভঙ্কর রায়' নামেই সর্বত্র পরিচিত হতেন। তিনি ছিলেন রাজা গোপাল সিংহের মন্ত্রীও। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ার পর একদিন শুভঙ্কর রায় মুচিরাম ঘোষকে নিয়ে যান বিষ্ণুপুরের তৎকালীন মল্লরাজা গোপালদেব সিংহঠাকুরের কাছে। রাজামশাই মুচিরামের কাজের মধ্যে সততা ও সাহসিকতা দেখে মুগ্ধ হন এবং তাঁর হাতে পাত্রসায়ের এর পারুলিয়া পরগনা নামক একটি জমিদারির দায়িত্বভার তুলে দেন। তার পাশাপাশি মুচিরাম ঘোষকে মল্লরাজা 'মণ্ডল' উপাধিও দেন। আর এরপরই মণ্ডল জমিদারির পত্তন হয়। এদের কুলদেবতা ছিল দামোদর জীউ।

পরবর্তীকালে নীলচাষেও এই পরিবার সমৃদ্ধি লাভ করে। এই উর্বর এলাকায় ব্রিটিশরা নীল চাষ শুরু করলে মন্ডল জমিদার পরিবারও তার শরিক হন। তার জেরে ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গেও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এই মণ্ডল জমিদারদের। আরও পরে ব্রিটিশদের কাছ থেকে ওই এলাকার মোট সাতটি নীলকুঠি ইজারা নিয়ে নেয় মণ্ডলরা।

জমিদারি পত্তনের কয়েক পুরুষ পর থেকেই এই জমিদার বাড়িতে সূচনা হয় দুর্গাপুজোর। জানা যায়, শ্রীরামপুরের কাছে মণ্ডল পরিবারের সপ্তম পুরুষ জমিদার বেচারাম মণ্ডল ডাকাতদের কবলে পড়েন। বাধ্য হয়ে করতে হয় আত্মসমর্পণও। তাঁকে উদ্ধার করেন দুই লাঠিয়াল। জমিদারের বিশ্বাস মায়ের আশীর্বাদেই এটা সম্ভব হয়েছিল। উদ্ধার হওয়ার পর বাড়ি ফিরে আরও ধুমধাম করে দুর্গাপুজোর আয়োজন করেন তিনি। ওই দুই লাঠিয়াল দামু, কামুর মূর্তি মণ্ডল বাড়ির প্রবেশ দ্বারের দুই পাশে প্রতিষ্ঠিত। সেই পুরনো রীতি নীতি মেনে আজও জমিদার মণ্ডল বাড়িতে হয়ে আসছে দুর্গাপুজো। পূজার সূচনা নিয়ে আরেকটি জনশ্রুতিও আছে। সেই সময় বোদাই নদীতে নীল বোঝাই করা বজরা ভাসিয়ে দূরদূরান্তে রপ্তানি করত মণ্ডলরা। নীল বিক্রি করে প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে বজরায় করে গ্রামে ফেরার সময় ঘটে বিপত্তি। কোনও এক জায়গায় জলদস্যুর কবলে পড়েছিলেন মণ্ডল বাড়ির কোনও এক পূর্বপুরুষ। জলদস্যুদের হাত থেকে বেঁচে ফিরলে বজরায় থাকা যাবতীয় সম্পত্তি দুর্গার নামে দেবোত্তর করে দেওয়ার মানত করেন তিনি। পরে জলদস্যুর হাত থেকে উদ্ধার হয়ে নিরাপদে ফিরে এলে ওই বজরায় থাকা সমস্ত ধনসম্পত্তি দিয়ে বিশাল দুর্গা দালান, রাসমঞ্চ মন্দির, রথ মন্দির, নাট মন্দির, নহবত খানা তৈরি করেন সেই মণ্ডল জমিদার। বংশ পরম্পরায় পুজো চালিয়ে যাওয়ার জন্য বহু জমি ও পুকুর কিনে সেগুলি দুর্গার নামে দেবোত্তর করে দেন। একদিকে নীলকুঠির বিপুল আয়, অন্যদিকে বিশাল জমিদারিতে ফুলেফেঁপে ওঠে কোষাগার। তার প্রভাব পড়ে দুর্গাপূজাতেও। সেই সময় পুজোতে সাতদিন ধরে নহবতখানায় বসত নহবত।

বাড়ির সিংহদুয়ার পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেই নজর কাড়বে টেরাকোটার অপূর্ব সুন্দর রাসমঞ্চ, রথ, কালীমন্দির ও বৈঠকখানা। তারপরেই রয়েছে দুর্গামন্দির, আটচালা ও নাটমন্দির। পাত্রসায়েরের হদলনারায়ণপুর জমিদার বাড়ির দুর্গা পুজো প্রায় ৩০০ বছরের প্রাচীন। পুজোয় দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জমিদার বাড়ির আত্মীয়দের আগমন ঘটে।

হদল-নারায়ণপুরের স্থাপত্যের মধ্যে মন্ডল পরিবারের বসতবাড়ি, রাসমঞ্চ এবং তাঁদের নির্মিত তিনটি টেরাকোটা মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাবেক মন্ডল জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা মুচিরামের প্রপৌত্রের আমলে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। স্থানীয় ভাবে বড় তরফ, মেজো তরফ ও ছোত তরফ হিসাবে এই তিনটি শাখা পরিচিতি পেয়েছে। এই তিনটি পরিবারই মন্দির স্থাপত্যের ক্ষেত্রে নতুনত্বের সাক্ষর রেখেছে।

বড় তরফ রাজবাড়িতে আছে রাসমঞ্চ, নাটমন্দির, আটচালা, রথতলা আর বিশাল জমিদার বাড়ি। চারশো বছরের পুরোনো হলেও মনে হবে নতুন সৃষ্টি। এই প্রাসাদোপম দোতলা অট্টালিকাটিকেও পুরাকীর্তি বলা চলে। এই জাতীয় সাত মহলা বসতবাড়ি পশ্চিম বাংলার গ্রামে বিরল। এই বসতবাটির বাইরের প্রাঙ্গনে একটি সতেরো চূড়া বিশিষ্ট, আটকোনা, দ্বিতল রাসমঞ্চ দেখতে পাওয়া যায়। এটির উচ্চতা ৪০ ফুট এবং ভিত্তি বরাবর প্রতি দিকের দৈর্ঘ্য ৮ ফুট ৩ ইঞ্চি। এটির দেওয়াল গাত্রের ভাস্কর্যের মধ্যে অনন্তশয়নে বিষ্ণু, পুত্রকন্যা সহ মহিষমর্দিনী দুর্গা, শিব বিবাহ,কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা, গজলক্ষ্মী, রামসীতা এবং কৃষ্ণরাধিকা উল্লেখযোগ্য। এই বসতবাটির ভিতরে উঠানের মাঝে রাধা দামোদরের ত্রিখিলান দালানসহ দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দির রয়েছে। এই মন্দিরের গায়ে স্থাপত্য ভাস্কর্য সাধারণ মানের। তবে এটি হদল-নারায়ণপুরের একমাত্র মন্দির যার গাত্রে প্রতিষ্ঠালিপি রয়েছে। সেখান থেকে জানা যায় যে এই মন্দির ১৭২৮ শকাব্দে (১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে) নির্মিত হয়েছিল।

এই গ্রামের উত্তর দিকে মন্ডল পরিবারের মেজ তরফের পুবমুখী রাধাদামোদরের নবরত্ন মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরের পূর্ব ও উত্তর দিকে ত্রিখিলান দালান রয়েছে। এই মন্দিরের দেওয়ালে যে টেরাকোটা অলংকরণ রয়েছে, তা বাঁকুড়া জেলার শ্রেষ্ঠ দেবালয়গুলির সমকক্ষ ধরা যেতে পারে। এই অলংকরণদের মধ্যে পূর্ব দিকের খিলানে লঙ্কা যুদ্ধ, অনন্তশায়ী বিষ্ণু, কৃষ্ণের চূড়াবাঁধা ও ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ উল্লেখযোগ্য।

ছোট তরফের রাজবাড়িতে আছে নাটমন্দির, দুর্গা-কালী মন্দির এবং খুব সুন্দর দামোদর মন্দির। এর পিছনেই আছে ছোট কালী মন্দির ও শিব মন্দির। আবাসগৃহের প্রাঙ্গনে দক্ষিণমুখী নবরত্ন মন্দিরটির আদল কতকটা গীর্জার মতন। এই মন্দিরের সামনের দিকে ত্রিখিলান যুক্ত দালান রয়েছে। এছাড়া পশ্চিম দিকে দেওয়াল ঘেঁষে উপরে যাওয়ার সিঁড়ি চোখে পড়ে। এই মন্দিরের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের দেওয়ালে উচ্চ শ্রেণীর টেরাকোটা অলংকরণের কাজ রয়েছে। কেন্দ্রীয় খিলানের শীর্ষে অর্জুনের

মৎসচক্ষু লক্ষ্যভেদের বড় প্যানেলটি নি:সন্দেহে অভিনব। মন্ডল পরিবারের সূত্রে জানা যায় যে প্রায় ২০০ বছর আগে বাবুরাম মন্ডল তার নাবালক পুত্র গঙ্গাগোবিন্দের নামে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

জনহিতকর কাজের নমুনা হিসাবে মন্ডল জমিদারদের আনুকুল্যে নারায়ণপুর গ্রামে অবস্থিত হদল-নারায়ণপুর আপার প্রাইমারি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলটি ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণ পাঠাগার, পোষ্ট অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড অফিস জমিদার প্রাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭৭০ সালে সীতারাম মন্ডল নারায়ণ শিলা দামোদর জীউ নামে প্রতিষ্ঠা করে গ্রামে দুর্গা পূজার সূচনা করেন। উত্তরসূরী গঙ্গাগোবিন্দ মন্ডলের সময়ে দুর্গা মন্ডপের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। সপ্তমীর দিন বোদাই নদীতে নবপত্রিকা স্নান করিয়ে দেবী পূজা শুরু হয়। একচালার দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন হয় অদ্ভুত ভাবে। জলে না দিয়ে মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা হয়। তিন দিন নিরামিষ খাবার পর দশমীর দিনে পূজার পর ছাই মাখা চ্যাঙ মাছ বলি করা হয় ও তার পর সবাই মাছ মুখে দেয়।

১৮৫৩ সালে ভৈরবনাথ মন্ডল রাসমঞ্চ নির্মাণ করেন। ১৪০০০ টাকা ব্যয়ে ২২ জন মিস্ত্রি আড়াই বছর ধরে সূক্ষ্ম টেরাকোটার কাজ সহ ৭০ ফুট উঁচু এই রাস মঞ্চ গড়ে তোলে। সদর দালানে রাসমঞ্চ ছাড়াও আছে বৃহৎ পেতলের রথ, কালী মন্দির। বড় বড় থামওয়ালা কড়ি বর্গার ছাদের নাট মন্দির, দুর্গা দালান সহ দালান বাড়ির কাজ শেষ হয়েছিল ১৮০৬ সালে। বেলজিয়াম কাঁচের ঝাড়, লাল মেঝে জমিদারির সবেকিয়ানার সাক্ষ্য দেয়। পাশে আছে সার দেওয়া অতিথি ভবন। একসময় সাধুসন্তের আশ্রয় স্থল। নির্মাণ করেছিলেন দেবনারায়ণ মন্ডল। রাসবিহারি মন্ডলের হাতে ১৯১০ সালে একটি বিষ্ণুমন্দির ও দুটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। খিড়কি ও সদরের দিকে খনন করা পুকুর হয়েছিল ন'বাবু অনুপম মন্ডলের দ্বারা, যা ন'বাবুর পুকুর নামে খ্যাত।

এই ভাবে বিভিন্ন সময়ে জমিদার পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের দ্বারা বিভিন্ন কীর্তি গড়ে উঠেছে।

হদলনারায়ণপুরে ব্রাহ্মণী মূর্তি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এক চমকপ্রদ ঘটনা। প্রাচীনত্ব থেকে বোঝা যায় এর প্রতিষ্ঠা সম্ভবত মন্ডল জমিদারি প্রতিষ্ঠার পূর্বেই। হদলনারায়ণপুর গ্রামে ঢোকবার মুখেই একটি দালান মন্দির চোখে পড়বে। গ্রামে এটি ব্রহ্মাণী দেবীর মন্দির বলে পরিচিত। কষ্ঠিপাথরের এই অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তিটির

উচ্চতা ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি ও প্রস্থ ২ ফিট ১১ ইঞ্চি। তবে এই মূর্তিটির পায়ে, দুই পাশে এবং পিছনের খিলানে সবশুদ্ধ পাঁচটি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের অনুকৃতি থেকে একে 'পঞ্চকুন্ডা অগ্নিমধ্যস্থা' পার্বতী বলে অনুমান করা যেতে পারে।

এই দেবীর ইতিহাস বেশ চিত্তাকর্ষক। গ্রামের লোককথা অনুসারে কোন এক 'মুড়োকাটা' চক্রবর্তী এই অঞ্চলের গাছের মুড়ো কেটে এখানে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর বিধবা মেয়ে স্বপ্নাদেশ পেয়ে দামোদরের এক গভীর দহ থেকে এই মূর্তি উদ্ধার করেন।

এই লোককথার ভিন্নমত আছে। অন্য মতটি হল রানী ময়রা নামক এক তাম্বুলি মহিলা স্বপ্নাদেশ পান। তার কথা শুনে গ্রামের লোকজন দামোদরের পাশে গভীর কাদার ভিতর থেকে মূর্তিটি উদ্ধার করে ব্রহ্মাণী দেবী হিসাবে গ্রামে প্রতিষ্ঠা করে।

## ১০) মেজিয়া বণিক পাল পরিবার ও পূজা

বাঁকুড়ার মেজিয়ার ভূস্বামী-ধনবান পাল পরিবারের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন হুগলির চন্দননগরের বাসিন্দা। তাঁরা সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ের। বহু আগে সেই পরিবারের পূর্বপুরুষরা দামোদর নদ দিয়ে নৌকাপথে বাণিজ্য করতে আসতেন বর্তমান রানিগঞ্জ, মেজিয়া এলাকায়। তেমনই এক বার বাণিজ্য করতে এসেই বর্গি আক্রমণের মুখে পড়েন তাঁরা। বর্গি আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাতে তারা আত্মগোপন করেছিলেন বাঁকুড়া জেলার মেজিয়ায়। শোনা যায়, তার পর থেকেই এখানে বসবাস শুরু করেন পাল পরিবার।

পরিবারের দুর্গাপুজোর ইতিহাস প্রায় আড়াইশো বছরের। কোনও এক সময় পূর্বপুরুষ গোবিন্দ পাল এই পুজোর সূচনা করেছিলেন বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। এই সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের পরিবারের আর্থিক উপার্জন একটা সময়ে বেশ ভালোই ছিল। গালার কারবার ছিল পাল পরিবারের। ছিল বেশ কিছু দেবোত্তর সম্পত্তিও। আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে তখন পুজো হত বেশ ধুমধাম করেই। পুজোর দিনগুলিতে বসত নহবতের আসর। এখন আর সেই আড়ম্বর নেই। তবে পুজোর পরম্পরা ধরে রেখেছেন পরিবারের সদস্যরা। পুরানো রীতি রেওয়াজ মেনে আজও পাল পরিবারের ঠাকুরদালানে প্রতি বছর উমার আরাধনা হয়। পূর্বপুরুষদের দেখানো আচার নিয়ম মেনে পুজো হয় বৈষ্ণব মতে। আত্মীয়, পরিজন, বন্ধুবান্ধব মিলে উৎসবে মেতে ওঠেন প্রত্যেকে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পুজোর দিনগুলি আনন্দে

মেতে ওঠেন স্থানীয় বাসিন্দারাও।

পাল পরিবারের বিশ্বাস, মা দুর্গা সারা বছরই মন্দির চত্বরে খেলে বেরান। মায়ের দুরন্তপনা আটকাতেই পুজোর দিনগুলিতে শিকল বেঁধে রাখতেন পূর্বপুরুষেরা। সেই রীতি মেনে ২৫০ বছর পরে আজও মন্দিরের দেওয়ালের আংটায় শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয় মায়ের আসনের কাঠের পাটাতনটি।

## ১১) জয়পুর রাজগ্রাম ও রাহা পরিবার

জয়পুর থানার রাহা পরিবার ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা থেকেই ক্রমে সমৃদ্ধি অর্জন করতে শুরু করে। সেই সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দেয় গ্রামের বিভিন্ন স্থাপত্য। ইতিহাসের নিরিখে গুরুত্ব রয়েছে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত দিকপাড় গ্রামের সপ্তরথ সদাশিবের দেউলটি। তৈরি হয়েছে ঝামা পাথরে। জয়পুর থেকে কোতুলপুর যাওয়ার পথে রাজগ্রাম। সেখানকার দামোদর ও গিরিগোবর্ধন মন্দির দু'টিও ইট ও মাকড়া পাথর দিয়ে তৈরি, টেরাকোটা অলংকরণে সমৃদ্ধ। আছে ১৭ চূড়া বিশিষ্ট একটি রাসমঞ্চও। এলাকার বর্ধিষ্ণু রাহা পরিবার যার স্রষ্টা।

## ১২) পাত্রসায়েরের হাজরা পরিবার ও পালা-পার্বণ

ঢাকা থেকে আগত বিষ্ণুপুরের সামরিক কর্মচারী হাজরা পরিবার পত্তনিদার হিসাবে পাত্রসায়েরে প্রতিষ্ঠা পায়। চোদ্দ হাজার বিঘার পত্তনির মালিক ছিলেন এই পরিবার। ইতিহাসের সূত্র থেকে জানা যায়, এক সময় বর্ধমান রাজার সঙ্গে বিষ্ণুপুর মল্লরাজার সীমানা অতিক্রম করে খাজনা আদায় করা নিয়ে প্রায়ই সংঘর্ষ লেগে থাকত। আর পাত্রসায়ের ছিল বিষ্ণুপুর এবং বর্ধমান রাজ্য সীমানার একেবারে শেষ অংশ। এই অংশে মূলত সামরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমর-বিশারদ ভূস্বামীর প্রয়োজন ছিল (নিরাপত্তা রক্ষার বিনিময়ে সেবাজমি বা জমিদারি)। সে কারণেই তৎকালীন অবিভক্ত বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার কাঞ্জিলাল চক্রবর্তীকে মল্লরাজ সেনাধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত করেন। পাত্রসায়ের এলাকার প্রায় কয়েকশো বছর আগে হাজার একর জমি নিয়ে তাদের জমিদারির পত্তন হয়। আর এই হাজার একর জমির মালিকানা পাওয়ার কারণে চক্রবর্তী থেকে তাদের পদবী পরিবর্তিত হয়ে 'হাজরা' হয়ে যায়।

আরেকটি তথ্যে জানা যায়, চৈতন্য সিংহের সময়ে বিক্রমপুর থেকে নন্দরাম,

সাহেবরাম, গিরিধর, হরিশ্চন্দ্র নামে চার ভাই মল্লভূমে এসে বিভিন্ন পদে আসীন হন। নন্দরাম ১০০০ সেনার সেনাধ্যক্ষ হওয়ার কারণে চক্রবর্তী পদবীর পরিবর্তে রাজদত্ত 'হাজারী' পদবী ব্যবহার করতে থাকে। এরা পাত্রসায়েরে প্রচুর জমিজমা কিনে বসতি স্থাপন করেন।

বংশের আদি পুরুষ কাঞ্জিলালের ছিল চার সন্তান। এদের মধ্যে এক মাত্র বড় ছেলে ছিলেন চার সন্তানের পিতা। তবে অন্য তিন ছেলেরা নিঃসন্তান ছিলেন। বংশানুক্রমে জমিদারি কিভাবে চলবে এই নিয়ে সেনাধ্যক্ষ কাঞ্জিলাল শোকহত ছিলেন। কাঞ্জিলালের বড় ছেলের তৃতীয় সন্তান হরিপদ ঘোড়ায় চড়ে একদিন খাজনা আদায় করতে গিয়েছিলেন। সে কাজ সেরে তৎকালীন জঙ্গলাকীর্ন রাস্তায় ফিরে আসার সময় তিনি দিক ভ্রষ্ট হয়ে পথ হারিয়ে ফেলেন। তিনি স্থানীয় রঙ্কিনী পুষ্করিণীর জল পান করে একটি গাছের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেই সময় মা দুর্গা বালিকা রূপে রঙ্কিনী পুষ্করিণী থেকে উঠে এসে তাকে পথ দেখিয়ে দেন। এরপর এই অলৌকিক ঘটনার কথা জানিয়ে মেজো ছেলে হরিপদ বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাকে একটি চিঠি লেখেন। সেই থেকেই বিষ্ণুপুর রাজের অর্থানুকূল্যে শুরু হয় মা মহামায়া পুজো। প্রতিষ্ঠা হয় মন্দিরের। কথিত আছে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিষ্ণুপুরের তদানীন্তন মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পাত্রসায়েরের রাজবাড়িতে দুর্গাপুজোর সূচনা হয়েছিল। এই পুজোর সূচনা নিয়ে অন্য এক জনশ্রুতি যে হাজরা পরিবারের আদিপুরুষ নন্দরাম হাজরা খাজনা আদায়ে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে দেবী মূর্তির দর্শন পান। রাতে দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে শালগ্রাম শিলা এনে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে মন্দিরে একচালার দেবীমূর্তির পুজো শুরু হয়।

তখন থেকেই সেই সাড়ে চারশো বছর ধরেই রীতিনীতি মেনে হয়ে আসছে হাজরাবাড়ী মা দুর্গার আরাধনা। জমিদার বাড়ির পুজোর রীতিনীতি অন্যান্য সর্বজনীন পূজা থেকে কিছুটা আলাদা। এই জমিদার বাড়িতে একচালা মন্দিরে মহিষমর্দিনী দেবীর প্রতিমা হয়। এখানে পুজো হয় বৃহৎনন্দিকা পুরাণ মতে। নিয়ম-নীতি মেনে আদিকাল থেকেই অষ্টমীর দিন হয় বলির আয়োজন। পাত্রসায়েরের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের কাছে হাজরা পরিবার অভিজাত পরিবারের মর্যাদা পান। জমিদারি চলে গেলেও মর্যাদা আজও অটুট। হাজরাবাড়ির দুর্গাপুজোর আলাদা একটা গরিমা রয়েছে। নবমীর সকালে বিশেষ আকর্ষণ রাজবলি। এই পুজোয় নবমীর সকালে প্রথম রাজমানত হিসাবে মহিষ বলি হয়। গ্রামেরই পুরোহিত এই বলি দেন। অনেক পাঁঠাও

বলি হয়। বহুদিন থেকেই এই প্রথা চালু রয়েছে। নবমীর সকালে এই পরিবারের দুর্গামন্দির প্রাঙ্গনে রাজবলি সবচেয়ে বিখ্যাত। কমবেশি একশোটি ছাগল বলির পাশাপাশি একজোড়া মহিষ বলি হয়। হাজরাবাড়ির দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গনে প্রথম বলি হওয়ার পরে রাজবলি বা রাজার বলি বাজনা সহযোগে পাত্রসায়েরে গ্রাম পরিক্রমায় বের হয়।

এই পরিবারের তখনকার প্রতিপত্তি বোঝা যায় ডুমনিগড়ে নিষ্কর জমি দিয়ে এক রাজপুত সমরকর্মীকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে। সম্ভবত মল্লরাজের দেওয়া সামরিক কর্তব্য পালন করতে তিনি রাজপুতদের জমিদারি এলাকায় প্রতিষ্ঠা করেন। এই মৌজায় বিহার থেকে আগত (আদি বাস রাজস্থান) পাত্রসায়েরের হাজরা জমিদারদের রাজপুত প্রহরী হিসাবে তারা নিষ্কর ভূমি লাভ করে বসতি স্থাপন করে। চৈতন্য সিংহের সময়কালে আগত সেই আদি পুরুষ ছিলেন গোবিন্দ সিং। তার পরবর্তী পুরুষরা হলেন ভবতারণ, উমাপদ, গৌরীপদ, প্রবীর।

এই ভাবে স্থানিক বৃত্তে পাত্রসায়েরের হাজরা পরিবার গরিমার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

## ১৩) বেলিয়াতোড়ের রায় জমিদার ও পূজাপার্বণ

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথির আবিষ্কারক হিসাবে বসন্তরঞ্জনের নাম ও বিখ্যাত চিত্রকর যামিনী রায় সারা দেশে পরিচিত নাম। এদের জমিদারি ছিল বড়জোড়া থানার বেলিয়াতোড়ে। বাঁকুড়ার এক গ্রামে গোয়ালঘর থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথি আবিষ্কার করেছিলেন বসন্তরঞ্জন রায়। শিল্পী যামিনী রায় তাঁরই খুড়তুতো ভাই।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথির আবিষ্কার বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের কৃষ্ণপ্রেম ও টেরাকোটার মন্দিরের শিল্পকলার খ্যাতি তত দিনে ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বিশ্ব জুড়ে। দেশ-বিদেশের পর্যটকেরা ছুটে আসছেন মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরে। বিষ্ণুপুরের কাছে রাধানগর সংলগ্ন কাঁকিল্যা গ্রামের এক গোয়ালঘরের মাচায় তখনও পড়ে ছিল এক পুঁথি, বিচিত্র কৃষ্ণকথা। প্রাকচৈতন্য যুগে যা রচনা করে গিয়েছিলেন কবি বড়ুচণ্ডীদাস।

সেই পুঁথি জনসমক্ষে এল ১৯০৯ সালে। আর তা সম্ভব হয়েছিল বেলিয়াতোড়ের বাসিন্দা বসন্তরঞ্জন রায়ের হাত ধরে। গোয়ালঘরের মাচা থেকে তাঁরই মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঢুকে পড়ল সেই পুঁথি। বসন্তরঞ্জনই বড়ুচণ্ডীদাসের সেই

পুঁথির নামকরণ করলেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'।

বসন্তরঞ্জন রায়ের আরও একটি পরিচয়, সম্পর্কে তিনি বরেণ্য চিত্রকর যামিনী রায়ের দাদা। বেলিয়াতোড়ে এই রায় পরিবার 'জমিদার পরিবার' নামে খ্যাত। প্রাচীন এই পরিবারের দুর্গাপূজাটিও ঐতিহ্যমণ্ডিত। মল্লরাজাদের আমল থেকে প্রচলিত এই পুজোকে অনেকে 'মুণ্ড পুজো'ও বলেন। কারণ এখানে কেবল দেবীর মুখমণ্ডলেরই পুজো করা হয়।

বেলিয়াতোড়ের রায় জমিদারির এক সুপ্রাচীন ইতিহাস আছে।[৮০] মল্লরাজাদের আমলে বর্গি আক্রমণের জেরে (সম্ভবত মগ আক্রমণ) প্রাণভয়ে বাংলাদেশ থেকে বিষ্ণুপুরে এসে পড়েছিলেন বাংলার বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের এক ভাই। তিনি 'কচু রায়' নামে পরিচিত হন। মল্লরাজারা কচু রায়কে আশ্রয় দিয়েছিলেন। পাশাপাশি বেলিয়াতোড়ে তাঁকে জায়গির হিসাবে নিয়োগ করেন। সেই থেকেই রায় পরিবারের বাস শুরু বেলিয়াতোড়ে। কচু রায়ের তিন ছেলে বড় রায়, মেজ রায় ও ছোট রায়। বসন্তরঞ্জন, যামিনী রায়েরা মেজ রায়ের বংশধর ছিলেন।

বেলিয়াতোড়ের কায়স্থ 'রায়' পরিবার নিয়ে আরেক কাহিনি হল সতত্বরাম রায় কর্তৃক এই বংশের প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাবের 'ক্রোড়ী' (আড়াই লক্ষ টাকা বা 'দাম') এর আদায়কারী। এদের আদি পদবী ছিল গুহ। মল্লভূমিতে এসে দ্বিতীয় রঘুনাথের দেওয়ান হয়েছিলেন সতত্বরাম রায়। রাজা এদের গোপালগঞ্জের ষষ্ঠীবড়তলায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এদের পূজিত দশভূজার সেবার জন্য কামারপাড়ায় ৪২ বিঘা খুজরান জমি দেন। এর থেকে খাজনা আদায় ছিল ৫২টা ১২আ. ১৫ পাই। জগমোহন দেশাবলী বিবৃতিতে গোপাল সিংহের মন্ত্রী হিসাবে বেলিয়াতোড়ের রাজীবের কথা বলেছেন। ১৭০১সালে রাজা ২য় রঘুনাথের চেতুয়া-বরদা অভিযানে দেওয়ান সতত্বরাম সঙ্গী হয়েছিলেন। চৈতন্য সিংহের দেওয়ান ছিলেন মুকুন্দরাম রায়।

বেলিয়াতোড়ের রায় পরিবারের মুণ্ড পুজো তিনশো বছর বা তারও বেশি পুরনো। এই পুজো শুরুর আগে থেকেই অবশ্য 'রায় পরিবারের দুর্গাপুজো' শুরু হয়ে গিয়েছিল বিষ্ণুপুরে। তখন এই পরিবারের বাস ছিল সেখানেই। দেবীর সেই প্রাচীন দশভুজা মূর্তি বিষ্ণুপুর শহরের গোপালগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত। এখনও নিত্যপুজো হয়, তার যাবতীয় খরচ বেলিয়াতোড় থেকেই সামলান রায় পরিবারের বর্তমান সদস্যেরা।

শোনা যায়, কচু রায়ের এক বংশধর পুরীতে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন। সেখানেই এক সাধু তাঁর হাতে ওই প্রাচীন দশভুজা দেবীমূর্তি তুলে দিয়েছিলেন। সেই বিগ্রহেরই প্রতিষ্ঠা করে পুজো শুরু হয় গোপালগঞ্জে। পরবর্তী কালে রায় পরিবার বেলিয়াতোড়ে এসে বসবাস শুরু করে। তখনও মুণ্ড পুজোর প্রচলন হয়নি। জনশ্রুতি, পরিবারের কাউকে দেবী স্বপ্নাদেশে নির্দেশ দেন, দশভুজারূপে যেহেতু তিনি বিষ্ণুপুরে পূজিতা হচ্ছেন, তাই পুজোর চার দিন বেলিয়াতোড়ে কেবল দেবীর মুখমণ্ডল গড়ে পুজো করতে হবে। সেই থেকেই বিষ্ণুপুরে দেবীর নিত্যপূজার পাশাপাশি বেলিয়াতোড়েও রায় পরিবারের বাৎসরিক দুর্গাপুজো শুরু হয়।

বেলিয়াতোড়ে পুজো সামলানোর পাশাপাশি রায় পরিবারের সদস্যেরা বিষ্ণুপুরেও দেবীর পুজোয় যোগ দিতেন। এক বার বিষ্ণুপুরের পুজোয় যোগ দিতে যাওয়ার পথে কী এক অঘটন ঘটে। তার পর থেকেই পরিবারের সদস্যেরা দুর্গাপুজোর চার দিন বিষ্ণুপুরের প্রাচীন পুজোয় যাওয়া বন্ধ করে দেন। এটিই ক্রমে পারিবারিক প্রথা হয়ে দাঁড়ায়। শুরু হয় 'বাহক' প্রথা। পরিবারের লোক অনুপস্থিত থাকলেও বিষ্ণুপুরের পুজোর নৈবেদ্য বা যাবতীয় উপকরণ বেলিয়াতোড় থেকে পাঠানো হত। বেলিয়াতোড় সংলগ্ন বনগ্রাম এলাকার কিছু গ্রামবাসী জমিদারের 'বাহক' হিসেবে সেই সব নিয়ে বিষ্ণুপুরে যেতেন। ষষ্ঠী থেকে একাদশী পর্যন্ত বাহকেরা বিষ্ণুপুরে দেবীর মন্দিরেই থাকতেন। পরে ফিরে আসতেন বেলিয়াতোড়ে। শতাব্দীপ্রাচীন সেই প্রথা আজও বর্তমান। বনগ্রামের কিছু বাসিন্দা এখনও রায়বাড়ির বাহক হিসেবে পুজোর উপকরণ নিয়ে ষষ্ঠীতে বিষ্ণুপুরের দশভুজা মন্দিরে যান।

বেলিয়াতোড়ে রায়বাড়ির নিজস্ব দুর্গামন্দিরে প্রাচীন সেগুন কাঠের রথঘর রয়েছে। পুজোর সময়ে দেবীর মুখমণ্ডলের মূর্তি সেই রথঘরে রাখা হয়। রথঘরের গায়ে রং-তুলি দিয়ে চারপাশে বাহন সমেত লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ ও শিবের ছবি আঁকা হয়।

বিষ্ণুপুরে রায়বাড়ির আদি পুজোয় ঢাক বাজানো হলেও বেলিয়াতোড়ের পুজোয় ঢাকের বদলে কাড়া-নাকাড়া বাজানো হয়। নবপত্রিকা স্নানের সময়ে ও বিসর্জনের সময়ে কাড়া-নাকড়ার ছন্দ শোনা যায়। এখন রায়বাড়ির বারোটি শরিক পরিবার এই পুজো চালান।

বসন্তরঞ্জন বহু বছর আগেই বেলিয়াতোড় ছেড়েছিলেন। আর ফেরেননি। তাঁর কোনও এক নাতি পরিবার নিয়ে সত্তরের দশকে কয়েক বছর বেলিয়াতোড়ে এসে

বসবাস শুরু করেছিলেন। বেলিয়াতোড়ে থাকাকালীন তিনি পরিবারের এই পুজোয় যোগও দিতেন। যদিও পরে তিনি বসন্তরঞ্জনের বসতভিটে বিক্রি করে সপরিবার চলে যান।

বসন্তরঞ্জনের পরিবারের আর কোনও খোঁজ পাননি বেলিয়াতোড়ে রায় পরিবারের বর্তমান সদস্যেরা। মুণ্ড পুজো অবশ্য চলছে নির্বিঘ্নেই। বেলিয়াতোড়ের ধর্মরাজ প্রথমে এক তাম্বুলি বণিকের বাঁটখারা হিসাবে ব্যবহৃত হলেও জমিদার রায় পরিবারের প্রধান স্বপ্নাদিষ্ট হলে এটি ধর্মরাজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আষাঢ়ী পূর্ণিমায় এই ধর্মরাজের গাজন হয়। পুরোহিত হলেন চট্টোপাধ্যায় পদবীর রাঢ়ী ব্রাহ্মণ পরিবার।[৮০ক]

## ১৪) বাকুড়া-২ ব্লকের কষ্টিয়ায় শিট পরিবারের জমিদারি।

কষ্টিয়ার শিট পরিবার জমিদারি প্রসারের সাথে সাথে দুর্গাপূজার মাধ্যমে সামাজিক গরিমা প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হন। সাড়ে তিনশো বছর আগে বাঁকুড়ার কষ্ঠিয়ার সম্ভ্রান্ত শিট পরিবারের জমিদারি ছিল আশপাশের প্রায় ১৬ টি তালুকে। প্রায় বারো হাজার বিঘা জমিতে থাকা বনাঞ্চলে ছিল তাঁদের কর্তৃত্ব। জমিদারির বিপুল আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে শিট পরিবারের দুর্গাপুজায় লেগেছিল বৈভব আর আভিজাত্যের ছোঁয়া।

আজ সে জমিদারও নেই , নেই জমিদারিও। তবু আজও কষ্টিয়ার শিট পরিবারের দরদালানে সাড়ম্বরে পূজিতা হন দেবী দুর্গা। এখানে কুমড়ো ও আখ বলির প্রচলন আছে।

শিট পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা সার্থক শিটই এই পুজোর প্রথম প্রচলন করেন। তাঁর জন্ম বাঁকুড়ার বড়জোড়া থানার বেলিয়াতোড় সন্নিহিত বনগ্রামের অত্যন্ত সাধারণ একটি কৃষিজীবী পরিবারে। কথিত আছে, তিনি পার্শবর্তী জঙ্গলে মহিষ চড়ানোর সময় একদিন ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এসময় স্বপ্নাদেশ পান, বেশ কিছুটা দূরে থাকা কষ্টিয়া গ্রামে দুর্গাপুজো শুরু করার।

আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে নিজের ক্ষুদ্র সামর্থে কষ্টিয়া গ্রামে একটি পর্ণ কুটির তৈরি করে দুর্গা পুজোর সূচনা করেন সার্থক শিট। পুজো শুরু হওয়ার পর দৈবিক আশীর্বাদে দ্রুত অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে তাঁর। শালী নদীর তীরবর্তী প্রায় সাত হাজার বিঘে উর্বর জমি কিনে জমিদারির পত্তন করেন সার্থক শিট।

জমিদারি পত্তনের প্রায় সাথে সাথেই জমিদারবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় দুর্গার জন্য স্থাপিত হয় সুদৃশ্য বিশাল দরদালান। বিশাল জাঁকজমকে শুরু হয় দুর্গা পুজা। জমিদারীর বিপুল আয়ে সে সময় শিট পরিবারের রাজকোষ উপচে পড়ে। তার ছাপ পড়তে থাকে দুর্গা পুজোতেও। আভিজাত্য আর জাঁকজমকে অল্প দিনেই ওই এলাকায় বিখ্যাত হয়ে ওঠে শিট পরিবারের দুর্গাপুজো।

সে সময় দূর দূরান্তের প্রজারা পুজা দেখতে পুজার চার দিন ধরে ভিড় জমাত কষ্ঠিয়া গ্রামের দুর্গা মণ্ডপে। চারদিন ধরে মণ্ডপে এলাকার সাতটি গ্রামের মানুষের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকত। সন্ধ্যা নামলেই দুর্গা মণ্ডপে সেজের ঝাড়বাতি লাগিয়ে বসত যাত্রাপালা, রামলীলা ও গানের জলসা। দশমীতে শিট পরিবারের দুর্গাদালানে দিনে যাত্রাপালা ছিল অন্যতম আকর্ষণ। জঙ্গল পেরিয়ে আসা দূর দূরান্তের প্রজারা যাতে যাত্রাপালা দেখে দিনের আলোতেই বাড়ি ফিরে যেতে পারেন সেজন্যই দিনের আলোয় এই যাত্রাপালার আয়োজন করতেন শিট পরিবারের সদস্যরা।

কিন্তু আজও পুরানো বিধি ও নিয়ম নীতি মেনে শিট পরিবারের প্রাচীন দুর্গা মন্দিরে পূজিতা হয়ে আসছেন দেবী দুর্গা। আয়োজনের কলেবর বহুগুণ কমলেও গ্রামবাসীদের ভক্তি শ্রদ্ধা ও এই পুজাকে ঘিরে উন্মাদনায় বিন্দু মাত্র ভাটা পড়েনি। দশমীতে দিনের যাত্রা পালা চলে আসছে প্রাচীন রীতি মেনে। জমিদারি না থাকলেও একসময় জমিদারির অংশ হিসাবে থাকা দূর দূরান্তের গ্রাম থেকে গ্রামবাসীরা পুজোর বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে পুজোর সময় হাজির হন শিট পরিবারের দুর্গা দালানে। দেশ বিদেশ থেকে ছুটে আসেন শিট পরিবারের সদস্যরাও। বছরের পুজোর কটা দিন ফের গমগম করে ওঠে শিট পরিবারের দুর্গা মন্দির।

## ১৫) সোনামুখীর দে পরিবারের জমিদারি ও পূজা

সোনামুখী শহরের ১১৫ বছরের প্রাচীন সরস্বতী পুজোর খ্যাতি তার বিশিষ্টতা ও প্রাচীনত্বের জন্য।

এই পুজোর বিশেষত্ব হল, এখানে শুধুমাত্র দেবী সরস্বতীই থাকেন না, সঙ্গে থাকেন তাঁর তিন ভাই-বোন অর্থাৎ লক্ষ্মী, কার্তিক এবং গণেশ। সোনামুখীতে এই পুজো শুরু করেন স্বর্গীয় অধরচন্দ্র দে মহাশয় ১৯০৬ সালে, যা আজও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছেন দে বাড়ির সদস্যরা।

অধরচন্দ্রকে সোনামুখীর জমিদারি বা পত্তনি প্রদান করেন বর্ধমানের রাজা।

অধরচন্দ্রবাবু নারীশিক্ষার প্রতি নিজের সদর্থক চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটাতে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে সেই মন্দিরটির নাম সরস্বতী মন্দির।

এই বংশের স্বর্গীয় অধরচন্দ্র দে মকর সংক্রান্তির দিনে এক স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন। তার সূত্র ধরেই তিনি এই মন্দির তৈরি করেন ও দেবী সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর আরও তিন ভাই-বোনেরও পুজোর ব্যবস্থা করেন।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, অধরচন্দ্রের আট সন্তান ছিল। তিনি চেয়েছিলেন এই আট সন্তানের মধ্যে যেন ভ্রাতৃত্ববোধ অটুট থাকে। সেই ভাবনার দ্যোতনায় তিনি একচালায় বাগদেবীর সঙ্গে লক্ষ্মী, কার্তিক এবং গণেশের পুজোর প্রচলন করেন। সোনামুখীর এই দে বাড়িতে এখনও সেই প্রাচীন নিয়ম মেনেই পুজো হয়ে আসছে।

প্রতি বছর মকরসংক্রান্তির পরে এই বাড়ির উঠোনে অনুষ্ঠিত হয় 'এখেন লক্ষ্মীপুজো'। এই পুজোর পর ধানের জমি থেকে মাটি ও খড় দিয়ে প্রতিমা নির্মাণ শুরু হয়। একচালার সাবেকি প্রতিমায় চার ভাই-বোন যেন এক সূত্রে বাঁধা থাকেন, এমনটাই চেয়েছিলেন অধরবাবু। পারিবারিক গহনা দিয়ে সাজানো হয় প্রতিমা। ডাকের সাজের উজ্জ্বল প্রতিমা সোনামুখীর ঐতিহ্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

শুক্লপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীপুজোর সঙ্গে সঙ্গে দে পরিবারে রান্নাপুজোও অনুষ্ঠিত হয়। প্রাচীন রীতি মেনে পরিবারের সদস্যরা পুজোর অঞ্জলি দেওয়ার পর মাছ খান। তবে দেবীকে নানান রকমের ফল, লুচি, ভাজা, মিষ্টি ইত্যাদি নিবেদন করা হয়। রান্নাপুজোয় বিভিন্ন রকমের পদ রাঁধা হয়, যেমন সাদাভাত, শুক্তোনি, মাছের মাথা দিয়ে বাঁধাকপির তরকারি, মাছের মাথা দিয়ে মুগের ডাল, মাছের আরও নানা পদ ইত্যাদি। পরের দিন পরিবারে রান্না হয় না। আগের দিনের তৈরি রান্নাই পরের দিন খান পরিবারের সদস্যরা।

অধরচন্দ্র দের সরস্বতী মন্দিরের পাশাপাশি পরিবারের কুলদেবতা শ্রীদামোদর জীউ-এর আলাদা মন্দির রয়েছে। তবে পুজোর দিন তিনি এই সরস্বতী মন্দিরেই অবস্থান করেন। প্রতি বছর পুজোর ভোগ ছাড়াও পরিবারের সদস্যরা এক সঙ্গে খিচুড়িভোগ খান। এখানে পূজিত হন 'জোড়া সরস্বতী'। দ্বিতীয়ত এর পূজা পাঠ হয় ঢাক ঢোল বাদ্যি বাজিয়ে এবং চার দিন ধরে আড়ম্বরের সাথে সরস্বতী বন্দনা করে। এই পুজো শুরু করেছিলেন অধরচন্দ্র দে মহাশয়। একই কাঠামোয় সরস্বতী এবং লক্ষ্মী শুরু করেছিলেন তিনি। একেই পরিবার জোড়া সরস্বতী বলে আখ্যা দিয়েছে। অধরচন্দ্র মহাশয় শুধু দুই বোন নয়, ভাইদেরকেও রেখেছিলেন। একসঙ্গেই পুজো

হয় তাঁদেরও। তবে মূল আকর্ষণ লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর সহাবস্থান। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের সূর্যগ্রহণ ও মকর সংক্রান্তির ক্ষণে লক্ষ্মী-সরস্বতীর একযোগে মন্দির তৈরির কাজ সম্পন্ন করলেন অধরচন্দ্র দে মহাশয়। সেই থেকেই দে পরিবারে এক কাঠামোয় লক্ষ্মী সরস্বতীকে রেখে শুরু হয় সরস্বতী পুজো। পুজোর প্রথম বিশেষত্ব অবশ্যই জোড়া সরস্বতী, দ্বিতীয় হল দে বাড়ির পুজো টানা চার দিন ধরে মহাসমারোহে রীতি পালন। সঙ্গে ঢাক ঢোল বাদ্যি বাজিয়ে হয় পুজো। পাশাপাশি কুলদেবতা দামোদর জীউয়েরও পুজো হয় এই ক'দিনে। দামোদর জীউয়ের জন্য আলাদা মন্দির রয়েছে। সরস্বতী পুজোর সময় এই দেবতাকে আনা হয় সরস্বতী-লক্ষ্মীর ঠাকুর দালানে। আবার চারদিন পর পুজো শেষ হলে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় নিজ গর্ভগৃহে। ছোট, মেজ, বড় এমন করে ছয় ভাগ হয়েছে সাবেক জমিদারি। কারণ অধরচন্দ্রের ছয় পুত্র ছিলেন। সোনামুখী আসলে বাঁকুড়া এবং বর্ধমানের মাঝে একটি অঞ্চল। সেখানকার জমিদার ছিলেন জাতিতে পোদ্দার এবং পেশায় স্বর্ণকার। তাই পুজোয় অন্ন ভোগ দেওয়া হয় না। পুজোয় সমস্ত কিছুই শুকনো দেওয়া হয়। দেওয়া হয় লুচি ভোগ। খিচুরিও করা হয়। তবে তা ঠাকুরের ভোগ হিসাবে নয়, পরিবারের নিজেদের জন্য। ছোট থেকে বড় পরিবারের প্রত্যেকে সমানভাবে অংশ নেয় চার দেবদেবীর এই সঙ্গমস্থলে। ফল কাটা থেকে সবজি কাটা সবকিছুই রয়েছে এর মধ্যে। জৌলুস কিছুটা কমেছে তবে, রীতিতে কোনও খামতি হয়নি। প্রায় আট পুরুষ ধরে এই অন্য ধারার বাগবন্দনা চলে আসছে দে বাড়িতে। সরস্বতী পুজোর পাশাপাশি লক্ষ্মী গনেশ এবং কার্তিক পুজোও নির্দিষ্ট পুজোর সময়ে করা হয়। বলা যেতে পারে এই পুজো-পার্বণ যেন একসুত্রে বেঁধে রেখেছে দে পরিবারকে। পারিবারিক ধারা হল রামকান্ত-অধর-ভুবনেশ্বর-গৌরী-হরিপদ। পশুপ্রেমিক গৌরী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী হরিপদবাবুর নানা কাহিনী প্রচলিত।

## ১৬) জয়পুরের পত্তনি পাঁজা পরিবার ও পূজাপার্বণ

জয়পুরের পাঁজা পরিবারের দুর্গা আসে পালকিতে। শাঁখ-উলুধ্বনি আর ঢাকের বোল গায়ে মেখে দেবী অধিষ্ঠিতা হন ঠাকুরদালানে। বাঁকুড়ার জয়পুরের রাহা পরিবারের নাটমঞ্চ, মন্দির আজও দাঁড়িয়ে অতীতের স্মৃতি বহন করে। বাঁকুড়ার জয়পুরের রাহা পরিবারের পুজো শুরু ২৬০ বছর আগে। বর্ধমান রাজ পরিবারের তালুকদার ছিলেন রাহাদের পূর্ব-পুরুষ। প্রথমে পদবী ছিল পাঁজা। পরে কোনও

ভাবে রাহা। কথিত আছে হাতের পাঞ্জা দিয়ে টাকা পয়সা লেনদেন হত, সেখান থেকে পাঁজা। পরে রাহা।

## ১৭) জয়পুরের জুজুড় গ্রামের বিশ্বাস পরিবারের পত্তনি ও পূজা

১৮৫৬ সালে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার জয়পুর ব্লকের জুজুড় গ্রামের জমিদার বাড়িতে শুরু হয়েছিল দুর্গাপুজো। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই দুর্গাপুজো আজও চলে আসছে সেদিনের রীতিনীতি প্রথা মেনে। পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে এই জমিদার বংশের আদি নিবাস ছিল পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষে। বিশ্বাস বংশের বংশধর রামনারয়ণ বিশ্বাস তৎকালীন বর্ধমানের রাজার অধীনে জমিদারিত্ব নিয়ে চলে আসেন বাঁকুড়া জেলার জুজুড় গ্রামে। জমিদার বংশের পদবী দাস হলেও রাজার বিশ্বাসভাজন হওয়ায় বিশ্বাস উপাধি লাভ করেছিলেন রামনারায়ণের পূর্বপুরুষরা। সেই থেকেই বিশ্বাস পদবী চলে আসছে। জমিদারির শেষের দিকে দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের অকাল প্রয়াণের পর তাঁর স্ত্রী কিরণবালা বিশ্বাস জমিদারির দায়িত্ব নেন। তাঁর আমল পর্যন্তই ছিল জমিদারি। কিরণবালার জীবদ্দশাতেই জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু পরিবারের পুজো বন্ধ হয়নি। পরে বিশ্বাস বংশের এক প্রজন্মের দৌহিত্র চৌধুরীরাও এই পুজোয় যোগ দেন। জমিদারি না থাকলেও জমিদারবাড়ির দালানের নোনাধরা ইট আজও সাক্ষী দিয়ে চলেছে বংশের গরিমার। জমিদার বাড়ি, দালান জুড়ে এখন শুধুই লতাপাতা গুল্ম গাছের আধিপত্য। তবুও পুকুর ঘাট, সবুজের আড়াল থেকে উঁকি মারা দালানবাড়ির লালরঙা ইট আজও বলে চলেছে ১৬৫ বছরের ইতিহাসের কত না বলা কাহিনী। তবে মায়ের পুজো অবশ্য সিমেন্টের তৈরি নাটমন্দিরে হয়। সেখানেই চলে প্রতিমা গড়ার কাজ। আগে প্রতিমা গড়া হত গঙ্গা মাটি এনে। এখন আর তা সম্ভব হয় না। তবে জমিদার বংশের প্রচীন এক রীতির জেরে গঙ্গামাটি মিশে থাকে এই সময়ের প্রতিমাতেও। পরিবারের রীতি মেনে বিসর্জনের সময় মা দুর্গার বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল ভেঙে রেখে দেওয়া হয়। পরের বছর ওই ভাঙা আঙুলের মাটি মিশিয়ে দেওয়া হয় প্রতিমা গড়ার সময়। পুজোর সময় আজও মায়ের টানে একত্রিত হন দেশে বিদেশে ছড়িয়ে থাকা জমিদারি বাড়ির সদস্যরা, প্রায় দুশো বছরের প্রাচীন জুজুড় গ্রামের জমিদার বাড়িতে।

## ১৮) গঙ্গাজলঘাটীর লালপুরের জমিদার

লালপুরের রায় জমিদারি ও জগদ্ধাত্রী পূজা বেশ প্রাচীন। প্রাচীন জগদ্ধাত্রী পুজো ঘিরে আজও মাতেন গঙ্গাজলঘাটির লালপুরের বাসিন্দারা। তৎকালীন জমিদার লালবিহারী রায় এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। কথিত রয়েছে, স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি পুজো শুরু করেন। এখন অবশ্য তা একপ্রকার গ্রামের সবার পুজো হয়ে উঠেছে। পুজোর পাশাপাশি এখানে দু'দিন ধরে যাত্রাপালা হয়।

## ১৯) জারকাবাইদ গ্রামের গোস্বামীদের প্রাচীন পূজা

বাঁকুড়া জেলার ওন্দা থানার জারকাবাইদ গ্রামের গোস্বামী পরিবারের প্রাচীন পারিবারিক দুর্গাপুজোর জৌলুস আজও অম্লান। পারিবারের দাবি এই পুজো প্রায় দুশো বছরের পুরানো। সম্ভবত উমাচরণ চক্রবর্তী এই পুজোর প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে তাঁর বংশধর হরিপদ চক্রবর্তীর ভাগ্নে প্রাক্তন শিক্ষক শ্রী বীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী মহাশয় এই পুজো আয়োজন করেন। প্রতিমা গড়ে পুজোর রীতি এখানে। এই পরিবারে দেবী দুর্গার পাশাপাশি পুজিতা হন দেবী লক্ষ্মীও। বোধন, নবপত্রিকা থেকে বিজয়া পর্যন্ত সমস্তকিছু শাস্ত্রীয় বিধি ও পরিবারের প্রাচীন রীতি মেনে পালন করা হয়। এই প্রাচীন ঐতিহ্যই পারিবারিক এই পুজোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আশেপাশে গ্রামের মানুষের মনে আজও ধর্মীয় ভাবাবেগ ও বহু স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে এই পূজাকে ঘিরে। তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ দূর দূরান্ত থেকে আজও ছুটে আসেন ঐতিহ্যবাহী এই পারিবারিক পুজোয় যোগ দিতে। পুজোর দিনগুলো রীতিমত উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হয় জারকাবাইদ গ্রাম। সন্ধিপুজো ও বলিদান ( আখ ও কুমড়ো) এই পুজোর বিশেষ আকর্ষণ। নেই আলোর আতিশয্য, প্যান্ডেলের নিপুণ কারুকার্য। তবুও স্থানীয় গ্রামের মানুষের কাছে এখনও জৌলুস হারায়নি পারিবারিক এই পুজো।

## ২০) হাড়মাসড়ার বৈদ্য রায় পরিবারের পূজা

খাতড়া মহকুমা শহর থেকে ২২ কিমি এবং বাঁকুড়া জেলা শহর থেকে ২৪ কিলোমিটার দূরে এক বর্ধিষ্ণু, সমৃদ্ধ গ্রাম হাড়মাসড়া। মন্দিরময় গ্রামটি। জৈন সভ্যতার বহু নিদর্শন আছে। গ্রামের দক্ষিণ পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে জয়পণ্ডা-শিলাবতী নদী। নানান ধরনের কিংবদন্তি ছড়িয়ে আছে এই গ্রামে।

এই মুহূর্তে হাড়মাসড়ার অন্যতম প্রবীণ সাহিত্যিক অদ্বৈত কুমার রায় ও সুসাহিত্যিক শক্তিপদ সেনের হাত ধরেই বহু অকথিত ইতিহাস উন্মোচিত হয়েছে। দুজনেরই শিকড়ের প্রতি গভীর মমত্ববোধ। তাই মাটির টানে আঞ্চলিক ইতিহাস অন্বেষণ করে চলেছেন। তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা হল হাড়ামের অড়া থেকে হাড়মাসড়া নামের সৃষ্টি। কোন কোন আঞ্চলিক গবেষকদের মতে হার্মাদ জাতীয় অসুরদের বাসস্থান হার্মাদাসুর থেকে হাড়মাসড়া নামের সৃষ্টি। বিখ্যাত কবি শক্তিপদ সেনের একই অভিমত। দক্ষিণ বাঁকুড়ার তালডাংরা থানার অন্তর্গত একটি সমৃদ্ধ গ্রাম হল হাড়মাসড়া। এই নামের কোন প্রকৃত অর্থ বা নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র খুব বেশি পাওয়া যায় নি। তবে আঞ্চলিক গবেষকদের ধারণা অতীতে এটি জনৈক আদিবাসী রাজার রাজধানী ছিল। বর্তমানে বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের সঙ্গেই প্রান্তভূমির প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বাস। এখানে বহু প্রাচীন জৈন মন্দির আজও ইতিহাসের নীরব সাক্ষী।

গ্রামের সমস্ত মন্দির ঘিরে লোকজীবনে নানান জনশ্রুতি শোনা যায়। একদল আঞ্চলিক গবেষকদের অভিমত হল, 'সাঁওতাল' 'হড়মসত' শব্দ থেকেই হাড়মাসড়া শব্দের উৎপত্তি, অর্থাৎ মৃত মানুষ। এই মৃত মানুষ শব্দের বিকৃতি হাড়মাসড়া। এই অভিমত খুব গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না আধুনিক লোকসংস্কৃতির গবেষকরা। অতীতের আদিবাসীরা হয়ত সেখানকার জৈন সাধককে এইভাবেই স্মরণীয় করে রেখেছে। কিংবদন্তি আছে জনৈক সাধু এক রাত্রে হাড়মাসড়ার মন্দিরটি শেষ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মন্দির সমাপ্তির আগেই ভোর হওয়ায় ও মোরগ ডাকার জন্য পরিত্যক্ত হয় সেই কাজ। এই কিংবদন্তির সঙ্গে বাস্তবের কোন সাধুর মৃত্যু জড়িয়ে থাকা কোন বিচিত্র নয়। সেই অনুসারে হড়মসত অর্থাৎ হাড়মাসড়া নাম হতে পারে।

বাঁকুড়ার আঞ্চলিক ইতিহাস অন্বেষণ করলে জানা যায় আনুমানিক ৪০০বছর আগে আদিবাসী অধ্যুষিত এই গ্রামে বীর হাম্বির প্রেরিত ঘাটোয়াল হিসেবে বৈদ্যগন এখানে আসেন। এই সম্পদায়ের আদিবাড়ি বর্ধমানের কোগ্রাম। রাজার আদায়, চিকিৎসা ও চাষবাস ছিল এদের প্রধান পেশা। জীবনে চলার পথে দেবতা, বিগ্রহ ও মন্দিরের সৃষ্টি।

এককালীন জৈন অধ্যুষিত এই গ্রামে মল্লরাজের অনুপ্রেরণায় বৈষ্ণব ধর্মীয় মন্দিরগুলি নির্মিত হয়। সময়ের হাত ধরেই জৈন মন্দির একান্তভাবে সৃষ্টি হয়েছিল এই গ্রামে। বহু গুণী ব্যক্তিত্বের আকরভূমি হাড়মাসড়া। দেশ-বিদেশের ছড়িয়ে আছেন

তাঁরা।

এ গ্রামের বিখ্যাত জনেরা হলেন সন্ন্যাসীবাবা গোপী ভট্টাচার্য, ভোলাক্ষ্যাপা কীর্তনীয়া চন্দ্র বাড়ুজ্যে, দেওয়ান কবি হেমচন্দ্র রায়, পথের কবি সুকান্তী রায়, প্রাবন্ধিক ও কবি শক্তিপদ সেন। নাম করতে হয় সমাজ সেবক শিক্ষক হরিকিঙ্কর, রুদ্রনাথ, তিনকড়ি, সত্যেন বিশ্বাস, সনৎ রায়, বিভূতিভূষণ রায়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থপতি প্রবোধ চন্দ্র রায় হলেন হাড়মাসড়ার সন্তান।

তৎকালীন বৈতলের শম্ভু হাজরা, ক্ষীরোদকুমার, নলিনীকান্ত ছিলেন রাজনীতি অঙ্গনে। পরবর্তী প্রজন্মের গুরুপদ রায়, কল্যাণ জ্যোতি সেন ছিলেন হাই কোর্টের বিচারপতি। নারী শিক্ষার বিস্তারে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন কয়েকজন নমস্য ব্যক্তি। শিক্ষা বিস্তারে আজও হিমালয়ের মতো মাথা উঁচু করে আছেন এই অঞ্চলের দুই প্রণম্য ব্যক্তিত্ব প্রবোধ চন্দ্র রায় ও নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

খাতড়া মহকুমার তালডাংরা থানার অন্তর্গত এই হাড়মাসড়া গ্রামের সাতঘরা বদ্যিবাড়ির দুর্গা পুজোর মাহাত্ম্য এখনো শোনা যায় তালডাংরা ব্লকের অলিতে-গলিতে। সাবেক ধাঁচের এই পুজোর বয়স ৩০০ বছরেও বেশি। সমগ্র বাঁকুড়া জেলার বারোয়ারি পুজোর পাশাপাশি প্রচুর বনেদি বাড়ির পুজো হয়। জেলার বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর-খাতড়া এই তিনটি মহকুমার ঐতিহ্যমণ্ডিত বহু বনেদি বাড়ির সুপ্রাচীন পুজোর আজও ঐতিহ্য বজায় রেখে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

যদিও এর বেশির ভাগই উত্তর ও পূর্ব বাঁকুড়ায়। তবে জঙ্গলমহলের দক্ষিণ বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কয়েকটি বনেদি বাড়ির পুজো আজও বংশপরম্পরায় অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। বহু প্রাচীন এই সব পুজো বাঁকুড়ার ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সাথে জড়িত। বছরের এই সময়টা বনেদি বাড়ির বাড়িগুলো বিশেষ করে ঠাকুর দালানে রঙের প্রলেপ পড়ে। দেশ-বিদেশ থেকে আত্মীয়স্বজনদের সমাগম হয়। বেশিরভাগ পুজোর নিজস্ব রীতি এবং বৈচিত্র আছে। পুজোর দিনে সাধারণের প্রবেশাধিকার থাকে।

হাড়মাসড়ার রায় পরিবারের পূজায় বংশ পরম্পরাগত ভাবে ঢাকি, নাপিত, কুমোর এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। কর্মসূত্রে পরিবারের সদস্যরা অন্যত্র থাকলেও পারিবারিক এই পুজোয় এসে সবাই মিলিত হয় প্রতিবছর। পৌরাণিক মতে ১৫ দিন আগে বোধন চণ্ডীপাঠ, বলিদান ও অন্যান্য পুরানো রীতি মেনেই রায় বাড়ির দুর্গা পুজো।

হাড়মাসড়া গ্রামের অতিপ্রাচীন এই দুর্গাপুজোর গ্রামবাসীরা প্রতি বছর আনন্দ

উৎসবে মেতে ওঠেন। পারিবারিক পুজো হলেও মূলত গ্রামবাসীদের আনন্দের জন্য হাড়মাসড়ার বৈদ্য বাড়ির দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল। রায় পরিবারের পূর্বসূরীরা চেয়েছিলেন গ্রামের সমস্ত মানুষ এই পুজোয় মেতে উঠুক। রায় পরিবারের বহু কৃতী সন্তান আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। এই পুজোটা বর্তমানে যারা পরিচালনা করেন, এঁদের 'সাত ঘরে' বলা হয়। এখানে বর্তমানে 'পাঁচ ঘরে' নামেও পরিবার আছে। আনুমানিক ১৭৩০ সালে ভাঁড়ার বেড় অঞ্চলে নয়ান চাঁদের পুত্র পৌত্রেরা এই পুজো ঘটে করতেন। এই অঞ্চলের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত পারিবারিক পুজো। বর্তমানে অত্যন্ত সাড়ম্বরে নিষ্ঠা সহকারে পূজা হয়। যুগলচরণ রায়ের পুত্র কন্দর্প নারায়ণ বাস্তু পরিবর্তন করে উত্তর অংশে বসবাস ও মাটির ঘরেই দুর্গাপুজো শুরু করেন। এখানকার প্রতিমা নিয়ে একটি কিংবদন্তি আছে। পুজোর সময় দেবী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। তাই পরপর দুবছর ঘটে পুজো হয়। কন্দর্প নারায়ণ রায়ের পুত্র ভবানী প্রসাদ রায় বর্তমানের মন্দিরটির নির্মাণ শুরু করেন। পূর্ব দুয়ারী প্রকাণ্ড একতলা বাড়ি সংলগ্ন অঙ্গনে নহবৎ খানার আকারে সুবৃহৎ তোরণ আজও অটুট। বর্তমানে দশভুজা মন্দির ও পাশে বাঘ দরজা এবং দুটি অন্য মন্দির আছে। এই মন্দিরে নিত্য পুজো হয় আজও। বড়মেলার পাশেই নবচূড়া রাসমঞ্চ।

দেবী এখানে কন্যা উমা রূপে বৈষ্ণব মতে পূজিতা হন। বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী পূজার নিয়মাবলী মেনে আখ ও কুমড়ো বলি হয়। পূজায় ব্রতী পরিবারগুলি মহাষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করেন। দশমীতে উমাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাবার সময়ে চ্যাং মাছ পোড়া খাওয়ানো হয়। তখন ভঙ্গ হয় নিরামিষ খাওয়ার পর্ব। সময়ের হাত ধরেই এই বনেদি বাড়ির পুজো অতীত ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছে।

কলাবৌ মানপাতায় দেবীর অধিষ্ঠান। পঞ্চপল্লবে শোভিতা নববস্ত্র পরিহিতা দেবী পুকুর থেকে এসে পানের পাতায় পা রেখে মন্দিরে প্রবেশ করেন। সম্মুখে থাকে অনির্বাণ ঘৃত দীপশিখা। একে জাগ-প্রদীপ বলা হয়। ষষ্ঠীসন্ধ্যায় দেবী বিল্ববৃক্ষে অধিষ্ঠান করেন। তাই বিল্ববরন অনুষ্ঠানে বোধন হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি ঘটলেও সেই দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ও এখানকার প্রান্তভূমির মানুষের লালিত পালিত বিশ্বাসে আজও ভাঁটা পড়েনি। একটু দূরে অনন্তকাল ধরে বয়ে চলেছে ভালোবাসার, একান্ত কাছের শিলাবতীর, বুকে কল কল শব্দ নিয়ে। সময়ের কোলে মাথা রেখে ইতিহাসের সব নীরব রহস্য হয়তো হাড়মাসড়ার ৩০০ বছরের দুর্গাপুজোর ইতিহাস ঘুমিয়ে আছে।

## ২১) বড়জোড়া গুপ্ত পরিবারের ২৫০ বছরের পূজা

বড়জোড়ার গুপ্ত পরিবারের জনৈক পঞ্চানন গুপ্ত স্বপ্নাদেশে শুরু করেন দুর্গাপুজো। এটি ২৫০ বছরেরও বেশি প্রাচীন। তার পর থেকে নিয়ম মেনেই মাতৃআরাধনা হয় এই বংশের। এই পুজোর অন্যতম বিশেষত্ব হল আগমনী ও বিজয়ার দিন গাওয়া দু'টি প্রাচীন গান।

দেবীর আগমন ও বিদায়ের সময় পরিবারের সকলে মিলে এই গান করেন। পরিবারের মেয়েরা শিলনোড়ায় গাছের ছাল বেটে দেবীকে বিশেষ পদ্ধতিতে অবগাহন করান।

পুজো এলেই ডাক পড়ে গ্রামের কামারদের। তাঁদের বাড়িতেই যে ধার দেওয়া হবে বলিদানের কাস্তে। আবার গ্রামের নাপিতবাড়ি থেকে আসে পুজোর ফুল। অষ্টমীর বলিদানের সময় 'মা' ডাকবেন মুখোপাধ্যায় বংশের প্রতিনিধি। এমন নানাবিধ রীতিই লক্ষ্য করা যায় কয়েক শতাব্দী প্রাচীন এই গুপ্তবাড়ির দুর্গাপুজোয়।

সপ্তমীর ভোরে দেবীকে গয়না আর অস্ত্রে সাজানো হয়। অষ্টমীতে হাজার হাজার ভক্ত সমাগম হয়। এই পুজোকে কেন্দ্র করেই পরিবারের সব সদস্য একত্রিত হন।

এই দেবীপ্রতিমায় মহিষ থাকে না। বলিদান পদ্ধতিও আলাদা। তিন গাছা আখ এক হাতে তুলে অন্য হাতে বলিদান করা হয়।

প্রাচীন পুথি মেনে এখানে বৈষ্ণব রীতিতে এই পুজো করা হয়। পুজোর চার দিনই চলে নানা রকম অনুষ্ঠান। যোগ দেয় সারা গ্রামের মানুষ জন।

## ২২) সোনামুখীর চৌধুরী ও অন্যান্য পারিবারিক দুর্গাপূজা

সোনামুখীতে গোপাল সিংহের আমলে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের (জমিদারি সূত্রে এরা এলাকায় চৌধুরী পরিবার নামে পরিচত হয়) দুর্গাপূজা চালু হয়। এর পরপরেই অন্যান্য পারিবারিক পূজা চালু হতে থাকে। যেমন কীত পরিবারে, চট্টোপাধ্যায় পরিবারে (২ নং ওয়ার্ড), মুখোপাধ্যায় পরিবারে (৯ নং ওয়ার্ড), কুন্ডু পরিবারে, কর্মকার কবিরাজ পরিবারে (৩ নং ওয়ার্ড), দত্ত বাড়িতে(ওয়ার্ড নং৪), সেন বাড়িতে (ওয়ার্ড নং ৭)। কুন্ডু পরিবারে পটে ও ঘটে পূজা হয়। বাকি সব পূজায় হয় মৃন্ময়ী মায়ের আরাধনা। বেশীরভাগই দালান মন্দিরে কৃষ্ণানবমী কল্পারম্ভ যোগে দেবীপুরাণ মতে পূজা হয়। অল্প কিছু কালিকাপুরাণ মতে। অল্প কিছু ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ ক্ষণে। এই

সব পারিবারিক পূজায় অন্নভোগের (অব্রাহ্মণ পরিবারে অতিরিক্ত ফল, লুচি, মিষ্টান্ন ইত্যাদি) সাথে থাকে মুরকি ভোগ। এই পরিবারের সদস্যরা মহাষষ্ঠী থেকে মহানবমী পর্যন্ত নিরামিষ খান। নগ্নপদে থাকেন। এই কদিন সংশ্লিষ্ট পরিবারের মহিলারা পায়ে আলতা পরেন না। আগে মল্লরাজধানীর তোপধ্বনি শুনে অষ্টমীর সন্ধিপুজা শুরু হত। অনেকে পরিবারের পূজায় ১০৮টি পদ্ম ও ১০৮ টি প্রদীপ ব্যবহার করা হয়।

এই পরিবারগুলি শ্রীনিবাস আচার্য, মনোহর দাসের প্রভাবে মূলত বৈষ্ণব মতে আরাধনা শুরু করে। অল্প কিছু শাক্তমতে হয়। আখ, চালকুমড়া, শসা বলি হয়। দুর্গাপূজায় সোনামুখীতে বিখ্যাত 'খ্যান' উৎসব চালুর পেছনে এই কাহিনী লুকিয়ে আছে। মল্লরাজ মল্লভূমে দুর্গাপূজায় পশুবলি নিষিদ্ধ করলেও চৌধুরী পরিবার নবমীর ছাগবলি অব্যাহত রাখেন। রুষ্ট মল্লরাজ গোপাল সিংহ জমিদার কাশীনাথ চৌধুরীকে ডেকে পাঠালেন রাজদরবারে। কাশীনাথ রাজাদেশ অমান্যের কারণ হিসাবে দীর্ঘ দিনের এই প্রথা বন্ধে দেবী রুষ্ট হওয়ার সম্ভবনার কথা জানালে রাজা তাঁকে বলিদান চালিয়া যাওয়ার বিশেষ অনুমতি দেন। এই সময়ে রাজদরবারে উপস্থিত ছিলেন অন্য এক পারিবারিক পূজার হোতা কাশীনাথ কীত। এরপর থেকে মল্লরাজ সোনামুখী কাছারী বাড়িতে সন্ধিপূজার পর 'খ্যান' যাত্রা করে দুই পরিবারকে (চৌধুরী ও কীত পরিবার) হাজির হয়ে রাজসম্মান 'ধুতি' গ্রহণ করতে আদেশ দেন। সেই প্রথা এখনও চলে। বর্তমানে অতীতের সেই কাছারী বাড়ি (বর্তমানে থানা) প্রাঙ্গন থেকে এই সম্মাননা প্রদান করে পুরসভা। অন্যান্য পুজোমালিকদের মাথায় কাপড়ের টুকরো বেঁধে সম্মান জানানো হয়। মহানবমীর দিন পারিবারিক দুর্গাপূজা মালিকরা প্রথাগত ভাবে স্বর্ণমুখী মন্দিরে পূজা দেয়। প্রথম পুজো দেওয়ার অধিকারী চৌধুরী পরিবার। এরা এই পূজার সময় একটি ছাগ বলি দিত। রীতি অনুসারে মাথাটি পেত থান্দার পরিবার। রথযাত্রার সময় একই ভাবে থান্দারদের আয়োজিত ছগবলির মাথা চৌধুরী বাড়িতে পাঠান হয়। অন্যান্য পরিবার অবশ্য মহানবমীতে আখ, চালকুমড়া, শসা বলি করে। চোধুরী বাড়ি থেকে স্বর্ণমুখী মন্দির পর্যন্ত এই শোভাযাত্রায় যোগ দেয় ঢাক বাদক সহ বাউরি, বাগদী, থান্দার সম্প্রদায়। এর পর অন্যান্য পরিবার শোভাযাত্রা করে মন্দির অভিমুখে যাত্রা করে।

এই সব পারিবারিক পূজাগুলিতে মহাসপ্তমী থেকে মহাঅষ্টমী পর্যন্ত মায়ের সামনে দুটি প্রদীপ (একটি ঘিয়ের অন্যটি তেলের) একটানা জ্বালিয়ে রাখতে হয়। এই প্রদীপকে 'জাগর' প্রদীপ বলা হয়। আগে এই পূজাগুলোয় রামায়ণী গানের আসর বসত। প্রথা

অনুসারে এই কদিন পূজা প্রাঙ্গনে অন্যান্য পারিবারিক বিগ্রহ এনে একত্রে পূজা করা হয়। দশমীর দিন সব প্রতিমার নিরঞ্জন হলেও শুধুমাত্র কর্মকার পরিবারের প্রতিমার বিসর্জন হয় বারো বছর পর পর। এটি জয়দুর্গা বারোমেসে দুর্গা নামে পরিচিত। এই পূজায় পরিবারের সদস্যরা নানা মানসিক (প্রার্থনা) করে থাকেন। জয়দুর্গা বারোমেসে দুর্গা মন্দির থেকে মন্ত্রপূত অর্শের ওষুধ দেওয়ার চলও আছে। এইরূপ নানা প্রাচীন রীতি ও প্রথায় আজও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক সোনামুখীর এই সব প্রাচীন পূজাগুলি।

## নতুন জমিদার শ্রেণী

ব্রিটিশ শাসনের সূচনা পর্বে বিভিন্ন ভূম রাজ্যে সরকারী বদান্যতায়, ব্যবসা ও ভূমি বন্দোবস্তের ফলে এক মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। মল্লরাজাদের জমিদারি বর্ধমানের রাজা কিনে নিয়ে পত্তনি প্রথার প্রচলন করলে সাবেক মল্লভূমের মৌজাগুলি বিভিন্ন পত্তনিদার কিনে নিতে থাকেন।

১) বেতুড়ে এমনি পত্তনির সূচনা হয় বিখ্যাত পালিত বংশের হাতে। তাঁদের আদি বাসস্থান বর্তমান কলকাতার গোবিন্দপুর মৌজায়। কলকাতার গোবিন্দপুর মৌজায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ ও ঘাঁটি গড়ে ওঠার কারণে সেই বাসস্থান ছেড়ে পালিত পরিবারের আদি পুরুষ ভবানীপ্রসাদ খন্ডঘোষে বসতি গড়েন। তাঁর পুত্ররা খন্ডঘোষ থেকে বেতুড়ে বাসা পরিবর্তন করেন। বর্ধমান রাজার অধীনে পত্তনিদার এই বংশের থেকে পরবর্তীকালে উমেশচন্দ্র পালিত (উকিল), সুরেন্দ্রনাথ পালিত(বিচারক), গোবিন্দপ্রসাদ পালিত (বিচারক), অক্ষয় কুমার পালিত(পেশকার) ছিলেন বিচার বিভাগের বিভিন্ন উচ্চপদে বা আইন পেশায়।

২) দেশজ পরিবারের রাজানুকূল্যে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার বড় উদাহরণ ময়নাপুরের মুখোপাধ্যায় পরিবার। নিধিকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে হুগলীর খামারগাছি গ্রাম থেকে জয়পুর থানার ময়নাপুরে অভিবাসিত হয়ে মল্লরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথের দেওয়ান শরোত্তর রায়ের কন্যা অন্নপূর্ণাকে বিবাহ করলে মল্লানুগ্রহের নতুন দিক খুলে যায়। শরোত্তর রায়ের মৃত্যুর পর অন্নপূর্ণার পুত্র চন্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় মল্লরাজ চৈতন্য সিংহের দেওয়ান হতে সফল হন এবং ক্রমে প্রচুর সম্পদ ও ভূসম্পদের অধিকারী হন। এই ধারা পরবর্তী কালেও অব্যাহত থাকে। এই পরিবারের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা ঘটে হুগলীর দেবানন্দপুর থেকে আগত নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। চন্ডীচরণের পৌত্র জগদানন্দের (চন্ডীচরণ-তারিণীপ্রসাদ-জগদানন্দ) কন্যা

চন্দ্রজ্যোতির সাথে নবগোপালের বৈবাহিক সম্পর্কের পর এই পরিবারটি ব্রিটিশ রাজের পরিসরে ক্রমশ বিত্তবান হতে থাকে। নবগোপাল জগদানন্দের সুপারিশে জেলা বাস্তুকার পদে অধিষ্ঠিত হন। একই ভাবে জগদানন্দের প্রভাবে এফ এ উত্তীর্ণ নবগোপাল পুত্র প্রসন্নকুমার সাব-ডেপুটি, পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও আবগারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে উন্নীত হন। প্রসন্ন পুত্র হরিপ্রসাদ প্রচুর কয়লা খনির মালিক হন। এই পরিবার নিলামে অংশ নিয়ে অর্জুনপুর, পুরন্দরপুর, হলাইগড়্যা, রাইপুরের কাজলা-চিলতোড়-বনপাথারী মৌজাগুলির পত্তনি লাভ করে। একই ভাবে চন্ডীচরণের উত্তরসূরিরা ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্যের বিনিময়ে সরকারী উচ্চ পদে আসীন হন। চন্ডীচরণের দুই পুত্র জেলা জজ ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হয়েছিলেন। পুত্র তারিণীর এক পুত্র শ্যামলানন্দ দুমকার মহকুমা শাসক থাকার সময় ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহী সিপাহীদের হাত থেকে ট্রেজারীর সম্পদ রক্ষা করেন। অন্য পুত্র জগদানন্দ কলকাতায় ব্রিটিশ যুবরাজের ভ্রমণের সময় বাড়ির মহিলাদের দিয়ে বরণের ব্যবস্থা করে রক্ষণশীল বাঙ্গালী সমাজের বিরাগ ভাজন হন। কিন্তু ব্রিটিশের অনুগ্রহে এই পরিবারের চরম আর্থিক ও সামাজিক সমৃদ্ধি ঘটে।

৩) দামোদর তীরের ইন্দাস থানার সোমসার গ্রামের গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পরিবার কোম্পানী শাসনের নিলাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও মৌজার পত্তনি প্রক্রিয়ায় সুবিধা নিয়ে নয়া জমিদারে পরিণত হয়। গুরুপ্রসাদ বাঁকুড়া শহরে কোম্পানীর উকিল হিসাবে ওকালতি পেশা শুরু করে উপার্জিত অর্থে জমিদারি কিনতে থাকেন। গুরুপ্রসাদের পুত্র হলেন হরিশঙ্কর (১৮০০-১৮৭৬খ্রিঃ)। তিনি বর্ধমান রাজ এস্টেটের নায়েবের কন্যা মঙ্গলাকে বিবাহ করার ফলে বর্ধমান রাজ এস্টেটের অধীন মৌজাগুলির পত্তনি পেতে অন্য ধরণের সুবিধা পেতে থাকেন। অন্য দিকে ছিলেন সরকারী উকিল ও পিতা গুরুপ্রসাদ। তিনি খুব দ্রুত মাত্র এগার শত একুশ টাকা এক আনা এক পাই বার্ষিক খাজনায় দলদলি, সাহেবগঞ্জ, মানখামার, তেঁতুলমুড়ি, নয়নানন্দপুর, কুলাড়া, মাজডিহা, হাতবাড়ী সহ ২৬ টি মৌজার পত্তনি স্বত্ত্ব লাভ করেন। হরিশঙ্কর বাবু বিভিন্ন দরিদ্র মানুষের জমি প্রলোভন, ভয় দেখিয়ে অল্প দামে গ্রাস করতেন বলে অভিযোগ। যেমন (১) ১৮৫০ সালের একটি দলিল থেকে জানা যায়, দেনার দায়ে খোদা বক্স ও জান বিবির জমি নিলামের মাধ্যমে হরিশঙ্করের দখলে আসে। (২) ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে নিলামের মাধ্যমে রমানাথ চট্টোপাধ্যায়ের দোচালা ঘর ও ৪.৫ কাঠা জমি ২১ টাকা ৮ আনায় তাঁর হাতে আসে। (৩) ১৮৫০ সালে

১০ই জ্যৈষ্ঠ কাসিমা বিবির বাস্তু সহ দুই কাঠা রাজদত্ত লাখেরাজী জমি ১২ টাকা মূল্যে কেনা হয়। (৪) ১৮৫২ সালের ২০ শে আষাঢ় দাসীমণি বোষ্টমী, কিনি বোষ্টমী ও মণি বোষ্টমীর কাছ থেকে এক কাঠা জায়গা হস্তগত করেন। (৫) ১৮৫১ সালের ১৫ ই জুন শিবনারায়ণ রায় ও বাদলচন্দ্র রায়ের কাছ থেকে ৪৯ টাকায় বসতবাড়ী, কূয়ো সহ চার কাঠা জমি অধিকারে আসে। (৬) শেখ বকসুরের জমি হস্তগত হয়। (৭) দাঁ পুষ্করিণী গুরুপ্রসাদের সময়ে দখলে আসে। এটি ৯ টাকা মীনকর জমায় শচীন কেওটকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। (৮) ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ শে ফাল্গুন লালমণি দাসীর বাস্তু হরিবাবু দখলে নেন। (৯) ১৮৪০ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারী মধুসূদন পোতদারের জমি নিলামের মাধ্যমে চার আনা মূল্যে হরিশঙ্করের অধীনে আসে। এর থেকে সমকালীন জমিদারি শোষণের একটি চিত্র ফুটে ওঠে।

(৪) ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে কাশ্মীর রাজ্যের দেওয়ান নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় (আদি নিবাস নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া) বাঁকুড়া শহরে কাঠজুড়িডাঙ্গায় বিশাল বসতবাড়ী তৈরি করে লোকপুরের গিসবর্ণ কোম্পানীর নীলকুঠি সহ জমি ও শুশুনিয়ার কাছে ১২৪৪ বিঘার পলাশবনী মৌজার পত্তনি ক্রয় করেন। বসতবাড়ীর নাম হয় 'মালতী কুঞ্জ' ও লোকপুরের নীলকুঠির নাম হয় 'নীলাম্বর মঞ্জিল'। কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতি দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও নীলাম্বরের আরেক ভাই ঋষিবরের সহ-সভাপতিত্বে 'বাঁকুড়া সম্মেলনী' প্রতিষ্ঠিত হয়। লোকপুরের নীলকুঠি সহ ৮০ বিঘা জমি দানকৃত হলে ১৯২২ সালে 'বাঁকুড়া সম্মেলনী'র অধীনে একটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

(৫) পাত্রসায়ের থানার দামোদর তীরের বারাসত গ্রামের দ্বারিনানাথ রায় ওকালতি ব্যবসায় সূত্রে বাঁকুড়া শহরের রামপুরে অবস্থান করেন ও উপার্জনের টাকায় ছাতনার শুশুনিয়া-চাঁদরার পত্তনি ক্রয় করেন। তাঁর পুত্র কমলকৃষ্ণ রায় ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী।

(৬) বাঁকি গ্রামের ভৈরব চন্দ্র ভট্টাচার্য তেজারতি কারবার থেকে লব্ধ আয়ে বাঁকি, সেন্দ্রা, তালডাঙ্গা, কাটনার, আইলঠা, প্রতাপপুর, আকুড়্যাবাঁধ ইত্যাদি মৌজার পত্তনি ক্রয় করেন। পুত্র অভয়পদ আইন ব্যবসায়ে মন দেন। অভয়পদর বড় ছেলে অম্বিকাচরণ কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতি ছিলেন। মধ্যম পুত্র অবনীভূষণ চিকিৎসক ও কমিউনিষ্ট আর কনিষ্ঠ অম্বুজাক্ষ ছিলেন আয়কর আধিকারিক।

(৭) ভাদুলের সিংহ কায়স্থ পরিবার ছিল মল্লরাজের সামরিক বাহিনীর সদস্য

এবং মল্লরাজ ঘনিষ্ঠতার সুযোগে বহু ভূসম্পত্তির মালিক। এই পরিবার মল্লশাসনের অবসানের পর ব্রিটিশের অধীনেও রাজকর্মচারী ছিলেন। এই বংশের রাধিকাপ্রসাদ সিংহ ছিলেন বিহার পুলিশের দেওঘরের সার্কেল ইন্সপেক্টর। তাঁর পুত্র মণীন্দ্রপ্রসাদ সিংহ সিমলায় বিদেশ দপ্তরে কর্মরত থাকলেও অচিরেই ব্রিটিশের বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিবাদে চাকুরি ছেড়ে জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। ভাই ছিলেন প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অর্থের যোগানদার। রুষ্ট ব্রিটিশ সরকার রাধিকাপ্রসাদের পেনশন বন্ধ করে দিলে এই অন্যায়ের প্রতিবাদে লড়াই করে সিংহ পরিবার পেনসনের অধিকার ফিরে পান।

(৮) মল্লরাজার অধীনে গঙ্গাজলঘাটির ঘাটোয়াল ছিলেন রাজপুত ক্ষত্রিয় বংশীয় অর্জুন সিংহ। অর্জুন পুত্র দিবাকর সিংহ ছিলেন কনেমারা-ঢাককাটা মৌজার পত্তনিদার। তিনি ছিলেন প্রজাপীড়ক। দিবাকর পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ ছিলেন এদের বিপরীত চরিত্রের। ১৯১৫ সালের দুর্ভিক্ষের সময় জমিদারের মজুত চাল-ধান প্রজাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য করেন। দিবাকর মহলে পালাপার্বণ, উৎসব, রাজপুত ‘আহোরিয়া পর্ব’ পালনে অগাধ অর্থ ব্যায় করলেও প্রজাসাধারণের সাথে নির্মম ব্যবহার করতেন। গোবিন্দপ্রসাদ ছিলেন বাঁকুড়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের মুখ। তিনি নিজ সম্প্রদায়ের উদারমুখী সংস্কারের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে পাতিয়ালার মহারাজ ও মঙ্গলপোতের রাজার উপস্থিতিতে কনেমারায় একটি বৃহৎ ক্ষত্রিয় মহাসভার আয়োজন করেন। কিন্তু গোঁড়া ক্ষত্রিয় সমাজের বাধায় তিনি খুব একটা সফলতা পাননি। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ‘অমর কানন’ নামে এক সেবা আশ্রম।

(৯) মল্লরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের সভাপন্ডিত হিসাবে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর থেকে এসেছিলেন চক্রবর্তী বংশীয় গদাধর শিরোমণি। সঙ্গীতজ্ঞ গদাধর মল্লভূমে কথকতার স্রষ্টা বলে জানা যায়। তিনি বর্ধমান ও মাহিষাদলের রাজারও আনুকূল্য পেয়েছেলেন। এই সব পৃষ্ঠপোষকতার জোরে তিনি অনেকগুলি তালুকের মালিক হন। তিনি সোনামুখীতে স্থায়ী বাসস্থান ও বাবুপাড়ায় গোবিন্দজীউ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। গদাধরের পুত্র হলেন বিশ্বম্ভর বিদ্যাভূষণ। এই পরিবারের সম্পর্কিত দৌহিত্র বংশের ‘বন্দ্যোপাধ্যায়’ বাবু পরিবার। এই বাবু পরিবারের দৌহিত্র বংশ হল মুখোপাধ্যায় পরিবার। এই বংশের ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সোনামুখীর কয়লাখনির মালিক রসরাজ বিশ্বাসের সাহায্যে জাহাজের বাঁশের পাটা সরবরাহ ও লঞ্চের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তিনি পড়ন্ত বাবু বংশের জমিদারি ও অযোধ্যার

জমিদারির অংশ বিশেষ ক্রয় করে বড় জমিদারে পরিণত হন।

শিরোমণির বংশের গন্ধর্বা পরিণয়সূত্রে তারিণীপ্রসাদের সাথে আবদ্ধ হলে 'বাবু' দৌহিত্র বংশের জন্ম হয়। তারিণীর পুত্র ছিল অমৃতশেখর। অমৃতশেখরের পুত্র বিজয়মাধব। বিজয়ের পুত্র সগুণানন্দ ওরফে বগলাবাবু ছিলেন তাঁদের আরেক দৌহিত্র বংশীয় ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের সমসাময়িক। তিনি কাকা তিনকড়ির কয়লা ব্যবসা, ধীরেন বাবুর রাণীগঞ্জের কাগজ কারখানার সাথে যুক্ত থেকে অনেক টাকার মালিক হন আর সোনামুখীতে সিনেমা ও ধানকলের ব্যবসা শুরু করেন। শিরোমণির দৌহিত্র বংশীয় জমিদার অমৃত শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে ১৮৮৬ সালে সোনামুখী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা নেন, অন্য তিন জমিদার শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, শুচিশেখর মুখোপাধ্যায়, সত্যশেখর মুখোপাধ্যায়ের সাথে। অমৃত শেখরের দৌহিত্র বংশের জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে এই বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণের জন্য ৫০০০ টাকা দান করলে বিদ্যালয়টির নতুন নামকরণ হয় ধীরেন্দ্রনাথের মা 'বিন্দুবাসিনী'র নামে।

(১০) দুশ বছর আগে বর্ধমান জেলার কোগ্রাম থেকে বৈদ্যবংশীয় পদ্মলোচন রায় ভাগ্যান্বেষণে এসে হাড়মাসড়ায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পৌত্র ব্রজলাল ছিলেন রাজার ঘাটোয়াল। আর এক পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন লাটপাকসাড়া, কদমা, চিমড়া, কলমলি, কাদামারী ইত্যাদি মৌজার পত্তনিদার। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র প্রবোধচন্দ্র কলকাতা মহানিগমে চাকুরি করতেন ও অন্য ভাই নারায়ণচন্দ্র ছিলেন একজন ডাক্তার। নারায়ণচন্দ্র 'বাকুড়া সম্মিলনী'র সাথে যুক্ত থেকে অম্বিকানগর ও হাড়মাসড়ায় ১৯৫০ সালে কূপখনন সহ বিভিন্ন ত্রাণ কাজের নেতৃত্ব দেন। দাদা প্রবোধচন্দ্র কলকাতা মহানিগমের মোটা মাহিনার চাকুরির মোহ ত্যাগ করে গ্রাম গঠন ও গ্রামের শিক্ষা বিস্তারে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি ১৯২১ সালের ১৯ জানুয়ারী অনেক সমমনস্ক মানুষের সহযোগিতায় গড়ে তোলেন হাড়মাসড়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়।

(১১) দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় নামের এক বর্ধমানের উকিল পিয়ারডোবা অঞ্চলের পত্তনি নেন।

(১২) বাঁকুড়া শহরের উকিলপুত্র হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ওন্দা থানায় লাট সাহেবগঞ্জ, দলদলি, মানখামার, তেঁতুলমুড়ি, নয়নানন্দপুর, কুলাড়া, মাজডিহা, হাতবাড়ী ইত্যাদি ২৬ টি মৌজার পত্তনিদার হয়েছিলেন ১১২১টা ১আ ১ পাই খাজনা আদায় দেওয়ার শর্তে।

(১৩) কালীতলা নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার অর্জুনপুর, পুরন্দরপুর, হলাইগড়া, রাইপুরের কাজলা, চিলতোড়, বনপাহাড়ী ইত্যাদি মৌজার পত্তনি নিয়েছিলেন।

(১৪) অযোধ্যার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার নীল ব্যবসার রোজগার থেকে বহু পত্তনির মালিক হন। ১৩০২ বঙ্গাব্দে এই পরিবারের ৫০০ টি তৌজিভূক্ত ৫০৮টি পত্তনি নিলাম হয়ে যায়। এগুলি কেনেন শিয়ারশোলের শ্যামসুন্দর মালিয়া। লাট সেনাপতি মহল কেনেন বর্ধমানের উকিল দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আর সোনামুখীর লঞ্চ ব্যবসায়ী ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

(১৫) বাঁকুড়াবাসী ব্যবসায়ী হরিকিষণ রাঠী হরিপুর, লাট চুয়ামসিনা, রাধানগর, ইছোরিয়া মৌজা, লায়েকবাঁধ জঙ্গলের পত্তনি লাভ করেন।

(১৬) রাণীগঞ্জের মাড়োয়ারী রামবল্লভ বাঁকুড়া শহর সহ কয়েকটি মৌজার পত্তনিদার ছিলেন।

(১৭) গোপালনগরের বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল আরেক পত্তনিদার।

(১৮) রোলের সৈয়দ পরিবার ছিল একজন বিশিষ্ট পত্তনিদার। এই রোলের জমিদারি প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য নিহিত ছিল।

মল্লভূমে বিভিন্ন জমিদার বংশের পাশাপাশি রোলের মুসলিম জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠা মল্লরাজের ধর্মনিরেপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। পয়গম্বর হজরত মহম্মদের পার্ষদ হজরত ওসমানের উত্তরপুরুষ কাজী আহমদ্দিন ওসমানি মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে দিল্লী আসেন ও প্রধান কাজী পদে নিযুক্ত হন। কাজী ওসমানের তৃতীয় উত্তরপুরুষের বংশধর শাহ কামালউদ্দিন বাংলায় বর্ধমানের দিঘনগর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন ঔরঙ্গজেবের শাসনের অন্তিম লগ্নে। তাঁর মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ মাদার ধর্ম প্রচারের জন্য রোলে আসেন। এই ঘটনা ঘটেছিল গোপাল সিংহ (১৭১২ - ১৭৪৮) বা ২য় রঘুনাথ সিংহের রাজত্বের শেষ দিকে। তাঁর পান্ডিত্য ও পবিত্রতার জন্য মল্লরাজ মুর্শিদ চক, কানাই চক, বলাই চক মৌজা তিনটি আয়মা মৌজা হিসাব তাঁকে প্রদান করেন। আরো অনেক নিষ্কর লাখেরাজ ভূসম্পত্তির মালিক হয়েছিল এই পরিবার। শাহ মাদারের পর বংশের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিল যে উত্তর পুরুষরা, তাঁরা হলেন চৌধুরী মহম্মদ আল ওসমানি-আব্দুর রহমান-ইমায়েতুল্লাহ-গোলাম মওলা-হামিদউল্লাহ-গোলাম আব্বাস-গোলাম হায়দার-গোলাম আহমদ-চৌধুরী কেরামতুল্লাহ-সাজেদউর রহমান/ আজিজিউর

রহমান — চৌধুরী মহম্মদ তৈয়ব- চৌধুরী মহম্মদ আলি/ মহম্মদ ইব্রাহিম(-১৯৩০-)। ১৭৫০-১৭৬০ সালের মধ্যে পরিবারের জনৈকা কর্ত্রী তৈয়বা খাতুন রোলে যে মসজিদ স্থাপন করেন, সেটি জামা মসজিদ নামে পরিচিত। ১৮৯২ সালে চৌধুরী মহম্মদ তৈয়াব নিজ নামে একটি ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। রোলের জমিদাররা ইউনিয়ান বোর্ডের সভাপতিত্ব করেছেন অনেকদিন। সামজিক দায়িত্ব পালনে এই পরিবারের ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। রোল, ঠাকুরগাঁ, কুসুমগ্রাম — এই তিন খন্ডে তিন ম্যানেজার রেখে দীর্ঘ দিন জমিদারি পরিচালনা করেছেন রোলের চৌধুরী পরিবার।শাহ মাদারের ইচ্ছা অনুসারে পরিবারটি একতলা জমিদারবাড়িতে বাস করতেন। জমিদারির সাধারণ প্রজারাও এই রীতি মেনে চলতেন।

(১৯) বাঁকুড়া শহরবাসী মুন্সী আলি জামিন চামড়া ব্যবসায়ের লাভের টাকা পত্তনি ক্রয়ে বিনিয়োগ করেন।

(২০) কোগ্রাম আগত বৈদ্যবর্ণীয় রায় পরিবারের হাতে আসে পাকসারা, কদমা, বিঘারা, কলমলি, কাদামারী মোজা সমূহ।

(২১) সোনামুখীর গন্ধবণিক 'ঘর' পরিবারের হাতে আসে সোনামুখী, ধুলুই, লাচনহাটি সহ কয়েকটি মৌজা।

(২২) সোনামুখীর বন্দ্যোপাধ্যায় ও দৌহিত্র মুখোপাধ্যায় পরিবার ছিল পত্তনিদার।

(২৩) পোদ্দার-সুবর্ণবণিক মাকড়া পরিবার নন্দকুমার দের সুবাদে কৃষ্ণবাটী, মাধববনী, মবারকপুর, প্রসাদপুর ও বৈকণ্ঠপুর মৌজার পত্তনি লাভ করে।

(২৪) মালিয়াড়া থেকে কাশ্মীর রাজ্যের প্রাক্তন দেওয়ান নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় পলাশীবনা মৌজার পত্তনি কিনেছিলেন।

(২৫) হাজারিবাগ-কোডারমা অভ্র ব্যবসায়ী সাহানা পরিবার লাভ করে মুড়ড়া, এক্তেশ্বর, কাঞ্চনপুর প্রভৃতি মৌজা।

(২৬) কয়লা ব্যবসায়ী শিয়ারশোল মালিয়াদের আত্মীয় কালীপ্রসাদ বশিষ্ঠ কাশীপুরের রাজার কাছ থেকে মহিষাড়া পরগণার শ্যামপুরের দুটি মৌজা পত্তনি নেন।

(২৭) পাটপুর মৌজার পত্তনিদার ছিলেন কুমার রমেন্দ্র মালিয়া।

এছাড়া ইন্দাসে সত্যকিঙ্কর পিতা প্রাণকৃষ্ণ সাহানার জমিদারি, পোখন্নার কালীভূষণ-দ্বিজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জমিদারি, কোতলপুরে কমলাকান্ত বসুর জমিদারি, কলাবতীর চৌধুরী, শুসুকপাহাড়ীর দত্তদের মতো বহু পত্তনি বা জমিদারির সৃষ্টি হয়।

## কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রাম পত্তনের নিদর্শন ও গ্রাম প্রশাসন

একদা মল্লভূম ছিল রাঢ়বঙ্গের এক আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। বৃহৎ মল্লভূমে গড়ে ওঠা ছোট বড় নানা জনপদ নানা কারণে বিশিষ্টতা ও নিজস্বতা অর্জন করেছে সময়ের সাথে সাথে। মল্ল সময়ে মল্লানুকূল্যে বা আর্থ সামাজিক কারণে বেশ কিছু গ্রাম গড়ে ওঠে এবং গড়ে ওঠা গ্রামে স্থাপত্য-ধর্মাচরণের নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। দেবদেউল, পালা-পার্বণ এবং তাঁকে ঘিরে নানান সংস্কৃতি ছড়িয়ে আছে জনপদের আনাচে কানাচে। কোথাও অক্ষত মহিমায় কোথাও-বা ক্রমক্ষয়ের স্মারক হয়ে, কোথাওবা অবলুপ্তির অবশেষ নিয়ে। এমন কিছু গ্রামের বিশিষ্টতা নিম্নে আলোচনা করা হল।

### ১) বৈতল ও ময়নাপুর

অধুনা বাঁকুড়া জেলার এক সমৃদ্ধ জনপদ বৈতল। মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে যদি একটি পঁচিশ কিলোমিটারের বৃত্ত টানা হয় তাহলে যে বিস্তৃত ক্ষেত্র দেখি তার প্রায় ব্যাসরেখায় অবস্থান করছে প্রত্নভূমি বৈতল। এটি বাঁকুড়া জেলার একটি অতি বড় গ্রাম। অনেকগুলো পাড়া নিয়ে গঠিত এই ইতিহাস সমৃদ্ধ গ্রামটির বহুকাল থেকেই দুটি ভাগে বিভক্ত, যথা উত্তরবাড় (জেএল নম্বর ১২৭) ও দক্ষিণবাড় (জেএল নম্বর ১৩৪)। পুরো গ্রাম জুড়েই ইতিহাস বাঙ্ময় হয়ে আছে। বিষ্ণুপুর থেকে জয়পুর হয়ে সলদা-গোকুলনগর হয়ে বৈতল গ্রামে পৌঁছানো যায়। খুব কাছেই পশ্চিম মেদিনীপুর ও হুগলি জেলা।

একদিকে স্থাপত্য শিল্প, অন্যদিকে প্রাচীন ও লৌকিক দুই সংস্কৃতির বিবিধ উপকরণ অঞ্চলটিকে উচ্চতর মাত্রা দিয়েছে।

গ্রামের একপ্রান্তে দক্ষিণবাড় মৌজার 'গড়ধার'-এ দাঁড়িয়ে আছে মাকড়া পাথরের পঞ্চরত্ন শ্যামচাঁদ মন্দির। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৩৬ ফুট, উচ্চতায় ৪০ ফুট এই মন্দির এক নিপুণ স্থাপত্যের নিদর্শন। একটি পাথরের ভিত্তিবেদির ওপর নির্মিত। মন্দিরের দেওয়ালে ক্ষোদিত প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়

> "শ্রীল শ্রী রাধিকাকৃষ্ণ পদপঙ্কজ সান্নিধ্যে
> রসর্তুগ্রহগেশাকে বীর হাম্বির জখনত্বা
> রঘুনাথ নরেশস্য সুবর্ণমণি সংগ্রহয়া
> মাহষ্যাগ্রমদেন্বেদ নবরত্ন সমর্পিত।"

অর্থাৎ বীর হাম্বিরের পুত্র প্রথম রঘুনাথ সিংহের পত্নী সুবর্ণমনি ৯৬৬ মল্লাব্দে, ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরটি এখন সরকার দ্বারা অধিগৃহীত। সরকারি ফলকেও নির্মাণকাল লেখা আছে।

বিষ্ণুপুরের বাইরেও মল্লভূমে যে বিস্তৃত মল্ল স্থাপত্যের নিদর্শন রয়েছে তার খুব একটা প্রচার নেই। এরকমই এক প্রচারবিহীন স্থাপত্য হল বৈতল গ্রামের শ্যামচাঁদ মন্দির। বৈতল গ্রামটি বেশ প্রাচীন ও বড়। কেবল তাই নয়, অবস্থানহেতু অর্থাৎ বাঁকুড়া, হুগলি ও মেদিনীপুর জেলার সঙ্গমস্থলের কাছাকাছি হওয়ার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম।

বিষ্ণুপুর থেকে মেদিনীপুরগামী সড়কে খানিক এগোলেই পড়বে বাঁকাদহ। বাঁকাদহ থেকে বাঁহাতি যে পাকা রাস্তাটি জয়রামবাটির দিকে চলে যাচ্ছে, সেই রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে আসবে বৈতল পাথরপুকুর মোড়। এখান থেকে ডান দিকের রাস্তায় ঢুকলে পড়ে কসবা গ্রাম। গ্রামে ঢোকার মুখে চোখে পড়বে পুরাতত্ত্ব বিভাগের সাইনবোর্ড যাতে তিরচিহ্ন দিয়ে দিক-নির্দেশ দেওয়া আছে শ্যামচাঁদ মন্দিরের। নির্দেশিত পথে এগোতে এগোতে পাওয়া যাবে অভীষ্ট শ্যামচাঁদ মন্দির।

প্রত্নতত্ত্ব অধিকার দ্বারা অধিগৃহীত মন্দিরটি অনেকটা এলাকা জুড়ে। চারপাশ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তার ওপর তারকাঁটা। পুরাতত্ত্ব বিভাগের সাইনবোর্ড ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়, মল্লরাজ বীর হাম্বিরের পুত্র রাজা রঘুনাথের পত্নী সুবর্ণমণি শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবার উদ্দেশ্যে মন্দিরটি ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন। মন্দিরটি মাকড়া পাথরের নির্মিত পঞ্চরত্ন। রত্নগুলি খাঁজকাটা রেখ দেউলসদৃশ। মন্দিরের সবদিকেই ত্রি-খিলান যুক্ত প্রবেশপথ। চারচালা রীতির বাঁকানো ছাদের ঠিক মাঝখানে এক বিশাল রত্নশিখর এবং তারই চার কোণে চারটি ছোট ছোট রত্নশিখর দ্বারা পরিবেষ্টিত। মন্দিরের চার কোণে চারটি প্রকোষ্ঠ এবং তার লাগোয়া চারটি বারান্দা মিলেমিশে গর্ভগৃহকে বেষ্টন করে যেন পরিক্রমা রচনা করেছে। মন্দিরের উল্লেখযোগ্য দিক হল, দক্ষিণ দিকে বারান্দার ভেতরে একটি পার্শ্বকক্ষের মধ্য দিয়ে পাথরের সংকীর্ণ ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়।

গর্ভগৃহের দেবতা কষ্টিপাথরের কৃষ্ণমূর্তি বাঁশি হাতে দণ্ডায়মান, সঙ্গে অষ্টধাতুর শ্রীরাধিকা। পাশেই বেদির ওপর নারায়ণশিলা। নিত্যভোগ ও নিত্যসেবা হয়। মূল মন্দিরের সামনে একটি বাঁধানো কুয়ো, যার জলস্তর সারা বছরই এক থাকে। গ্রীষ্মের দিনেও নাকি একটুকুও জলস্তর কমে না। মন্দিরের ঠিক দক্ষিণে রয়েছে গ্রামের

ষোলো আনার শীতলা মন্দির। পুজোর নির্দিষ্ট দিন ছাড়া মন্দির সাধারণ সময়ে বিগ্রহহীন পড়ে থাকে।

বিগ্রহের নামে প্রায় ২০-২৫ বিঘা দেবোত্তর জমি আছে। সৃজিত বন থেকে আয় দেবসবার কাজে ব্যবহার করা হয়। শ্যামচাঁদ মন্দির ছাড়াও বৈতলের উত্তরবার মৌজায় হাটতলায় রয়েছে ঝগড়াই চণ্ডীর এক প্রাচীন মন্দির। ছোট সপ্তরথ দেউল শৈলীর মন্দিরটি চুনকাম করা। তবে চটে যাওয়া অংশ প্রমাণ করে যে এটি মাকড়া পাথরের দ্বারা নির্মিত। মন্দিরের শিখরে দুই থাক আমলক, তার ওপর কলস, পতাকা দণ্ড ও দণ্ডের সঙ্গে রয়েছে একটি ধাতব চক্র। উত্তরমুখী মন্দিরের মূলদ্বারের দু'পাশে দুটি কুলুঙ্গি, একটিতে চতুর্ভুজ গণেশ, অপরটিতে ময়ূরবাহন কার্তিক। মন্দিরটিতে উল্লেখযোগ্য অলংকরণ কিছু নেই। কেবলমাত্র দ্বারের ওপরে অল্প পঙ্খের কাজ ছাড়া। গর্ভগৃহের মধ্যে অবস্থান করছেন কালো কষ্টিপাথরের দেবীমূর্তি। বিগ্রহের দুই চোখ ধাতু নির্মিত এবং মাথায় মুকুট পরিহিত, সর্বাঙ্গে কাপড় জড়ানো। মন্দির প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কিংবদন্তিটি সম্পর্কে অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি'তে লিখেছেন, মহারাজ প্রথম রঘুনাথ সিংহ চেতোয়াবরদা রাজ্যের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হবার সময় গভীর অরণ্যের মধ্যে এক অপরূপ সুন্দর মূর্তি ক্ষণিকের জন্য দেখতে পান। এই ঘটনাকে তিনি দেবীর কৃপা হিসাবে ধরে নেন। যুদ্ধ জয় করে ফেরার পর তিনি এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। ঝগড়ার ফলস্বরূপ এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত বলে দেবী 'ঝগড়াই চণ্ডী' নামে লোকমুখে পরিচিত হন। দেবী নিত্যপূজিতা। দুর্গাপূজার সময় দশমীর দিন মন্দিরে উৎসব হয় এবং সেই উপলক্ষে একটি মেলাও বসে। ঘটনাটি প্রথম রঘুনাথের সময়ে ঘটলে সমর অভিযান চেতুয়া-বরদার বিরুদ্ধে হওয়া সম্ভব নয়। এমন যুদ্ধ ঘটেছিল দ্বিতীয় রঘুনাথের আমলে। সুতরাং এই বিবাদের ঘটনা ঘটেছিল সম্ভবত বর্ধমান রাজার সাথে।

প্রায় একই ধরণের আরেকটা গল্প শোনা যায় রাজা রঘুনাথকে নিয়ে। মল্লরাজ বর্ধমান রাজের সাথে লড়াইয়ে যাওয়ার সময় এক বড় বট গাছের নিচে কাদা মাখা বালিকাকে বসে থাকতে দেখেন। বালিকা রাজাকে কাদা মাখা খেলায় আহ্বান জানালে তিনি বলেন, যদি লড়াইয়ে তিনি জিততে পারেন ফিরে এসে তিনি কাদা খেলা খেলবেন। কথিত আছে লড়াইয়ে জিতে দশমীর দিন সেনা-অমাত্য সহ কাদা খেলায় মেতে ওঠেন। যেই ঘটনার স্মরণে আজও দশমীর দিন আশপাশের গ্রামের নারীপুরুষ জমায়েত হয় ঝগড়া চন্ডী মন্দিরের সামনে। সাতটি পুকুরের জল জমা করে তার

মধ্যে স্নান ও কাদা ছোড়ার উৎসবে মেতে ওঠে।

মন্দিরের পূর্ব দিকে একটি বাঁধানো বেদির ওপর অস্পষ্ট একটি খোদিত মূর্তি রয়েছে যা স্থানীয়ভাবে দেবী ষষ্ঠী হিসাবে পূজিতা হন। মন্দিরের সামান্য উত্তরে একটি ছোট্ট দোলমঞ্চ আর রয়েছে একটি চার চাকার লোহার রথ।

এছাড়াও, এই গ্রামে আছে ধর্মরাজ বাঁকুড়া রায়ের মন্দির ও রাধাদামোদরের পঞ্চরত্ন মন্দির।

১৬৫৯ ও ১৬৬০ সালে মল্লরাজা প্রথম রঘুনাথ সিংহ জয়পুরের বৈতল গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন দু'টি মন্দির। একটি মাকড়া পাথরের ঝগড়াই চণ্ডী ও অন্যটি শ্যামচাঁদের মন্দির নামে খ্যাত। শ্যামচাঁদের মন্দিরটি পাথরের পঞ্চরত্ন শৈলির। ওই গ্রামেই আরও একটি পঞ্চরত্ন শৈলির মন্দির রয়েছে যার দেবতা রাধাদামোদর। আঠারো শতকে সেখানে তৈরি হয় বিখ্যাত বাঁকুড়া রায় নামে খ্যাত মাকড়া পাথরের ধর্মরাজের মন্দিরটি। ইতিহাস গবেষক অনেকের অনুমান, সেই দেবতার নামেই হয়েছে বাঁকুড়া জেলার নামকরণ।

জয়পুরের ময়নাপুর গ্রামে জন্মে ছিলেন 'শূন্যপূরাণ' রচয়িতা রামাই পণ্ডিত। তাঁর নামে একটি কলেজও হয়েছে। প্রাক্‌মুসলিম যুগে ওই গ্রামেই তৈরি হয় সপ্তরথ পীরা দেউল হাকন্দ মন্দির। মন্দিরের পাশের হাকন্দ দীঘির ধারেই নাকি রঞ্জাবতী-পুত্র লাউসেন নিজের দেহকে নয় খণ্ড করেন বলে জনশ্রুতি। বাঁকুড়ায় ময়নাপুরের প্রাক-মুসলিম যুগীয় দেউল ছাড়াও ধর্মঠাকুরের দালান আছে ইন্দাস (১৮-১৯ শতক) ও বেলিয়াতোড়ে (২০ শতকে গোড়ায়), আটচালা আছে বৈতল (১৮ শতক) এবং কোতুলপুরে (১৯ শতক)।

আঠারো ও উনিশ শতকে তৈরি আরও কয়েকটি মন্দির আছে এখানে। এখানকার যাত্রাসিদ্ধি রায়ের ধর্ম গাজনও বিখ্যাত। জয়পুরের পীরের দরগাগুলির মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত ইসমাইল গাজীর দরগা। সেটির অবস্থান লোকপুর গ্রামে। রাউতখণ্ড গ্রামে রয়েছে জগৎ গৌরীমায়ের মন্দির। পাথরের এই মন্দিরটিতে আছে আটচালাও। ভিতরে সাপের উপরে উপবিষ্ট মাথায় সপ্তনাগের ছত্রধরা মনসাদেবীর মূর্তি। ওই গ্রামেই রয়েছে ১৭৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত কালঞ্জয় শিবের মন্দির।

**২) দেউলবাড়ি**

দেউলবাড়িতে একসময় মল্লরাজাদের নির্মিত দক্ষিণমুখী সুবিশাল গিরিগোবর্ধন

মন্দিরের মাকড়া পাথরের কেবল ভিত্তি চাতাল অবশিষ্ট আছে। অনতিদূরে পাথর-চুন-সুরকির একটি ভিত্তি চাতাল হাওয়া মহল বলে পরিচিত। এখানে অস্থলের সম্পত্তিও লক্ষিত হয়। সুতরাং মল্লরাজাদের প্রতিষ্ঠান ও মন্দিরের প্রাচীন ইতিহাস সম্পৃক্ত এই গ্রামের ইতিহাস সময়ের অন্ধকারে হারিয়ে যেতে বসেছে। এছাড়া জেলায় গিরিগোবর্ধন মন্দির আছে সোনামুখী, অযোধ্যা, কোতলপুর-রাজগ্রামে।

**৩) কুমীরদহ**

কুমীরাদহ গ্রাম ওন্দা থানার মধ্যে বিড়াই তীরবর্তী প্রাচীন একটি গ্রাম। মধ্যস্থানে একটি মহাপ্রভুর চালা ঘর আছে যেখানে লৌকিক দেবতা মনসা, বাঘরায়, ভৈরব, কুদরা, কালোসোনার সাথে লাল শালুতে মোড়া পুঁথি মহাপ্রভু জ্ঞানে পূজা হচ্ছে। মন্দিরের পূজারী স্থানীয় ঘোষ পরিবার। আদিতে রমাড়, চুন, পুয়ান, বাঘমুখা মৌজায় ৬০ বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল। গ্রামে লোহার ও ঘোষ পরিবারের বাস। মন্দিরের অংশ ল্যাটেরাইটের থাম থেকে মনে হয় এখানে এক সময় রাধাকান্ত জীউয়ের মন্দির ছিল (মৌজা রাধাকান্তপুর, তিলি অধ্যুষিত)। গ্রামের ঘোষ পরিবার খটবাটি মৌজায় ১০০৩ বিঘা জমি ও ৪০০ বিঘা জঙ্গল কোনোভাবে দান হিসাবে পায়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পন্ডিত এই পরিবারের চার পুরুষ হল রাজেন্দ্র-শ্রীনাথ-গুরুচরণ-কালিপদ। গ্রামে লোহার, খয়রা, তাঁতিদের বাস ছিল।

**৩) যাদবনগর**

যাদবনগর গ্রাম লোহার, খয়রা, তিলি, গোয়ালা, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বাস। মল্লরাজ সম্পর্কিত সামন্ত যাদব রায়ের প্রবর্তিত এই গ্রাম বলে জনশ্রুতি। প্রতিষ্ঠা লিপি থেকে গ্রামের ধ্বংশপ্রাপ্ত এক মন্দির সম্পর্কে জানা যায় এটি ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে মল্লরাজ প্রথম রঘুনাথ সিংহ কৃষ্ণ উপাসনা মন্দির হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একরত্ন শিখর দেউল হিসাবে। মন্দির সংলগ্ন যাদবসায়ের একটি বড় দীঘি। এর পাড়ে অপর একটি বিলুপ্ত মন্দির ও কুয়োর জনশ্রুতি আছে।

**৪) দ্বাদশবাটি গ্রাম**

দ্বাদশবাটি গ্রামটি জনশ্রুতি ও প্রত্ন-প্রমাণের আধারে একটি প্রাচীন গ্রাম। জনশ্রুতি মল্লরাজ দুর্জন সিংহের (১৬৮২-১৭০২) দ্বিতীয় পুত্র গোপাল সিংহ বারটি মৌজার

দায়িত্ব নিয়ে এই জমিদারি পত্তন করেন। তাই জমিদারির নাম হয় দ্বাদশবাটী। তাঁর নিয়ন্ত্রিত মৌজাগুলি ছিল (১) হলুদবাড়ি (২) বড়বাড়ি (৩) কাঁটাবাড়ি (৪) তিলিবাড়ি (৫) বাবুর বাড়ি (৬) ভাজিবাড়ি (৭) তিলবাড়ি (৮) তিলিবাড়ি (৯) দ্বাদশবাড়ি (১০) বড় আমলাই (১১) ছোট আমলাই (১২) ভান্ডারিয়া (১৩) শাঁখারিয়া (১৪) ঝরিয়া (১৫) বনকাটি (১৬) ঝাটিবনী (১৭) বোলপুষ্করিনী (১৮) যাদবনগর (১৯) বারপেটা (২০) পেদ্যা। ৮টি অতিরিক্ত মৌজা১২ টি মৌজা থেকে বিভাজিত মৌজাও হতে পারে। আরেকটি মত হল মল্ল বংশীয় জমিদারি পত্তন কালে জমিদারি ও দেবোত্তর দেখভালের জন্য রাজ আনুকুল্যে বারটি পরিবারের এখানে অভিবাসন ঘটে। যেমন (১) ক্ষত্রিয় (২) খয়রা (৩) মাঝি (বরগা পদবীর বাগদী গোত্রের) (৪) বাউরি (৫) কুমোর (৬) কামার (৭) তাঁতি (৮) সদগোপ (৯) তিলি (১০) বারুই (১১) ময়রা (১২) নাপিত। এই দ্বাদশ জাতির নামে গ্রামনাম দ্বাদশবাটি হওয়ার সম্ভবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এখন ক্ষত্রিয়দের মধ্যে আছে মল্লবংশীয় জগবন্ধু সিংহদেব ও অম্বিকানগর ধবলরাজ বংশ থেকে বিবাহ সূত্রে সন্নিহিত জগন্নাথপুরে আগত ও স্থাপিত ধবল বংশ। রায় পদবীর ‘সর্দার’ খয়রা জাতিভূক্ত আছে অনেকে। এরা ছিলেন মল্লরাজের সামরিক বাহিনীতে, পরে ব্রিটিশের চৌকিদারি পেশায় নিযুক্ত হন। মাঝিরা চিড়া কুটার কাজ করত। সকলেই মল্লরাজ প্রদত্ত বাস্তু ও চাকরান সম্পত্তির মালিক। এখানে উঁচু ১০কাঠা জমির উপর নন্দলাল জীউয়ের দক্ষিণমুখী একরত্ন মাকড়ামুখী মন্দির অন্যতম পুরাসম্পদ। ১৬৯৭ খ্রিষ্টাব্দে দুর্জন সিংদেব মহিষী ধ্বজামণির আনন্দার্থে এই সৌধটি নির্মাণ করা হয়। দেবালয়ের অদূরে একটি মাকড়া পাথরের ভোগমন্ডপের ভিত্তিভূমি দেখা যায়। এটি চারচালা রীতিতে তৈরি হয়। সন্নিকটের ২৮ বিঘার একটি দীঘি ও ল্যাটেরাইটের ঘাট আছে। গ্রামে দুই পুষ্করিণী শ্যামকুন্ড ও রাধাকুন্ড ও পাড়ের দুই মন্দিরের অবশেষ ‘চিহ্ন’ আজও দেখা যায়। নন্দলালের পূজারী ছিলেন সন্নিহিত কাটাবাড়ী গ্রামের মহাপাত্ররা ও পেদ্যা গ্রামের চক্রবর্তী পরিবার। সেবাইত ছিলেন বনকাটির সদগোপ ও ঘোষ পরিবার। মল্লপরিবারের এই অংশের একটি বংশতালিকা নিম্নরূপ। শ্যামসুন্দর সিংহদেব-নন্দদুলাল-আনন্দ-বিনোদ-জীবনবল্লভ-শরৎসিহদেব-জগবন্ধু-স্বপন। শরৎ সিংহদেব বিচারক হিসাবে নিজের জমিদারি ছাড়াও মল্ল নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন স্থানের বিচার সভায় অংশে অংশ নিতেন। শ্যামসুন্দর প্রাগুক্ত গোপাল সিংহের উত্তরপুরুষ।

## ৫) কাঁটাবাড়ী

অষ্টাদশ শতকে বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় গ্রাম পত্তনের বড় দৃষ্টান্ত কাঁটাবাড়ী। মল্ল রাজানুকূল্যে গ্রামপত্তনের মুখ্য কারিগর ছিলেন নন্দী ও পাল পদবীর দুই দ্বাদশ তিলি পরিবার। নন্দীদের সাথে বৈবাহিক সূত্রে কুন্ডুদের আগমন ঘটে। নন্দী-কুন্ডুদের শালগ্রাম শিলা 'দামোদর' ছোট একটি দালান মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেবসেবা ও সামাজিক প্রয়োজনে গ্রামে আসে দুটি কর্মকার পরিবার। দেব বিগ্রহের আরাধনার জন্য মহাপাত্র, চক্রবর্তী, বল্লভ পদবীধারী ব্রাহ্মণদের আগমন ঘটে। মহাপাত্রদের আদি নিবাস ছিল দ্বারিকা গ্রামে। আর আসে একটি পরামাণিক নাপিত পরিবার, গুই তাঁতি পরিবার, মহন্ত বৈষ্ণব পরিবার। রাজাদের আনুকূল্যে এরা ভূসম্পত্তি ও বাস্তুর অধিকারী হন। গ্রামের ভাগবত ঘর-মন্দিরে ভাগবত পাঠ, কীর্তন, অতিথি সমাগম ঘটত। পাঠ করতে আসতেন নিত্যানন্দ বংশীয় গোস্বামীরা। মেলাঘর স্থাপনে ওড়িয়া রীতির প্রভাব আছে। কুন্ডু ও নন্দীদের কীর্তনের ধারা এখনও অব্যাহত আছে। কর্মকার পরিবারটির আগমন ঘটেছিল ২০০ বছরেরও বেশি আগে শ্যামসুন্দর কর্মকারের হাত ধরে। এই পরিবারের বংশলতিকা হল শ্যামাপ্রসাদ-তারাপদ-পেলারাম-কার্তিক-রামসদয়-কৃষ্ণচন্দ্র-হরিপদ-ভূজঙ্গ। দেবালয় ছাড়াও নন্দী-পাল বংশের পুষ্করিণী খনন, উদ্যান সৃষ্টির মধ্যে জমিদার মর্যাদার আভাস পাওয়া যায়। এই ভূম্যধিকারীদের কৃষি জমির চেয়ে বন-স্বত্ত্ব বেশি ছিল। খড়বাড়ী মৌজায় ২২০০ বিঘা ও বাবুর গোড়া মৌজায় ২৮০০ বিঘা জঙ্গলের মালিকানা ছাড়াও বনমধ্যে ২০০ বিঘার ভান্ডারিয়া বাঁধের(দিঘি) স্বত্ত্ব এদের হাতে আসে। ভান্ডারী বাঁধ মুখী দুটি পথ, গাঁঘাট ও বন ঘাট গড়ে ওঠা এই পুষ্করিণীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব প্রমাণ করে। এই নন্দী পরিবারের আদি নিবাস ছিল দ্বারিকা গ্রামে। এই পরিবারে তালপাতায় রক্ষিত এক বংশপঞ্জীতে দেখা যায় পরিবারের আদি পুরুষ হরেকৃষ্ণ নন্দী। বংশ ধারাটি হল হরেকৃষ্ণ-প্রসাদ- কমল-দামোদর- শ্রীবাস- চন্ডী-গিরীশ-পশুপতি-রঞ্জিত-উত্তম-পবিত্র। ১৮০৬ সালে বর্ধমান রাজার হাতে জমিদারি চলে গেলে এ গ্রাম থেকে রাজস্ব হিসাবে ১৫-২০ টি গরুর গাড়িতে শস্য দামোদর পার করে বর্ধমান রাজদরবারে পৌঁছাত। পরে নীলামে জয়পুরের দে-পোদ্দারদের হাতে জমিদারি চলে গেলে নন্দীপাড়ায় ৬ শতক জায়গার উপর কাছারি বাড়ি তৈরি করে কর আদায় চলত তাদের। বৈষ্ণবীয় ধারায় কুন্ডু-নন্দী পরিবারে পুঁথি লিখন, অণুলিখন, পাঠ, চব্বিশপ্রহর, নামকীর্তন ও ভৈরব-মনসা উৎসবের প্রচলন অব্যাহত ছিল অনেক কাল।

**৬) বনকাটি গ্রাম**

বিষ্ণুপুরের মড়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের বনকাটি গ্রাম ৫২ টি মৌজা নিয়ে ঘোষ পরিবারের জমিদারির সূচনা হয়। সদগোপ জাতির তিন ভাইয়ের পত্তন করা এই গ্রামে এখনও তিনটি বাটির একটি নিশ্চিহ্ন, একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ও একটি বর্তমান প্রসাদোপম দ্বিতল অট্টালিকা সেই অতীত গরিমার সাক্ষ্য দেয়। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পূর্বমুখী বিষ্ণুমন্দির চুন-সুরকিতে তৈরি ও উঁচু বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। পশ্চিম ও দক্ষিণে সরু অলিন্দের ঢাকা বারান্দা। এটির নির্মাণ অষ্টাদশ-ঊনিশ শতকে। ঘোষেদের প্রতিষ্ঠিত জোড়া শিব মন্দিরে শিবলিঙ্গ পূজিত হয়। একটি দালান মন্দিরে হাতি-ঘোড়ায় মনসার পূজা হয়। আর লৌকিক দেবী আছে চাঁপাই সিনি, বাগানে সিনি। পুরোহিত গোয়ালা ও খয়রা পরিবার। এই বৈষ্ণব ঘোষ পরিবারটি নিত্যানন্দ বংশীয় গোস্বামীদের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ঘোষ ভূস্বামীরা গুরু বংশ গোস্বামীদের ২০০০ বিঘা একটি জঙ্গল (গোঁসাইয়ের জঙ্গল নামে পরিচিত) ও খুলেমুড়ি মৌজা দান করে এদের এখানে অভিবাসিত করেন।

**৭) উলিয়াড়া-নারায়ণপুর**

ব্রাহ্মণ-মাল-কর্মকার পরিবার অধ্যুষিত উলিয়াড়া-নারায়ণপুর গ্রামে ঊনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি কৃষ্ণ-বলরামের মন্দির। মধ্যাহ্নে অন্নভোগ, সন্ধ্যায় শীতভোগ ও মাঘী পূর্ণিমায় রাসোৎসব হয়ে থাকে। এখানে এদের সাথে পূজিতা হন বসুধা-জাহ্নবী। নারায়ণপুর মৌজায় দুই তৃতীয়াংশ এলাকাই দেবোত্তর। মৌজার ৩০০ বিঘা জমির ১০ আনা ১৩ গন্ডা ১ আনা ১ ক্রান্তি দেবোত্তর ও অবশিষ্ট ৫ আনা ৬ গন্ডা ২ কড়া ২ ক্রান্তি প্রজাবলী স্বত্বের। মন্দিরের পাশে আটচালা মন্দির, বাংলা রীতির রাসমঞ্চ ও তিন একরের যমুনা পুকুর অবস্থিত। এই গ্রামের বৈষ্ণবীয় ভাবধারা ছিল নিত্যানন্দ প্রভাবিত। স্পষ্টতই মল্লভূমে চৈতন্যোত্তর নিত্যানন্দ ভাবধারা ও পরবর্তীকালের শ্রীনিবাস আচার্যের প্রচারিত বৈষ্ণব মতাদর্শের সম্মিলনে একটি শক্তিশালী বৈষ্ণবীয় পরিমন্ডল সৃষ্টি হয়েছিল। দেউলবাড়ী, কুমীরাদহ, গোপালপুর, তেজপাল, দেউলী, কাকিলা, মুনিনগর, মনিপুর, যাদবনগর, দ্বাদশবাটী ছিল শ্রীনিবাস প্রভাবিত। অন্যদিকে মড়ার, বনকাটি, বারপেটা, নারায়ণপুর ছিল নিত্যানন্দ প্রভাবিত।

মন্দির চত্বরের সাদামাঠা বেদীর উপর তুলসি মঞ্চটি অনেকের মতে মন্দির প্রতিষ্ঠাতা জনৈক 'অধিকারী'র। উলিয়াড়া গ্রামের জনৈক নিঃসন্তান অধিকারী, যিনি

সান্ডিল্য গোত্রের রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, নারায়ণপুর গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের এক জনকে দত্তক নিলে মন্দিরের শরিকানা পায় এই 'বন্দ্যোপাধ্যায়' পরিবার। পরবর্তীকালে শরিক হিসাবে দৌহিত্র বংশের চট্টোপাধ্যায় ও গাঙ্গুলী পরিবারের আগমন ঘটে, যথাক্রমে পাঁচের দশকে জয়পুরের কারকবেড়া ও তিনের দশকে পড়াসিয়া গ্রাম থেকে। এই বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার বিষ্ণুপুর শহরের সঙ্গীত আবহের বাইরে ভড়া-হিংজুড়ি-রিসড়া-সাহাপুর-গুমুট-উলিয়াড়া-মুনিনগর-ছিলিমপুর-প্রকাশ প্রভৃতি গ্রামে একটি সাঙ্গীতিক পরিমন্ডল গড়ে তোলেন। এই বংশের হৃদয়নাথ ধ্রুপদী ধারায় উচ্চাঙ্গের গায়ক ছিলেন। তিনি ছিলেন বর্ধমান রাজার সভাগায়ক ও রাজ প্রদত্ত 'খেয়ালী হৃদয়' উপাধি প্রাপ্ত। পরবর্তী প্রজন্মের ব্রজনাথ, শ্যামাপদ, কালিপদ, নারায়ণ, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়েরা এই ধারাকে বাঁচিয়ে রাখেন। রিষড়া গ্রামের বৈদ্যনাথ বাউড়ী, ভাট্টার উত্তম ডোম এই পরিবারের সাথে তবলায় সঙ্গত দিতেন। পরিবারের সীতানাথ, দিবাকার, চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামে রামায়ণ গানের আসর বসাতেন। রাস উৎসব সহ মন্দির সংক্রান্ত উৎসবের খরচার মধ্যে দেবোত্তর আয় ছাড়াও বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের নিজস্ব আয়ের কিছু অংশও যুক্ত হত। কথিত আছে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কের রোগ নিরাময়ের জন্য প্রস্তুত বহুল প্রচারিত ওষুধ থেকে বেশ আয় হত, যার একাংশ এই মন্দিরের ব্যয়ে ব্যবহৃত হত। ফুটন্ত কৃষ্ণতিলে জ্যান্ত মৌরালা মাছ ছেড়ে দিয়ে বিশেষ পক্রিয়ায় এই তেল তৈরি করা হত। দেশ-দেশান্তরে এই তেল ছিল বেশ জনপ্রিয়। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে এই ওষধি তেলের এক ছটাকের দাম ছিল ৫-৬ আনা।

**৮) দধিমুখা**

শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে দীক্ষা নেবার পর বীর হাম্বির মনস্থ করেন বৃন্দাবন যাবেন এবং সেখান থেকে মদনমোহনের একটি মূর্তি নিয়ে আসবেন। বৃন্দাবন যাত্রার আগে তিনি এক গ্রীষ্মের দিনে মৃগয়ায় গিয়ে এক জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে বসে পড়েন। প্রচণ্ড ক্ষুধা তৃষ্ণায় জীবন যায় যায় অবস্থা। কোথাও কিছু নেই। হঠাৎ এক গোয়ালিনীকে আসতে দেখে তিনি জল চাইলেন। কিন্তু গোয়ালিনীর কাছে জল ছিলনা। কিছুটা মাত্র দই অবশিষ্ট ছিল। তাই খেয়েই সে যাত্রা তার প্রাণ রক্ষা হয় এবং তিনি সংকল্প করেন সেখানে একটি জনবসতি এবং দেবালয় স্থাপন করবেন। তার ইচ্ছা অনুসারে গড়ে উঠে এই জনপদ।

সেই গ্রামটিই বর্তমান বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত দধিমুখা। অনেকে বলেন এখানেই গোয়ালিনী তার মুখে দধির ভাণ্ড ধরেছিলেন, তাই নাম হয়েছিল 'দধিমুখ'। তা থেকে মুখে মুখে দধিমুখা। আবার অনেকে বলেন ঐ অঞ্চলে প্রচুর দধিমুখ বা বানরের উৎপাত ছিল, তাই ওইরকম নামকরণ। কোনটিরই কোন তথ্যগত প্রমাণ পাওয়া যায়না। পরিকল্পনা মত বৃন্দাবন গিয়েছিলেন বীর হাম্বির। তার সঙ্গে গিয়েছিলেন রামচরণ সিং জমাদার। তিনি ছিলেন দধিমুখার পার্শবর্তী গ্রাম হরেকৃষ্ণপুরের জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারী। সবই তখন মল্লরাজাদের অধীন। বৃন্দাবন থেকে তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন মদনমোহনের একটি বিগ্রহ। বৃন্দাবনে তখন সেবাইত ছিলেন সুবলচন্দ্র দাস গোস্বামী। মল্লরাজের ইচ্ছানুযায়ী বিগ্রহটি স্থাপিত হল দধিমুখা গ্রামে, একটি মন্দির তৈরি করে। এখনও দধিমুখা ভাণ্ডারে যে মদনমোহনের বিগ্রহ পুজো হয় সেটি প্রাচীন ও কষ্টিপাথরের। জনশ্রুতি অনুযায়ী এবং দধিমুখা 'ভাণ্ডার' এর পরিচালক - সেবাইত শ্রীশুকদেব কিশোর দেব গোস্বামীর বয়ান অনুযায়ী বিগ্রহটি বৃন্দাবন থেকে নিয়ে এসেছিলেন স্বয়ং মল্লরাজ বীর হাম্বির (১৬২০ — ১৬২৬)।

**৯) ময়নাপুর**

ময়নাপুর একটি প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। জয়পুর থেকে ৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে জয়পুর থানার জনবহুল গ্রাম হল ময়নাপুর। অনেকের দাবি, এটি নাকি শূন্যপুরাণের রচয়িতা রামাই পণ্ডিতের জন্মস্থান। শুধু তাই নয়, এই গ্রাম তাঁর সাধনক্ষেত্রও বটে। অপর দিকে, ধর্মমঙ্গলের লাউসেনের বাবা কর্ণসেন ও মা রঞ্জাবতীর উপাখ্যানের সঙ্গেও জড়িত এই গ্রাম।

কিংবদন্তি আছে যে, এই গ্রামের হাকন্দ দীঘির তীরে কঠোর তপস্যায় রঞ্জাবতীর মৃত্যু হলে ধর্মরাজ তাকে পুনর্জীবিত করে বর দেন। হাকন্দের জলকে তাই গঙ্গাজলের মতো পবিত্র ধরা হয়। এই দীঘির পশ্চিম তীরে হাটতলার মধ্যে ভাঙাচোরা হাকন্দ মন্দির অবস্থিত।[৮১] গবেষকদের মতে পাথরের সপ্তরথ এই পীঢ়া দেউলটি বাঁকুড়া তথা বঙ্গের অন্যতম উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। প্রতিষ্ঠালিপি না থাকায় সঠিক প্রতিষ্ঠাকাল পাওয়া সম্ভব হয়নি। স্থাপত্যের বিচারে দেউলটি প্রাক-মুসলিম যুগের বলেই মনে হয়। মূল মন্দিরের ভেতরে বর্তমানে শিবলিঙ্গ (হাকন্দেশ্বর নামে পরিচিত) প্রতিষ্ঠিত থাকলেও অতীতে নাকি এটি ধর্মরাজের মন্দির ছিল।

গ্রামের উত্তর-পূর্ব দিকে রয়েছে আধুনিক এক মন্দির। এই মন্দিরে 'যাত্রাসিদ্ধি

রায়' নামে ছোট কূর্মমূর্তি বিরাজ করছে। এই ধর্মরাজ নাকি রামাই পণ্ডিতের উপাসিত। সামনের প্রাঙ্গনে মাকড়া পাথরের চাঙড়ের নীচে রয়েছে সমাধি। জনশ্রুতি, সমাধিটি রামাই পণ্ডিতের। ধর্মরাজ যাত্রাসিদ্ধির বার্ষিক পুজো হয় ভাদ্র মাসে আর গাজন অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখ মাসে। এই গাজনের সূত্রপাত হয় অক্ষয় তৃতীয়ায় আর শেষ হয় পূর্ণিমায়।

**১০) পাচালের (ধর্মগাজন ও জমিদার)**

এই গ্রামের কনৌজ ব্রাহ্মণ মিশ্র বংশীয় ভূম্যধিকারীরা প্রাচীন বংশের। গ্রামে ঊনিশ শতকের প্রাচীন শিব মন্দিরকে কেন্দ্র করে চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন মেলা হয়। এই বিখ্যাত মেলার বিশেষত্ব হল ভক্তাদের বাণ ফোড়া সহ বিভিন্ন আত্মনিগ্রহ মূলক প্রদর্শন। গ্রামে মূলত খয়রা, বাগদি, বাউরি, নায়েক সহ অনুচ্চবর্ণের বাস। আর আছে মিশ্র, বাজপেয়ী, চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। গাজন মেলার আগের দিন বাণফোড়া উৎসব হয়। কর্মকাররা ভক্তাদের জিভে, পিঠে, পাঁজরায়, গালে লোহার বাণ ফোড়ার কাজ করে। পুকুর পাড় থেকে সার সার বাড়ির মাঝ দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে মন্দির প্রাঙ্গনে এরা উপস্থিত হয়। সারা রাত চলে ভক্তাদের এই শিববন্দনা। পরদিন পিঠে লোহার হুক ঢুকিয়ে ভক্তরা চরক প্রদক্ষিণ করে। সাধারণ ভাবে মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ হলেও এই পর্বের প্রক্রিয়া 'ধামতকর্ণী' নামের অব্রাহ্মণরা সম্পন্ন করে।

**১১) ইন্দাসের দিঘলগ্রামের (টোল শিক্ষা ও শক্তি আরাধনার সূচনা)**

শিক্ষার পীঠস্থান হিসাবে ইন্দাসের দিঘলগ্রামের পরিচিতি গড়ে ওঠে। পরে শক্তি সাধনার পীঠস্থান হিসাবেও এই গ্রামের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এই কাজ শুরু হয় দ্বারকেশ্বর নদের তীরবর্তী গোঘাট থানার আসপুর গ্রামের মুখোপাধ্যায় পরিবারের এক ব্যক্তি দ্বারা, যিনি ইন্দাস থানার দিঘলগ্রামে ভট্টাচার্য বংশীয় টোলে শিক্ষা গ্রহণ করতে এসেছিলেন আজ থেকে প্রায় দু'-তিনশো বছর আগে।

শিক্ষান্তে ইনি দিঘলগ্রামে কালী সাধনায় ত্রিমুণ্ডী আসনে সিদ্ধি লাভ করে নিজ গ্রামে ফিরে আসেন ও নিজের বাড়িতে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে সিদ্ধিলাভ করেন। দিঘলগ্রামে ত্রিমুণ্ডী আসনে পুজোর ভার দেন শিক্ষাগুরুকে। সেই সময় থেকেই

বংশানুক্রমে দিঘলগ্রামের ভট্টাচার্য পরিবার এই পুজো করে আসছে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই বর্তমান পরিস্থিতি বদলেছে। এখন পুজো দেখাশোনা করার জন্য তৈরি হয়েছে নির্দিষ্ট পুজো কমিটি।

স্থানীয় সূত্র অনুসারে, আনুমানিক দু'-তিনশো বছরের বেশি পুরনো এই পুজো। এই পুজোর নিয়মও ভিন্ন। গঙ্গাজলে দেবী অর্চনা হয় না। নিজের পুকুরের জল, নিজস্ব ধ্যান ও পুজোর মন্ত্রে মা পূজিতা হন। পুজো ও বিসর্জন সম্পূর্ণ নিঃশব্দে হয়। মূর্তি তৈরিতে বিশেষ নিয়ম নীতি লক্ষণীয়।

দুর্গাপুজোর পরই শুরু হয়ে যায় কালীপুজোর প্রস্তুতি। প্রথম থেকে এই মূর্তি তৈরি করে আসছে আসপুরের মুখোপাধ্যায় পরিবার। তাই সিদ্ধেশ্বরী মূর্তি তৈরির জন্য কাঠের অবয়ব আজও আসপুর গ্রামে পাঠানো হয়। মুখোপাধ্যায় বাড়িতে দু'টি মূর্তি তৈরি হয়। একটি নিজেদের পুজোর জন্য, অন্যটি দিঘলগ্রামে পুজোর জন্য। আগে গ্রামের এই পুজোর সকল সামগ্রী ওই মুখোপাধ্যায় পরিবার থেকেই আসত। বর্তমানে পুজো কমিটির তরফে সমস্ত কিছুর আয়োজন করা হয়। প্রচলিত পুজোর নিয়ম অনুসারে পুজোতে প্রথম সংকল্প হয় ওই 'মুখোপাধ্যায়' পরিবারের নামে হয়।

আগে স্থানীয় জমিদারের সহায়তায় মাটির মন্দির তৈরি করেন ভট্টাচার্য পরিবারের সদস্যরা। মাটির মন্দির ভেঙে পড়ার পর স্থানীয় খড়শী গ্রামের অভয় সরকার ওই জায়গাতেই নতুন পাকা মন্দির তৈরি করে দেন।

দ্বারকেশ্বর নদী তীরে মায়ের পুজোর পর বর্তমানে শোভাযাত্রা করে মাতৃ মূর্তি দিঘলগ্রামে মায়ের মন্দিরে আনা হয়। সুদীর্ঘ ছয় কিলোমিটার রাস্তায় আমড়া, বাউড়ো, নেত্রখণ্ড, কেঁজরা গ্রামের মানুষ ষোলোআনা রাস্তাতেই মায়ের যাত্রাপথে পুজো দিয়ে দেন। এর পর ধুপ ধুনো বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে দেবীকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

জনশ্রুতি অনুসারে এই মা প্রথমে ছিলেন হুগলি জেলার আসপুর গ্রামের মুখোপাধ্যায় বাড়িতে। পরে দিঘলগ্রামের মা সিদ্ধেশ্বরী রূপে পূজিতা হন। স্থানীয় মানুষের কাছে মা 'সিধুমা' বলেই পরিচিত। তিন-চারদিন ধরে মন্দির চত্বর সংলগ্ন এলাকায় মেলা বসে। যাত্রাপালা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন গ্রামের মানুষ। তার পর একটি শুভ দিন দেখে স্থানীয় পুকুরে মূর্তি বিসর্জন করা হয়।

## ১২) সোনামুখীর হটনগর (কালীর ইতিহাস)

হটনগর গ্রামে কালীর প্রতিষ্ঠা নিয়ে নানা গল্প মুখে মুখে ঘুরে বেরায়। কথিত আছে গ্রামের পথে চিঁড়ে বিক্রি করে ফেরার পথে একটি শ্যামাঙ্গী মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয় সোনামুখীর তারিণী সূত্রধরের। সোনামুখী থেকে বড়জোড়ার নিরাশা গ্রাম, এই দীর্ঘ যাত্রাপথে মাথায় করে চিঁড়ে নিয়ে যাওয়ার সময় একটি খালের ধারে বিশ্রাম নিতেন ওই বৃদ্ধা। প্রতি দিনই লাল পাড় শাড়ি পরা ওই ছোট্ট শ্যামাঙ্গী মেয়ে তাঁর সঙ্গে সোনামুখী যাওয়ার জন্য বায়না করত। বৃদ্ধা প্রতি দিনই কিছু না কিছু বলে ওই ছোটো কন্যাশিশুটিকে বিরত করতেন। এক দিন সে জেদ ধরে বসল বৃদ্ধার সঙ্গে সোনামুখী যাবেই যাবে। তখন নিরুপায় তারিণী সূত্রধর তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। কিছু দূর আসার পর তাঁর কোলে চাপার বায়না ধরে ওই মেয়ে। মাথায় চিঁড়ে বিক্রি করে পাওয়া ধান আর কোলে ধানের ঝুড়ি থাকায় তাঁর অসহায়তার কথা বললে, ওই মেয়েটি মাথার ঝুড়িতে চাপার কথা বলে। নিরুপায় তারিণী সূত্রধর তাই করেন। পরে বাড়ি ফিরে ঝুড়ি নামিয়ে রাখেন। পরে দেখেন মেয়ের বদলে ওই জায়গাতেই দু'টি পাথর। ভয় পেয়ে তিনি সেই পাথর দু'টিকে তুলসীতলায় রেখে দেন। সে দিন রাতেই বৃদ্ধা মায়ের পুজোর স্বপ্নাদেশ পান। একই সঙ্গে সেই শ্যামাঙ্গী ছোট্ট মেয়েটি যে আদতে মা কালী, তা-ও জানতে পারেন। তাঁর ভার লাঘবের জন্য তিনি পাথরের রূপ ধারণ করেছেন, তা-ও জানান দেবী। স্বপ্নে পুজোর নির্দেশ পেয়ে পর দিন সকালে ওই বৃদ্ধা লালবাজার এলাকার মানুষকে সব কথা জানান।

সেই সময় ছোঁয়াছুঁয়ি আর জাতপাতের ঘটনা এতটাই তীব্র ছিল যে পুরোহিত পুজো করতে অস্বীকার করেন। ফলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তারিণী। পরে অবশ্য পুরোহিতও স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজো করতে রাজি হন। স্থানীয় জমিদার গিন্নী কাদম্বরী দেবী এক সিদ্ধপুরুষের স্বপ্নাদেশ পেয়ে মন্দির নির্মাণের জন্য এক খণ্ড জমি দেন। ঘটনাটি আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগের। আজও সেই গাছতলায় পূজিত হয় ওই দুটি পাথরের খণ্ড। হটনগর কালীর নামকরণ নিয়ে এলাকায় দ্বিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, হটনামে এক যোগী পুরুষ এই কালীর পূজার্চনা করতেন। তাই এই রূপ নামকরণ। আবার কেউ বলেন, মা কালী হঠাৎ এসেছিলেন। তাই হটনগর কালী নামকরণ হয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মা কালীর নির্দেশে যে আঁকড় গাছের নিচে পাথর দু'টি রাখা হয়েছিল সেই গাছ আজও আছে। আশ্চর্যের বিষয় সেই গাছে কোন কাঁটা নেই। এমনকি ঐ গাছের আদি মূলের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

আর পাথর দু'টি আজও সেই আঁকড় গাছের নিচে রেখে পূজার্চনা করা হয়। তবে আশ্চর্যের বিষয় ঐ পাথর দু'টি ঋতুভেদে রং পরিবর্তন হয়। এমনটাই দাবী স্থানীয়দের।

পরে বর্ধমানের এক সমাজসেবী অজিত সিংহ নতুন মন্দির তৈরী করে দেন। বর্তমানে সেই মন্দিরেই পুজো হয়। এই মন্দির নির্মাণেও অভিনবত্ব রয়েছে। মূল মন্দিরের সামনে রাখা রয়েছে, তারিণী সূত্রধরের মাথায় ধানের ঝুড়িতে চেপে মা আসছেন তার মূর্তি। অন্য দিকে সিদ্ধপুরুষ হটযোগীর মূর্তি। সবার উপরে শিব।

এ ছাড়াও মূল মন্দিরের কুড়ি-পঁচিশ ফুট উপরে রয়েছে একটি পদ্মফুল। যা অনেক দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। বর্তমানে প্রাচীন পরম্পরা মেনে সূত্রধর পরিবারের সদস্য বিপত্তারণ সূত্রধরের ছেলে সুকুমার সূত্রধর যেমন মূর্তি তৈরি করেন, তেমনি এই পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন ভক্তিভূষণ ভট্টাচার্য ও গোপাল ভট্টাচার্য। প্রাচীন সেই প্রথা মেনে আজও সূত্রধররাই কেবল ঘট আনার অধিকারী। এই ঘট সারা বছর মন্দিরে রেখে পুজো করা হয়। পরে বছর বাৎসরিক পুজোর সময় সেই ঘট বিসর্জন দিয়ে নতুন ঘট আনা হয়।

**১৩) ইন্দাসের আকুই গ্রামের কালীর পূজা ও ইতিহাস**

বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের আকুই-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মান্দড়া মৌজার কয়েকশো বছরের প্রাচীন কালী 'মাঠের কালী' নামে এলাকায় সমধিক পরিচিত। এলাকায় প্রচলিত লোককথা হল, কয়েকশো বছর পূর্বে এই এলাকা ঘন জঙ্গলে ভর্তি ছিল। এখনকার মতো তেমন জনবসতি গড়ে ওঠেনি। চোর-ডাকাতদের মুক্তাঞ্চল ছিল বলা যায়। তখন কোনো এক গভীর রাতে এক ডাকাতদল গ্রামের আলপথ দিয়ে ডাকাতির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। হঠাৎ ডাকাত সর্দারের নজরে এল লাল শাড়ি পরা একটি বাচ্চা মেয়ে তাঁদের পথের উপর দাড়িয়ে কাঁদছে। এত রাতে ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে কান্না কেন, তা ওই মেয়েটির কাছে জানতে চাইলেন ডাকাত সর্দার। বার বার জানতে চেয়েও কোনো উত্তর না পেয়ে ডাকাতদল কালবিলম্ব না করে ডাকাতির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল।

ওই পথ দিয়ে ফেরার সময় ঠিক ওই জায়গাতেই ডাকাতদলটি মায়ের দু'টি পদচিহ্ন দেখতে পেল। আর ডাকাতসর্দার তখনই সিদ্ধান্ত নিলেন, ওই জায়গাতেই কালীর আরাধনা করা হবে। কথিত আছে, তৎকালীন সময়ে ওই স্থানে নরবলি দেওয়া হত।

এখানে 'মাঠ কালী'র নিত্যপূজা হয় আর কার্তিক মাসে কালীপূজার দিন বিশেষ পূজা হয়। এখানে মূর্তিপূজা হয় না। নরমুণ্ডীর আসনকেই দেবী জ্ঞানে পূজা করার রীতিই পালিত হয় এখানে।

মান্দড়ার ধাড়া পরিবারের লোকজন পূজার দায়িত্বে থাকলেও পূজাপাঠ করেন স্থানীয় বটব্যাল বংশের পুরোহিতরা। বর্তমানে কালীপূজার দিন শতাধিক ছাগ বলি হয় এখানে। এ ছাড়াও আখ, কুমড়ো ও লেবু বলিও হয়। পূজা উপলক্ষ্যে প্রচুর ভক্ত সমাগম ঘটে এই সময়।

**১৪) হাট আশুড়িয়ার বিরিঞ্চি বাবা ও অন্যান্য গ্রামের চরক মেলা**

হাট আশুড়িয়া গ্রামে  চৈত্র মাসের শেষ দিন বা চৈত্র সংক্রান্তিতে পালিত হয় চড়ক পুজো। বড়জোড়া ব্লকের হাট আশুড়িয়ার বিরিঞ্চি নারায়ণের চড়ক পূজাকে কেন্দ্র করে মেতে উঠে এলাকার সাধারণ মানুষ। ৪০০ বছরের পুরনো বিরিঞ্চি নারায়ণের গাজন উপলক্ষে চড়ক পুজো ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে ফি বছর। কয়েক হাজার সাধারণ মানুষ এই চড়ক পুজোতে অংশগ্রহণ করে থাকেন।  চড়ক পূজা চৈত্রসংক্রান্তিতে অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষ দিবসে পালিত হয়। আগের দিন চড়ক গাছটিকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা হয়।

এছাড়া সোনামুখী ব্লকের মাজীরডাঙ্গা গ্রামের রামেশ্বর গাজন উৎসবে উপলক্ষে চড়ক পূজা হয়। প্রায় সাড়ে ৩০০ বছরের প্রাচীন গাজন এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়।  চড়ক উৎসবে গ্রামে আত্মীয়-স্বজনরা ভিড় জমান। দূর-দূরান্ত থেকে সাধারণ মানুষ এই চড়ক  পুজো দেখতে জনপ্লাবন ঘটায়।

আনুমানিক ৮০০ বছরের ও বেশী পুরোনো পাঁচালের চড়ক পূজা। বড়জোড়া ব্লকের বেলিয়াতোড় থানার ছন্দার গ্রাম পঞ্চায়েতে বাণেশ্বর গ্রামে চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হয় ধুমধামের সাথে। সন্ন্যাসীরা নিজের শরীর বড়শিতে বিঁধে চড়কগাছে ঝুলে শূন্যে ঘুরতে থাকেন। আবার সন্ন্যাসীর আর্শীবাদ লাভের আশায় শিশুসন্তানদের শূন্যে তুলে দেন অভিভাবকরা। সন্ন্যাসীরা ঘুরতে ঘুরতে কখনও কখনও শিশুদের মাথায় হাত দিয়ে আর্শীবাদও করেন।  চড়ক পূজায় পিঠে বাণ ফুড়িয়ে চড়ক গাছের সঙ্গে বাশঁ দিয়ে তৈরি করা বিশেষ এক ধরনের চড়কায় ঝুলন্ত দড়ির সঙ্গে পিঠের বড়শি বেঁধে দেওয়া হয়। তখন বাণবিদ্ধ সন্ন্যাসীরা শূন্যে ঝুলতে থাকেন।

গঙ্গাজলঘাটি থানার পিড়রাবনি অঞ্চলে চন্দ্রশেখর জীউএর গাজন উপলক্ষে

চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাচীন রীতিনীতিকে মান্যতা দিয়ে ফিবছর বহু মানুষের অংশগ্রহণে এই পালন উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। রাঢ় বাঁকুড়ার বিভিন্ন গ্রামেই এমন চরক মেলা আয়োজিত হয়ে থাকে।

## মল্লভূমে বিভিন্ন পেশা-জাতির মানুষের অভিবাসনের ইতিহাস

বনান্তরালের মল্লভূমি ছিল জঙ্গলমহল নামে পরিচিত, আর রাজধানী বিষ্ণুপুর ছিল বনবিষ্ণুপুর। মল্লরাজবংশের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ক্রমাগত রাজ্যের পরিসর বাড়তে থাকে। আর এই ভূমরাজ্যের বিশালত্বের সাথে সাযুজ্য রেখে রাজধানী শহরের বিস্তার ও নতুন নতুন জনপদের পত্তন হতে থাকে। এই ধর্মরাজ্যে প্রায় প্রতি গ্রামেই প্রতিষ্ঠিত আছে দেবস্থান। দেবপূজার জন্য প্রয়োজন হল পূজারী শ্রেণীর। বিভিন্ন দেবতার ও বৈষ্ণব দেবস্থানের মিষ্টি ভোগের জন্য গোয়ালা সম্প্রদায়ের বাস জরুরি হয়ে ওঠে উৎপাদক হিসাবে। মন্দিরের ফুল ও মালার জন্য বহু স্থানে মালাকার সম্প্রদায়ের বসতি গড়ে ওঠে। পাশাপাশি উৎসব ও সামাজিক প্রয়োজনে তন্তুবায়, কর্মকার, কুম্ভকার, ক্ষৌরকার সহ বিভিন্ন বৃত্তির মানুষদের আগমন ঘটে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। বহুক্ষেত্রেই রাজা ও মল্লরাজবংশের প্রত্যক্ষ উৎসাহে ও আনুকূল্যে এই অভিবাসন ঘটে ও বসতি গড়ে ওঠে। জাতির উপবিভাগগুলো থেকে আগমন পূর্ব বাসস্থানের ধারণা পাওয়া যায়। জাতি ভিত্তিক আলোচনায় এই অভিবাসনের অভিমুখ ও ধারা বোঝা যাবে।

**ব্রাহ্মণ :** ভূমিদান করে ব্রাহ্মণদের প্রতিষ্ঠিত করার চল যে গুপ্ত যুগেও ছিল তা শুশুনিয়া শিলালিপির থেকে প্রমাণিত হয়। মল্লরাজত্বে ব্রাহ্মণ আগমন মূলত দেব ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠার অনুষঙ্গে। মল্লরাজত্বে প্রথম ঐতিহাসিক চরিত্র রাজা হাম্বিরের সময়ে রাজানুকূল্যে বহু ব্রাহ্মণ বসতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হাম্বিরের সভাপন্ডিত ব্যাসাচার্য ছিলেন এমন এক ব্রাহ্মণ। গোস্বামী বংশীয় শ্রীনিবাস আচার্য মল্লভূমির বৈষ্ণব আচার্য পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর বিভিন্ন স্থানে গোস্বামী বংশের বসতি স্থাপিত হতে থাকে। তার আগে কিছু নিত্যানন্দ অনুগামী গোস্বামীর আগমন ঘটে। শ্রীনিবাসপূর্ব এমন অভিবাসনের উদাহরণ নদীয়া থেকে পরমেশ্বর মল্লিকের প্রথমে রাজধানী সন্নিহিত বসন্তপুরে ও উত্তর পুরুষদের কাদাকুলি মহাপাত্র পাড়ায় বসতি স্থাপন। শ্রীনিবাস মল্লভূমে এসে এক ব্রাহ্মণের (বিষ্ণুপরের উপকণ্ঠে দেউলি গ্রামের কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্তী) সাহায্যেই রাজ দরবারে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে

রাজার অনুরোধে এক ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যার (রাজধানী সন্নিহিত গোপালপুরের রঘুনাথ/রাঘব চক্রবর্তীর কন্যা পদ্মাবতী) সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর বসতি ছিল খড়বাংলা সন্নিহিত গোস্বামী পাড়ায়। পরবর্তীকালে রাজা প্রথম রঘুনাথের আমলে অযোধ্যায় মহাপাত্র বংশের প্রতিষ্ঠা ঘটে, যারা পরে বিষ্ণুপুরের কাদাকুলি মহাপাত্র পাড়ায় বসতি স্থাপন করেন। এই সময়েই রাজমহল থেকে কমলাকান্ত সার্বভৌম নামের ব্রাহ্মণ বিষ্ণুপুরে বসতি স্থাপন করে চতুষ্পাঠী ভিত্তিক সংস্কৃত শিক্ষার পরম্পরা গড়ে তোলেন। মল্লভূমে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র, উভয় থাকের ব্রাহ্মণেরই অভিবাসন ঘটে। ব্রাহ্মণদের পদবী ছিল মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, ঘোষাল, গোস্বামী, চক্রবর্তী, রায়। মল্লরাজ চৈতন্য সিংহের সময় দেওয়ান চন্ডী মুখোপাধ্যায় ময়নাপুরের বহু ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন।

**বৈদ্য :** হাম্বিরের সময় থেকেই মল্লভূমে কবিরাজী চিকিৎসার একটি বলিষ্ঠ ধারা প্রতিষ্ঠিত ও প্রবাহিত হতে থাকে। রাজাদের আনুকূল্যে রাজধানীতে কবিরাজ পাড়া গড়ে ওঠে। মল্লভূমির বিভিন্ন ডিহি, তরফ, পরগণা, মহলে তারা ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া বিভিন্ন সম্পদায়ের মধ্যেও এই ধারা প্রবাহিত ও পুষ্ট হতে থাকে। বনবিষ্ণুপুরের বিভিন্ন মহলের জঙ্গলের থেকে ভেষজ উদ্ভিদের যোগান এই চর্চাকে স্বভাবতই শক্তিশালী করে তোলে। হাম্বিরের সময়ে শ্রীনিবাসের সঙ্গী হিসাবে রামচন্দ্র কবিরাজ ও যদুনন্দন দাশের মত বৈদ্যের আগমন এই ধারার সূচনা ও পুষ্টির সহায়ক হয়েছিল। মল্লভূমে কবিরাজি ধারার আদি পুরুষ বল্লভী কবিরাজ ও তাঁর দুই সহোদর রামদাস ও গোপালদাস বিষ্ণুপুরে বসতি স্থাপন করলে মল্লভূমে কবিরাজি চিকিৎসা ব্যবস্থা উৎকর্ষতায় উত্তীর্ণ হয়। পরে শঙ্খবণিক, কর্মকার, তন্তুবায়দের মধ্যেও এই বৃত্তি সম্প্রসারিত হয়। কিছু নাপিতের অস্ত্রোপচারে ও মাল সম্পদায়ের ছানি কাটার হাত যশ ছড়িয়ে পড়ে। গুপ্ত, সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত, কবিরাজ পদবীর জাতিরা এই পেশায় ছিলেন।

**কায়স্থ :** রাজকার্যে সাহায্য করার নিমিত্ত এই বৃত্তিধারীদের মল্লভূমে আগমন ঘটে। প্রশাসনিক প্রয়োজনে কায়স্থদের বসতি স্থাপন ও সম্প্রসারণের উদাহরণ (১) বর্ধমানের বেনু গ্রাম থেকে আগত দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ মিত্র ও বিশ্বাস পরিবার মল্লভূমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে আসীন হন। (২) আদি মল্লের সময় থেকে ভগীরথ গুহের পরিবার প্রশাসনিক প্রয়োজনে মল্লভূমে আসেন এবং বেলিয়াতোড় গ্রামে বসতি স্থাপন করে। বর্তমানে এদের পদবী রায়। (৩) একই ভাবে সোনামুখী থানার

লোখেশোল গ্রামের দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ চৌধুরী পরিবারের আগমন ঘটে। (৪) গোপাল সিংহ ও চৈতন্য সিংহের সময়ে দেওয়ান কায়স্থ বংশীয় সতত্ত্বরামের বংশধর মুকুন্দরাম দেওয়ান ছিলেন। (৫) চৈতন্য সিংহের মন্ত্রী কমল বিশ্বাস ছিলেন কায়স্থ ও বাস ছিল মহালবেড়া সংলগ্ন দেওয়ানবাটীতে। (৬) চৈতন্য সিংহের সময়ে বিক্রমপুর থেকে নন্দরাম, সাহেবরাম, গিরিধর, হরিশ্চন্দ্র নামে চার ভাই মল্লভূমে এসে বিভিন্ন পদে আসীন হন। নন্দরাম ১০০০ সেনার সেনাধ্যক্ষ হওয়ার কারণে চক্রবর্তী পদবীর পরিবর্তে রাজদত্ত 'হাজারী' পদবী ব্যবহার করতে থাকে। এরা পাত্রসায়েরে প্রচুর জমিজমা কিনে বসতি স্থাপন করেন।

**ছত্রী :** বড়জোড়া-গঙ্গাজলঘাটী কেন্দ্রিক শূরভূম ছান্দার পরিমন্ডলে ঐতিহাসিক ভাবেই ছত্রী অধ্যুষিত (ছত্রীভূম)। এখানে উৎস অনুসারে দুই থাকের ছত্রী আছে। কাঁসাই-শিলাই মধ্যেকার ছত্রীরা বারোহাজারী ও দামোদর-দ্বারকেশ্বর মধ্যবর্তী থাক হল সিংহহাজারী। এদের পদবী বর্ধন, মান, শূর, বীর, সী, রায়, বিশুই, মল্ল, তু, ভঞ্জ।

**গোপ :** মূলত দেবতা মিষ্টিভোগ উৎপাদনের কারণে মল্লভূমে এদের আগমন ঘটে। মন্দির সন্নিহিত স্থানে এদের বসতি শুরু হলেও ক্রমে এরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এদের তিনটি থাকের পেছনেও এই ছড়িয়ে পড়ার ইতিহাস জড়িয়ে আছে। যাদবনগরে এদের বাস শুরু হলেও বিষ্ণুপুর শহর ছেড়ে আশেপাশের চৌত্রিশটি গ্রামে এরা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এই থাকের নাম হয় 'চৌত্রিশগ্রামী' থাক। মল্লভূমের শিল্প ও বাণিজ্যের অনুষঙ্গে শিল্পীদের দ্বারা মন্দির পরিমন্ডল গড়ে উঠতে থাকে এবং গোপ পল্লীগুলি গড়ে ওঠার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সোনামুখী কেন্দ্রিক এমন ২২ টি ডিহিতে এদের সম্প্রসারণের ফলে 'বাইশডিহা' থাকের সৃষ্টি হয়। উঠতি নাগরিক কেন্দ্র বাঁকুড়া জনপদ কেন্দ্রিক গোপগ্রামগুলির গোপেরা জয়বেলিয়া থাকের। আগে এই মহলটির নাম ছিল জয়বেলিয়া। তার থেকেই এই পরিচিতি।

**সদগোপ :** মল্লসময়ে রাজকার্যে নিযুক্ত হয় বেশ কয়েকটি সদগোপ পরিবার, যেমন (১) কোতলপুরের কাছে কাকবেড়িয়ার বিশ্বাস পরিবার, (২) দেওপাড়া গ্রামের কোলে পরিবার, (৩) দেওপাড়ার কাছে পঞ্চরত্ন দামোদর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা জিবটা গ্রামের 'রায়' পরিবার, (৪) কুড়িয়া গ্রামের সদগোপ পরিবার, (৫) হিজলডিহা গ্রামের চৌধুরী পরিবার, (৬) শুকজোড়া গ্রামের মন্ডল পরিবার, (৭) মাগুরা গ্রামের মন্ডল ঘোষ, নিয়োগী, মল্লিক, পয়ান, খাঁ পরিবার, (৮) চৈতন্য সিংহের সনদ প্রাপ্ত হদল-নারায়ণপুরের মন্ডল পরিবার, (৯) বিষ্ণুপুরের কাছে ভড়া গ্রামের মন্ডল

পরিবার।

**তিলি :** তিল চাষ ও তেল উৎপাদনের সাথে জড়িত বিষ্ণুপুর মহকুমার পূর্বের একাদশ থাক ও পশ্চিমের দ্বাদশ থাকের তিলিদের বসতি গড়ে উঠেছিল।

**মাহিষ্য :** মূলত কৃষিকাজের জন্য আগত উত্তর রাঢ়ী ও দক্ষিণ রাঢ়ী উপভাগের মাহিষ্যদের আগমন ঘটে। সামাজিক দিক থেকে এদের বিভাজন (ক) লালচেটিয়া (খ) একসিধে (৩) দোসিধে (ঘ) মাকুন্দ।

**তাম্বুলী :** হাম্বির পরবর্তী সময়ে রাজহাটি-বীরসিংহপুর বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করলে এখানে তন্তুবায়দের মত তাম্বুলীদের আধিক্য ঘটে। সেসময়ে ৭৫০ ঘর তাম্বুলীর বসবাসের কথা জানা যায়। এই তাম্বুলী সম্প্রদায়ের দর্পনারায়ণ কর চৈতন্য সিংহের পেশকার ছিলেন। রাজহাটী থাক ছাড়াও বর্ধমান আগত বর্ধমেন্যা, জাহানাবাদ আগত(আরামবাগ) জাহানাবাদী থাকের তাম্বুলীর বাস আছে। এদের তামাক ও অম্বরী তামাকের ব্যবসা ছিল।

**বারুজীবি :** পান ও পানের বোরোজ তৈরিতে বৃত্তিগত দক্ষতা ছিল এই শ্রেণীর জাতির। মল্লভূমে কৃষি ফসলের মধ্যে পান অন্যতম। স্থানীয় প্রয়োজন মিটিয়ে বাইরেও পাঠান হত। পাত্রসায়ের থানার বেলুট, গোপীনাথপুর, বোরোজপোতা এবং মালিয়াড়া গ্রামে বারুই জাতির আধিক্য আছে।

**কেয়ট :** কৈবর্ত বা কেয়ট জাতি 'চাষা কৈবর্ত' ও 'জেলে কৈবর্ত' এই দুই উপভাগে বিভক্ত। প্রথম উপভাগের চাষই মুখ্য পেশা হলেও জেলে কৈবর্তদের মাছ ধরা মূল জীবিকা। ডিহর গ্রাম সন্নিহিত ঠাকুরপুর গ্রামের কেয়টগণ বংশ পরম্পরায় দ্বারকেশ্বর নদীতে ও বিষ্ণুপুরের কেয়টগণ মধুপুর, বসন্তপুর দহে মাছ ধরে। রাজধানীর শাঁখারিতলা-মনসাতলা জেলেপাড়ায় জেলেদের বাস আছে। কেয়ট জাতির নিজস্ব বিচার পদ্ধতি আছে। পারিবারিক বিবাদে গ্রামমুখ্যা, আপিলের ক্ষেত্রে অঞ্চল বিচারক, চূড়ান্ত বিচারের ক্ষেত্রে দেশ বিচারক। এই বিচার সভা বসত রাজধানীর মনসাতলা কেয়টপাড়ায়। আসতেন স্বয়ং মল্লরাজ বা তাঁর প্রতিনিধি।

**লোহার :** মল্লে বসতি স্থাপন করা লোহার সম্প্রদায়ের গ্রামউৎস, টোটেম ও কাজ অনুসারে বিভিন্ন থাক ছিল। (১) কংসাবতী নদী সন্নিহিত এলাকা থেকে আগত লোহার 'কাঁসাইকুলা' থাকের। (২) কাঁসাই-শিলাই বিধৌত অঞ্চলের লোহাররা 'সিংহাজারী' থাকের। (৩) 'তেঁতুলিয়া' থাকের লোহার। এদের টোটেম বা জাতিচিহ্ন তেঁতুলের অনুকরণে অভিহিত। (৪) 'রাঙ্গারা' থাক মূলত ল্যাটেরাইট থেকে অঙ্গার

নিষ্কাষণ ও লোহা গলানোর কাজে দক্ষ ছিল। বিষ্ণুপুরে সামরিক প্রয়োজনে কর্মকারদের পাশাপাশি এরাও অস্ত্রাদি, কামান তৈরিতে দক্ষতার জন্য আদৃত হতেন।

**কর্মকার :** রাজা-জমিদারদের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার ছাড়াও সামাজিক প্রয়োজনে, কৃষিকাজের প্রয়োজনে ধাতব যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য এরা গ্রাম-গ্রামান্তরে বসতি স্থাপন করে। ধাতু ও কাজের রকম ভেদ অনুসারে এই জাতি আট উপভাগে বিভাজিত ছিল। (১) লোহার কামারদের আধিক্য আছে মল্লভূম ছাড়াও মটগোদা ও কুলবনীতে। লোহার জাতির মত কাজ ও দক্ষতা ছিল এই উপভাগের। (২) পিটুল কর্মকারদের কাজ মূলত পেতল ধাতুর উপর। বীরসিংহ গ্রামে এদের আধিক্য ছিল। তামার ঘাটোয়ালী ব্যাজ এরাই মূলত তৈরি করত। (৩) অষ্টলই বা কাঁসারি কামারঃ কাঁসার কাজে একসময় মল্লভূম প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। রাজদত্ত উপাধি ছিল খাঁস, মল্লিক, সরকা, চৌধুরী। মূলত কাঁসা, পিতল, ভরণ, নিকেল, জার্মান-সিলভার প্রভৃতি সঙ্কর ধাতুর তৈজসপত্র নির্মাণ করত। (৪) বিরলা কামারদের তৈরি গ্রামীণ যন্ত্রপাতি ও উপকরণ মল্লভূমের অন্যান্য জাতির দ্রব্যাদির সাথে বিনিময় প্রথা বহুকাল অব্যাহত ছিল। রাজধানীর কাইতিপাড়া, ধুলাপাড়া, হাজরাপাড়া, বকুলতলা, রানার পুকুর অঞ্চলে এদের বসতি। এরা মূলত কৃষি সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি তৈরি করে। (৫) ময়ুরভঞ্জ থেকে মল্লরাজার উৎসাহে রানার পুকুর, মটুকগঞ্জ, কৃষ্ণগঞ্জ অঞ্চলে এদের বাস। এই কাঁসারিদের মল্লরাজ 'বায়েন' উপাধি দিয়েছিলেন। শ্রীনিবাস পরিচালিত বৈষ্ণব যাত্রাগানে সম্ভবত এদের পূর্বজরা সংগত করতেন। রাজা ও রাজ্যের প্রয়োজনে বিভিন্ন কাঁসা/তাম্র অলঙ্কার ও তৈজসপত্র তৈরিতে এরা পটু ছিল। (৬) তামার কর্মকার ধর্মপূজায় ব্যবহৃত তাম্রবলয় ও বিভিন্ন পূজায় প্রয়োজনীয় তাম্রপত্র উৎপাদনে এদের দক্ষতা ছিল। (৭) ডোকরা কামার ময়ূরভঞ্জ, ছত্রিশগড় রাজানুকূল্য থেকে অভিবাসিত হয়ে মল্লরাজ্যে ও সামন্তভূমে বসতি স্থাপন করে। এদের বিভিন্ন ধাতুর সংমিশ্রণে বিশেষ প্রক্রিয়ায় অসাধারণ শিল্পকলা সৃষ্টিতে পটু ছিলেন, যে ধারা আজও অব্যাহত।

এছাড়া মিরদাহা (মিদ্যা) কামার রাজধানীতে কামান তৈরির শৈলী করায়ত্ত করেছিল। বীরসিংহ গ্রামেও এদের বসতি আছে। স্বর্ণ কামার, খাতড়া কামার, চাঁদ কামার ছিল এদের আর কিছু উপবিভাগ।

**ঘড়িয়াল :** মল্লসমকালে পূজার সময়, ক্ষণ নির্ণয় ও সেই অনুসারে পূজা শুরুর বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেমন অষ্টমী-নবমীর পূজা, সন্ধি পূজা। তখন জল

ঘড়ি বা সূর্য ঘড়িই ছিল একমাত্র ভরসা। জামকুড়ি-জয়কৃষ্ণপুর গ্রামের আচার্য পরিবারের এই প্রযুক্তিজ্ঞান ও দক্ষতা ছিল বলে জানা যায়। জামকুড়ির প্রবীণ জ্যোতিষাচার্য হরিদাস ঘড়িয়াল আচার্য এই পরিবারের সদস্য এবং মল্লরাজ প্রদত্ত ঘড়িয়াল উপাধি ঘড়ি নির্মাণ কাজে জড়িয়ে থাকার সুবাদে প্রাপ্ত। পট নির্মাতা কর্মকার পরিবার, ঘড়ি নির্মাতা ঘড়িয়াল পরিবারের সাথে মল্লরাজাদের আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল।

**তন্তুবায় :** মল্লভূমে তন্তুবায়দের থাক ছিল মোড়ালী, পাটরা, পাটরাঙ্গা, মধু তাঁতি, বর্ধমেন্যা, মন্দারন্যা। হাম্বির পরবর্তী রাজহাটী-বীরসিংহপুরে ১২০০ ঘর তন্তুবায় বসতি ও সমৃদ্ধি গড়ে ওঠে (এরা ছিলেন 'মোড়ালী' থাকের, নিজেদের আশ্বিন তাঁতি বলে পরিচয় দিতেন)। জৈন প্রভাবিত তাঁতিরা 'সরাক তাঁতি' নামে অভিহিত হতেন। স্থানিক পরিচয়ে তাঁতিরা পরিচিত হতেন। যেমন বীরভূম থেকে আগত বীরভূমিয়া, শিখরভূম থেকে আগত শিখরিয়া, রাঁচী-তামার পরগণা থেকে আগত তামারিয়া, নন্দীপারিয়া (দামোদরের দক্ষিণ ও মানভূম থেকে আগত)। রাজহাটী কেন্দ্রের অবলুপ্তির পর রাজগ্রাম, বিষ্ণুপুর, বীরসিংহ, সোনামুখীতে এদের আগমন ও সংখ্যাধিক্য ঘটে। পাটরা, পাটনি, পাটরাঙ্গা গোষ্ঠীর তন্তুবায়রা রেশম রঙ করার কাজে বিশেষ ভাবে দক্ষ। বিষ্ণুপুর ও সোনামুখীর তাঁতীরা লাক্ষা থেকে যে লাল রঙা বস্ত্র ও ভেষজ নির্জাস দিয়ে হলুদ বস্ত্র তৈরি করতেন তা বেশ জনপ্রিয় ছিল। পূজায় লালবস্ত্র ও সামাজিক মন্ত্রানুষ্ঠানে হলুদ বস্ত্রের প্রচলন আছে।

**শাঁখারী :** রাঢ়ে চারটি থাকের এই শিল্পী ও কারিগরদের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন ১) রাজহাটী অর্থাৎ রাজহাট পরিমন্ডলের শাঁখারী (২) শিখর্যা শাঁখারী অর্থাৎ শিখরভূম থেকে আগত (৩) বর্ধমেন্যা অর্থাৎ বর্ধমান থেকে আগত আর (৫) পঙ্খা থাক বা পঙ্খের কাজে পটু। প্রাচীন বাণিজ্যকেন্দ্র সপ্তগ্রামের শঙ্খ শিল্পীদের বাসভূমি শঙ্খনগরের সাথে মল্লভূমের শাঁখারীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এতে মল্লরাজ্যে শাঁখারীদের অভিবাসনের একটি ধারা অনুমান করা যায়।

**মোদক :** মল্লরাজাদের মন্দির স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষকতার অনুষঙ্গে দেবতার ভোগ নিবেদনের জন্য মিষ্টান্ন ও মিষ্টান্ন উৎপাদকের বসতি স্থাপন জরুরি হয়ে পড়ে। অসংখ্য দেবদেবীর ভোগ নিবেদনের জন্য বিবিধ মিষ্টান্নের উৎপাদন হত ও কয়েকটি পরিবার বিশেষ বিশেষ মিষ্টিতে পারদর্শী হয়ে ওঠে। যেমন নাগ মোদক মতিচুর, দে মোদক ভাল জিলিপি, বরাট মোদক বুটের মিঠাই ও চিনির মন্ড তৈরিতে খ্যাতি লাভ

করে।

**কুম্ভকার :** আগমনপূর্ব বাসস্থানের পরিচয়ে মল্লভূমের কুম্ভকাররা কয়েকটি থাকে বিভক্ত। যেমন, দামোদর ও দ্বারকেশ্বর অববাহিকা থেকে বারোহাজারী, কাঁসাই-শীলাই বিধৌত অঞ্চল থেকে সিংহহাজারী, শিলাইয়ের গড়বেতা অঞ্চল (গনগনি-কুমাশোল-কামারশোল) থেকে আগত গনগনিয়া থাক, ওন্দার রাজহাটি-বীরসিংহপুর অঞ্চলের রাজহাটি থাক, ডিহর পরিমন্ডলের গামিদ্যা, রাউতাড়া, লয়ের, জন্তার ইত্যাদি সাতটি তরফের 'সাততপা' থাকের। বিষ্ণুপুরের উলিয়ারা, প্রকাশঘাট, নারায়ণপুরে কুম্ভকার বসতির আধিক্য আছে। মাটির পোড়ানো তৈজসপত্রাদি দৈনন্দিন চাহিদা ও দেব আরাধনার কাজে লাগত।

**রজক :** বিষ্ণুপুরে রেশম শিল্প খ্যাতির শিখরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে রজকদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। রেশমের শাড়িতে স্থায়ী চিক্কন রঙ দেওয়ার ক্ষেত্রে ও সেগুলি মসৃণ রাখার জন্য 'পেটা ধোলাই' আর দামী বস্ত্রসমূহ কীট পতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করার প্রকরণ এদের আয়ত্বে ছিল। রামজীবনপুর, রঘুনাথপুরের রজকদের সাথে ভূমরাজ্যের রজকরা সম্পর্কিত।

**ক্ষৌরকার :** প্রাচীনকালে ও মল্লশাসনের প্রথমদিকেও শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে এদের দক্ষাতা ব্যবহৃত হত। পরবর্তীকালে উন্নত এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার প্রচলন হলে এই ধারাটির অবলুপ্তি ঘটে। মূলত হিন্দু মাঙ্গলিক/পরলৌকিক ও ধর্মীয় আচার পালনের ক্ষেত্রে ও চুল কর্তনের মত সৌন্দর্য বর্ধনের কাজে এদের বৃত্তি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। রাজহাট-বীরসিংহপুর পরিমন্ডলে বালিগুমা, রামনগরের এদের বসতি দেখা যায়। পরে প্রায় সব গ্রামেই এরা ছড়িয়ে পড়ে।

**শুঁড়ি :** এই প্রাচীন জাতিটির নাম বৌদ্ধগান ও দোহাতে (চর্যাপদ) পাওয়া যায়। মূলত অন্ত্যজ ও অন্যান্য শ্রেণীর প্রয়োজনীয় উত্তেজক পানীয় তৈরিতে এদের দক্ষতা ছিল। অনেক চর্যাপদ রচয়িতা রাঢ় অঞ্চলের মানুষ ছিলেন।

**করঙ্গা :** পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় সন্নিহিত যে করঙ্গা পল্লী আছে, সেখান থেকে কিছু পরিবার বিষ্ণুপুরে এসে বসতি স্থাপন করে। এরা মল্লভুমের জনতার প্রয়োজনীয় আসবাব ছাড়াও পরিমাপের পাত্র (সের, পোয়া) তৈরি করত। বীরনগরসহ বিভিন্ন গ্রামে এদের বসতি আছে।

**গন্ধবণিক :** মঙ্গলকাব্যে রাঢ়ীয় গন্ধবণিক জাতির উল্লেখ আছে। দামোদর-ভাগীরথী কেন্দ্রিক নদী বাণিজ্য ও ধনাগমের সাথে সাথে এদের সমৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। উজানি-

সপ্তগ্রামের গন্ধবণিকদের থাক যথাক্রমে দেবদাস, শঙ্খভূতি, আবটদত্ত ও বিষ্কটগুপ্ত। মঙ্গলকাব্যে বিষ্ণুপুরের ভাগ্যবন্ত খাঁ ও মল্লভূমের চন্দ্রকান্ত রায়ের মত সফল বণিকের উল্লেখ আছে। মকড় সংক্রান্তির দিনে গন্ধবণিক মহিলাদের সুয়ো-দুয়ো ব্রতানুষ্ঠান, সন্ধ্যায় শোলার ডিঙি ভাসানোর রীতির মধ্যে প্রাচীন জলবাণিজ্যের স্মৃতি তর্পণ হয়। এদের তৎকালীন বাণিজ্য পসরা ছিল অগুরু, চন্দন, নারিকেল, কাঁঠাল, বেল, সুপারি, কলা ছাই, সাদা পায়রা, শুকসারি, জয়ীপত্র, তেজপাতা, লাক্ষা, গালা, পাটের কাপড়, তসর, সুতোর কাপড় ইত্যাদি।

**স্বর্ণবণিক :** সোনা-রূপোর কাজের বৃত্তির এই জাতির রাজধানী বিষ্ণুপুরে আগমন ও বসতি স্থাপন ঘটেছিল সন্নিহিত গ্রাম লয়ের, বসন্তপুর, সোনামুখী, পাত্রসায়ের, শ্যামনগর, রামসাগর, ওন্দা ছাড়াও নদীয়ার শান্তিপুর, বর্ধমানের সাতগেছিয়া, মেদিনীপুরের খড়্গপুর, বাঁকুড়ার পাইকপাড়া সহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে।

**ডোম :** এদের মধ্যে আঁকুড়ে, কালিন্দী, কাটারি, ধাড়া ইত্যাদি উপভাগ পাওয়া যায়। মহাপদ্ম নন্দের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া (মতান্তরে ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে) আঁকুড়ে ডোম কালু বীর এই জাতির বীর সম্মানে পূজা পায় ১৩ ই বৈশাখ। এদের মধ্যে একাংশ এই জন্য শূন্যবাদী রামাই পন্ডিতের ধর্মপূজার পন্ডিতের ভূমিকায় পৌরোহিত্য করতেন। ধর্ম পূজার জন্য তাম্র বলয় পরিধান করে এরা সমাজে বিশেষ সম্মানের পাত্র ছিল। মল্ল সামরিক শক্তির অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীতে এদের অংশগ্রহণ ছিল সবচেয়ে বেশি।

**হাঁড়ি :** মল্লভূমে শিখর্যো বা শিখর ভূম থেকে আগত ও মন্দারন্যা বা মন্দারন থেকে আগত হাঁড়িদের বাস আছে। এই জাতির সদস্যারা দাইমা হিসাবে কাজ করত। এরা ঘোড়ার মৃত্যু হলে অশৌচ পালন করত।

**বাগদি :** মল্লভূমে এদের তিনটি উপবিভাগ দেখা যায়। তেঁতুলিয়া থাকের বাগদীরা দক্ষিণ কলিঙ্গের সাথে সম্পর্কিত বলে দাবি। লাঞ্ছন চিহ্ন তেঁতুল থেকে এই নামকরণ হতে পারে। অন্য থাকটি হল কাঁসাইকুল্যা যেটি কাঁসাই বিধৌত অঞ্চল থেকে আগত হওয়ার কারণে হতে পারে। শক্তি ও সুঠাম চেহারার কারণে রাজারা এদের পালকি বাহক, দেহরক্ষী, প্রাসাদরক্ষী, অষ্টপ্রহরী, সেনা, লাঠিয়াল, পদাতিক সেনা, বরকন্দাজ পাইক, ঘাটোয়াল, সাদিয়াল প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করত। আর একটি থাক হল খয়রা। শহর বাঁকুড়ার আশপাশের অঞ্চলের(পূর্বতন জয়বেলিয়া তরফ) বাগদীদের জয়বেলিয়া থাকের, দামোদর-দ্বারকেশ্বর বিধৌত অঞ্চলের বারোহাজারী থাক,

কাঁসাই-শিলাই বিধৌত অঞ্চলের বাগদীদের নিয়ে সিংহাজারী থাকের দেখা পাওয়া যায়।

**যুগী :** এরা নাথপন্থী। এদের তিনটি থাক হল (১) ধর্ম ঠাকুরের পূজারী, তামার বালা ধারী (২) উপবীত ধারী (৩) বালা বা উপবীত হীন। এদের বৃত্ত ছিল বেলমালা তৈরি, কাপড় বোনা ও চুন বিক্রি। বিষ্ণুপুরের যুগীপাড়া ছাড়াও সোনামুখীর বিবড়দা, গেলিয়া গ্রামে এদের বাস আছে।

**বাউরি :** ধলভূমের বাউরিরা 'ধুলিয়া', শিখরভূমের 'শিখর্যা, মানভূমের 'মানা', মল্লভূমের বাউরি 'মানা' নামে পরিচিত। মল্ল বাউরিদের আঞ্চলিক উপবিভাগ ছিল (ক) সিংহাজারী (খ) সাততপা (গ) জয়বেলিয়া এবং কাজের ভিত্তিতে (ক) পাততুলা, (খ) গোবরা, (গ) কাঠুরিয়া, (ঘ) পাথুরিয়া। মল্লভূমের সব গ্রামেই এদের বাস।

**মাল :** বীরভুমের পূর্বের মালপাহাড়িয়াদের সাথে অনেকে এদের এক করে দেখেন। মল্লরাজারা মন্দিরের পূজার প্রয়োজনে মালাকার হিসাবে এদের মন্দির সন্নিহিত স্থানে বসতি স্থাপন করান। এদের চারটি পরিচিত থাক হল (ক) বারোহাজারী (খ) সিংহাজারী (গ) শেরগড়্যা (আসানসোল সন্নিহত শেরগড় এলাকা জাত) (ঘ) পটুয়া। বস্ত্রবয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাঁশের সূক্ষ্ম যন্ত্র এরা প্রস্তুত করে দিত।

**সাঁওতাল :** মল্লরাজ্যে সাঁওতালদেরও বসতি গড়ে উঠেছিল। ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে এদের আগমন ঘটে। রাঢ়ে এদের উপবিভাগগুলি হল হাঁসদা, সোরেন, মুর্মু, মান্ডি, টুডু, কিস্কু, হেমব্রম, চঁড়ে, পাঁউরিয়া, বেসড়া ও গেন্ডয়ার। ছাতনা, দক্ষিণ রাঢ়, শিলদা অঞ্চলে এদের আধিক্য ছিল। আদি আগমন ঘটেছিল ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে।

## মন্দির স্থাপত্যের কারিগর

সমস্ত মল্লভূম জুড়েই ষোড়শ-সপ্তদশ শতক থেকেই মন্দির স্থাপত্যের জোয়ার আসে। মূলত মল্লরাজা বা স্থানীয় জমিদারদের অনুকূল্যে, কিছু ক্ষেত্রে বণিক সম্পদায়ের অর্থে এই মন্দিরগুলো গড়ে উঠতে থাকে। মূলত মাকড়া পাথর দিয়ে, বা বেশির ভাগ পোড়া মাটির ইট, চুন-সুরকি দিয়ে এগুলি গড়ে উঠতে থাকে। এই ইট তৈরি হত তেঁতুল কাঠের জ্বালানী থেকে। মন্দির সন্নিহিত এলাকায় পুকুর খনন করে সেই মাটি নির্মীয়মাণ মন্দিরের চারপাশে ঢিপ করে আস্তে আস্তে মন্দিরগুলি গড়ে উঠত। কাজ শেষে এই মাটি গলিয়ে ফিরে পাওয়া যেত গড়ে ওঠা মন্দিরের কাঠামো।

ল্যাটেরাইট পাথর সংগ্রহ করা হত খাদানের মধ্যস্তর থেকে ছোটদানা, ঘন বাঁধনের পাথর দেখে। হাতুড়ি ঠুকে আওয়াজ বুঝে এই নির্বাচন সারা হত। উড়িষ্যার মাকড়া পাথর ছিল সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ের উৎকৃষ্ট পাথরও আনা হত। পাত্রসায়েরের পশ্চিমের বনভূমির, সোনামুখীর পাথরমোড়া ও চুয়াসমিনা গ্রামের মাকড়া পাথর বিষ্ণুপুর মন্দিরে ব্যবহার করা হয়েছে। পাত্রসায়ের থানার মন্দির নির্মাণে বীরসিংহ বনভূমির পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। বিনোদনগর, বীরসিংহ, জামকুড়ি মৌজার উত্তরাংশ ও ধানসিমলা মৌজার বনভূমির উন্নত মকড়া পাথর এই থানার বিভিন্ন মন্দির নির্মাণে ব্যবহার করা হত বলে জনশ্রুতি। এই পাথর তোলার কাজ করত মূলত বাউরি ও লোহার সম্প্রদায়ের মানুষ ও মন্দির নির্মাণ করতেন মূলত সূত্রধর সম্প্রদায়ের লোকজন।

মন্দির সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে বড় ভূমিকা নেয় মন্দিরগাত্রে ক্ষোদিত প্রতিষ্ঠা লিপি। সেই অর্থে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। বেশ কিছু মন্দিরের প্রতিষ্ঠা লিপি থেকে মন্দির তৈরির কারিগরের নাম, সাকিন ও নির্মাণকাল জানা যায়। এই লিপি হত বাংলা বা সংস্কৃত হরফে। কালো পাথরে, পোড়া মাটিতে, পঙ্খের ফলকে, সরাসরি মন্দির গাত্রে বা তাম্র, কাষ্ঠ ফলকে।

এমন মন্দির লিপির মাধ্যমে হদিশ মেলে বিভিন্ন কারিগরের, যেমন (১) ইন্দপুর থানার সাসপুর গ্রামে ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত তন্তুবায় দে পরিবারের সতেরো চূড়া বিশিষ্ট রাসমঞ্চের লিপি থেকে জানা যায় এর কারিগর ছিলেন রোল গ্রামের বিষ্ণুচরণ মিস্ত্রি। এর এক বছর পর ঠাকুর বাড়ির প্রবেশ পথ ও পাশের ডোঙ্গালন গ্রামের বুনা শিব ও রাধাবল্লভ জীউয়ের মন্দির সংস্কারেও তাঁর নাম কারিগর হিসাবে ক্ষোদিত আছে। (২) জয়পুর থানার বৈতল গ্রামের লাহা পরিবারের রাধাদামোদর মন্দিরের নির্মাণ কাজ (১৬৯১-১৬৯৬) করেন বাখাটি গ্রামের পুলিন দাস মিস্ত্রি। (৩) একই বাখাটি গ্রামের রামমোহন মিস্ত্রি ১৭৮৫ সালে কোতলপুরের থানার কোনারপুর গ্রামের কৃষ্ণকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথ মন্দিরের নির্মাণ কাজ শেষ করেন। স্পষ্টতই হুগলীর বদনগঞ্জ সন্নিহিত বাখাটি গ্রামে নির্মাণ শিল্পীদের বসবাস ছিল এবং মল্লভূমের বিভিন্ন মন্দির তৈরিতে এদের দুই শতাব্দী বা তার বেশি সময় ধরে ডাক পড়েছে। (৩) বিষ্ণুপুর থানার বাঁকাদহ গ্রামের রাধাদামোদরের আটচালা মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় ১৮৪৫ সাল থেকে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত চলতে থাকা মন্দির তৈরির কাজ করেছিলেন নারায়ণ মিস্ত্রি ও সম্প্রদায় (দিগর)। পাত্রসায়ের

থানার হদনারায়ণপুরের মন্ডল সতেরচূড়া বিখ্যাত ত্রিতল রাসমঞ্চ নির্মাণ করেছিলেন নারায়ণ সূত্রধর। (৪) ১৮৯০ সালে কোতলপুরের জিবটা গ্রামের দুর্গা দালান মন্দিরের কাজ করেছিলেন তাজপুরের পানাউল্লা কাজি ও দিং (অন্যান্যরা)। এই প্রতিষ্ঠালিপি থেকে বোঝা যায় হিন্দু মন্দির নির্মাণে মুসলিম কারিগরদেরও সমান যোগদান ও দক্ষতা ছিল। (৫) ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে ঐ থানার ভাগলপুর নিবাসী নবকৃষ্ণরায় প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণরায় জীউয়ের মন্দিরের পোড়ামাটির ছয় লাইনের লিপি ফলক থেকে কারিগর হিসাবে প্রমাণিত রায়না পরগণার কানপুর গ্রামের সাফল্য রাম দে। (৬) জয়পুর থানার ময়নাপুরের কর্মকারদের ১৮৪৪-১৮৪৫ সালের মধ্যে নির্মিত কুলদেবতা রাধাদামোদর পঞ্চরত্ন মন্দিরটি হয়েছিল শ্রী গঙ্গানারায়ণ মিস্ত্রির হাতে। (৭) সোনামুখীর তন্তুবায় পরিবারের পশ্চিমমুখী পঁচিশ চূড়ার টেরাকোটার শ্রীধর মন্দির তৈরি করেছিলেন কানাই দাস রুদ্র। ১৮৪৫ সালের এই অসামান্য সৃষ্টি হয়েছিল হরি সূত্রধর নামে এক কারিগরের হাত ধরে। (৮) পরবর্তীকালে হদলনারায়ণপুরের রাধাদামোদর মন্দির সংস্কারে হাত দিয়েছিলেন বেনীমাধব সূত্রধরের দল। (৯) চন্দ্রপাড়া কামারগলির গন্ধবণিক পরিবারের ইটের খাঁজকাটা শিখরযুক্ত দেউল শিব মন্দিরটি সোনামুখীর রামহরি মিস্ত্রির দ্বারা তৈরি হয় ১৮৩৭ সালে। কালনার প্রতাপেশ্বর দেউলটি ১৮৪৯ সালে ইনিই তৈরি করে দিয়েছিলেন। (১০) সোনামুখীর রামগোপাল সূত্রধর ১৮৬৭ সালের সোনামুখীর সিদ্ধেশ্বরের একটি মন্দির নির্মাণ করেন। (১১) এখনও দারুশিল্পী সূত্রধরদের বিষ্ণুপুরের মনসাতলা, গোপালগঞ্জ, মাধবগঞ্জ, বাহাদুরগঞ্জ, কাটানধার, নিমতলা, বেলতলা, কালীমেলা, বোলতলা এলাকায় দেখা যায়। এদের পূর্বপুরুষরা মন্দির স্থপতি ছিলেন এমন নথি মেলে। ১৮৯২ সালে তৈরি গড়বেতা থানার দেরিয়াপুর গ্রামের বেরা পরিবারের আটচালা মন্দির নির্মাণ করেন বিষ্ণুপুরের শংকর দাস। এ গ্রামের নন্দী পরিবারের তুলসী মন্দিরের স্থপতি ছিলেন মুচিরাম সূত্রধর। (১২) ১৮৫৫ সালে তৈরি মেদিনীপুর জেলার বগড়ীর কৃষ্ণরাই জীউয়ের পঞ্চরত্ন মন্দিরটির স্থপতি ছিলেন বিষ্ণুপুরের সনাতন মিস্ত্রি। (১৩) ১৯২৬ সালের গড়বেতা থানার যোগারডাঙ্গার কুন্ডু পরিবারের পঞ্চরত্ন মন্দিরের স্থপতি ছিলেন বিষ্ণুপুর-কৃষ্ণগঞ্জের গোবিন্দ সূত্রধর। অর্থাৎ বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই শিল্প ও শিল্পীর যোগান বিষ্ণুপুর থেকে অব্যাহত ছিল। (১৪) বীরসিংহে বৈষ্ণব কবি তারাচাঁদ গোস্বামীর পুত্র রাধারমণের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে নাড়ুগোপাল মন্দির ও ১৯২৫ সালে মন্দির সংলগ্ন অপূর্ব খিলানের গোম্বুজাকৃতি নাটমন্দির নির্মাণ

করেছিলেন বর্ধমানের শাঁখারী গ্রামের রাধারমনের শিষ্য ভাবিনী বাগদী ও বীরসিংহ গ্রামের নটবর মিস্ত্রি। নটবর সূত্রধর বহু লাটাই কুমড়িবাড়ী, দেবালয়, শিখর রীতির মন্দির তৈরি করেছিলেন।

দ্বারকেশ্বর সন্নিহিত গ্রাম প্রকাশ, ছিলিমপুর, ভড়া, মুনিনগর, উলিয়াড়া, হিংজুড়ি গ্রামে কুম্ভকারদের বাস ও ইট তৈরির প্রকরণ ও কর্মশালার প্রত্নপ্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রকাশ গ্রামের একটি প্রাচীন কুম্ভকার বাড়ী মাকড়া পাথরের ভিত্তির উপর পোড়া মাটির টালি ইটের তৈরি। কিছু নথি থেকে মল্ল সমকালীন ভড়া গ্রামে মন্দির স্থপতিদের বসতি নিয়ে ধারণা তৈরি করা যায়। বিষ্ণুপুরের যোগেশচন্দ্র সংগ্রহশালায় রক্ষিত একটি প্রস্তরফলকে নাম পাওয়া যায় সনাতন মিস্ত্রি, তারাচাঁদ মিস্ত্রি, নন্দলাল মিস্ত্রীর। পাত্রসায়ের বীরসিংহ গ্রামে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতক থেকে নির্মিত মন্দিরগুলির কারিগর ছিলেন জেলার স্থপতিরাই। (ক) ১৮২৫ সালের গরাই পরিবারের শ্রীধর মন্দিরের কারিগর ছিলেন নটবর রক্ষিত। (খ) ১৮৫৫ সালের তৈরি কালীচরণ সরকার প্রতিষ্ঠিত মাঝেপাড়া শিবতলার শীতলেশ্বর শিবের রেখদেউল মন্দিরটির স্থপতি ছিলেন বিশ্বনাথ মিস্ত্রি। এর নাট মন্দিরটি ছিল বেত, খড়, কাঠের উপকরণ দিয়ে লাটাইকুমড়ি শৈলীর। শিল্পী ছিলেন স্থানীয় সূত্রধরেরা। (গ) মোলতলাপাড়ার দাস পরিবারের লক্ষ্মী জনার্দন আটচালা মন্দিরের স্থপতি ছিলেন বালসী গ্রামের। (ঘ) তুলসী মন্দির সহ কাশীশ্বর ও রামেশ্বর মন্দির স্থাপনের কারিগর ছিলেন স্থানীয় নটবর মিস্ত্রি। (ঙ) ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে বামুনডাঙ্গাপাড়ার গয়ারাম-বিহারী চক্রবর্তী পরিবারের রঘুনাথ দালানের মন্দিরের স্থপতি ছিলেন নদেরচাঁদ মিস্ত্রি। (চ) গোস্বামী বংশের রাধারমন ও রামভবানী প্রতিষ্ঠিত গোপাল জীউ এলতলা দালান মন্দির-নাটমন্দিরে স্থপতি ছিলেন নটবর মিস্ত্রি ও সহযোগী সাঁকারী গ্রামের ভাবী বাগদী। (ছ) গ্রামের বিশ বা ঊনিশ শতকের তৈরি হওয়া দাস-দে-সু পরিবারের রাসমন্ডল (১৮২৯), আটচালা শিবদূর্গা মন্দির (১৯০৫) ও দিগম্বরী মন্দিরের (১৯২৭) নির্মাণ কাজ হয়েছিল স্থানীয় সূত্রধর মিস্ত্রিদের দিয়ে।

## বিষ্ণুপুরের শিল্প ও শিল্পী সমাজ

ষোড়ষ শতকে বেনারস থেকে কয়েকজন সুদক্ষ তন্তুবায় বস্ত্রশিল্পী মুর্শিদাবাদের বালুচর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এই অভিবাসনের কোন কারণ পাওয়া যায় না। একটি মতে ঔরঙ্গজেব প্রশাসনের অত্যাচারের ফলে তন্তুবায় সমাজ ভারতের

বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। মুর্শিদকুলী প্রতিষ্ঠিত এই নতুন রাজধানী মুর্শিদাবাদে তন্তুবায় গ্রাম প্রতিষ্ঠার কারণ এটি হতে পারে। এরা তসর বস্ত্রে অসাধারণ কারুকাজের বস্ত্র বয়ন করতে সক্ষম ছিলেন। এগুলি ছিল মূলত জামদানি ও ঢাকাই মসলিন। আরেকটি মতে বালুচর গ্রামে পূর্ববঙ্গ থেকে রাজধানী স্থানান্তরের অনুষঙ্গে ঢাকাই মসলিনের শিল্পীদের আগমন ঘটে।[৮২] যেভাবেই আসুন, তারা দ্রুত নবাব পরিবারের নজরে পরেন এবং নবাবদের আদেশে নতুন ধরণের শাড়ি তৈরির প্রয়াসে বালুচরী শাড়ি তৈরি করতে সক্ষম হয়।[৮৩] কিছুকাল পরে এই তন্তুবায়দের এক অংশের মল্লরাজধানীতে আগমন ঘটে। প্রবাদ আছে নবাবরা অসাধারণ শাড়ি তৈরির পর সেই শাড়ি যাতে আর তৈরি না হয় তার জন্য তাঁতির আঙ্গুল কেটে দিতেন। অবশ্য এটি সত্য কিনা সন্দেহ, কারণ পরবর্তী প্রয়োজনে এ শাড়ি পাওয়ার সম্ভবনা তাতে নির্মূল হত। হয়ত অর্থনৈতিক কারণে ও বালুচর গ্রাম নদীগর্ভে চলে যাওয়ার ফলে এরা বিষ্ণুপুরে চলে আসেন। উল্লেখ্য পরবর্তী কলে কোম্পানী ব্রিটিশ বস্ত্রের আমদানী বাড়াতে দেশীয় তন্তবায়দের আঙ্গুল কেটে দিতেন। চীপের সোনামুখী কুঠি ছিল বস্ত্রবয়ন শিল্প ও রপ্তানী-আমদানীর মুখ্য কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের দ্বারা দাদন সংগ্রহ থেকে দৈহিক অত্যাচারের বিভিন্ন নথি পাওয়া যায়।

মন্দারণে শূর বংশের রাজত্বকালে তন্তুবায় সমাজের বসতি স্থাপিত হয়। মল্লভূমের সমৃদ্ধি পর্বে মন্দারণ থেকে এদের বিষ্ণুপুরে আগমন ঘটে। এরা মল্লভূমে 'মান্দারাণ্যা তাঁতি' বা মান্দার তাঁতি নামে পরিচিত হয়। এরা তসর ও রেশম বস্ত্র বয়নে অত্যন্ত পটু। বালুচর গ্রামের তন্তুবায়রা বিষ্ণুপুর ও সোনামুখীতে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৮৪] পাটরা, পাটনি, পাটরাঙা থাকের তন্তুবায়রা রং করার কাজে পারদর্শী এবং তারা বিষ্ণুপুরে বসতি স্থাপন করে। এরা লাক্ষা থেকে লাল রঙ, নীল গাছ থেকে নীল রঙ, একাধিক জৈব রঙের মিশ্রণে বিবিধ রঙ উৎপন্ন করতেন। রঙ পাকা করতে তেঁতুল, আকন্দ, কলা, শাল প্রভৃতি গাছের ক্ষার বা অম্ল ব্যবহার করা হত। পাট রঙ করায় পটু এই তন্তুবায়দের মল্লরাজ আবহে 'পাটরাঙা' পদবী প্রাপ্ত হয়।

মল্লরাজ হাম্বির শ্রীনিবাস আচার্যের প্রভাবে বৈষ্ণব মতের অনুসারী হলে বনবিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমে একের পর এক রাধা-শ্যাম মন্দির প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। প্রতি মন্দির সন্নিহিত এলাকায় পূজা ভোগ-নৈবেদ্য দেওয়ার সুবিধার্থে বসান হয় একঘর মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক মোদক ও দুধ-ছানা সরবরাহকারী গোয়ালা। এই সব কারণে যোড়শ শতক থেকে মল্লভূমে মিষ্টান্ন শিল্পে জোয়ার আসে। রাঢ়ীয় মোদক

জাতির মধ্যে বারোটি গোষ্ঠী আছে। এক একটি গোষ্ঠী এক এক ধরণের মিষ্টি তৈরিতে পটু ছিলেন। যেমন বরাট মোদকরা বেসনের মিঠাই ও চিনির ওলা তৈরিতে ওস্তাদ। দে-মোদকরা জিলিপি ও নাগ-মোদকরা মোতিচুর তৈরিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।[৮৫] উল্লেখ্য শেষ মল্লরাজ চৈতনা সিংহ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে বাগবাজারের ধনী লবণ ব্যবসায়ী গোকুল মিত্রের কাছে কুলদেবতা মদনমোহন বন্ধক রাখলে তার সেবার জন্য বিষ্ণুপুর থেকে মিষ্টান্ন কারিগর নবীন মোদক ও ভীম নাগ আর গোয়ালা দ্বারিক ঘোষকে বাগবাজারে এনে বসান। এদের হাত ধরেই কলকাতায় মিষ্টান্ন ব্যবসায়ের প্রসার ও প্রচার ঘটে।

বিষ্ণুপুরে মিহিদানার অনুরূপ মিষ্টি মোতিচুর এই অঞ্চলের নিজস্ব সৃষ্টি। মিহিদানা তৈরি হয় ডবল-বেসন থেকে, আর মোতিচুর পিয়াল বিচির বাদামের বেসন থেকে। দানার আকার মিনিদানা থেকে বড়। কোন রঙ মেশান হয় না। পিয়ালের বেসনের সাথে আনুপাতিক হারে চালগুড়ি মিশিয়ে পরিমাণ মতো জল মিশিয়ে হালকা আঁচে দেশী ঘিয়ে ভাজা হয়। আর শেষে চিনির জলে ডুবিয়ে ঠান্ডা করে নেওয়া হয়। মোতি সদৃশ উজ্জ্বলতার কারণে এর নাম হয় মোতিচুর। এই মিষ্টান্ন তৈরির পরিবারের সাত পুরুষ আগের প্রতিষ্ঠাতা (আদি পুরুষ) গোপাল নাগ মন্ডল। পুরুষানুক্রমে ছয় পুরুষ ধরে (মহাদেব নাগ মন্ডল পর্যন্ত) এই পরিবার মল্লরাজদের সমস্ত পূজার মিষ্টি সরবরাহ করেছেন। মল্ল রাজারা এই দক্ষতার স্বীকৃতিতে গোপাল নাগকে মন্ডল উপাধি দেন, যা আজও পরিবার ব্যবহার করে।

মল্লভূমে বীরহাম্বিরের সময়ে দশাবতার তাসের প্রচলন এক অনন্যতার নজির।[৮৬] মল্লরাজের সাথে ভারত সম্রাট আকবরের মিত্রতা ছিল। তিনি অনেকবার দিল্লীর দরবারে হাজির হয়েছিলেন। রাজদরবারের তাসের অনুকরণে তিনি বিষ্ণুপুরে দশাবতার তাসের প্রচলন করেন। অনেকের মতে এটি উড়িষ্যার প্রভাবে প্রচলিত হয়। দশম তাসে বুদ্ধদেবের পরিবর্তে জগন্নাথের অবস্থান এই ওড়িয়া প্রভাবের ফল বলে প্রচারিত। তবে খুব সম্ভব দুই ধারার সংমিশ্রণেই এই তাসের সৃষ্টি। বিষ্ণুর দশ অবতার হল মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, বলরাম, পরশুরাম, দাশরথি-রাম, জগন্নাথ, কল্কি। প্রতি অবতারে দশটি তাস নিয়ে মোট ১২০ টি তাস দিয়ে এই খেলা। এই তাসের নির্মাণরীতিও বিচিত্র। প্রথমে পরপর তিন পর্দা সুতির কাপড় তেঁতুল বিচির আঠা দিয়ে টানটান করে চিটিয়ে নিয়ে কাপড়ের একটি শিট তৈরি করা হয়। শুকিয়ে নিয়ে প্রয়োজন মতো আঠা ও খড়িমাটি মিশ্রিত প্রলেপ দেওয়া

হয় উভয় পার্শ্বে। এটি আবার শুকিয়ে নোড়া দিয়ে ঘসে মসৃণ করে নেওয়া হয়। কাঁচি দিয়ে প্রথমে বর্গাকার ও পরে বৃত্তাকার আকার আনা হয়। প্রান্তদেশ আগের পদ্ধতিতে শক্ত করা হয়। এর পর ছবি আঁকা ও বার্ণিশের পালা। অবতারের অঙ্কণে ওড়িয়া প্রভাব ও পার্শ্বচিত্রে মোঘল ছাপ আছে। কল্কি অবতারটি মোঘল রাজপুরুষের মতো। হাম্বিরের নির্দেশে কার্তিক ফৌজদার এই তাসের সৃষ্টি করেন বলে জানা যায়। এই ধারা বজায় রেখেছেন তাঁর উত্তরপুরুষরা। ভাস্কর, শীতল, বিদ্যুৎ।

মল্লরাজ হাম্বিরের সময়ে গড়ে ওঠা মন্দির গাত্রে পোড়ামাটির অলংকরণ মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরের গরিমা বৃদ্ধি করেছে। শিল্পীদের পরম যত্ন, কায়িক শ্রম ও শিল্প বোধের সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই শিল্পকলা। পোড়া মাটির হাতি ঘোড়ার শিল্প বাঁচিয়ে রেখেছে পাঁচমুড়ার মৃৎশিল্পীরা। এই শিল্প অনেকটা মল্লরাজের সামরিক বাহন হাতি ও ঘোড়াকে গৌড়াবান্বিত করে। এই মল্ল ঘোড়া ও হাতি গহনায় সজ্জিত থাকত এবং তার অনুকরণে পাঁচমুড়ার হাতি-ঘোড়াকে সজ্জিত করা হয়। কথিত আছে এই কাজে সুনিপুণ ছিলেন হুগলী জেলার মৃৎশিল্পীরা। পরে তাদের থেকে মল্লভূমের মৃৎশিল্পীরা এই কলা আয়ত্ত করেন।

এইভাবে রাজ শাসনের অনুষঙ্গে মল্লভূমে বিভিন্ন শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। বিষ্ণুপুরে লন্ঠন, শাঁখের কাজ, ধাতুর কাজ সহ বিভিন্ন শিল্পেরও বিকাশ ঘটে।

## রাজহাটী বাণিজ্য কেন্দ্র

রাজহাট হল দ্বারকেশ্বর নদীতীরে প্রতিষ্ঠিত মল্ল সময়কার একটি বাণিজ্য কেন্দ্র। কবে এর সূচনা হয়েছিল তার কোন প্রামাণ্য নথি বা তথ্য নেই। তবে অনেকেরই অনুমান মল্লরাজ বীরসিংহ (১৬৫৬ - ১৬৪২) তার প্রান্তিক প্রশাসনিক শহর হিসাবে এটি গড়ে তুলেছিলেন। তবে এ নিয়ে কোন লিখিত তথ্য নেই। তবে এই বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির অনেক প্রমাণ আছে। হয়ত বীরসিংহের সময়ে এই সমৃদ্ধি শিখরে পৌঁছেছিল। এখানে তন্তুবায়, তাম্বুলি, শঙ্খবণিকদের বিনিয়োগ ও বাস ছিল। এই সামাজিক বণিক শ্রেণী 'রাজহাটি শ্রেণী' এবং রাজহাটের পরিমাপ পদ্ধতি 'রাজহাটি পাই' জেলা জুড়ে খ্যাতি ও ব্যবহারিক পরিচিতি পেয়েছে। উমাদত্ত-রামকিষেণ নামে বাঁকুড়া শহরের সবচেয়ে বড় বস্ত্র বিপণি গড়ে উঠেছে যে সফল ব্যবসায়ীদের ব্র্যান্ড নামে, তারাও ছিলেন এই রাজহাটি থাকের।

এখনও এই পরিত্যক্ত বাণিজ্য জনপদটিতে গেলে এর অতীত গরিমার আঁচ

পাওয়া যায়। দোতলা-তিনতলা প্রাসাদোপম বাড়িগুলির ধ্বংশাবশেষ সেই অতীত সঙ্গতির দ্যোতক। এই রাজহাটি-বীরসিংহপুর পরিমন্ডলে ক্ষেত্র সমীক্ষায় শ'খানেক ইমারত ছাড়াও নাটমন্দির, দুর্গামন্ডপ ও প্রাচীন মন্দিরের অনেক ভিত্তিভূমির সন্ধান পাওয়া গেছে। অনেকে পরিত্যক্ত বাড়িগুলিতে খনন করে মুদ্রা, সোনা, রূপার হদিশ পেয়েছেন বলে জনরব আছে। রাজহাটিতে এমন একটি ধ্বংশপ্রাপ্ত বিষ্ণুমন্দিরের প্রতিষ্ঠা লিপিতে দেখা যায় ১৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে এর অধিষ্ঠান হয়েছে। তখন মল্লভূমে রাজা পরম বৈষ্ণব গোপাল সিংহের শাসন।

এই রাজহাট বাণিজ্য কেন্দ্রের কবে পতন ঘটল তা নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। গোপাল সিংহের (১৭১২ - ১৭৪৮) সময়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা থেকে মনে হয়, এই পতন সম্ভবত চৈতন্য সিংহ (১৭৪৮ - ১৮০১) বা তার পরবর্তীকালে ঘটেছিল। পতনের কালে এখানে ১৬২ ঘর তাম্বুলির বাস ছিল। এরা 'রাজহাটি তামলি' নামে পরিচিত ছিল। এই তন্তুবায় ও তামলিরা সম্ভবত বড় সংক্রামক রোগে মরকের কারণে একযোগে কোন অকল্যাণ থেকে বাঁচতে গ্রাম ছাড়া হয়ে রাজগ্রাম সহ জেলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন।

এখান থেকে তাম্বুল, রেশম, তসর ইত্যাদি সন্নিহিত ও দূরবর্তী জেলাতে বিক্রি হত। মেদিনীপুরের লবণ উৎপাদক অঞ্চলের সাথে এই বাণিজ্য কেন্দ্রের যোগ ছিল। সড়ক পথ ছাড়াও ব্যবহার করা হত দ্বারকেশ্বর নদীপথ।

## মল্লভূমে ব্যবসা-বাণিজ্যে পরিবহন ও সড়ক

মল্লভূমের বনজ সম্পদ, কৃষক ও শিল্পীদের উৎপাদিত সামগ্রীর বিপণন ও বাণিজ্যের জন্য নদীপথ ও সড়কপথ ব্যবহার করা হত। নদী বাণিজ্যে দামোদর, দ্বারকেশ্বর ও কংসাবতী নদী ব্যবহৃত হত। স্থলপথের ক্ষেত্রে অনেকগুলি পথ মল্লভূমি ছুঁয়ে গেছে। গৌড় থেকে দাঁতন হয়ে উড়িষ্যা গামী রাস্তা মন্দারণের কাছে মল্লভূম সীমান্ত ছুঁয়ে গেছে। এটি বাদশাহী সড়কের অংশ ছিল।

দ্বারকেশ্বর নদীতীর বরাবর একটি প্রাচীন পথের অস্তিত্ব ছিল যেটি মূলত বাণিজ্যের কারণে ব্যবহৃত হত। এই রাস্তা যোথবিহার, ডিহর, বহুলাড়া, এক্তেশ্বর স্পর্শ করে গেছে এবং এই জনপদগুলিতে মূলত বণিকদের দ্বারা অনেক মন্দির গড়ে ওঠেছিল। এটি গঙ্গাজলঘাটি, মেজিয়া, রাণীগঞ্জ, ভীমগড়, নাগোর, বক্রেশ্বর হয়ে মুঙ্গের স্পর্শ করেছে। এই রাস্তাটি এক্তেশ্বরের কাছে নদী পার হয়ে রাজগ্রাম, দেউলভিড়্যা

(ইন্দপুর), খাতড়া, পাকবিড়া, বুধপুর, মানবাজার, বরাবাজার হয়ে দুলমীর কাছে সুবর্ণরেখা অতিক্রম করে বুদ্ধগয়াতে পৌঁছছে।

বাঁকুড়া শহরের শাখারিপাড়া থেকে পশ্চিমমুখী আরেকটি রাস্তা পাটপুর, উড়িয়ামা, কেঞ্জাকুড়া, ছাতনা, পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর, চেলিয়ামা, তেলকুপি, ঝরিয়া, রাজৌলী, রাজগীর হয়ে পাটলিপুত্রে পৌঁছেছে।

সোনামুখী বস্ত্রকেন্দ্র থেকে রাঙামাটির কাছে দামোদর অতিক্রম করে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বুদবুদের কাছে জিটি রোডে যুক্ত হয়েছে। এই পথ থেকে পখন্না, পুষ্করণা, সাহারজোড়া, মালিয়াড়ার মত প্রাচীন জনপদের যোগ ছিল শাখা সড়ক মাধ্যমে। মোঘল আমলে মোঘলমারি থেকে মন্দারণ ও মন্দারণ থেকে কোতলপুর হয়ে রাইপুর—বিষ্ণুপুর একটি সড়ক পথের অস্তিত্ব ছিল।

এই সব সড়ক-পথ ব্যবহার করেই মল্লভূম ও সন্নিহিত ভূমরাজ্যগুলি বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল।

দ্বাদশ শতকে ইন্দোরের রানী অহল্যাবাঈ যে সুদীর্ঘ সড়ক নির্মাণ করেছিলেন (অহল্যাবাঈ সড়ক নামে পরিচিত) মল্লভূমে তার অংশ ছিল বাঁকুড়ার রাণীগঞ্জ-রাণীগঞ্জ মোড় থেকে বাঁকুড়া শহর স্পর্শ করে বিষ্ণুপুর হয়ে আরাম্যনগর বা আরামবাগের দিকে ধাবিত ও জাজপুরগামী সড়কের সাথে সংযুক্ত। এই সড়কের পার্শ্বে জেলায় ও সন্নিহিত জেলায় বাণিজ্যিক বিশ্রামের জন্য চটি ও আড্ডা গড়ে উঠেছিল তার তালিকা নিম্নরূপ, প্রথম রানীগঞ্জে মোড়ে মদনমোহন চটি, দ্বিতীয় চটি কালিসেন, তৃতীয় ওন্দাগ্রাম, চতুর্থ সোনামুখী মোড়, পঞ্চম গড়বেতা চটি, ষষ্ঠ শালবনি, সপ্তম গোদাপিয়াশাল, অষ্টম মেদিনীপুর শহর। পরিবহনের বড় মাধ্যম ছিল বলদ চালিত গাড়ি।

## মল্লভূমির ভূমিব্যবস্থা

মল্লভূমে রাজানুকূল্যে সামাজিক, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে বিভিন্ন মানুষের আগমন ঘটে। মল্লরাজারা ভূমি দান সহ বিভিন্ন উপায়ে এদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এমন ভূসম্পত্তি ও রাজানুকূল্য পাওয়া কিছু পরিবারের তালিকা পর্যালোচনা করলে সমকালীন সামাজিক বিবর্তন, ভূমি লাভ ও অভিবাসনের ধারা অনুধাবন করা যাবে।

'নাগ' পদবীর দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ চৌধুরী পরিবার আদপে মুর্শিদাবাদে নবাবের

কর্মচারী ছিলেন। নবাবের বিরাগভাজন হয়ে এরা সোনামুখীর জঙ্গলে আত্মগোপন করে। নবাবের নজরদারি কমলে মল্লরাজের অধীনে দুই ভাই কাজ শুরু করেন ও সোনামুখীর লোখেশোল গ্রামের প্রচুর ভূসম্পত্তি লাভ করেন। একই ভাবে 'গুহ' পদবীধারী কায়স্থ রায় পরিবারের সতত্বরাম রায় ছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাবের বছরে আড়াই লক্ষ টাকার রাজস্ব আদায়কারী 'ক্রোড়ী'। মল্লরাজের অনুগ্রহে তিনি দেওয়ান নিযুক্ত হয়ে রাজধানীর গোপালগঞ্জ-ষষ্ঠীবড়তলার নব প্রতিষ্ঠিত দশভূজা দেবীর সেবাইত নিযুক্ত হয়ে মল্লরাজের কাছে কামাড়পাড়ায় বিয়াল্লিশ বিঘা খুজরান জমি লাভ করেন। এর খাজনা ছিল ৫২ টাকা ১২ আনা ১৫ পাই। তিনি ছিলেন রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ ও গোপাল সিংহের দেওয়ান। তিনি ১৭০১ সালে দ্বিতীয় রঘুনাথের সাথে চেতুয়া-বরদা অভিযানে অংশ নেন। গোপাল সিংহ ও চৈতন্য সিংহের দেওয়ান ছিলেন এই বংশের মুকুন্দরাম। এদের বেলিয়াতোড়ে বহু ভূসম্পত্তি ছিল। গোপাল সিংহের সেনাপতি কমল বিশ্বাস হুগলী জেলার বালি থেকে আগত দত্তবংশীয় কায়স্থ। এরা মল্লরাজাদের কাছে 'বিশ্বাস' উপাধি ও জয়কৃষ্ণপুর-গহীরহাটি গ্রামে প্রচুর ভূসম্পত্তি লাভ করেন। দ্বিতীয় রঘুনাথের দুই বীর সেনা 'জয়' ও 'বিজয়'-এর বীরত্বে চেতুয়া-বরদা জয় সহজ হয়। কৃতজ্ঞ মল্লরাজের আনুকূল্যে সুর্পানগর গ্রামের দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ এই সুরাল পরিবার প্রচুর ভূসম্পত্তি লাভ করে। এমনকি চেতুয়া-বরদার রাজার অপহৃত গৃহদেবতাও সুর্পানগরে রাখার জন্য মল্লরাজের অনুমতি মেলে। হুগলী জেলা থেকে আগত আরেক 'দে' পদবীধারী রাঢ়ী কায়স্থ মল্লরাজের সমর কর্মী নিযুক্ত হয়ে মল্লরাজের কাছে সদর থানার ভাদুলে ভূসম্পত্তি সহ বসতি ও 'সিংহ' পদবী লাভ করে। দামোদরবাটী গ্রামে চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা দামোদর গুহের অধীনস্থ জমিদার বা চৌধুরী হিসাবে বহু ভূসম্পত্তি লাভ করেন মল্ল রাজার কাছ থেকে। ওন্দা থানার চাবড়া গ্রামের দক্ষিণ রাঢ়ী গ্রামের কায়স্থ পরিবার রাজকাজে যোগ দিয়ে মল্লরাজার অনুগ্রহে প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক হয়। দ্বারকেশ্বর নদী তীরবর্তী পাইকপাড়া পাত্রবাখড়া গ্রামে মুর্শিদাবাদ থেকে আগত রাঘব দাস নামের উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ মল্লরাজ বীরসিংহের আমলে বসতি স্থাপন করেন ও মল্লরাজের কাছ থেকে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি ও প্রচুর ভূসম্পত্তি দান পান। রাজার ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে কাজ করার জন্য বিহার থেকে প্রচুর ভাড়াটে সেনার আগমন ঘটে ও তারা এখানে স্থায়ী বসতি পত্তন করেন। এরা ছত্রী হিসাবে পরিচিতি হন। গঙ্গাজলঘাটিতে এদের আধিক্য ছিল। রক্ষণশীল এই জাতির মহিলারা ছিল পর্দানশীন। কৃষি ছিল এদের

অন্যতম জীবিকা। বাইশগ্রামের ঘাটোয়াল ছিলেন ছত্রী। বারো হাজারী এলাকার ছত্রীরা ছিলেন মূলত তোপ বা কামান বাহিনীর অংশ। মল্লরাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এরা কামান সহ হাজির হত। ক্রমে এরা ঘাটোয়াল ও কৃষকে পরিণত হন। শুধু কায়স্থ-ছত্রী নয়, বিপুল সংখ্যক ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য মল্লভূমে হাজির হয়ে রাজার আনুকূল্যে অর্থবান ও প্রতিষ্ঠিত হন। বর্ধমান থেকে সঞ্চারী পরগণার বেনুগ্রাম থেকে আসা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ মিত্র পরিবার রাজপরিবারের সাথে যোগসূত্র হেতু প্রচুর ভূসম্পত্তির অধিকারী হতে পেরেছিল। এমন ভূমিদান পেয়েছিলেন আরো বহু পরিবার। উত্তর চব্বিশ পরগণার আড়িয়াদহ থেকে ঘোষাল পদবীর এক ব্রাহ্মণ মল্লরাজের জয়বেলিয়া পরগণার রাজস্ব কর্মচারী নিযুক্ত হয়ে নড়ড়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ইনি রাজার কাছ থেকে ভূসম্পত্তি ও 'পাত্র' পদবী লাভ করেন। চৈতন্য সিংহের সময়ে ঢাকার বিক্রমপুর থেকে নন্দরাম, সাহেবরাম, গিরিধর, হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্তী নামের চার ভাই মল্লভূমে এসে বিভিন্ন রাজকীয় পদ অলঙ্কৃত করেন। নন্দরাম এক হাজার সেনার অধ্যক্ষ পদ লাভ করে 'হাজারী' উপাধি পান। এরা পাত্রসায়েরে বসতি ও বহু ভূসম্পত্তির মালিক হন। গোপাল সিংহের আমলে হুগলী জেলার খামারগাছী গ্রাম থেকে নিধিকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জয়পুর থানার ময়নাপুরে এসে বসতি স্থাপন করে। এদিকে মল্লরাজের দেওয়ান শরোত্তর রায় ছিলেন ময়নাপুরের বাসিন্দা ও অপুত্রক। নিধিকৃষ্ণের সাথে শরোত্তরের কন্যা অন্নপূর্ণার বিবাহ হয়। চৈতন্য সিংহের সময় রায় পরিবার থেকে এই মুখোপাধ্যায় পরিবারে দেওয়ানী হস্তান্তরিত হয়। কারণ, বৃদ্ধ দেওয়ান শরোত্তর রাজাকে প্রভাবিত করে অন্নপূর্ণার পুত্র চন্ডীচরণকে দেওয়ান পদে নিয়োগ করতে সমর্থ হন। বিক্রমপুরের বার ভূঁইয়া চাঁদ রায়ের কাছে 'বঙ্গবিভূষণ' উপাধি পাওয়া 'চট্টোপাধ্যায়' পরিবার ওন্দার বেলিয়াড়া গ্রামে বসতি স্থাপন করে। এই পরিবার ও চাঁদ রায়ের নৌবাহিনীর মাঝিরা মল্লভূমিতে প্রথমে 'বাঙ্গালমারা' গ্রামে বসতি স্থাপন করে। পরে দস্যু উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে এরা বেলিয়াড়া গ্রামে চলে যায়। এই ভাবে বিভিন্ন জাতির আগমনে মল্লভূমে সমৃদ্ধ এক মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম হয়।

মুর্শিদাবাদের মাণিকহারা গ্রামের বাসিন্দা শ্রীনিবাস আচার্য মল্লভূমের রাজগুরু পদে ব্রতী হন এবং রাজ প্রদত্ত বহু ভূসম্পত্তির মালিক হন। নিষ্কর এমন বিভিন্ন মৌজা যেমন নবগ্রাম, কাঁকিল্যা,মাকড়কোল, গোড়াশোল, নাকাইজুড়ি গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্যের পরিবারের সদস্যরা ছড়িয়ে আছে। শ্রীনিবাসের আগে মল্লভূমে বৈষ্ণব

ধর্মের প্রচার করেছিলেন পরমেশ্বর মল্লিক। নদীয়ার শান্তিপুরের পিলখাঁ গ্রামের পরমেশ্বর মল্লিক বিষ্ণুপুররাজ প্রদত্ত জমিতে (কাদাকুলি ও চাকদহ গ্রামে) বসতি স্থাপন করেন। প্রথম রঘুনাথ সিংহের মন্ত্রী অযোধ্যা মহাপাত্রের পূর্বজ সম্ভবত বীর হাম্বিরের আমলে মল্লভূমে এসে মন্ত্রী মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। প্রথম রঘুনাথের সময়ে রাজমহল থেকে কমলাকান্ত সার্বভৌম নামে এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মল্লভূমে এসে চতুষ্পাঠী শিক্ষার প্রসার ঘটান। ব্রাহ্মণ শ্রীনিবাসের শিষ্যমন্ডলীর বলিষ্ঠ বৃত্তে মল্লভূমে এক উন্নত ধর্মীয় সাহিত্য ও আয়ুর্বেদ চর্চার প্রসার ও প্রতিষ্ঠা ঘটে। শ্রীনিবাসের শিষ্য মুর্শিদাবাদের তিলিয়া বুধুরী গ্রামের রামচন্দ্র কবিরাজ ও হেমলতার শিষ্য কাটোয়ার উত্তরের মালহাটী গ্রাম নিবাসী যদুনন্দন দাসের মল্লভূমে আগমন ঘটলে দুটি বিখ্যাত বৈদ্য পরিবারের পত্তন ঘটে। যদুনন্দন বুধুইপাড়ায় হেমলতার সাথে থাকতেন। নরোত্তম দাসের ‘প্রেমবিলাস’ ও শ্রীনিবাস ও হেমলতার গুণকাহিনী নিয়ে যদুনন্দন দাসের ‘কর্ণানন্দ’ গ্রন্থ থেকে শ্রীনিবাসের শিষ্যমন্ডলী রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ কবিরাজ, কর্ণপুর কবিরাজ, নৃসিংহ কবিরাজ, গোপীরমণ কবিরাজ, গোকুলানন্দ কবিরাজ, গোবিন্দ চক্রবর্তী, শ্যামদাস চক্রবর্তী, ব্যাস চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী, গোকুলানন্দ চক্রবর্তী, রামজয় চক্রবর্তী, রাধাবল্লভ চক্রবর্তীর পরিচয় পাওয়া যায়। এতে কায়স্থদের পাশাপাশি ব্রাহ্মণদের ভূসম্পদ লাভে রাজানুগ্রহের আধিক্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই অভিজাত রাজানুগ্রাহী শ্রেণী ছাড়াও ছিল পরিশ্রম নির্ভর ধনোৎপাদক স্তর। এর নিচের স্তর তৈরি হয় শিল্পী-কারিগর-ব্যবসায়ী-বণিক (নবশাখ) শ্রেণীকে নিয়ে। এরা ধর্মীয়-রাজনৈতিক-সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে রাজধানীতে ও মল্লভূমে উপস্থিত হয় তন্তুবায়, কুম্ভকার, সূত্রধর, মালাকার, কর্মকার, শাখারী, সুবর্ণ বণিক, মোদক, তাম্বুলী, গন্ধবণিক, শোলাকার। এমনকি নাপিত, মুচি, তিলি, ধোপা, গোপ, গণিকা ও অন্ত্যজ উপবর্ণের মানুষজন। বস্তুত সমাজ ব্যবস্থায় প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক কারণে প্রচুর জমিজমার মালিক শ্রেণী (অন্যের শ্রম ও ধনোৎপাদনের উপর নির্ভরশীল) ‘ভদ্রলোক’ এবং মাহিষ্য-সদগোপ-তিলির মত ক্ষুদ্র কৃষক ও বিভিন্ন বৃত্তির শ্রমজীবি মানুষেরা ‘ছোটলোক’ বলে পরিচিত হত। বড় জোত মালিকরা নিজস্ব হাল-বলদ ও গতানো মুনিষ মহিন্দরের সাহায্যে কৃষিকাজ পরিচালনা করত। তিলি-গোপ-সদগোপ-মাহিষ্য-আগুরি-খয়রাদের মতো কম জমির মালিক নিজেরাই জমি চাষ করত ও প্রয়োজন হলে বাৎসরিক চুক্তির ভিত্তিতে ক্ষেত মজুর নিয়োগ

করত। প্রতি বাংলা সনের পৌষ সংক্রান্তি ও শ্রীপঞ্চমীর অন্তর্বর্তী সময়ে নিয়োগ কর্তা ও চাষীদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে তাদের মাসিক বেতন ও অন্যান্য প্রাপ্য স্থির করা হত। মুনিষ-মাহিন্দাররা এসময় নতুন মালিকের সাথেও চুক্তিবদ্ধ হতে পারতেন। বাউরি-বাগতি-লোহার-মোদি-খয়রা-সাঁওতাল প্রভৃতি নিম্নবর্গীয়রা মুনিষ, দিনমজুর হিসাবে কাজ করতেন। বার্ষিক বেতন ছিল ৩০-৩৬ টাকা। অথবা বীজ, বলদ, শ্রম দিয়ে মালিকের জমি চাষ করলে পেত ফসলের অর্ধাংশ।

বনান্তরালে বেড়েওঠা ও গড়েওঠা সমাজ ও অর্থনীতির ধাঁচা অনেকটা একই থেকে যায় সুদীর্ঘকাল জুড়ে। আঞ্চলিক গবেষক রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর এনিয়ে অভিমত ছিল, দীর্ঘ দেড় হাজার বছর ধরে কৃষি ও কুটির শিল্পে গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থা প্রায় একই ছিল। গরু-মহিষ-হাল, গোযান, আখমাড়াই যন্ত্র, কলুর ঘানি, তকলী-তাঁত, হাপড়-নেয়াই, হাতুড়ি-বাটালি-করাত ইত্যাদি অবলম্বন করেই কয়েক শতাব্দীর কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থা আবর্তিত হয়। ব্রিটিশ নথি থেকে গ্রাম সমাজের পঞ্চায়েত ও মন্ডলী প্রথার অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে। তবে সুপ্রাচীন এই ব্যবস্থা ব্রিটিশ নীতি ও নয়া শাসন ব্যবস্থার যাঁতাকলে লোপ পায় ১৮৭২ সালের মধ্যে। তবে গ্রাম সমাজের মাথারা মিলিত হয়ে বিবাদ নিরসনে সিদ্ধান্ত ও জরুরি প্রয়োজনে কার্যসমিতি গঠন ও পরিচালনার চল ছিল দীর্ঘদিন ধরে। ও'ম্যালী বাউরি ও বাগদী সমাজে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অস্তিত্বের কথা জানিয়েছেন।

ব্রিটিশ রাজের রাশ শক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত শক্তিশালী মন্ডলী প্রথার প্রভাব ও প্রতিপত্তির কথা জানা যায়। এটি হত বর্ণ-সম্প্রদায় ভিত্তিক বা গ্রাম/মহল্লা ভিত্তিক। গ্রামবাসীদের দ্বারা জমির মালিক, জ্ঞানী ও পরিচালনার কাজে সক্ষম ব্যক্তিকেই মন্ডল হিসাবে নির্বাচিত করা হত, জমিদারের অনুমোদন সাপেক্ষে। আসদাচরণ ছাড়া এরা অপসারিত হত না। ফলে ক্রমে পদটি বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। এর মূল কাজ ছিল রায়ত ও জমিদারের সম্পর্কের বিষয়টি ঠিক রাখা, সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া, গ্রামের সাধারণ পুলিশি বা অপরাধ প্রবণতা রোধ, গ্রাম্য বিবাদ নিরসন। এই পদ ছিল অবৈতনিক। কর্তব্য পালনের বিনিময়ে কেবল মন্ডলের জমির রাজস্ব কিছু কম রাখা হত ও মন্ডলী জমি নিয়মিত রাজস্ব বৃদ্ধি থেকে অব্যাহতি পেত। গ্রামের বিবাহ, শ্রাদ্ধ, মুখে ভাতের মত সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে তিনি সম্মানের আসনে আমন্ত্রিত হতেন। কাপড়-গামছা-প্রণামী দিয়ে বরণ করা হত। তবে ব্রিটিশ শাসনে জমিদারদের সার্বিক গুরুত্ব বৃদ্ধি, থানার ক্ষমতায়ন, গ্রামে গোমস্তা

সহ বিভিন্ন জমিদারী কর্মীর হস্তক্ষেপ, অপরাধের ক্ষেত্রে আদালতের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা মন্ডলদের গরিমা ও প্রতিপত্তি বিনষ্ট করে। এদের কাজ সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়ায় শাসককে খবর সরবরাহ ও রাজকর্মচারী গ্রামে আগমনকালে যত্নআত্তি করা।

দলদলি মৌজার একটি জমি সংক্রান্ত ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দের নথিতে মল্লভূমে দশশালা বন্দোবস্তের পূর্ববর্তী সময়ের কৃষির অবস্থা, জমির প্রকার ভেদ ও দাম সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। দেখা যায় রাজার কাছে ১২ টাকা জমায় রায়ত কানু রায় সংশ্লিষ্ট জমিটির বংশানুক্রমিক ভোগ দখলের শর্তে পাট্টা পেয়েছিলেন ১৭৫৬ সালে। এর একাংশ এবার রাজাদেশে রামকৃষ্ণ গোস্বামীকে নিষ্কর স্বত্বে ছেড়ে দিতে হয় এই মর্মে, "সন ১০৬২ সালে ১২ ফাল্গুনে লিখিত কানু রায় খয়রার নামীয় সনদ মৌজে দলদলিতে রামকৃষ্ণ গোস্বামীর নিষ্কর জমি ছাড়িয়া দিবার বিষয়ে রাজা চৈতন্য সিং-এর মৌহরী প্রকাশ্যে।" এই নথিটি বিশ্লেষণে দেখা যায়, মৌজায় ১৫ টি প্রকার ভেদের জমি ও বিঘা প্রতি জমির দর আছে, যেমন ১) সানিজোন আওন (২ টা ১১ আনা ১১ গন্ডা ১ কড়া) ২) সানিজোন দোয়েম (২ টাকা ২ আনা ৮ গন্ডা ১ কড়া) ৩) সোম (১-৬-৫-০) ৪) সানিডাঙ্গা আগুন (১-১-৭-৩) ৫) সানিডাঙ্গা দোয়েম (০-১২-১৬-০) ৬) সানিডাঙ্গা সোম (০-৮-৮-১) ৭) জুনাইফু আগুন (৪-৫-২-১) ৮) জুনাইফু দোয়েম (৩-১১-১৮-১) ৯) নিজসুনা আগুন (৩-১১-১৮-১) ১০) বাস্তু (৯-১২-১৫-২) ১১) উদ্বাস্তু (২-৪-৪-২) ১২) পুষ্করিণী (০-৪-০-০) ১৩) তিন্যাডাঙ্গা (০-১২-০-০) ১৪) আউসডাঙ্গা (১-০-০-০) ১৫) জঙ্গল (০-৪-০-০)। এই পাট্টা ছিল খয়রা উপবর্ণেরে রায়তের। আবার সেখান থেকে কিছু অংশ পরে গোস্বামী বংশের একজনকে নিষ্কর হিসাবে দেওয়া হয়েছে। এর থেকে সমকালীন সামাজিক সমীকরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পাট্টাদারদের জঙ্গল হাসিল করে জমিতে রূপান্তরে উৎসাহ দেওয়া হত। জমি মাপে বিঘা কাঠা ছটাক ব্যবহার করা হত। জমির দর নির্ধারণে টাকা আনা গন্ডা ও কড়া ব্যবহার করা হত। জমির দাম সময়ের সাথে বাড়ত। জমির মান বোঝাতে ফার্সী শব্দ আওন, দোয়েম, সোম শব্দের অর্থ উত্তম, মধ্যম, নিকৃষ্ট। জলের অভাবে (অনাবৃষ্টি, খরা জনিত) চাষ না হওয়া সত্ত্বেও মালগুজারি গুনাগার বা ক্ষতি স্বীকার করে রায়তকে পূর্ণ খাজনা পরিশোধ করতে হত।

দেবোত্তর ও পীরোত্তর ভূমিদানে মল্লরাজারা ছিলেন দরাজহস্ত। মল্লভূমে ব্রাহ্মণরা নিষ্কর বা প্রায় নিষ্কর ভূমিদান পায়নি এমন ঘটনা বিরল। নব্বুই শতাংশের বেশি

ব্রাহ্মণ দেবোত্তর বা ব্রহ্মোত্তর ভূমির অধিকারী ছিলেন। হজরত কুমরাণ শাহ ৩১৫ বিঘা পীরোত্তর ভূমিদান পেয়েছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে ১০ জ্যেষ্ঠ এক দলিলে কসিমা বিবি বিষ্ণুপুরের শিরোমণিপুর মৌজায় বহু দিনের রাজপ্রদত্ত লাখেরাজ জমির অধিকার দাবি করছেন। ১৮০১ সালে ব্লান্টের হিসাবে মল্লভূমের পুনঃগ্রহণযোগ্য লাখেরাজ জমির রাজস্ব ছিল ৪০০০০ টাকা। এর উপর ছিল ঘাটোয়ালদের প্রদত্ত ঘাটোয়ালী জমি। পথঘাট পাহারা, সন্নিহিত অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অচেনাদের গতিবিধির খবরাখবর নেওয়া, পথচারীদের নিরাপদে আগিয়ে দেওয়া, পথচারীর হারিয়ে যাওয়া জিনিস উদ্ধার ও মালিকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ছিল এই ঘাটোয়ালরা। পাঁচজন ঘাটোয়ালের উপর থাকত একজন সাদিয়াল ও সাদিয়ালের উপর থাকত দিকপতি বা দিগর। মল্লরাজ্যে এমন দুই হাজার দুই শত ঘাটোয়ালের মধ্যে গঙ্গাজলঘাটি থানার বাইশ গ্রাম তরফে ২২ জন, ছান্দার তরফে ২৭ জন, চুয়ামসিনা তরফে ৫০ জন ঘাটোয়ালের কথা জানা যায়। কান্তোড়, বাকাদহ, চুয়ামসিনা, খাটুল, জয়বেলিয়া ও বাইশগ্রামের মত ছয়টি ঘাটের বিভাগীয় বিভাজন নিয়ে বারহাজারী মহালের অস্তিত্ব ছিল। ১৮০২ সালে এই ঘাটোয়ালদের অধিকৃত জমি ছিল ৩৪৯৩৪ বিঘা। আদিতে তেইশটি ঘাট নিয়ে গঠিত 'বাইশগ্রাম', ঘাটোয়ালী অধিকারে ছিল না। এটি ছিল তোপখানা ও গোলন্দাজ বাহিনীর সেবা জমি। রাজদরবারে সামরিক ও উৎসবের প্রয়োজনে কামান-বন্দুক-সেনা নিয়ে এরা ডাক পেলেই হাজির হতেন। ক্রমে এরা ঘাটোয়াল শ্রেণীতে পরিণত হয়। সনদ অনুসারে নামমাত্র পঞ্চকীতে ৬০০০ বিঘা জমি এদের বরাদ্দ ছিল। ১৮৬২ সালের সরকারী হিসাবে এর চেয়ে দখলীয় জমি বেশি পাওয়া যায়। এই মহাল পরে সোনামুখীর কুঠিয়াল এরস্কিন বার্ষিক ১৫০ পাউন্ড পঞ্চকীর বিনিময়ে কিনে বাইশগ্রামে কুঠি স্থাপন করে এর দখল নিতে চাইছিলেন, কিন্তু স্থানীয় বাধায় তা হয়ে ওঠেনি।

ঘাটোয়াল পিছু ১৫ বিঘা জমি বরাদ্দের নীতি মল্লরাজের অনুসরণ করতেন। সে হিসাবে ২২০০ ঘাটোয়ালের ৩৩০০০ বিঘা ঘাটোয়ালী জমি হওয়ার কথা। ১৮০২ সালে ব্রিটিশ আধিকারিক ব্লান্টের হিসাব মত পঞ্চকী জুম্মার ঘাটের সংখ্যা ছিল ৪৩ ও সেখানে ঘাটোয়ালের সংখ্যা ২২৯৯, দখলীয় জমি ৩৫২৮২ বিঘা, আদায়যোগ্য পঞ্চক ৪৬৯০টাকা ১২ আনা ৭ পাই। বেপঞ্চকী ঘাটের সংখ্যা এগার। ১৭৯১ সালের হিসাবে ঘাটোয়ালী পঞ্চকী জুম্মা থেকে আদায়যোগ্য রাজস্ব ছিল বার হাজার সিক্কা টাকা। এই গরমিলের কারণ রাজ প্রদত্ত জমির চেয়ে বেশি জমি ঘাটোয়ালরা হাসিল

করে চাষ যোগ্য করে তুলত। অনেক সময় সাঁওতালদের মালগুজারি জমিও এরা হাতিয়ে নিত। জনসংখ্যার চাপ কম ও জঙ্গলের পরিমাণ বেশি থাকায় এধরণের জমি হাসিলে রাজার তরফে কোন বাধাও দেখা যেত না। ১৮৪০ সালের হিসাবে ঘাটোয়ালরা রাজদত্ত জমির তিন গুণ ভোগদখল করতেন। এই ঘাটোয়ালী অধিকার বংশানুক্রমিক ছিল না। রাজা বার্ধক্য, পদচ্যুতি, পদত্যাগ ইত্যাদি কারণে ঘাটোয়ালী শূন্যপদে নতুন নিয়োগ করতেন। যদিও ঘাটোয়ালের পরিবারকেই সাধারণত বংশানুক্রমে এই দায়িত্বে রাখতেন। ১৮৪৭ সালে ভক্ত্যাবাঁধের সাদিয়াল ওমরাও সিংহকে পদচ্যুত করে ১৮৫৬ সালে মাণিক সিংহকে ওই পদে নিযুক্ত করা হয়। যদিও তাদের মধ্যে আত্মীয়তা ছিল না। মাণিক সিংহের মৃত্যুর পর অবশ্য পুত্র শ্যাম সিংহ ঘাটোয়াল নিযুক্ত হয়েছিলেন। মল্লরাজ্যে সেবার বিনিময়ে বেতন না দিয়ে সেবা-জমি প্রদানের ব্যাপক চল ছিল। চৌকিদার (নৈশ প্রহরী) ও সীমান্দার (শস্য পাহারাদার) নামের নিরাপত্তা কর্মীরা এমন জমি ভোগ করতেন। এদের সংখ্যা বেশি ছিল ইন্দাস ও কোতলপুরে। সেনাবাহিনীর জন্য জমি ছিল সেনাপত মহাল, রাজধানী নগর প্রহরীদের বেরা মহাল, কোষাধ্যক্ষদের বক্সী মহাল, দেওয়ানদের জন্য ক্রোট মহাল, গোলন্দাজ বাহিনীদের জন্য তোপখানা মহাল, বাদ্যকার-গায়কদের ডোম মহাল, পাল্কীবাহকদের কাহারণ মহাল, দুর্গের কুলি-মজুরদের খাজাতি মহাল, রাজধানীর বিপণনের জন্যে হাসিতা মহাল, ধর্মীয় ও দাতব্য কারণে বেগুলব মহাল।

তবে এভাবে ভূমিদান শক্তিশালী রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে অন্তরায় হয়ে দাড়ায়, যা ঔপনিবেশিক শাসনে কর অনাদয়ের ঘটনা ও তার থেকে জমিদারির পতন তরান্বিত করে। আমদানি-রপ্তানী শুল্কের ক্ষেত্রে যেমন নির্ধারণ জিনিসপত্রের মূল্যের উপর নির্দিষ্ট হারে না করে অবৈজ্ঞানিক ভাবে পণ্য বহনকারী বলদের সংখ্যার উপর (সর্বোচ্চ ছয় কাহন কড়ি অর্থাৎ দেড় টাকার নিচে) নির্ভর করা হত। ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে জমি পরিমাপ করে উৎপাদনশীলতা বিচার করে কর আরোপ অপেক্ষা ভূমিদান ও খামখেয়ালী করারোপ অনেক বেশি প্রচলিত রীতি ছিল।

## সোনামুখীর অন্তবায় সমাজ ও মনোহর উবাচ

মনোহর দাস ( ? — ১৬৩৮) ছিলেন একজন বৈষ্ণব আওলিয়া ও নিত্যানন্দ শাখাভূক্ত জাহ্নবীদেবীর শিষ্য। তিনি ছিলেন একজন পন্ডিত মানুষ, যাঁর কর্ম ও ধর্মভূমি ছিল মল্লভূম। তিনি প্রথমে বিষ্ণুপুরের রাজার গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন। ‘পদসমুদ্র’ ও

'নির্যাসতত্ত্বের' সংগ্রহকর্তা এবং 'দিনমণি চন্দোদয়' গ্রন্থপ্রণেতা। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে ঘুরতেন বলে 'আউলিয়া মনোহর' নামে পরিচিত ছিলেন। বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের সঙ্গে তিনি কাঁদড়া গ্রামে থাকতেন এবং তাঁর সঙ্গে খেতুরির মহোৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি গরাণহাটি ঢঙে প্রাচীন রাঢ়ীয় সঙ্গীতরীতি সহযোগে মনোহর শাহী রীতির প্রবর্তন করেন। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার বদনগঞ্জ গ্রামে তাঁর সমাধিক্ষেত্রে মকরসংক্রান্তি তিথিতে মেলা বসে। মতান্তরে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী গ্রামে এবং বিষ্ণুপুরের কাছে গোকুলনগরেও তাঁর সমাধিস্থল আছে বলে স্থানীয়রা বিশ্বাস করতেন।

কিন্তু সোনামুখীর সাথে মনোহর দাসের সম্পর্ক ছিল আত্মিক। এলাকার মানুষ বিশেষত তন্তুবায় সমাজের কাছে মনোহর দাসের স্থান ছিল দেবতা ও গুরুর। এখানে রামনবমী থেকে তিন দিনের মহোৎসব পালিত হয় মনোহর দাসের নামে। একটি প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী মনোহর দাস আদতে সোনামুখীর বাসিন্দা ছিলেন না। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচলে যাত্রার সময়কালে জনৈক মনোহর দাস দামোদর নদ পেরিয়ে বাঁকুড়ার সোনামুখীতে এসে পৌঁছোন। এখন যে এলাকা মনোহরতলা, সেখানেই তিনি তালপাতার ছাউনির নীচে থাকতেন। প্রায় দশ বছর সোনামুখীতে তিনি বসবাস করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন তিনি। সোনামুখীর শ্যামের মন্দিরে তিনি আশ্রয় নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা শুরু করেন। পরে এই স্থানেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন বলে শোনা যায়। স্থানীয় তন্তুবায় সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয় মানুষ ছিলেন বলে জানা যায়। তাদের সুখ-দুঃখে সমান অংশীদার ছিলেন তিনি। প্রচলিত কথা অনুযায়ী কোনো এক সময় তন্তুবায় সম্প্রদায়ের মানুষের জীবিকা অর্জনের বিপন্নতা থেকে তাঁত ও রেশমকে রক্ষা করেছিলেন এই শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্যদেবের ভক্ত আলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মনোহর দাস। চৈতন্য পরিকর নিত্যানন্দ স্বামী ও তৎপুত্র বলভদ্রর ঘরানার যোগী মনোহর দাস। রামনবমীর দিন তিনি সমাধিস্থ হন। সেই সময়কাল থেকে সোনামুখীতে মনোহর দাসের স্মরণে তিন দিনের মহোৎসব হয়ে আসছে। গুরুর সেই সময়কাল থেকেই তন্তুবায় সম্প্রদায়ের মানুষ এই মহোৎসবের আয়োজন করে আসছেন।

মনোহর দাসের তিন দিনব্যাপী মহোৎসব বা স্থানীয় ভাষায় 'মোচ্ছব'-এ সর্ব ধর্ম, সর্ব সম্প্রদায়ের সমাগম ঘটে। বাঁকুড়ার গণ্ডি ছাড়িয়ে রাজ্যের হাজারো বাউল শিল্পীর আগমন ঘটে এই তিন দিনের মহোৎসবে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য সাধুসঙ্গ। ১৬টি আখড়ায় বাউল গানের পাশাপাশি মূল আকর্ষণ হল 'ভাত কাড়াকাড়ি' অনুষ্ঠান।

বেশ কয়েকটি নতুন মাটির হাঁড়ি পাশাপাশি রেখে অন্নভোগ রান্না হয়। সেই অন্নভোগ সংগ্রহের জন্য অসংখ্য ভক্ত ভিড় জমান। ভক্তরা বিশ্বাস করেন, মনোহর দাসের এই মোচ্ছবের 'ভাত' সংগ্রহ করে রেখে কোনো বিশেষ দিন বা বিশেষ কাজের আগে ভক্তি ভরে সেই ভাত মহাপ্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করলে সমস্ত কাজে সিদ্ধিলাভ হয় ও রোগমুক্তি ঘটে।

## মল্লভূমে ধর্মীয়-সামাজিক পরিবর্তন ও গোস্বামীতন্ত্রের জন্ম

শ্রীনিবাসের মল্লভূমে বৈষ্ণবীয় ভাবধারা প্রবর্তনের অনেক আগেই খড়দহ কেন্দ্রিক নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর অনুগামীরা রাধা-কৃষ্ণ অনুরাগ মল্লভূমে প্রচার করেছেন। এদের মধ্যে মুখ্য ছিলেন মনোহর দাস ও অভিরাম গোস্বামী। এদের নেতৃত্বে ছিলেন নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেবী। সমগ্র বৈষ্ণব সমাজকে শৃঙ্খলায় বাঁধতে বঙ্গ প্রদেশকে কয়েকটি ভাবক মহলে বিভাজিত করা হয়। যার মাথায় থাকত একজন গোস্বামী বা গোঁসাই। গোঁসাইকে সাহায্য করত অধিকারী। এর অধীনে ফৌজদার ও সর্বশেষে ছড়িদার। টহলদার বলে একটি পদ ছিল যেটি মূলত বৈষ্ণব মুখ্যারাই পালন করত। বৈষ্ণব সমাজের বিবাহ, দীক্ষা, মৃত্যু, পার্বণে ধর্মীয় আচার এরাই পরিচালনা করতেন এবং সাম্মানিক দক্ষিণা পেতেন। প্রতিটি ক্রিয়াকাজে গোস্বামীর ধার্য দক্ষিণা ছিল ১টাকা ৬ আনা, যার মধ্যে ফৌজদারের ভাগ ৪ আনা ও ছড়িদারের ২ আনা। দুশ বছর আগে বাঁকুড়া-মল্লভূমে এমন গোস্বামীদের নাম হল মোহিত মোহন গোস্বামী, নিত্যানন্দ মোহন গোস্বামী, হীরেন্দ্র মোহন গোস্বামী, অটল চন্দ্র গোস্বামী, রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী (জামকুড়ি), গৌরাঙ্গ গোস্বামী, ললিত মোহন গোস্বামী, মুরারী মোহন গোস্বামী, আদিনাথ গোস্বামী। এদের সাহায্যে থাকা 'অধিকারী' ছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও গোপাল অধিকারী (ভড়া)। ফৌজদার ছিলেন গোপাল দাস (বীরসিংহ), তারাচাঁদ দাস (বিদ্যানন্দপুর), বলাই দাস (মজুরডাঙ্গা), নরহরিদাস (বীরসিংহ)। টহলদার ছিলেন রামকান্ত দাস, ব্রজকিশোর দাস, জপকিশোর দাস, রাধাই দাস (বীরসিংহ)। এরা গ্রামের মুখ্যা হিসাবে কাজ করতেন।

## বিষ্ণুপুরের প্রাচীন মন্দিরসমূহের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মন্দির শহর বিষ্ণুপুর ও তার সন্নিহিত জনপদগুলিতে মূলত রাজানুকূল্যে মন্দিরগুলো গড়ে উঠতে থাকে ষোড়শ-সপ্তদশ শতক থেকে। এই গড়ে ওঠার ইতিহাস নিচে

আলোচনা করা হল।

**১) ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের রাসমঞ্চ :** মল্লরাজা বীর হাম্বির আনুমানিক ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে এই মঞ্চটি নির্মাণ করেন। বৈষ্ণব রাস উৎসবের সময় বিষ্ণুপুর শহরের যাবতীয় রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ এখানে জনসাধারণের দর্শনের জন্য আনা হত। ১৬০০ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত এখানে রাস উৎসব আয়োজিত হয়েছে। রাসমঞ্চের চূড়া পিরামিডাকৃতির। চূড়ার মূলে চারটি করে দোচালা ও প্রতি কোণে একটি করে চারচালা রয়েছে। মঞ্চের বেদিটি মাকড়া বা ল্যাটেরাইট পাথরে নির্মিত। বেদিটির উচ্চতা ১.৬ মিটার ও দৈর্ঘ্য ২৪.৫ মিটার। মঞ্চটির মোট উচ্চতা ১২.৫ মিটার। উপরের অংশ ইষ্টকনির্মিত। চূড়ার কাছে একটি স্বল্প পরিসর ছাদে গিয়ে উপরের অংশটি মিলিত হয়েছে। গর্ভগৃহটি দেওয়াল-দ্বারা আবৃত নয়। বরং রাসমঞ্চের গর্ভগৃহটিকে ঘিরে রয়েছে তিন প্রস্থ খিলানযুক্ত দেওয়াল। বাইরের সারিতে খিলানের সংখ্যা ৪০। এই খিলানগুলির গায়ে পোড়ামাটির পদ্ম ও পূর্ব দেওয়ালে বিষ্ণুপুরের গায়ক-বাদকদের স্মৃতি-অলংকৃত কয়েকটি টেরাকোটার প্যানেল রয়েছে। রাসমঞ্চটি বিষ্ণুপুরের প্রচলিত স্থাপত্যরীতি অনুসরণে নির্মিত হয়নি বরং তার স্থাপত্য অনেকটাই ব্যতিক্রমী।

**২) ১৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দের কৃষ্ণরায় মন্দির :** মল্লরাজা প্রথম রঘুনাথ সিংহ দ্বারা নির্মিত এই মন্দিরটি পরস্পর সংযুক্ত দুটি দোচালা কুটিরের সমন্বয়ে গঠিত। সংযুক্ত অংশের মধ্যস্থলে একটি চারচালা শিখর বিদ্যমান। তাই একে জোড় বাংলা বলা হয়। মন্দিরের দৈর্ঘ্য ১১.৮ মিটার, প্রস্থ ১১.৭ মিটার ও উচ্চতা ১০.৭ মিটার। মন্দিরের দেওয়ালে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী, সামাজিক জীবনযাত্রা ও শিকারের দৃশ্য টেরাকোটা অলংকরণের মাধ্যমে চিত্রিত।

**৩) ১৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দের শ্যামরায় :** মল্লরাজা প্রথম রঘুনাথ সিংহ টেরাকোটা কাজে সমৃদ্ধ দক্ষিণমুখী এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এই মন্দিরের দক্ষিণদিকের দেওয়ালে নিবদ্ধ প্রাচীন উৎসর্গ লিপি থেকে এই তথ্য জানতে পারা যায়। শ্যামরায় মন্দির বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ টেরাকোটা শৈলীতে নির্মিত একটি মন্দির। মন্দিরটি চৌকো, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ১১.৪ মিটার। মন্দিরের চারদিকের খিলানগুলি সুন্দর কারুকার্যময় স্তম্ভের ওপর নির্ভর করে নির্মিত হয়ে ফাঁকা দালানের মতো অংশের সৃষ্টি করেছে। এই দালানের ভেতরে মন্দিরের গর্ভগৃহটি অবস্থিত। গর্ভগৃহের দরজা টেরাকোটা শৈলীতে ফুল ও বিভিন্ন প্রকার নকশা দ্বারা সাজানো। মন্দিরের ছাদ চৌকো ও উত্তলাকার। ছাদের চার প্রান্তে চারটি শিখর বা শীর্ষ বর্তমান। উড়িষ্যার স্থাপত্যরীতিতে

নির্মিত এই শিখরগুলি প্রত্যেকটি প্রতিসম। ছাদের ঠিক মাঝে একটি অষ্টভূজাকৃতি শিখর বা গম্বুজ বর্তমান। এই অংশে মন্দিরের উচ্চতা ১০.৭ মিটার। মন্দিরের বাইরের ও ভেতরের দেওয়ালে রাসলীলা, রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী এবং বিভিন্ন কারুকার্যের দৃশ্য আছে।

**৪) ১৬৯৪ খ্রিষ্টাব্দে মদনমোহন মন্দির :** মল্লরাজা দুর্জন সিংহ এই একরত্ন ইষ্টক নির্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরটির ছাদ চৌকো ও বাঁকানো, কিনারা বাঁকযুক্ত ও মধ্যে গম্বুজাকৃতি শীর্ষ বর্তমান। মন্দিরের দেওয়ালে কৃষ্ণলীলা, দশাবতার ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনীর বিভিন্ন দৃশ্য ভাস্কর্যের মাধ্যমে রূপায়িত। মন্দিরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ১২.২ মিটার এবং উচ্চতা ১০.৭ মিটার।

**৫) ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দের রাধালাল জীউয়ের মন্দির :** মল্লরাজা বীর সিংহ দ্বারা নির্মিত এই মন্দিরটি চৌকো বেদীর ওপর অবস্থিত। এই মন্দিরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ১২.৩ মিটার এবং উচ্চতা ১০.৭ মিটার।

**৬) ১৭৫৮ খ্রিষ্টাব্দের রাধাশ্যাম মন্দির :** মল্লরাজা চৈতন্য সিংহ মাকড়া পাথরের এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ১২.৫ মিটার এবং উচ্চতা ১০.৭ মিটার। মন্দিরের শিখরটি গম্বুজাকৃতির। মন্দিরের দেওয়ালে পুরাণরামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীর স্থাপত্য লক্ষণীয়। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে ইটের নহবতখানা আছে। পূর্বদিকে উড়িষ্যার স্থাপত্যরীতি অনুসারে নির্মিত তুলসীমঞ্চ ও নাটমঞ্চ বর্তমান।

**৭) সপ্তদশ শতাব্দীর নন্দলাল মন্দির :** চৌকো বেদীর ওপরে নির্মিত একচালা মন্দিরটির বাঁকানো ছাদ এক শিখর বিশিষ্ট।

**৮) ১৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দের কালাচাঁদ মন্দির :** মল্লরাজা রঘুনাথ সিংহ মাকড়া পাথরের এই একচালা মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের সামনের দিকে পঙ্খের অলঙ্করণে কৃষ্ণলীলা ও পুরাণের কাহিনী দেখা যায়।

**৯) ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দের মদনগোপাল জীউয়ের মন্দির :** মল্লরাজা বীর সিংহের পত্নী রানী শিরোমণি দেবী মাকড়া পাথরের পাঁচচালা মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন।

**১০) ১৭২৯ খ্রিষ্টাব্দের রাধাগোবিন্দ মন্দির :** মল্লরাজা কৃষ্ণ সিংহ ঝামা পাথরের একচালা মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন।

**১১) ১৭৩৭ খ্রিষ্টাব্দে রাধামাধব মন্দির :** মল্লরাজা গোপাল সিংহের পুত্রবধূ চূড়ামণিদেবী মাকড়া পাথরের এই একচালা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

**১২) ১৭২৬ খ্রিষ্টাব্দের জোড় মন্দির :** মল্লরাজা গোপাল সিংহ মাকড়া পাথরের এই মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠা করেন। দুটি বড় ও একটি ছোট মন্দির নিয়ে এটি জোড় মন্দির শ্রেণী নামে পরিচিত।

**১৩) ৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের মৃন্ময়ী মন্দির :** মল্লরাজা জগৎমল্ল এই মন্দির তৈরী করেন। এই মন্দিরের পিছনে মল্লরাজাদের রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। এই মন্দিরে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে প্রাচীন দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

**১৪) অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগোল কিশোরের মন্দির (কৃষ্ণবলরাম) :** গৌড়ীয় স্থাপত্যে পাশাপাশি অবস্থিত এই মন্দির দুটি নির্মিত হয়েছে।

**১৫) অষ্টাদশ শতাব্দীর মহাপ্রভু মন্দির :** উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মন্দিরটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। প্রতিষ্ঠালিপি পাওয়া না যাওয়াতে, এই মন্দির সম্পর্কে বিস্তৃত কিছু জানা যায় না।

**১৬) ১৬২২ খ্রিষ্টাব্দের মল্লেশ্বর মন্দির :** মল্লরাজা বীর সিংহ মাকড়া পাথরের এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন।

**১৭) সপ্তদশ শতকের বড় পাথর দরজা :** মাকড়া পাথরের তৈরি খিলান সজ্জিত এই প্রবেশপথটি মল্লরাজা বীর সিংহ তৈরি করেন। এটি বিষ্ণুপুরের প্রাচীন দুর্গের উত্তরদিকের প্রবেশ পথ। তোরণের মধ্যে প্রবেশ পথের দুই দিকে সৈন্য সমাহারের উপযোগী দুই তল বিশিষ্ট দালান বর্তমান।

**১৮) সপ্তদশ শতকের ছোট পাথর দরজা :** মাকড়া পাথরের তৈরী এই প্রবেশপথটি মল্লরাজা বীর সিংহ তৈরি করেন।

**১৯) সপ্তদশ শতকের পাথরের রথ :** দ্বিতল রথটি মাকড়া পাথরের তৈরি। এর নিচের অংশ রাসমঞ্চের অনুরূপ এবং উপরের দিকটি বিষ্ণুপুরের অন্যান্য মন্দিরের মতো তৈরি করা হয়েছে।

**২০) সপ্তদশ শতকের গুমঘর :** মল্লরাজা বীর সিংহ গুমঘরের প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্থাপত্যটি কি কাজে ব্যবহৃত হত, সে বিষয়ে বহুমত রয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে, এটি ছিল রাজবাড়ীর জলাধার।

**২১) লালবাঈ মহল :** মল্লরাজা রঘুনাথ সিংহ নর্তকী লালবাঈয়ের রূপে অনুরক্ত হয়ে রাজ-অন্তঃপুরের বাইরে লালবাঈয়ের বসবাসের জন্য এই ভবন নির্মাণ করে দেন। বর্তমানে এটি উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে।

**২২) হাওয়া মহল :** সম্ভবত সপ্তদশ শতকে মৃন্ময়ী মন্দিরের সংলগ্ন সরোবরের বিপরীতে আমোদ প্রমোদের জন্য বা রানীদের জন্য হাওয়া মহল গড়ে তোলে হয়।

এর চারকোণে ছিল সুউচ্চ মিনার। এটি একটি দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংশের পথে।

## হাম্বির পূর্ব রাজবংশের জনশ্রুতি

রাজবাড়িতে রক্ষিত বংশ তালিকা, যেটির বড় অংশ ইতিহাসে বর্ণিত রাজাদের তালিকার (রাজা হাম্বির থেকে) আগের রাজাদের। এদের অস্তিত্ব জনশ্রুতিতে। কোন ঐতিহাসিক নথি বা স্থাপত্যে এদের নাম মেলে না। তালিকাটি নিম্নরূপ,

১) আদিমল্ল (৬৯৪ - ৭১০) : লাউগ্রামে মল্ল বংশের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সাথে আদি মল্লের নাম জড়িয়ে আছে।

(২) জয়মল্ল (৭১০ - ৭২০) : জয় মল্ল তার সাহসিকতা এবং সামরিক দক্ষতার জন্যও বিখ্যাত ছিলেন, যা তার বাবার অনুরূপ ছিল।

(৩) বেণু মল্ল (৭২০ - ৭৩৩)

(৪) কিনুমল্ল (৭৩৩ - ৭৪২) : ৭৩৩ সালে কিনু মল্ল ইন্দ্রহংসের (বর্তমানে ইন্দাস নামে পরিচিত) রাজাকে পরাজিত করেন এবং মল্লরাজ্য প্রসারিত করেন।

(৫) ইন্দ্রমল্ল (৭৪২ - ৭৫৭)

(৬) কানু মল্ল (৭৫৭ - ৭৬৪)

(৭) ঝাউ মল্ল (৭৬৪ - ৭৭৫)

(৮) শূর মল্ল (৭৭৫ - ৭৯৫) : শূর মল্ল মেদিনীপুরের বাগড়ি এলাকা জয় করেন এবং এটিকে মল্লভূমের অন্তর্ভুক্ত করেন।

(৯) কনক মল্ল (৭৯৫ - ৮০৭)

(১০) কন্দর্প মল্ল (৮০৭ - ৮২৮)

(১১) সনাতন মল্ল (৮২৮ - ৮৪১)

(১২) খড়্গা মল্ল (৮৪১ - ৮৬২) : খড়্গা মল্লর সেনাবাহিনী মেদিনীপুর জয় করার পর তার নামে খড়্গাপুর শহরের নামকরণ করা হয়েছিল।

(১৩) দুর্জন মল্ল (৮৬২ - ৯০৬)

(১৪) যাদব মল্ল (৯০৬-৯১৯)

(১৫) জগন্নাথ মল্ল (৯১৯ - ৯৩১)

(১৬) বিরাট মল্ল (৯৩১ - ৯৪৬)

(১৭) মহাদেব মল্ল (৯৪৬ - ৯৭৭)

(১৮) দুর্গাদাস মল্ল (৯৭৭- ৯৯৪)

(১৯) জগৎ মল্ল (৯৯৪-১০০৭) : শ্রীমন্ত জগৎ মল্লদেব মল্ল-রাজবংশের ইতিহাসে বিশেষ পরিচিত পান, কারণ বিশ্বাস করা হয় যে দেবী জগদম্বা মা মৃন্ময়ীর নির্দেশ অনুসারে তিনি তাঁর রাজধানী প্রদ্যুম্নপুর থেকে বন-বিষ্ণুপুরে স্থানান্তর করেছিলেন। কিংবদন্তি অনুসারে, শ্রীমন্ত জগৎমল্ল দেব একসময় শিকারের জন্য বন-বিষ্ণুপুরের গিয়েছিলেন। তৎকালীন বিষ্ণুপুর ছিল সেই সময় ঘন জঙ্গলে আচ্ছাদিত। শিকার খেলায় ক্লান্ত হয়ে মহারাজ এক বটবৃক্ষের মুলে বিশ্রামার্থে আশ্রয় নিলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন স্বপ্নে মা মৃন্ময়ী দুর্গা দর্শন দিলেন এবং তাঁকে স্বপ্নাদেশ দিলেন এই বট বৃক্ষের তলে এক দেবী মুখাবয়ব আছে তা উদ্ধার করিয়ে এই স্থানে মন্দির ও বিগ্রহ স্থাপন এবং রাজকীয় গরিমায় নিত্যার্চনার ব্যবস্থা করতে। এবং রাজধানী বিষ্ণুপুরে স্থানান্তর করতেও বলেন তাতে তার রাজবংশ দেবীর কৃপাপাত্র এবং নিষ্কণ্টক রাজত্ব লাভ করে। রাজা জগৎমল্ল দেবও দেবীমায়ের স্বপ্নাদেশানুসারে কার্য করলেন। বলা হয় যে বনবিষ্ণুপুর আগে একটি ছোট গ্রাম ছিল এবং প্রতিপালক ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নাম অনুসারে এর নামকরণ করা হয়েছিল। ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে, জগৎ মল্ল মৃন্ময়ী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর শাসনামলে বিষ্ণুপুর ছিল অত্যন্ত উন্নত এবং একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজ্য। জগৎ মল্ল তের বছর রাজত্ব করেছিলেন।

(২০) অনন্ত মল্ল (১০০৭ - ১০১৫)

(২১) রূপ মল্ল (১০১৫-১০২৯)

(২২) সুন্দর মল্ল (১০২৯-১০৫৩)

(২৩) কুমুদ মল্ল (১০৫৩-১০৭৪)

(২৪) কৃষ্ণ মল্ল (১০৭৪ - ১০৮৪)

(২৫) ২য় রূপ মল্ল (১০৮৪ - ১০৯৭)

(২৬) প্রকাশ মল্ল (১০৯৭ - ১১০২) : প্রকাশ মল্ল ঢাকেশ্বর নদীর উত্তর -পূর্ব কোণে একটি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রকাশ ঘাট নামে ব্যবসায়িক কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করেন।

(২৭) প্রতাপ মল্ল (১১০২ - ১১১৩)

(২৮) সিঁদুর মল্ল (১১১৩ - ১১২৯)

(২৯) শুক মল্ল (১১২৯ - ১১৪২)

(৩০) বনমালী মল্ল (১১৪২ - ১১৫৬)

(৩১) যদু মল্ল (১১৫৬ - ১১৬৭)

(৩২) জীবন মল্ল (১১৬৭ - ১১৮৫)

(৩৩) রাম মল্ল (১১৮৫ - ১২০৯) : রাম মল্ল তার রাজ্যের সামরিক শক্তি উন্নত করেছিলেন।

(৩৪) গোবিন্দ মল্ল (১২০৯ - ১২৪০)

(৩৫) ভীম মল্ল (১২৪০ - ১২৬৩) : ভীম মল্ল দেবতা শ্যামচন্দ্রের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মল্লভূমের সীমানা উত্তরে দামোদর নদ পর্যন্ত বিস্তৃত করেন।

(৩৬) কাতরা মল্ল (১২৬৩ - ১২৯৫)

(৩৭) পৃথ্বীমল্ল (১২৯৫ - ১৩১৯) : পৃথ্বী মল্লকে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয় ভগবান শিবের দুটি মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য। এগুলি হল বিষ্ণুপুর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে ডিহরের চকোলিথিক স্থানে শৈলেশ্বর এবং যাড়েশ্বর মন্দির। আজ অবধি এই দুটি মন্দির শুধুমাত্র ভক্তদের জন্য নয়, পণ্ডিত এবং পর্যটকদের জন্যও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

(৩৮) তপ মল্ল (১৩১৯-১৩৩৪)

(৩৯) দীনবন্ধু মল্ল (১৩৩৪-১৩৪৫)

(৪০) ২য় কানু মল্ল (১৩৪৫ - ১৩৫৮)

(৪১) ২য় শূর মল্ল (১৩৫৮ - ১৩৭০)

(৪২) শিব সিংহ মল্ল (১৩৭০ - ১৪০৭)

(৪৩) মদন মল্ল (১৪০৭ - ১৪২০)

(৪৪) ২য় দুর্জন মল্ল (১৪২০ - ১৪৩৭)

(৪৫) উদয় মল্ল (১৪৩৭ - ১৪৬০)

(৪৬) চন্দ্র মল্ল (১৪৬০ - ১৫০১)

(৪৭) বীর মল্ল (১৫০১ - ১৫৫৪)

(৪৮) ধারী মল্ল (১৫৫৪ - ১৫৬৫)।

**মল্লভূমের সাথে শাখা ও মিত্র রাইপুর রাজবংশ এবং মিত্র সিমলাপাল রাজবংশের তুলনা :**

| **মল্লরাজ বংশ** | **রাইপুর রাজাজদের রাজত্বকাল** | **প্রাচীন সিমলাপাল রাজবংশ** |
|---|---|---|
| হাম্বির মল্লদেব (১৫৬৫-১৬২০) | শিখর রাজ | বাসুদেব মহাপাত্র (১৫৪৫-১৫৫৮) |
| ধারীহাম্বীর মল্লদেব (১৬২০-১৬২৬) | ? | বলরাম মহাপাত্র (১৫৫৮-১৫৮০) |
| রঘুনাথ সিংহদেব (১৬২৬-১৬৫৬) | ব্রাহ্মণ রাজা ? | মোহনদাস মহাপাত্র (১৫৮০-১৫৯৩) |
| বীরসিংহদেব (১৬৫৬-১৬৮২) | ব্রাহ্মণ রাজাকে উচ্ছেদে ফতে সিং ? | চিরঞ্জীব সিংহ (১৫৯৩-১৬১৫) |
| দুর্জনসিংহদেব (১৬৮২-১৭০২) | রঘুনাথ সিংহদেব (১৬৫৫) | লক্ষ্মণ সিংহ (১৬১৫-১৬৫২) |
| রঘুনাথ সিংহদেব ২য় (১৭০২-১৭১২) | ধরমসিংহদেব-কৃষ্ণসিংহদেব অর্জুন সিংহদেব | কৃষ্ণদাস সিংহ (১৬৫২-১৬৯৩) |
| গোপাল সিংহদেব (১৭১২-১৭৪৮) | দুর্জন সিংহদেব (১৭৬৭-১৮০০) | রাধানন্দ সিংহ (১৬৯৩-১৭২৮) |
| চৈতন্যসিংহদেব (১৭৪৮-১৮০১) | ফতে সিংহদেব | বলরাম সিংহ (১৭২৮-১৭৭৫) |
| মাধব সিংহদেব (১৮০১-১৮০৯) | বীর সিংহদেব (১৮৪১) | জগন্নাথ সিংহ (১৭৭৫-১৮২০) |
| গোপাল সিংহদেব ২য় (১৮০৯-১৮৭৬) | হরিহর সিংহদেব-রাজা রঘুনাথ ১৮৮০ | চিরঞ্জীব সিংহ চৌধুরী (১৮২০-১৮৩১) |

| মল্লরাজ বংশ | রাইপুর রাজাজদের রাজত্বকাল | প্রাচীন সিমলাপাল রাজবংশ |
|---|---|---|
| রামকৃষ্ণ সিংহদেব (১৮৭৬-১৮৮৫) | ইন্দ্র সিংহদেব (১ম রাণী উজ্জ্বল কুমারী, ২য় রাণী নিশা কুমারী)-<br>লাল সিংহদেব | নটবর সিংহ চৌধুরী (১৮৪৪-১৯০৫) |
| ধ্বজামণীদেবী (১৮৮৫-১৮৮৯) | বলভদ্র সিংহদেব (১৯১১) | মানগোবিন্দ সিংহ চৌধুরী (১৯০৫-জগবন্ধু সিংহ চৌধুরী (১৯০৫-১৯০৯) |
| নীলমণি সিংহদেব (১৮৮৯-১৯০৩) | কালীপদ সিংহদেব | মদনমোহন সিংহ চৌধুরী (১৯০৯-১৯২৭) |
| রাজানেই (১৯০৩-১৯৩০) | চক্রধর সিংহদেব | শ্যামসুন্দর সিংহ চৌধুরী (১৯২৭-১৯৫৫) |
| কালীপদ সিংহঠাকুর (১৯৩০-১৯৮৩) | শশধর সিংহদেব/মধুসূদন /গোপীনাথ | কল্যাণীপ্রসাদ-দেবপ্রসাদ |
| সলিল/জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ ঠাকুর | হরিপদ সিংহদেব শিবনাথ/পৌলমী | চিরঞ্জীব |

মল্লরাজবংশের সাথে বাংলার শাসক ও দিল্লীর বাদশাহদের নানা ঘটনার ঘনিষ্ঠ যোগ গড়ে উঠেছিল। সেই দুই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কালক্রমের তুলনা করলে বিভিন্ন ঘটনাক্রমের একটি সুতোয় বাঁধা সম্পর্ক অনুধাবন করা যাবে। তাই নিম্নে তিন শাসকদলের কালক্রম আলোচনা করা হল।

| মল্লরাজ বংশ | বাংলার শাসক তালিকা | ভারতের শাসকগণ |
|---|---|---|
| হাম্বির মল্লদেব (১৫৬৫-১৬২০) | তাজ খান<br><br>কররানী/সুলায়মান/বায়েজিদ/ দাউদ (১৫৬৪-৭৬) মুনিম খান/ | আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)<br>জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৫) |

| মল্লরাজ বংশ | বাংলার শাসক তালিকা | ভারতের শাসকগণ |
|---|---|---|
| | হুসেন কুলি খান/মোজাফফর খান তুরবাতি/মির্জা আজিজ কোকা/ উজির খান তাজিক/শাহবাজ খান কাম্বোহ/সাদিক খান/ উজির খান তাজিক/সাইদ খান/ রাজা মন সিংহ (আকবরের অধীন ১৫৭৪-১৬০৬) কুতুবউদ্দিন কোকা/জাহাঙ্গীর কুলি বেগ/ইসলাম খান চিশতী/ কাসিম খান চিশতী/ইব্রাহিম খান ফাত-ই-জাং (জাহাঙ্গীরের অধীন ১৬০৬-২৪) | |
| ধারীহাম্বীর মল্লদেব (১৬২০-১৬২৬) | মহাবত খান/মোকারম খান (জাহাঙ্গীরের অধীন ১৬২৫-২৭) | জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৫) শাহজাহান (১৬২৭-৫৮) |
| রঘুনাথ সিংহদেব (১৬২৬-১৬৫৬) | ফিদাই খান (জাহাঙ্গীরের অধীন ১৬২৭-২৮) কাসিম খান/মীর মুহাম্মদ বাকির/মীর আবদুস সালাম/ প্রিন্স শাহ সুজা শোহজাহানের অধীন (১৬২৮-৬০) | শাহজাহান (১৬২৭-৫৮) |
| বীরসিংহদেব (১৬৫৬-১৬৮২) | মীর জুমলা দ্বিতীয়/শায়েস্তা খান/আজম খান কোকা/ যুবরাজ মুহাম্মদ আজম/ শায়েস্তা খান (ঔরঙ্গজেব অধীনে ১৬৬০-৮৮) | ঔরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭) |

| মল্লরাজ বংশ | বাংলার শাসক তালিকা | ভারতের শাসকগণ |
|---|---|---|
| দুর্জনসিংহদেব (১৬৮২-১৭০২) | দ্বিতীয় ইব্রাহিম খান/যুবরাজ আজিম-উস-শান (ঔরঙ্গজেব অধীনে ১৬৮৮-১৭১২) | ঔরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭) |
| রঘুনাথ সিংহদেব (১৬২৬-১৬৫৬) | ফিদাই খান (জাহাঙ্গীরের অধীন ১৬২৭-২৮) কাসিম খান/ মীর মুহাম্মদ বাকির/মীর আবদুস সালাম/প্রিন্স শাহ সুজা (শাহজাহানের অধীন ১৬২৮-৬০) | শাহজাহান (১৬২৭-৫৮) |
| বীরসিংহদেব (১৬৫৬-১৬৮২) | মীর জুমলা দ্বিতীয়/শায়েস্তা খান/আজম খান কোকা/ যুবরাজ মুহাম্মদ আজম/ শায়েস্তা খান (ঔরঙ্গজেব অধীনে ১৬৮৮-১৭১২) | ঔরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭) |
| দুর্জনসিংহদেব (১৬৮২-১৭০২) | দ্বিতীয় ইব্রাহিম খান/যুবরাজ আজিম-উস-শান (ঔরঙ্গজেব অধীনে ১৬৮৮-১৭১২) | ঔরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭) |
| রঘুনাথ সিংহদেব ২য় (১৭০২-১৭১২) | খান-ই-আলম (১৭১২-১৩) | বাহাদুর শাহ (১৭০৮-১২) জাহান্দার শাহ (১৭১২-১১৩) |
| গোপাল সিংহদেব (১৭১২-১৭৪৮) | ফররুখ সিয়ার/মুর্শিদকুলি খান (ঔরঙ্গজেব অধীনে ১৭১৩-২৭) সরফরাজ খান বাহাদুর/সুজা-উদ্দিন মুহাম্মদ খান/সরফরাজ খান বাহাদুর/ মুহাম্মদ আলীবর্দী (১৭১৩-১৭৫৬) | ফাররুকশিয়ার (১৭১৩-১৯) রফি-উদ-দারজাত (১৭১৯) দ্বিতীয় শাহজাহান (১৭১৯) মোহাম্মদ শাহ (১৭১৯-৪৮) |

| মল্লরাজ বংশ | বাংলার শাসক তালিকা | ভারতের শাসকগণ |
|---|---|---|
| চৈতন্য সিংহদেব (১৭৪৮-১৮০১) | সিরাজ-উদ-দোলা/জাফর আলী খান/মীর কাসিম/জাফর আলী খান/নাজিমুদ্দিন/নাজাবুত আলী/আশরাফ আলী/মোবারক আলী খান/বাবর আলী (১৭৫৬-১৮১০) | আহমদ শাহ বাহাদুর (১৭৪৮-৫৪) দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪-৫৯) তৃতীয় শাহজাহান (১৭৫৯-৬০) দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৬০-১৮০৬) মোহাম্মদ শাহ বাহাদুর (১৭৮৮) |
| মাধব সিংহদেব (১৮০৯-১৮০৯) | বাবর আলী (১৭৯৩-১৮১০) | দ্বিতীয় আকবর শাহ (১৮০৬-৩৭) |
| গোপাল সিংহদেব ২য় (১৮০৯-১৮৭৬ | জয়নউদ্দিন আলী/আহমদ আলী/মোবারক ২য়/মনসুর (১৮১০-৮১) | দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-৫৭) |
| রামকৃষ্ণ সিংহদেব (১৮৭৬-১৮৮৫) | মনসুর (১৮৩৮-৮১) হাসান | —— |
| ধ্বজামণীদেবী (১৮৮৫-১৮৮৯) | মনসুর (১৮৩৮-৮১) সৈয়দ হাসান আলী মির্জা খান (১৮৮২-১৯০৬) | —— |
| নীলমণি সিংহদেব (১৮৮৫-১৮৮৯) | সৈয়দ হাসান আলী মির্জা (১৮৮২-১৯০৬) | —— |
| রাজানেই (১৯০৩-১৯৩০) | ওয়াসিফ আলী (১৯০৬-১৯৫৯) | —— |
| কালীপদ সিংহঠাকুর (১৯৩০-১৯৮৩) | সৈয়দ ওয়ারিস আলী মির্জা (১৯৫৯-৬৯) | —— |
| সলিল/জ্যোতি প্রসাদ সিংহ ঠাকুর | সৈয়দ মোহাম্মদ আব্বাস আলী (বর্তমান) | —— |

বিষ্ণুপুরের রাজাদের বলা হত মল্লরাজা। সংস্কৃত ভাষায় 'মল্ল' শব্দের অর্থ কুস্তিগির। তবে এই অঞ্চলের মাল উপজাতির নামের সঙ্গে এই নামের যোগ থাকা সম্ভব।

খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে ব্রিটিশ শাসন শুরুর আগে পর্যন্ত প্রায় ১০০০ বছর বাঁকুড়া জেলার ইতিহাস মল্লভূম রাজ্যের উত্থান পতনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। বিপত্তারিণী দেবীর কিংবদন্তিটি এই মল্লরাজাদের সঙ্গে যুক্ত। প্রাচীন এই রাজবংশের পরিণতি ছিল অত্যন্ত করুণ ও মর্মন্তুদ।[৮৭]

**তথ্যসূত্র :**


১. **A. P. Mallik, History of Bishnupurraj, Calcutta, 1921, p. 11.**

১ক. অজয় কুমার ঘোষ, বাঁকুড়া ভাবনা, বর্ধমান, ২০২২, পৃ. ১০৭।

১খ. লক্ষ্মীকান্ত পাল, দক্ষিণরাঢ় সংস্কৃতি পরিক্রমা মল্লভূম, মহিষাদল, ২০১৫, পৃঃ ৪৮। পিতা আদিমল্লের সর্পফণাশ্রয়ে প্রাণরক্ষার কাহিনীর স্মরণে মল্লরাজ জয়মল্ল (৭১০-৭২০) দন্ডেশ্বরী মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন বলে জনশ্রুতি। দেবী সারা বছর জগদ্ধাত্রী হিসাবে পূজিতা। এছাড়া শ্যামাপূজায় শ্যামা হিসাবে, দশহরা-সয়লায় মনসা হিসাবে, বারোয়ারি পূজায় চণ্ডী ও বাৎসরিক পূজায় মনসা হিসাবে পূজা পায়। থাকে আলাদা আলাদা পুরোহিত। এখানে সায়লা উৎসবের পর কার্তিক মাসের পরবর্তী শনি বা মঙ্গলবার কনকাবতী গ্রামের কনকেশ্বরী দেবীর সায়লা উৎসব পালিত হয়। জেলা বা রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামে সায়লা বা অনুরূপ উৎসব পালিত হয়। সন্নিহিত হুগলী সহ বিভিন্ন জেলায় সই পাতানো, নব-দম্পতিদের কোনো পরিবারের সথে সই বা ইস্টেলা পাতানোর রীতি আছে।

২. **A. P. Mallik, History of Bishnupurraj, Calcutta, 1921, p. 12.**

৩. মাণিকলাল সিংহ, পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ ১৫৩-৫৪।

৪. **Abhay Pada Mallik, History of Bishnupur-Raj, Calcutta, 1921, p.26.**

৫. শম্ভু ভট্টাচার্য্য, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির, কলকাতা, ২০০০, পৃঃ ৩৪৬।

৬. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের শিল্প, প্রবাসী মাঘ সংখ্যা, কলিকাতা, ১৮৯৭, পৃঃ ৫৬১।

৭. অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, কলকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ১১৮।

৭ক. প্রতিষ্ঠালিপি অস্পষ্ট। অনেক গবেষকের মতে ১৬৪৩-৪৬ বর্ষে মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ এটির প্রতিষ্ঠা বা সংস্কার করেন। দেবোত্তর আর থেকে নিত্যভোগ ছিল ১ শালি (১৮ কেজি) অন্ন, কাঁচা শালপাতায় পোড়া পোস্ত ও বিরি কলাই ডাল। দোল, রাস ঝুলন, জন্মাষ্টমী পালিত হয়। পরিমণ্ডলে মন্দির সংস্কৃতি বজায় ছিল বহুকাল। দিকপাড় সপ্তরথ সদাশিব (১৮৭৬), রাউতখণ্ডের কালঞ্জয় শিব-গৌরীমা (১৭৫২), রাজগ্রাম রাহাদের দামোদর-গিরিগোবর্ধন-রাসমঞ্চ অব্যাহত মন্দির স্থাপত্যের নিদর্শন।

৮. গৌরপদ সেন, মল্লভূমির জীবন প্রভাত ও জীবন সন্ধ্যা, বর্ধমান, ২০০১, পৃঃ ৫১।

৯. মাণিকলাল সিংহ, পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ ১৫৩-৫৪।

১০. **S N Hasan, Satish Chandra(ed), Religion, State amd Society in Medieval India : Collected Works of S N Hasan, New Delhi, 2005.**

১০ক. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০, পৃ. ১২।

১১. **M Habib, K. A. Nizami(ed), A Comprehensive History of India, Vol-V, 1206-1526, p.940. 1139.**
১২. অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ (সঃ), সন্ধাকর নন্দীর রামচরিত, ১৯৩৭, পৃঃ ৪৪।
**Amiyakumar Bandyopadhyaya, Bankura District Gazetteers, Calcutta, 1968, p.72.**
১৩. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০ (পুনঃমুদ্রণ ২০১০), পৃঃ ৭৭।
১৩ক. **Paramanda Acharya, Studies in Orissan History, Archaeology and Archives, Cuttack–1969, p.467** ও রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, ব্রিটিশ রাজপর্বে বাঁকুড়া জীবন, বাঁকুড়া, ২০১৭, পৃঃ১৬৭। ১৯৬২ সালের ১৯ নভেম্বরের ৬৯০৪ নং দলিলে শূরভুম হিসাবে উল্লিখিত আছে বড়জোড়া থানার কাঞ্চনপুর, কোচকুল্যা, খাড়ারী, নূতনগঞ্জ, শিরসা, মড়াজুড়ি, শালুকা,দেজুরি, ভুল্তড়া, পুর্ণিয়া, বহড়াখুল্যা, সরগড়া, আউল্যা, বদনপুর, গোপীনাথপুর, ডাকাইসিনি, উয়াড়া, শীতলা, মাঞ্জমুড়া, ভেউদা এবং গঙ্গাজলঘাটি থানার জেজুয়া, জাম্বেদ্যা, ভৈরবপুর, দেশুড়্যা, কুমিরা, লখ্যাড়া, বনগ্রাম, একচালা, কুকড়াজোড়, রামপুর নামেরমোট ত্রিশটি গ্রাম।
১৪. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০ (পুনঃমুদ্রণ ২০১০), পৃঃ ৪২।
১৪ক. গৌরপদ সেন, মল্লভূমির জীবন প্রভাত ও জীবন সন্ধ্য, বর্ধমান, ২০১১, পৃ. ৭৮।
১৪খ. কোতল খাঁয়ের নামেই কোতলপুরের নামকরণ হয়। যুদ্ধে নিহত হলে কোতলপুরেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।
১৫. **Jadunath Sarkar, History of Bengal, Vol II, New Delhi, 1943, p. 208**
লক্ষ্মীকান্ত পাল, কোতলপুরের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মহিষাদল, ২০০৮, পৃঃ ৪০।
১৫ক. **Abul Fazal, Akbarnama:English Translation by H Beveridge, Vol-1, Calcutta, 1943, p. 878.**
১৬. মাণিকলাল সিংহ, পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৭৮।
১৭. মাণিকলাল সিংহ, পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৭৮।
১৮. **J D Beglar, A Tour through the Bengal Provinces, Delhi, 1878 (reprint 2000), p. 207, 208.**
১৯. **Amiyakumar Bandyopadhyaya, Bankura District Gazetteers, Calcutta, 1968, p.94.**
১৯ক. বিষ্ণুপুর আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত মণ্ডমালাঘাট থেকে প্রাপ্ত দুটি তরবারী অতীত যুদ্ধের ইঙ্গিত দেয়।
২০. **A. P. Mallik, History of Bishnupurraj, Calcutta, 1 921, p. 32.**
২১. রজতকান্ত রায়, পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, কলিকাতা ১৯৯৪, পৃঃ ১০০।
২২. **Prabhat Kumar Saha, Some Aspectss of Malla Rule in Bishnupur, Calcutta, 1970, p.70.**
২৩. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০ (পুনঃ মুদ্রণ ২০১০), পৃঃ ৮৬।
২৪. বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৫০, পৃঃ ৭৪।
২৫. রজতকান্ত রায়, পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃঃ ১০২।

২৬. বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৫০, পৃঃ ৭৯।

২৬ক. রতন কবিরাতের 'মদনমোহন বন্দনা'য় 'সুজাদি আইল চড়ি/সঙ্গে হাজার ফোদ ঝুড়ি/আসি ছিলা ধনুষ্টঙ্কারে প্রভুর বচন পেয়া/রাজারে শিরোপা দিয়া/ফিরিয়া গেলেন তিনি ঘরে।' শিরোপা হল সম্ভবত 'সিংহ' উপাধি।

২৬খ. রতন কবিরাজ 'মদনমোহন বন্দনায়' লিখেছেন, 'আর এক মহিলা শুন/কীর্ত্তিচন্দ্র আইলপুন/হাজার পাঁচছয় ঘোড়া সঙ্গে লগ্ধা।' 'জাফর খাঁ জমাদার/মারা গেল ভাগিনা তার/তথাপিলা ছাড়িয়া না যায়।'

২৬গ. মল্লরাজাদের থেকে পিরোত্তর জমি পেয়েছিলেন বিষ্ণুপুরের কুরবান শাহ্, কোতলপুরের বাজধরা পির ও কুলাহার পির, রোলের শাহ মাদার, কড়িসুন্ডার হোসিনি কিরমানি, রসুলপুরের জনৈক পির।

২৭. গীতা নিয়োগী, কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর বিষ্ণুপুরী রামায়ণ, শ্রীরামপুর, ২০০০, পৃ. ১৭।

২৮. সুদীপ্ত পোড়েল, অতীত বাঁকুড়ার সমাজ ও অর্থনীতি, কলকাতা, ২০১৬, পৃঃ ২৩৭।

২৯. রজতকান্ত রায়, পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃঃ ১০৩।

৩০. **F W Robertson, Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Bankura, Calcutta, 1926, p.31.**

৩১. **Letter from Hesilrige to Birbhum-Bishnupur Collector Keating dated 18th December, 1789.**

৩২. **Philip Francis, parliamentary paper, 1812, Minutes dated 5th Nov, 1776, Vol VII, p. 349.**
কোম্পানীর রাজস্ব দাবী ছিল ১৭৬২-৬৩ সালে ১৩৬০৪৫ টাকা, ১৭৬৫-৬৬ সালে ১৬১০৪৪ টাকা, ১৭৬৯-৭০ সালে ২৫০৫০১ টাকা, ১৭৭০-৭১ সালে ২৮০৫০১ টাকা।

৩৩. অচিন্ত্য রায়, কৃষি ও সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০৫, পৃঃ ২০।

৩৪. **F W Robertson, Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Bankura, Calcutta, 1926, p.35.**

৩৫. **F W Robertson, Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Bankura, Calcutta, 1926, p.34.**

৩৫ক. বালসী ও বেলিয়াতোড়ের কৃষকদের জমিদারি জুলুমের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ নথিতে পাওয়া যায়।

৩৬. **F W Robertson, Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Bankura, Calcutta, 1926, p.35.**

৩৭. **W W Hunter, Statistical Accounts of Bengal, Part-IV, London, 1876, p.276, 284.**

৩৮. **A. P. Mallik, History of Bishnupurraj, Calcutta, 1921, p.54.**

৩৯. **A. P. Mallik, History of Bishnupurraj, Calcutta, 1921, p.57.**

৩৯ক. শিবিরের স্থানটি বর্তমানে মারাঠাডাঙ্গা নামে পরিচিত।

৪০. **W W Hunter, State Accounts of Bengal, Vol IV, London, 1876, p.314.**

৪১. **W W Hunter, Statistical Accounts of Bengal, Part-IV, London, 1876, p.16.**

৪২. **Calcutta Gazette dated 29.03.1787.**

৪৩. **Calcutta Gazette dated 16.10.1788.**

৪৪. **W W Hunter, Statistical Accounts of Bengal, Part-IV, London, 1876, p.17.**

৪৫. **W W Hunter, Statistical Accounts of Bengal, Part-IV, London, 1876, p.81.**
৪৬. **W W Hunter, Statistical Accounts of Bengal, Part-IV, London, 1876, p.83.**
৪৭. **W W Hunter, Statistical Accounts of Bengal, Part-IV, London, 1876, p.399.**
৪৮. সুদীপ্ত পোড়েল, অতীত বাঁকুড়ার সমাজ ও অর্থনীতি, কলকাতা, ২০১৬, পৃঃ ২৩৮।
৪৯. **Letter from Birbhum-Bishnupur Collector keating to Burdwan Collector L Mercer dated 9th April, 1789.**
৫০. **Letter from Birbhum-Bishnupur Collector Keating to Board of Revenue of 3rd July, 1789.**
৫১. **Letter of Blunt to Judicial Secretary, Calcutta dated 5th March, 1808.**
৫২. **Letter of Bishnupur Commissioner Blunt to Front Williams dated 20th May, 1807.**
৫৩. **Letter from District Collector to Company dated 9th March, 1808.**
৫৪. **A. P. Mallik, History of Bishnupurraj, Calcutta, 1921, p.57.**
৫৫. **Jaminimohan Ghosh, Sannuyasi and Fakir Raiders in Bengal, Calcutta, 1930, p.59.**
৫৬. **W W Hunter, Annals of Rural Bengal, London, 1868, p.26.**
৫৭. **W W Hunter, Annals of Rural Bengal, London, 1868, p.32.**
৫৮. **Proceedings of Board of Revenue dated 3rd March, 1789.**
৫৯. **Letter from Collector Keating to Bor dated 1st January, 1792.**
৬০. **Letter from Collector Keating to John Shore, BoR dated 10th February, 1789.**
৬১. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০ (পুনঃ মুদ্রণ ২০১০), পৃঃ ১১০।
৬২. অশোক মিত্র, পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ৪র্থ খণ্ড, দিল্লী, ১৯৭৪, পৃঃ ১৭৮।
৬৩. **J Carrau, Circular Orders passed by Nizamat Adawlat, Calcutta, 1855, Vol I, p 194-96, 211-12, 229-30, 224-46, 272-75, 296-98, 324-27.**
৬৪. শুভম মুখোপাধ্যায়, মল্লভূমির মন্দিরলেখ, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ২০২২, পৃঃ ৬০, ৯৪।
৬৫. চন্দনকুমার ভট্টাচার্য্য, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সংকলন, বাঁকুড়া, ২০২২, পৃঃ ১৭৬, প্রবন্ধ : প্রদীপ সিংহ, আচার্য শ্রীনিবাস, বিষ্ণুপুর সঙ্গীত ঘরানার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।
৬৬. **A. P. Mallik, History of Bishnupurraj, Calcutta, 1921, p.111-112.**
৬৭. লীলাময় মুখোপাধ্যায়, সুরতীর্থ বিষ্ণুপুরের পাঁচ সঙ্গীতগুণী, বিষ্ণুপুর, ২০০৭, পৃঃ ২৭।
৬৮. হেমেন্দ্রনাথ পালিত, শুভঙ্করী রাঢ় বঙ্গের গণিত পদাবলী, অলোক পালিত (সঃ) বর্ধমান, ২০০১। পৃঃ ৫৮-৮৬।
৬৯. **Haraprasad Shastri, A Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the Collection of Royal Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1893, MS-3615.**
৭০. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সঃ), প্রভাতী, কলিকাতা, মিত্র-ঘোষ, পৃঃ ৩০৩-৩২৬।
৭১. রজতকান্ত রায়, পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃঃ ৯৮।
৭২. মুহাম্মদ আব্দুল রহিম, আলিবর্দী ও মারাঠা আক্রমণ, ঢাকা, পৃঃ ২৯৬।

৭৩. দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৩৫, পৃঃ ৭৮৫।
৭৪. দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৩৫, পৃঃ ৭৫২।
৭৫. চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা, বিষ্ণুপুর, ১৯৮০, পৃঃ ১৭।
৭৫ক. মন্দির সংলগ্ন গাছতলায় সাবেক কামানটি অযত্নে পড়ে থাকায় অপহৃত হয়। বর্তমানে ছোট-বড় পাঁচটি কামান তোপধ্বনি করা হয়।
৭৬. **A. P. Mallik, History of Bishnupurraj, Calcutta, 1921, p.56.**
৭৬ক. অজয়কুমার ঘোষ, বাঁকুড়া ভাবনা, বর্ধমান, ২০২২, পৃ. ২৯। ১৯১৯ সালে বিষ্ণুপুর দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি আপোষ দলিল।
৭৭. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, ব্রিটিশ রাজপর্বে বাঁকুড়া জীবন, বাঁকুড়া, ২০১৭, পৃঃ ১৭।
৭৭ক. অজয় কুমার ঘোষ, বাঁকুড়া ভাবনা, বর্ধমান, ২০২২, পৃ. ৬৪-৬৫। সোমেশ্বর শিবখ্যাত সোমসারের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ব্রিটিশ নথি উল্লেখ করে এই ঘাটের নামের অস্তিত্ব ১৭৭৪ সালের আগের জানিয়েছেন। আর চাঁদপাল ছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার মানুষ।
৭৮. অশোক মিত্র, পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ৪র্থ খণ্ড, দিল্লী, ১৯৭৪, পৃঃ ৩৫।
৭৯. বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৫০, পৃঃ ৯১-৯৪।
৮০. অশোক মিত্র, পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ৪র্থ খণ্ড, দিল্লী, ১৯৭৪, পৃঃ ৯৭।
৮০ক. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস-সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০, পৃ. ১৪১।
৮১. অশোক মিত্র, পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ৪র্থ খণ্ড, দিল্লী, ১৯৭৪, পৃঃ ২২৯।
৮২. দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৩৫, পৃঃ ৯৩৩-৩৪।
৮৩. **Debarsi Das, Murshidabad : Study of Cultural Diversity (1800-2000), Calcutta, 2008, p. 406-407.**
৮৪. **Kalikankar Dutta, Alivardi and his rimes, Calcutta, 1939, p. 180.**
৮৫. কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত, সূত্র : চন্দন কুমার ভট্টাচার্য্য, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সংকলন, বাঁকুড়া, ২০১২, পৃঃ ৮০।
৮৬. রামামৃত সিংহ মহাপাত্র, মল্লভূমের দশাবতার তাস, কলকাতা, ২০২১, পৃঃ ১-১২।
৮৭. জমি বাঁচাতে দরিদ্র রাজা দ্বিতীয় গোপাল সিংহ দেউলভিড়া গ্রামে পীর ইমামের নামে বণিক-মহাজন সফিউদ্দিনকে ৫৯০ বিঘার পরিচালক নিযুক্ত করে ১৮৪১ সালে যা আদপে ছিল লাখেরাজ সম্পত্তি ও পরবর্তীকালে বেআইনি হস্তান্তরে অযোধ্যার বন্দ্যোপাধ্যায়দের দেবোত্তর। দ্বিতীয় গোপাল সিংহের এই পদক্ষেপ ও প্রাচীন জৈন দেবালয়টির প্রতিষ্ঠাতা ও পালক হওয়ার দাবি আদালতে মান্যতা পায়নি। জেলাশাসক এইচ রোজ এই জটিলতা থেকে দূরে থাকলেও অযোধ্যার মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা ১৮৭৮ সালের ২৫ নং মামলায় রায় রাজার বিপক্ষে গিয়েছিল। এসময় দেওয়ান ছিলেন শ্রীনাথ। সমকালীন নথিতে ঘাটোয়াল হিসাবে দেখা যায় মুড়াকাটার নদীয়ারচাঁদ, পাটতেঁতুলের সর্দার ঘাটোয়াল শ্রীমন্ত রায় ও সাদিয়াল কুঞ্জবিহারী (ঘাটোয়ালী ব্যবস্থায় সর্দার, তাবেদার ও শেষে দিগর অবস্থান করত), বাঁকুড়া ঘাটের গিসবর্ণ এ্যান্ড কোম্পানীর তাবেদার ছিলেন মোহিত চট্ট ও পোলারাম লোহার এবং ছাতনারাজ হেমেন্দ্রলালের পক্ষে তাবেদার হারাধন চট্টোপাধ্যায়, ইন্দাস ঘাট বিহারের দিনু লায়েক (অন্তর্গত বেতালনের সর্দার ভজহরি ডোম ও তাবেদার ঘাটোয়াল তারাপদ ডোম) ও ঘাট ছেনার রাম লায়েক। জয়বেলিয়া গ্রামের তাবেদার ছিলেন নড়রার গোবিন্দ্রচন্দ্র রায়। উল্লেখ্য ফুলকুসুমা জমিদারির লগদা ঘাটের সর্দার ঘাটোয়াল কীর্তিবাস ঘোড়ুই ও শির্ষা ঘাটের সর্দার লক্ষ্মীনারায়ণ রায় জমিদারি বানোয়ারীলাল সিংহ সাহস রায় ১৮৮৫ সালে নিলামে কিনে নিলে ঘাটোয়ালী জমিগুলি অধিগৃহীত হয়ে তৌজি মহলে (নং ১১২৯ ও ১১৩০) পরিণত হয়।

## একাদশ অধ্যায়

# লৌকিক ও হিন্দু দেবদেবীর পূজার্চনা ও প্রজাজীবন

বাঁকুড়া জেলা জুড়েই ব্যাপকতা আছে লৌকিক দেবদেবীর পূজা ও পার্বণ পালনের। মূলত উপজাতীয় ও অর্ধ-উপজাতীয়দের আরাধ্য এই লৌকিক দেব-দেবীরা পরবর্তীকালে সমগ্র হিন্দু সাধারণের কাছে গ্রহণীয় হয়। লৌকিক দেব-দেবীর অনুষঙ্গে উপজাতি ও অর্ধউপজাতীয়দের হিন্দুকরণ রাঢ় বাঁকুড়ায় একটি বড় ঘটনা। এই পালন ও উৎসব রাঢ় বাঁকুড়ার সাংস্কৃতিক পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিচে কিছু লোকদেবতা ও লোক উৎসবের বিবরণ দেওয়া হল।

### ১) বাসুলী

এটি মূলত ভূমিজ, মাহাতো, কোরা, বাউরি, বাগদি, ডোম, মাল, খয়রা, হাড়ি ইত্যাদি উপজাতীয়দের মধ্যে পূজিতা দেবী। ভোগ হিসাবে মদ ও মাংসের প্রচলন এই উপজাতীয় যোগের ইঙ্গিত দেয়। রাইপুরের কোকামুখী বা বরাহমুখা মহামায়ার ভোগও মদ ও মাংস। এখানে বাসুলী মহাত্ম্যও প্রচারিত। সামন্তভূমের বাসুলী দেবীর ভোগও মদ-মাংস। এই পুরান বাসুলী মাতা রূপী শিলাখন্ড মাঝে ছিত্র যুক্ত, নগ্ন নারী ও হস্তমুন্ড বিহীন এক পুরুষ চিহ্নিত।[১] রাজবাড়ী সংলগ্ন নতুন বাসুলী মন্দিরের কষ্টি পাথরে খোদিত বাসুলী দিগবসনা, দ্বিভূজা, এক হস্তে তরবারি, অন্যটিতে রুধির পাত্র, মুন্ডমালা পরিহিতা, পদতলে মঞ্জু ঘোষ। এই ভূমরাজ্যের চাঁদরার বাসুলী প্রদীপ শিখার মত শিলা মূর্তি। আড়জুড়ির বাসুলী একটি গোলাকৃতি বাসুলী। রাজগ্রাম, বেল্যা, মনতমড়াতেও বাসুলীর পূজা হয়। ধবলভূমের ইন্দপুরের আটবাইচন্ডী গ্রামের

ভগ্ন ত্রিরথ শিখর দেউল মন্দিরের বসুলী মূর্তি ষোড়শ শতকে ছাতনা বসুলী মন্দিরে স্থানান্তরিত হয় বলে জনরব।[২] তাই এই বিগ্রহ শূন্য মন্দিরে অন্তর্হিতা দেবীর উদ্দেশ্যেই পূজা নিবেদন করে আসছেন ব্রাহ্মণ পূজারী। মল্লভূমের কুমিদ্যা গ্রামে চোখমুখ খোদিত শিলাখন্ড বাসুলী হিসাবে পূজিতা। গুমুট মৌজার মুনিনগর গ্রামের এক পুকুর থেকে প্রাপ্ত পাথরের উপবিষ্ট বাসুলী মাতার পূজা হয় ভক্তি ভরে। শলদা-ময়নাপুরের নবাসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বাসুলী মাতার দেবোত্তর হিসাবে রাজা চৈতন্য সিংহ পরিচালক শ্রীরাম পন্ডিতকে ভূমি দান করেছিলেন। সলদা গ্রামের বাসুলী রণচন্ডী নামে পরিচিত।[৩] রাউতখন্ড-বিক্রমপুরে একসময় বাসুলী দেবী পূজার চল ছিল। বড়জোড়া থানার জগন্নাথপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে বাসুলীর প্রতিষ্ঠা আছে।

**২) ধর্মঠাকুর**

মল্লভূমের ময়নাপুরকেই ধর্ম ঠাকুরের আদি কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।[৪] এখনও জয়পুরের ময়নাপুর অঞ্চলের মধ্যেই ধর্ম পূজা সীমাবদ্ধ। মনে হয় ধর্ম পূজার মূল নিহিত অনার্য কৌম সংস্কৃতির মধ্যেই। আদিতে রাঢ়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বাড়লেও বৌদ্ধরা এই প্রচলিত ধারাটি গ্রহণ করে তান্ত্রিকতার মোড়কে। কূর্ম মূর্তি ও শিলা মূর্তিতে ধর্ম ঠাকুরের পূজিত রূপ শঙ্খাসুর, কালু রায়, দোলু রায়, ক্ষুদি রায়, বাঁকুড়া রায়, মেঘ রায়, মোহন রায়, চাঁদ রায়, বুড়ো রায়, কৌতুক রায়, মনোহর রায়, শীতল রায়, আধারকুলী, কাকড়াবিছা, দলমাদল, যাত্রাসিদ্ধি, রাজাধিরাজ, কালোসোনা, কালাচাঁদ, শ্যামরায়, শীতলনারায়ণ, স্বরূপরায় প্রভৃতি।[৫] ধর্মঠাকুর প্রভাবিত জনপদ (১) ময়নাপুরে আছে রামাই পন্ডিত পূজিত যাত্রাসিদ্ধি ঠাকুর। হাকন্দ পুকুরের পাশে হাকন্দ মন্দিরে অধিষ্ঠিত।[৬] আশ্বিন মাসের শুক্লা নবমীতে যাত্রাসিদ্ধির বিশেষ পূজা উপলক্ষে গাজন আয়োজিত হয়। (২) চৌধুরী পাড়ায় প্রামাণিকদের পূজিত বাঁকুড়া রায়। (৩) শলদা গ্রামের ডোমপাড়ায় শঙ্খাসুর নামের ধর্মঠাকুর। পুরোহিত জনৈক ডোমপন্ডিত। মকর সংক্রান্তিতে হয় বিশেষ পূজা। (৪) রাজাশোল গ্রামে আছে আঁধারকুলী ধর্মঠাকুর। পূজারী মিশ্র-বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ। প্রত্যেক সংক্রান্তিতে উৎসব হলেও মকড়েই বড় আয়োজন হয়ে থাকে। এছাড়া রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, রামনবমী পালন করা হয়। এ গ্রামে ডোম পূজারীর আরাধ্য আরো এক কালাচাঁদ নামে ধর্মশিলা বিরাজ করে। (৫) শ্রীধরপুরের সদগোপ পল্লীতে বাঁকুড়া রায় প্রসিদ্ধ ধর্মঠাকুর। এখানেও রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, আষাঢ়ের রথযাত্রা পালন করা হয়।

সেবাইত 'দেউল্যা' ও 'কারক' পদবীর সদগোপ পরিবার। (৬) আমোদর তীরের কুলনগর গ্রামে আছে শ্যামরায় ধর্মঠাকুর। (৭) কুচিয়াকোল গ্রামের জেলেপাড়ায় বাঁকুড়া রায়, চৌধুরী পাড়ায় শীতলনারায়ণ, বাগদিপাড়ায় কালোসোনা ধর্মশিলা অধিষ্ঠিত। (৮) কুড়াগ্রামের মনোহর রায় ধর্মঠাকুরের সেবাইত বংশপরম্পরায় সদগোপ পরিবার। (৯) বাঁশী-চন্ডীপুর গ্রামে অবস্থান করে কৌতুক রায় নামে ধর্মঠাকুর। গাজনের অঙ্গ এখানে শালেভর, বাণফোর, আগুন সন্ন্যাসের মত আত্মনির্যাতন মূলক আচার। (১০) বৈতল গ্রামের দক্ষিণবাড় মৌজার পন্ডিত পাড়ায় মাকড়া পাথরের ধর্মরাজ মন্দিরে দুটি কূর্মাকৃতি ধর্মরাজ মূর্তি পূজিত হয়। এর নিম্নভাগে আছে অষ্টদল পদ্ম ও অনন্তনাগের চিহ্ন। মন্দিরে রাখা আছে সপ্তনাগের আশ্রয়ে পাথরের মনসা মূর্তি। ওপরের ডান হাতে পুঁথির পাটা, ঠিক নিচের হাতে শাঁখ, ডানহাত দুইয়ে যথাক্রমে সাপ ও কমন্ডুলু। পুরোহিত পন্ডিত পদবীর তেতুলিয়া বাগদি বংশের। এক কালে দেবোত্তর সম্পত্তি থাকলেও, এখন আর্থিক কারণে ১০-১২ বছর ছাড়া গাজন পালিত হয়। (১১) কোতলপুরের ভাগলপুর গ্রামের বাঁকুড়া রায়ের পূজা করে পন্ডিত পদবীর কাঁসাইকুলিয়া বাগদী সম্প্রদায়ের মানুষ। (১২) জয়পুর থানার রাজগ্রামে কূর্মাকৃতি ধর্মরাজ 'শীতলনারায়ণ' প্রতিষ্ঠিত। পুরোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ এর পূজারী হলেও পৌষ মাসে বার্ষিক উৎসবে ডোম পন্ডিত মন্ত্রপাঠ করলেই পূজার সূচনা হত। (১৩) রাউতখন্ড গ্রামের মন্ডল পরিবারের শীতল সিংহ ও ক্ষুদিরায় নামে দুই ধর্মঠাকুর পুজিত হয়। (১৪) ইন্দাস গ্রামে বাঁকুড়া রায় ধর্মঠাকুর হিসাবে পূজা পায়। সূত্রধর পূজিত এই প্রস্তর মূর্তিতে বিষ্ণুর দশাবতারে চিত্রিত ব্যাখ্যা আছে। রথযাত্রা, মকড় সংক্রান্তি পালিত হয়। (১৫) বিষ্ণুপুর শাঁখারীপাড়ায় মল্ল আগমনের পূর্ব থেকেই 'বৃদ্ধা' ও 'বৃদ্ধি অক্ষিযুক্ত' দুই বুড়োধর্মরাজের পূজা হয় কর্মকার পরিবারের দ্বারা। মল্লরাজারা পরে দেবোত্তর ভূমি দানে এ পূজার গরিমা বৃদ্ধি করেছেন। (১৬) মঙ্গলপুরে তন্তুবায় পরিবার পূজিত ধর্মরাজ হল কূর্মাকৃতি শিলায় 'স্বরূপনারায়ণ'। (১৭) বালসী গ্রামে কর্মকার সম্প্রদায় পূজিত ধর্ম ঠাকুর হল 'নবজীবন'। বালসী, মঙ্গলপুর, গাবপুরে মকর সংক্রান্তিতে ধর্ম ঠাকুরের উৎসব হয়। (১৮) পংখাই গ্রামের উগ্র ক্ষত্রিয় বাড়ীতে কূর্মাকৃতি 'রষ্টক রায়' পূজিত হয় ব্রাহ্মণ দিয়ে। (১৯) কোতলপুর থানার সিয়াম গ্রামে নাপিত গৃহে কূর্মাকৃতি 'কালাচাঁদ' অধিষ্ঠিত। (২০) পার্শা গ্রামে কূর্মাকৃতি 'পঞ্চানন' ঠাকুর অবস্থান করে। (২১) জয়পুর থানার গোপালপুর গ্রামের ধর্মঠাকুর হল 'কাঁকড়াবিছা'। (২৩) পাত্রসায়ের থানার

হদল-নারায়ণপুরের আছে নাম বিহীন কূর্মাকৃতি ধর্মঠাকুর। (২৪) মেজিয়া গ্রামে এক শূদ্র পরিবারের গৃহে অধিষ্ঠিত ধর্মরাজের পূজারী একজন চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ। আকৃতি গোলাকার চাকতির মত শিলা। গরুর বাথান থেকে এটি পাওয়া গিয়েছিল বলে জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজের উৎসব 'বাথানিয়া' উৎসব নামে পরিচিত। (২৫) যোতবিহারে দত্ত পদবীধারী সদগোপ পরিবারের পূজিত ধর্মঠাকুর 'কালু রায়'। পালিত হয় দোল যাত্রা, রাস যাত্রা, আষাঢ়ী রথযাত্রা। (২৬) বেতাসন গ্রামে ধর্মঠাকুর 'যাত্রাসিদ্ধি' ও 'সাহেবঠাকুর' প্রস্তরে নাগফণাছত্রধারী সর্পদেবী। জনশ্রুতি ডাকাতদের হাত থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করেন এই দুই দেবতা। বৈশাখী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয় যাত্রাসিদ্ধির বিশেষ উৎসব। ডিহরের আকুড়ে ডোমেরা ধর্ম ঠাকুরের উপাসক। বেলিয়াতোড় ও শ্যামসুন্দরপুরের মটগোদায় ধর্মরাজের পূজা ও মেলা বিখ্যাত। সিমলাপালে বলাদাবুড়ী ধর্মঠাকুরকে সম্ভবত সিমলাপালের উপর দিয়ে বণিকদের বলদগাড়ির রক্ষাকর্তা মানা হত।

**৩) মনসা**

রাঢ় বাঁকুড়ার প্রত্যেক গ্রামে এক বা একাধিক সর্পদেবী মনসার থান আছে।[৭] অর্থাৎ এই জেলায় মনসাদেবীর প্রভাব সর্বব্যাপী ও নিরঙ্কুশ। পাত্রসায়ের থানার বেলুট গ্রামের চন্দ্রদ্বীপ ঢিবি চাঁদ সদাগরের স্মৃতি বিজড়িত। সিমলাপাল থানার শুশুনিয়া গ্রামে বেহুলা লখীন্দরের স্থান আছে। এটি সাধারণত মন্দিরে নয়,গাছের তলায় নিকানো বেদীর ওপর সর্পফণা বিশিষ্ট পোড়ামাটির মনসা মূর্তি পূজিত হয় মূলত অন্ত্যজ মানুষদের দ্বারা। মনসা ঘট বা মনসা চালিতে পূজার চল আছে। সমগ্র শ্রাবণ মাস ধরে 'মনসার ভাসান' নামের পালাগান আয়োজিত হয়। শ্রাবণ সংক্রান্তি তিথিতে ব্রতীগণ সারাদিন উপোস করে সন্ধ্যায় বাদ্যভান্ড সহ মশাল জ্বেলে কাছের পুকুর থেকে জল ভরে নিয়ে মনসা থানে প্রতিষ্ঠা করে পূজাপাঠ করে। পরের দিন ভোরে ছাগল ও পায়রা বলি করা হয়। আর ব্রতীর ওপর দেবতা ভর করলে ভক্তের ভাল মন্দের ভবিষ্যত বাণী ও ওষুধ দেওয়ার পর্ব চলে। এদিন জেলা ব্যাপী ঝাপান উৎসব কয়েকটি গরুর গাড়ীতে মঞ্চ তৈরি করে ঘুরে ঘুরে চতুর্দোলায় 'ঝাপান' অর্থে ঝাপি থেকে বিষধর সহ বিভিন্ন সাপ হাতে, গলায় জড়িয়ে নানা খেলা, রঙ্গ, তামাশা দেখাতে থাকে।[৮] কখনও মাটির তৈরি বাঘের পিঠে বসে যে খেলা দেখায়, তাকে 'বাঘ ঝাপান' বলে।

তালডাংরা থানায় জেড্ডি গ্রামে ছান্দার, হন্যাবাদ, অযোধ্যা থেকে তিনটি মনসা

বারি এনে স্থাপিত হয়েছে। অর্জুনপুর ও অযোধ্যায় মনসা ‘কালুবুড়ী’ নামে পরিচিতা।[৯] অযোধ্যা গ্রামে দশহরা দিবসে কালুবুড়ী তথা মনসা পূজা উপলক্ষ্যে বাগদী-আঁকুড়ে ডোম প্রতিষ্ঠিত দেবীকে বেদা গ্রামের ছাতাইত পরিবারের একজন মাথায় ঘটে বসিয়ে নিয়ে দ্বারকেশ্বর নদের উদ্দেশ্যে স্নানযাত্রা করে। শুরু হয় উৎসব। এই দিন এলাকার বাড়ির চারপাশে গোময় বৃত্ত অঙ্কনে সাপের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের প্রথা আছে। অনেকের মতে মনসা পূজার উৎস আদি অস্ত্রাল বা দ্রাবিড় সংস্কৃতি সম্ভূত। দাক্ষিণাত্য থেকে আগত সেন রাজাদের সাথে আগত কানাড়ী ও তেলেগু ভাষী আদিবাসীদের ‘মহাম্মা’ নামক সর্পদেবী থেকে ‘মনসা’র উৎপত্তির একটি ধারণাও প্রবল। উপজাতীয় সর্পদেবী কালুবুড়ী পৌরাণিক মনসা ও বৌদ্ধ জাঙ্গুলীর মধ্যে বিবর্তিত ও লীন হয়ে যায়। রাউতখন্ডে আছে ‘জগদগৌরী’ নামে পূজিতা পাথরের সর্পাসীনা ও সপ্তনাগাচ্ছাদিতা মনাসা মূর্তি। অনেকের মতে ইনি বৌদ্ধ দেবী। একই মত পাওয়া যায় ফুটকরা গ্রামের পাথরের মনসা মূর্তি নিয়ে। সলদা গ্রামে আছে পুস্তক ও সর্পধারী পদ্মে উপবিষ্ট মহাযানী বৌদ্ধ ধারার সর্পদেবী।

৪) চন্ডী

এটিও আদি-অস্ত্রাল বা দ্রাবিড় রীতির দেবী হিসাবে চিহ্নিত। চন্ডী মঙ্গলের ভাষ্যতে এটি কিরাতদের দেবী। অনার্য এই দেবী পার্বতীর সাথে একাকার হয়ে শক্তি দেবীর মর্যাদা পেয়েছে। চন্ডীর অপর নাম অম্বিকা। অম্বিকানগরে অম্বিকা জৈন দেবী না হিন্দু তা নিয়ে গুরুতর বিতর্ক আছে। বিশেষত জৈন পুরাতাত্ত্বিক অবশেষ সমৃদ্ধ অম্বিকানগর পরিমন্ডলে। খাতড়ার কেচেন্দায় ও রাইপুর থানার সাতপাট্টা-মন্ডলকুলিতেও অম্বিকা দেবী আছে। এছাড়া সিমলাপালের জোড়সা ও গোতরা গ্রামের অম্বিকা দেবীও একই ভাবে সফলা আমসাছের নিচে দুই শিশু সহ দন্ডায়মান হাস্যময়ী নারী মূর্তি। এটি বৌদ্ধ ভাবনা ও আদিতে উপজাতিদের ফলবতী আমগাছ প্রদক্ষিণ করে বিবাহ সম্পন করার সাথে সম্পর্কিত বলে অনুমান। চন্ডী ও দূর্গা অভিন্ন হয়ে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে স্বীকৃত দেবী হয়। রাইপুরের মাহামায়া আদিতে প্রস্তর খন্ডে চন্ডী রূপে বিরাজিতা ও পরে মহামায়া হিসাবে আবির্ভূতা।[১০] বড়জোড়া থানার সাহারজোড়া গ্রামের অম্বিকাও জাগ্রত বলে মানা হয়। হদলনারায়ণপুরের ব্রাহ্মণী চন্ডীও পার্বতীর অন্যরূপ বলে বিশ্লেষিত। পাত্রসায়েরের নারিচা গ্রামের সর্বমঙ্গলা নামে পূজিতা কষ্টিপাথরের মহিষমর্দিনী। আটবাইচন্ডী, ডিহর ও ছান্দার গ্রামের চন্ডী

প্রস্তর খন্ডে বিরাজিতা। বাসুলী রণচন্ডীরই এক রূপ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কব্যে রাধাকে বড়াই বলছে চন্ডীকে সন্তুষ্ট করলেই কৃষ্ণকে পাওয়া সম্ভব। তাই বাসুলী মায়ের পূজা চন্ডীরই আরাধনা। মল্লরাজদের গৃহদেবতা চন্ডীর লৌকিক নাম মৃন্ময়ী। হাম্বির প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত হওয়ার আগেই রাজউপাসিত এই দেবী প্রজা সাধারণের মধ্যে প্রচার ও পূজা পেয়েছিল ব্যাপক আকারে। জামকুড়ির রাজরাজেশ্বরী বড়মা, নারিচার সর্বমঙ্গলা মেজমা, বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী ছোটমাকে তিন বোন হিসাবে মান্যতা দেওয়া হয়। কোথাও একটা হয়তো লোকদেবী থেকে রূপান্তরিত দেবীত্রয়ের মধ্যে এই সম্পর্কের বাঁধন হয়ত লোকমনে রয়ে গেছে। ধবলভূমের অম্বিকাকে জয়রামবাটির একটি দেবীশূন্য মন্দির থেকে আনা হয়েছিল বলে জনশ্রুতি।

**৫) শীতলা**

মারী বা মড়ক নিবারক লৌকিক এই দেবীর পূজা রাঢ় বাঁকুড়ার গ্রামে গ্রামে। মল্লরাজ পরিবারে এই পূজার ধারা বংশানুক্রমে প্রচারিত ও প্রসারিত। শীতলা গ্রহবিপ্রদের (সূর্যপূজক) দেবতা। ঘরে ঘরে শিলা মূর্তি ও ধাতু মূর্তিতে পূজিতা। মাঘ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে শীতলা ষষ্ঠি হিসাবে এই দেবতা প্রায় ঘরে ঘরে পূজিতা হন। রাইপুরের মন্ডলকুলিতে সুবিশাল প্রস্তরখন্ডে শীতলার অধিষ্ঠান আছে। লোকবিশ্বাস অনুসারে সন্তান কামনাতুর নারীদের কাছে পূজিতা এই দেবী হল মূর্তি বিহীন ষষ্ঠী ও বৌদ্ধ হারিতীদেবীর সমন্বিত রূপ।[১১]

**৬) শিব**

জেলার প্রসিদ্ধ শিবস্থান হল এক্তেশ্বর, বহুলারা, পাঁচাল, জগন্নাথপুর, ডিহর। অপ্রধান শিবক্ষেত্রগুলো হল দেউলেশ্বর, বামিরা, পাত্রসায়র, পীড়রাবনী, বিহারীনাথ, শিহর, মৌলবনা, মনতুমরা। এক্তেশ্বর মন্দিরে প্রাচীন কাল থেকেই চড়ক, গাজন ও নীল পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উপলক্ষ্যে পনের দিন আগে থেকেই বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে আগত ভক্তরা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে। এদের শিব গোত্রান্তরিত করে ব্রাহ্মণদের মত গলায় উপবীত দেওয়া হয়। গৈরিক বস্ত্রাবৃত হয়ে গলায় উত্তরীয়, হাতে বেতের ছড়ি হাতে এরা মুষ্ঠি ভিক্ষা করে। চৈত্রের শেষ তিন দিনের প্রথম দিন হল 'ফল ভাঙ্গা' এদিন শুধু তারা ফল খেয়ে থাকেন এবং সে ফল যে কোন বাগান থেকে অবাধে সংগ্রহের অধিকারী। দ্বিতীয় দিনে 'দাদুরঘাটা' নামে পরিচিত দ্বারকেশ্বর নদী ঘাট থেকে পাটভক্ত্যাকে পেরেক লাগানো পাটে চিত করে

শুইয়ে এক্তেশ্বর মন্দিরে আনা হয়। আর মধ্য রাত্রে পালিত 'সতীদাহ' অনুষ্ঠানে নারী ভক্ত্যাগণ মাথায় মৃৎপাত্রে কাঠকয়লার আগুন ধূনো সহকারে জ্বালিয়ে মন্দির প্রাঙ্গন আলোকিত করে তোলে। অতীত সতীদাহের অনুষঙ্গে এই উৎসবের প্রচলন বলে মনে হয়। চৈত্র সংক্রান্তির ভোরে পালিত হয় 'আগুন সন্ন্যাস'। মন্দিরের পেছনে একটি নির্দিষ্ট স্থানে কাঠকয়লায় আগুন জ্বালিয়ে একের পর এক ভক্ত্যারা হেঁটে যান। এর পর বেলায় চরক অনুষ্ঠানে পিঠে বড়শি বিঁধিয়ে শাল কাঠের চরকে ঝুলে পাক খেতে থাকে।

বহুলাড়া গ্রাম আছে সিদ্ধেশ্বর শিব মন্দির আর অদূরে চুয়ামুসিনা গ্রামে আছে দুগ্ধেশ্বর শিব লিঙ্গের অধিষ্ঠান। এখানে জাতি নির্বিশেষে সবাইয়ের ভক্ত্যা হওয়ার অধিকার থাকলেও বর্ণেতর মানুষদের মধ্যেই ভক্ত্যা হওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। সংক্রান্তির আগের দিন স্নান সেরে লোহার পেরেক বসানো পাটের ওপর চিত হয়ে শুয়ে ব্রাহ্মণকে বুকের উপর বসিয়ে ভক্ত্যা গাজন তলায় উপস্থিত হয়। চরকের দিন ভোরে মনসা তলায় আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে ভক্ত্যারা আগুন ব্রত পালন পালন করেন। বিকেলে গ্রামের বৈষ্ণবপাড়ায় 'মায়ের পুকুর' নামের পুকুরে শিবের পাটকে স্নান করিয়ে মন্ডপে ফিরে এলে মানসিককারী মহিলারা নতুন মাটির সরায় মাথায়, বুকে ধূপ পোড়ায়। কেউ কেউ পুকুর থেকে মন্দির পর্যন্ত দন্ডী কেটে আসে। মান শোধের পর 'কামিলা তোলা' উৎসবে পাটভক্ত্যা কাস্তের অগ্রভাগে মশাল জ্বালিয়ে ডুব দিয়ে কুম্ভ জলপূর্ণ করলে অন্য ভক্ত্যারা ধরে তাকে মন্দিরে নিয়ে আসে। বড়শি ফুঁড়ে ভক্ত্যাগণের চরকে পাক খাওয়া নিষিদ্ধ হলেও জিববাণ, কপাল-বাণের মত প্রথা এখনও দেখা যায়।

পাঁচালের রত্নেশ্বর শিব মন্দিরের ভক্ত্যাদের মাদক ও স্ত্রীস্পর্শ নিষিদ্ধ বলে স্বপাকে খেতে হয় কয়েক দিন। বাণফোঁড়া, আগুন হাঁটা, চরকের মত প্রথাগুলি এখানে চালু আছে। এখানে বহু সংখ্যক সাঁওতালের যোগদান ও দলবদ্ধ নৃত্য বিশেষ প্রথা হিসাবে চলে আসছে।

জগন্নাথপুরের অনাদিলিঙ্গ রত্নেশ্বর শিবের চৈত্র সংক্রান্তির গাজনে রঙ্গিন শাড়ি ও অলঙ্কার পরহিত ভক্ত্যা সন্ন্যাসীদের ব্রত পালন করতে দেখা যায়। শলাকা পাটে শায়িত পাটভক্ত্যার ওপর দাঁড়িয়ে মূল পুরোহিত ধামাতকর্ণির আগমন ঘটে। লোহা ও বাঁশের শলা জিব, বুক, পিঠ বা হাতের চামড়া ভেদ করে 'বাণফোঁড়া' অনুষ্ঠান হয়।[১২]

ডিহর গ্রামে শৈলেশ্বর ও ষাঁড়েশ্বর শিব মন্দিরে গাজন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া গঙ্গাজলঘাটীর পীড়ারবনী বাণেশ্বর শিব, পাত্রসায়েরের দেউলেশ্বর গ্রামের অনাদিলিঙ্গ দেউলেশ্বর, পাত্রসায়ের গ্রামের কালঞ্জয় শিব, কোতলপুর থানার সিহর গ্রামের স্বয়ম্ভুলিঙ্গ শিব শান্তিনাথ, মৌলবনা মৌলেশ্বর শিবের গাজন প্রাচীন। মনতুমরা গ্রামের শিবের গাজনে শলাকা পাটে পাটভক্ত্যা স্নান সেরে মন্ডপে আসে। ভক্ত্যাদের মধ্যে সাঁওতালদের আধিক্য। এই গাজনে ব্রাহ্মণ দেওঘরিয়া সেবাইতরা বাদ্যভান্ড সহকারে ছাতনার রাজবাড়ীতে রাজাকে 'সিধা' দেওয়ার রীতি আছে। বালসীতে আছে বালেশ্বর শিব মন্দির।

সম্প্রতি জামকুড়ির খেজুড় জঙ্গল থেকে মাটির নিচের চাপা পড়া শিব লিঙ্গ উদ্ধার থেকে মনে হয় এই গ্রামেও এক সময় শৈব প্রভাব ছিল।

মেলার পরিসংখ্যানে শিব সংক্রান্ত মেলার আধিক্য জনমানসে শৈব প্রভাবের প্রমাণ দেয়। বাঁকুড়া জেলার ৪০০ টি মেলার মধ্যে ১৪২ টি মেলাই গাজন কেন্দ্রিক। অন্য একটি হিসাবে জেলার ২০১ টি মেলার ১১৬ টি হল চড়ক ও গাজনের মেলা। ১৯৩৭ সালের হিসাবে ১৭৩ টি মেলার ২৮ টি গাজন, শিব গাজন ১০, আবাল গাজন ৯, চৈত্র গাজন ৪ ও ছাতনার রানী গাজন ১ টি, মোট ৫২ টি উৎসব শৈব সম্পর্কের।

### ৭) দুর্গা

প্রায় সমস্ত রাজবাড়ী ও জমিদার বাড়ীগুলিতে ধুমধামের সাথে দুর্গা উৎসব পালিত হয় বিবিধ ও বিচিত্র রীতির মধ্য দিয়ে। এই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা জমিদার বাড়ীর পূজা ও পার্বণ অংশে আছে। রাঢ়ে শক্তি আরাধনার এটি একটি ধারা।[১৩]

### ৮) রাধা-কৃষ্ণ

ষোড়শ শতকের হাম্বির সমকালীন শ্রীনিবাস আচার্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম মল্লভূম প্লাবিত করে ও এই ভক্তি ধারার অন্যতম মূল উপজীব্য ছিল রাসলীলা।[১৪] সারা রাজ্য জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয় অজস্র রাসমঞ্চ, বিভিন্ন বৈষ্ণব স্থাপত্যের নিদর্শন। রাজধানী শহরে বীর হাম্বির প্রতিষ্ঠিত প্রস্তর নির্মিত রাসমঞ্চ ভারতখ্যাত ও অনন্য স্থাপত্যের নিদর্শন। গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে এমন অসংখ্য স্থাপত্য। যেমন বিষ্ণুপুর থানার অবন্তিকা গ্রামের ইটের নবরত্ন রাসমঞ্চ ও একটি সাধারণ দোলমঞ্চ। বড়জোড়া থানার কাদাসোল গ্রামের বিষ্ণুমন্দিরের কেন্দ্রীয় খিলান শীর্ষে রাসমন্ডলের মূর্তি-ভাস্কর্য

আছে, যেমন ভাবে প্রথম রঘুনাথের তৈরি শ্যামরায় পঞ্চরত্ন মন্দিরে দুটি বড় ও চারটি রাসমন্ডল ক্ষোদিত হয়েছিল। গ্রামান্তরে নির্মিত দোলমঞ্চের উদাহরণ হল পাত্রসায়ের থানার ইটের সপ্তদশ চূড়া বিশিষ্ট রাসমঞ্চ, অযোধ্যা ও হদলনারায়ণপুর রাজবাড়ির রাসমঞ্চ, কৃষ্ণনগরে রামপুর গ্রামের আটকোণা নবরত্ন রাসমঞ্চ, বাঁকুড়া শহরে দোলমঞ্চ, তাম্বুলী সম্প্রদায়ের রাসমঞ্চ, সোনামুখী শহরের রাসমঞ্চ, জয়পুরের রাজগ্রামের মাকড়া পাথরের ভিত্তিতে আটকোণাকৃতি সপ্তদশ রত্ন রাসমঞ্চ, তালডাংরা থানার হাড়মাসড়া গ্রামে টেরাকোটার নবরত্ন রাসমঞ্চ ও সাব্রাকোণ গ্রামের আটকোণা রাসমঞ্চ, কোতলপুর গ্রামের রাসমঞ্চ ও ভগলপুর গ্রামের আটকোণা রাসমঞ্চ, ইন্দাস গ্রামের রাসমঞ্চ ও সাসপুর গ্রামের তন্তুবায় ভক্তের সপ্তদশ চূড়ার রাসমঞ্চ, জয়পুর থানার সুপুর গ্রামের ইটের আটকোণা রাসমঞ্চ, মেজিয়া থানার রামচন্দ্রপুরের বিশাল রাসমঞ্চ, ওন্দা থানার দলদলি গ্রামে গোয়ালা সম্পদায়ের রাসমঞ্চ, খামারবেড়িয়া, ছাগুলিয়া, গৌরাসোল ও জগদল্লা গ্রামের রাসমঞ্চ, মানকানালী গ্রামের তিলি সম্প্রদায়ের রাসমঞ্চ, কুমিদ্যা, ব্রজরাজপুর ও নড়রা গ্রামের রাসমঞ্চ। ১৯৩৭ সালের জেলা বোর্ডের রেকর্ডে দেখা যায়, রাসমেলা হত ছাগুলিয়ার চারদিন ধরে, গৌরাসোলে তিন দিন ধরে, সাব্রাকোণে পাঁচ দিন ধরে, রামচন্দ্রপুরে পাঁচদিন ধরে, অযোধ্যায় তিন দিন ধরে, শিরোমণিপুরে বার দিন ধরে। দোলযাত্রা হয় ব্রজরাজপুর ছয় ঘন্টা ধরে, আড়রায় তিন দিন ধরে, সিমলাপালে তিন দিন ধরে, ভেলাইডিহাতে তিন দিন ধরে, বামনিয়ায় চার দিন ধরে, বানজোড়ায় এক দিন ধরে। এই দুই উৎসবের উৎস সাঁওতাল সমাজের মামঁরে-বাহা পরব বলে অনেকে মনে করেন। ডাল্টন বিষ্ণুপুরাণের রাসনৃত্যের সাথে সাঁওতাল জুমির নৃত্যের সাদৃশ্য দেখেছেন। মামঁরে পরবে কুমারী ও অবিবাহিত তরুণরা হাঁড়িয়া পান করে সারা রাত নৃত্য গান করে।

নিম্নবর্ণীয়দের বেশ কয়েকটি পরবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আষাঢ় পূজা, করম পরব, ভাদু উৎসব, পৌষ উৎসব, তুসু উৎসব। আষাঢ় পূজা প্রকৃপক্ষে সাঁওতালদের বীজ ফেলার পূজা। ফলনের আশায় জমিতে ছাগ ও মুরগি বলি দেওয়া হয়। ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠিত করম পরব করম গাছ বা করম দেবতার পূজা। এটা মূলত ভূমিজদের অন্যতম বড় পরব। এটির ক্ষণ হল শুক্লা একাদশী বা পার্শ্ব একাদশী। পূজার পাঁচ-সাত দিন আগে বাঁশের ডালার জাওয়ার কুমারী মেয়েরা শস্য বীজ বপন করে, যাদের ‘জাওয়ার মা’ বলা হয়। বিসর্জনের দিন বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেওয়া হয় অঙ্কুরিত বীজ আর পূজার রাতভর চলে নারী পুরুষের অবাধ নাচ-গান। ভাদ্র সংক্রান্তিতে

বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার ভাদু উৎসব পালিত হয় বাউরী ঘরে। ভাদ্র মাসের শেষ দুদিন পালিত হয় ভাদু পরব। ভাদ্র মাস জুড়ে পূজিতা হন ছোট বালিকা মূর্তি। প্রত্যেক সন্ধ্যায় এর চারপাশে মেয়ে-বধুরা সমবেত হয়ে ভাদু গান গেয়ে বন্দনা করে দেবীর। সংক্রান্তির আগের দিন ভাদু জাগরণে সারা রাত চলে নাচ-গান। সংক্রান্তির দিন শোভাযাত্রা করে ভাদু বিসর্জন করা হয়।

পৌষ পার্বণ ও 'এখ্যান' উৎসব পৌষ সংক্রান্তির দুদিন আগে থেকেই শুরু হয়। পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন হল বাউড়ী ও তার আগের দিনকে বলা হয় চাউড়ী। চাউড়ীর দিন প্রতি গৃহস্থ ঘরে চলে ঢেকীতে চাল কুটার পালা। রান্নাঘরের পুরানো মাটির বাসন ফেলে নতুন বাসন পত্র ব্যবহার করা হয়। হয় পৌষ লক্ষ্মীর পূজা। সন্ধ্যায় বধুরা ধানের শিষ দিয়ে 'বাউরী' বাঁধে ভাড়ারে, ধানের গোলায়। বাচ্ছারা খাল-বিল-পুকুরের ধারে পাতা-কঞ্চি দিয়ে কুনা বা কুঁড়েঘর বানায়। সংক্রান্তির দিন ভোরে স্নান সেরে নতুন জামা কাপড় পরে কুনায় আগুন ধরিয়ে শীত নিবারণ করে। ফিরে এসে চাল গুঁড়ি ও সিন্দুর দিয়ে পৌষ লক্ষ্মীর মূর্তি তৈরি করে উঠোনে তা ধামাচাপা দেয়। এই চাপা দেওয়ার রীতিকে 'পৌষ আগলান' বলে। এই পয়লা মাঘ নিকানো উঠোনে আলপানা দিয়ে লক্ষ্মীর আসন পেতে পূজা করা হয় ও রাতে শিয়ালের ডাক শুনে তা গুটিয়ে ফেলা হয়।

রাজা-জমিদাররা এই দিনে সদলবলে মৃগয়ায় বেরত। প্রয়োজনে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন পর্যন্ত এই শিকারোৎসব চলত। মূলত সাঁওতালদের মত নিম্নবর্ণের মানুষরা এই শিকার উৎসব পালন করত।

পৌষ মাসে রাঢ় এলাকায় বড় উৎসব টুসু পালিত হয়। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত টানা এক মাস ধরে এই উৎসব পালিত হয়। ধানের ক্ষেত থেকে এক গোছা নতুন আমন ধান মাথায় করে এনে খামারে পিঁড়িতে রেখে দেওয়া হয়। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির সন্ধ্যায় গ্রামের কুমারি মেয়েরা কুমোরদের বিশেষ কায়দায় তৈরি পোড়া মাটির খোলায় (টুসুখোলা নামে পরিচিত) চালের গুঁড়ো লাগিয়ে তাতে তুষ রাখেন। তারপর দুর্বা-ঘাস, সর্ষে, বাসক, আকন্দ ফুল, গাঁদা ফুলের মালা প্রভৃতি দিয়ে সাজিয়ে, গায়ে হলুদ রঙের টিপ লাগিয়ে পাত্রটিকে পিড়ি বা কুলুঙ্গির উপরে স্থাপন করে। প্রতি সন্ধ্যায় পূজিতা হন এই টুসু দেবী। গোটা পৌষ মাস জুড়ে প্রতি সন্ধ্যায় দেবীর উদ্দেশ্যে চিঁড়ে, গুড়, বাতাসা, কাঁচা মূলো, খেজুর পাটালি মুড়ি ভোগ নিবেদনের সঙ্গে বাড়ির কুমারী মেয়েরা পাত্রের চারপাশে

মাটির প্রদীপ দিয়ে সাজিয়ে সন্ধ্যায় সমবেতভাবে তুসু গান গায়। গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে শীতের সন্ধ্যায় এভাবেই টুসু বন্দনায় মেতে ওঠে মেয়েরা। পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন 'তুসুর আগমন' পালিত হয়। এই টুসু উৎসব পালনের সময় পৌষ মাসের শেষ ক'টা দিন চাঁউড়ি, বাঁউড়ি ও মকর নামে পরিচিত। চাঁউড়ির দিনে গৃহস্থ বাড়ির মেয়েরা উঠোন গোবর-মাটি দিয়ে নিকিয়ে পরিষ্কার করে। তৈরি করা হয় চালের গুঁড়ো। বাঁউড়ির দিন পিঠে তৈরি হয়। চাঁছি, তিল, নারকেলের পুর দিয়ে বিভিন্ন আকারের পিঠে বানানো হয়। স্থানীয় ভাষায় যার নাম গড়গড়্যা পিঠে বা পুর পিঠে। বাঁউড়ির রাতেই হয় টুসুর জাগরণ। এই মন্ত্রহীন পূজার শেষে পৌষসংক্রান্তির ভোরে টুসুদেবীকে সুসজ্জিত চতুর্দোলায় বসিয়ে গান গাইতে গাইতে নিয়ে গিয়ে কাছের নদী, দিঘি বা পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হয়। তারপরে স্নান করে, নতুন কাপড় পরে, মেয়েরা গান গাইতে গাইতে ফিরে যায় গ্রামে। এ সময়ে এক দলের সঙ্গে অন্য দলের মধ্যে গানের লড়াই চলে। 'আমার টুসু নেয়ে এল/ কী বা পরতে দিব গো?/ ঘরে আছে বেনারসী/ সেটি বার করে দিব গো।/ ওদের টুসু নেয়ে এল/ ওরা কী বা পরতে দিবে গো?/ ওদের ঘরে আছে ছিঁড়া ট্যানা / ওরা তাই বার করে দিবে গো'। টুসু বিসর্জনকে কেন্দ্র করে বহু জায়গায় বসে মেলা। টুসু শব্দটির উৎস নিয়ে নানা মত আছে। ধানের তুষ, শীতের সময় যা জ্বালিয়ে আমাদের গ্রামেগঞ্জে লোকেরা আঁচ পোহায়, সেই তুষ থেকেই টুসু নামটি এসেছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত পৌষালি উৎসব 'তুষতুষালি ব্রতকথা'র মধ্যে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। টুসু দ্রাবিড় অস্ট্রিক ভাষাবর্গের কোল, মুন্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল, ভূমিজ, ভুঁইয়া, কুর্মি, মাহাতো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবী বলে প্রচলিত। তুষ দিয়েই পূজার ডালি সাজানো হয়। বঙ্কিমচন্দ্র মাহাতোর মতে, তুষ থেকে টুসু শব্দটি এসেছে। দীনেন্দ্রনাথ সরকারের মতে তিষ্যা বা পুষ্যা নক্ষত্র থেকে অথবা ঊষা থেকে টুসু শব্দটি এসেছে। আবার মধ্যপ্রাচ্যের প্রজননের দেবতা টৈষুব থেকে টুসু শব্দটি তৈরি হয়েছে বলেও মত আছে।

সারারাত গান শেষে ব্রতীরা ভোরে টুসু ভাসিয়ে মাটির সরায় জল ভরে বাড়ী ফিরে আসে। এই জল হল 'মকর জল'। বাড়ীর সবাই এই জল পান করে। তারপর 'দুবড়ি' ও 'লবড়ি' পিঠা তুসুর নামে উৎসর্গ করে সকলে পিঠে পুলি খায়। হুগলী বর্ধমানে মালসায় ছোলা সহ বিভিন্ন গাছ রোপণ করে 'এঁতো' পূজার চলের সাথে তুসু ব্রতের সাদৃশ্য আছে। মল্লভূমে নাগপঞ্চমীর শেষে জেলে, বাগদী, কেওট, খয়রা

ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে শস্যরোপণ পর্ব শেষে জমিতে 'খইধারা' অনুষ্ঠান পালনের চল দেখা যায়। একই রকমের অনুষ্ঠান 'নল সংক্রান্তি' অনেক জায়গায় প্রচলিত। জেলায় বড় টুসু মেলা বসে পারকুলে। এটি ২৫০ বছরের প্রাচীন মেলা। কংসাবতী নদী তীরের এটি প্রাচীন গ্রাম। নদী তীরের নদী-গুহা এই প্রাচীনত্বের নিদর্শন।

রাঢ়ের সমাজ জীবনে মেলা ও পার্বণগুলির অর্থনৈতিক তাৎপর্য লক্ষ্য করার মত। মেলাগুলির সময় নির্বাচন করা হয়েছিল বর্ষার মত সময় বাদ দিয়ে ও যে সময় লোকের হাতে পয়সা থাকে সেই সময়কে।

## প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার ধারা

হাম্বিরের সমকালে মল্লভূমে বৈষ্ণব ভাবধারার অনুষঙ্গে যে স্বর্ণযুগের সূচনা হয় তার ফলে সংস্কৃত ভাষা ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠতে থকে।[১৪ক] হাম্বিরের গুরু শ্রীনিবাস আচার্যের সাথে আসেন রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজ ভাতৃদ্বয়। তারা ছিলেন শিক্ষিত, পন্ডিত ও পদকর্তা। হাম্বিরের সময়ে বর্তমান শহর বাঁকুড়ার পাঁচ-ছয় মাইল উত্তর-পূর্বে বাঁকি গ্রামের বাসিন্দা জানকীনাথ সার্বভৌম ছিলেন মল্লরাজের সভাপন্ডিত। পরবর্তী কালের কাশীনাথ সার্বভৌমও ছিলেন মল্লরাজ বীরসিংহদেব-দুর্জন সিংহের সভাকবি। পরবর্তীকালে তিনি বিকনা গ্রামে উঠে গিয়ে একটি রামসীতা মন্দির করেন ১৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দে, যা আজ ভগ্নপ্রায় ও নিশ্চিহ্ন।[১৫] এ গ্রামে তাঁর বসতবাড়ীর ভগ্নাবশেষ ও খনন করা কাশীনাথ পুকুর অদ্যাবধি বর্তমান আছে। এই বাঁকি গ্রামটি একটি সংস্কৃত চর্চার পীঠস্থান হিসাবে গড়ে ওঠে। কারণ ঊনিশ শতকের মধ্যভাগেও রুক্মিণীকান্ত বেদান্তরত্ন ও কেদারনাথ ন্যায়রত্ন এই ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। এ সময় এই গ্রামে টোলের সংখ্যা ছিল আট। সম্ভবত কাশী-বারাণসী থেকে শর্মা নাম্নী এক সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত ষোড়শ শতকে বৈষ্ণব প্রভাবিত মল্লভূমে হাজির হন ও পান্ডিত্যের জন্য 'সার্বভৌম' উপাধিতে ভূষিত হন। দ্বিতীয় রঘুনাথ ও গোপাল সিংহের সভাপন্ডিত ছিলেন শুভঙ্কর (রামপুরের জগন্নাথ চৌধুরী)। তিনি গণিত শাস্ত্রে ছিলেন খ্যাতিমান সুপন্ডিত। তাঁর রচিত আর্যা, যা 'শুভঙ্করী আর্যা' বলে পরিচিত ছিল, সারা বাংলায় পঠিত হত। স্বভাবতই মল্লভূমের টোলগুলিতে তাঁর আর্যা পাঠ করা হত গণিতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

প্রথম রঘুনাথ সিংহের আমলে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের জন্য রাজমহল থেকে আনা হয় কমলাকান্ত সার্বভৌমকে।[১৬] অনেকে তাঁকে মল্লভূমের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার

জনক বলে মনে করেন। তাঁর হাত ধরে মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরে চতুষ্পাঠী শিক্ষার প্রবর্তন হয়।

ধার্মিক রাজা গোপাল সিংহের সময়ে (ঊনবিংশ শতকের সাতের দশকে) রঘুনাথ শিরোমণি প্রতিষ্ঠিত টোল খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছিল। এখানকার ছাত্ররা বিদ্যা শিক্ষা শেষ করে বিভিন্ন ভূমরাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে ও তার ফলে বিকেন্দ্রীকৃত চতুষ্পাঠী শিক্ষা ব্যবস্থার জন্ম হয়। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরু শিষ্য পরম্পরা, যতটা সম্ভব আবাসিক এবং নিঃশুল্ক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। শিরোমণি টোলের কৃতী ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন রাখালদাস ন্যায়তর্কতীর্থ, দ্বারকানাথ বেদান্ততীর্থ, গোপীনাথ স্মৃতিতীর্থ।[১৭] গোপীনাথ ১৮৮০ সালে হাড়মাসড়া গ্রামে সারদা চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। গোপীনাথের ছাতনা থেকে আগত ছাত্র হরগোবিন্দ ব্যাকরণতীর্থ সামন্তভূমে বিদ্যার আলো ছড়িয়ে দেন। পাশাপাশি সিমলাপালের সংস্কৃত শিক্ষা আবর্তিত হয় উৎকল ব্রাহ্মণ দ্বারকনাথ ও তাঁর উত্তরসূরিদের দ্বারা। এসময় সিমলাপালের রাজা ছিলেন নটবর সিংহ। তিনি ছিলেন বিদ্যানুরাগী ও লেখক।[১৮]

বাঁকুড়া শহরে এমন বহু চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয়। রামগতি বিদ্যানিধির পাঠকপাড়ায় ১৮৮৯ সালে সীতানাথ চতুষ্পাঠী, ১৮৯০ সালে আশুতোষ বিদ্যারত্ন প্রতিষ্ঠিত হরিনারায়ণ চতুষ্পাঠী, পাঠকপাড়ায় অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের টোল, গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়-কুমুদকান্তি কাব্যতীর্থের টোল, মধুসূদন বাচস্পতির স্কুলডাঙ্গার টোল, দোলতলার চন্দ্রভূষণ ভট্টাচার্যের টোল, শহর সংলগ্ন কেশিয়াকোলের হরিকিষণ রাঠী-অনঙ্গভূষণ গোস্বামীর নৃসিংহ টোল এর উদাহরণ।

অযোধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের অধ্যাপনায় গিরিগোবর্ধন টোল। কেঞ্জাকুড়ার গোপালপুরের সনাতন আশ্রমে অধ্যাপনা করতেন ভগীরথ মিশ্র। বিংশ শতকের প্রথমে ললিতাঙ্গ কাব্য পুরাণতীর্থের প্রতিষ্ঠিত পাত্রসায়ের গ্রামের টোল,১৮৭০ সালে তৈরি লোনাড়া-ভাটপাড়া গ্রামে ব্যাকরণ কেশরীর টোল, তিলুড়ী গ্রামে হারানচন্দ্র স্মৃতিতীর্থের প্রাচীন টোল, ১৯৩০ সালের সোনামুখীতে নলিনীমোহন পাল কাব্যব্যাকরণতীর্থের টোল, পুয়ারায় অমূল্যরতন কাব্যতীর্থের টোল, দুবরাকোণের মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্নের টোল থেকে ইঙ্গিত মেলে গ্রামান্তরে টোল শিক্ষা ছড়িয়ে পড়েছিল। রাইপুর কেন্দ্রিক টোলগুলির মধ্যমণি ছিল বীরভানপুরের বৃষভানু চতুষ্পাঠী, যেটি স্থাপন করেন শ্রীনাথচন্দ্র কাব্যব্যাকরণতীর্থ।

এই পন্ডিত মহল সামাজিক ভাবে শক্তিশালী ছিল। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে বারো জন পন্ডিত রায় দিয়েছিলেন গন্ধবণিকরা নবশাক সম্প্রদায় নয়, বৈশ্য জাতিভূক্ত। এই পন্ডিত দলে ছিলেন বিষ্ণুপুরের রঘুনাথ শিরোমণি, পারুল্যার ন্যায়পঞ্চানন, বামিরার হেমচন্দ্র তর্কতীর্থ, বাঁকুড়া শহরের রামগতি বিদ্যানিধি, মধুসূদন বিদ্যাবাচস্পতি, শশিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, বাঁকির রুক্মিণীকান্ত বেদান্তরত্ন, কেদারনাথ ন্যায়রত্ন, ছাতনার অনন্তলাল বৈদান্তিক, রাজগ্রামের শ্রীনাথচন্দ্র ভট্টাচার্য, আঁচুড়ির রামজীবন ভট্টাচার্য, নড়রার রামদুর্লভ কাবিভূষণ। ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত সারস্বত সমাজের পরিচালক ছিলেন বাণীকন্ঠ ভট্টাচার্য, রামশরণ ঘোষ, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, সত্যকিঙ্কর সাহানার মত পন্ডিত প্রবর ও যশশ্রী ব্যক্তিগণ।[১৯]

শিক্ষা বিস্তারের এই প্রাচীন মাধ্যমটির পাশাপাশি গণস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে সামন্তভূমে বৈদ্যদের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। প্রথম ঐতিহাসিক চরিত্রের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক হাম্বিরের সময়ে মল্লভূমের রামচন্দ্র কবিরাজ। তিনি ছিলেন শ্রীনিবাসের পার্ষদ। রামচন্দ্রের ভাই গোবিন্দ কবিরাজ একই ভাবে মল্লভূমে আসেন। ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় জেলায় পুরুষ কবিরাজ ৮৬ ও মহিলা কবিরাজ ১১ জন।[২০] হাম্বিরের রাজত্বে অনেক খ্যাতনামা কবিরাজের মল্ল রাজধানীতে আগমন ঘটে। এদের মধ্যে নদীয়া থেকে আগত মৌদগল্য গোত্রের 'দাশগুপ্ত' পদবীর কবিরাজ ছিল মুকুন্দ কবিরাজ। তিনি শ্রীনিবাসের শিষ্যত্ব নেন। মল্লভূমে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রখ্যাত কবিরাজ ছিলেন হৃষীকেশ কবিরাজ ও হলধর দাশগুপ্ত। হলধর বাবু ছিলেন রাজা দ্বিতীয় গোপাল সিংহের রাজবৈদ্য। মুকুন্দ কবিরাজের বংশধর সূর্যানন্দের পুত্র আনন্দীরাম কাকিল্যা গ্রামে বসতি স্থাপন করলে এটি কবিরাজ গ্রামের মর্যাদা পায়। বংশ পরম্পরায় এই ধারা অব্যাহত থাকে। আনন্দীরামের পুত্র উৎসবানন্দ, উৎসবের পুত্র হরগোবিন্দ, হরগোবিন্দের পুত্র সচ্চিদানন্দ-হরিপদ এই উজ্জ্বল ধারার কিছু নাম। হরিপদ কবিরাজ ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে বাঁকুড়া শহরে হরগোবিন্দ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় স্থাপন করে এক নতুন ধারার সূচনা করেন। তার পুত্র নবনীরদও এই চিকিৎসা বিদ্যায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। সচ্চিদানন্দ ও হরিপদের ক্রয় করা কাকিল্যা গ্রামে ২৫০ বিঘা করে জমি এই পেশার আর্থিক দিকটাও মনে করিয়ে দেয়। হরিপদ কবিরাজের দুই ছাত্র গোলকবিহারী সেনগুপ্ত ও বিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বুৎপত্তির সাক্ষ্য রাখেন। এছাড়া বালসীর নীলমাধব সেন, নারায়ণ দাশ, বেণীমাধব দাশগুপ্ত, নারায়ণ

দাস, রাজু ভল্লকী; বামিরার বারাণসী গুপ্ত, কৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রী; ছাতনার জীবন কবিরাজ (১৮৫০-১৯২৫), সেন্দ্রার গুপ্ত পরিবার, খাতড়ার মহিমার্ণব সেনগুপ্ত (১৮৬০-১৯২৮), ভেলাইডিহার পঞ্চানন দাশগুপ্ত, রাজগ্রামের গোপাল দাশগুপ্ত, পূর্ণ গুপ্ত (-১৮৮৮), রামব্রহ্ম কবিরাজ, ভেদুয়া গ্রামের সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মালিয়াড়ার রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, ইন্দপুর-গোকুলনগরের হাড় জোড়ায় অভিজ্ঞ কবিরাজ, বিষ্ণুপুর-কৃষ্ণগঞ্জের কর্মকার শল্যবিদ, ভড়ার কর্মকার চক্ষু চিকিৎসকমন্ডলীর মাধ্যমে রাঢ়ের এই ভূম রাজ্যগুলিতে এক উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। কোম্পানী শাসনেও বাঁকুড়ায় জেলের সরকারী চিকিৎসক হিসাবে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদেরই ভরসা করেছেন। ১৮০৮ সালে রামচন্দ্র কবিরাজ ও ১৮২১ সালে গোবর্ধন কবিরাজ এমন দুই সরকারীভাবে নিযুক্ত কবিরাজ। এই কবিরাজদের অধিকাংশই উন্নত মানের চিকিৎসা গ্রন্থও প্রণয়ন করেছিলেন।[২১] গণিত শিক্ষার প্রসারে শুভঙ্করী আর্যা বড় ভূমিকা নিয়েছিল। গোপাল সিংহের আমলে রামপুরের শুভঙ্কর ছাড়াও ছাতনায় তিনজনের শুভঙ্করী আর্যা লেখার সমাচার পাওয়া যায়। এদের একজনের নাম ছিল ভবানী মিত্র।[২১ক]

## দুর্ভিক্ষ ও ত্রাণকাজে ভূমরাজাদের ভূমিকা

বিভিন্ন সরকারী নথি ও সমকালীন সমাচারপত্র থেকে জমিদারদের অনাবৃষ্টি ও অনটন-দুর্ভিক্ষে জমিদারদের অবদানের কথা কিছুকিছু জানা যায়। সিমলাপালে দুর্ভিক্ষের ত্রাণকাজে সরকারের পাশাপাশি জমিদারেরও যোগদান ছিল। জেলাশাসক জে ই ম্যানিষ্টি বর্ধমান ডিভিসনের কমিশনারকে ১৭/০৯/৯৭ তারিখে ১২৩৯-জি স্মারক সংখ্যায় যে পত্র লিখেছিলেন তার থেকে জানা যায় সিমলাপালে ত্রাণশিবির চলেছিল ১৬/০৭/৯৭ থেকে প্রায় দুই মাস ০৫/০৯/৯৭ পর্যন্ত। সিমলাপালে আগষ্ট মাসে চালের সংকট তীব্র আকার নিলে চালের দাম দাঁড়ায় টাকায় আটসের। বিচলিত সিমলাপাল জমিদার নটবর সিংহ মেদিনীপুর জেলা থেকে জমিদারির অর্থে চাল আমদানি করে নিরন্ন প্রজাদের মধ্যে বিলি করেন। সিমলাপাল, ভেলাইডিহা ও কুচিয়াকোলের জমিদাররা (যথাক্রমে রাজা নটবর, রাজা প্রাণবল্লভ, রাজা রাধাবল্লভ সিংহ) দুর্ভিক্ষ পরবর্তী সময়কালে চাষীদের বিনামূল্যে বীজ সরবরাহ করতেন (সূত্র : Annual General Administration Report, Burdwan Division – 1885-86 – Jun 1886– p.86.)। ১৯৩৬ সালের দুর্ভিক্ষজনিত অনটনের সময় মালিয়াড়ার

রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ চন্দ্রাধ্বর্যু প্রজাদের মধ্যে ৪১ মণচাল বিতরণ করেছিলেন (সূত্র ঃ বাঁকুড়াদর্পণ, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬)। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে সিমলাপাল জমিদার মদনমোহন সিংহচৌধুরী প্রজাদের অন্ন-বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিলেন বলে জানা যায় (সূত্র ঃ বাঁকুড়াদর্পণ, ১লা অক্টোবর, ১৯৪৩ সংখ্যা)। ১৯১৫-১৬ সালের দুর্ভিক্ষের সময় অম্বিকানগরের দখলী জমিদার চন্দ্রশেখর সরকার প্রজাদের ৬০০০ টাকার চাল বিতরণ ছাড়া ও ভূমিকরের সুদমুকুব, পরবর্তী বছরের চাষের জন্য বীজধান ও মূলধন দিয়ে সাহায্য করেন (সূত্র ঃ প্রবাসীপত্রিকা, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ অগ্রহায়ণ সংখ্যা, পৃঃ ১১৭)। ১৮৯৬ সালের ২৬ শে নভেম্বর বোর্ডঅব রেভেন্যুকে বর্ধমান বিভাগীয় কমিশনার স্টিভেন সনের লেখা প্রতিবেদন থেকে জানা যায় বাঁকুড়া জেলার ১০৫৩ বর্গমাইল এলাকায় অনাবৃষ্টিজনিত কৃষক দুর্গতি রুখতে বীজধান ও বলদের জন্য ঋণদানের ব্যবস্থার করা হচ্ছে। ১৮৯৬ সালের অনটনের সময় কালেক্টর ম্যানিষ্ঠি ১০৪৭৪ টাকার ভূমি উন্নয়ন ঋণের আবেদনের মধ্যে মাত্র ৩০০০ টাকা মঞ্জুর করেন। ১৮৯৭ সালে ৩১২ জন এমন আবেদনকারীর ২৮৫ জন ঋণ পান জনপ্রতি ১৩ আনা ৭ আনা ৬ পয়সা হিসাবে। ফেমিন কোডের ৩০(গ) ধারা অনুসারে সিমলাপালের রাজা নটবর ও ভেলাইডিহার রাজা প্রাণবল্লভ জলসেচের উদ্দেশ্যে জলাশয় খননের জন্য সরকারের কাছে ৩০০০ টাকা অনুদানের আবেদন করলে ১০০০ টাকা বরাদ্দ পান। আর আটজন কৃষককে দেওয়া হয় ১৫০৫ টাকা ঋণ। ১৮৯৭ সালে বিভাগীয় কমিশনার বাঁকুড়া জেলার জন্য চার শতাংশ সুদে পাঁচ বছরে পরিশোধযোগ্য কৃষিঋণ ৫১৮৭২ টাকা ও জমি উন্নয়ন ঋণ ১৭৩৩৭ টাকা বরাদ্দ করেন। সরকারি নথি থেকে বোঝা যায় জমিদারেরা এ সময় ত্রাণ কাজে তেমন এগিয়ে আসেননি। কারণ আর্থিক দুর্গতি ও গুদামজাত শস্য বাজেয়াপ্ত হওয়ার আশঙ্কা। এদিকে দুর্গতরা রায়তরা বিত্তবানদের সম্পদ লুঠের জন্য গোপনে একজোট হচ্ছিল রাইপুর, ইন্দপুর ও খাতড়ার বিভিন্ন গ্রামে (সূত্র :জেলা ইন্টেলিজেন্স বিভাগের ১৫/০৩/৪৩ ও ০৩/০৪/৪৩ তারিখের গোপন সাপ্তাহিক প্রতিবেদন)। এসময় সেচের উন্নয়নে সিমলাপালের জমিদার কুলিক খাল খনন করেন ও সেচসেবিত জমিতে বিঘা প্রতি ৪-৭ পাইধান আদায়ের বিনিময়ে নিয়মিত খালসংস্কার করার রীতি প্রচলন করেন। রাজা লক্ষ্মণ সিংহ চৌধুরী এই কাজ চালিয়ে গেলেও কর অনাদায়ের কারণে পরবর্তী রাজারা নিয়মিত খাল সংস্কারে অনাগ্রহী হয়ে পড়েন। মদনমোহন সিংহচৌধুরীর সময়ে এটির গভীরতা কমে যায় এবং ১৯৩২-৩৩ সাল

নাগাদ এটি জলসেচের ক্ষেত্র অকার্যকরী হয়ে পড়ে (সূত্র ঃ রামকৃষ্ণদাস, বাঁকুড়া জেলার কৃষি ও সেচব্যবস্থা, লোকমত, প্রথমসংখ্যা, ১৩৫৪ বঙ্গা, পৃঃ৫৭-৫৮)। কৃষিক্ষেত্রে ঋণের যোগান নিশ্চিত করতে কৃষি সমবায় ব্যাঙ্ক তৈরির লর্ডকার্জনের নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে জেলাশাসক জে এন গুপ্তা ১৯০৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী নিজ বাসভবনে এক সভা আহ্বান করেন। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমানররাজ, মালিয়াড়ার রাজা রাজনারায়ণ, সিমলাপাল রাজপরিবারের যাদবেন্দ্র, কুচিয়াকোলের জমিদার যোগেন্দ্র সিংহ, অযোধ্যার অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-রামবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, পলাশডাঙ্গার ডাক্তার কালীনাথ চট্টোপাধ্যায় সহ বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তি। অযোধ্যা (কাচকা), মালিয়াড়া ও পলাশডাঙ্গাতে উপস্থিত প্রতিনিধিদের উদ্যোগে তিনটি সমবায় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। এইভাবে রাজ উদ্যোগে দুর্গত কৃষিসমাজকে স্বস্তি দেওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে।

## কৃষিসমাজের ভাঙ্গন, দারিদ্র ও শেষ কথা

বিভিন্ন ভূমরাজ্যে কৃষক সমাজ চারটি স্তরে বিভক্ত ছিল। (১) রাজপরিবার ও তার অনুগৃহীত শ্রেণী (২) ব্রাহ্মণ সমাজ (৩) ঘাটোয়াল ও অন্যান্য চাকরাণ জমি ভোগী (৪) মন্ডল-গ্রাম মুখ্যা ও তার অধীনস্থ অসংখ্য চাষী। রাজা ভোগ করতেন নিষ্কর জমি, রাজকীয় পাট্টায় ব্রাহ্মণকুল ভোগ করত নিষ্কর ভূমি। ঘাটোয়াল সহ সেবা জমির মালিকরা পঞ্চকি (অল্প ভূমিকর) জমা দিত। মন্ডলরা কিছু নিষ্কর বা অল্প করের জমি ভোগ করলেও, তাদের দখলে থাকত প্রচুর জমি। মন্ডলরা ছিল রায়ত ও জমিদারদের মধ্যে যোগসূত্রকারী। রায়তরা রাজাকে ভূমি রাজস্ব জমা দিত। মাঠে চাষ করত মাহিন্দর-গতানো মুনিষ-ক্ষেতমজুর। ক্ষত্রিয়ত্বে বিশ্বাসী রাজপুরুষ ও হাল ধারণে শাস্ত্রীয় নিষেধাজ্ঞার কারণে ব্রাহ্মণরা সরাসরি চাষে অংশ নিত না। মাটির কাছাকাছি ছিল মন্ডল-মুখ্যা ও রায়তরা। চার প্রকার ভূমি ব্যবহারের নজির দেখা যায়। রাজা, রাজপুরুষরা ছিলেন ভূম্যধিকারী। ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, ঘাটোয়াল, সেবা জমির অধিকারী, রাজকর্মচারী, বৈদ্য, মন্ডল, বড় জোতের অধিকারীরা ছিলেন ভূমিস্বত্ত্বভোগী। এর বাইরে বড় অংশই হল নির্দিষ্ট অধিকারের ভিত্তিতে কর প্রদানকারী প্রকৃত হালধারী চাষী ও জমির উপর অধিকারহীন কিন্তু চাষে নিয়োজিত ভাড়াটে মুনিষ —মাহিন্দার-ক্ষেতমজুর। এই দীন মজুর বা বাঁধা ভৃত্য শ্রেণীর মানুষরা ছিল বাউরি-বাগদি-লোহার-মোদি/কোড়া-খয়রা-সাঁওতালদের মত নিম্নবর্ণীয় শ্রেণী।

ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে জঙ্গল থেকে কৃষি জমি তৈরির উৎসাহ দেওয়া হত ঔপনিবেশিক শাসনের শুরু থেকেই। ভূম রাজত্বে ঘাটোয়ালরা একাজে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। ক্রমে সদগোপ জাতিভূক্তরা একাজে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। মেষপালক এই জাতির মানুষরা চালের ব্যবসা ছাড়াও জমির ভোগ দখলেও বড় ভূমিকা নেয়।

ইংরেজ আগমনের আগে পর্যন্ত রাঢ় বাঁকুড়ায় ভূমরাজ্যের সংখ্যা ছিল মাত্র এগারোটি। এগুলি হল (১) মল্লভূম (২) সামন্তভুম (৩) ধবলভূম (৪) তুঙ্গভূমের অংশ শ্যামসুন্দরপুর (৫)তুঙ্গভূমের অংশ রাইপুর (৬)তুঙ্গভূমের অংশ সিমলাপাল (৭) শ্যামসুন্দরপুর থেকে সৃষ্ট ফুলকুসুমা (৮) সিমলাপাল থেকে সৃষ্ট ভেলাইডিহা (৯) পূর্বতন মল্লভূম থেকে সৃষ্ট স্বতন্ত্র মালিয়াড়া (১০) শিখরভূমের অংশ মহিষাড়া পরগণা (১১) সুপুর-খাতড়া কেন্দ্রিক ধবলভূম থেকে সৃষ্ট অম্বিকানগর। ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের পর কোম্পানী শাসনের সূচনা হতে থাকে। সময়ের সরণি বেয়ে বার্ষিক নিলাম, পাঁচশালা বন্দোবস্ত, দশশালা বন্দোবস্ত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত ভূমি ব্যবস্থা তৈরি ছিল ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। সূর্যাস্ত আইনের কোপে অর্থাৎ বছরের নির্ধারিত শেষ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ রাজস্ব পরিশোধ না করলে অপরিশোধিত রাজস্ব আদায়ে জমিদারির অংশ নিলামের রীতি চালু হলে প্রাচীন রাজবংশগুলো ধ্বংশের দিকে এগিয়ে যায়। তৈরি হয় অজস্র ভূম্যধিকারি বা জমিদারি। ১৮৬৮-৬৯ খ্রিষ্টাব্দের একটি ব্রিটিশ পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে রাঢ় বাঁকুড়ার বিভিন্ন ধরণের অজস্র জমিদারির মধ্যে (১) পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি রাজস্ব প্রাদানকারী সুবৃহৎ জমিদারি এস্টেট হল দুইটি। এদের অন্তর্গত গ্রাম সংখ্যা ছিল ৫৩৪৪৮৩ একরের ৪২ টি। (২) পাঁচ হাজার টাকার বেশী রাজস্ব প্রদানকারী বড় জমিদারি এস্টেট ছিল চারটি। অন্তর্গত গ্রাম সংখ্যা ১১৭১৫৭ একরের ১৫০ টি। (৩) ক্ষুদ্র জমিদারির সংখ্যা ৮৯৬। এগুলি ছিল সমসংখ্যক গ্রাম নিয়ে, মোট ২০৫৪১২ একরের। (৪) চিরস্থায়ী ভিত্তিতে নিষ্কর বন্দোবস্ত ছিল ৩৭৫। সমসংখ্যক গ্রাম নিয়ে এগুলির আয়তন ছিল ৬৩৭৫ একর। (৬) আদলতের ডিক্রীতে ভূমিকর আদায়ের অধিকার প্রাপ্ত বন্দোবস্ত ছিল ১১ টি। ১৮ একরের ১১ টি ছোট গ্রামে। (৭) সরকার প্রদত্ত বন্দোবস্ত ছিল ১২৮৮ টি। ব্যাপ্ত ছিল ৮৬৩৪৪৫ একরের ১৮৬০ গ্রামে।[২২]

ভূম্যধিকারীদের অধিকার লাভের এই খতিয়ানের পাশাপাশি রায়তের দখলি স্বত্ত্বের পরিমাণ ছিল নৈরাশ্যজনক। ১৮৭১ সাল পর্যন্ত আদালতের রায় বলে ১৮

জন চাষী দখলী স্বত্ত্বের ভিত্তিতে ও মাত্র ২৬ জন খাজনা বৃদ্ধি করা যাবে না এমন শর্তে ভূমি মালিকানা ভোগের অধিকার পেয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগেই মল্লভূমের প্রায় সবটাই বর্ধমান রাজার হস্তগত হয়ে গিয়েছিল। এই অনাবাসী জমিদাররা আবার ভূমিরাজস্ব আদায়ের উপায় হিসাবে চিরকালীন ইজারা ব্যবস্থা চালু করে। এতে যেমন নিজস্ব কর্মচারী নিয়োগ, কাছারি বাড়ি তৈরি ও তার রাহা খরচ এড়ান গিয়েছিল, তেমনই বার্ষিক নির্দিষ্ট টাকা আদায় দেওয়ার বিনিময়ে পরিমিত জমি তুলে দিয়ে রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা গিয়েছিল। এরা ছিল ভোগদখল স্বত্ত্বের পত্তনিদার, যে অধিকার ছিল বংশানুক্রমিক ও হস্তান্তর যোগ্য। বাঁকুড়ায় বর্ধমান রাজার এমন পত্তনিদার ছিল ৪৩১। এরা মূলত উচ্চবর্ণের ভদ্রলোক। তবে রায়ত, ব্যবসায়ী ও নিম্নবর্ণের মানুষ পত্তনিদার হতেন না, এমন নয়। যদিও সংখ্যায় কম। এই সব পত্তনিদাররা অধিকারের একাংশে একই ভাবে কাউকে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিলে তাকে বলা হত দরপত্তনিদার। দরপত্তনিদারের অধীনে থাকত সে-পত্তনিদার। প্রতিটি স্তরে অতিরিক্ত লাভের আশায় অতিরিক্ত আদায়ের ঝোঁক থাকায় মোট সংযুক্ত চাপ এসে পড়ত নিচের চাষীদের উপর। ফলে পত্তনি ব্যবস্থায় চাষীদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে।[২৩] কিন্তু নিশ্চিত আয়ের কারণে এই প্রথাকে ব্রিটিশ শাসকরা মান্যতা দেন ১৮১৯ সালের ৮ নং রেগুলেশনের বলে।

বাঁকুড়া জেলায় পত্তনিদার-তালুকদারদের জাতিগত বিশ্লেষণে দেখা যায় বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের এ কাজে প্রাধান্য ছিল। তাছাড়া ছিল বৈদ্য-কায়স্থ-সদগোপ —উগ্রক্ষত্রিয়-গন্ধবণিক-সুবর্ণবণিক-মাড়োয়ারী-মুসলিম। এদের বেশির ভাগই ছিল শিক্ষিত ভদ্রলোক। অনেকেই শহরবাসী। অনেকেই অন্য বৃত্তির ও শ্রমবিমুখ। হাতেনাতে চাষ না করার ফলে জমিতে নিযুক্ত প্রকৃত মাঠচাষী ছিল বাউরি-বাগদি-সাঁওতাল ক্ষেতমজুর। আর সদগোপ, তিলি, তাম্বুলি, গোয়ালা, আগুরি, মাহিষ্য সম্প্রদায়ের মানুষরা ছিলেন মোকাবরী রায়তী স্বত্ত্বভোগী। এরা জমি নিজেরা চাষ করলেও এদের চাষে সাহায্য করত বাউরি-বাগদি-সাঁওতালদের মত ক্ষেতমজুর। সাধারণ রায়তরা জমি চাষ করত নিজেরা। তবে 'ভদ্রলোক' রায়তরা জমির একাংশ (খামার) নিজেদের তত্ত্বাবধানে রেখে বাকি অংশে ভাড়াটে মজুর দিয়ে চাষ করাত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ রাঢ় বাঁকুড়ার মোট জমির ২৩ শতাংশ ছিল মালিক ও মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের আর বাকি ৪৬ শতাংশ ছিল রায়ত ও অধস্তন রায়তদের।[২৪] অনাবাদী জমি ও জঙ্গলের উপর অধিকার ছিল জমিদারের।

স্পষ্টতই অধিকারহীন শ্রমিক ও ভাগচাষীর সংখ্যা ছিল জেলায় যথেষ্ট। ক্রমাগত কৃষক আন্দোলন ও কৃষক দুর্দশার মুখে ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন বলবৎ করে কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা হয়। এই আইন মোতাবেক একাদিক্রমে বারো বছর চাষী এক জমিতে কৃষিকাজ করলে জমির উপর চাষীর স্বত্বাধিকার জন্মাবে। খাজনা বৃদ্ধি ১৫ বছর অন্তর করা যাবে। এই বৃদ্ধি আবার ১২.৫ শতাংশের বেশি হবে না। এইসব আইনি সুরক্ষার ফলে জমি যার লাঙ্গল তার নীতি অনেকাংশ রূপায়িত হয়। অবশ্য অধস্তন ভাড়াটেদের জমি ভাড়া দেওয়ার ঘটনাও ছিল। বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে বাঁকুড়ায় এমন ভাড়াটে রায়ত ছিল ৪ শতাংশ। প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের আগেই বহিরাগত মহাজনদের কাছ থেকে ঋণজালে বিদ্ধ নিম্নবর্ণীয় রায়তরা ক্রমাগত জমি হারাচ্ছিলেন। ১৯৩৮-৪০ সালের মধ্যে আয়োজিত জেলায় ভূমিরাজস্ব কমিশনের একটি নমুনা সমীক্ষা থেকে জানা যায় বড় ভূস্বামীদের মধ্যে ১০ একরের বেশি জমি ছিল ১০.৩ শতাংশ, ৫-১০ একর ১৪.৮ শতাংশ, ৪-৫ একর ৪.৫ শতাংশ, ৩-৪ একর ৭.৮ শতাংশ, ২-৩ একর ৮.৯ শতাংশ ও ২ একরের কম ৫৩.৭ শতাংশ। অবশ্য ও'ম্যালীর ভাষ্যে এই সব জোতদারদের একাংশ ছিল আদপে ভাগচাষী বা ভাগজোত জমির মালিক। কারণ নির্দিষ্ট খাজনা দেওয়ার শর্তে একবছর ও এক মরশুমের জন্য ভাগদখলী স্বত্বে এরা জমি চাষ করত। সাধারণত ফসলের অর্ধাংশ খাজনা হিসাবে দিতে হত। ভাগ-জোতদার চাষীকে দিত গরু-লাঙ্গল, এমনকি সাধারণ ভাবে বীজ ও সার। পেত অর্ধেক ফসল ও খড়।[২৫]

ভূম রাজত্বে জমিদারদের সাথে রায়তদের সম্পর্ক ছিল মোটের উপর মধুর। রায়তরা যেমন পূণ্যাহ উৎসবে জমিদার বা জমিদার প্রতিনিধিদের হাতে বকেয়া রাজস্ব তুলে দিত, তেমনি জমিদাররাও সমস্যামুক্ত কৃষিকাজের স্বার্থে পুকুর ও খাল খনন, সেচের ব্যবস্থা, পাঁক পরিষ্কার, বীচ-সার প্রদান, মূলধন সরবরাহের বিষয়ে রায়তদের যথা সম্ভব সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত। দুর্গাপূজা সহ বিভিন্ন ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন করে প্রজাদের বিনোদন ও চর্চা অব্যাহত রাখত। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রেও অনেক জমিদার এগিয়ে এসেছিল। ঔপনিবেশিক শাসনে ডাকের জমিদাররা এই ভূমিকাগুলি পালনে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। ফলে সেচের উৎসগুলি মজে যাওয়া, চাষের কাঁচা মাল ও মূলধনের যোগান পরিমিত হয়ে যাওয়ার ফলে চাষ ও চাষীর বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল। তার

প্রভাব পড়েছিল কৃষি উৎপাদনে।

ঔপনিবেশিক শাসনের ভূমি ব্যবস্থায় মন্ডলী প্রথা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।[২৬] সাঁওতাল, ভূমিজ ও মাহাতোরা জঙ্গল পরিষ্কার করে জমিদারের অনুকূলে জমি হাসিল করে প্রথম দিকে নিষ্কর ও পরে গোষ্ঠীপতির মাধ্যমে সব উপজাতি বা অর্ধউপজাতির হয়ে গোষ্ঠীভূক্ত জমির রাজস্ব জমা দিত। রাইপুর ও ছাতনা পরগণায় ইংরেজের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই এই ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। অম্বিকানগর, সুপুর, ফুলকসুমা, শ্যামসুন্দরপুর, সিমলাপাল একসময় ছিল প্রায় সমস্তটাই বনভূমি, যা পরিষ্কার করে বাসযোগ্য ও চাষ যোগ্য করে তোলাতে এই মন্ডলী প্রথার বড় ভূমিকা ছিল। গ্যাসট্রেলের হিসাবে ১৮৫৪-৫৬ সালের জেলার মোট পতিত জমি যেখানে ছিল ৩৮.৬২ শতাংশ, ১৯১৭-২৪ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছিল ৩১ শতাংশ।[২৭] পাঁচ-ছয় দশকে প্রায় সাত শতাংশ জমি পতিত থেকে আবাদী হওয়ার পেছনে মন্ডলী প্রথার অবশ্যই অবদান ছিল। ১৯০৯ সালের ম্যাকালপিন প্রতিবেদনেও তার সমর্থন মেলে। ছাতনা পরগণায় রাজানুকূল্যে সাঁওতালদের অবস্থা ছিল ভালই। ক্রমে ঔপনিবেশিক কালবেলায় এদের জমিচ্যুতি ঘটতে থাকে। এর বড় কারণ ছিল জমির উপসামন্তীকরণ। মোকাবরী স্বত্ত্বের জমির উপর শোষণের অভিঘাত ক্রমে তীব্রতর হতে থাকে। বিভিন্ন ভাবে সাঁওতাল জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। যেমন, পতিত জমি হাসিল করার জন্য (১) ক্ষতিপূরণের দাবিতে দেওয়ানী মামলা, (২) গাছকাটার অভিযোগে ফৌজদারী মামলা,(৩) অকর্ষিত জমির মালিকানা দাবি করে স্বত্ত্বস্বামিত্বমূলক মামলা, (৪) বর্ধিত খাজনার দাবিতে মামলা।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ক্রমাগত মন্ডলী ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে থাকে। বিশেষত বহিরাগত অর্থবান ও মহাজনদের চাপে বা কোথাও কোথাও ঘাটোয়ালদের তৎপরতায়। ঋণ জালে ক্রমেই আদিবাসীরা জর্জরিত হয়ে পড়ে। সুদের হার ছিল মাত্রা ছাড়া। নগদ ঋণের ক্ষেত্রে সাধারণত এই হার ছিল ২৫ শতাংশ। অন্যান্য হার ছিল টাকা প্রতি ৪.৫ আনা। দক্ষিণ বাঁকুড়ায় সুদের হার ছিল প্রতি মাসে টাকা প্রতি দু'পয়সা। সাঁওতালদের ক্ষেত্রে শস্য ঋণের ক্ষেত্রে সুদ নেওয়া হত ৫০ শতাংশ হারে। ধান বীজের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ এবং দুই ক্ষেত্রেই চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ নেওয়া হত। গ্রামাঞ্চলে মহাজনরাই ছিল ধান-চালের কারবারী। তারা চাষীদের বীজ, ধান, চাল ও অর্থ ঋণ দিত। ম্যাকালপিনের ১৯০৯ সালের পর্যবেক্ষণ অনুসারে দ্রব্য ঋণের উপর সুদ ছিল ৫০ শতাংশ। নগদ অর্থে বন্ধকী ঋণের উপর সুদের হার ছিল ২৪ শতাংশ।

বিনা বন্ধকে ৬০-১০০ শতাংশ। ১৯০৮ সালে ও'ম্যালী দেখেছিলেন, পিতল-কাঁসা-তৈজসপত্র বন্ধক দিয়ে সুদ নেওয়া হত ১২-১৮ শতাংশ। অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক নিয়ে বড় ঋণের ক্ষেত্রে এই সুদের হার ছিল ১৮-২৪ শতাংশ। স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দিলে ঋণ মিলত ৯-১২ শতাংশ সুদের শর্তে। মুচলেকা দিয়ে ক্ষুদ্র কৃষি দাদনের ক্ষেত্রে সুদের হার ছিল ১৮-৩৬ শতাংশ। শস্য ঋণের প্রচলিত সুদের হার ছিল এক চতুর্থাংশ। ১৯২৯ সালে মহাজনী ঋণের সুদের হার ছিল ১৫-৩৭.৫ শতাংশ।[২৮]

দক্ষিণ বাঁকুড়ায় এই মহাজনী কারবারে ছিল উড়িষ্যা আগত ধনী মহাজন সম্প্রদায়। এরা উপজাতীয়দের কাছে 'দিকু' নামে পরিচিত ছিল। ১৮৩৯ সাল নাগাদ ব্রিটিশ প্রশাসন, মন্ডলী প্রথায় জমিদার-মন্ডলী রায়তদের তিক্ততা অবসানে উভয়ের অধিকার নির্দিষ্ট করে দেয়। কিন্তু আদিবাসী ও অর্ধ-উপজাতীয়দের হাত থেকে জমি, মহাজন ও ভূস্বামীদের হাতে চলে যাওয়া চলতেই থাকে।[২৯] 'দিকু'দের ঋণের ফাঁদ ছিল মারাত্মক। এই মহাজনী শোষণের অস্ত্র ছিল উচ্চ হারের সুদ, চক্রবৃদ্ধির ব্যবস্থা, ভুল হিসাব, গোলদারি দোকানে বাটখারায় কারচুপি ও বীজ-সার দেওয়ার সময় এক রকম ও শস্যে ঋণ শোধের সময় আরেক বাটখারা ব্যবহার। অশিক্ষিত এই কৃষকদের নানা অসাধু মুচলেকা ও অর্পণনামায় সই করিয়ে এই শোষণ যন্ত্রকে কদর্য রূপ দেওয়া হয়েছিল। ১৯০৯ সালের ম্যাকালপিন প্রতিবেদনে এর বিস্তৃত খতিয়ান আছে। শ্যামসুন্দরপুর, ফুলকুসুমা ও ছাতনা পরগণায় এই ভূমিচ্যুতির ঘটনা ছিল ব্যাপক। শ্যামসুন্দরপুর, ফুলকুসুমায় তা দাঁড়িয়ে ছিল ৫০-৭৫ শতাংশে। এই উপজাতীয় দুর্দশা নিরসনে সরকার ১৯১৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ত্ব আইনের সংশোধন করে জেলাশাসকের অনুমতি ছাড়া উপজাতীয়দের জমি অনুপজাতীয়দের হাতে হস্তান্তর নিষিদ্ধ করে। তবে এই আইন প্রণীত ও রূপায়িত হওয়ার আগেই ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গিয়েছিল। এর সাথে যোগ হয়েছিল প্রাক-ব্রিটিশ 'ঋণের দায়ে জমি বিক্রয়ের অধিকার' না থাকার নিয়ম প্রত্যাহারের কুফল। জমিদাররাও ব্রিটিশের এই নীতির বিরোধিতা করেছিলেন, কারণ জমির রায়ত নির্বাচনের নিরঙ্কুশ অধিকার তারা হারাতে চায়নি। কিন্তু এই নতুন নিয়মের ফাঁকে মহাজনদের জমি কেনার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। রায়ত ঋণজালে জড়িয়ে পড়ে ক্রমেই জমি হারাতে থাকে। ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ত্ব আইনে বারো বছর একটানা দখলে থাকলে রায়তদের ভূমির উপরে যে স্থায়ীত্বের অধিকার দেওয়া হয়েছিল, তা এড়াতে অনেক চাষীকে ঘন ঘন জমিদাররা উচ্ছেদের পথে যান। ১৯১৭-২৪ সালের সময়সীমায় জেলায় ভোগদখল স্বত্বের জমি ছিল

৭৮৫৭৩৬ একর, যেখানে মহাজন ও ভূস্বামীদের হাতে থাকা জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৩৯৪০২৩ একর।

ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট কিন্তু বাস্তবে ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা ছিল জেলায় প্রচুর। যেমন ভাগদার (এই ধরণের ভাগচাষীর ভোগ দখল স্বত্ত্ব ছিল না বা স্বীকার করা হত না), কৃষাণ (উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ মজুরি হিসাবে পাওয়ার শর্তে বাঁধা মজুর), মুনিষ (দিনমজুর) ও মাহিন্দার (ক্ষেতের চাকর)। হয়ত এদের কখনও কখনও নিজস্ব ক্ষুদ্র সব্জি বা ধান জমি থাকত, কিন্তু এরা ছিল মূলত ভূমিহীন। মহাজন ও ভূস্বামী শ্রেণী এদের দিয়ে জমি চাষ করাত। ১৯২১ সালের আদম সুমারি প্রতিবেদন অনুসারে ভূস্বামী, চাষী ও মজুরের অনুপাত ছিল ৪.১৮ : ৬৮.৩৯ : ২৭.৪৩। রবার্টসনের প্রতিবেদন (১৯২৪) অনুসারে কৃষিতে নিয়োজিত ছিলেন মোট ৮০৫১৭০ জন, তার মধ্যে ২১৫২৩৪ জন (২৭ শতাংশ) ছিল ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। পূণ্যাহের সময় ভূমিমালিকদের সাথে কিষাণ-মাহিন্দারদের ক্ষেত মজুরির চুক্তি হত। ১৮৭৮ সালে হান্টারের মতে এই মজুরি ছিল বছরে ২০-৩৬ টাকা। বীজ-বলদ-শ্রম দিলে তারা পেত উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ।

মন্ডলী প্রথার বা অন্য উচ্ছিন্ন রায়তদেরই মহজন কঠিন শর্তে ছেড়ে আসা জমিতে চাষ করাত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই সাজা আদায় ছিল উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক। ক্ষতিগ্রস্ত এই সাজা চাষীদের বেশির ভাগই ছিল সাঁওতাল, ভূমিজ, মাহাতো, বাগদি, বাউরি, ডোম জাতিভূক্ত। সরকারী প্রতিবেদনে দেখা যায় রায়তী জমির এক চতুর্থাংশই সাজা চাষীতে পরিণত হয়েছিল। ১৯১৭-২৪ সালের সেটেলমেন্ট প্রতিবেদনে জমি মালিকানার যে চিত্র উঠে এসেছে তাতে দেখা যায়, জেলার মোট জমির অর্ধেক আছে জমিদারির অধিকারে, মাত্র চার শতাংশ আছে রায়তের দখলে, ১৬ শতাংশ ফসলে সাজা দেওয়া চাষীর, ৯ শতাংশ ফসলে ও নগদে সাজা দেয় এমন চাষীর দখলে। পলাশবনী গ্রামে ১৮৮৯ সালে দশ বছরের জন্য ২১ টাকা খাজনায় যে জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছিল, ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রদত্ত মোকাবরী স্বত্বে সে জমির খাজনা দাঁড়ায় নগদ ৭৪ টাকা ও সাথে এক সের ঘি, এক সের কাগ, আট সের কলাই, আট সের বাজরা ইত্যাদি। ১৯০৯ সালে সে খাজনা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল নগদে ১৩৪ টাকা। মহাজন-ভূস্বামীরা ভুল বুঝিয়ে অশিক্ষিত সাঁওতালদের খাজনা বৃদ্ধি ও বকেয়া ঋণ, হস্তান্তর সংক্রান্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করে নিবন্ধীকৃত দলিলে সই করিয়ে নিত। আদিবাসী জমি হস্তান্তরের জন্য কালেক্টরের কাছে অনুমতি চেয়ে

দরখাস্ত জমে পড়েছিল ১৯২৪-২৫ সালে ৩০ টি ও আগের বছরের ২টি, যার ১৩ টি অনুমতি পেয়েছিল, ৮টি বাতিল ও ১১ টি তদন্তাধীন ছিল।[৩০] এই সম্প্রদায়ের ভূমিচ্যুতি বোঝা যায় এক মহাজন ভূমি-মালিকের জবানবন্দী থেকে। ১৮৯৫ সাল থেকে তার দখলে এসেছিল ১২০ বিঘার মত সাঁওতাল জমি। ১৯০৬ সাল নাগাদ সাঁওতালদের ভূমিচ্যুতির এমন সংখ্যা ছিল মোট ৩৮০ টি, যার মধ্যে বিক্রি ১৩৭টি, আদালতের রায়ে ২২ টি, বন্ধকের মাধ্যমে ১৭৪ টি। ৩০ শতাংশ ক্ষেত্রেই মহাজনেরা একতরফা রায় পেতেন। রাইপুরের দেওয়ানী আদালত ও খাতড়ার মুন্সেফ আদালতে এমন প্রচুর মামলা জমা হত। রাইপুর, অম্বিকানগর, খাতড়া পরগণায় এই ভূমিচ্যুতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। জমিচ্যুতির পেছনে ঋণজালের এক বিষচক্র গড়ে উঠেছিল। তার পেছনে ছিল অভাবের তাড়না, শস্যঋণ অপরিশোধ্য হওয়া, আরোপিত দেওয়ানী-ফৌজদারী মামলা খরচ চালাতে ঋণ গ্রহণ। ১৯০৯ সালে এমন অভাবী বা জোরবিক্রির ক্ষেত্রে চারভাগের একভাগ ক্ষেত্রেই জমির দাম ছিল বিঘা প্রতি ১০ টাকা বা তার কম।[৩১]

সাঁওতাল জনজীবনে, ভৌমরাজ শাসনে ও ঔপনিবেশিক শাসনে ধর্মীয় টানাপোড়েন কম ছিল না। ভৌমসময় কালে হিন্দু ধর্মের প্রতি রাজানুকূল্য প্রজাজীবনকে প্রভাবিত করেছিল। সাঁওতালরা সাবেক প্রজননবাদী, প্রকৃতিবাদী ও স্রষ্টা উত্তরপুরুষবাদী পূজা অর্চনা ছেড়ে আর্যীয় হিন্দু ভাবনায় প্রভাবিত হতে থাকে। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গেজেটিয়ার্সে এমন বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দের সেনসাস প্রতিবেদনে জানা যায়, বহু আদিবাসী তাদের পুরানো ধর্ম বিশ্বাস ত্যাগ করে হিন্দু ভাবধারা গ্রহণ করেছেন। রবার্টসনের মতে এসময় মোট সাঁওতাল জনসংখ্যার ১৩৮৮০ জন নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৩১ সালে জেলায় এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৭৪১৯। অর্থাৎ মোট সাঁওতাল জনসংখ্যার যথাক্রমে ১৩.২ ও ৪১.৪ শতাংশ। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে সাঁওতালগণ শ্রীধর্ম বলে একটি ধর্মের অনুগামী বলে দাবি করেন। এটি ছিল হিন্দু ভক্তি ধর্মের সাঁওতালী প্রাকৃত রূপ। এ বছরের সেনসাসে ১৪৫৭১১ সাঁওতালের মধ্যে ২৯১১১ জন অর্থাৎ ১৯.৯ শতাংশ শ্রীধর্ম মতালম্বী বলে জানা যায়। ১৯০১ সাল থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে ২.৭১ শতাংশ সাঁওতাল স্বধর্ম পরিত্যাগ করে হিন্দু পরিবৃত্তে প্রবেশ করেছেন। এসময়ে ঔপনিবেশিক শাসক ও পাদ্রীদের প্রভাবে খ্রিষ্ট ধর্মে প্রভাবিত হয়েছিলেন সাঁওতালদের একাংশ। শতকরা হারে ০.০৩-০.১২ শতাংশ। মহাজনী শোষণ পিষ্ট হলেও মোটের

উপর সাঁওতাল জীবন ছিল আনন্দ ও উৎসব মুখর। এরা ছিল পরম্পরাগত ভাবে পরিচ্ছন্নতার সাধক। পতিতাবৃত্তি ও ভিক্ষাবৃত্তির মত নিচ পেশার সাথে এ সম্প্রদায়ের কোন যোগ ছিল না। এসময় শোষণের বিরুদ্ধে সংহত প্রতিবাদেরও খন্ডচিত্রও দেখা যায়। এরা ১৯৩০ সালে শালতোড়া থানার শ্যামপুরের বশিষ্ঠ পত্তনিদারদের 'বন প্রবেশ কর' আরোপের বিরুদ্ধে ও বেগার প্রথার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। ১৯৪১ সালের ৫ই জুন ছাতনায় মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে জেলার সাঁওতালদের এক মহাসমাবেশের কথা জানা যায়।

ভৌম শাসনের অন্তভাগে ও ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকলে বিংশ শতকে জেলার প্রান্তিক মানুষদের আর্থিক দুর্গতি ও সামাজিক চিত্র যথার্থ ভাবে অঙ্কিত হয়েছিল আঞ্চলিক গবেষক রথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর প্রতিবেদনে। তিনি গ্যাসট্রেলের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে বলেছেন মহাজনরা ৬০, ৬৫, ৮০, ৯৮ তোলা সের ওজনের বাটখাড়ায় কারচুপি করে কৃষকদের ঠকাতো। বন্ধকী ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার ছিল ২০-২৪ শতাংশ, বন্ধক ছাড়া সুদের হার ৬০-১০০ শতাংশ। ৭ বিঘা জমির মালিকের পরিবারের সদস্য যদি চার হত, তবে গড় আয় ছিল বছরে ৭২ টাকা ৮ আনা। আর খরচ ছিল ৬৪ টাকা। হাতে থাকত ৮ টাকা ৮ আনা।[৩২] বিবাহ, শ্রাদ্ধ, সামাজিক অনুষ্ঠান করতেই এদের অনেক টাকা বেরিয়ে যেত। যথাযথ খরচে এগুলি আয়োজিত না হলে, পরিবারকে একঘরে থাকত হত। সব প্রয়োজন মেটাতে কখনও কখনও ঋণের পরিমাণ দাঁড়াত ৮৪ টাকা, যা তার বার্ষিক আয়ের চেয়ে বেশি। ব্যবহৃত পিতলের বাসন, স্ত্রীলোকের পিতলের বালা, রূপার নাকছাবির মূল্য ছিল ১৫ টাকা। এসময় ভূমিহীন ক্ষেত মজুরের সংখ্যা ছিল ১১৯৮০৮। এরা লাঙ্গল দিত ও শস্য কাটত। এদের দৈনিক মজুরি ছিল ৪ আনা। দিনে তিন আনায় দিন মজুরি করে এদের সংসার চালানো ছিল কঠিন। আট সদস্যের বড় কৃষক পরিবার পাঁচ একর জমি চাষ করে উৎপাদন করত ২৩০ মণ ধান ও ১৬ কাহন খড়। একর প্রতি ধান ফলত ৪৬ মণ(বিঘা প্রতি ১৫.৩ মণ)। ধানের দাম ছিল মণ প্রতি ১০ আনা, ১ টাকায় ২ পণ খড়। ধান ও খড় থেকে আয় হত বছরে ১৫৬ টাকা। জঙ্গল থেকে কাঠ ও জ্বালানী সংগ্রহ করতে জমিদারকে অর্থ দিতে হত। সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে ধান ভেনে মজুরি পেত বছরে ১২ টাকা। নিম্নবর্ণীয় চাষীদের বছরে রোজগার হত ১৬৮ টাকা, খরচ হয়ে যেত ১৬৫ টাকা। এর মধ্যে খাওয়া ১২০ টাকা, জামা-কাপড় ১৫ টাকা, খাজনা ১৫ টাকা, প্রয়োজনে মজুরি প্রদান ৫ টাকা, মেরামতির কাজ, গহনা,

সামাজিক অনুষ্ঠান ১০ টাকা। বিবাহ, অজন্মা, গরু-বলদ ক্রয় প্রভৃতি কারণে চাষী ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ত। ভূমিহীন মজুরদের পরিবারে দিনমজুরি দৈনিক দু আনা ও দুজন কামিনের ৩ আনা, মোট পাঁচ আনা আয়ে কোনরকমে বা আধপেটা সংসার চলত। অজন্মা বা খরার বছরে কাজের অভাবে তাই পূব দেশে যেত হত এদের। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জাতি ছিল বাউরি-বাগদি-ডোম। কর্মকাররা চার বিঘা জমি ও জাত পেশা থেকে বছরে ১০০ টাকা রোজগার করতে পারত। দুপুর-রাত্রির ভাত, ডাল, সব্জি, মুড়ির জন্য দৈনিক চালের প্রয়োজন হত পুরুষের ১ সের, মহিলার ৩/৪ সের, বালক-বালিকা ১.২ সের। ভাতের দৈনিক প্রয়োজন ছিল দৈনিক ১৩ ছটাক বা ৭৫৬ গ্রাম।

সমকালীন কৃষকের জোতের পরিমাণ, জোত থেকে আয়, প্রয়োজনীয় ব্যয়ের হিসাব করলে চাষীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের অনুমান পাওয়া যাবে। রবার্টসনের প্রতিবেদন দেখা যায় জেলার মোট জোতের সংখ্যা ৪২২৭৩১, আর পরিমাণ ৭৮৫৭০৬ একর। এগুলি ছিল ২১৪৩০২ পরিবারের হাতে। এই ২০১৭-২৪ কালসীমার মধ্যে এই হিসাবে পরিবার প্রতি জমি ছিল ৩.৭২ একর। এই জমিগুলি ছিল মূলত এক ফসলী। দোফসলী জমির জমি ছিল ১০ শতাংশের কম। পরিবারের অধিকৃত জোত থেকে গড় চাল উৎপাদন ছিল ২১ মণ ৮ সের। সাড়ে চার জনের পরিবারের দৈনিক চালের প্রাপ্তি ছিল মাত্র ২ সের ১৩ ছটাক। এই পরিমাণ চালে পরিবারের সব সদস্যের দুই বেলা গ্রাসাচ্ছাদন করা কঠিন ছিল। ১৮৭১ সালের কালেক্টরের প্রতিবেদনে এই সংকটের ইঙ্গিত আছে। বছরে পাঁচ একরের জমিতে মাত্র আট মাসের গ্রাসাচ্ছাদন করা সম্ভব হত। ফলে চাষীরা ঋণ নিয়ে আরো দারিদ্র কবলিত হত। বেশির ভাগ ক্ষুদ্র চাষীরই বংশানুক্রমিক ভোগদখলী স্বত্ত্ব ছিল না। মহজনী ঋণে জর্জরিত কৃষক ক্রমশ জমির অধিকার হারাতে থাকে। ১৮৭৮ সালে হান্টার জানিয়েছেন কৃষি ঋণের সুদের হার ছিল ১৮-৩৬ শতাংশ। এই দুষ্ট চক্রের সাথে জড়িত ছিল গোলদার, মহাজন ও কখনও কখনও জমিদার। ১৯২৯ সালের ব্যাঙ্কিং প্রতিবদনে দেখা যায় জেলার মহাজনী ঋণের সুদ ছিল ১৫-৩৭.৫ শতাংশ। এই ঋণ ভারের অনিবার্য পরিণতি ছিল জমি হারানোর যন্ত্রণা।[৩৩] অবশ্য চক্রী অধিকতর ভাগ বা খাজনার শর্তে (অর্ধেক বা ৯/১৬ ভাগের) হাতিয়ে নেওয়া জমিতে আবার চাষীকে নিযুক্ত করত। এদের বলা হত 'সাজা' চাষী। ১৯১৭-২৪ সালের মধ্যে কৃষকদের এক চতুর্থাংশ সাজা প্রথার চাষীতে পরিণত হয়েছে। স্পষ্টতই জেলায়

ক্ষেত মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এরা ছিল জেলার মোট জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ। কম মজুরি ও ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধি এই প্রান্তিক মানুষদের অবস্থা শোচনীয় করে তুলছিল। চালের দাম ছিল টাকা প্রতি ১৯০৫-০৬ সালে ১৩.৫ সের, ১৯০৬-০৭ সালে ৯.১৩ সের, ১৯০৭-০৮ সালে ৭.৭৫ সের, ১৯০৮-০৯ সালে প্রায় ৮ সের, ১৯২১-২২ সালে ৫.৬৩ সের।[৩৪] জেলায় মুনিষের মজুরি ছিল ৪ পাই ধান, আর কামিনের মজুরি ৩ পাই। ১০২১-২২ সালের ১ টাকায় ৫ সের চালের দামের হিসাবে এই দৈনিক মজুরি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫০ পয়সা ও ৩৭.৫ পয়সা। মন্বন্তরের অভিঘাতে সাজা প্রথায় ভূমিচ্যুতি ছাড়াও অভাবী জমি বিক্রয় বাড়তে থাকে। শুধু প্রজাস্বত্ব আইনে মন্বন্তরের বছরে এই হস্তান্তর ছিল ১৯২৯ সালে ১১৯৯৬ ও ১৯৪৩ সালে ২৭৫৫১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর বর্ণগত দিক থেকে ভূমি মালিকানায় প্রাধান্য ছিল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, ছত্রী, তাম্বুলি, তিলি, গন্ধবণিকদের। অন্যদিকে প্রান্তিক অবস্থানে চলে যায় সাঁওতাল, কোড়া, বাগদি, বাগদি, বাউরি, লোহার সম্প্রদায়ের মানুষেরা। ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের ধারায় দখলীস্বত্বহীন রায়তদের 'কোর্ফা' রায়ত বলা হত। এরা দিন মজুরের চেয়ে কিছু ভালো হলেও জমিদাররা প্রায়ই এদের উচ্ছেদ করত। বাগদী, বাউরি, লোহার জাতিভূক্তরা বেশির ভাগই ছিল এমন রায়ত। ভাগচাষীদের অবস্থান খুব ভালো ছিল না। স্থিতিবান স্বত্বভোগী রায়তরা ছিলেন এই উচ্ছেদের আশঙ্কা মুক্ত। কিন্তু কম বেশি সব রায়তদেরকেই জমিদারকে বেগার শ্রম দিতে হত।

অনাবৃষ্টি জনিত শস্যহানি প্রায়শই প্রান্তিক মানুষদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলত। একেই শ্রমের মজুরি জীবন ধারণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না, তার উপর শস্য হানি জনিত দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি অনটনের ও অভাবের মাত্রাকে বহুগুণিত করত। ১৮৭৫ সালের কালেক্টরের প্রতিবেদনে দেখা যায় এসময় একজন অদক্ষ শ্রমিকের আয় ছিল দিনে ২ টাকা থেকে ৩ টাকা আট আনা মাত্র। ১৮৪৬ সালে কালেক্টর জর্জ লচ অজন্মার ফলে দুষ্প্রাপ্য খাদ্যশস্য যেমন চালের দাম দাঁড়িয়েছিল টাকায় ১৬-১৮ সের। অথচ একজন কুলির সে সময় আয় ছিল দৈনিক এক আনা থেকে পাঁচ পয়সা মাত্র। এতে একবেলার আহারের সংস্থানও করা যেত না। অভাবের তাড়নায় ভূমিহীন মজুররা চলে যেতেন শ্রীহট্ট-আসাম-কাছাড় চা বাগান, রাণীগঞ্জ খনি, রেল পথের কাজ, কলকারখানায়। হুগলী-বর্ধমান জেলায় কৃষি-শ্রমের কাজে মরসুমী অভিবাসন ঘটত।

দিনমজুর ও কারিগর শ্রেণীর মানুষদের অবস্থাও খুব ভাল ছিল না। ১৮৭০

সালে কুলি-দিনমজুরের দৈনিক মজুরি ছিল ২ পয়সা। কামার, সূত্রধর, কাঠ মিস্ত্রির দৈনিক মজুরি ছিল ৪-৫ আনা। ১৮৬০ সালে চালের দাম ছিল ১৫ আনায় এক মণ। ১৮৭১ সালে সেটি বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় মণ প্রতি এক টাকা চার আনা। এসময় ছুতার দৈনিক ৬-৮ আনা, রাজমিস্ত্রি ৫-৬ আনা রোজগার করতে পারত। সেই সময় রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ঠিকাদার ব্যবস্থা শক্তিশালী হওয়ায় স্থানীয়রা সরকারী বড় কাজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। ১৮৯৩ সালে চালের দাম ছিল টাকায় ১ সের ১২ ছটাক এবং ১৯১১ সালে তা ছিল টাকায় ১২ সের। দুই বছর মজুরি ছিল যথাক্রমে কুলি ৩ আনা ও ৫ আনা, কামিন ১.৫ ও ২.৫ আনা, বালক শ্রমিক ১ আনা ও ৩ আনা, ঘরামি ৪ আনা ও ৬ আনা, দক্ষ রাজমিস্ত্রি ৫ আনা ও ৯ আনা, রাজমিস্ত্রি ৪ আনা ও ৮ আনা, দক্ষ ছুতার ৫ আনা ও ১০ আনা, ছুতার ৪ আনা ও ৮ আনা, দক্ষ কামার ৫ আনা ও ৯ আনা, কামার ৪ আনা ও ৮ আনা। এই আয় ও ব্যয়ের নিরিখে সমকালীন জীবিকা নির্বাহের সংগ্রাম নিয়ে একটি ধারণা তৈরি করা যায়।[৩৫]

কৃষকদের সাথে সাথে তন্তুবায়দের পতন ঘটে ঔপনিবেশিক সময়ে। জেলার সবচেয়ে বড় কার্পাস বস্ত্র বয়ন কেন্দ্র সোনামুখী। অন্যান্য কেন্দ্রগুলি হল জেলা শহর সংলগ্ন গোপীনাথপুর-রাজগ্রাম, খাটা, কাঞ্চনপুর, মৈঠা, মাঝটিয়া, নতুনগ্রাম। ১৮৭৮ সালে জেলায় তাঁতির সংখ্যা ছিল ১৬৩১০। ১৭৫৭ সালে সোনামুখী কুঠিতে ব্রিটিশ কোম্পানীর অর্থ লগ্নি ছিল ১০১২২০ টাকা। এই সমৃদ্ধি সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে সোনামুখীর বস্ত্রশিল্প গভীর সংকটে নিমজ্জিত হয়। এর কারণ ছিল চীপ-এরস্কিনদের সোনামুখীর কুঠি নিয়ন্ত্রিত দাদন প্রথা। অগ্রিম দিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রাকে দাদন বলা হত। এই পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন তাঁতির ক্ষমতার বাইরে হলেও পুরো পরিবারকে জোর করা হত, এমনকি কোম্পানী প্রতিনিধি (পিয়ন ও তাগাদাদার) তাঁতির ঘরে অবস্থান করে এটি তদারকি করতেন। তার থাকা খাওয়ার খরচ তাঁতিকেই বহন করতে হত। ১৭৮৮ সালের দুর্ভিক্ষ চাষীদের আর্থিক সঙ্গতি শোচনীয় করে তোলে। জিনিসের দাম বাড়ে। বস্ত্র উৎপাদনের কাঁচা মালের দাম বাড়লেও কোম্পানী উৎপাদিত বস্ত্রের দাম একই রেখে দেয়। ১৭৯২-৯৩ সালে যেখানে মণ প্রতি তুলার দাম ছিল ১৩ টাকা ৮ আনা, ১৭৯৯-১৮০০ সালে সেটি ২১টাকা ৮ আনা, ১৮০০-০১ সালে ২০ টাকা, ১৮০১-০২ সালে ২৩ টাকা। ১৭৯৪ সাল থেকেই কোম্পানী কুঠির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত হতে থাকে। চীপ তাঁতিদের বরখাস্ত করতে শুরু করলে, বহু তাঁতি কাজ ছেড়ে দিতে থাকেন এদিকে

এসময় সোনামুখীতে বেসরকারি আমেরিকান বণিকদের আগমন ঘটেছিল। এদের সাথে অনেক তাঁতি কাজ শুরু করলেও দীর্ঘকালীন লাভের নিরিখে তা ছিল হটকারিতা। আমেরিকানরা চড়া দামে মোটা কাপড় কেনা শুরু করায়, তাঁতিরা সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। কাটনিদের কাছে উচ্চ মানের সুতা কেনার প্রবণতা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বস্ত্র শিল্পের গুণগত মান পড়ে যায় ও গুণী শিল্পীদের বিনাশ ঘটে। এদিকে বাজার ছেয়ে যায় সস্তা দরের ব্রিটিশ কারখানার উৎপাদিত বস্ত্র। পশ্চিম ভারতে সোনামুখী বস্ত্রের চাহিদাও কমে যায়। আমেরিকান বণিকরাও এসময় হাত গুটিয়ে নিয়েছিল। ব্রিটিশ আওরঙ্গগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, দেশীয় মহাজনের খপ্পরে পড়ে সোনামুখীর তাঁতিরা।[৩৬] অ-তন্তুবায় মহাজনরা কাঁচামাল ও অর্থ দিত দাদন হিসাবে। পাইকারী দরে তাদেরকেই উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করতে হত। আসল ও সুদ হিসাব করে বাকি টাকা এই মহাজনেরা তাঁতিদের হাতে তুলে দিত। শুরু হয় শোষণের আরেক অধ্যায়। চীপের হিসাবে বেশির ভাগ তাঁতি মুটেমজুর, ভিক্ষুক, ভবঘুরে, সন্ন্যাসী,চাষী, যন্ত্র সারাইকারীতে পরিণত হয়। প্রায় ৫০ শতাংশ তাঁতি মারা যান। রেশম শিল্পের সাথে জড়িত হয়ে যায় কিছু তন্তুবায়। ১৮৯২-৯২ সালে এই দুর্দশাগ্রস্ত চাষীদের মাসিক আয় কমে দাঁড়ায় পাঁচ টাকা। ১৯২০ সালে এটি ছিল সাত টাকা। জাত ব্যবসায় যেহেতু আয় সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল, এরা চাষের কাজে অতিরিক্ত আয়ের আশায় যেতে বাধ্য হয়। এসময় গড়ে তিন বিঘা জমি চাষ করে বার্ষিক রোজগার ছিল আশি টাকা। পরিবারের সদস্য ছিল ছয় জন। গ্রামাঞ্চলে বিলাতী কাপড়ের তুলনায় তাদের উৎপাদিত মোটা কাপড়ের চাহিদা ছিল। এই ভাবে বিনাশের পর্ব থেকে কোনমতে সোনামুখীর বস্ত্র শিল্প অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে।

এই ভাবে ভূমরাজ্যগুলির সায়হ্নবেলায় ও ঔপনিবেশিক পর্বে শোষণের কথামালার আড়ালে জেলার সাধারণের মানুষের জীবন নিষ্পেষিত হয়ে পড়ে। ১৮৪৪, ১৮৫১, ১৮৬৫-৬৬, ১৮৭৩-৭৪, ১৮৮৫, ১৮৯৭-৯৮, ১৯০৮, ১৯১৯-২১, ১৯২৫, ১৯২৭-২৮, ১৯৩০-৩৩, ১৯৩৭, ১৯৪৩-৪৪, ১৯৪৬-৪৭ সালের মহামারী, প্রায়শই ম্যালেরিয়া, কলেরা, গুটি বসন্তের মড়ক দারিদ্রের অভিঘাতকে তীব্রতর করে তোলে।[৩৭]

দশটি ভূমরাজ্যের ইতিহাস ও তার প্রজাজীবনের স্বতন্ত্র মূল্যায়ণের যোগফলে রাঢ় বাঁকুড়া জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস উপলব্ধ করা সম্ভব। গ্রাম স্তরের ইতিহাস, উপজেলা স্তরের ইতিহাস, জেলার ইতিহাস... আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার মূল প্রতিপাদ্য। শুধু

রাজকথা নয়, প্রজা জীবনের খুঁটিনাটি সে ইতিহাসকে সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত করে। আলোচিত ইতিহাস সেই লক্ষ্যেই রচিত হল। অবশ্য এটি সূচনা মাত্র। আরো আবিষ্কার, আগামীতে আরো ইতিহাসের খোঁজ 'বাঁকুড়া জন'-এর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার কাজে একদিন সম্পূর্ণতা আনবে।

**তথ্যসূত্র :**

১. বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৫০, পৃঃ ৬৩, ৭৩।
২. অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, কলকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ৩৪।
৩. মাণিকলাল সিংহ, রাঢ়ের মন্ত্রযান, কলিকাতা, ১৯৭৯, পৃঃ ১৬।
৪. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সঃ), শূন্যপুরাণ, বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৭৪। হাকন্দ পুকুরে একটি নিমজ্জিত মন্দিরের কথা জানা যায়। আছে সন্নিহিত কৈলাস মন্দির।
৫. মাণিকলাল সিংহ, রাঢ়ের মন্ত্রযান, কলিকাতা, ১৯৭৯, পৃঃ ১৬।
৬. বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা ১৯৫০, পৃঃ ১০০।
৭. বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা ১৯৫০, পৃঃ ১৯৯।
৮. বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা ১৯৫০, পৃঃ ৩৯৮।
৯. মাণিকলাল সিংহ, রাঢ়ের মন্ত্রযান, কলিকাতা, ১৯৭৯, পৃঃ ৭৬।
১০. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০, পৃঃ ১৫১।
১১. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাসে সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০, পৃঃ ২৫২।
১২. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাসে সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০, পৃঃ ২৫২।
১৩. বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৫০, পৃঃ ২৯২।
১৪. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাসে সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০, পৃঃ ১৬০।
১৪ক. হাম্বীর সমকালীন গুরুকন্যা হেমলতার 'মানবী বিলাসকাব্য' ছান্দারে উদ্ধার হয়, যেটি প্রকাশ করেন প্রদীপ সিংহ পিং মানিকলাল সিংহ। গোপাল সিংহের রানী ধ্বজামণি নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস কাব্যটি অনুলিখন করেন। ১৮৩৪-৩৫ সালে অম্বিকানগর পরগনার বৃন্দাবনপুরের লালমুনি বৈষ্ণবী যদুনাথ দাসের ভ্রমরগীতা অনুলিখন করেন। **Descriptive Category of BM, Vol I, p 127, Cal 1926,** পুঁ-১২৬ থেকে বোঝা যায় রাজা গোপাল সিংহ ছিলেন লেখক ও পাঠক। লিখেছিলেন রাধাকৃষ্ণ কাব্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর পুঁথি ২৩৮নং এ রাজা চৈতন্য সিংহের নিমিত্ত অনুলিখিত চৈতন্য চরিতামৃতের সন্ধান মেলে। ১৭৮৬ সালে। ১৮৪৯সালের ৭ই চৈত্র অনুলিখিত নাড়িচার চন্দ্রদাস বসুর 'রামায়ণ' ছিল গোপাল সিংহের (২য়) গাঁথাঘরে। ছিল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। একইভাবে জামকুড়ি ও কুচিয়াকোলের গাঁথাঘরে **(Library)** অনুলিখিত হয়েছে পুঁথি। জামকুড়ি কেল্লার পঞ্চম সিংহবাবুর মধ্যমপুত্র রাধানাথের জন্য লেখা হয় কিস্কিন্ধাকাণ্ড, ১৮৬০ সালের ৭ই পৌষ বৃহস্পতিবার বেলা চার দন্ডে। ১৬৩৭ সালের ৩১ শ্রাবণ পাত্রসায়েরের গোবিন্দরাম সরকার মোহন শঙ্খবণিকের জন্য লেখেন রূপবান চরিত। মল্লগ্রন্থাগারে ছিল বদন ঘোষ লিখিত কপাল চরিত্র **(Descriptive of the vernacular MS in the Collection of Royal Asiatic Society of Bengal, Vol IX, Cal, 1951)**। এমন বহু অনুলিখন মিলেছে কোতলপুর, পাত্রসায়ের, বিষ্ণুপুর, শিরোমণিপুর, বায়ড়া, ডিঙ্গাল, শিহড়, মান্দারণ বাঁকি, কৃষ্ণগঞ্জ, চাবড়া, ভাদুল,

সিতিলা-মুক্তাতোড়, নাড়িচা, বোলাড়া, চাতরা, রাধানগর সহ বিভিন্ন গ্রামে।
১৫. শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, শানাবান্ধা গ্রামের ইতিবৃত্ত, বাঁকুড়া, ১৯৪০, পৃঃ ১১।
১৬. **A. P. Mallick, History of Bishnupurraj, Calcutta, 1921, p.40.**
১৭. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাসে সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০, পৃঃ ৩৯৯।
১৮. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাসে সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০, পৃঃ ৪০০।
১৯. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাসে সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০, পৃঃ ৪০১।
২০. **W W Hunter, Statistical Acoounts of Bengal, Vol IV, London, 1875, p. 248.**
২১. **S Sinha and H Banerjee (Ed), Bankura District Letters Issued, 1802-1869, Calcutta, 1989, p.4.**
২১ক. আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন (বিষ্ণুপুর)-এ রক্ষিত পুঁথি।
২২. **W W Hunter, Statistical Accounts of Bengal, Vol IV, London, 1875, p.248.**
২৩. **L S S O'Malley, Bankura District Gazetteers, Calcutta, 1908, p.62.**
২৪. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০, পৃঃ ৩১৮।
২৫. **F W Robertson, Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Bankura, Calcutta, 1926, p.21.**
২৬. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০, পৃঃ ১২১।
২৭. **S Sinha and H Banerjee (Ed), Bankura District Letters Issued, 1802-1869, Calcutta, 1989, p.xix.**
২৮. সুনীল সেন, ভারতে কৃষি সম্পর্ক (অঃ ছায়া দাশগুপ্ত), নয়া দিল্লী, ১৯৫৮, পৃঃ ১২৬।
২৯. **M. C. McAlpine, Report on the condition of the Santals in the Districts of Birbhum Bankura Midnapore and North Balasore, Calcutta, 1909, p.18-19.**
৩০. **Bankura District Collector's Report to Commissioner, Burdwan Division, 1924-25, para 46 (w.r.t BT Act, 1918)**
৩১. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাসে সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০, পৃঃ ৩৭৪।
৩২. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাসে সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০, পৃঃ ৩২০।
৩৩. **S Sinha and H Banerjee (Ed), Bankura District Letters Issued, 1802-1869, Calcutta, 1989, p.xx.**
৩৪. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাসে সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০, পৃঃ ৩৬৭।
৩৫. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাসে সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০, পৃঃ ৩৬৫, ৩৬৭।
৩৬. **B Foley, Report on Labour in Bengal, Calcutta, 1906, p.50.**
৩৭. শশিভূষণ বিশ্বাস, 'মল্লভূমি' ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, ১৮৯৯, পৃঃ ৫৪-৫৬।

## দ্বাদশ অধ্যায়

# অস্থল কাহিনী, দেবোত্তর ও পীরোত্তর সম্পদ

রাঢ় বাঁকুড়ার অস্থল কাহিনী, দেবোত্তর ও পীরোত্তর সম্পদ, সেই সম্পদ-সংরক্ষণ প্রকরণের আইনি মান্যতা অনন্য বিশিষ্টতার নজির। প্রাকব্রিটিশ যুগে বংশানুক্রমিক ধারায় দেববিগ্রহ সেবা ও আনুষঙ্গিক পালা-পার্বণের আয়োজন নিষ্ঠা সহকারে পালিত হত অবিচ্ছিন্ন ভাবে, কোন রকম আইনি নথি ছাড়াই। ব্রিটিশ যুগে অবশ্য রাজা, জমিদার ও সম্পন্ন পরিবারগুলি তাদের দেব আরাধনার ধারা ঔপনিবেশিক আইনের নিগড়ে বেঁধে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন। এর ফলে দেবসেবা এই শাসন পর্বে অক্ষত ও অব্যাহত ছিল। দীর্ঘ ব্রিটিশ শাসনে প্রায় সর্বজনীন রূপ পায় এই জমিদারি বা পারিবারিক পূজাগুলি। স্বাধীনোত্তর কালে জমিদারি প্রথা বিলোপের পরও তাই গ্রামসমাজ এই পূজা ও প্রথাগুলি অব্যাহত রাখতে এগিয়ে আসে। নিচে এমনই কিছু দেবসেবা ও দেবউৎসবের কাহিনী আলোচনা করা হল। রাঢ় বাঁকুড়ায় আরেকটি প্রায় অনালোচিত অধ্যায় হল অস্থলের প্রতিষ্ঠা। রাঢ় বাঁকুড়ায় শ্রীনিবাস আচার্য অনুশীলিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারার সূচনার আগেই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অবাঙ্গালী ধর্মাচার্যেরা ভারত জুড়ে নতুন মোড়কে বৈষ্ণব ধর্মমত প্রচার করে। বাঢ় বাঙ্গলাতেও তার ছাপ পড়েছিল। এমন তিনটি ধর্মসম্প্রদায় হল রামানুজ, রামানন্দ ও নিম্বার্কপন্থী। তামিল বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ(১০১৬-১১৩৭) প্রবর্তিত শ্রীসম্প্রদায় রাধা-কৃষ্ণ ও গোপীলীলা সম্পর্কিত বিষয়টি সাধন-ভজনের অঙ্গ না করে মূলত নারায়ণ ভজনাকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রামানুজের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রামানন্দ (১৩৮০-১৪৭৫) প্রাকচৈতন্য পর্বে আবার নারায়ণ (বিষ্ণু) অবতার রাম এবং সীতার

নাম-জপের গুরুত্ব দিয়েছিলেন।[১] এই রামানন্দপন্থীরাও বাঁকুড়ায় কয়েকটি অস্থল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রামানুজের পর একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর বৃন্দাবন নিবাসী তৈলাঙ্গ ব্রাহ্মণ সাধক নিম্বার্ক (১১৩০-১২০০) রাধাসহ রাখাল কৃষ্ণের লীলাপর্ব গুরুত্বের সাথে প্রচার করেছেন। রাঢ় বাঁকুড়ায় এমন অস্থল ছিল ষোলটি। আটটি ছিল রামানুজপন্থী, একটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মালম্বী, সাতটি রামানন্দপন্থী।

## অস্থল কাহিনী

স্থল (হিন্দি উচ্চারণে অস্থল) বা থান হল দেবস্থান। জেলায় নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস, দাস গদাধর প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব থাকলেও পাশাপাশি রামানুজ, রামানন্দ ও নিম্বার্কপন্থী বৈষ্ণব ধারাও সক্রিয় ছিল।

আগে জমিদার ও বণিক সম্প্রদায় বৃন্দাবন-অযোধ্যা-প্রয়াগ সহ বিভিন্ন ধর্মস্থানের আশ্রমে গিয়ে মহন্তদের কাছে দীক্ষা নিতেন। পরে সেই আশ্রমের অধিষ্ঠাতা দেববিগ্রহ নিয়ে নিজ এলাকায় ফিরে এসে প্রভূত জমিজমা দিয়ে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতেন। এইভাবে সেখানে আশ্রম পরিচালক হিসাবে দীক্ষাদাতা আশ্রমের প্রতিনিধি আগমনের মাধ্যমে অস্থলগুলির পত্তন হয়েছিল। অনেক সময় রাজানুকূল্যে এই আশ্রমগুলির প্রতিষ্ঠা ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। মল্লভূমে অন্তত এমন ২১ টি অস্থলের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলি হল ১) ওন্দার রাজগ্রাম ২) বিষ্ণুপুরের খামারবেড়িয়া ৩) বিষ্ণুপুর শহরের নিমতলা ৪) বিষ্ণুপুরের পানশিউলি ৫) কোতলপুরের শ্রীরামপুর ৬) কোতলপুরের চাতরা ৭) তালডাংরা থানার সিহর-গোপীনাথপুর ৮ ) সারেঙ্গা থানার লাগার ৯) সিমলাপাল থানার বনকুল ১০) বড়জোড়া থানার খয়েরপাহাড়ি ১১) দধিমুখা ১২) বেলুট-গোবিন্দপুর ১৩) ডাকাইসিনি ১৪) মাঞ্জমুড়া ১৫) খটিল্যা ১৬) সোনামুখী থানার বেলিয়াতোড় ১৭) পাত্রসায়ের থানার শীতলজোড় ১৮) ইন্দাস থানার জামকুড়ি ১৯) হাজরাপাড়া ২০) কৈবর্তপাড়া ২১) চারিগ্রাম।[২] অস্থলের ভূসম্পত্তি জেলার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ১৬৯৩ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ২৬০ বছরে জেলার অস্থলগুলি অন্তত ২৪০০০-২৫০০০ বিঘা জমি দখলে রেখেছিল। ১৯২১-২২ সালের জেলার মোট জমি ১৬৭৭৭৪০ একরের হিসাবে এটি প্রায় পাঁচ শতাংশ। ১৯২৫ সালের হিসাবে মহন্তদের সমষ্টিগত আয় ছিল প্রায় তিন লক্ষ টাকা।[৩] বর্তমানের নিরিখে আড়াই কোটি টাকারও বেশি। বেলুট-গোবিন্দপুর অস্থলের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখলে বোঝা যায় জেলার আয়ের

ত্রিশ শতাংশ বৃন্দাবন-অযোধ্যার মত মূল আশ্রমে পাঠাতে হত। তিলি, মাহিষ্য, গোয়ালা সম্প্রদায়ের চাষীরা ফসলী, হাসিল ও বাজে জমি চাষ করত। জেলার এই অংশে অস্থল কর্তৃপক্ষের দ্বারা পুকুর খনন, কূপ খনন, পানীয় জলের সংস্থান, মাছ চাষ, নিয়মিত পূজা-পার্বণ, অন্নবিতরণ, অতিথিসেবা, খামার চাষ ও দাসদাসীদের কাজ পাওয়ার ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা থাকার রসদ পেয়েছিল।

এই অস্থলগুলি গড়ে উঠেছিল অরণ্যান্তরালে বা গ্রামের প্রান্তে উঁচু প্রাচীরঘেরা নির্জন পরিবেশে। প্রাঙ্গণে থাকত একাধিক বিগ্রহ মন্দির, মহন্ত-পুরোহিত-সেবাইত-সেবক-সেবিকা-অতিথি-অভ্যাগত-লগ্দিদের বাসের ঘর, খাজাঞ্চিখানা, রান্নাঘর, ভোগমন্ডপ, ভান্ডারঘর, খামার, মড়াই, গুদামঘর, গোশালা, গদিঘর বা সেরেস্তো কার্যালয়। প্রবেশদ্বার হত সিংহদুয়ার বা দ্বিতল নহবতখানার আদলে বা দুপাশে সারিবদ্ধ ঘরের মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গরূপ পথ। কোন কোন অস্থলে থাকত বিচার-চাতাল যেখানে বসে মহন্তরা স্থানীয় বিবাদের মীমাংসাও করতেন। অস্থলের সুরক্ষা, শস্যগোলা রক্ষা, মহন্তদের দেহরক্ষী (ছড়িদার), চাষবাস দেখাশোনা, রায়তদের কাছে খাজনা আদায়, রায়তদের ধানের মড়াই ক্রোক করার পদাতিক হিসাবে কাজ করতেন পশ্চিমা লগ্দীরা।[৪] মহন্তদের সমাধি থাকত অস্থল প্রাঙ্গণের মধ্যে বা বাইরে। অস্থলের ও গ্রামবাসীদের ব্যবহারের জন্য প্রাঙ্গণের বাইরে খনন করা হত ইঁদারা ও পুকুর। মহন্তের উত্তরাধিকার হিসাবে থাকতেন প্রথম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ চেলা। মহন্ত ও চেলার সম্পর্ক ছিল গুরুপিতা ও ধর্মপুত্রের। এরা হতেন ব্রাহ্মণ বংশীয় বা নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী। কোন কারণে মহন্তের পর উত্তরাধিকারী চিহ্নিত করা না থাকলে অস্থলবাসী, অন্যান্য অস্থলের মহন্ত, পাশের গ্রামগুলির গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পরামর্শ নিয়ে মহন্ত (সাধারণত গুরুভ্রাতাদের থেকে) নির্বাচন করা হত। অস্থলের এক উঁচু বেদিতে বসিয়ে, কপালে চন্দন তিলক দিয়ে, মহন্তের চাদর পরিয়ে বাদ্যভান্ড ও ব্রাহ্মণভোজন সহযোগে এই অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করা হত। অবাঙালী মহন্তদের বাংলাজ্ঞান ছিল না।[৫] দেবনগরী হরফে স্বাক্ষর করতেন। হলুদ ও সাদা বস্ত্রে চন্দন-তিলক শোভিত, তুলসীমালা ও দন্ডধারী দীর্ঘাকার, গৌরবর্ণ ও সৌম্যকান্তি এই মহন্তরা শাস্ত্রীয় পান্ডিত্যের তেমন অধিকারী না হলেও এরা পূজা-পার্বণ-তীর্থপর্যটনে স্বচ্ছন্দ ছিলেন। এরা নাগা সন্ন্যাসী না হলেও বাঁকুড়ায় এরা 'লাগা সন্ন্যাসী' নামে সুপরিচিত ছিলেন। এর থেকেই 'লাগার গ্রাম', 'লাগার পুকুর' 'লাগারগড়্যা', 'লাগাড়ডাং' নামগুলি এসেছে বলে রথীন্দ্রমোহন বাবু বাঁকুড়া সন্ধান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

জেলার অস্থলগুলির আটটি ছিল রামানুজপন্থী, একটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মালম্বী, সাতটি রামানন্দপন্থী, চারটি নিম্বার্কপন্থী। ইন্দাসের মল্লবংশীয় জমিদার ও গবেষক বলীন্দ্রনাথ সিংহদেব এই অস্থলগুলিকে তীর্থযাত্রী ও গরিব মানুষের বিপদের ক্ষণে আহার ও আশ্রয়স্থল হিসাবে বর্ণনা করেছেন।[৬]

বড়জোড়া ব্লকের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত দধিমুখা অস্থলটি জেলার প্রাচীনতম অস্থল বলে পরিচিতি পেয়েছে। মহন্তদের দাবি এটি বীর হাম্বিরের সময়ে প্রতিষ্ঠিত। ১১০০ বঙ্গাব্দের (১৬৯৩) ৯ই বৈশাখ প্রথম বিগ্রহমন্দিরটি বীর হাম্বির কতৃক প্রতিষ্ঠিত বলে তাঁদের দাবি। ওই বছরের ১৯শে ফাল্গুন বৃন্দাবন থেকে প্রথম মহন্ত হিসাবে রামচরণ সিং জমাদার এই অস্থলের যোগদান করেছিলেন। কিন্তু এই সময় কালটি ছিল দুর্জন সিংহের রাজত্ব (১৬৭৭-৯৪)। প্রথম মহন্ত রামচরণ সম্ভবত বৃন্দাবনের সনাতন গোস্বামী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন জীউয়ের মন্দির-আশ্রম প্রেরিত। এই অস্থলটির মহন্ত ছিল রাজপুত বংশীয়। এই অস্থলটি যেমন মল্লানুকূল্য পেয়েছিল, তেমনই গড়ে ওঠার সময় ব্রজবালা দেব্যা নাম্নী স্থানীয় বিধবা ব্রাহ্মণ তাঁর দধিমুখা মৌজার যাবতীয় সম্পত্তি অস্থলের মদনমোহন জীউকে দান করেন। অস্থলের মালিকাধীন মৌজা ছিল বাঁকুড়া থানার উপরডিহি, সেমুয়া, ওন্দা থানার কাওয়াবাসা, মাদারবনী, বড়জোড়া থানার দধিমুখা, বৃন্দাবনপুর, তালান্দা, গোপীনাথপুর, কৃষ্ণনগর, মেজিয়া থানার রামলালপুর, পাত্রসায়ের থানার বলরামপুর।[৭] ১৯৫৪ সালে বাঁকুড়া থানার মৌজা দুটির প্রজাবিলি জমি থেকে নগদে ও দ্রব্যাকারে সাজা আদায় ছিল ৪০২ টাকা ১৪ আনা ১০ পাই। বর্তমান মহন্তের দাবি অনুসারে আরও মৌজা যেমন জেলার গোপবাদী, বৃন্দাবনীয়, বেলঘরিয়া, পুরুলিয়ার চুনা, বদমা, কালীপাহাড়ী ও বর্ধমান জেলার মন্ডাবর ও সঙ্গে আরও সাতটি মৌজা নিয়ে অস্থলের মোট সম্পত্তি ছিল ৩০০০০ বিঘা। যদিও এ দাবি অতিরঞ্জিত বলেই মনে হয়। দ্বারকানাথ প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কোল কোম্পানী বার্ষিক ইজারামূল্যের বিনিময়ে এদের থেকে মন্ডাবর মৌজা ইজারা নিয়েছিল। অস্থলে গোপীনাথ জীউ, নারায়ণ জীউ, নিতাই-গৌর সহ অসংখ্য শালগ্রাম শিলা পূজিত হয়। বিভিন্ন মহন্তদের মধ্যে রোহিনীমণি দেবীর মহন্ত হিসাবে কাজ করা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। জেলায় নারীদের মহন্ত পদে অভিষেক এক বিরল ঘটনা। ১৯৪৫ সালে দধিমুখা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে ছিল মহন্ত বীরকিশোরের জমিদান ও পৃষ্ঠপোষকতা। অবশ্য এসময় থেকে আমমোক্তারনামা সহ বিভিন্ন নথির অপব্যবহার

ঘটে বহু সম্পত্তি হাতছাড়া হয়। এই অস্থলটির প্রকৃত মালিক ছিল বৃন্দাবনস্থিত মদনমোহনজীউ আশ্রমের মহন্ত।[৮]

মন্দির ফলক থেকে দেখা যায় বেলুট-গোবিন্দপুর অস্থলটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৭৪৬ সালে অর্থাৎ চৈতন্য সিংহের আমলে। এখানে মল্লরাজ চৈতন্য সিংহ ও দামোদর সিংহের ভূমিদানের নজির আছে। রাজপুতনার কদমখন্ডী থেকে আগত রামানন্দপন্থী মহন্ত ধর্মদাস ছিলেন এই অস্থলের প্রতিষ্ঠাতা। এখানে রঘুনাথ জীউ ও হনুমান জীউয়ের মন্দিরে সেবা পেত জানকী, মদনমোহন, গোপাল, কৃষ্ণ ও রাধিকা সহ শতাধিক শালগ্রাম শিলা। এই অস্থলটির একটি শাখা ১৮৪৮ সালে গোপালদাস মহন্তের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বেলিয়াতোড়ে। রায় জমিদারবাড়ি সংলগ্ন এই অস্থলের সাথে জমিদারদের সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। দুর্গাপূজার সময় সেখানে তাঁরা পাঠাতেন হাড়িভর্তি খাজা, বুটের মিঠাই, টানা মিঠাই ইত্যাদি। বিজয়াদশমীর দিন ঘট বিসর্জনের পর কাঁসার বাটিভর্তি গব্যঘৃতে রায় পরিবারের সদস্যদের মুখ দেখার অনুষ্ঠান পালিত হত মহন্তদের পরিচালনায়।[৯] লিখিত নথি থেকে দেখা যায় ১৮৯৭ সালে এজন্য পরিবারের নবকৃষ্ণ রায় মহন্ত মহারাজকে পাঁচ সিকা দক্ষিণা দিয়েছিলেন। এই দুই অস্থলের মোট জমির পরিমাণ ছিল ১৯৮৫ একর ৬৭ শতক। অধীনস্থ মৌজাগুলি হল গোবিন্দপুর, বেলুট, শালডাঙ্গা, বাঁকুড়াডাঙ্গা, মথুরাডাঙ্গা, রাউতড়া, আমঠ্যা, হরেকৃষ্ণপুর, মহীধরা, নারায়ণপুর, মেঠ্যানারায়ণপুর, বেলিয়াতোড়, ফুলবেড়িয়া, উয়াড়া, কাচ্ছালা, এনায়েৎপুর, ডাঙ্গারপাড়া ও খাতড়া মৌজার একাংশ। মোট জমি আবাদি জমি ২০৪ বিঘা। জঙ্গল ৬৮৪ বিঘা। ১৯৫৪ সালের হিসাবে গোবিন্দপুর অস্থলের দেবোত্তর সম্পদের আনুমানিক মূল্য ছিল ১৪৪৫৫১ টাকা। খাসচাষ, ভাগচাষীদের দেয়, প্রজাদের কাছে প্রাপ্য সাজা মিলিয়ে বছরে আয় ১০১০ মণ ধান ও নগদ ১৮০০ টাকা। জঙ্গলের কাঠ ও সোনাজমি থেকেও আয় হত। বার্ষিক ব্যয় ছিল ৬০০ মণ ধান। সেবছর অস্থল কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে ২০০ টাকার জ্বালানী কাঠ, ১৫০০ টাকার মাছ, ১০০ টি শাল গাছ, ১৬/১৭টি মহুয়া-নিম-চাকলতা গাছ ৫০০০ টাকায় বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। জানকীজীউয়ের সোনার গহনা ছিল দুগাছা হার, ছয় গাছা চুড়ি, সিঁথি, কানের দুল ইত্যাদি। জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির সময় অস্থলটি ক্ষতিপূরণ পায় ৪০৯৮ টাকা। অস্থলের প্রধান উৎসব ছিল জন্মাষ্টমী, দোলপূর্ণিমা, রাসপূর্ণিমা, অন্নকূট, ঝুলনযাত্রা, রামনবমী ইত্যাদি। পশ্চিমদেশ থেকে জামাইৎ আগমন উপলক্ষে অস্থলে উৎসবের অনুষঙ্গ

তৈরি হত। পঞ্চাশ-ষাটজন মহন্ত-সাধুসন্তের দল আসত হাতি-ঘোড়া-উটের পিঠে চেপে। মোষ-বলদ-গাধার দল বয়ে আনত তাদের জিনিসপত্র। উন্মুক্ত কৃপাণহাতে এই শোভাযাত্রীদের সাথে থাকত বিভিন্ন দেববিগ্রহ। এদের দেখতে আসা বিপুল ভক্ত-দর্শনার্থীদের ভোজনের ব্যবস্থা করত অস্থল কর্তৃপক্ষ।

জনশ্রুতি অনুসারে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি চৈতন্য সিংহের আনুকূল্যে দুই দলছুট বর্গী রামানন্দপন্থী ডাকাইসিনি এই অস্থলটি প্রতিষ্ঠা করে। অন্য একটি মতে আড়াইশো বছর আগে রঘুবীর দাস এর প্রতিষ্ঠাতা। তিন মহন্তের সন-তারিখ যুক্ত সমাধিও অস্থলে বর্তমান। প্রথমে জমি, জঙ্গল, বাগান নিয়ে অস্থলের ভূসম্পত্তির মোট পরিমাণ ছিল ৩০ একর। পরে বর্ধমানরাজ ডাকাইসিনি মৌজায় গোপাল জীউকে ৮৪ বিঘা আবাদী জমি দান করেন। কালাইপানি মৌজা ছিল নরসিংহ জীউয়ের সম্পত্তি। অস্থলের সম্পত্তি বাড়াতে মহন্ত রামরতন দাস কিছু ঘাটোয়ালী সম্পত্তি ক্রয় করেছিলেন। অস্থলে হত নিত্যসংকীর্তন, জন্মাষ্টমী। এখানে জামাইৎ ছাড়াও রামনবমী, রথযাত্রা, দোলযাত্রা, মহালয়া, পৌষসংক্রান্তি সহ বিভিন্ন উৎসব পালিত হত। অস্থলে গোপাল জীউ, নরসিংহ জীউ সহ অসংখ্য শালগ্রামশিলা পূজিত হত। এই অস্থলের অধীনে ছিল মাঞ্জমুড়া ও খটিল্যা শাখা অস্থল। সাত বিঘা জমিতে দেড়শো-দুশো বছর আগে সোনামুখীর শীতলজোড়া গ্রামে বিহারের গোপালগঞ্জের থেকে আগত কনৌজ ব্রাহ্মণ 'তেওয়ারী' পদবীর এক মহন্ত এই রামানন্দপন্থী অস্থলের সূচনা করেছিলেন। বর্ধমানরাজের কাছ থেকে শীতলজোড়ায় ৩০০ বিঘা জমি পায় এই অস্থল। ভাগ চাষীরা জমি চাষ করত ও চাষ বন্ধ করলে জমির অধিকার অস্থলের কাছে ফিরে আসত। আর সম্পত্তি হিসাবে ছিল সোনামুখী শহরে দু-তিন বিঘার কাঁঠাল বাগান, যেটিতে শিবগাজনে যোগ দিতে গিয়ে শীতলজড়ার লোক গরুর গাড়ি রাখত ও বিশ্রাম নিত। ১৯৫৩ সালে জমিদারি বিলোপের সময় অস্থলের হাতে থাকে মাত্র ১২ বিঘা জমি। অস্থলে আছে কষ্টিপাথরের মদনমোহন বিগ্রহ ও ২০ টি শালগ্রাম শিলা। রঘুনাথ জীউ সহ বেশ কিছু মূর্তি অপহৃত। আগে আট দিনের রাসোৎসবে তিনদিন দুপুরে অন্নভোগ পেতেন সন্নিহিত গ্রামের মানুষজন। জামাইৎদের আগমনেও উৎসবে মেতে উঠত অস্থলটি।

বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন রাজগ্রামে রামানন্দপন্থী অস্থলটি ১৮৩০ সাল নাগাদ বৃন্দাবন আগত জনৈক বাবাজী মহন্ত চৈতন্য কুন্ডের অপুত্রক সন্তানের দানে গড়ে ওঠে।[১০] অস্থলের জমি ছিল বনকাটী মৌজায় ১৮.৫৩ একর, উপরশোল মৌজায় ৮ একর,

আইলাকান্দি মৌজার অর্ধেক। কষ্টিপাথরের মদনমোহন ও অষ্টধাতুর রাধার আরাধনা হয় এই অস্থলে। এছাড়া আছে ১০৯ টি শালগ্রাম শিলা ও ২৪ টি দেববিগ্রহ। কার্তিক মাসব্যাপী বিশেষ সেবা উৎসব পালিত হয়। অস্থলটি জমিদারি বিলোপের সময় ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল ৪৭৫ টাকা।

ওন্দার খামারবেড়িয়া অস্থলটি প্রতিষ্ঠা করেছিল বর্ধমানের রাজগঞ্জের নিম্বার্কপন্থী সম্প্রদায়ের মহন্ত মহারাজেরা (এরা বর্ধমানরাজেরও পুরোহিত ছিলেন)। বর্ধমানরাজের কাছ থেকে প্রতিষ্ঠাতা অধিকারী পরিবার ৩২০ বিঘা জমি বন্দোবস্ত নেয়। মহন্ত নিয়েছিলেন ১০০ বিঘা জমির বন্দোবস্ত। মোট ১১২ বিঘা জমি থেকে খাস চাষ ও সাজা আদায় থেকে আসত ৩০০ কুইন্টাল ধান। অস্থলে ছিল গিরিধারী-রাধিকা, রাধারাণী জীউ, গোপাল-রাধারাণী জীউ, গোপীনাথ-রাধারাণী জীউ, মহাবীর জীউ, পঞ্চাশটি শালগ্রাম শিলা। এই অস্থলটি অবলুপ্ত হলে গিরিধারীর দায়িত্ব নেয় অধিকারী পরিবার ও বাকি বিগ্রহগুলি স্থানান্তরিত হয় ঝিলিমিলির তালগড়াস্থ বিষ্ণুদাস মহন্ত মহারাজের সিদ্ধাশ্রমে।[১১] অস্থলটিতে নিত্যপূজা ছাড়াও জন্মাষ্টমী ও দোলযাত্রা ধুমধাম করে পালিত হত। প্রাচীন এই অস্থলটি স্থাপিত হয়েছিল সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে। চৈতন্যদেবের মন্ত্রশিষ্য অদ্বৈতাচার্য খামারবেড়িয়ার শাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ সীতারাম অধিকারীকে গিরিধারী বিগ্রহ দিয়ে দীক্ষা দিলে খামারবেড়িয়া গ্রামে অস্থল প্রতিষ্ঠার সম্ভবনা তৈরি হয়। জনশ্রুতি পুরীযাত্রা পথে এই গ্রামে রামানুজদাস নাগা নাম্নী এক সন্ন্যাসী অসুস্থ হয়ে পড়লে অধিকারীদের আতিথ্যে কিছুকাল গ্রামে অবস্থান করে সুস্থ হন। এর পর সীতারাম ও ভক্তদের অনুরোধে তিনি গোপালবিগ্রহ সহ সীতারাম অধিকারী প্রদত্ত ১২ বিঘা জমিতে অস্থলের সূচনা করেন। গিরিধারী বিগ্রহও অস্থলের অংশ হয়ে যায়। অবশ্য জৈমিনি ব্রাহ্মণ বংশের বর্তমান মহন্তের দাবি অনুসারে অস্থলের প্রতিষ্ঠাতা উত্তর ভারত আগত লছমন দাস। সম্ভবত গোপাল সিংহের আমলে। এই পরিবাটি আবার ছিল রামানুজপন্থী।

১৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দে বিষ্ণুপুর শহরের নিমতলায় রামানুজপন্থী একটি অস্থল গড়ে উঠেছিল মল্লরাজ দুর্জন সিংহের আনুকূল্যে। এটির পরিচালক মিশ্র পদবীর কত্যায়ন গোত্রের কন্যাকুব্জ ব্রাহ্মণ পরিবার। প্রথম মহন্ত ছিলেন রাজস্থানের জয়পুরের রামধন দাস। মল্লরাজাদের মহন্ত নিয়োগের ক্ষমতা থাকায় অস্থলের কাজে রাজাদের হস্তক্ষেপ ঘটতে থাকে। এমনকি সূচিতা রক্ষা ও সুশাসনের অজুহাতে বিভিন্ন সময় মহন্তদের অপসারণের ঘটনাও ঘটতে থাকে। মহন্ত রামকৃষ্ণ দাসের সাথে রাজা রামকৃষ্ণ

সিংহদেবের প্রবল বিরোধ আদালত পর্যন্ত গড়ায়।[১২] রুষ্ট রাজা রামকৃষ্ণ তাঁকে বরখাস্ত করে চেলা ভরতদাসকে মহন্ত পদে নিয়োগ করেন। কিন্তু পরবর্তী রাজা নীলমণি সিংহদেব কাজে অবহেলার দায়ে এই ভরত দাসকে অপসারণ করে অন্য আশ্রমিক রঘুনাথ দাসকে মহন্ত হিসাবে নিয়োগ করেন। মহন্ত রঘুনাথ রানী চূড়ামণির অনুমোদন নিয়ে রামেশ্বর দাসকে তাঁর অবর্তমানে মহন্ত মনোনীত করে যান। বিহার প্রদেশাগত কনৌজ ব্রাহ্মণ মহন্ত রামেশ্বর অতীতের রীতি না মেনে অনিতাবালা তেওয়ারীকে বিবাহ করেন। রাজা কালীপদ সিংহঠাকুর এই ঘটনায় রুষ্ট হয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন। কিন্তু আদালতে রামেশ্বরের জয় হয়। তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র রামপ্রসাদ দাসকে পরবর্তী মহন্ত পদে বসাতে সক্ষম হন। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ৪ মার্চ তারিখে সম্পাদিত এক দলিল থেকে জানা যায়, বিষ্ণুপুর-ওন্দা-সোনামুখী থানার বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, মধুবন, কুশদ্বীপ, ঠেঙ্গারডাঙ্গা, চালতাকোন্দর, তালডাংরা, ডেঙ্গরপাড়া, ঠেঙ্গরতলা, চন্দ্রকোণা, মণিপুর, ভাজিবাড়ী, সোনাঝোড় ইত্যাদি মৌজার এক হাজার বিঘা ছিল অস্থলের দখলে। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হলে এই অস্থলের জমি অধিগৃহীত হয়ে পড়ে থাকে ৩২ বিঘা মাত্র জমি। গোপীনাথ জীউয়ের প্রজাবিলি সম্পত্তির অছি সরকারের কাছে বার্ষিক বৃত্তি পেত ১১১টাকা ৫৩ পয়সা। অস্থলে রঘুনাথ জীউ, গোপীনাথ জীউ, জানকী জীউ, লছমন জীউ, হনুমান জীউ, রাধিকা জীউ, ধ্বজাধারী ঠাকুর, আট-দশটি শালগ্রাম শিলার পূজা হয়। প্রধান উৎসব ছিল বিজয়া দশমী থেকে দ্বাদশী পর্যন্ত রাবণকাটা রথোৎসব। দশমীর দিন কাটা হয় কুম্ভকর্ণের মাথা, একাদশীর দিন ইন্দ্রজিতের ও দ্বাদশীর দিন রাবণের মুন্ড। রাজধানীর রাজপথে পরিক্রমা করত মুখোশ ও বিশেষ ধরণের পোষাক পরে বানরনৃত্য এবং বাদ্যভান্ড সমেত রাবণকাটা রথ।

বিষ্ণুপুর থানার শ্রীরামপুরে রামানুজপন্থী পরেশরাম দাস চার বিঘা জমিতে চৈতন্য সিংহের আনুকূল্যে একটি অস্থল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৭০ সালের পরপরই চৈতন্য সিংহ মহামারী কবলিত বিষ্ণুপুরে চুয়ামসিনা মৌজায় ১০৬৪ বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেন এই অস্থলকে। বিহারের ছাপরা জেলার রামচন্দ্রপুর থেকে তেওয়ারী পদবীর পরাশর গোত্রের এক কন্যাকুব্জ ব্রাহ্মণ পরিবার মহন্ত পদে অভিষিক্ত হন। অস্থলের ১০০ বিঘা জমি ছিল মবারকপুর মৌজায়। এছাড়া ছিল শ্রীরামপুর মৌজায় ৫০ বিঘা তড়াজমি ও তাঁতিপুকুর এবং কামাপুকুর মৌজায় ৫৭ বিঘা জঙ্গলজমি। অস্থলের গোশালায় ছিল শতাধিক গাভী ও মোষ। প্রধান উৎসব ছিল রামনবমী, জন্মাষ্টমী। জামাইৎ আগমন উপলক্ষে অস্থলে সমাগম হত ভক্তদের। শ্রীরামপুরে

দশরথি মহন্ত প্রতিষ্ঠিত আরেকটি অস্থল ছিল। এর ছিল ২৯ বিঘা গগনা পুকুর। বাঙ্গালী মহন্ত হওয়াতে অনেকে এটি অস্থল হিসাবে মানেন না।[১৩]

বীর হাম্বিরের রাজত্বকালে শ্রীনিবাস আগমন পূর্ব ১৫৯৫ সালে কোতলপুর থানার চাতরা অস্থলটি স্থাপিত হয়েছিল। সেই হিসাবে এটিই জেলার প্রাচীনতম অস্থল। রানী ধ্বজামণি পুরী তীর্থযাত্রা কালে সীতারামদাস নামের নাগা সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পেলে তাঁকে সীতারাম বিগ্রহ সমেত চাতরা গ্রামে অস্থল প্রতিষ্ঠা করতে আহ্বান করেন। অস্থলে আছে রঘুনাথ জীউ (রামসীতা), দশরথ পরিবারের সব সদস্যের বিগ্রহ। আর ১০৮ টি শালগ্রাম শিলা। এগুলি অপহৃত হওয়ায় এখন এখানে শুধুমাত্র অষ্টধাতুনির্মিত লক্ষ্মী-নারায়ণজীর পূজা হয়। চাষজমি, পুকুর, বন নিয়ে ১২০০ বিঘা ভূসম্পত্তি ছড়িয়ে ছিল চাতরা-কৃষ্ণনগর, চকনয়ন, শুকজোড়া, কুসুমদীঘি, ধুলাডাঙ্গা, আসুরালি মৌজায়।[১৪] জমিদারি প্রথার অবসানে অস্থলের জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮ একর। বছরে আয় ১৮০০০-২০০০০ টাকা। বড় উৎসব রাবণকাটা উৎসব। জামাইত্যা দলের আগমনে এলাকা উৎসব মুখর হয়ে উঠত। হাতি পিঠে চেপে আগত এই সব সন্ন্যাসী দলের বাহনের রসদের জন্য রোপণ করা হয়েছিল কয়েকটি বটগাছ। এই অস্থলের শাখা অস্থল ছিল সিহর-গোপীনাথপুর ও পানশিউলি গ্রামে। এই অস্থলে আছে রঘুনাথজীউ ও বড়গোঁসাইয়ের ভগ্ন মন্দির। মহন্তদের সমাধি মন্দির 'মঠ' আছে চাতরায় সাতটি ও সিহরে তিনটি। এই অস্থল থেকে রামসীতা, হনুমানজীউ, নাড়ুগোপালের বিগ্রহ ও শালগ্রাম শিলাগুলি চাতরা আশ্রমে স্থানান্তরিত হলেও চুরির হাত থেকে রক্ষা করা যায়নি। আশি বিঘার মত সম্পত্তির(মহন্তের মাঠ) এখন টিকে আছে মাত্র তিন বিঘা। মহন্তের বন ইতিমধ্যেই বন দপ্তরের হাতে গেছে। গ্রামের মাহিষ্য দে পরিবার ছিল এখানকার গোমস্তা। উত্থান একাদশী ও সরস্বতীপূজা ধুমধাম করে পালিত হত।

বীর হাম্বিরের আনুকূল্যে তালডাংরা থানায় লাগারগ্রামে একটি অস্থল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অস্থলের প্রতিষ্ঠাতা অযোধ্যাগত কনৌজ ব্রাহ্মণ অলকরাম বাবাজী সম্পর্কে কাহিনী হল বেনারস-পুরী সড়ক পার্শ্বে রামসাগর গ্রামের লাগারবাঁধে ধারে অবস্থানকালে হাম্বিরের রাজকর্মচারীরা বাবাজীকে অসন্তুষ্ট করে মাছ ধরে নিয়ে যায়। এর পর হাম্বিরের কন্যা অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি অলকরামের স্মরাণাপন্ন হন। বাবাজীর অলৌকিক ক্ষমতায় রোগ নিরাময় হলে হাম্বির আগদা, কুড়কুটিয়া, নাকাইজুড়ি ইত্যাদি মৌজায় ১৯৯ বিঘা নিষ্কর দেবোত্তর ভুমিদান করেন বাবাজীকে।

লাগার গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় অলকরামের রামসীতা মন্দির। তবে স্থাপত্য বিশ্লেষণ করে রথীন্দ্রমোহনবাবু এই অস্থলের প্রতিষ্ঠা গোপাল সিংহ বা চৈতন্য সিংহের সময়ে বলে অভিমত দিয়েছেন (১৯৩৮ সালে রামদাসের শিষ্য বিহারীদাস নতুন মন্দিরে রামমূর্তি সংস্থাপিত করে)।[১৫] রামানন্দপন্থী শ্রীসম্প্রদায়ের এই অস্থল পরিচালিত হত কলকাতার অফিস থেকে। ১৯৯ বিঘা জমির বেশিটাই চাষ হত রায়তী প্রজাবিলির মাধ্যমে। কিছু জমি ছিল খাস আবাদী। সেখান থেকে সাজা আদায় হত। লাঠিয়াল ও চাকরাণ মজুররা ছিল খয়রা সম্প্রদায়ের। মহন্তদের বন্ধকী তেজারতি কারবার ছিল। জমিদারি অধিগ্রহণের পর অবশিষ্ট ছিল ৩৫ বিঘা জমি। জমিদারি অধিগ্রহণের বিনিময়ে অস্থলটি ক্ষতিপূরণ বাবদ চিরকালীন বার্ষিক বৃত্তি পেয়েছিল ৫১২ আনা ১৪ আনা ২ পাই ও ১২৭৯ টাকা ১০ আনা ৭ পাই।

সিমলাপাল থানার বনকুল গ্রামের অস্থল স্থাপিত হয়েছিল আনুমানিক ১৭৫ বছর আগে। প্রতিষ্ঠাতা অযোধ্যাগত রামানুজপন্থী কনৌজ ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী কাঙ্গালীদাস। পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন পরগণার জমিদার চিরঞ্জীব সিংহচৌধুরী। শিলাবতীর তীরে গোলাপবাগান নামক ফলবাগানে মাটি ও খড়ের মন্দিরে স্থান পায় বালগোপাল, রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ। কাঙ্গালীদাস ছিলেন আদপে সিমলাপাল দিয়ে পুরীগামী জামাইত্যা দলের একজন। এই নাগা (লাগা) সন্ন্যাসীর থেকে স্থাননাম হয়েছিল লাগারডাং। সেই মৌজার ১৫০ একরের জমি সনাতি ৩/৪ টাকার নামমাত্র খাজনায় চিরঞ্জীব সিংহমহামাত্র সন্ন্যাসীকে চেকবন্দোবস্ত দেন। এটি ছিল একটি বনাবৃত ডিহি। মাত্র ১৫-১৬ একরের ধানী জমি থেকে বছরে সাজা খাজনা ছিল ৩৩ আড়া ধান আর গম-ঘি-গুড়-কাঠ ও বৈশাখ মাসে ভোগের ছোলা। এছাড়া জমি ছিল বরদি, জগন্নাথপুর মৌজায়। ১৯২২ সালের নদীর ভাঙ্গনে পুরাতন অস্থলটি তলিয়ে গেলে জমিদার মদনমোহন সিংহচৌধুরী বর্তমান অস্থলটি গড়ে দেন। প্রধান উৎসব হল জন্মাষ্টমী, ঝুলন, রামনবমী।[১৬]

সারেঙ্গার খয়েরপাহাড়ী অস্থলটি ছিল আসলে চন্দ্রকোণার মহন্ত মহারাজের দেবোত্তর জমিদারির চাষবাড়ি ও জমিদারি সেরেস্তা। চাষের কাজে নিয়োজিত ছিল কিছু সাঁওতাল ও কোড়া পরিবার। বেনাশলিতেও অনুরূপ একটি চাষবাড়ি ছিল। পরে সেখানে তিলি সম্প্রদায়ের চাষীদেরও আগমন ঘটেছিল।

ইন্দাস থানায় তিনটি নিম্বার্কপন্থী অস্থল ছিল যথাক্রমে হাজরাপাড়ায় (নিম্বার্ক বড় কুঠী), কৈবর্তপাড়ায় (নিম্বার্ক ছোট কুঠী), চারিগ্রাম ও আরেকটি পাত্রসায়েরের

জামকুড়িতে।[১৭] সবগুলিই বর্ধমান শহরের রাজগঞ্জ অস্থলের অধীনে ছিল। এই মুখ্য অস্থলের মহন্ত ছিলেন বর্ধমান রাজপরিবারের প্রধান পুরোহিত। জেলায় পত্তনি প্রথার প্রসারের সাথে সাথে এই অস্থল চারটি গড়ে ওঠে। বড় কুঠীর পত্তন ঘটেছিল গিরিধারীদাস মহন্তের হাতে ১৮৪৩ সালে। আরেকটি মতে ১৮৪০ সালে মহন্ত মধুসূদন দাসের হাতে বড়, ছোট ও চারিগ্রাম অস্থলের পত্তন ঘটে। অস্থলগুলির জমি ছিল ইন্দাস, দিবাকরবাটী, কৃষ্ণবাটী, গঙ্গাবাটী, মির্জাপুর, চারিগ্রাম, সাওতারি, পড়ারডাঙ্গা, রায়পাড়া, মনোহরপুর, বিহারপুষ্করিণী, জাগলদ্বীপ, সাপুরা, ফতেপুর, কুশমুন্ডি ইত্যাদি মৌজার পত্তনিতে। ইন্দাস মল্লবংশের দৌহিত্র বংশের দুটি দলিল থেকে জানা যায় (১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ২ মার্চ ও ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দের ১১ জুলাই সম্পাদিত) বর্ধমানের মহন্তমহারাজ এই পরিবারের কাছ থেকে পাত্রসায়েরের জামকুড়ি অঞ্চলে ৭৫ টাকা বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে চন্ডালবাটী মৌজায় ২২৯.৭৫ বিঘা জমি ও আরেক দলিল মূলে ৮ টাকা খাজনার বিনিময়ে হরিপুর মৌজার নিষ্কর লাখেরাজ ভূসম্পত্তি মোকাবরী বন্দোবস্ত নেন। বড়কুঠীর উত্তরে যে হাট অস্থল কর্তৃপক্ষ বসাতেন সেখানকার হাটুরিয়াদের কাছ থেকে তোলা হিসাবে নেওয়া হত তরিতরকারী ও শাকসব্জী। ১৯২০ সাল নাগাদ নিম্বার্কপন্থী এই চারটি অস্থলের জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল দশ হাজার বিঘার মত। চারিগ্রামের নগদ আদায় ছিল ৪০০০ টাকা। চারটি অস্থলের মূল বিগ্রহই ছিল গোপীনাথ জীউ। অন্যান্য বিগ্রহ সহ পাঁচ শতাধিক শালগ্রাম শিলাও পূজিত হত। ২০১৬ সালে কলুগড্যা পুকুরের পাঁক থেকে উদ্ধার হওয়া অষ্টধাতুর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ বিগ্রহ ছিল সম্ভবত অস্থলের। মূল উৎসব পনের দিনের ঝুলন, রথযাত্রা ও রাসোৎসব। ঝুলন যাত্রায় দপুরে ভুরিভোজ ও সন্ধ্যায় রামায়ণ গান আয়োজিত হত। অনুষ্ঠানে ইন্দাস মল্লরাজবংশীয় জমিদারদের বিশেষ সম্মান দেওয়া হত। এর কারণ ইজারা দেওয়া অস্থলের জমির মালিক ছিলেন এই বংশের জমিদারেরা। তাঁকে নাটমন্দিরে গালিচা শোভিত তাকিয়ায় বসতে দেওয়া হত। বড় থালায় দেওয়া হত বহু পদের আহার্য। আহারান্তে প্রদান করা হত সন্মানসূচক সুতির চাদর। হরিপুর ও চন্ডালবাটীর অস্থলের সম্পত্তির মালিক এই পরিবারকে সম্মান দেওয়ার মধ্যে একপ্রকার স্বীকৃতি ও মান্যতা প্রকাশ পেত। ইন্দাস রাজপরিবারের সাথে মহন্তদের সুসম্পর্কের প্রমাণ রাজপরিবারের অন্তঃপুরে মহন্তদের অবাধ যাতায়াত থেকে। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ২ মার্চের একটি দলিলে ইন্দাস সাবরেজিষ্ট্রার আবু সৈয়দের লিখিত মন্তব্য ছিল যে রাজপরিবারের চন্দ্রাবলী দেব্যাকে

সনাক্ত করেছেন রামচন্দ্র মহন্তের ধর্মপুত্র রামচন্দ্র দাস। ইন্দাস অস্থলের মহন্তরা অনেক বিনাশুল্কের গোচারণভূমির সৃষ্টি করেছিলেন। গ্রাম থেকে গোথান পর্যন্ত যাত্রাপথের ধারে ধারে গবাদি পশুদের পানের জন্য জলের চৌবাচ্ছা বানানো থাকত। ইন্দাসে পানীয় জলের জন্য গোপীকুন্ড ও রাধাকুন্ড নামের দুটি পানীয় জলের পুকুর খনন করা হয়েছিল। এটির শুদ্ধতা রক্ষা করতে অস্থল নিয়োজিত বরকন্দাজ নজরদারি রাখত। এসব উন্নয়নমূলক কাজ সত্বেও মহন্তদের বিরুদ্ধে প্রজাপীড়ন ও ব্যভিচারের কিছু অভিযোগ ছিল।[১৭ক] একবার উত্তেজিত জনতা (মতান্তরে দস্যুদল) বড় কুঠী ও ছোট কুঠী আক্রমণ ও লুন্ঠন করে অস্থলের আর্থিক ক্ষতি সাধন করে ও ছোট কুঠীর অত্যাচারী সেবাদাসী মন্ডবীকে ফুটন্ত তেলে পুড়িয়ে মারে। বিংশ শতকের প্রথম ভাগে ইন্দাস মল্ল জমিদার বংশীয় বলীন্দ্রনাথ সিংহদেব প্রথমদিকের মহন্ত ও মঠের আধ্যাত্ম ভাব ও দেবভাবের (dome of divinity) আভাস দিলেও অচিরেই এদের অধঃপতনের প্রকাশ নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন।[১৮] তিনি মনে করতেন অস্থলগুলি, "turned into a den of mischief and oppression– a hotbed of vices and immoralities. A deadly cramp has seized the whole moral organism of society."

## দেবোত্তর অছি ও পীরোত্তর সম্পদ

রাঢ় বাঁকুড়ার দেবোত্তর ও পীরোত্তর সম্পদের অস্তিত্ব এক স্বতন্ত্র সামাজিক ব্যবস্থার নজির। বহু ছোট বড় দেবোত্তরের মধ্যে ১৯ টি এমন পারিবারিক দেবোত্তরের বিবরণ নিচে দেওয়া হল।[১৯]

১) মল্লরাজাদের দেবোত্তর ২) অযোধ্যার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের দেবোত্তর ৩) মালিয়াড়া চন্দ্রাধ্বর্য্যু পরিবারের দেবোত্তর ৪) ভেলাইডিহা সিংহচৌধুরী পরিবারের দেবোত্তর ৫) শ্যামসুন্দরপুর তুঙ্গ পরিবারের দেবোত্তর ৬) ছাগুলিয়ার রায় পরিবারের দেবোত্তর ৭) পাথরার মন্ডল পরিবারের দেবোত্তর ৮ ) হদলনারায়ণপুরের মন্ডল পরিবারের দেবোত্তর ৯) হরিশ্চন্দ্রপুরের বেড়ে-খাঁ-মন্ডল পরিবারের দেবোত্তর ১০) বালসী নবকিশোর বিশ্বাস চৌধুরী পরিবারের দেবোত্তর ১১) সাসপুরের দে পরিবারের দেবোত্তর ১২) ময়নাপুরের মুখোপাধ্যায় পরিবারের দেবোত্তর ১৩) হাড়মাসড়ার রায় পরিবারের দেবোত্তর ১৪) বেলুট-গোবিন্দপুরের দেবোত্তর ১৫) দধিমুখার দেবোত্তর ১৬) বিষ্ণুপুর নিমতলার দেবোত্তর ১৭) রাজগ্রামের দেবোত্তর

১৮) সিমলাপাল বনকুল অস্থলের দেবোত্তর ১৯) রামকৃষ্ণ মিশ্রের দেবোত্তর।

মল্লরাজাদের দেবোত্তর অতি প্রাচীন। রাজা বীরমল্ল ১৫৪৫ খ্রিষ্টাব্দে এক্তেশ্বর জীউয়ের নামে এক্তেশ্বর-বাঁকুড়া-বেলগড়িয়া মৌজাত্রয়ের রাজস্ব অর্পণ করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। তবে এই দেবোত্তরের তথ্যভিত্তিক প্রমাণ মেলে ১৮৮০ সালের একটি একরারনামা থেকে। রামকৃষ্ণ সিংহদেবের পত্নী রানী ধ্বজামণি পট্টমহাদেবীর সাথে একরারনামা স্বাক্ষর করেছিলেন এক্তেশ্বর নিবাসী হৃদয়নাথ দেওঘরিয়া। দলিলে উল্লেখ আছে মল্লরাজ গোপাল সিংহের পৈত্রিক এক্তেশ্বর গ্রামে আছে নিষ্কর দেবোত্তর জমি। ধ্বজামণির শাশুড়িমাতা চূড়ামণি ছিলেন দেবোত্তরের পরিচারক। চূড়ামণির হয়ে দেবোত্তর পঞ্চক আদায় করতেন বিনোদ গঙ্গোপাধ্যায়। চূড়ামণি থেকে ধ্বজামণি যেমন পরিচারিকার দায়িত্ব পান, বিনোদের পর পঞ্চক আদায়ের ভার পান হৃদয়নাথ দেওঘরিয়া। বাইশ বিঘার বার্ষিক পঞ্চক ছিল দুই টাকা দুই আনা আড়াই পয়সা। ৭৩/১৬ মাপ ধান আদায় দিয়ে হৃদয়নাথ চাকরাণসূত্রে এক্তেশ্বর দেবোত্তরের দখলদার ছিলেন। পালা পার্বণে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি ও নগদ টাকার এক দশমাংশ পেত হৃদয়নাথ। হৃদয়নাথ-ধ্বজামণির একরারনামায় কর্তব্যে অবহেলা ও অবাধ্যতার কারণে পদচ্যুতির কথাও ছিল।[১৯ক] পরে এক্তেশ্বরের মেলা দু'টির স্বত্বাধিকারী হয়েছিলেন সত্যকিঙ্কর সাহানা। বালসী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউয়ের ও বেলুট-গোবিন্দপুর অস্থলের জন্য ভূমিদান ছিল চৈতন্য সিংহ-দামোদর সিংহের। শ্রীরামপুর অস্থলের জন্যেও ছিল মল্লরাজ চৈতন্য সিংহের ভূমিদান। ১৭১৯ সালের দিল্লীর বাদশাহ শাহআলম ও ১৭৫৩ সালের মল্লরাজ চৈতন্য সিংহ পীর কুরমাণ শাহকে মোট ৩১৪ বিঘা পীরোত্তর ভূমিদান করেছিলেন। স্বাধীনোত্তর কালে মল্লরাজ কালীপদ সিংহঠাকুরের জমি অধিগ্রহণের পর দেবোত্তর ক্ষতিপূরণ তালিকা থেকে জানা যায় মল্লরাজাদের দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল গোপীনাথ জীউ, মৃন্ময়ী, শ্যামচাঁদ জীউ, রাধাশ্যাম জীউ কেন্দ্রিক। মৃন্ময়ীদেবীর দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল তালডাংরা থানার বাকতোড় মৌজা ও বিষ্ণুপুর থানার চৌপেটা মৌজা। শ্যামচাঁদের দেবোত্তর ভূমি ছিল কোতলপুরের লাউগ্রামে ও তালডাংরা থানার হাটপাড়ড়া, রাধামোহনপুর, ব্রাহ্মণ্ডিহা, বিবরদা সহ ১৬ টি মৌজা। গোকুলচন্দ্রের দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল জয়পুর থানার আঙ্গারিয়া, গোকুলনগর, ভবানীপুর ইত্যাদি মৌজায়। মদনগোপালের দেবোত্তর ছিল বিষ্ণুপুর থানার তেঁতুলিয়া মৌজা। রাধাশ্যামের দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল বিষ্ণুপুর থানার তেঁতুলিয়া মৌজা, পুরসভা এলাকা, তালডাংরা থানার বৃন্দাবনপুর, জুড়াকাটি, ধুয়াকাটি, চাকতোড়

মৌজা। গোপীনাথ জীউয়ের সম্পত্তি ছিল বাঁকুড়া সদর থানার নবগ্রাম, বাঁকি, সেন্দ্রা, চাঁপাতড়া, বিদ্যাধরপুর, তালডাংরা থানার বাঁকতোড় মৌজায়। সরকার অধিগৃহীত দেবোত্তর প্রজাবিলি সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ হিসাবে ধার্য চিরকালীন বার্ষিক বৃত্তি নির্দিষ্ট হয় (১) মৃন্ময়ীদেবীর দেবোত্তর ২৯৫ টাঃ ১৫ আঃ ৫ পাই, (২) শ্যামচাঁদ জীউয়ের দেবোত্তর ৯৫০ টাকা ৫ আনা ৫ পাই, (৩) গোকুলচন্দ্র জীউয়ের দেবোত্তর ২১১৩ টাকা ৬ আনা ১ পাই, (৪) মদনগোপাল জীউয়ের দেবোত্তর ৩১২ টাকা ৯ আনা ১ পাই, (৫) রাধাশ্যাম জীউয়ের দেবোত্তর ৮২০ টাকা ১২ আনা ৯ পাই, (৬) গোপীনাথ জীউয়ের দেবোত্তর ৩৭২ টাকা ৮ আনা ৬ পাই।[২০]

মালিয়াড়া রাজ এস্টেটও অত্যন্ত পুরান। ১৯৪৪-৪৫ হিসাব বর্ষে কৃষি-আয়কর আধিকারিকের বিবরণে উল্লেখ আছে ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারির এক রোবকারির ভিত্তিতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এই দেবোত্তরের স্বীকৃতির কথা।[২১] এই সময় দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে মোট আয় ছিল ২৯৩৫০ টাকা। আরো উল্লেখ আছে ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ পৌষ মালিয়াড়া রাজপরিবারের ব্রজেন্দ্রনাথ ও কৃষ্ণগোপাল চন্দ্রাধ্বর্য্যু দেবোত্তর আয় দেবসেবায় ব্যয় হবে বলে একরারনামায় একমত হয়েছেন। ১৮৮৮ সালের ১২ জৈষ্ঠে রাজা ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত ইচ্ছাপত্রে ও পুত্র রাজেন্দ্রলালের পরবর্তী রাজা রাজনারায়ণের ১৯২২ সালের ১৪ জুনের শেষ ইচ্ছাপত্রে পূর্বপুরুষদের দেবোত্তর সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত দেবতা হিসাবে গোপালজীউ, পিয়ারীজীউ, সিংহবাহিনীজীউ, লক্ষ্মীমাতাজীউ, মনসামাতাজীউ, জরতকারুব্রহ্মজীউ, শবর শিবঠাকুরজীউ ইত্যাদি ২২ টি বিগ্রহ ও শালগ্রাম শিলার উল্লেখ আছে। অপুত্রক রাজা রাজনারায়ণ এই দেবোত্তরের সেবাইত হিসাবে রানী দুর্গাগতি দেবী ও দত্তক পুত্রকে মনোনীত করে যান। দেবোত্তর জমি ছিল বড়জোড়া থানার কুলডীহা, পিংরুই, গোকুল মথুরা, টিকরগ্রাম, মালিয়াড়া, মনোহর, নারিচা ইত্যাদি ও গঙ্গাজলঘাটি থানার হরেরডাঙ্গা, বড়লছিপুর, সারাংপুর ইত্যাদি মৌজায়।[২২] জমিদারি প্রথার অবসানে এই দেবোত্তর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ স্থির হয় (চিরকালীন বার্ষিক বৃত্তি ) ১৮৪০ টাকা ৭ পাই। পেয়েছিলেন সেবাইত রাজা নগেন্দ্রনারায়ণের পুত্র নৃপেন্দ্রনারায়ণ। ১৯২২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়া জেলা আদালতে একটি মামলার হলফনামায় রানী দুর্গাগতি দেবীর পক্ষে মালিয়াড়ার বৈদ্যনাথ পুত্র যশোদানন্দন তেওয়ারী সদ্যপ্রয়াত রাজা রাজনারায়ণের ত্যক্ত সম্পতির আনুমানিক মূল্য বলেছিলেন ২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬৩৩ টাকা ১১ আনা ১০ পাই। রাজার মৃত্যু

পরবর্তী চিকিৎসা-শ্রাদ্ধাদির ব্যয় ও ঋণ দাঁড়িয়েছিল ৫৯ হাজার ৫১৮ টাকা ৪ আনা।

জেলার শ্যামসুন্দরপুরে তুঙ্গ রাজপরিবারের দেবোত্তরও একটি প্রাচীন দেবোত্তর। ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সম্পাদিত রাজা ছত্রনারায়ণ দেউয়ের একটি দলিলে এই দেবোত্তর সম্পর্কে তথ্য আছে। এই দলিলের ভাষ্য অনুসারে উক্ত রাজার পিতা ও পিতামহ গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরজীউ, গোপালজীউ ও শালগ্রাম শিলার নিয়মিত পূজা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রার খরচ যোগাতে দান করেছিলেন ৫০ টাকা মূল্যের পঁচিশ আড়া সাজা ধান আদায়যোগ্য বাঁকুড়্যা মৌজায় ৩৪ বিঘা ১০ কাঠা জমি, বিশ টাকা মূল্যের দশ আড়া সাজা ধানের আদায়যোগ্য পাথরি মৌজার ২৩ বিঘা ১৫ কাঠা ৩১/২ ছটাক জমি, সাত টাকা খাজনার আসনবাটী মৌজায় সাত বিঘা জমি ও উক্ত মৌজায় কাত এগারো টাকা আদায়ের এগারো বিঘা জমি। কিন্তু সময়ের সাথে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে এই দেবোত্তর আয়ের বাইরে জমিদারি অর্থ ব্যয়িত হত।[২৩] ছত্রনারায়ণের রাজত্বে সেকারণে দেবতার নামে অতিরিক্ত ভূমিদান করা হয়েছিল। এই জমি ছিল একশো এক টাকা সাত আনা নয় গন্ডা খাজনার শ্যামরপচা মৌজার খাস পতিত জমি, দুশো কুড়ি টাকা আট আনা আট গন্ডা খাজনার লোদনা মৌজার খাস পতিত জমি, ঊনচল্লিশ টাকা খাজনার মারশোল মৌজার খাস পতিত জমি, চৌষট্টি টাকা খাজনার পাণিসহ সুরাগারী মৌজার খাস পতিত জমি, রারো টাকা খাজনার ছাকজবরা মৌজার খাস পতিত জমি, ছয় টাকা খাজনার সাড়িগাড়ি মৌজার খাস পতিত জমি। মোট আদায় হত ছয় শত ষাট টাকা সাত আনা ছয় গন্ডা। ছত্রনারায়ণের উত্তরাধিকারীই দেবোত্তর সম্পত্তির পরিচারক হবেন বলে দলিলে নির্দেশ দেওয়া ছিল। এ সম্পদ দান বা বিক্রয় নিরপেক্ষ ঘোষিত হয়। কোন পরিচারক দলিলের শর্তের বিপরীতে কাজ করলে শাস্তি স্বরূপ বিধান ছিল, "শ্রীশ্রী শ্রীমতি মহারাণী ভারতেশ্বরী ঐ সকল মৌজা ও জমি আপন খাস দখলে আনিয়া তাহার উৎপন্ন হইতে উপযুক্ত দেবসেবার কার্যাদি সম্পন্ন করাইবেন।" ১৮২৫ সালে পত্তন হওয়া এই দেবোত্তর ১৮৮৯ সালে শ্যামসুন্দরপুর জমিদারি নিলাম হয়ে গেলেও দেবসেবা অক্ষুণ্ণ রাখতে সহায়ক ভূমিকা নেয়। ১৯৫৩ সালে দেবোত্তর সম্পদ অধিগ্রহণের কালে সেবাইত ছত্রনারায়ণপুত্র কানাইনারায়ণ দেও ক্ষতিপূরণ (চিরকালীন বার্ষিক বৃত্তি) হিসাবে পান ২০০৭ টাকা ১৫ আনা ৭ পাই।[২৪] এই দেবোওর নথিগুলো থেকে সমকালীন দ্রব্য বিনিময়ের মাপ ও দাম সম্পর্কেও কিছু তথ্য মেলে। তুঙ্গভূমের আড়া মাপের উল্লেখ আছে ১৮৯৮ সালের নথিতে। বাঁকুড়ি পাইয়ে ১৬০

সের বা ১২৮ পাই সমান ১ মাপ। এখনকার হিসাবে এটি ৬৪ কেজি। ৮ পাইয়ে ১ কুড়ি ও ১৬ কুড়িতে ১ মাপ। তুঙ্গভূম অর্থাৎ রায়পুর-শ্যামসুন্দরপুর এলাকায় ১৮৭৮-১৮৯৮ সালের মধ্যে ১ আড়া (৭০ কেজি) ধানের দাম ছিল দুই টাকা মাত্র। ১৯৩৬ সালের কালপাথরের বাগ পরিবারের একটি নথি থেকে মাছের দাম দেখা যাচ্ছে কেজিতে ৩০ পয়সা। অর্থাৎ বর্তমানের নিরিখে দ্রব্যমূল্য কয়েক শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভেলাইডিহা রাজবাড়ির ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের একটি নিবন্ধীকরণ নথি ও ১৯৫৩ সালের সোনামুখীর 'ঘর' পরিবারের নিবন্ধীকরণ নথি থেকে বোঝা যায় জেলায় দুধ ও মাছের উৎপাদন ছিল প্রতুল। সব্জির মধ্যে বেগুনের চাষ ছিল ব্যাপক।

সিমলাপাল পরগণার বিভাজনের ফলে ১৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে ভেলাইডিহা তালুকদারির সূত্রপাত ঘটে। ১৯৪৭ সালের ৭ই আগষ্ট সম্পাদিত দুটি অর্পণনামা থেকে এই সিংহচৌধুরী পদবীর তালুকদারদের দুটি পুরান দেবোত্তরের সন্ধান মেলে। এই দুটি দলিল অনুসারে রাজা বিজয়চন্দ্রের পূর্বপুরুষগণ রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর নিত্যসেবা ছাড়াও জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, চন্ডীমন্ডপ ও নাটমন্ডপে দুর্গা-কালীপূজার আয়োজন হত জমিদারির আয় থেকে। এই দেবসেবা যাতে কোনভাবে বিঘ্নিত না হয় সেজন্য রাজা প্রাণবল্লভ কিছু সম্পত্তি পৃথক করে রেখেছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুর পর রাজা বিজয়চন্দ্র সিংহচৌধুরী দুটি পৃক অর্পণনামা নিবন্ধীকরণ করে রাধাগোবিন্দ ও দুর্গা-কালীমাতার জন্য দুটি দেবোত্তর এস্টেটের সৃষ্টি করেন। একটি রাধাগোবিন্দের নয় হাজার টাকার ২০০৫.৩৯ একর ভূসম্পত্তি ও অন্যটি দুর্গা-কালী মাতার জন্য চার হাজার টাকা মূল্যের ১৩৪৪.৬১ একর ভূসম্পত্তি।[২৫]

রাধাগোবিন্দের নিত্যসেবায় 'জায়া' বা উপাচার তালিকা হল চিড়া দুপাই, সোয়া দু-পাই আতপ চাল, পাঁচ পাই ওশনা চাল, এক পোয়া লবণ, দশ ছটাক ডাল, এক ছটাক পোস্ত, দশ তোলা জিরা, এক ছটাক লঙ্কা, এক ছটাক হরিদ্রা, দশ সের তরকারি, আধ সের দুধ, এক পোয়া গুড়, এক ছটাক ঘৃত, এক ছটাক তেল, এক আনা পান-সুপারি। জন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমী পর্ব দুটির জন্য উপাচার ছিল আধ মণ ময়দা, পাঁচ সের ঘৃত, পাঁচ সের গুড়, পাঁচ সের ডাল, আধ মণ কাঁচা তরকারি, এক সের লবণ,আট আনার মশলাদি, একহাত শালু কাপড়, চার হাত ধুতি, চার হাতি শাড়ি, হরিনাম সংকীর্তন, রসযাত্রা পরবে দুই সের আবীর, তিন সের সন্দেশ, একহাত শালু কাপড়, চার হাতি ধুতি, চার হাতি শাড়ি, এক মণ ময়দা, দশ সের ঘৃত, পনের সের

ছানা, পনের সের গুড়, পাঁচ সের দুধ, দশ সের ডাল, এক মণ কাঁচা তরকারি, পঞ্চাশটি ফুলছড়ি, এক মণ কেরোসিন। দেবোত্তর দোলযাত্রা ছিল আড়ম্বরপূর্ণ। নবম্যাদি কল্পারম্ভ থেকে বিজয়দশমী পর্যন্ত দুর্গাপূজার উপাচার হল একহাত শালুকাপড়, ছয় খানা শাড়ি, কুড়িখানা ধুতি, বত্রিশ হাত থান, চার কুড়ি ঘৃত, চার মণ ময়দা, আধ মণ ছানা, দুই কুড়ি দুধ, এক আড়া দধি, এক আড়া ধান, পাঁচ মণ গুড়, দুই মণ বিড়ি কলাই, এক মণ অড়হর ডাল, দশ সের মুগ ডাল, আধ আড়া আতপ চাল, তিন আড়া সিদ্ধ চাল, ছয় আড়া চিড়া, পাঁচ মণ কাঁচা তরকারি, এক মণ সরিষার ডাল, এক টিন কেরোসিন তেল, পাঁচ হাজার পান, দশ সের সুপারি, আধ মণ লবণ, আড়াই সের হরিদ্রা, দশ সের মিষ্টান্ন, কুড়ি টাকার রম্ভা-বাতাবী ফলাদি, তিন টাকার নানা জাতীয় পুষ্প-পল্লব-যজ্ঞকাঠ, কুড়ি টাকার দেবীপুরাণের বিধান অনুসারে মশলা, গন্ধদ্রব্য-ধূপধুনা-আসানাঙ্গুরীয়-মধুপর্কের বাটি ইত্যাদি, পঞ্চাশ টাকার প্রতিমা, দুটি চাঁদমালা, পনেরটি পাঁঠা, পনেরটি কুমড়া, পনেরটি আখ, দক্ষিণা পঞ্চাশ টাকা, দুশো টাকার নৃত্য ও বাদ্য, ছয় টাকার হাড়ি-কাঠপাতা, ছয় জোড়া শাঁখ।

শ্যামাপূজার উপাচার হল দুইহাত শালু, তিন খানা শাড়ি, পাঁচখানা ধুতি, যোলহাত থান, দুই কড়ি ঘৃত, এক মণ ময়দা, দশ সের ছানা, এক মণ গুড়, পাঁচ পাই দুধ, পাঁচকুড়ি দই, দুই আড়া চিড়া, এক আড়া সিদ্ধ চাল, চার কুড়ি আতপ চাল, চার কুড়ি ধান, বিড়ি কলাই আধ মণ, দশ সের অড়হর ডাল, পাঁচ সের মুগডাল, দুই মণ কাঁচা তরকারি, এক টিন কেরোসিন, আড়াই পোয়া লঙ্কা, দুই হাজার পান, পাঁচ সের সুপারি, আড়াই পোয়া তামাক, এক টিন সরিষার তেল, দশ সের লবণ, পাঁচ পোয়া হরিদ্রা, আড়াই পোয়া জিরা, আড়াই পোয়া লঙ্কা, দোক্তা পাঁচ ছটাক, আড়াই পোয়া খদির, দুই সের চুন, দশটি কলিকা, পাঁচ সের মিষ্টি, পনের টাকার ডাব-রম্ভা-বাতাবী ইত্যাদি ফল, পাঁচটি পাঁঠা, পাঁচটি আখ, পাঁচটি কুমড়া, দুই টাকার চাঁদমালা, দুই জোড়া শাঁখ, তিন টাকার পুষ্প-পল্লব-যজ্ঞকাঠ, এক টাকার হোমের কাঠ, পঁচিশ টাকার দেবীপুরাণের বিধান অনুসারে মশলা, গন্ধদ্রব্য-ধূপধুনা-আসানাঙ্গুরীয়-মধুপর্কের বাটি ইত্যাদি, দশ টাকার দক্ষিণা, একশো টাকার নৃত্য-বাদ্য, পঁচিশ টাকার হাড়িকাঠ পাতা। এই সব খরচ আসত দেবোত্তর সম্পত্তির আয় থেকে। ১৯৫৩ সালে জমিদারি প্রথার বিলোপের সময় রাধগোবিন্দ দেবোত্তরের ক্ষতিপূরণ (চিরস্থায়ী বার্ষিক বৃত্তি) স্থির হয়েছিল ৫৯২৪টাকা ৯ আনা ৩ পাই এবং দুর্গামাতা-কালীমাতা দেবোত্তরের জন্য ২০৬০ টাকা ৭ আনা ৪ পাই।[২৬] পূজার উপাচার তালিকা (ফর্দ)

থেকে বোঝা যায় বৈষ্ণব ভাবধারার পাশাপাশি শাক্ত মতে বলিদানও অনুষ্ঠিত হত। এলাকায় শৈব সাধনার পৃষ্ঠপোষকতা করত এই রাজপরিবার। ভেলাইডিহার এই দলিলগুলি থেকে জানা যায় পরগণায় দ্রব্য পরিমাপের একক ছিল আড়া মাপ। আট পাইয়ে এক কুড়ি, যোল কুড়িতে এক আড়া। একশো ষাট পাইয়ে একমাপ বলে আর একটি মাপও প্রচলিত ছিল।

অযোধ্যার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের পুরাতন দেবোত্তরের হদিশ মেলে ১৮৭৬ সালের ১৮ মে তারিখের সম্পাদিত অর্পণনামা থেকে। দলিলে স্বাক্ষর করেছিলেন প্রয়াত রামমোহনের দুই স্ত্রী শিবসুন্দরী ও হেমাঙ্গিনী, প্রয়াত লালমোহনের পত্নী দ্রবময়ী, প্রয়াত কৃষ্ণমোহনের পুত্র মহেশচন্দ্র, প্রয়াত গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায় রায়বাহাদুরের পুত্র বেণীমাধব, ভৈরবচন্দ্র, রাখালচন্দ্র, ঈশানচন্দ্রের পুত্র যোগেশচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র, পরিতোষ-পুলিন (নাবালক হওয়াতে মায়ের স্বাক্ষর), প্রয়াত গোপেশ্বরের পত্নী ধনকুমারী। অর্পণনামা অনুসারে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের রাধামোহন বিগ্রহ, শালগ্রাম শিলা, 'মৌরুষ' কাশীধামে প্রতিষ্ঠিত সপ্ত শিবলিঙ্গ, গ্রামের দ্বাদশ শিবলিঙ্গ, বৃন্দাবনধামে প্রতিষ্ঠিত বংশীগোপাল শালাগ্রাম শিলার নিত্যপূজা, যাত্রামহোৎসব, বার্ষিক শারদীয়া পূজা ও কার্তিকপূজা সহ বিভিন্ন কার্যাদি সম্পন্ন হত এই দেবোত্তর সম্পদ থেকে। রাধাদামোদরের নিত্যভোগের ভাগ কর্মচারী, পন্ডিত ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণের নির্দেশ ছিল। এদের কুলগুরু ওন্দা থানার গোপীনাথপুরের কাশীনাথ গোস্বামীর ঘরে রক্ষিত জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ইষ্টদেবতা গোপীনাথের দোলযাত্রার খরচও বংশানুক্রমে গোস্বামী পরিবার পেয়ে থাকত। ১৯৩১ সালে বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের দেবোত্তর সম্পদ নিয়ে মামলা হলে পরিবারের নির্বাচিত একজনকে ম্যানেজার নিয়োগ করে আদালত।[২৭] ১৯৫৩ সালের পরে অবশ্য জেলা জজ নিযুক্ত ম্যানেজারই এই সম্পদ দেখাশোনা করে। দেবোত্তর জমি ছড়িয়ে ছিল সোনামুখী, বিষ্ণুপুর, ওন্দা, গঙ্গাজলঘাটি, বড়জোড়া থানায় ঊনত্রিশটি মৌজায়। জমিদারি প্রথা বিলোপের পর ক্ষতিপূরণ (চিরস্থায়ী বার্ষিক বৃত্তি) হিসাবে দেবোত্তর কর্তৃপক্ষ পায় ৬৩১৭টাকা ৮০ পয়সা।

হদলনারায়ণপুরের মন্ডল পরিবার ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ মে একটি অর্পণনামায় পরিবারের পূজিত রাধাদামোদরচন্দ্র, বিশ্বেশ্বর শিবঠাকুর, দুর্গামাতা, সরস্বতী, কর্তাদামোদর, হনুমানজীউ দেবতার সেবা পূজা ও দুর্গোৎসব, রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা ইত্যাদি পর্বানুষ্ঠানের খরচ নির্বাহের জন্য

তিন হাজার নশো নিরানব্বুই টাকা সময়োচিত মূল্যের ৩০০ বিঘা দেবোত্তর জমির ব্যবস্থা করে। এর সাথে ছিল মন্দির নির্মাণ ও সংরক্ষণ, অতিথিসেবা ও সেবাব্রতের মত বিষয়গুলি। দলিল অনুসারে কীর্তিচন্দ্র, রাসবিহারী ও উপেনচন্দ্র মন্ডলদের নিয়ে তিনজনের পরিচারক নিয়োগ করা হয়। দেবোত্তর জমিগুলি ছিল সোনামুখী, পাত্রসায়ের ও বড়জোড়া থানার তিরিশটি মৌজায়।[২৮] পরিচারিকা হত শুধুমাত্র মন্ডল বংশের থেকে। ১৯৫৩ সালের জমিদারি প্রথা বিলোপের পর পরিচারক নারায়ণচন্দ্র, মাধবচন্দ্র, দেউলেশ্বর মন্ডল পান ৪৫১৬ টাকা ৫ আনা ১১ পাই ক্ষতিপূরণ।[২৯] বর্তমানে দেবোত্তর থেকে আয় হয় পাঁচ কুইন্টাল ধান।

বাঁকুড়া সাব-জজের আদালতে দায়ের করা ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের ৮৬ সংখ্যক দেওয়ানী মামলায় বাদী পক্ষের ১৮ জন ও বিবাদী পক্ষের ৫৩ জনের মধ্যে যে সোলেনামা স্বাক্ষরিত হয় তার থেকে হাড়মাসড়ার রায় পরিবারের দেবোত্তর নিয়ে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে নদের চাঁদ রায়ের সাথে নীলকর গিসবর্ণ কোম্পানীর একটি চুক্তি থেকে বোঝা যায় তাঁর পিতা বর্ধমানের কোগ্রাম নিবাসী পদ্মলোচন রায় সিমলাপালের রাজকর্মচারী হিসাবে হাড়মাসড়ায় বসতি স্থাপন করে কয়েক দশক আগে। পদ্মলোচনের মৃত্যুর পর তিন পুত্র দুর্গাচরণ, নদেরচাঁদ, কালীচরণ পালাক্রমে প্রতিবছর দুর্গাপূজা আয়োজন করতে থাকেন। এই পূজা সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট তালডাংরা থানার হাড়মাসড়া, কোবাগুলি, রেতসপুর, জেমুয়া, নবগ্রাম মৌজায় প্রজাবলি জমি এবং জেমুয়া-হাড়মাসড়া মৌজায় ৬৭.২৫ একর খাসজমি, কোনোগুলি মৌজায় ২৭.৬৬ একর জমি পুকুর সহ। জমিজমার উৎপন্নাদি ও সাজাখাজনা ছাড়া মৎস্য বিক্রি থেকে আয়ের সংস্থান ছিল। জমিদারি অবসানে সরকার অধিগৃহীত দেবোত্তর জমির বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ হিসাবে বার্ষিক বৃত্তি নির্দিষ্ট হয় ৪০৮ টাকা ৩ আনা ৪ পাই।[৩০] দুর্গামাতার সম্পদ ছিল সীতাহার একগাছা, চিক একটি, এক গাছা বিছাহার, তেঁতুলপাতার হার একগাছা, নথ চারটি, সোনাবাঁধানো লোহা পনেরোটি, টিকলি দুটি, টিপ নয়টি, চোখ চারটি। দেবতার আটত্রিশটি সোনার গহনার ওজন ছিল পনেরো ভরি তিন আনা ও ছেচল্লিশটি রূপার গহনার ওজন চুয়াল্লিশ ভরি আট আনা।

কুচিয়াকোলের মল্লশাখা বংশের জমিদার রায় যোগেন্দ্রনারায়ণ সিংহদেবের ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ অক্টোবর ও ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের ৩ আগষ্ট সম্পাদিত উইল অনুসারে দেবোত্তর এস্টেট ও তার সেবাইত/পরিচারক সম্পর্কিত বিষয়গুলি স্পষ্ট

করে দেওয়া হয়। ৩৩২৮ কোর্ট ফির বিনিময়ে উইলটির প্রোবেট মঞ্জুর হয় ১৯৩২ সালের ১৬ মে। এই নিবন্ধীকৃত ইচ্ছাপত্র অনুসারে দেবোত্তরের অছি ও নির্বাহক ছিলেন যোগেন্দ্রনাথের তিন নাতনীর মামা চিল্কিগড়ের রাজা জগদীশচন্দ্র ধবলদেব, ছোট নাতনীর শ্বশুর রাজা নন্দকিশোর সিংহ বাহাদুর, ভাগ্নে কুমার ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ, নাতজামাই ক্ষেত্রমোহন সিংহঠাকুর। পরের প্রজন্মের নির্বাহক ছিলেন জগদীশচন্দ্র মনোনীত (১৯৪৮ সালের ২৬ আগষ্ট এই নিবন্ধীকৃত ইচ্ছাপত্রমূলে) ভুবনেশ্বর নারায়ণ এবং ইন্দ্রনারায়ণ পুত্র শান্তিপ্রসাদ সিংহ (১৯৪৯ সালের ১০ আগষ্টের এক ইচ্ছাপত্রমূলে)।[৩১] যোগেন্দ্রনাথ জমিদারির পরিধি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যত্নবান ছিলেন। লাট রঘুনাথপুরের চার হাজার টাকা দিয়ে সাড়ে পাঁচ আনা অংশ, পাঁচ নং তৌজির লাট কুচিয়াকোলের জমিদারি বহির্ভুত অংশটুকু বিয়াল্লিশ হাজার টাকায় কিনে নেন। চৌষট্টি নং তৌজির লাট জুনগড়ার অর্ধাংশ ও বিভিন্ন  তৌজির শরিকদের 'খুচরান'ও তিনি কিনে নেন। নতুন সম্পত্তি ক্রয় করতে ও অন্যান্য ঋণ শোধ করতে প্রায় লক্ষাধিক টাকা তিনি জীবদ্দশায় জোগাড় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইচ্ছাপত্রে উদ্বৃত্ত অর্থে জমি ক্রয় ও তার থেকে অতিরিক্ত আয় দিয়ে জমিদারির অন্তর্গত সব সরোবরের পাঁক পরিষ্কারের নির্দেশ ছিল। সরকারের রাজস্ব পরিশোধে যাতে কোন বিঘ্ন ঘটে তার জন্যে জমিদারি আয়ের এক অংশ দিয়ে দশ হাজার টাকার একটি কর্পাস তহবিল রাখার ব্যবস্থা ছিল।

তিনি দেবোত্তর ইচ্ছাপত্রে গৃহদেবতা গোপলবিশ্বরূপ জীউয়ের নিত্যসেবা, দোলোৎসব, দুর্গোৎসবের জন্য এক হাজার টাকা নির্দিষ্ট করেন। যোগেন্দ্রনাথের তিন নাতনি বীরাঙ্গনা, ব্রজঙ্গনা, দিব্যাঙ্গনা আর ভাগিনেয় ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ ছিলেন জমিদার নিযুক্ত সেবাইত। ইচ্ছাপত্রে রাজবাটীতে অবস্থানরত কনিষ্ঠ ভগিনী, বিধবা পুত্রবধু, ভাতৃজায়ার জন্য তিনি খোরাকি ও বিবাহ-শ্রাদ্ধাদির খরচও নিশ্চিত করেন। বংশানুক্রমিক পূজারী দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কুলদেবতার সেবার জন্যে বেতন ছাড়াও পেতেন নিত্যসেবার আমান্ন, প্রসাদের অংশ ও বার্ষিক খোরাকি হিসাবে কুচিয়াকোলী পাই মাপের ছয় মাপ ধান বা ষাট টাকা। এই ইচ্ছাপত্রের একটি বিশেষ দিক হল জনসেবামূলক বিভিন্ন নির্দেশ। যেমন (১) বার্ষিক ১৫০ টাকা সাহায্য প্রাপ্ত বঙ্গ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। (২) বার্ষিক দুশো টাকা সাহায্যপ্রাপ্ত প্রয়াত বসন্তকুমারের নামে একটি দুই হাজার টাকা ব্যয়ের ভবন প্রতিষ্ঠা। (৩) পিতৃদেব প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভ ইনস্টিটিউশন ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়টির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দ বার্ষিক ছয়

শত টাকা। ভালো ছাত্রদের ছাত্রবৃত্তি ও স্বর্ণপদক নির্দিষ্ট করা হয়। (৪) সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর ভবনের জন্যে দুই হাজার টাকা ও বার্ষিক ষাট টাকা বরাদ্দ। পারিবারিক বরাদ্দের টাকা যখন কাজে লাগবে না তখন সেই বরাদ্দও বেতন, ছাত্র খোরাকি, পুস্তকাদির ক্রয়ে ব্যবহারের নির্দেশ ছিল। পরিবারের সদস্যদের লোকান্তরিত হওয়ার পর এই বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে একশো টাকায় দাঁড়ায়। (৫) রাজবাটীতে চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রসারের জন্যে একটি ডিসপেন্সারি ছিল, যার ঔষধ সমেত চিকিৎসক খরচ বাবদ বছরে তিনশ টাকা নির্দিষ্ট করা ছিল। ১৯৫৩ সালের জমিদারি অধিগ্রহণের সময় এই সেবা কাজ ও দেবসেবা অব্যাহত রাখার জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে বার্ষিক বৃত্তি ছিল (১) গোপালবিশ্বরূপ জীউ ১০৬০ টাকা (২) রাধাবল্লভ ইনস্টিটিউশন ৬০০ টাকা (৩) বসন্ত গ্রন্থাগার ৩৫০ টাকা (৪) বঙ্গ বিদ্যালয় ১৫০ টাকা (৫) এস্টেট ডিসপেন্সারি ৩০০ টাকা (৬) সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ১২০০ টাকা (৭) রাধাবিনোদ জীউ ৭৫ টাকা। দেখা যাচ্ছে সরকার যোগেন্দ্রনাথের ইচ্ছাপত্রে বরাদ্দ টাকাই ক্ষতিপূরণে অবিকৃত রেখেছে। ইচ্ছাপত্রে আরেকটি অভিনব বিষয় ছিল কুচিয়াকোলের 'ভূষণ' পদবীধারী পরিবারের কুলদেবতা রাধাবিনোদজীউয়ের সেবা ও রথযাত্রা জন্য বার্ষিক পঁচাত্তর টাকা বরাদ্দ। এরা ছিল আদিতে মল্লরাজাদের প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর জমিভোগী ও 'ভট্টাচার্য' পদবীধারী। উত্তরকালে বিদ্যানুরাগী কুচিয়াকোল মল্লশাখাবংশে কাছে এই বিদ্যান পরিবারটি 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি পায়। সেটি পরে সংক্ষিপ্ত হয়ে 'ভূষণ' হয়ে দাঁড়ায় ও বাসস্থান ভূষণপাড়া নামে পরিচিত হয়। এরা রথযাত্রার দিন রাজার অনুমতি নিয়ে রথযাত্রা শুরু করে ও সোজারথ থেকে উল্টোরথ পর্যন্ত রথকে রাজবাটীতে অবস্থান করায়। সেই সঙ্গে সাত দিন রাজপরবারকে প্রসাদ প্রদান করে।[৩২]

হুগলী জেলাগত নিধিকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মল্লরাজের দেওয়ান শরোত্তর রায়ের কন্যাকে বিবাহ করে ময়নাপুর গ্রামে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন।[৩২ক] তাঁর সন্তান চন্ডীচরণ মল্লরাজের দেওয়ান পদে অভিষিক্ত হয়ে প্রভূত ভূসম্পত্তির মালিক হন। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের এক অর্পণনামা (চন্ডীচরণের দুই পুত্র কালীপ্রসাদ ও তারিণীপ্রসাদের সাক্ষাৎ মৌরুষ সারদাকিঙ্কর ও জ্ঞানদাকিঙ্কর সম্পাদিত) থেকে জানা যায় চন্ডীচরণ-কালীপ্রসাদ প্রতিষ্ঠিত দুর্গামাতা, কালীমাতা, লক্ষ্মীজনার্দন, অনাদিলিঙ্গশিব, লক্ষ্মীদেবী, সরস্বতী, ষষ্ঠীদেবীর সেবাপূজা ও জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, দোলযাত্রা, শিবরাত্রি পর্বোনুষ্ঠানের খরচ নির্বাহে নতুনগ্রাম মৌজায় সাতাশ বিঘা জঙ্গল, পঞ্চাশ বিঘা ধান জমি, তিনটি পুকুর; গোপীনাথপুর মৌজা থেকে একশো সাঁইত্রিশ টাকা আয়; বাজে

ময়নাপুর থেকে একশ পাঁচ টাকা, একুনে দুশো বিয়াল্লিশ টাকা ও একশো মাপের সাজা ধান (মোট সময়োচিত মূল্য দুই হাজার টাকা) স্থির করা আছে। শরোত্তর রায়ের সময় দেবসেবার আয় আসত নতুনগ্রাম, বাজেময়নাপুর, ময়নাপুর মৌজার আয় থেকে।[৩৩] উল্লেখ্য শরোত্তর রায়ের পুত্র সন্তান না থাকায় কুলদেবতা লক্ষ্মীজনার্দন শিলা দৌহিত্র বংশীয় চন্ডীচরণ-পদ্মলোচনের পরিবারে স্থানান্তরিত হয়। উত্তর প্রজন্মের চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় পরিচারক হিসাবে থাকলেও বংশের কুলদাপ্রসাদ প্রতিষ্ঠিত সিউড়ি ভবতারিণী কালীবাড়ির সেবাইতদের হাতে নিয়োগ ইত্যাদি ক্ষমতা দিয়ে রাখা হয়েছিল। জমিদারে অবসানে এখানে চিরকালীন বার্ষিক বৃত্তি নির্দিষ্ট হয়েছিল ৩৬২ টাকা ১৫ আনা ১ পাই।[৩৪]

সোনামুখীতে বাণিজ্য ও জমিদারি ব্যবসাতে সফল ও বিত্তবান ঘর পরিবার, মহাদানী পরিবার, হরিশ্চন্দ্রপুরের বেড়ে পরিবার, বিড়ড়া গ্রামের মন্ডল, বালসী গ্রামের বিশ্বাস-চৌধুরী পরিবার, শালতোড়ায় শিখর বংশ, ওন্দা-ছাগুলিয়ার রায় পরিবার, কালপাথরের বাগ পরিবার, সাঁসপুরের কেশ পরিবারের দেবোত্তর সম্পদের সন্ধান পাওয়া যায়। জমি ও তেজারতি ব্যবসায়ে বিত্তবান ছাগুলিয়ার রায় পরিবারের তরফে ১৮৯৪ সালের নভেম্বরের এক নিবন্ধীকৃত দলিলে রাধাদামোদর শালগ্রাম শিলা ও শিবঠাকুর জীউয়ের নিত্যসেবা ও বিভিন্ন উৎসব পালনের জন্য ওন্দা ও তালডাংড়া থানার সতেরোটি মৌজার ৭২০০ টাকা মূল্যের ভূসম্পত্তি, নগদ ২০১ টাকা, ২৯ মাপ ধান (তৎকালীন মূল্য ৯৪ টাকা ১২ আনা), মোট ৭৮৯৫ টাকা ১২ আনা মূল্যের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নির্দিষ্ট করা হয়। ২০১ টাকা, ২৯ মাপ ধান ছিল চিরকালীন মজুত। জমিদারি অধিগ্রহণে ক্ষতিপূরণ হিসাবে বার্ষিক চিরকালীন বৃত্তি ছিল ৪৪৬৮ টাকা ১২ আনা ৪ পাই।[৩৫] দেবোত্তর অর্পণনামায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণভোজনের আমন্ত্রিতের সংখ্যা ও খাদ্যতালিকাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া ছিল। চাচরি ও দোলযাত্রায় দ্রব্যভিত্তিক খরচ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল অর্পণনামায়।

সোনামুখীর শ্যামনগর মহল্লার গন্ধবণিক ঘর পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সন্তোষ ঘর। পৌত্র লাগারাম ঘরের শ্রীবৃদ্ধির চরমে পৌঁছায় বর্ধমানরাজের পত্তনিদার লাগারামের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ রাধিকাপ্রসাদের সময়। ১৯৫৪ সালের পরিবারের বত্রিশজনের স্বাক্ষরিত কুলদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণের সেবাপূজা, শিবঠাকুর ও উৎসবের জন্য অনিবন্ধীকৃত অর্পণনামায় সোনামুখী থানার সোনামুখী, ধুলাই, সাহাপুর, বৈকন্ঠপুর, জামবনী, খয়রাকুঁড়ে, বোন্দলহাটি, শ্যামবাজার মৌজা ও গঙ্গাজলঘাটির

বৃন্দাবনপুর মৌজায় ১৯০.০৯ একর (তৎকালীন সময়োচিত মূল্য তেরো হাজার টাকা) জমি দেবোত্তর রাখা হয়।[৩৬] জমিদারি অধিগ্রহণে ক্ষতিপূরণ হিসাবে এই দেবোত্তরের বার্ষিক চিরকালীন বৃত্তি ছিল ১৬২৩ টাকা ৮ আনা ৫ পাই।[৩৭]

সোনামুখী শহরের বাজারপাড়ার রাজেন্দ্র মহাদানী (১৮৫০-১৯২৪) নীলকর জে সি এরস্কিনের নীলকুঠি ও গালাকুঠিসহ যাবতীয় সম্পত্তি কিনে নিয়ে ও বর্ধমানের রাজার কাছ থেকে পত্তনি লাভ করে বিত্তবান হয়ে ওঠেন। ১৮৮৪ সালে কোজাগরী লক্ষ্মীর দেবোত্তর হিসাবে সময়োচিত ৫০০ টাকা মূল্যের ভূসম্পত্তি নির্দিষ্ট করা হয় যার থেকে বার্ষিক আয় ছিল ৫০ টাকা (৪০ টাকা পূজার ও ১০ টাকা মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের জন্য)। ১৯১১ সালে সময়োচিত ৭০০ টাকা মূল্যের আরো ভূসম্পত্তি এই দেবোত্তরের সাথে যুক্ত করা হয়। সাত বছর পর রাজেন্দ্র মহাদানী দুই দুহিতাকে ২৮৩৯২ টাকার নিরূপণ দলিল করে সমস্ত সম্পত্তি ও দেবোত্তর পরিচারিকার দায়িত্ব দিয়ে চিরকালের জন্য  কাশীবাসী হন। এই দেবোত্তর ছিল ব্যক্তিগত দেবোত্তর।[৩৮]

সোনামুখী থানার দুর্গম, জঙ্গল ও অনাবাদি জনবিরল এলাকাগুলি চাষের আওতায় আনার জন্য বর্ধমানের রাজা চার বছর কর ছাড় দিয়ে পত্তনি দিতে শুরু করেন। এই সুযোগে অযোধ্যার নিকটে বিড়ড়া গ্রাম থেকে তিলি চাষি গোপাল বেড়ে হরিশচন্দ্রপুরে ও গোলাম মন্ডল পাথরা গ্রামে বসতি ও সেরেস্তা প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৯] গোপাল বেড়ে রাজার কাছ থেকে ৫৭ টাকা খাজনায় ৮০ বিঘা ও অন্যত্র ৪৮ টাকা ৬ আনা খাজনায় ৬০ বিঘা জমি পত্তনি নেন। এই উদ্যমী ও পরিশ্রমী পুরুষ নিজ হাতে চাষ করতেন। কোবালামূলে ও নিলাম ক্রয়ের মাধ্যমে আরো জমি তাঁর দখলে এলে কিছু অংশে সাজা খজনার প্রজাবিলি করতে হয়। এইভাবে তাঁর খাসদখলী প্রজাবিলি সকর-নিষ্কর জমি দাড়িয়েছিল ৩১৫.৩৫ একর।  এই বংশের কুলদেবতা বংশীগোপাল জীউ ও লোচনচন্ডী মহামায়া প্রতিষ্ঠা হয় ১৮০৮ সালে।  পৌত্র চন্দকান্ত বেড়ে ছিলেন ধার্মিক, সদাশয় ও পরদুঃখকাতর। অতিথি-অভ্যাগত, অনাথ, দরিদ্ররা সেবা পেত দ্বিতল কোঠাবড়িতে আয়োজিত সদাব্রত। এই বাড়িতে থাকত অতিথি থাকার ঘর, ভান্ডার ঘর, রান্নাঘর। তবে তাঁর মৃত্যর পর দেবসেবায় প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা আনতে ১৯৪২ সালে দেবোত্তর সম্পদ ও পরিচালনা কাজ নিবদ্ধীকৃত অর্পণনামার বাঁধনে আনা হয়। পরিচারক ছিলেন সতীশচন্দ্র, অতুচন্দ্র, রামকান্ত, নলীনাক্ষ, রামকৃষ্ণ এবং দৌহিত্র বংশের রামরতন। জমিদারির অবসানে চিরকালীন বার্ষিক বৃত্তি ৪২০৭ টাকা ২৬

পয়সা খরচ করতেন পরিচারকবর্গ হরিনারায়ণ, উমাপদ, সুধাংশু, শান্তিময় ও দৌহিত্র বংশের উমাশঙ্কর খাঁ, উমাপদ কুন্ডু।

একই ভাবে পাথরা গ্রামে গোলাম মন্ডল রায়তী মোকাররী চাষি হিসাবে পত্তনি নেন বর্ধমানের রাজার কাছ থেকে। জমিদারি এলাকায় ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা ঘটে কালাচাঁদ, বংশীবদন, রামেশ্বর শিবের। আয়োজিত হতে থাকে সরস্বতী পূজা, গ্রামদেবতার আরাধনা, যাত্রানুষ্ঠান, পালা-পার্বণ। ১৯৩০ সালে এক নিবন্ধীকৃত দলিলে সোনামুখী থানার জয়নগর তরফে নতুনগ্রাম, বহড়াবুনি, মথুরাবাটী, ইছারিয়া মৌজায়; বড়জোড়া থানায় সাউলিয়া; বিষ্ণুপুর থানায় নারীকোলা, চুয়ামসিনা মৌজায় ৩৫০০ টাকা সময়োচিত মূল্যে একুনে ৩৯০.৯৯ একর দেবোত্তর জমি নির্দিষ্ট করা হয়। এই অর্পণনামা হয়েছিল গোলামের প্রপৌত্রের সময়ে। পরিচারক ছিলেন যুগোলকিশোর, বৈকন্ঠনাথ, শরৎচন্দ্র, কেদারনাথ, গোলকবিহারী, ভূষণচন্দ্র, রামকৃষ্ণ। পরিমাণের হিসাবে পাথরা দেবোত্তরের ক্ষতিপূরণ (চিরকালীন বার্ষিক বৃত্তি) ছিল জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ আগষ্টের ক্ষতিপূরণ রোল অনুসারে এই বৃত্তি ছিল ৮৩৯৭ টাকা ৬ আনা।[৪০]

বালসী গ্রামের আদি দেবতা বাল্লেশ্বর শিবের সেবাইত হিসাবে গ্রামে তিলি বংশীয় চৌধুরী ও বিশ্বাস পরিবারের আগমন ঘটে। চৌধুরীদের কুলদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ জিউয়ের জন্য বালসীতে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৫২ খ্রিষ্টাব্দে। বালসীতে এসেছিল বাল্লেশ্বর শিবের পুরোহিত হিসাবে মিশ্র পরিবার এবং দেবতার পায়স (মনুই) রান্নার জন্য বটব্যাল পরিবার। শিবরাত্রি ছাড়াও ১৮ চৈত্র থেকে চৈত্র সংক্রান্তি পর্যন্ত আয়োজিত হয় গাজন উৎসব। এসময় রামায়ণ পাঠ ও মনুই ভোগ হয়। বিশ্বাস পরিবারার থেকে হন পাটভক্ত্যা। ১৯২১-২২ সালের সি এস রেকর্ডে বাল্লেশ্বরের সেবাইত ছিলেন গদাধর বিশ্বাস ও সারদাপ্রসাদ চৌধুরী এবং ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দোত্তর রিভিসনাল সেটেলমেন্টের সময় সেবাইত ছিলেন গদাধর বিশ্বাস ও বলহরি চৌধুরী। সি এস রেকর্ড অনুসারে দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল বালসী, নবকিশোর, মহেশনন্দী, সজকুঁড়ি মৌজায়।[৪১] এস্টেটের খাসদখলী ও প্রজাবিলি সম্পত্তি ছিল ৬.৪৬ একর। জমিদারি অবসানে ক্ষতিপূরণ (চিরকালীন বার্ষিক বৃত্তি) ছিল ১৪০ টাকা ১ টাকা ৬ পাই।[৪২] শোনা যায় মল্লরাজারা বালসীতে দেবোত্তর হিসাবে ৯৭৫ বিঘা জমি দান করেছিলেন। বালসীর লক্ষ্মীনারায়ণ সেবা নিয়ে স্বত্বাধিকারী দ্বাদশ তিলি বংশীয় চৌধুরী ও কশ্যপ গোত্রের চট্টোপাধ্যায় পূজারির মধ্যে ঘোর বিবাদ শুরু হলে ১৯১৯ সালের

২২৬ নং দেওয়ানী মামলায় একটি আপোষনামা স্বাক্ষরিত হয়। আপোষনামায় দেবোত্তর সম্পর্কে আভাস মেলে একটি মন্তব্যে, "উক্ত ঠাকুর জিউ-এর অপূর্ব মহিমা ও দৈবশক্তি মল্লভূম ও দেশ বিদেশে প্রচার হওয়ায় তৎকালীন মল্লভূম-পতি বিষ্ণুপুরের মহারাজ চৈতন্য সিংহদেব ও জামকড়ির রাজা দামোদর সিংহদেব প্রমুখ ব্যক্তি সেবা চলিবার উপযুক্ত সম্পত্তি উক্ত ঠাকুর জিউকে অর্পণ করেন......।" [৪২ক]

১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শহর বাঁকুড়ার রামপুর মহল্লায় গরাঞী পরিবারের উদ্যোগে একটি দেবোত্তর তৈরি হয়েছিল ষোলআনা দুর্গাপূজার জন্য। এই পরিবার ১৯৪৪, ১৯৪৬, ১৯৪৫ সালে গঙ্গাজলঘাটির আমলাডিহি মৌজায় ৬একর ৮৫ শতক জমি ক্রয় করেছিলেন। এই প্রজাবিলি সম্পত্তির স্বত্ব নিয়ে খয়েরবনীর বাসিন্দা লাখপতি বাউরি সনাতি 'বাঁকুড়ি' পাই মাপের কচখাড়া (কুলায় ঝেড়ে আখড়া ও ধুলা বাদে ধান) বারো মাপ সাজা ধান ও দেড় কাহন খড় আদায় দিত। এ জমির জন্য নির্ধারিত রাজস্ব সনাতি ৫ টাকা ১৪ আনা ৯ পাই দিতে হত শিয়ারশোলের মালিয়া পরিবারকে। জমিদারি বিলোপে এখানে ক্ষতিপূরণ (চিরকালীন বার্ষিক বৃত্তি) নির্দিষ্ট হয় ৪১৪ টাকা ৯ আনা ৬ পাই।[৪৩]

শালতোড়ার সাহেবডাঙ্গার শিখর পরিবার নড়িহি মৌজায় কালীমাতার জন্য দেবোত্তরের ব্যবস্থা করে। দেবোত্তর অধিগ্রহণের সময় সেবাইত ছিলেন ধ্রুবলাল শেখর। ক্ষতিপূরণ (চিরকালীন বার্ষিক বৃত্তি) পেয়েছিলেন ১০০০ টাকা ৮ আনা ১০ পাই।[৪৪]

একসময় কালপাথরের শুঁড়ি বাগ পরিবার বর্ধমান থেকে এসে জঙ্গলাকীর্ণ কালপাথরে বসতি স্থাপন করেছিল।[৪৫] এই আদি পুরুষের পৌত্র ভজহরি বাগ ছিলেন একজন উদ্যমী ও সফল মানুষ। তেজারতি ও জমিদারি ব্যবসাতে সাফল্য লাভ করে পরিবারের সদস্যরা শিক্ষার আলো দেখলে তিনি ১৯১৩ সালে সরস্বতী পূজা শুরু করেন (বিশেষত ভাইপো উমাচরণের ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্তির পর)। কিন্তু ১৯১৫ সালে এই পূজা নিয়ে দলাদলি ও দুটো গোষ্ঠী তৈরি হলে রাজগ্রামের কুন্ডু পরিবার ফৌজদারি মামলায় বিদ্ধ দুই গোষ্ঠীকে এক করে একটি পরিচারকমন্ডলী গঠন করে। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ১৭ অক্টোবর সম্পাদিত কবুলতিপত্র থেকে এই দেবোত্তর সম্পদের পরিচয় পাওয়া যায়। কবুলতি গ্রহীতা ছিলেন পরিচারক রাসবিহারী, সতীশচন্দ্র, ফেলারাম, রামকিঙ্কর, সারদাপ্রসাদ। এই তিনদিনের পূজায় একহাজার ব্রাহ্মণসহ গ্রামের তিন হাজার গ্রামবাসী ভোজন করতেন। হত তিনদিনের যাত্রানুষ্ঠান। ষষ্ঠীর

দিন অরন্ধন ও আগের দিনের তৈরি করা মাছসহ বাসিভাত খাওয়ার রীতি ছিল। এই মাছের বড় অংশ আসত গাংতোড়া গ্রাম থেকে। ১৯৩৬ সালে এই গ্রামের কবুলতিদাতা ছিলেন মুকুন্দ মন্ডল। সেই বছর থেকে প্রতি বছর মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর দিন চার মণ মাছ সাজা আদায়ের শর্তে পাঁচটি সরোবর চিরস্থায়ী ভোগদখলের অধিকার পেয়েছিলেন। কিস্তি খেলাপে মণপ্রতি দশ সের মাছের সুদ (বাড়ি) দিতে হত। তখন কেজিপ্রতি মাছের দাম ছিল ৩০ পয়সা। অন্যান্য সরকারি সেসও নগদে আদায় হত। জমিদারির অবসানে এখানে ক্ষতিপূরণ (চিরকালীন বার্ষিক বৃত্তি) ছিল ১৬০৯ টাকা ২ পাই।[৪৬]

ইন্দাসের সাঁসপুরে দেবোত্তর ছিল গ্রামের উগ্রক্ষত্রিয় কেশ পরিবারের কুলদেবী বাসন্তীমাতার নামে। দেবোত্তর জমি ছিল খাড়োবা, নারায়ণপুর, বাঁকি, তৃষানল মৌজাগুলিতে।[৪৭] ১৯৫৫ সালের ১৫ এপ্রিলের একটি সরকারি নথিতে সেবাইত হিসাবে নাম দেখা যায় শান্তশীল, তারকনাথ, সচ্চিদানন্দের। জমিদারি অধিগ্রহণের পর এর ক্ষতিপূরণ (চিরকালীন বার্ষিক বৃত্তি) দাঁড়ায় ৫৯৫ টাকা ৯ আআনা ৯ পাই।[৪৮]

সিমলাপালের বনকুল আশ্রমের ইতিহাস ইতিমধ্যেই বিবৃত হয়েছে। জমিদারি প্রথা বিলোপের পর এই অস্থল দেবোত্তরের ক্ষতিপূরণ (চিরকালীন বার্ষিক বৃত্তি) ছিল ১৩৩৮ টাকা ৫ আনা ৯ পাই।

জয়রামবাটীতে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে স্বামী সারদানন্দ মা সারদার বাসের ও জগদ্ধাত্রী পূজামন্ডপের জন্য বাস্তুজমি ও পূণ্যপুকুর ক্রয় করেন। ১৯১৬ সালের ৭ জুলাই একটি অর্পণনামা দলিলে বেলুড় মঠের ট্রাস্টিদের হাতে এই সম্পদ হস্তান্তর করা হয়। জমি ছিল কুলপোতবনকাটি মৌজায়। জমিদারি অধিগ্রহণের পর এই সম্পদের ক্ষতিপূরণ (চিরকালীন বার্ষিক বৃত্তি) ছিল ১৮৯ টাকা ৬ আনা ৯ পাই।[৪৯]

## পীরোত্তর অছি

প্রাক ব্রিটিশ পর্বে রাঢ় বাঁকুড়ায় বেশ কিছু পীরের আগমনের সাথে সাথে সর্বধর্ম সমন্বয়ের উদার মতবাদের প্রসার ঘটে। এমন কিছু পীরের ও পীরস্থানের বর্ণনা দেওয়া হল। এই পীরেরা নানা অলোকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে জনমনে বিশ্বাস জন্মেছিল। পীরস্থানেই সাধারণত পীরের সমাধি ও মাজার থাকত। থাকত লাগোয়া পূণ্যপকুর। পীরের কাছে আশীর্বাদ পেতে ও সমস্যার সুরাহা পেতে আসতেন হিন্দু-মুসলিম সহ আপামর জনতা। বধুর বন্ধ্যাত্ব নিরারণ, সন্তান কামনায়, চর্মরোগ,

শ্রবণ-দৃষ্টি-বাক-চলশক্তি হীনতা থেকে পরিবারের সদস্যদের মুক্তি দিতে অনেকে এই পীরের স্মরণাপন্ন হত। পীরস্থান সংলগ্ন পুকুরের জল পবিত্র বলে মানা হত। অনেক পীরের হাতি, ঘোড়ার পিঠে ঘুরে বেড়ান, জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, দেবতা বা দূরবর্তী তীর্থস্থানের ছবি দেখান, দুর্ঘটনা থেকে মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতার কথা প্রচারিত আছে। পীরস্থান হত প্রাচীন গাছের নিচে অনাড়ম্বর কাঠামোতে। পীরস্থানে ভক্তেরা মাটির ঘোড়া, ধুপ, লাল/হলুদ চাদর দিয়ে পূজা দিতেন। ভোগ থাকত বাতাসা, নকুলদানা, চিঁড়া, কলা, গুড় পাটালি ও সিরনি। নিত্যদিন সন্ধ্যায় মুসলিম সেবক চিরাগ বা ধুপ-প্রদীপ দিয়ে পীরস্থানের আরাধনা করত। পীরের বংশধরেরা সাধারণত সেবক বা খাদিম হিসাবে কাজ করত। বেশির ভাগ পীরেরই পীরোত্তর জমি ছিল। অনেক সময় তা দান হিসাবে পাওয়া যেত রাজার কাছ থেকে। বার্ষিক উৎসবকে 'উরস' বলা হয়। অনেক খাদিম ভেষজ ঔষধ দিতেন।

কোতলপুরের বাগডোবা গ্রামের নারকেলডাঙ্গা গ্রামে সপ্তদশ শতকে পীরস্থানের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হজরত শাহ নুর মোহাম্মদ আলায়হে। কাছেই আছে কুড়চি-শ্যাওড়া গাছের নিচে এক মোহান্তের সমাধি। পৌষ সংক্রান্তিতে মোহান্তির সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান হয়। উরস উৎসব হয় ৩রা ফাল্গুন।[৫০]

কোতলপুর থানার গোপালপুর মৌজার পাথরচটি গ্রামের প্রাচীন সৌধের ধ্বংশস্তুপের উপর শাহ ইসমাইল গাজী প্রতিষ্ঠিত পীরস্থান আছে। পীরপুকুরে স্নান করলে নাকি চর্মরোগ নিরাময় হয়। উরস উৎসব হয় ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে।

কোতলপুরের উত্তরপাড়ায় গঙ্গাধর শিবমন্দিরের কাছে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হজরত সৈয়দ হামিদউদ্দিন শাহ আলি বাজ রহমতুল্লাহ গুজরাট থেকে একজন মুরিদকে নিয়ে বহু দেশ ভ্রমণ করে অবশেষে একটি পীরস্থান প্রতিষ্ঠা করেন। মল্লরাজ পরিবারের একজনের বজ্রপাতে মৃত্যু রোধ করে 'বাজধরা পীর' হিসাবে পরিচিত হন। এই পীরস্থানে মোট ১৬ টি পীরের মাজার আছে। মল্লরাজ পীরকে বালসী মৌজায় ১৫০ বিঘা জমি দান করেন। কিছুদিন পর পীরের ভাই সৈয়দ হজরত খাজা রওশন আলি গ্রামে হাজির হলে পীরভাতৃদ্বয় 'পীর কেবলাহ' নামে পরিচিত হয়। এখানে উরস উৎসব পালিত হয় ৭ বৈশাখ, ২৬ কার্তিক, ৪ অগ্রহায়ণ, ২৭ ফাল্গুন ইত্যাদি তারিখে।

ঊনবিংশ শতকে কোতলপুরের মিরেপাড়ায় পীরস্থানের সূচনা করেন শাহ ইমাম। পীর নাকি রাত্রে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতেন। ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার উরস উৎসবে হিন্দু-মুসলিম সবাই অংশ গ্রহণ করে। এই গ্রামের অপর পীরস্থান হল

শাহ বাটুল প্রতিষ্ঠিত। আগমন একই শতকে। স্থানীয় এক হিন্দু স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে রোগের ঔষধ দিয়ে থাকে। পীরস্থান পরিষ্কার রাখে এক হিন্দু। ২ মাঘ উরস উৎসব হয়।[৫১]

কোতলপুরের লেগোর কাছে গঙ্গাধর শিব মন্দির সংলগ্ন মাধবগঞ্জে একটি পীরস্থান দেখা যায়। এখানে গাজন অক্ষয় তৃতীয়াতে শুরু হয়ে বুদ্ধ পূর্ণিমায় শেষ হয়। গাজনের দশ দিন আগে পীরের উরস উৎসব পালিত হয়। শিবের পায়স 'মনুই' প্রস্তুত করে ধুলাডাঙ্গার মুসলিম হাজারী পরিবার। এরা গাজনের হিন্দু ভক্ত্যা ঠিক করে দেয় ও তার খরচ বহন করে।

দেশড়া-কোয়ালপাড়া এলাকার কুলাহার গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা পীরের নাম শাহ শহীদ। মানুষের বিশ্বাস ভোরে পীরপুকুরে বোবা শিশুকে স্নান করালে ক্রমে কথা বলতে শুরু করে। উরস উৎসব হয় পৌষ সংক্রান্তি ও পয়লা মাঘ। কাছেই যমুনা গ্রামে শাহ ইসমাইল গাজি প্রতিষ্ঠিত পীরস্থানের জন্য মল্লরাজ ৫২ বিঘা জমি দেন। গোপীনাথপুরের ইসমাইলকে গ্রামের পীর শাহ ইসমাইল প্রতিষ্ঠিত এটি 'ধাওড়ে পীরের আস্থানা' নামে পরিচিত। উরস উৎসব হয় চৈত্রমাসের দ্বিতীয়ার্ধের কোন বৃহস্পতিবার।

জয়পুর থানার লোকপুরে আছে সরোবর তীরবর্তী ইসমাইল গাজির মাজার। পঞ্চদশ শতকের মাকড়া পাথরের সৌধে এই মাজারটি। জনশ্রুতি এই যে গৌড়ের সুলতান বরবেক শাহ (১৪৫৯-৭৪) বা হোসেন শাহের (১৪৯৪-১৫১৯) আদেশে মন্দারণ বিজয়ী সেনাপতি ইসমাইল গাজি নিহত হলে (মতান্তরে সুলতান রুকনুদ্দিনের আদেশে ১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ৪ জানুয়ারী তাঁর শিরচ্ছেদ করা হয়) মৃতদেহ অশ্বপৃষ্ঠে বাহিত হয়ে লোকপুরে সমাধিস্থ হয় ও রক্তের চিহ্ন পড়ে যমুনা, পাথরচটির মত স্থানে অন্যান্য পবিত্র মাজারগুলি গড়ে ওঠে।[৫২] অবশ্য এই ঘটনা বিতর্কিত। গাজির মৃত্যুদন্ডের কারণ সম্ভবত মন্দারণ কেন্দ্রিক স্বাধীন রাজ্য গঠনের চেষ্টা। কোনভাবে তিনি সন্তের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হন। নবান্নের দিনে মাজারে মিষ্টান্ন সহ নতুন চাল সিধে হিসাবে দেওয়া হয়। দোল পূর্ণিমাতে এখানে সমাগম হয়। দুপুরে বাতাসা, চিঁড়ে ও সন্ধ্যায় শিরনি দেওয়া হয়। দরগায় ডঙ্কা শুনে হিন্দু মহিলারা সন্ধ্যাপ্রদীপ দেয়। উরস উৎসব হয় ১১ হতে ১৩ ফাল্গুন। জয়পুরের উসমানচকের শাহাদন পীরের দরগায় উরস উৎসব পালিত হয় ২১ ফাল্গুন।

বীর হাম্বিরের সময়ে উত্তর প্রদেশ থেকে কয়েক জন শিষ্য নিয়ে বিষ্ণুপুর শহরের কুরবানতলায় পীরস্থান প্রতিষ্ঠা করেন হজরত কুরবান শাহ। তাঁর কৃপাতেই মল্লরাজ

হাম্বির পুত্র সন্তান লাভ করে। অনেকে নিরাময়ের আশায় ও সমস্যা সমাধানে এই মাজারে হাজির হয়। কুরবান শাহ বাঘের পিঠে ঘুরতেন বলে জনশ্রুতি। ১৭২১ সালে মুঘল বাদশাহ শাহ আলম পীরের জমির খাজনা মুকুব করেন। ১৭৫৩ সালে চৈতন্য সিংহ এই পীরস্থানের জন্য প্রচুর নিষ্কর জমি দান করে। উরস উৎসব হয় চন্দ্রমাসের ১৫ তম দিনে। শহরের কবরডাঙ্গা মহল্লায় ঘোড়ালি বাবার মাজার জাগ্রত মনে করা হয়। মহরমের দিন শহরের সম্মিলিত তাজিয়া রাজদরবারে প্রদর্শিত করার সময় রাজা এই মাজারের তাজিয়ার নিশানকে প্রথম মান্যতা দিয়ে সম্মান জানায়। ভাদ্র মাসে উরস উৎসব হয়। পোকাবাঁধের সত্যপীরতলায় হিন্দু-মুসলিম একত্রে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।[৫৩]

সোনামুখীর সত্যপীরতলায় বড়পীরের মাজার কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার কোন তথ্য নেই। সংলগ্ন কালীমন্দিরের কালী সত্যকালী নামে খ্যাত হয়ে গেছে। সন্নিহিত স্থানে পীরের ভাই প্রতিষ্ঠিত 'ছোটপীর'এর দরগাও আছে। থানার রাধামোহনপুরের দরগার পীর ছিলেন হাফিজুর চিস্তি(পাঠান বাবা)। উরস উৎসব হয় ১৫ মাঘ। সন্নিকটস্থ ফকিরডাঙ্গাতে আর একটি পীরস্থান আছে। উনবিংশ শতকে এই গ্রামের বড় মাজারটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হজরত সুফি ভড়ং শাহ। এটি একটি প্রাচীন স্থাপত্যের ধ্বংশাবশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত। উরস উৎসব হয় ২১-২৪ চৈত্র।

অষ্টদশ শতকের প্রথমভাগে পাত্রসায়ের থানার রসুলপুর পীরস্থানের প্রতিষ্ঠা হয় হজরত শাহ চিনকি রহমতুল্লাহ আলায়হে দ্বারা। তাঁর পৌত্র সেখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে। কিংবদন্তী আছে এই পীর মল্লরাজের চর্মরোগ নিরাময় করেন। মল্লরাজ এই পীরস্থানের জন্য নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। উরস পালিত হয় ফাল্গুন মাসের প্রথম রবিবার। ইন্দাসের লস্কর পীরের পীরস্থান মানুষের শ্রদ্ধার জায়গা। বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে উরস উৎসব হয়। পূর্ণিমা রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে পীরবাবা রাস্তায় হাঁটেন এই বিশ্বাসে সবাই জানালা সেসময় বন্ধ রাখে। এই থানার বেতুড় গ্রামের পীরস্থানের প্রচলন করেছিলেন আজগবী বাবা। বেতুড় মৌজার পীরোত্তর সম্পত্তি থেকে আয় ছিল ১৯৭ টাকা ৫ আনা ১১ পাই। গেনু মিদ্যা, কালু মন্ডল, হোসেন মন্ডল, আজীদ শেখের মত পীরোত্তর সেবাইতরা এখান থেকে খাজনা দিতেন ৪ টাকা ১৪ আনা ৬ পাই। জমিদারি প্রথা বিলোপে চিরকালীন বার্ষিক বৃত্তি নির্দিষ্ট হয় ১৯১ টাকা ৭ আনা ৫ পাই।[৫৪]

অষ্টাদশ শতকে ইন্দাসের রোলে শাহমাদারতলায় পীর 'শাহ মাদার' দরগা প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল রোলের জমিদার পরিবার প্রদত্ত জমিতে। নিকটস্থ চিচিঙ্গা গ্রামের পীরস্থানটি প্রতিষ্ঠা করেন শাহ মাদারের বৈমাত্রেয় ভাই বন্দেগি শাহ। জনশ্রুতি তিনি মল্লরাজকে কৃষ্ণের লীলা দেখিয়েছিলেন। মল্লরাজ এই পীরস্থানের জন্য নিষ্কর জমির ব্যবস্থা করেন। আশেপাশের মালিবাগান, কামারভিটে, ধোবাভিটে, তামলিভিটে নামের জায়গাগুলি এখন সেই পেশার মানুষ বর্জিত। কিন্তু একসময়ের পীরস্থান কেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য দেয়। ইন্দাসের করিশুন্ডার পীরস্থানের প্রবর্তন করেন শাহ হোসেনি কিরমানি। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। তাঁর আদি নিবাস মধ্যপ্রাচ্যের কিরমান অঞ্চলে। উরস উৎসব হয় চৈত্রমাসের বিভিন্ন দিনে। এলাকায় দোতলা বাড়ির বাসিন্দারা পীরের সম্মানে রাত্রে একতলার ঘরে ঘুমোয়। এই পীরের অলৌকিক বিভিন্ন ক্ষমতার মধ্যে মল্লরাজকে গঙ্গানদী তৈরি করে তাতে পূণ্যস্নানের কাহিনীও আছে।

ইন্দাসের পরীক্ষাপাড়ায় বৃহৎ প্রাচীন স্তুপের উপর শাহ মিঞা প্রতিষ্ঠিত পীরস্থান আছে। আর সাহিনসাড়া গ্রামের কাছে সেখডাঙ্গায় আছে পীরানি হালিমা বিবির মাজার। মহিলারা প্রতি সন্ধ্যায় চিরাগ জ্বেলে শ্রদ্ধা জানায়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সিরনি দেওয়া হয়। মহরম মাসের সাত তারিখে এখানে উরস উৎসব পালিত হয়। বাসিন্দাদের একতলায় ঘুমানোর রীতি এখানেও প্রচলিত।

রাঢ় বাঁকুড়ায় এই পীরস্থানগুলির প্রতিষ্ঠা রাঢ় বাঁকুড়ায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির অমোঘ ধারা প্রতিষ্ঠা করে। চৈত্র সংক্রান্তির গাজনে দিকডাকের পুঁথিপাঠের সাথে ফকির বন্দনাও করা হয়। জয়পুর থানার আশুরালিতে ভূতনাথ শিবের গাজনে মনুই সূচনা ভোগ তৈরির দায়িত্বে থাকে গ্রামের মুসলিম পরিবার। কুশদ্বীপের গাজন ভক্ত্যারা কাঁকড়াশোলের মুসলিম মিদ্যা পরিবারে এসে ফলাহার করে। জয়পুরের গাজন ভক্ত্যারা ইসমাইল গাজির থানে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে যায়। কোতলপুর থানার মাধবগঞ্জের গঙ্গাধর শিবের মনুই ভোগের সাথে জড়িত ধুলাডাঙ্গার মুসলিম পরিবার। গ্রামের পীরোত্তর আয়ের একাংশ কাজে লাগে গাজনের ব্যয়ে। ইন্দাসের শিবগাজনের জন্য রোলের মুসলিম জমিদারের জমিদান ছিল। ভক্ত্যারদল তাই পরিবারকে ফুলের মালা দিয়ে সম্মানিত করে। এমন উদাহরণ ছড়িয়ে আছে সব ভূমরাজ্য জুড়ে। সপ্তদশ শতকে জেলায় সত্যপীর ও সত্যপীরের পাঁচালির আবির্ভাব ঘটে। মানিকরামের ধর্মমঙ্গলে কোতলপুরের দেশাড়া গ্রাম ও সত্যপীরের কথা পাই। এমনি করেই রাঢ় বাঁকুড়ায় তৈরি হয় সর্বধর্ম সমন্বয়ের এক অকাট্য বাঁধুনি ও অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ।

## রাজবৃত্তে মেলা-পার্বণ

রাজপোষিত দেবারাধনার পাশাপাশি ভূমরাজ্যগুলিতে সর্বজনীন মেলাগুলির প্রবর্তনের ব্যাপারে ভূমরাজ্যাধিপতিরা সমান সক্রিয় ছিলেন। এগুলি থেকে আয়ের ব্যবস্থা করে মেলা পরিচালনা করা ও সরকারি কর দেওয়ার বিষয়ে সরকারি নথিতে বিবরণ পাওয়া যায়।[৫৫] নথি অনুসারে মল্লরাজ কালীপদ সিংহঠাকুর ছিলেন ডিহড়-জান্তার ষাঁড়েশ্বর (চৈত্রের গাজন, মাঘের মাকড়ি সপ্তমী, শ্রাবণের শ্রাবণী, পৌষের মকরমেলা) মেলার মালিক। আদায় ছিল ১২০ টাকা। জেলা বোর্ড নিত আট টাকা ও স্বাস্থ্য দপ্তরের বারো টাকা। তুঙ্গভূমের ফুলকুসুমা রাজপরিবারের কালীপ্রসন্ন নারায়ণ দেও ছিলেন রসপালের দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে মেলা ও চড়ক মেলার স্বত্বাধিকারী। মেলা দুটি থেকে আয় ছিল যথাক্রমে চার ও তিন টাকা। জেলাবোর্ড ও সরকারকে এর জন্য এক টাকা করে মোট চার টাকা দিতে হত। রাইপুর রাজপরিবারের চক্রধর সিংহদেবের মালিকাধীন হরিহরগঞ্জের জিতামেলা ও রাইপুরের ইন্দমেলার থেকে আয় হত চার টাকা ও শূন্য টাকা। জেলাবোর্ড ও সরকারের আদায় ছিল এই দুটি মেলা থেকে এক টাকা করে মোট চার টাকা। অর্থাৎ মোট আদায়কৃত অর্থ শুল্ক দিতে গিয়েই খরচ হয়ে যেত। খাতড়ার শ্রীপঞ্চমী ও ইন্দমেলা দুটির মালিক ছিলেন খাতড়া রাজপরিবারের সুকুমার ধবলদেব শাহাজাদা। এই দুটি মেলা থেকে মোট আয় ছিল তেইশ টাকা। জেলা বোর্ড ও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরকে দেয় শুল্ক ছিল যথাক্রমে পাঁচ ও আড়াই টাকা। অম্বিকানগর রাজপরিবারের পূর্ণচন্দ্র ধবলদেবের স্বত্বাধীন রুদ্রার গাজন মেলা ও ছাতা পরবের মোট আদায় ছিল এগারো টাকা। জেলাবোর্ডকে কোন শুল্ক দিতে না হলেও সরকারকে দিতে হত দুই টাকা। ছাতনা রাজপরিবারের বামাসুন্দরী দেবীর মালিকানায় ছিল ছাতনার রানী গাজন মেলা। মেলা থেকে আয় হত দশ টাকা। জেলা বোর্ড ও সরকার পেত এক টাকা করে। সিমলাপালের রাজা মদনমোহন সিংহচৌধুরীর দোলমেলা, দুর্গাপূজা মেলা, দুবরাজপুরের শিবগাজন মেলা, জামিরডীহার পৌষ পার্বণ মেলা, নেত্রপালের নেত্রপাল মেলা, বাণেশ্বর চৈত্রগাজন মেলা থেকে মোট আদায় ছিল বারো টাকা। জেলাবোর্ড কোন শুল্ক না নিলেও সরকার নিত এক টাকা করে মোট ছয় টাকা। ভেলাইডিহার সমকালীন জমিদার বিজয় সিংহচৌধুরী ছিলেন পরকুলের বিখ্যাত মকরসংক্রান্তি মেলা, গারোরার চৈত্রগাজন মেলা, আমকঁদারের পায়রাসিনি মেলা, ভেলাইডিহা শিবগাজন মেলার স্বত্বাধিকারী। এই মেলাগুলি থেকে আদায় ছিল

যথাক্রমে পঁচিশ টাকা, দুই টাকা, এক টাকা, একুনে পঁয়ত্রিশ টাকা। জেলা বোর্ড শুল্ক নিত শুধুমাত্র পরকুল মেলার থেকে পাঁচ টাকা। সরকারের আদায় ছিল পরকুল মেলার জন্য আড়াই টাকা ও অন্য তিনটি মেলা থেকে এক টাকা। একই ভাবে অযোধ্যার রাশমেলা, ছাগুলিয়া রাশমেলা, ময়নাপুরের হাকন্দ মেলা, শাঁসপুরের বনশিব গাজন মেলা, স্থানীয় জমিদারদের অধীনে অনুষ্ঠিত হত। এক্তেশ্বরের চৈত্র ও পৌষ মেলার স্বত্বাদজিকারী ছিলেন সত্যকিঙ্কর সাহানা। তাছাড়া বিভিন্ন গ্রামীণ মেলা স্থানীয় প্রভাবশালী পরিবারের অধীনে পরিচালিত হত। কিন্তু সব মেলাগুলিই সর্বশ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণের ফলে সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

## লোকগানে বীরত্বগাথা

বিভিন্ন লোকগান মানুষের পাশে দাঁড়ান ও লড়াইয়ে থাকা স্থানীয় প্রতিবাদী নেতাদের লোকনায়কে পরিণত করেছে।[৫৬] ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নায়ক হয়ে ওঠা স্থানীয় সর্দার অচল সিংহ, বিষেণ সিংহ, লাল সিংহ, গোবর্দন দিগর, সুবলা সিংহ এমন করেই যুগের পর যুগ লোকগানের মধ্য দিয়ে লোকনায়ক হয়ে মানুষের মনে বেঁচে আছেন। যেমন, "লাল সিং লড়হাই করিলি। বিষেণ সিং লড়াই করিলি। / 'চিয়াড়' নামে গোরার গুলি —এ মরিলি/সুবলা সিং সুতানে মরিলি/তবু লড়হাই করিলি।" "গড় রাইপুরে দুর্জন সিং, শিলদায় গোবর্দন লড়হাই করেছে/ শয়ে শয়ে ভূমিজ-পাতর কাঁড়-কাঁড়বাঁশ ধরেছে/ লাল সিং কাঁসাই ঘাটে শহীদ হঁয়েছে / দুর্জন সিং লড়হাই করেছে।" "তবু লাল সিং-এর বিষেণ সিং-এর নাম রহিল/ সুবলা সিং কুইল্যাপালে পালাঁঞ গেল, সুতানে মরিল/ লাল সিং-এর, দুর্জন সিং নাম নেই গেল/ রাইপুরের রাজা তবু মরে বাঁচিল।/ দুর্জন সিং নাম নাই মুছে গেল।/ কাহিনী মুখে মুখে বাঁচিয়া রহিল।"

এই লোকগানের মধ্য দিয়ে জানা যায় বিদ্রোহের সময় বামুনগোড়ায় সাপখোঁদড়ের জঙ্গলে দুর্জন সিং লুকিয়েছিলেন, বড়দিসিনি পাহাড়ের নিচে লাল-সিং ঘাট তাঁর লড়াইয়ে স্মৃতি বিজড়িত, রাইপুরের রাজা দুর্জন সিংহের বিধবা দিদির বড়দিসিনির পাহাড়ে সাধিকার জীবন, আত্মহত্যা ও সিনিদেবীর দুর্গম থানে মৌকুড়া গ্রামের দুলে-বাউরিগণের দ্বারা তাঁর পূজা, এখ্যানের দিন পূজা, মৌকুড়ার মল্লভূমাগত কামার, সাহেববাঁধের গোরা সৈন্যের অবস্থান ও লাল সিংহের বিরুদ্ধে অভিযান। এই সব লোকগানের মধ্য দিয়ে সেই বীরত্বগাথা বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হচ্ছে।

রাঢ় বাঁকুড়া প্রথমাবধি দারিদ্র কবলিত আখ্যায়িত হলেও রাজ্যের অন্যান্য অংশের সাথে বাঁকুড়াভূমিতে অষ্টদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অনুষ্ঠিত বর্গী আক্রমণের তীব্রতা থেকে এই এলাকায় সম্পদের প্রাচুর্য সম্পর্কে অনুমান করা যায়। মল্লভূম ও বিষ্ণুপুর শহরে ভাস্কর পন্ডিতের-শিউ ভট্টদের নেতৃত্বে মারঠা আক্রমণের ঐতিহাসিক নথি আছে।[৫৭] গোপাল সিংহ ও চৈতন্য সিংহের সময়ে এই আক্রমণগুলি সংগঠিত হয়। শহরের উপকণ্ঠে তৎকালীন মারাঠা শিবিরের প্রমাণ হয়ত এখনকার শহরের মারাঠাডাঙ্গা নামের মধ্যে। বিষ্ণুপুর আক্রমণের অভিঘাত সঞ্চারিত হয়েছিল সামন্তভূমে ও আড়রা সহ বিভিন্ন গ্রামে, ইন্দাসের বেতালন গ্রামে, হদলনারায়ণপুরে, রাইপুর, জয়পুরের সলদায়, সোনামুখী শহরে, ধবলভূমির ব্রজরাজপুরে, বালসীতে, শিখরভূমের মাহিষাড়া পরগণার (মেজিয়া) রামচন্দ্রপুরে। কারণ এই সব স্থান নাম উল্লেখ করে বর্গী আগমন সম্পর্কিত সরকারি নথি পাওয়া গেছে। স্পষ্টতই এই এলাকা ও সন্নিহিত পরগণা-মহলগুলি ছিল মারাঠা আক্রমণ জর্জরিত। মেজিয়ার রামচন্দ্রপুরে পঞ্চকোটরাজ ১৭৩৭ সালে দেওয়ান রামেশ্বর পট্টনায়ককে দেওয়ানীকাজ থেকে মুক্ত করে শ্যামচাঁদের আরাধনার অনুমতি দেন। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২১ শে মাঘ পঞ্চকোটরাজ পূর্বতন দেওয়ানের পূজিত দেবতার অনুকূলে মৌজাটির লাখেরাজ দেবোত্তর সনদ দেন। আলেকজান্ডার হিগিনসের দস্তখতি ও মঞ্জুরী 'তেরীজ বাজে জমিন' ফর্দে এই দেবোত্তরকে বীরভূম রাজস্ব বিভাগের অধীন দেবোত্তর হিসাবে দেখান আছে। সেই দেবোত্তর জমি বর্ণনায় গ্রামটির পূর্ব সীমানাকে 'বর্গীর সড়ান' বলে দেখান হয়েছে অর্থাৎ বর্গীদের যাতায়াতের রাস্তা। স্পষ্টতই বর্ধমান থেকে মল্লভূম অভিযানের বর্গী গতিবিধি ছিল এই পথ ধরেই।

পঞ্চকোট রাজার অধীনে শালতোড়া থানার পাবয়া ও সন্নিহিত গ্রামগুলির জমিদার বাগদী বংশীয় রূপ সিংহ সম্প্রদায়ের যুবকদের অস্ত্র ও অশ্বারোহণে প্রশিক্ষণ দিয়ে এক দুর্ধর্ষ বর্গী বিরোধী বাহিনী গড়ে তোলেন। কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে গ্রামে প্রবেশের রাস্তাগুলিতে দিবারাত্র পাহারায় থাকতেন এই বাহিনী ও বর্গী আক্রমণের ক্ষেত্রে এদের সংকেতে গ্রামের লড়াকুড়া একজোট হতেন। গ্রামের ভৈরবরাজ মন্দিরের গায়ে যে বর্গীদের সাথে লড়াইয়ের প্রাচীন চিত্র অঙ্কিত আছে তার থেকে এই প্রস্তুতি সম্পর্কে অনুমান করা যায়। স্পষ্টতই মহারাষ্ট্র থেকে ঝাড়খন্ড হয়ে মল্লভূমে আগমন পথে বর্গীরা এই গ্রাম আক্রমণ করত।

জেলায় মারাঠা অভিযান চলার সময় সোনামুখীর জাগ্রত স্বর্ণমুখী দেবীর পূজা

দিয়েছিলেন অধিনায়ক ভাস্কর। তাঁকে যোড়োশোপাচারে দেবীর পূজা দেওয়ার পাশাপাশি মাকে 'মা-ইতো-কালী' বলে চিৎকার করে ডাকতে শোনা গিয়েছিল। তার থেকেই এটি মারাঠা কালী নামেও অভিহিত হয়। হদলনারায়ণপুরের 'চল্লিশকুঠরি' দালান মন্দির বর্গীদের দ্বারা আক্রান্ত হলে দেবতার স্বর্ণালঙ্কার ভূগর্ভস্থ কামরায় যক্ষের পাহারায় রাখা হয় বলে জনশ্রুতি। জয়পুর থানার শলদা গ্রামের ভুবনেশ্বর শিবলিঙ্গের রত্নালঙ্কার সহ গৌরীপট্টের নয়টি রত্ন বর্গীদের দ্বারা অপহৃত হয়। এখনও শিবলিঙ্গে নয়টি গর্ত দেখা যায়। রাইপুরের শিখররাজের সেনাপতি মিরণ শাহ মারাঠাদের সাথে যুদ্ধে নিহত হয়েছিল বলে জনশ্রুতি যদিও সেটি মারাঠা আক্রমণ অপেক্ষা আফগান আক্রমণ হওয়া অনেক ইতিহাস সম্মত। একই ভাবে সামন্তভূমে রাজা স্বরূপনারায়ণ একটি মারাঠা আক্রমণ দমন করে সাত শত বর্গীর মুন্ড মুর্শিদাবাদ দরবারে পাঠিয়েছিলেন বলে কিংবদন্তী যদিও কালবিভ্রাটের জন্য সেটির সত্যতা প্রমাণিত হয়নি। তবে সামন্তভূমে মারাঠা আগমন ঘটেছিল। কারণ দেশমুখ প্রভৃতি পদবীধারী মারাঠা সেনার পরিবার জমিজমা লাভ করে আড়রা সহ বিভিন্ন গ্রামে থেকে গিয়েছিল তার প্রমাণ এখনও আছে। বালসীর জনৈক কমলাকান্ত শর্মার ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দের ২ চৈত্র তুলট কাগজে ভুসো কালিতে লেখা পৈত্রিক হবিকত বাজে জমির নানা দফা সম্বলিত বিবরণপত্রে পূর্ব বালসী, নবকিশোর, হাজরাপাড়া, লক্ষ্মীজলা মৌজার এক হাজার বিঘা জমির 'তিন বিঘা জমির সনদ বর্গীর হাঙ্গামায় খোয়া গিয়াছে' বলে উল্লেখিত। ইন্দাসের বেতালন গ্রামে স্বরূপনারায়ণ মন্দিরের নির্মাতা ও পূজারি চক্রবর্তী পরিবার 'বর্গী ভুলানো বামুন' নামে পরিচিত। তার কারণ গ্রামে বর্গী আক্রমণের সময় এই পরিবার কৌশলে মারাঠা বাহিনীকে বিভ্রান্ত করে গ্রামকে রক্ষা করেন। ইন্দপুরের ব্রজরাজপুরে গ্রামে বর্গি হাঙ্গামা নিয়ে দাস গোবিন্দ রচিত 'শ্রী শ্রী শ্যাম লীলামৃত' নামক কাব্যে কবি লিখেছেন, "এগার তেষট্টি সনে বৈশাখের অপরাহ্নে/শুক্ল পক্ষে তৃতীয়ার দিনে /একদল বর্গি এসে অত্যাচার কৈল যবে/ এই ব্রজরাজপুর গ্রামে।" অর্থাৎ ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে ব্রজরাজপুরে রাঢ়ে বর্গি আক্রমণ সংঘটিত হয়। তার অভিঘাত এসে পৌঁছায় খাতড়া পরগণার ব্রজরাজপুরে। তবে ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বর্গি আক্রমণের কথা বলা হলেও ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে আলিবর্দী ও নাগপুরের মারাঠা সর্দার রঘুজি ভোঁসলের মধ্যে শান্তি চুক্তি সাক্ষরিত হওয়ার পর বাংলায় দীর্ঘ দিন মারাঠা আক্রমণ সংঘটিত হয়নি। তবে ১৭৬০ সালে মুঘল প্ররোচনায় মারাঠা সর্দার শিউভট্ট একবার ইংরেজ প্রভাবিত বিষ্ণুপুর পর্যন্ত পৌঁছে যান। এই

সময়ে বিষ্ণুপুর সন্নিহিত ব্রজরাজপুরে মারাঠা আক্রমণ হয়েছিল ধরে নিলে ১৭৫৬ সালে বৈশাখ মাসের পরিবর্তে ১৭৬০ সালের বৈশাখে এই আক্রমণ রচিত হয়েছিল ইতিহাসের নিরিখে এমন মনে করা যেতে পারে। কারণ মারাঠা আক্রমণগুলো বর্ষার ঠিক আগে সম্পন্ন হত। এই সব সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয় রাঢ় বাঁকুড়া শুধু সাহিত্য, সংস্কৃতি, স্থাপত্য, অতীত গরিমায় এক সমৃদ্ধ অঞ্চল নয়, আর্থিক সম্পদ অর্জনেও অনেকাংশে সফল হয়েছিল। সেই অতীত সমৃদ্ধি ও গরিমা আজ পরিপূর্ণ আবিষ্কারের অপেক্ষায়।

**তথ্যসূত্র**


১. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়া সন্ধান, কলকাতা, ২০১৮, পৃঃ৮।

২. প্রাগুক্ত, পৃঃ১৪।

৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭।

৪. বাঁকুড়ার সিনিয়র সাবজজ আদালতে গঙ্গাগোবিন্দ পতির পেশ করা ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ৮৬ নং আপিলের আর্জি।

৫. বাঁকুড়ার সাবজজ আদালতে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ২১ নং দেওয়ানী মামলায় ২৭ মে দাখিল করা রামকিশোর ও হরগৌরীদাসের লিখিত বর্ণনাপত্র।

৬. দৌহিত্র বংশের কালীপদ সিংহঠাকুরের কাছে রক্ষিত ইন্দাসের মল্লরাজবংশের বলীন্দ্রনাথ সিংহদেবের অপ্রকাশিত ইংরাজী রচনা।

৭. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়া সন্ধান, কলকাতা, ২০১৮, পৃঃ১৮।

৮. বাঁকুড়া কালেক্টরেট ক্ষতিপূরণ মামলা নং ১/এফ/এ-১/৮৬-৮৭।

৯. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়া সন্ধান, কলকাতা, ২০১৮, পৃঃ২১।

১০. প্রাগুক্ত, পৃঃ২৯।

১১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩-৩৪।

১২. বিষ্ণুপুরের জেলা সাব্রেজেষ্ট্রি অফিসে নিবন্ধীকৃ মহন্ত নিযুক্তিপত্র(দলিল নং ৪৬৭৫, তাং ০৬.০১/১৯৮৭)।

১৩. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়া সন্ধান, কলকাতা, ২০১৮, পৃঃ৩৮।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ৪১।

১৫. H. C. Raychaudhuri, Political History of Ancient India, New Delhi, 1923, P. 412 / 438.

১৬. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়া সন্ধান, কলকাতা, ২০১৮, পৃঃ৪৬।

১৭. ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ১২ মে ইন্দাস মুন্সেফ আদালতের নথি। রাধালাল হজরা কতৃক বাংলায় লিখিত ও বিচারক কাজী নাসিরুদ্দিন কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

১৭ক. রামানুজ কর, বাঁকুড়া জেলার বিবরণ, কলিকাতা, ১৯২৫(পুনর্মুদ্রিত), পৃ.১৩৭। তারকেশ্বরের মহন্তবিরোধী আন্দোলনে যোগ দিতে যাওয়ার পথে বেলিয়াতোড়, সোনামুখী, ইন্দাসের অস্থলগুলি পরিদর্শন করেন স্বামী বিশ্বানন্দ ও ফেরার পথে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন।

১৮. দৌহিত্র বংশের কালীপদ সিংহঠাকুরের কাছে রক্ষিত ইন্দাসের মল্লরাজবংশের বলীন্দ্রনাথ সিংহদেবের

অপ্রকাশিত ইংরাজী রচনা।

১৯. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়া সন্ধান, কলকাতা, ২০১৮, পৃঃ৬৫।

২০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১।

২১. **Order No. 120 BkS by AITO, Burdwan Range, Chinsurah with Assessment year 1944-45.**

২২. **C. A. Roll No1525 at Bankura Collectorate.**

২৩. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়া সন্ধান, কলকাতা, ২০১৮, পৃঃ৭৪।

২৪. শ্যামসুন্দরপুর রাজপরিবারের সদস্য গৌরীশঙ্কর নারায়ণ দেও-এর কাছে সংরক্ষিত নথি।

২৫. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়া সন্ধান, কলকাতা, ২০১৮, পৃঃ৭৫।

২৬. **Bankura Compensation Case No. I/F/S/C of 83-84.**

২৭. বাঁকুড়া জেলা আদালতে দায়ের বিবিধ মামলা নং ১/১৯৩১।

২৮. **C. A Roll No. 16335.**

২৯. **Bankura Compensation Case No. 206/FA-Bank of 72-73**

৩০. **Bankura Compensation Case No. 2736/F/H/C of 66-67, CA Roll No. 4819.**

৩১. **Bankura Compensation Case No. 59/F.A./Bank of 73-74**

৩২. বিষ্ণুপুরের দেবব্রত সিংহঠাকুরের দেওয়া তথ্য।

৩২ক. লক্ষ্মীকান্ত পাল, দক্ষিণরাঢ় সংস্কৃতি পরিক্রমা মল্লভূম, মহিষাদল, ২০১৫, পৃঃ ৩৬, ৬৫। গোপাল সিংহ-চৈতন্য সিংহের দেওয়ান শরোত্তর রায় মল্লরাজের অনুমতিক্রমে ময়নাপুরে মৃন্ময়ী দুর্গা পূজার সূচনা করেন। মল্লরাজের আগমন পর্যন্ত বিসর্জন স্থগিত রাখা হয়। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন তিনি দেবী দর্শনে এলে সেদিন বিসর্জন দেওয়া হয়। সেটাই রীতি হয়ে দাঁড়ায়। দৌহিত্র চণ্ডীচরণ ও তৎপুত্র তারিণীপ্রসাদ নবদ্বীপের মৃৎশিল্পীদের দিয়ে ২৫ ফুটের মূর্তি বানিয়ে দশপ্রহরণধারিণী দেবীপূজার সূচনা করেন। কুলগুরু হুগলীর রঘুবাটী গ্রামের। এরপর এই পূজা পরিচালনা করতে থাকে জ্যেষ্ঠ কালীপ্রসাদের বংশ (৩ বছরের পালা ও ত্যক্ত পুকুরের এক মণ মাছের উৎসর্গে), কনিষ্ঠ সারদাপ্রসাদের বংশ (৪ বছরের পালা ও এক মাসের অতি উৎকৃষ্ট চাল প্রদানে) ও সারদাপ্রসাদের বংশ (৫ বছরের পালা ও নগর ৫০ টাকা যোগানে)। কালীপ্রসাদ প্রপৌত্র সাদর, সেবাইত চন্দ্রশেখর ও সেবাইত পুত্র দ্যোতিনীপ্রসাদ পাঁচ দশক তারিণীপ্রসাদের বংশের সাথে পূজা পরিচালনা করছেন। এখন কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথি থেকে দেবীপক্ষেদ্দ দশমী পর্যন্ত পূজা চলে। প্রদীপ ও পাঁচসের গব্যঘৃতের হোমকুণ্ড সপ্তমী থেকে নবমী প্রজ্বলিত থাকে। পূজা শেষে অক্ষয় প্রদীপ-কুললক্ষ্মী যায় কালীপ্রসাদের ভদ্রাসনে, কোলসরা-বামপ্রদীপ যায় তারিণীপ্রসাদের বাড়ি, ডানপ্রদীপ-লিসুজ পরমানন্দের বাড়ি।

৩৩. **Bankura C. A Roll No. 13730.**

৩৪. **Bankura Compensation Case No. 137/F/G/C of 68-69.**

৩৫. **Bankura C. A Roll No. 9142. Compensation Case No. 679/F/A-Bank of 69-70.**

৩৬. **Bankura C. A Roll No– 9414.**

৩৭. **Bankura Compensation Case No. 12ùFùAéŸéBnk of 78-79.**

৩৮. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়া সন্ধান, কলকাতা, ২০১৮, পৃঃ৮৭।

৩৯. হরিশ্চন্দ্রপুরের উমাপদ বেড়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

৪০. **Bankura Compensation Case No. 204/F/A-Bank of 72-73**

৪১. **Bankura C. A Roll No. 18873.**

৪২. **Bankura Compensation Case No. 173/F/P/C-Bank of 66-67**

৪২ক. অজয় কুমার ঘোষ, বাঁকুড়া ভাবনা, বর্ধমান, ২০২২, পৃঃ২৯।

৪৩. **Bankura C. A Roll No. 5780 & Compensation Case No. 83/F/G/C of 63-64**

৪৪. **Bankura Compensation Case No. 36/F/G/C of 70-71**

৪৫. বাঁকুড়া শহরের যোগেশপল্লীর কালীপদ বাগের থেকে সংগৃহীত।

৪৬. **C. A Roll No. 17541 & 29415. Compensation Case No. 625/F/Kat/C of 65-66 242/F/Kentu/C of 70-71**

৪৭. **Bankura C. A Roll No. 6327 & 6328.**

৪৮. **Bankura Copensation Case No. 189/F/Intas/C of 66-67 & 588/F/Indas/F of 66-67**

৪৯. **C. A Roll No. 24399. Bankura Compensation Case No.126/F/Kendu/C of 69-70.**

৫০. অজয় কুমার ঘোষ, বাঁকুড়া ভাবনা, বর্ধমান, ২০২২, পৃঃ১১২।

৫১. প্রাগুক্ত, পৃঃ১১৩।

৫২. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০, পৃঃ ১৬-১৭। ইসমাইল মক্কাগত পয়গম্বর বংশের।

৫৩. অজয় কুমার ঘোষ, বাঁকুড়া ভাবনা, বর্ধমান, ২০২২, পৃঃ১১৫।

৫৪. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়া সন্ধান, কলকাতা, ২০১৮, পৃঃ ৯৭।

৫৫. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়া সন্ধান, কলকাতা, ২০১৮, পৃঃ১২৪।

৫৬. গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী(সঃ), বাঁকুড়ার খেয়ালী, বাকুড়া, ২০১৪, পৃঃ ৬৫-৬৬ (সুশীল মাহাতের প্রবন্ধ)।

৫৭. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়াজনের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০০, পৃঃ ৮২।

# সংযোজনী-১

রাজবংশ সূত্রে জানা যায় রাজনারায়ণের মৃত্যুর পর অপুত্রক রানী দুর্গাগতি দেবী উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মধ্যম ভ্রাতা যোগেন্দ্রনারায়ণের পুত্র অবনীনাথকে উপেক্ষা করে নগেন্দ্রনারায়ণের পুত্র নৃপেন্দ্রনারায়ণকে নির্বাচন করলে কার্যত রাজপরিবারের বিভাজন ঘটে। অবনীনাথ আধ্বর্য্যু প্রতিপালন জমিস্বত্ব ও রামলালা-কমলা লক্ষ্মী নিয়ে মূলরাজবাড়ী সংলগ্ন যোগেন্দ্র ভবনে চলে যান। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় এই আপোষ-মীমাংসাতে সাহায্য করেছিলেন বলে কথিত।

এই সময় ঔপনিবেশিক করভারে জর্জরিত এই রাজবংশ বিভিন্ন বন্ধকি মামলা, শরিকি বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। নিম্ন আদালত, জেলা আদালত, হাই কোর্ট পর্যন্ত মামলা গড়ায়। বন্ধকপ্রাপ্ত হাজারিমল বাবু বনাম অবনী নাথ আয়ুর্ধ্য মামলার রায়ে উচ্চ ন্যায়ালয় মালিয়াড়া রাজম্পত্তির বিভাজনে মিতাক্ষরা নীতির মান্যতা দেয়। (১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে ৫ই সেপ্টেম্বর হাজারিমল বনাম আবনীনাথ অধ্বুর্য মামলায় উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারক আশুতোষ মুখার্জী ও চার্লস পার্টেন ব্রীচক্রফ এই রায় দেন। উল্লেখ্য ব্রীচক্রফ আলিপুর বোমা মামলায় ঋষি অরবিন্দকে বেকসুর খালাস করছিলেন।) অর্থাৎ বড় সন্তান জমিদারির অধিকারী হবেন ও বাকিরা ভরণপোষণ সম্পদ বা বৃত্তির অধিকারি হবে। নিচে সেই ঐতিহাসিক রায়ের প্রতিলিপি দেওয়া হল।

Hazarimal Babu vs Abani Nath Adhurjoya And Ors. on 5 September, 1912

Equivalent citations : 18 Ind Cas 625

Author : A Mookeejee

Bench : A Mookerjee, Beachcroft

JUDGMENT Ashutosh Mookeejee, J.

1. This is an appeal on behalf of the first defendant, in a suit for declaration that a decree obtained by the first eight defendants against the ninth defendant on the 26th July 1904, on the basis of four

mortgages, is not binding upon the plaintiffs, the first four of whom are the sons and the fifth is the wife of the mortgagor. The plaintiffs asked for a declaration, for an injunction, and for incidental reliefs. The first eight defendants resisted the claim substantially on the ground that the plaintiffs were bound to pay the debts of the ninth defendant, which were incurred for legal necessity and not for immoral purposes as falsely alleged by the plaintiffs. The defendants further contended that the properties hypothecated were the self-acquired properties of the mortgagor. The family to which the mortgagor belongs is governed by the **Mitakshara School of Hindu Law**, and the evidence on this point is described by the Court of first instance as complete, satisfactory and overwhelming. The founder was a Kanauj Brahmin, who migrated from the North-Western Provinces and settled at Maliara in the District of Bankura. The family has acquired considerable landed property, and the eldest male member is locally styled as Raja. In the Court of first instance, an issue was raised upon the question, whether the Maliara estate is impartible and succession thereto is governed by the rule of primogeniture. This issue was, however, subsequently expunged and the suit proceeded to trial. The Subordinate Judge found, with regard to the first property mentioned in the schedule to the plaint, that it was the ancestral property of the mortgagor, and decreed the claim is so far as that property was concerned. As regards the third property, mentioned in the schedule, he held that it was the self-acquired property of the mortgagor and dismissed the claim in respect thereof. When the matter was taken on appeal to the District Judge, he held that the sixth issue ought not to have been expunged and remitted the case to the original Court for decision of the question raised therein. The Subordinate Judge held that there was no tangible or direct evidence in proof of the allegation that in the Maliara estate, the eldest son alone succeeded according to the family usage and the other sons were entitled to receive nothing beyond maintenance allowance. The matter then came up for disposal before the District Judge, and he proceeded to consider the appeal by the defendant in so far as the first property was concerned and a cross-appeal by the plaintiffs in respect of the third property. On behalf of the creditor appellant, three points were urged, namely, first that the plaintiffs could not maintain a pure declaratory suit and should have asked for consequential relief by way of possession; secondly, that the first property was not ancestral property is the hands of the mortgagor; and thirdly, that the debts had not been proved to be illegal or immoral. On behalf of the plaintiffs-respondents, it was argued that the third property was not

the self-acquired property of the mortgagor. Upon the first question, the District Judge held that the suit as framed was maintainable. Upon the second question, he held that the view of the Subordinate Judge, namely, that the first property was ancestral, could not be successfully attacked. Upon the third question, he affirmed the finding of the Court of first instance that the debts were contracted for immoral purposes and that the creditors were aware of the purpose for which the loans were taken. As regards the cross appeal, he found that the third property had been rightly deemed self-acquired property, as it was a lease-hold interest acquired by the mortgagor himself. In this view, the District Judge dismissed both the appeal and the cross-appeal and affirmed the decree of the primary Court. The first defendant alone has appealed to this Court, and on his behalf, the decree of the District Judge has been assailed substantially on the ground that the first property was the self acquired property of the mortgagor. There is no controversy as to the history of the acquisition of this property by the ninth defendant. The property admittedly formed part of the Maliara estate. On the 25th May 1889, the father of the ninth defendant made a testamentary disposition. The Will recites that he had four sons and a married daughter who lived with him, and that according to family custom, his eldest son would inherit the entire zemindari, while the other sons would get maintenance either in cash or from property. The testator then proceeds to state that each of his sons other than the eldest would get lands yielding a net annual profit of Rs. 2,000 and a house to be built at a cost of Rs. 5,000, Then follows an important clause to the effect that the property given for maintenance and the houses for residence, which each son will get, will be held and enjoyed by him by right down to his sons, grandsons and their sons in succession. The first property now in dispute was received by the ninth defendant under this clause of the Will, and the question in controversy is, whether it became his self-acquired property or formed ancestral property subject to the rules of Mitakshara law. To determine this question, it is essential to investigate, in the first instance, whether the Maliara estate, of which it formed part, was impartible and descendible according to the rule of primogeniture. As already stated, there has been no satisfactory determination of this question, and both the parties are responsible for this result. The sixth issue specifically raised the question, but was expunged by consent of parties. The District Judge directed the issue to be restored and tried, but as no evidence had been directed to this point at the original trial, the Subordinate Judge could only come to the conclusion that the affirmative of the issue had not been proved. In effect, the

only evidence on the record, worthy of the name, upon this matter, is the assertion of the father of the mortgagor in his Will that the estate was impartible and governed by the rule of primogeniture. A question of this character, however, cannot obviously be decided upon such slender material. The creditor, no doubt, seeks to hold the plaintiffs bound by their allegations in the plaint, but this is not quite fair, because he did not accept those allegations in the Court of first instance, and, indeed, expressly repudiated them. The substance of the matter, therefore, is that each party seeks to abandon the position originally taken up by him and relies upon the case of his adversary. This is manifestly unsatisfactory, and the position is not by any means improved when we bear in mind the fact that four of the plaintiffs are infants, represented by their mother, a paradanashin lady, who is herself the fifth plaintiff. As their Lordships of the Judicial Committee pointed out in Ramalakshmi Ammal v. Sivanantha 14 M.I.A. 570; 12 B.L.R. 396; 17 W.R. 553 it is of the essence of special usages modifying the ordinary law of succession that they should be ancient and invariable and that they should be established to be so by clear and unambiguous evidence. It would not be right, therefore, to assume for the purposes of this

2. appeal that the Maliara estate is not governed by the ordinary rules of inheritance but is an impartible estate descendible according to the rule of primogeniture. The question was in controversy in the Courts below and the Subordinate Judge answered it against the plaintiffs, upon objection taken by the defendants; the latter cannot be permitted to take up an inconsistent position when it suits them to do so, to withdraw their objection, and to seek to bind the plaintiffs by an assertion which they have failed to establish; the plaintiffs may as well seek to hold the defendants fast to their allegation. In the events which have happened, the Court cannot attribute to the family a status which involves a departure from the ordinary law and can be established only by convincing proof. In these circumstances, if it were necessary to determine this question for the purposes of the appeal, it would, in my opinion, be essential to remand the case to the Court of first instance for a fresh investigation. But as I shall presently show, the appellant cannot succeed even on the assumption that the Maliara estate is impartible and governed by the rule of primogeniture.

2. Let us assume for a moment that the Maliara estate is an impartible zemndari descendible according to the rule of primogeniture. The decision of their Lordships of the Judicial Committee in Sartaj Kuari

v. Deoraj Kuari 15 I.A. 51; 10 A. 272 shows that the holder for the time being is competent to alienate the estate without the consent of the next taker, because the eldest son of the holder is not a joint owner; in other words, as there is no joint ownership, there is no right to partition and no restraint upon alienation. The subsequent decision in Venkata Surya Mahipati Rama Krishna v. The Court of Wards 26 I.A. 83; 22 M. 383; 8 O.W.N. 415 shows that an impartible zemindari is not inalienable by Will or otherwise, by virtue only of its impartibility, and in the absence of proof of some special family custom attaching to the zemindari and having that effect. Assume, therefore, that the father of the ninth defendant was in possession of an impartible estate and made a valid testamentary disposition whereby he granted to his younger son part of the property of the estate, for his maintenance and for the maintenance of his descendants. The question arises, whether the property so received by the ninth defendant became self-acquired or ancestral property in his hands. Upon this question, there is a well-marked divergence of judicial opinion; and though an elaborate attempt has been made by each party to distinguish the cases which run counter to their respective contentions, it is clear that in whatever manner the cases may be sought to be distinguished, two conflicting principles have been adopted, one by the Calcutta and the Madras High Courts and the other by the Bombay and the Allahabad High Courts.

3. In Muddun Gopal v. Ram Buksh 6 W.R. 71 at p. 74 a father distributed property acquired by him, among his sons by various deeds of gifts. It was held that the portion obtained by each son was ancestral property in so far as his issue was concerned; it was further held that property acquired by a grandfather and distributed by him amongst his sons, did not by such gift become the self-acquired property of the sons so as to enable them to dispose of it by gift or sale without the consent and to the prejudice of the grandsons. The same principle was recognised in Tara Chand v. Reeb Ram 3 M.H.C.R. 50 at p. 55. The question arose again in Nagalingam Pillai v. Ramchandra Tevar 24 M. 439; 11 M.L.J. 210 where the father of the plaintiff made voluntary gifts of certain property to the defendant after the birth of the plaintiff. The whole of the property in question had been acquired by the plaintiff’s paternal grandfather, who disposed of it by Will to his three sons, of whom the father of the plaintiff was one. The plaintiff contended that, notwithstanding this fact, the property had the quality of ancestral property in his father’s hands. It was held that as there were no words in the grandfather’s Will that the sons would hold their shares free from the incidents of ancestral property, the property

devised by him to his sons was ancestral, and that the plaintiff was, therefore, entitled to succeed in a suit brought by him to set aside his father's alienation and to recover the property. It was farther held that if a partition was made by the father on the footing that the property was partible property, although in point of law there was a disposition made by the father, there was no doubt that the father intended that the quality of the ancestral estate should remain. On the other hand, it was ruled in Jagmohan Das v. Sir Mangaldas 10 B. 528 that a son to whom his father bequeathed his self-acquired property by Will took it under the Will, and not by inheritance, and, that as property devised by Will was held by Hindu Law to be received as gift, such property was self-acquired in the hands of the son and was not subject to partition in his life-time at the suit of the son of the latter. To the same effect is Nanabhai v. Achratbai 12 B. 122 which, however, recognises the position that where a father indicates by his Will that his sons should take his self-acquired property jointly, such property would, undoubtedly, be regarded as ancestral. The current of decisions in Bombay has, however, gone back, as is shown by the cases of Ahmedbhoy v. Sir Dinshaw M. Petit 11 Bom. L.R. 366; 3 Ind. Cas. 124 and Chabildas v. Ramdas 11 Bom. L.R. 606; 3 Ind. Cas. 257. In the former of these cases, it was held that where property passed from one Hindu to another, its character was to be ascertained, in the hands of the latter, by the relationship existing between the grantor and grantee and the mode of transmission; a doubt was further expressed as to whether self-acquired property, devised by a Hindu father to his son, would remain in the hands of the son as the latter's self-acquisition. The Bombay High Court had previously held, in Lakshmibai v. Ganpat 5 B.H.C.R. 128 (O.C.) that where a grandfather indicates by his devise that his property should be held in severalty, such property in the hands of the devisee must be deemed self-acquired and not ancestral. In Parsotam v. Janki Bai 29 A. 354 at p. 363; A.W.N. (1907) 77: 4 A.L.J. 257 Sir John Stanley preferred the view taken in Jagmohandas v. Sir Mangal Das 10 B. 528 to that adopted in Muddun Gopal v. Ram Buksh 3 M.H.C.R. 50 at p. 55 and Tara Chand v. Reeb Ram 3 M.H.C.R. 50 at p. 55. There the Hindu family consisted of a father and his sons, and the father devised by his Will property which he acquired under the Will of his father, to his sons separately by name. It was held that the property so devised remained separate property according to Hindu Law, although the sons continued to live as members of the joint family and treated the property for a long series of years as if it was their ancestral property. Upon a review of the decisions analysed above, it is plain that there

is a divergence of judicial opinion upon the question whether when a Hindu, instead of allowing his self-acquired or separate property to go by descent, makes a gift of it to his son or bequeathes it to him by Will, such property is the separate property of the son or whether it is ancestral in the hands of the son as regards his male issue. According to this Court, such property-is ancestral property in the hands of the son as if he had inherited it from the father: Muddun Gopal v. Ram Buksh 3 M.H.C.R. 50 at p. 55. According to the decisions of the other High Courts, it is a question of construction in each case whether the property was intended to pass to the son as ancestral property or as separate property, though in Bombay and Allahabad the inference has been in favour of the separate or self-acquired character of the property, Jugmohan Das v. Sir Mangul Das 10 B. 528; Parsotam v. Janki Bai 29 A. 354 at p. 363; A.W.N. (1907) 77: 4 A.L.J. 257 while in Madras, the tendency has been in favour of the inference that the character of the property was ancestral; Tara Chand v. Reeb Ram 3 M.H.C.R. 50 at p. 55; Nagalingam v. Ramchandra 24 M. 439; 11 M.L.J. 210. The decision in Muddun Gopal v. Ram Buksh 3 M.H.C.R. 50 at p. 55 has been treated in this Court as good law for half a century and was expressly followed in Hardai Narain v. Haruck Dhari Singh 12 C.L.R. 104 the decision wherein was subsequently affirmed by the Judicial Committee: Nanomi Babuasin v. Modhun Mohun 13 I.A. I; 13 C. 21. The decision of the Full Bench in Modhoo Dyal v. Golbur Singh 9 W.R. 511 does not touch the question raised before us and so also the decision in Bawa Misser v. Rajah Bishen Prokash 10 W.R. 287. I am not un-mindful of the observation of Sir Barnes Peacock to counsel in the course of argument in Pauliem Valoo v. Pauliem Sooryah 1 M. 252 at p. 255; 4 I.A. 109 but this can hardly be taken as a decision upon the point which did not directly arise in that case; nor can the decision in Rajah Ram Narain Singh v. Pertum Singh 20 W.B. 189; 11 B.L.R. 397 be deemed to contain any definite pronouncement upon the matter. On the other hand, the decision in Muddun Gopal v. Ram Buksh 3 M.H.C.R. 50 at p. 55 was treated as good law in Ram Chandra Marwari v. Mudeshwar Singh 33 C. 1158; 10 C.W.N. 978 and Laliteswar Singh v. Bhabeswar Singh 35 C. 823; 8 C.L.J. 124; 12 C.W.N. Under these circumstances, I am not prepared to dissent from the decision in Muddun Gopal v. Ram Buksh 3 M.H.C.R. 50 at p. 55 though it may be conceded that if the matter were res integra, the question would be worthy of consideration. It cannot further be overlooked that even if the view be maintained, as has been done in some of the cases reviewed, that it is a question of construction whether the property was intended to pass to the son as ancestral

property or as separate property, the appellant cannot possibly succeed. The testamentary disposition of the father of the ninth defendant makes it abundantly clear that the intention of the testator was that the property should vest in his son for the maintenance, not merely of his son himself but also of his grandsons and their descendants. The testator would have been very much surprised to hear that the effect of his devise was to make the property self-acquired property in the hands of his son, so that he might alienate it at pleasure and deprive the grandsons of their only, means of maintenance. It may finally be observed that the view adopted by Sir Charles Sargent in Jagmohandas v. Sir Mangal Das 10 B. 528 is applicable only to cases where the property obtained by the son from his father may be regarded as given simply as an act of favour; in other words, to exclude such property from partition, it must be brought within Chapter I, Section 4 pl. 28 read with Chapter 1 Section 6 pl. 13-16 of the Mitakshara. But in the present case, it is impossible to say that the disputed property was "Pitriprasadlabdha" or obtained through the father's favour" within the meaning of the e xpression as used in the Mitakshara; the Will of the father admits that the younger sons are entitled by family custom to maintenance in cash or property, and with a view to prevent future dispute, he gave this particular property to the ninth defendant. It cannot justly be maintained that this was a mere act of favour; on the other hand, the property so given may rightly be deemed to possess the same characteristics as would have attached to it, if the father had, during his life-time, given it to his son for maintenance, or the latter had obtained it from his eldest brother, the holder of the impartible estate, in lieu of maintenance as a matter of right. The decisions of their Lordships of the Judicial Committee in Sartaj Kuari v. Deoraj Kuari 26 I.A. 83; 22 M. 383; 8 O.W.N. 415 and Venkata, Surya Mahipati. Rama Krishna Rao v. The Court of Wards 26 I.A. 83; 22 M. 383; 8 O.W.N. 415 recognise that the holder of an impartible estate has the right to alienate the estate without the consent of the next taker; but these decisions do not, by necessary implication, involve the conclusion that if the holder of the impartible estate, by a testamentary disposition or otherwise, carves out a portion thereof and grants it to his younger son for purposes of the maintenance of the son and his descendants, such property becomes the self-acquired property of the grantee, liable to be capriciously alienated by him to the detriment of the grandsons of the testator. It is not contended, and in view of the decision of the Judicial Committee in Durgadut v. Rameswar 36 C. 943; 10 C.L.J. 233; 13 C.W.N. 1013 (P.C.); 6 M.L.T.

68; 11 Bom. L.R. 901; 6 A.L.J. 847; 4 Ind. Cas. 2; 36 I.A. 176; 19 M.L.J. 567. it cannot be contended, that the property is inalienable, but the view may well be maintained that it has all the incidents of ancestral property. I hold, therefore, that the disputed property was ancestral property in the hands of the ninth defendant.

4. If the property is held to be ancestral property in the hands of the mortgagor, the decree of the District Judge cannot be successfully attacked. The plaintiffs do not dispute the well-settled rule that where it is alleged by the sons that a particular debt was contracted by the father for an illegal or immoral purpose, the burden lies upon them to show that it was contracted for such purpose; such burden is not discharged by proof that the father lived an extravagant or immoral life; there must be a direct connection established between the particular debt and the immorality set up by the son. Suraj Bunsi Koer v. Sheo Persad 6 I.A. 88; 5 C. 148; 4 C.L.R. 256; Bhagbut Pershad v. Girja Koer 15 L.A. 99; 15 C.717; Sahu Sita Ram v. Zalim Singh 8 A. 231; A.W.N. (1886) 62; Kishan Lall v. Garuruddhwaja 8 A. 231; A.W.N. (1886) 62; Gaura v. Nanak Chand 6 A. 193; A.W.N. (1884) 23; Chintamanrav v. Kashinath 14 B. 320; Sadashiv v. Dinkar 6 B. 520 and Dattatraya v. Vishnu Narayan 36 B. 68; 13 Bom. L.R. 1161; 12 Ind. Cas. 949. The burden which thus rests upon the sons has been discharged in this case. The District Judge has held that there is ample evidence to show the connection between the debts and the immoralities alleged and proved by the sons, and further that the creditors were aware of the purpose for which the loans were taken. Some stress was laid, however, on the form of the issue raised upon this point, namely, were the mortgage bands bona fide transactions and executed for legal necessity, and it was suggested that the question of immorality was not expressly raised. But no objection was taken in the Courts below to the form of the issue which was framed in the presence of the parties. The parties went fully into evidence upon the question of immorality. There is no suggestion that either of them has been misled by the terms of the issue, and the Court would not, under these circumstances, remand the case for retrial: Vishnu Ramchandra v. Ganesh Appaji 21 B. 325 and Rajah Saheb Perladh Singh v. Broughton 24 W.R. 275.

5. It has finally been contended that the fourth plaintiff, who is said to have been born after the execution of the mortgages, is not entitled to relief in respect of what would be his share in ancestral property. This question does not appear to have been pressed before the District Judge, and there is no substance in it. It is well-settled that where a

Mitakshara, father has made an alienation without necessity and without the consent of sons then living, it would not only be invalid against them but also against any son born before they had ratified the transaction, and no consent given by them after his birth would render it binding upon him: Hurodoot Narain Singh v. Beer Narain 11 W.R. 480 and Bunwari Lal v. Daya Sunker 13 C.W.N. 815; 1 Ind. Cas. 670. Substantially to the same effect is the decision in Ponnambala Pillai v. Sundarappayyar 20 M. 354; 7 M.L.J. 240 although one need not take the extreme view adopted by the Pundits of the Madras Sadar Court in Sooba Pudten v. Janga Miah (1851) M.S.D.A. 3. I am not unmindful that the contrary view was taken by the Allahabad High Court in Chuttan Lal v. Kallu 33 A. 283; 8 A.L.J. 15; 8 Ind. Cas. 719 but the later view of the same Court is in harmony with that adopted by this Court: Tulshi Ram v. Babu Lal 33 A. 654; 8 A.L.J. 733; 10 Ind. Cas. 903. It may be conceded that an alienation, valid when it is made, Cannot be set aside at the instance of any son, grandson or other co-parcener who was neither born nor begotten at the time of alienation: Raja Ram v. Luchnun, 8 W. It. 15 and Bholanath v. Kartick Kissen 34 C. 372; 11 C.W.N. 462. It may also be conceded that an alienation, valid when it is made, cannot be impeached by a son adopted after the date of alienation: Sudanund v. Soorjoo Mouse 11 W.R. 436 and Rambhat v. Lakshman 5 B. 630. The position, however, is obviously different in a case where the alienation, when made, is not valid, and the case is very much stronger where, as here, the property has not as yet passed completely out of the family; there is, as pointed out by this Court in Kishan Pershad v. Tipan Pershad 34 C. 735; 11 C.W.N. 613; 5 C.L.J. 569 a fundamental distinction in this class of cases between an absolute alienation and a mortgage by the father. In my opinion, the position of the fourth plaintiff cannot be differentiated from that of his brothers upon any sound principle of law.

6. The result is that as all the contentions of the appellant fail, the decree of the District Judge must be affirmed and (his appeal dismissed with costs to the plaintiffs-respondents.

## Beachcroft, J.

7. I agree that the appeal must be dismissed, though I am not at one with my learned brother in regard to the first point, which he discusses in his judgment. I think, for the purposes of this appeal, that we mast proceed on the footing that the Maliara estate was impartible and

governed by the rule of primogeniture. This was the case with which the plaintiffs started their action. It is true that the defendants denied it and that when the learned District Judge, before whom the appeal first came, remanded the suit for a finding on the issue as to impartibility, the parties found it convenient to reverse their positions on this question. The decision (on remand) of the Subordinate Judge shows that the parties were given an opportunity to produce evidence on the point, but no evidence was offered beyond what was already on the record. No doubt impartibility is an instance of a special usage modifying the ordinary law of succession and it is for the party alleging it to establish his position. But I do not think it quite right to say that the defendant can no more rely on the plaintiffs' original case than the plaintiffs can on the defendants. It must be remembered that the plaintiffs are members of the family and, therefore, presumably know whether their family estate is impartible or not. The principal defendants, on the other hand, are strangers to the family and their denial of impartibility really amounted to no more than to putting the plaintiffs to proof of their case. Where a defendant merely puts a plaintiff to proof of the usage on which he bases his title, I do not see that he is precluded from saying at a later stage that he will not insist on proof of the usage, but will accept the plaintiff's case on the point. But it is altogether another matter for a plaintiff, who presumably knows the truth as to the usage and bases his case on it, to turn round and gay: I find it more convenient for my title to deny the usage and, therefore, I will accept the defendant's contention."

8. As regards the question whether a son, to whom his father bequeaths self-acquired property by Will, takes under the Will, or by inheritance, I incline to the view that he takes by Will but I cannot press my view in the face of the decision of this Court in the case of Muddun Gopal v. Ram Buksh 3 M.H.C.R. 50 at p. 55 which has been subsequently accepted as good law by this Court in the cases of Hardai Narain v. Haruck Dhari Singh 12 C.L.R. 104; Ram Chandra Marwari v. Mudeshwar Singh 33 C. 1158; 10 C.W.N. 978; Laliteswar Singh v. Bhabeswar Singh 35 C. 823; 8 C.L.J. 124; 12 C.W.N. In the last mentioned case, it was held that a grant of ancestral property for the maintenance of junior branches of the family did not divest the property granted of its ancestral character. In the present case, there can be no question that the grant was one of this nature. It is not necessary to discuss the question whether such a grant offends against the law of perpetuities. It is sufficient to say that such a grant has been recognised as valid by this Court and that I am not prepared to dissent from that decision.

# সংযোজনী-২

শ্যামসুন্দরপুর রাজার রায়ত ছিলেন ক্ষিরোদ বিহারী দত্ত ও পান্ডারা ছিলেন দত্তদের অধীন দরমোকাবরী ইজারাদার। কবুলিয়ত অনুসারে পান্ডাদের সরাসরি রাজাকে রাজস্ব দেওয়ার কথা। এই সংক্রান্ত বিবাদ উচ্চ ন্যায়ালয় পর্যন্ত পৌঁছলে বিচারক জে উইলিয়ামস ১৬ ই মার্চ ১৯৩৪ এর রায় দেন। নিচে রায়ের হুবহু তুলে ধরা হল।

Khirod Behari Dutt vs Man Gobinda And Ors on 16 March, 1934

Equivalent citations : AIR 1934 Cal 682, 152 Ind Cas 351
Author: Lort-Williams

## JUDGMENT Lort-Williams, J.

1. This appeal arises out of a suit for arrears of rent. The facts are not disputed. The plaintiff is the usufructuary mortgagee of the Zamindar (defendant 7). The Dutta defendants (defendants 1 to 6) are the Zamindar's tenants of the jama in suit consisting of seven moujas in pergana Shyamsundarpur. The Panda defendants (defendants 8 to 17) held the land in darmokarari lease under the Dutta defendants by a kabuliyat wherein it was stipulated that the Pandas would pay the Dutta's mokarari rental direct to the Zamindar and would indemnify the Duttas against any claim made by him. Further it was stipulated as security for the due discharge of my liabilities for the said jama and the said Trust (Barat) as described above in the present kabuliyat, I do hereby create a charge (pratibandhak) upon my mokarari interest in the moujas of Jharya and Shyampur, both in my khas possession,
2. This is an agreed translation. The kabuliyat was acted upon by all the parties interested, in respect of former payments of rent. That is to say

the Pandas used to pay the Zamindar's rent direct, and the arrangement was accepted by him. The sole question for decision is, whether the plaintiff can rely upon this contract which was made between the Pandas and the Duttas, and get a decree for his rent against the Pandas. On this point what was the old rule of the English Common law is beyond dispute. 'No one but the parties to a contract can be bound by it or entitled under it': Anson, Law of Con-tract, (Edn. 16) 274. 'A third person cannot become entitled by the contract itself to demand the performance of any duty under the contract,' Pollock, Principles of Contract: (Edn. 9), 212, 220. 'No man can enforce a contract to which he is not a party, even though he has a direct interest in the performance of it': Salmond and Winfield, Law of Contracts, 18. The law was stated in positive and unmistakable terms in Twaddle v. Atkinson (1861) 1 B and S 393, and in Dunlop Tyre Co. v. Selfridge (1915) AC 847, Viscount Haldane, L.C., said (p. 853): 'In the law of England certain principles are fundamental. One is that only a person who is a party to a contract can sue on it. Our law knows nothing of a jusquaesitumtertio arising by way of contract.' But to this rule Courts of Equity introduced exceptions. 'A contract can create no right or liability in a person who is not a party to it; unless he can claim or be charged through a party, as in the case of a cestui que trust claiming through a trustee; or a principal claiming or being charged through an agent': Leake on Contracts (Edn. 7), P. 301.

3. The necessity for the Common law rule arose out of the implications of the old Common law action in assumpsit. The reason for the exceptions was the necessity to provide some escape from the harsh and inelastic bonds of the old rule. Like so much else in the progressive growth of English law, this expansion was achieved by means of the dual fictions of trust and agency. In India there are no reasons legal, historical or otherwise, why we should shrink from a frank recognition of this fact. A careful examination of the English decisions on the point leads inevitably to the conclusion that they were based upon fiction. This tendency began prior to the decision in Twaddle v. Atkinson (1861) 1 B and S 393. Thus in Dutton v. Poole, (1677) 2 Leave. 210, a donee beneficiary was allowed to sue in assumpsit, though she was not a party to the contract and gave no consideration. But its rapid extension was due to Courts of Equity which recognised a right in a contract beneficiary. Thus in Tomlinson v. Gill, (1756) Ambler 330 the defendant had promised a widow that if she would consent to his being appointed a co-administrator with her deceased husband's estate, he would pay the debts of the deceased to the extent of any deficiency in the assets. The plaintiff, a creditor of the deceased, brought a bill in equity to enforce

this promise and obtained a decree on the ground, as stated by Lord Hard-wicke, that the promise was for the benefit of the creditors, and the widow was a trustee for them.

4. This was probably the origin of the use of the conception of a trust for the benefit of a contract beneficiary. It is clear that in that case this was a fiction. There was no trust fund to be administered either by the defendant or the promisee. Doubtless the defendant and the widow were trustees of the deceased husband's estate, but this was not the object of the contract, but the payment of any deficiency in the estate. For this neither he nor she ever held any property or money in trust, nor did Lord Hardwicke call him a trustee. It was the widow who was called the trustee for the creditors of the promisee made by the defendant, and calling her a trustee was merely a device for making the defendant keep his promise. But this conception was invented by the Chancery Court, and used to undermine and nullify the rule of the common law and to enforce rights in third persona which the common law refused to recognize. In particular it was used to avoid the common law doctrine of "lack of privity of contract" and "stranger to the consideration." Sometimes the theory of agency was used for the same purpose. The promisee was said to have received the promise as agent for the third party. The next case to be considered is Gregory and Parkar v. Williams, (1817) 3 Mer 582. Parkar was indebted to both Williams and Gregory. In consideration of an assignment by Parkar of all his property to Williams. Williams promised Parkar that he would pay 900 to Gregory in settlement of Parkar's debt to Gregory. Later Gregory and Parkar brought their bill in equity against Williams to compel the performance of his promise made to Parker. The Master of the Bolls, Sir William Grant, held that the bill was maintainable and decreed the payment by Williams of 900 to Gregory, on the ground that Parker acted as trustee for Gregory and "Gregory may derive an equitable right through the mediation of Parker's agreement," though he was not a party to it, nor furnished any part of the consideration.

5. This decision rested on Lord Hardwicke's theory as stated in Tomlinson v. Gill, (1756) Ambler 330 and it was not suggested that the property conveyed by Parker to Williams was held by Williams as a trust fund for the benefit of Gregory. Williams was required to pay Gregory because he made a promise to Parker for the benefit of Gregory. Parker, the promisee was the trustee; and Williams, the promisor was not. The word trust was not used in the contract. The money was to be paid to Gregory and not to Parker, the promisee. Parker was not intended to become and never, in fact, became a trustee of the 900. In Gandy v.

Gandy, (1884) 30 Ch. D 57 a husband contracted to pay money to trustees for the support of his wife and children. The trustees refused to sue; and the Court said there was no trust by virtue of which the children could sue in their own names. But the wife, as a beneficiary who had the children to support, obtained a decree for everything promised. She was not the promisee, and the promise was not to pay money to her. In Fletcher v. Fletcher, (1844) 4 Hare 67, a father executed a sealed covenant in which he promised certain persons named therein that his executor or administrator would pay to them the sum of 60,000 in trust for the benefit of the promisor's illegitimate sons. The promisees named as trustees declined to act or to enforce the contract. One of the beneficiaries brought his own bill against the executors of his father's will and obtained a decree for the payment of the money direct to him. Here no money was ever held in trust. There was merely an executory covenant to pay money to be held in trust. The Vice Chancellor held that the covenantees were trustees of the covenant, even though they never assented to it, and that the beneficiary could enforce it. But it is clear that no trust fund was ever created. The Court was merely enforcing an executory contract to create a trust fund, and did it by declaring that the named promisees were trustees of the covenant. The covenantor said nothing of such a trust as this. Until the fund was created, the plaintiff was merely a beneficiary of the contract, if he could enforce a contract to create a trust fund, he should be able to enforce a contract to pay money in any other manner.

6. There are several cases holding that a creditor can give an enforceable right to a third person by merely directing his debtor to pay the debt to the third person or to make an investment for him, the debtor assenting thereto. Thus in Paterson v. Murphy, (1853) 11 Hare 88, Paterson borrowed 300 and promised the lender to repay part of it by investing in consols for the promisee's children. The debtor never made the investment and paid the debt to the lender, because the lender countermanded the direction to make it. A bill by the children in the administration of the promisee's estate was sustained, even though they had known nothing of the transaction until after the attempted revocation. No fund was ever in the hands of the defendant as a trustee. In Parker v. Stones, (1868) 38 LJ Ch. 46 at the creditors's request his debtor promised to pay the amount of the debt to third parties creditor saying that he "could trust him to pay the money according to directions." In these cases the creditor can be held to have made himself a trustee of the right to performance by the debtor; but it seems that the Court may have regarded the debtor as the trustee, although he merely made a promise to pay his debt in a new way, and did not segregate

any part of his general assets as a trust fund. These cases might have been, but were not, regarded as cases of oral assignments of the debt; otherwise, they were merely contracts by a debtor to pay to a third person. Courts of equity having declared the promisee to be a trustee, the Court of exchequer proceeded to hold that the promisee could sue on the contract and recover, not merely nominal damages, but the full amount promised for the benefit of the third party. In Lamb v. Vice, (1840) 6 M and W 467, the defendant, as an officer of the Palace Court, had given a bond to the Knight Marshal of that Court, as security for the due performance of the duties of his office, and that he should take sufficient bail from all persons arrested by him. In an action by a creditor against the debtor, the defendant released the debtor on insufficient bail, with the result, that the creditor lost his money. Thereupon the Knight of Marshal brought an action of debt on the defendant's bond for the benefit of the creditor. It was argued that the plaintiff could recover only nominal damages, because the defendant's breach had caused him no loss. The Court held however that the plaintiff could recover the full amount of the injury suffered by the creditor.

7. The bond was a contract between the defendant and the plaintiff which partly benefited third parties, but there was not a word in the bond itself to indicate that the plaintiff was acting as a trustee for them. Clearly, the concept of a trust was used in this case only for the purpose of enabling a third party, who was one of a class benefited by the contract, to recover damages in a common law action for its breach. The performance promised by the defendant was not payment of money to anybody. The damages awarded belonged to the creditor. They were not a trust fund which the defendant had promised to pay to the plaintiff, or that the plaintiff had promised to hold in trust. In Robertson v. Wait, (1853) 8 Ex. 299, the plaintiffs chartered a vessel of the defendant to carry a cargo from Liverpool to Calcutta; and the defendants promised, in the charter party to consign the vessel to Ewing and Co. at Calcutta on the usual terms, one of them being that the consignees might procure the homeward freight at 5 per cent, commission. The defendant consigned the vessel to Ewing and Co., but did not permit them to procure the homeward freight, thereby depriving them of the commission and depriving the plaintiffs of a part of that commission, which by reason of an arrangement with Ewing and Co., the plaintiffs would have received, It was held that the plaintiffs could maintain an action for the full amount of the commission so lost by them and by Ewing and Co. The Court said that the contract was made for the benefit of Ewing and Co.; and Parke, B., remarked (p. 302): "I entertain no doubt whatever that the plaintiffs are entitled to recover the whole

amount as trustees for Ewing and Co.

8. Clearly, the only reason for holding that the promisees were trustees for Ewing and Co. was, that the contract, if performed, would have resulted in a benefit to them. Plaintiffs' recovery of the full amount was directly dependent upon the right of Ewing and Co. to the expected commission. The word trustee was not used in the contract. If such a contract makes the promisee a trustee and creates a right to the commission in Ewing and Co. as cestui que trust, there is no reason why the same result should not follow where two parties make an ordinary commercial contract under which, if performed, third will benefit. The promisee, in these cases, was only a trustee to the extent that he must allow the use of his name. With respect to the money, if it came into his hands at all, his duty was to pay it over to the rightful owner, he was a mere conduit.

9. In Touche v. Metropolitan Ry. W. Co., (1871) 6 Ch. 671, the plaintiff rendered services to the promoters of the defendant company and they promised that he should receive 2,000 from the company. Later, when the company was formed, its articles of association provided that 2,000 should be paid to Walker, one of the promoters, for the benefit of the plaintiff. The plaintiff sued the company in his own name for the 2,000. It was held that the defendant company's promise to pay the 2.000 was made to the promotor as trustee for the plaintiff; and that the plaintiff had a right to come here and obtain the benefit of the arrangement entered into between Walker and the company" (p. 677). The Court cited Gregory and Parkar v. Williams, (1817) 3 Mer 582 as an authority to that effect. It seems clear that the plaintiff was not the promisee and that he gave no consideration for the defendant company's promise. The plaintiff was merely a beneficiary of the contract, and Walker, the promisee, was called a trustee merely to enable the plaintiff to enforce a contract made by others under which, if performed, he would benefit. In the ordinary sense of the term there was no trust in any of the cases now under discussion. The concept of trust was being used as a mere device for the recognition and enforcement of the right of a third party beneficiary created by a contract to which he was not a party.

10. In the case of Lloyd's v. Harper (1880) 16 Ch. D 290 in consideration of the admission of R. H. Harper as an underwriting member of Lloyd's Samuel Harper wrote to Lloyd's: I beg to tender may guarantee on his behalf, and to hereby hold myself responsible for all his engagements in that capacity'. R. H. Harper defaulted on certain marine insurance policies, and Lloyd's sued Samuel Harper on the guarantee contract,

for the benefit of the holders of such policies. It was argued that Lloyd's had suffered no injury, and were entitled only to nominal damages. It was held however that they could recover the amount that was due to the holders of the insurance policies. The cases of Tomlinson v. Gill, (1756) Ambler 330. Lamb v. Vice, (1840) 6 M and W 467 and Gregory and Parkar v. Williams, (1817) 3 Mer 582, were approved and followed. Lloyd's, the promisees were said to have received the guarantee promise as trustees for the benefit of many third parties, including the holders of insurance policies issued by R. H. Harper. Fry, J., said (p. 309) :

In my opinion the action can be maintained for the whole amount covered by the guarantee. It apears to me from the cases which were cited in the course of the argument, especially Tomlinson v. Gill, (1756) Ambler 330 and Lamb v. Vice, (1840) 6 M and W 467 that were a contract is made for the benefit and on behalf of a third person, there is an equity in that third person to sue on the contract; and the person who has entered into the contract may be treated as a trustee for the person for whose benefit it has been entered into.

11. In the Court of Appeal, James, L. J., said (p. 315) :

I am of opinion that Fry, J., was well warranted in the conclusion at which he arrived that the engagement was made with the Committee as trustees for and on behalf of the person beneficially interested,

12. Speaking on the argument that Lloyd's could recover no more than nominal damages, Lush, L. J., said (p. 321):

That, to my mind, is a startling and alarming doctrine, and a novelty, because I consider it to be an established rule of law that where a contract is made with A for the benefit of B.A can sue on the contract for the benefit of B and recover all that B could have recovered if the contract had been made with B himself.

13. In this case the contract was merely an ordinary contract of guarantee, made partly for the protection of Lloyd's, partly for the protection of its members, and partly for the protection and security of third persons who might do business with E. H. Harper. If in such a contract the promisee is a trustee for the benefit of third persons the same is true of the promisee in any contract that is made for the benefit of a third person. If the promisee can recover in an action on such a contract the full amount that is due to the third person he does so because the Court recognizes a legally enforceable right in that third person, and not because the promisee himself has a right to such an amount. The amount so recovered belongs to the third person and

not to the promisee. With respect to this money the promisee has no other duties as trustee except to pay the amount so collected immediately to the third person. Where this is so it is a barren formality to require the suit to be brought in the name of the promisee and the beneficiary should be allowed to maintain suit directly in his own name. In some cases, the beneficiary of the contract might beheld to be a cestui que trust on either of two grounds. Two partners have agreed that on the death of one, the survivor shall pay to his widow a sum of money out of the business income, or that the widow shall have an interest in the business. Such contracts have been enforced in favour of the widow as against the creditors of the deceased partner: see Page v. Cox (1851) 10 Hare 163, Re Flavell (1883) 25 Ch. D 89 and Drimmie v. Dayies (1899) 1 Ir. Ch. 176. This could be justified either on the ground that the promisee, the deceased partner, was a trustee for his wife on the principle of Tomlinson v. Gill, (1756) Ambler 330 or on the ground that the promisor, the surviving, partner, promised to take over the business assets in trust for the benefit of the widow.

14. There are a few cases in which the plaintiff was denied a remedy, although the facts cannot be distinguished from those in Tomlinson v. Gill, (1756) Ambler 330. Apparently this was because the Court considered that some trust fund in the possession of one of the contracting parties was necessary. The possibility of regarding the promisee as a trustee of the contract right did not occur to the Court. In Les Affreteurs etc. v. Walford (1919) AC 801 Walford was a broker for the charterers of a ship and negotiated a charterparty with the defendants as owners. In that contract the defendants promised the charterers to pay a commission to the broker. The broker sued the owners on this promise and got judgment. Lord Birkenhead, L.C., said (1919) A. C. pp. 805-806:

    A charterparty is, of course, a contract between owners and charterers, and it is elementary that so far as the brokers are concerned, it is res inter alios acta; but the parties in the present case, by an interlocutory and very sensible arrangement, have agreed that the matter shall be dealt with as if the charterers were co-plaintifls.

15. Thereupon he discussed and followed the case of Robertson v. Wait, (1853) 8 Ex. 299 and the Court held that the contract created in Walford a right to his commission against the shipowners. The learned Lords regarded the charterers as having contracted as trustees for the broker Walford in face of the fact that Walford himself negotiated the contract as agent for the charterers. Lord Wrenbury said (p. 813):

We have here to do with a contract between two parties reserving a benefit of a third. . . a contract to which he himself, I agree, was not a party.

16. Lord Finlay said (p. 811):

    We must regard the charterer as having entered into that bargain in the interests of the broker and as a trustee for the broker.

17. Lord Birkenhead said (pp. 806-807):

    The broker, in effect, nominates the charterer to contract on his behalf, influenced probably by the circumstances that there is always a contract between charterer and owner in which this stipulation, which is to enure to the benefit of the broker, may very conveniently be inserted.

18. In Walford v. Les Affreteur etc, (1918) 2 KB 498, at p. 506, Sorutton, L. J., said:

    That objection, which has existed so long as I have been at the bar has always been avoided on the authority of Robertson v. Wait, (1853) 8 Ex. 299, by the charterers suing as trustees for the broker, or by the shipowners not taking the objection that the brokers were not parties to the charterparty.

19. Bankes, L. J., said (p. 504):

    The plaintiffs were not parties to the contract alleged to be contained in the charterparty, but it was arranged, in order to avoid any amendment, and in order to bring the plaintiff within the decision of Robertson v. Wait, (1853) 8 Ex. 299, that an action should be treated as brought by the charterers for the benefit of the plaintiffs. That is possible, and that the contract inserted in the charterparty between the charterers and the shipowners can be treated as a contract made by the charterers in the interests of the brokers and on which they, the charterers, can sue as trustees for the brokers, must be taken to be established law since the decision in Robertson v. Wait, (1853) 8 Ex. 299, a decision which has never been questioned.

20. The absence of the promisee (the charterer) as plaintiff was held to be made immaterial by the agreement of the plaintiff and defendant to try the case as if the promisee were a co-plaintiff. If he had been the plaintiff, he could have recovered Walford's agreed commission as trustee, and Walford could have compelled its payment over. If Walford had had no right to it by virtue of the contract, assuredly the charterer would not; and the subsequent stipulation between Walford

and the owner would not itself create one. Nor would the issues be res judicata as against the charterer, for he was a party neither to the suit nor to the stipulation. And if the beneficiary Walford had no legally recognized right prior to the stipulation, the House of Lords would not have recognized and enforced such a right merely because the defendant stipulated with him that the issues should be determined just as if a third person were in fact a party plaintiff. In giving judgment that the defendant must pay Walford in accordance with the contract with the charterer, the House of Lords clearly recognized that that contract had itself created an enforceable right in Walford to the promised commission, and it enforced that right by a direct judgment in his favour against the promisor. This was in spite of the fact that Walford did not give the consideration for the defendant's promise and that he was not the promisee in the contract. Walford had rendered services to the charterer; but the defendant's contract was in consideration for the payments made by the charterer of the vessel not in consideration for those services.

21. In 1 Ir. Drimmie v. Dayies (1899) 1 Ir. Ch. 176, the defendant promised his partner by a deed to pay annuities to' the promisee's children. The Court held that the children and the promisee's executors could maintain suit on the sealed contract. The Vice Chancellor said (pp. 181-182):

    The defendant's contention is based on the Common Law rule that in the case of contracts Under seal no one can sue who is not a party to the deed. That rule is fully stated in the case of Twaddle v. Atkinson (1861) 1 B and S 393., namely, that a stranger to the contract, that is to say, a person who is not a party to the contract, and from whom no consideration moved, cannot sue upon it. The test seems to be whether such a person could be sued upon the contract. Now here the daughters and sons were not parties to the contract, nor did any consideration move from them, nor could they be sued upon the contract. But this rule did not prevail in equity, and since the Judicature Act the rules in equity are to prevail in cases where such a conflict exists. The equitable rule was that the party to whose use or for whose benefit the contract had been entered into has a remedy in equity against the person with whom it was expressed to be made.

22. What is the nature of the trust that was created by the Courts in Les Affreteurs etc. v. Walford (1919) AC 801 and Tomlinson v. Gill, (1756) Ambler 330? Nothing was held in trust by the promisor; and no property or money was to be paid to the promisee or was to be held by him as a trust fund. The performance that was agreed upon in these two

cases was a payment by the promisor direct to Tomlinson and to Walford; in Lamb v. Vice, (1840) 6 M and W 467; it was merely the exercise of sufficient care in the taking of bail bonds; in Lloyd's v. Harper (1880) 16 Ch. D 290, it was the causing of R.H. Harper to pay his debts to his creditors. All that the promisee could be said to hold in trust therefore was the contract 'right;' and in none of the foregoing cases was this a right that money should be paid to the promisee, which he was to hold as a trustee for the third person. When it is said that the promisee is a trustee of the contract right that the promised performance shall be rendered, we are merely saying that the facts create a right in the third party. The facts that create the resulting legal relations among the three parties are nothing but a promise by A for a consideration moving from B to render a performance to C. There is no more reason for holding B to be a trustee, than for holding C to have an enforceable right. The result aimed at is the same in either case, and the procedure should be the same in attaining it. In Walford's case the House of Lords recognized that the participation of the trustee is a mere encumbering formality except for the purpose of making the judgment conclusive against him, and that the right to the money is actually in the beneficiary. It is indeed cumbrous procedure that might require, first, a suit by the trustee, and then secondly a suit by the beneficiary, when the net result required by the law is that the money shall be paid to the beneficiary.

23. If it be possible and desirable to declare that a promisee may be a trustee of a contract right by virtue of a mere promise to him to pay money to a third person, it is equally possible and desirable to declare him to be a trustee of a right created by any other kind of promise made for a third person's benefit. In neither case is there recognition of a trust for the purpose of conserving property or affording protection for an incompetent beneficiary; in both cases alike it is for the purpose of compelling performance by a promisor who has received a consideration for his promise. The expansion of the trust concept to include cases such as these is an instance of the growth of law by fiction. In England it has often been by fiction that old rules have been avoided, discredited, and finally broken down. The result is the same whether reached by fiction or not, and there is no reason in India why we should not openly recogniza the fact that fiction has been employed, that a change has been worked in the law by its use, and that the time has come to state the result in terms that will no longer mislead.

24. Whatever may have been the necessity in England whether historical, procedural or otherwise, of making use of such fictions in order to give to a third party the right to enforce a contract made between others, there seems to be no similar necessity for importing these anomalies into Indiaexcept possibly so far as suits on the Original Side of the Chartered High Courts are concerned. There the English Common Law is enforced, but on the appellate side and in the mofussil Courts the English Common Law' is not and has not ever been followed. The first report of the Commissioners, appointed in 1853, to consider the reform of the Judicial, establishments of India stated inter alia:

The Mofussil Courts, on the other hand, had nothing to do with English law but were amenable in all respects to the Regulations of Government, and when Hindu or Mahomedan Law did not apply, or when no Regulations were applicable, were directed to proceed according to justice, equity and good conscience. That is to say, in cases for which no law was provided, the Judges were authorized to use the bast discretion they possessed. (See Rules and Orders, Calcutta High Court (O. S.) Preface, p. 15).

25. The Act of 1861 for establishing High Courts of Judicature in India, provided for the abolition of Supreme Courts and Sadder Courts and the establishments of High Courts which should have and exercise all jurisdiction and every power and authority whatsoever in any manner vested in any of the Courts in the same Presidency abolished under this Act at the time of the abolition of such last mentioned Courts (Section 9.)

26. The Letters Patent of 1865 provided in Clause 21 that the law of equity and rule of good conscience to be applied by the said High Court of Judicature at Port William in Bengal, to each ease coming before it in the exercise of its appellate jurisdiction, shall be the law of equity and rule of good conscience which the Court in which the proceedings in such case were originally instituted ought to have applied to such ease.

27. Nor is there anything in the Indian Contract Act which prevents the recognition of a right in a third party to enforce a contract made by others, which contains a provision for his benefit. In the United States of America this is frankly recognized. Section 136, American Law of Contract, as stated by the American Law Institute, provides that a promise to discharge the promisee's duty creates a duty of the promisor, the creditor beneficiary, to perform the promise.

28. According to Scots Law :

When parties contract, if there be any article in favour of a third party, at any time, estjus quaesitum tertio, which cannot be recalled by either or both of the contractors, but he may compel either of them to exhibit the contract, and there upon the obliged may be compelled to perform; 1 Stair's Inst. Law of Scotland, 95.

29. In Khwaja Muhammad Khan v. Husaini Bagum (1910) 32 All 410 where the appellant executed an agreement with the respondent's father that in consideration of the respondent's marriage with his son (both being minors at the time he would pay to the respondents Rs. 500 a month in perpetuity for her betelleaf expenses, and c., from the date of her reception, and charged certain properties with the payment, with power to the respondent to enforce it, it was held that the respondent, although no party to the agreement, was clearly entitled to proceed in equity to enforce her claim. Their Lordships of the Privy Council said that the case of Twaddle v. Atkinson (1861) 1 B and S 393. was inapplicable, that this case was an action of assumpsit, and that the rule of Common law on the basis of which it was dismissed is not, in their Lordships' opinion, applicable to the facts and circumstances of the present case. Here the agreement executed by the defendant specifically charges immovable property for the allowance which he binds himself to pay to the plaintiff; she is the only person beneficially entitled under it. In their Lordships' judgment, although no party to the document, she is clearly entitled to proceed in equity to enforce her claim. Their Lordships desire to observe that in India and among communities circumstanced as the Mahomedans, among whom marriages are contracted for minors by parents and guardians, it might occasion serious injustice if the Common law doctrine was applied to agreement or arrangements entered into in connexion with such contracts.

30. In Debnarayan Dutt v. Chunilal Ghose, 1914 Cal 129 Jenkins, G. J., and Mookerjee, J., held that where the transferee of a debtor's liability has acknowledged his obligation to the creditor for the debt to be paid by him, under the provisions of the registered instrument conveying to him all the moveable and immovable properties of the original debtor, and the acknowledgment was communicated to the creditor and accepted by him, the arrangement between the creditor and the transferee did not amount to a novation within the meaning of Section 62, Contract Act; that the obligation undertaken by the transferee was for, and intended to be for, the benefit of the creditor; and that the creditor is entitled to sue the transferee on the registered instrument. They relied upon Gregory and Parkar v. Williams, (1817) 3 Mer 582; Touche v. Metropolitan Ry. W. Co., (1871) 6 Ch 671; Gandy v. Gandy, (1884) 30 Ch D 57 and other English cases. Jenkins, C. J., remarked at p. 144:

We have here then a position in which it would be, in accordance with the principles of justice, equity and good conscience, the abiding rule in these Courts, that the plaintiff should be entitled to enforce this claim against defendant 5. If we were governed by Twaddle v. Atkinson (1861) 1 B and S 393. 393 (1) there might possibly be a difficulty in our way, but it has to be borne in mind that, Twaddle v. Atkinson (1861) 1 B and S 393. was a decision on a form of action peculiar to the Common Law Courts in England and that the case was influenced by the rule that no action in assumpsit could be maintained upon a promise unless consideration moved from the party to whom it was made. Here we have a definition of consideration which is wider than the requirement of the English law, Section 2(d), Contract Act. And it has beep laid down by Sir Barnes Peacock in a Full Bench decision of this Court in relation to the Courts in the mofussil, Rambux Chittangeo's case, (1867) BLR Sup Vol. 675 that in those Courts the rights of parties are to be determined according to the general principles of equity and justice without any distinction, as in England, between that partial justice which is administered in the Courts of law and the more full and complete justice for which it is frequently necessary to seek the assistance of a Court of equity. The rules and the fictions which have been in many cases adopted by the common law Courts in England for the purpose of obtaining jurisdiction in cases which would otherwise have been cognizable only by the Courts of equity, are not necessary to be followed in this country where the aim is to do complete justice in one suit. More than that we now have ample authority for saying that the administration of justice in these Courts is not to be in any way hampered by the doctrine laid down in Twaddle v. Atkinson (1861) 1 B and S 393 (1). That I take to be the result of the decision of the Privy Council in Khwaja Muhammad Khan v. Husaini Bagum (1910) 32 All 410. In the report of that case, in 14 C.W.N. 868 there is an interlocutory remark of Lord Macnaughten which indicates the limits imposed on a Court of Common law. He there says supposing she (that is the plaintiff) were an English woman, it is true she could not bring an action in the King's Bench Division buts could she not bring a suit in equity'?. The answer of the learned counsel was 'yes.' It is possible that this distinction can be explained by the history of the action of assumpsit which was a development of the writ of trespass. In the old writ in indebtitatus assumpsit it was alleged that the defendant 'not regarding his said promise and undertaking but contriving and fraudulently intending craftily and subtly to deceive and defraud' had not paid and so forth. The breach of contract was charged as deceit and it was only the person deceived who could sue. The bar then in the way of an action by the person not a direct party to the contract, was probably one of procedure and not of substance. In India we are free from these trammels and are guided in matters of procedure by the rule of justice, equity and good conscience. The case with which we are now

dealing finds a close parallel in Gregory and Parkar v. Williams, (1817) 3 Mer 582 and also in the more recent cases of Touche v. Metropolitan Ry. W. Co., (1871) 6 Ch 671 and Gandy v. Gandy, (1884) 30 Ch D 57. There is a valuable exposition of the law by Lord Hatherley In the first of these last two cases which was adopted by Cotton, L. J in the second. The Lord Chancellor said, 'The case comes within the authority that where a sum is payable by A.R. for the benefit of C.D. C.D, can claim under the, contract as if it had been made with himself.' That appears to me to be a principle which is of distinct use in the consideration of this case. It appears to me that we have therefore in the circumstances of this case, a condition of affairs in which it would be right to hold that the plaintiff is entitled to enforce his claim in this suit.

31. This case was followed in Dwarika Nath v. Priyanath, 1918 Cal 941, and other cases. It is true that there are other cases both in the Calcutta High Court and in other Courts in India in which a contrary view has been taken, such for example, as Subbu Chetti v. Arunachalam Chettiar, 1930 Mad 382, a Pull Bench decision in which all the cases were discussed: Jiban Krishna v. Nirupama Gupta, 1926 Cal 1009; Krishna Lal Sadhu v. Pramila Bala Dasi, 1928 Cal 518 and Jagadamba Debya v. Bibhuti Bhusan, 1933 Cal 407. These cases seem to be in conflict with Debnarayan's case (supra) which I propose to follow. If that case can be explained, and it is felt desirable to explain it, by pretending that there was something in it in the nature of a trust or agency, then, in my opinion, in the present case the facts constituted a trust or agency just as much as in that case, or in the English cases to which I have referred. However, I prefer to base my decision, on a frank recognition that these are fictions and that in India no necessity arises for resorting to them.

32. In the present case all the parties were before the Courts below and are before us, and neither common sense nor convenience, nor equity nor good concience require me to force the parties into further and unnecessary litigation. In my opinion, the plaintiff is entitled to enforce the contract in suit. Therefore, the appeal is allowed with costs here and below and the judgment of the District Judge of Bankura modified. There will be a decree in favour of the plaintiff for his claim and costs against defendants 8 to 17, and against defendants 1 to 6 for any balance which may remain outstanding after executing the decree against defendants 8 to 17. Defendants 8 to 17 will in addition pay the costs of defendants 1 to 6 and defendant 7.

M.C. Ghose, J.

33. (After stating facts, the judgment proceeds.) In this case there were two contracts. The first contract was between the plaintiff's predecessor and Dutts defendants whereby Dutts agreed to pay plaintiff Rs. 220 a year as rent of the tenure. The second contract was between Dutts and Pandas whereby Pandas

agreed to pay Rs. 520 a year as rent of the sub-tenure; they further agreed with Dutts to pay the sum in two lots, viz. Rs. 300 to Dutts and Rs. 220 to plaintiff. I do not see how the contract between Dutts and Pandas can have the effect of releasing Dutts from the effect of the former contract between the landlord and Dutts. In my opinion, Dutts are bound to pay the rent, Rs. 220 a year, to the plaintiff; they cannot escape the liability by reason of their contract with Pandas that Pandas would pay the amount for them. This appears clear from the terms of the contract between Dutts and Pandas. In para. 6 of Panda's kabuliat it was stated:

If on account of my neglect in paying the rents the Raja institutes a suit against you I shall pay you the litigation expenses. If any harm is done to your mourashi interest on account of the said rent, I or my heirs and successors shall make good the loss or damage that may result therefrom to you or your heirs and successors.

34. It is clear from the terms of the kabuliat that Dutts reserved the rights to demand and obtain from Pandas the whole of the rent, Rs. 520. If Pandas failed to pay the rent to the superior landlord and produce the rent receipt to Dutts within the time Dutts were entitled to sue Pandas for the same, in my opinion the decree made against Dutts must stand. The next question is whether the decree should also be made against Pandas. My learned brother has discussed all the leading cases. I agree to the proposition of law that though ordinarily only a person who is a party to the contract can sue on it, where a contract is made for the benefit of a third person, there may be an equity in the third person to sue upon the contract. The question is whether the contract between Dutts and Pandas was a contract made for the benefit of the plaintiff. It is clear that the contract was made primarily for the benefit of Dutts. They wanted to enjoy an income of Rs. 300 a year without doing any work for it, without either collecting the rent from the raiyats or paying the rent due to the superior landlord. It is urged that the contract was also for the benefit of plaintiff. On the other side it is urged that the benefit to the plaintiff, if any, was very slight ; rent is the first charge upon the tenure ; if Dutts do not pay the rent the plaintiff may get a rent decree against them and put up the tenure to sale free of incumbrances, but against Pandas the plaintiff can only have a money decree.

35. My learned brother holds that the plaintiff benefited by the contract between Dutts and Pandas and he is entitled on the strength of it to get a decree against Pandas. I was inclined to hold that the plaintiff should be given a decree against Dutts alone, and Dutts should be left to sue Pandas in a separate rent suit. It was urged that it was now too late for Dutts to sue Pandas, the claim for the period being barred by limitation. In these particular circumstances I accept my learned brother's view that a decree may be made both against Dutts and Pandas in the form proposed by him.

# সংযোজনী-৩

১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের একটি দেওয়ানী মামলায় দেখা যাচ্ছে পীতাম্বর লায়েককে ঘাটোয়ালী দায়িত্ব ও ভূমির অধিকার থেকে উচ্ছেদ করে কালেক্টর মতিলাল লায়েককে নিয়োগ করেছেন। এর বিরুদ্ধে মামলাকারীর বক্তব্য ছিল উপরোক্ত জমিতে পূর্বপুরুষ শোভারামকে মৌরসীপঞ্চকি পাট্টা দিয়ে তাদের স্থায়ী ও বংশ পরম্পরায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন খাতড়া-রাজ স্বয়ং এবং অবিচ্ছিন্নভাবে ঘাটোয়ালী দায়িত্ব পালন করে নিয়মিত প্রথমে রাজা ও পরে ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে পঞ্চকি দিয়ে আসছেন। অবশ্য মুন্সিফ কোর্ট, পরবর্তীকালে জেলা কোর্ট ঘাটোয়ালী স্বত্ত্বকে স্থায়ী ও বংশগত অধিকার বলে মান্যতা দেয়নি। পীতাম্বরের কাজে অবহেলার দায়ে ও জরিমানা না দেওয়ার অভিযোগে বরখাস্তের রায় বহাল থাকে। ১৮৯৩ সালে ঘাটোয়ালী অধিগ্রহণ ও পুনর্বন্টনের সুবিধাও এই মামলায় প্রমাণাভাবে দেওয়া হয়নি। হাইকোর্টের আপিল মামলায় রায় হয় ১২ মে ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে। বিচারক ছিলেন জে গ্রাহাম ও সুরবর্দী। নিম্ন আদালতের রায়ই বহাল থাকে। এই রায় থেকে সমকালীন ঘাটোয়ালী ব্যবস্থার কিছু খন্ডচিত্র উঠে আসে। রায়ের তর্জমা হুবহু দেওয়া হল।

Pitambar Laik vs Mati Lal Laik And Ors. on 12 May, 1931

Equivalent citations : AIR 1932 Cal 77

Author : Graham

JUDGMENT Graham, J.

1. This appeal by the plaintiff arises out of a suit for ejectment of the principal defendants, now respondents, from certain lands on declaration of the plaintiff's title thereto. There was also a prayer for mesne profits in respect of the years 1327 to 1329 B. S.
2. Plaintiff's case was that the lands in suit belong to him in mourasi panchaki and ghatwali right by virtue of a grant made to his remote

ancestor Sobharam Laik by the Raja of Khatra, that thereafter his predecessors were in possession of the said lands in such right long before the time of the Bast Indian Company, their interest being a permanent heritable interest; that sub-leases of the land were granted, and that eventually the lands came into the possession of the plaintiff. After the acquisition of Bengal by the British the ghatwaili right vested in the Government, and since then the plaintiff's ancestors and plaintiff himself had been paying panchaki rent to the zamindar, and had been performing ghatwali duties under orders of the Government as directed by the zamindar. Plaintiff averred that the Secretary of State for India in Council (defendant 15 in the suit and now respondent 24) had no right to deprive him of the lands by dispensing with his services. The plaint contained other allegations as to the circumstances in which the plaintiff came to be dismissed, and affirmed that the Magistrate had no right or jurisdiction to dismiss him from the post of ghatwali and to appoint defendant 1 in his place.

3. Defendants 1 and 15 filed separate written statements and contested the suit, They contend inter alia that the plaintiff and his predecessors, who were ghatwals of Ghat Lohat, held the lands in suit in lieu of remuneration for service as ghatwals, that they had no panchaki right or interest of any kind apart from the ghatwali, that the tenures in question are neither permanent nor hereditary in the sense claimed by the plaintiff, that no ghatwal was entitled to succeed by inheritance unless approved and appointed by the Magistrate, that ghatwals possessed the lands by virtue of their appointment, that the payment of panchaki or quit rent is a common incident of some of the ghatwaii tenures in Bankura District, that the District Magistrate of Bankura had power to appoint and dismiss ghatwals, that he dismissed the plaintiff for neglect of duty upon failure to pay a fine imposed upon him for such neglect and that the said order was in due course confirmed by the Commissioner of the Division and the Local Government' that such dismissal carried with it forfeiture of the service tenure, that since then plaintiff had ceased to have any right or interest in the land, that defendant 1 was appointed ghatwal in his place and that the civil Court had no jurisdiction to interfere or to make any declaration.

4. A number of issues were framed the two most important ones being the 7th and 8th which were as follows :

(7) Had the plaintiff or his predecessors or ancestors, apart from the ghatwali any panchaki or hereditary right in the lands in suit as alleged in the plaint ?

(8) Were the orders of the Magistrate dismissing the plaintiff and appointing defendant 1 as ghatwali without jurisdiction, illegal, ultra vires and void ?

5. The trial Court found on a consideration of the evidence and the authorities that there was no evidence, oral or documentary, to show that the tenure was so ancient as alleged in the plaint, that the tenure was for ghatwali service, that there was no evidence to establish the existence of the tenure apart from that service, that the heir of a member of the ghatwal's family was invariably appointed by the Magistrate and did not succeed simply by right of inheritance, that the civil Court had no jurisdiction to interfere with the orders of the Magistrate in these matters, and that the plaintiff was properly dismissed.

6. On these findings the suit was dismissed. The plaintiff then appealed to the District Judge, who in a somewhat brief judgment confirmed the decision of the Subordinate Judge holding that the evidence left no room for doubt that the tenure was a ghatwali tenure for ghatwaili service, that the dismissal of the plaintiff involved forfeiture of the tenure and that his attempt to prove that he and his predecessors had a panchaki or hereditary right in the lands had failed. The appeal was accordingly dismissed, as also a cross-appeal filed by the respondents.

7. The plaintiff thereupon preferred this second appeal.

8. The first point taken on behalf of the appellant is that the judgment of the Court of appeal below is not in accordance with law and is not in compliance with Order 41, Rule 31, Civil P.C. There can be no doubt that the judgment does furnish some ground for this criticizm, and at one stage of the argument I was inclined to hold that it might be necessary to remand the appeal for rehearing. On farther consideration however I have come to the conclusion that the nature of the ease and the particular facts and circumstances proved furnish a sufficient explanation why the judgment, which is a judgment of affirmance, has not dealt with the evidence in greater detail, nor do I think that any useful purpose would he served by ordering a remand for the reason that there do not appear to be any matters for further investigation. The facts admitted and proved and the authorities bearing upon the case are so clear that it would be a mere waste of time as well as an unnecessary expense to the parties concerned if we directed a rehearing of the appeal.

9. Mr. Bose on behalf of the appellant laid stress upon the number and variety of ghatwali tenures and made it a grievance that the Courts below, instead of dealing with the evidence with the object of determining what the particular variety of ghatwali tenure is in this case, have based their decisions upon the authorities, and those authorities, he argued, have no application because in those cases the facts were different. No doubt it is true that there are many different kinds of ghatwali tenures, but it may be observed that the case set up in the plaint was that there had been an ancient grant of a mourasi panchaki right by the Raja of Khatra in favour of the plaintiff's ancestor Sobharam, that it was a permanent heritable right and had been enjoyed as such by the plaintiff and his ancestors. That case was dealt with by the Subordinate Judge at considerable length and his finding was that there was no evidence, oral or documentary, to support it. That finding has been confirmed by the District Judge. Mr. Bose conceded, as I understood, that the plaintiff had failed to substantiate that part of his case. He presented the plaintiff's case however in a somewhat different form, his submission being that while the plaintiff up to the year 1893 was performing ghatwali duties, from 1894 an amicable settlement was come to and it was decided that all ghatwali lands were to be resumed, these lands being then resettled with the ghatwals who were found to be in possession. From that date the ghatwals were absolved from service and kabuliyats were taken from them by the zamindar with the consent of Government. In short the suggestion is that as a result of the emancipation from service the character of the tenure was changed (vide also ground 13 of the grounds of appeal) and that the plaintiff acquired a zamindari mourasi panchaki right apart from and independent of the performance of the ghatwali services. There is a good deal of vagueness as to the precise date when this change in the nature of the tenure took place, and when I asked Mr. Bose when this title accrued to the plaintiff he replied that he was unable to give any definife date. There is a similar vagueness as to the events which brought about this change in the character of the tenure. Mr. Bose referred to oral evidence to the effect that a notice was issued by the Magistrate absolving the ghatwals from further service. Such evidence obviously cannot be regarded as a proper foundation for a declaration of title.

10. The important point however in connexion with this argument is that the case, which it is now sought to make, was not the case with which the plaintiff came to Court, and finds no place in his plaint. No issue was framed upon the point for the very good reason that no

such case had been set up. If such a case was relied upon it was obviously incumbent upon the plaintiff to specifically plead it, and to give the necessary particulars so that an issue might be framed, and the defendants might have an opportunity of meeting it. In this view of the matter the appellant cannot be deemed to have any grievance because the Courts below did not deal with the evidence in relation to a case which was not before them. The case as now presented is, as I have said, a new case and cannot be allowed to be made for the first time in second appeal. On the admitted facts and findings arrived at in the Courts below it is plain that the appellant has no case. The learned District Judge has found that the tenure is a ghatwali tenure, and has observed further that the arguments before him on both sides were upon that footing. The plaintiff moreover did not attempt to dispute the fact in his evidence, and Mr. Bose has admitted before us that the tenure is a ghatwali tenure. When that is established, there can be no room for doubt that the Magistrate had jurisdiction and power to dismiss the plaintiff. It is clear from the plaintiff's own admissions that he recognized the Magistrate's authority, and incidentally it may be observed that the plaintiff's conduct after his dismissal and the anxiety he betrayed to get the order of dismissal set aside by appealing to higher authorities is hardly consistent with the case which he now seeks to establish of a zamindari tenure wholly independent of the ghatwali. As I have said there can be no doubt about the power of the Magistrate to dismiss a ghatwal for reasonable cause. It has been held by the Judicial Committee of the Privy Council in Satya Narain Singh v. Satya Niranjan Chakravarti A.I.R. 1924 P.C. 5 that in construing grants of this description it should be presumed, in the absence of evidence to the contrary, that the officers of Government were acting within their authority. There is nothing here to rebut that presumption. On the other hand the admitted conduct of the plaintiff goes to show that he recognized the authority of the Magistrate. The question which then arises is as to the effect of dismissal. As to that it was held by this Court in the case of the Secretary of State v. Poran Singh [1878] 5 Cal. 740 that the dismissal of a ghatwal carries with it the forfeiture of his tenure. That case, which also related to a ghatwali tenure of the Bankura District, was very similar to the present case; see also Hemendra Nath Roy v. Upendra Narain Boy [1915] 43 Cal. 743. On behalf of the appellant, on the other hand, reliance has been placed on the case of Jogendra Nath Singh v. Kali Charan Roy [1905] 9 C.W.N. 663 but the decision there was based on an entirely different set of facts. Incidentally moreover it was held in that case that where a ghatwal has been

rightly dismissed for misconduct such dismissal involves as a [necessary consequence the forfeiture of his tenure. The fact that the plaintiff was dismissed has not been disputed. Indeed he took every possible, step as previously stated, to get the order set aside. That order must be treated as final and certainly cannot be questioned in the civil Court.

11. For the reasons given I am of opinion that the suit was rightly dismissed. The appeal therefore fails and mu8t be dismissed with coats.

12. In that case of the Secretary of State v. Poran Singh [1878] 5 Cal. 740, referred to above, Jackson and Tottenham, JJ., whilst allowing the appeal and dismissing the suit, concluded by making a recommendation in favour of the plaintiff for the consideration of Government. They made the following observations:

    On the whole we entertain no doubt that the plaintiff has no right to be reinstated in the ghatwali land unless the executive authorities will condone his conduct and restore him to his situation. We think that, under all the circumstances, looking to the long continuance of the ghatwaliship in the plaintiff's family, to the increase of duty, and the more disagreeable nature of that duty lately required of the ghat wals, and to the punishment the plaintiff has undergone, it would be consistent with the dignity and character of the Government to reinstate him on the occurrence of an opportunity or to allow some member of his family to be appointed in his place. But this is wholly a matter for the consideration of Government.

13. There may have been circumstances in that case which are not present in this case. But they have this much in common: that the ghatwaliship appears to have continued for a long time in the plaintiff's family. Although the plaintiff has to some extent forfeited sympathy by setting up a right which he has failed to substantiate, we nevertheless think (?) that the matter might be considered by Government, in the event of any opportunity arising for re-appointment of the plaintiff. This however is of course, entirely a matter for the consideration of Government and we merely offer the suggestion for its consideration should the opportunity occur.

**Suhrawardy, J.**

14. I agree.

**তথ্য সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :**


অচিন্ত্য জানা, আদিবাসী সাঁওতাল (বাকুড়া-১৯৯৭)

অচিন্ত্য জানা, বাঁকুড়ার অর্থনীতিতে লোকশিল্প (বাঁকুড়া-১৯৯৯)

অচিন্ত্য জানা, লোকায়ত সংস্কৃতি (বাঁকুড়া-১৯৯৩)

অচিন্ত্য রায়, কৃষি ও সংস্কৃতি (বাঁকুড়া, ২০০৫)

অচিন্ত্য রায়, কৃষি ও সংস্কৃতি, বাঁকুড়া, ২০০৫, কয়াল(সঃ) রূপরামের কাব্য (কলিকাতা-২০১১)

অজয় কুমার ঘোষ, বাঁকুড়া ভাবনা (বর্ধমান ২০২২)

অভয়পদ মল্লিক, হিস্ট্রি অব বিষ্ণুপুর রাজ (ক্যালকাটা-১৯২১)

অমলেন্দু মিত্র, রাঢ়ের সংস্কতি ধর্মঠাকুর (কলিকাতা-২০০০)

অমরেন্দ্রনাথ রায়, বাংলার পূজাপার্বণ (কলকাতা-১৯৫০)

অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স (ক্যালকাটা-১৯৬৮)

অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাকুড়া জেলার পুরাকীর্তি (কলিকাতা-১৯৭১)

অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়ার মন্দির (কলিকাতা-১৯৭১)

অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় (সঃ), দ্বিজ কবিচন্দ্রের কপিলামঙ্গল (বিষ্ণুপুর-২০১৬)

অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় (সঃ), শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বাঁকুড়া লক্ষ্মী (বিষ্ণুপুর-২০১৬)

অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়, বাঁকুড়ার গুরুত্বপূর্ণ জনপদঃছাতনা (বাঁকুড়া, ২০০৯)

অশোক মিত্র, পশ্চিম বঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা (দিল্লী-১৯৭৪)

আনন্দ ভট্টাচার্য, সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ (কলিকাতা-২০১০)

আব্দুস সালাম (অঃ), রিয়াস-উস-সালাতিন (ঢাকা-১৯৬৩)

আর বিদ্যারত্ন (সঃ), নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস (মুর্শিদাবাদ-১৮৯১)

আর বিদ্যারত্ন (সঃ), যদুনন্দন দাসের কর্ণানন্দ (মুর্শিদাবাদ, ২য় মুদ্রণ-১৩৫৫ বঙ্গাব্দ)

আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (কলিকাতা-১৯৫৮)

ই সি ডিমক, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত (হাভার্ড বি বি প্রেস-১৯৯৯)

ই সি ডিমক-পি সি গুপ্ত, গঙ্গারামের মহারাষ্ট্রপুরাণ (হনলুলু-১৯৬৫)

উমাপদ রায় ও অন্যান্য (সঃ), সংকলনে শুভঙ্কর (বাকুড়া-রামপুর ২০০৮)

এইচ কুপল্যান্ড, মানভূম ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স (ক্যালকাটা-১৯১১)
এইচ জ্যাকোবি (অঃ), আচারঙ্গ সূত্র (অক্সফোর্ড)
এন আর পট্টানায়েক, ল্যান্ড এ্যান্ড এগ্রিকালচার ইন মিডিয়াভ্যাল ওড়িষা (১৯৯৭)
এফ এইচ বি স্ত্রাইন, মেমোর‍্যান্ডাম অন দ্যা মেটেরিয়াল কন্ডিশন অব দ্যা লোয়ার অর্ডারস অব বেঙ্গল ডিউরিং দ্যা টেন ইয়ারস ফ্রম ১৮৮১-১৮৯২ (ক্যালকাটা-১৮৯২)
এফ ডব্লু্য রববার্টসন, ফাইনাল রিপোর্ট অন দ্যা সার্ভে এ্যান্ড সেটেলমেন্ট অপারেশন ইন দ্যা ডিষ্ট্রিক্ট অব বাঁকুড়া ১৯১৭-১৯২৪ (ক্যালকাটা-১৯২৬)
এ্যাবে রাইনল ফিলোজফিক্যাল এ্যান্ড পলিটিক্যাল হিষ্ট্রি অব দ্যা সেটেলমেন্ট এ্যান্ড ট্রেড অব দ্যা ইউরোপিয়ান ইন দ্যা ইষ্ট এ্যান্ড ওয়েষ্ট ইন্ডিজ (জাস্টামন্ড কৃ অনুবাদ, লন্ডন-১৭৭৭)
এম সি ম্যাকালপিন, রিপোর্ট অন দ্যা কন্ডিশন অব দ্যা সাঁওতাল ইন দ্যা জুরিডিকসন অব ডিষ্ট্রিক্টস অব বীরভূম, বাঁকুড়া, মিডনাপুর এ্যান্ড নর্থ বালাসোর (ক্যালকাটা-১৯০৯)
এল পি সাইরেস, মেমোর‍্যা ন্ডাম অন দ্যা মেটেরিয়াল কন্ডিশন অব দ্যা পিপল অব বেঙ্গল ইন ইয়ারস ফ্রম ১৮৯২-৯৩ টু ১৯০১-০২ (ক্যালকাটা-১৯০২)
এল এস এস ও'ম্যালী, বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স (ক্যালকাটা-১৯০৮)
এল এস এস ও'ম্যালী, বীরভূম ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স (কলিকাতা-১৯১০)
এল এস এস ও'ম্যালী, মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স (কলিকাতা-১৯১১)
কালীকান্ত রায়, বাঁকুড়া জিলা —ভূগোল ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ (বাঁকুড়া-১৯৩৬)
কালীকিঙ্কর দত্ত, আলিবর্দি এ্যান্ড হিস টাইমস (ক্যালকাটা, ১৯৩৯)
কোতলপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতি, লক্ষ্মীকান্ত পাল (মহিষাদল, ২০০৮)
কৃষ্ণদাস গোস্বামী, শ্রীশ্রী শ্যামলীলাতত্ত্ব (বাঁকুড়া, ১৯৮৪)
কৃষ্ণপ্রসাদ সেন ও যোগেশচন্দ্র রায় চন্ডীদাস চরিত (কলিকাতা-১৩৪৪ বঙ্গাব্দ)
গঙ্গাগোবিন্দ রায়, মল্লভূম কাহিনী (বিষ্ণুপুর-১৯৫৪)
গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী (সঃ), প্রসঙ্গ বাঁকুড়া (বাঁকুড়া-১৯৯৯)
গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী (সঃ), বিষয় বাঁকুড়া (বাঁকুড়া-২০০০)
গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী (সঃ), বাঁকুড়ার খেয়ালী (বাঁকুড়া-২০০৩-১৬)
গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা (কলিকাতা-১৯৬৪, সংস্করণ ২০০৮)
গৌতম দে (সঃ) পশ্চিম রাঢ় গবেষণা সাময়িকী (বাঁকুড়া-২০০৩)
গৌতম ভদ্র ও পার্থ চ্যাটার্জী, নিম্নবর্গের ইতিহাস (কলিকাতা-১৯৯৮)
গৌরগোবিন্দ গোস্বামী, শ্রী শ্রী শ্যামলীলামৃত (বাঁকুড়া, ১৯২৭)
গৌরপদ সেন, মল্লভূমি জীবন প্রভাত ও প্রভাত সন্ধ্যা (বর্ধমান-২০১১)
গৌরপদ চ্যাটার্জী, হিষ্ট্রী অব বগরীরাজ্য (দিল্লী-১৯৭৬)
চন্দনকুমার ভট্টাচার্য, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সংকলন (বাঁকুড়া, ২০২২)

চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত,  বিষ্ণুপুর মন্দির টেরাকোটা (কলিকাতা-১৯৮০)
চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের মূর্তিশিল্প ও সংস্কৃতি, বিষ্ণুপুর, ২০১৬।
জলধর হালদার(সঃ), প্রত্নপরিক্রমা (প্রথম-অষ্টম খন্ড, বিষ্ণুপুর-২০০৮-২৩)
জয়কৃষ্ণ দাস, মদনমোহন বন্দনা (বিষ্ণুপুর-১৮৬১ সালের পান্ডুলিপি)
জন আর ম্যাকলেন, ল্যান্ড এ্যান্ড লোকাল কিংশিপ ইন এইট্টিন সেঞ্চুরি বেঙ্গল (অক্সফোর্ড-১৯৯৩)
জে ই গ্যাসট্রেল, জিওগ্রাফিক্যাল এ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকাল স্কেচ অব বাঁকুড়া (ক্যালকাটা-১৮৭৮)
জে এন সমাদ্দার, বর্গী ইনভেসন ইন বেঙ্গল (ক্যালকাটা-১৯২৫)
জে জেড হলওয়েল, ইন্টারেস্টিং হিষ্টোরিক্যাল ইভেন্ট রিলেটিভ টু দ্যা প্রভিন্স অব হিন্দুস্থান (লন্ডন-১৭৬৫)
জে ডি বেগলার, রিপোর্ট অব এ টুর থ্রু দ্যা বেঙ্গল প্রভিন্স(ক্যালকাটা-১৮৭৮)
জে সি ঝা, ভূমিজ রিভল্ট-১৮৩২-৩৩ (দিল্লী-১৯৬৭)
জে প্যাটারসন, বর্ধমান ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স (ক্যালকাটা-১৯০৫)
জেমস গ্রান্ট, এ্যানালিসিস অব দ্যা ফিনানসেস অব বেঙ্গল (লন্ডন-১৭৮৬)
জেমস গ্রান্ট, দ্যা ফিফত রিপোর্ট (মাদ্রাজ-১৮৬৬)
জেমস রেনেল, ডেসক্রিপশন অব দ্যা রোডস ইন বেঙ্গল এ্যান্ড বেহার (লন্ডন-১৭৭৮)
জেমস রেনেল, মেমোয়ার অব ম্যাপ অব হিন্দুস্থান (লন্ডন-১৭৮৮)
জে লং, সিলেকশন ফ্রম দ্যা আনপাবলিশ রেকর্ডস অব গভর্নমেন্ট ফর দ্যা ইয়ার ১৭৪৮-১৮৬৭, পার্ট-১ (ক্যালকাটা- ১৮৬৯)
জে সি প্রাইস, দ্যা চুয়ার রেবেলিয়ান (ক্যালকাটা-১৮৭৪)
ডব্লু ডব্লু হান্টার, দ্যা এনালস অব রুরাল বেঙ্গল (ক্যালকাটা-১৮৬৮/১৮৭৫)
ডেভিড ম্যাকাচ্চন, লেট মেডিয়াভ্যাল টেমপেলস অব বেঙ্গল (জে এ এস।খন্ড-১৮, ১৯৬২)
তরুণদেব ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া (কলিকাতা-১৯৮২)
তারকেশ্বর চট্টরাজ, অভিন্ন চৈতন্যদেব ও শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর (কাটোয়া-২০১০)
তারাপদ সাঁতরা, বাঁকুড়া জেলার অর্থনীতি (বাঁকুড়া-১৯৮৯)
তারাপদ সাঁতরা,  মন্দির লিপিতে বাংলার সমাজচিত্র (কলিকাতা-১৯৮৩)
তারিণীদাস ব্যানার্জী, জমিনদার এ্যান্ড রয়তস অব বেঙ্গল (কলকাতা-১৮৮৩)
দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ ২য় খন্ড (কলিকাতা, ১৯৩৫)
দিল মহম্মদ,  বিষ্ণুপুরের কুরবান শাহবাবা (বিষ্ণুপুর-২০০৭)
দিলীপ কুমার গোস্বামী, সীমান্ত রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি (পুরুলিয়া-২০১৪)
দুখভঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাকুড়া জেলার তপশিলী জাতি উপজাতি (বাকুড়া-১৯৮৭)
দেবপ্রসাদ জানা(সঃ), অহল্যাভূমি পুরুলিয়া, পর্ব ১ (পুরুলিয়া, ২০০৩)

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, গণ আন্দোলনে সাঁওতাল সমাজ (কলিকাতা-১৯৯৭)
ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ (কলিকাতা-১৯৮৭)
ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, বঙ্গ সংস্কৃতিতে প্রাকবৈদিক প্রভাব ২য় সংস্করণ (কলিকাতা,২০০৬)
নমিতা মন্ডল, বাঁকুড়া কেন্দ্রীক মল্লভূমির উপভাষা (বাঁকুড়া-১৯৮৯)
নিতিশ সেনগুপ্ত, ল্যান্ড অব টু রিভারস (নিউ দিল্লী, ২০১১)
পার্থসারথী গোস্বামী, শ্রীশ্রী শ্যামলীলাভূমি ব্রজরাজপুর (দুর্গাপুর, ২০২০)
প্রভাসচন্দ্র দে, প্রাচীন বিষ্ণুপুর ও বর্গীর হাঙ্গামা (বাণী-৩য় বর্ষ, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ)
পি আচার্য, এ্য নোট অব দি ভূম কান্ট্রিজ অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কালচার, নং-২, ভল্যুম-১২ (অক্টোবর, ১৯৪৫)
প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈষ্ণবীয় প্রভাবে বাঁকুড়া সংস্কৃতি (বাঁকুড়া-১৯৯৭)
প্রদীপ কুমার সিং, রাঢ়ের পদাবলী (বিষ্ণুপুর- ১৩২২ বঙ্গাব্দ)
প্রদীপ কর, বাঁকুড়া জেলার জৈন ধর্ম, কলকাতা, ২০২২।
প্রভাত কুমার সাহা, সাম এ্যাসপেক্ট অব মল্ল রুল ইন বিষ্ণুপুর(ক্যালকাটা-১৯৭০)
প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়ার মন্দির মসজিদ গীর্জা (বাঁকুড়া-১৯৯৪)
ফকির নারায়ণ কর্মকার, বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী (কলিকাতা-১৯৭৯)
বসন্ত রঞ্জন রায়, চন্ডীদাস বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (কলিকাতা, ১৯২৬)
বামাকান্ত চক্রবর্তী, বৈষ্ণবইজম ইন বেঙ্গল (নিউ দিল্লী-১৯৮৫)
বি এস দাস, সিভিল রেবেলিয়ন ইন দ্যা ফ্রন্টিয়ার বেঙ্গল (ক্যালকাটা-১৯৭৩)
বিজয় পান্ডা, উৎকল ইতিহাস (কলিকাতা-২০০৪)
বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (কলিকাতা, ১৯৫০)
বি ফোলে, রিপোর্ট অন লেবার ইন বেঙ্গল (ক্যালকাটা, ১৯০৬)
বিমানবিহারী মজুমদার, যোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য (কলিকাতা-১৩৬৮ বঙ্গাব্দ)
বি রায়, বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুক (ক্যালকাটা, ১৯৬১)
বিহারীলাল দে, বঙ্গে বর্গী (কলিকাতা, পুনঃমুদ্রণ-২০১৫)
বিষ্ণুপুর পঞ্চায়েত সমিতি প্রকাশিত বিষ্ণুপুরঃ তথ্যগ্রন্থ (বিষ্ণুপুর-২০০৪)
মনোরঞ্জন চন্দ্র, মল্লভূম বিষ্ণুপুর (কলিকাতা-২০০৪)
মাণিকলাল সিংহ, পশ্চিমরাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি (কলিকাতা-১৯৭৮)
মাণিকলাল সিংহ, রাঢ়ের মন্ত্রযান (কলিকাতা-১৯৭৯)
মাণিকলাল সিংহ, সুবর্ণরেখা হইতে ময়ূরাক্ষী (কলিকাতা-১৯৭৯)
মাণিকলাল সিংহ, কাঁসাই সভ্যতা (কলিকাতা-১৯৫৪)
মাণিকলাল সিংহ, রাঢ়ের জাতি ও কৃতি (কলকাতা-১৯৮২-৮৩)
মিহির চৌধুরী কামিল্যা, রাঢ়ের পূর্ব পুরুষ পূজা (ক লিকাতা-১৯৯১)

মেঘদূত ভুঁই, রাঢ়ের আলোকে মোলবোনা (বাঁকুড়া -২০১৫)
যতীন্দ্রনাথ মিত্র, দ্যা রুইনস অব বিষ্ণুপুর (ক্যালকাটা-১৯৪০)
যদুনাথ সরকার, হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল (দিল্লী, ১৯৪৩)
যদুনাথ সর্বাধিকারী, তীর্থভ্রমণ (কলিকাতা-১৯১৫)
যামিনীমোহন ঘোষ, সন্ন্যাসী এ্যান্ড ফকির রেডারস ইন বেঙ্গল (ক্যালকাটা, ১৯৩০)
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (সঃ), কৃষ্ণ সেনের চন্ডীদাস চরিত (কলিকাতা, ১৯৩৭)
রতন কবিরাজ মদন মোহন বন্দনা (বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষৎ, পান্ডুলিপি-৩২৪)
রজতকান্ত রায়, পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ (কলিকাতা-১৯৯৪)
রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা (কলিকাতা-১৯৮১)
রমেশ চন্দ্র মজুমদার, জগমোহন দেশাবলী বিবৃতি (কলিকাতা-১৩৫৫ বঙ্গাব্দ)
রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়া জনের ইতিহাস সংস্কৃতি (বাঁকুড়া-২০০২)
রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়ার মুসলমান (বাঁকুড়া-২০১৪)
রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, অতীত বাঁকুড়ার আর্থচিত্র (বাঁকুড়া-২০১২)
রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়া সন্ধান (বাঁকুড়া-২০১৪)
রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, নয়া বাঁকুড়ার গোড়াপত্তন ও বিকাশ (বাঁকুড়া-২০১৪)
রণজিৎ গুহ, সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ (অক্সফোর্ড-১৯৮৩)
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শিল্প ও সংস্কৃতি —বাঁকুড়া (কলিকাতা-২০০৩)
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সঃ), প্রবাসী পত্রিকা (ষটত্রিংশ ভাগ, প্রথম খন্ড)
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সঃ), প্রবাসী পত্রিকায় (ষড়বিংশ ভাগঃ প্রথম খন্ড)
রামানুজ কর, বাঁকুড়া জেলার বিবরণ (কলিকাতা-১৯২৫)
রামামৃত সিংহ মহাপাত্র, মল্লভূমের দশাবতার তাস (কলকাতা, ২০২১)
রামামৃত সিংহ মহাপাত্র, শিলাবতী উপত্যকার লোকায়ত প্রত্নজীবন, কলকাতা, ২০২০।
রূপেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঁকুড়া : এ্যা স্টাডি অব ইটস আর্কিওলজিক্যাল সোর্সেস (কলকাতা, ২০১০)
রূপেন চট্টোপাধ্যায়, নীহার হাজরা, গৌরপদ সেন (সঃ) বাকুড়া পরিচয় ( বাকুড়া-২০১২)
লীলাময় মুখোপাধ্যায়, জেলার নাম বাঁকুড়া (বাকুড়া-১৯৮৩)
লীলাময় মুখোপাধ্যায়, প্রসঙ্গ বাঁকুড়া (বাঁকুড়া-১৯৭৮)
লীলাময় মুখোপাধ্যায়, বিষয় বাঁকুড়া (বাঁকুড়া-১৯৮৫)
লীলাময় মুখোপাধ্যায়, সুরতীর্থ বিষ্ণুপুরের পাঁচ সঙ্গীতগুণী (বিষ্ণুপুর, ২০০৭)
লোকনাথ ঘোষ, দ্যা মডার্ন হিষ্ট্রি অব ইন্ডিয়ান চিপস রাজাস জমিনদারস (ক্যালকাটা, ১৮৯৭)
শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, শানাবান্ধা গ্রামের ইতিবৃত্ত (বাঁকুড়া, ১৯৪০)
শশিভূষণ বিশ্বাস, 'মল্লভূমি' ঐতিহাসিক চিত্র (১ম বর্ষ প্রথম খন্ড ১৮৯৯)

শুভম মুখোপাধ্যায়, মল্লভূমির মন্দিরলেখ, ১ম খন্ড (কলিকাতা, ২০২২)
শৈলেন দাস (সঃ), বাঁকুড়ার ইতিহাস সংস্কৃতি (বাঁকুড়া-১৯৯৭)
সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরের পথে একটি জীবন (বাঁকুড়া,১৯৪৭)
সব্যসাচী মন্ডল (সঃ), রাঢ় বাংলার লোকসংস্কৃতি (কলকাতা, ২০১৮)
সুকুমার মুখোপাধ্যায় (সঃ), মনোভূমি বাঁকুড়া (বাঁকুড়া-২০০৭)
সুকুমার সিনহা ও হিমাদ্রি ব্যানার্জী, বাকুড়া ডিষ্ট্রিক লেটার ইস্যুডঃ ১৮০২-৬৯ (ক্যালকাটা-১৯৮৯)
সুকুমার সেন (সঃ), কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত (দিল্লী-১৯৬৩)
সুকুমার সেন (সঃ), মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল (দিল্লী-১৯৭৫)
সুদীপ্ত পোড়েল, অতীত বাঁকুড়ার সমাজ ও অর্থনীতি (কলিকাতা-২০১৬)
সুদীপ্ত পোড়েল (সঃ), আত্মপরিচয় ঃ বাঁকুড়া-১ (বাঁকুড়া-২০০৫)
সুদীপ্ত পোড়েল, বাঁকুড়ায় ব্রিটিশ শাসন (বাঁকুড়া-২০০২)
সুধীর পালিত, বাঁকুড়া জেলার ভূগোল ও ইতিবৃত্ত (বাঁকুড়া-১৯৩১)
সুনীল সেন, ভারতে কৃষি সম্পর্ক (অঃ ছায়া দাশগুপ্ত) (নয়া দিল্লী, ১৯৫৮)
হরচন্দ্র ঘোষ, এ্য টোপোগ্রাফিক্যাল এ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্যাল স্কেচ অব বাঁকুড়া (গৌতম চট্টোপাধ্যায়, এ্যয়কোনিং ইন বেঙ্গল ইন আর্লি নাইনটিন সেঞ্চুরি, কলকাতা-১৯৬৫)
হরশঙ্কর ভট্টাচার্য, জমিনদার ও পাটনিদার (বর্ধমান-১৯৮৫)
হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ছাতনার কথা (ছাতনা-১৪০৩ বঙ্গাব্দ)
হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, বাঁকুড়ার ইতিবৃত্ত( কলিকাতা-১৯৯৯)
হরিনাথ ঘোষ, লাল সিং পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের এক অধ্যায় (পুরুলিয়া-১৯১৩)
হরিসাধন দত্ত, বাঁকুড়া দর্পণ (মেদিনীপুর-১৯৯৮)
হিমাংশু দে, বাঁকুড়া শহরের ইতিবৃত্ত (বাকুড়া-১৯৯৯)
হিতেশরঞ্জন সান্যাল, সোসাল মবিলিটি ইন বেঙ্গল (ক্যালকাটা, ১৯৮১)
হেমচন্দ্র পালিত (সঃ), রতন কবিরাজের মদনমোহন বন্দনা (প্রবাসী-১৩৪১)
হেমচন্দ্র পালিত, শুভঙ্করী রাঢ় বঙ্গের গণিত পদাবলী (বর্ধমান-২০০১)

**অন্যান্য লিখিত সূত্র :**

১) কল্পনা সিংদেও বিরচিত ছাতনার রাজ কাহিনীতে দেবী বাসুলী গ্রন্থ
২) মোলবোনার শিবমন্দিরে রক্ষিত ধর্ম পুস্তক ‘দিক ডাক ও দেব ডাক’
৩) রাজবাড়ীতে সংরক্ষিত হাত খাতা
৪) পদ্মলোচন শর্মা, বাসুলী মহাত্ম্য
৫) মোলবোনার শিবমন্দিরে রক্ষিত ধর্ম পুস্তক ‘দিক ডাক ও দেব ডাক’

৬) সিমলাপালের রাজা নটবর সিংহের ডায়েরী
৭) প্রত্নপরিক্রমা পত্রিকাসমূহ, জলধর হালদার (স.)
৮) বাঁকুড়ার খেয়ালী পত্রিকাসমূহ, গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী (স.)
৯) কৌলাল পত্রিকাসমূহ। স্বপনকুমার ঠাকুর (স.)।
১০) পশ্চিমরাঢ় গবেষণা সাময়িকী পত্রিকাসমূহ, গৌতম দে (স.)

**ব্যক্তিঋণ :**

১) ছাতনা রাজ পরিবারের প্রদীপ কুমার সিংদেও।
২) মালিয়াড়া রাজ পরিবারের হিমাদ্রিনারায়ণ চন্দ্রাধ্বর্য্যু।
৩) মল্লরাজ পরিবারের  সলিল সিংহ ঠাকুর। পার্থসারথী সিংহদেব, বিষ্ণুপুর।
৪) রাইপুর রাজপরিবারের মধুসূদন সিংহ ঠাকুর, পৌলমী সিংহ ঠাকুর।
৫) শ্যামসুন্দরপুর রাজপরিবারের পশুপতি নারায়ণদেও।
৬) রসপাল রাজ পরিবারের সুশান্তনারায়ণ দেও।
৭) সিমলাপাল রাজপরিবারের চিরঞ্জীব সিংহচৌধুরী।
৮ ) অম্বিকানগর রাজপরিবারের গৌরীশঙ্কর নারায়ণ দেও।
৯) খাতড়া রাজবাড়ীর সূর্যকান্ত ধবলদেব।
১০) ভেলাইডিহা রাজপরিবারের রজতকান্ত সিংহচৌধুরী।
১১) জলধর হালদার, বিষ্ণুপুর।
১২) হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়, ছাতনা।
১৩) অজয় কুমার ঘোষ, বর্ধমান।
১৪) সৌমিত্র শঙ্কর সেনগুপ্ত, কলকাতা।
১৫) গৌতম দে, বাঁকুড়া।
১৬) অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, বাঁকুড়া।
১৭) গিরীন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, বাঁকুড়া।
১৮) শুভম মুখোপাধ্যায়, বড়জোড়া।
১৯) দীপঙ্কর দাস, প্রাক্তন রাইপুর ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক।
২০) শুভদীপ পালিত, প্রাক্তন রানীবাঁধ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক।
২১) ধীরাজ মণ্ডল, হদলনারায়ণপুর জমিদার পরিবার।
২২) উদয় পাল, সোমসার জমিদার পরিবার।
২৩) বাসুদেব বন্দোপাধ্যায়, অযোধ্যা জমিদার পরিবার।
২৪) লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল, কোতলপুর।

২৫) ধ্রুবপদ সাণ্ডিল্য, প্রাক্তন জয়পুর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক।
২৬) প্রবীর সিংহদেব, জামকুড়ি রাজপরিবার।
২৭) শুভম মুখোপাধ্যায়, বড়জোড়া।
২৮) সাধন দে, সোনামুখী।
২৯) সন্দীপ ভদ্র, বিভাস দে, কোতলপুর।
৩০) সুজিত ও অদ্বৈত রায়, হাড়মাসড়া রায় পরিবার।
৩১) ভগীরথ ধবলদেব, দ্বাদশবাটি গ্রামের ধবল বংশের।

# শব্দসূত্র

## স্বরবর্ণ


অম্বিকা ৩২০ ৪১১ ৪১২ ৪৩০ ৪৩৬ ৪৬৮
অম্বিকানগর ১৪৮ ২৮৮ ৩০৪ ৩৪৭ ৩৫৫ ৪১১ ৪২২ ৪২৪ ৪২৭ ৪৩০ ৪৩৬ ৪৬৮
অযোধ্যা২৫৪ ২৯৪ ৩০৪ ৩০৮-৯ ৩১০ ৩১২ ৩৪৬ ৩৪৮ ৩৫৪ ৩৬৬ ৩৭১ ৩৮৪ ৪০৬ ৪১১ ৪১৫ ৪১৯ ৪২৩ ৪৩৯-৪০ ৪৪৬-৪৭ ৪৫৫ ৪৬০ ৪৬৯
আনন্দপুর ৮০
আফগান ২৬২ ৪৭১
আয়ুর্বেদ/ওষধি ২৫৮ ৩৫৮
ইন্দাস ২৬৫ ২৮৪ ২৮৯-৯০ ৩০১ ৩৪৪ ৩৫৩ ৩৬০ ৩৬৩ ৩৮৮ ৩৯৪ ৪০৬ ৪০৯ ৪১৫ ৪৩৯ ৪৪৭-৪৯ ৪৭২
ইন্দপরব ২৫৮ ২৭৫
ইংরেজ ২৫৪ ২৫৫ ২৬২ ২৬৫ ২৭১ ২৯৩ ৪২৪ ৪৭১
উত্তরহামির১৭৫ ১৭৮
ও'ম্যালী ১৫৭ ৩১০ ৩৮৫ ৪২৬ ৪২৮
ওড়িয়া/ উড়িষ্যা ২৯ ১০৪ ১১৩ ২৩৫ ২৪৫


## ক খ গ ঘ ঙ


করমপরব ৪১৫
কামার/কর্মকার ২৯২ ৩১৪ ৩৪১ ৩৫৫ ৩৬৯ ৪৩৪ ৪৬৭ ৪৬৯
কায়স্থ ১০৪ ১১৮ ২১৮
কালাচাঁদ ৩১৬ ৩৯২ ৪০৮ ৪০৯ ৪৬১
কালাপাহাড় ২৬২
কিটিং ২৬০ ২৬২ ২৬৪ ২৬৭ ২৭২ ২৭৩
কুচিয়াকোল২৫১ ২৮৪-৯০ ২৯২-৯৩ ২৯৫ ৩০৪ ৩০৮ ৩২১ ৪০৯ ৪২১ ৪৪৩ ৪৪৬ ৪৫৬-৫৭ ৪৫৮
কুবেরপেতে ১১২
কুরবানশাহ ৪০৪ ৪৬৫ ৪৬৬
কুলদেবতা ২৫৫ ২৭৫ ২৯০ ২৯৪ ২৯৮-৯৯ ৩১২ ৩২২ ৩৩৪-৩৫ ৩৭৫ ৩৭৮ ৪৪৫ ৪৪৭ ৪৫৮-৬১
কোতলপুর ২৬২ ২৬৫ ৩৫৪ ৩৮১ ৪০৯ ৪১৪ ৪১৫ ৪৪৬ ৪৬৪ ৪৬৭
কোতলখাঁ ৪০৩
কোর্ফা ৪৩৩
কৈবর্ত ৩৬৮ ৪৩৯ ৪৪৭
কৃষাণ ৪২৯
খঞ্জবিবেক ২৪ ১৭৭ ১৭৯-১ ১৮৫
খাতড়া ৬ ৭ ১০ ১১ ১৮ ১৯ ২৬ ২৮ ৩৮ ৪৬ ৬৮ ৭১ ৭৯ ৯৭ ১০৫ ১২৭ ১৩৫ ১৪০-২ ১৪৪ ১৪৬-৭ ১৫৫ ১৫৭ ১৫৮-৬৬
গঙ্গানারায়ণ ৮১ ১৫১ ১৮৩ ১৮৭
গাজন ৩০৫ ৩৩২ ৩৫৩ ৩৬০ ৩৬৪ ৪০৮-৯ ৪১২-১৪ ৪৬১ ৪৬৫ ৪৬৭-৬৯
গ্রাহাম ৫০২
গিসবর্ণকোম্পানী৮৯ ১৩৮ ১৬৬ ১৮৪

১৯৮ ৩৪৫ ৪০৬ ৪৫৬
গোকুলনগর ২৬২ ৩৫০ ৪৫০
ঘড়িয়াল ৩৬৯ ৬৭০
ঘাটশীলা ৮ ৪৫ ৯১ ১৫৯ ১৬০ ১৭৫ ১৮৭-৯ ১৯৭ ২৩৭ ২৩৯-৪১ ২৫৮
ঘাটোয়াল১৮৭-৯ ৩৭২ ৩৮৩ ৩৮৭-৮ ৪০৬ ৪২৩ ৪২৪ ৪২৭ ৪৪৩ ৫০২

## চ ছ জ ঝ ঞ

চরক ৩৬০ ৩৬৪-৬৫ ৪১৩
চাকরাণ ২৫৩ ২৫৬ ২৫৯ ২৯৯ ৩০০ ৩৫৫ ৪২৩ ৪৪৭ ৪৫০
চন্ডী ২৫৩ ২৫৬ ৩৫২ ৪০৮ ৪১১-১২ ৪৫৩ ৪৬০
চুয়ারবিদ্রোহ ২৬৪ ২৬৬-৭০
চৈতন্যসিংহ ২৫৫-৫৭ ২৬০-৬২ ২৬৪ ২৬৬-৯ ২৭৪-৪ ২৭৭ ২৮৩-৫ ২৮৯-৯৪ ৩২৭ ৩২৯ ৩৩০ ৩৪৩ ৩৬৬-৮ ৩৮০ ৩৮২-৩ ৩৮৬ ৩৯২ ৪০৮ ৪৩৬ ৪৪৩ ৪৪৫ ৪৪৭ ৪৫০ ৪৬২ ৪৬৬ ৪৭০
চৈতন্যদেব ২২৮ ২৩০ ২৩৭ ২৪৮-৯
ছত্রী ৩৬৭ ৩৮৭ ৪১০
ছাতনা ২৫৪ ২৭১ ৩৪৫ ৩৭৩ ৪০৬ ৪০৮ ৪১৪ ৪১৯-২১ ৪২৭-৮ ৪৩১ ৪৩৪ ৪৬৮
ছান্দার ৩৬৭ ৩৮৭ ৪১০
জগতসিংহ
জয়পুর ২৮৪ ২৯১-৫ ২৯৭-৩০০ ৩০৪ ৩৭০ ৩৭৪ ৩৯০ ৪১২ ৪১৪ ৪৩৬ ৪৩৯ ৪৪৮
জামকুড়ি ২৮৪ ২৯১-৫ ২৯৭-৩০০ ৩০৪ ৩৭০ ৩৭৪ ৩৯০ ৪১২ ৪১৪ ৪৩৬ ৪৩৯ ৪৪৮
জাড়িষ্যা ১১৩
ঝাপান ১৬১ ৪১০

## ট ঠ ড ঢ ণ

টুসু ৪১৬ ৪১৭ ৪১৮
টেকচাঁদ ১৫৬ ১৫৮
টেগার্ট ১৫৩

## ত থ দ ধ ন

তাঁতী/তন্তুবায় ২৯ ১৭১ ১৮৭ ২৩১-৩ ২৪৭ ২৫৮ ২৮০ ২৮২ ২৮৫ ৩৬৫-৬ ৩৬৮ ৩৭০ ৩৭৪-৮০ ৩৮৪ ৩৮৯ ৪০৯ ৪১৫ ৪৩৪-৫
তুঙ্গভূম ১০ ১৮ ২৭ ২৯ ৩১-৩ ৫০ ১০২ ১১০ ১১৭-৮ ৪১৩
দন্ডেশ্বরী ২২১
দশশালা ৭৪ ৯০ ২০৫ ২০৯
দশাবতার ২২৭
দামোদরসিংহ২৫১ ২৫৭ ২৮৪ ২৯১-৩ ৪৬২
দামোদর অধ্বর্য্যু ১১ ১৮ ২৭ ২০২ ২০৪ ২০৬-৮ ২১৫ ৪৭৫
দুর্গা ২৯০ ৩০২-৭ ৩১২-৩ ৩৪৩ ৩৫২ ৩৬১ ৩৭৫ ৩৮০ ৩৯৩ ৪১৪ ৪২৬ ৪৪২ ৪৫৪-৬ ৪৬২ ৪৬৮
দুর্জনসিংহ ৩৫৪-৫ ৩৯২ ৪১৮ ৪৪১ ৪৬৯
দ্বারভাঙ্গা ১৬৬
দেবোত্তর ২৫৩ ২৫৭ ২৬৬ ২৮৫ ২৯১ ২৯২ ২৯৪ ২৯৬ ২৯৮ ৩০৯ ৩১১ ৩২৩ ৩২৬

ধর্মঠাকুর ৪০৮ ৪০৯
ধবল ১৮ ২৬ ৮২ ১৪০-১ ১৫২-৫ ১৫৭-৮ ১৬১-২
ধবলভূম২৭০ ৪২৪
ধীবর ৩০৬
ধোপা ৩১৪ ৩৮৪
নকুড় ১০১ ১০২ ১০৫ ১১৭ ১১৮
নটবর সিংহ ১০৪ ১০৬ ১০৮ ১১৪ ২০৩ ২৭৭ ২৯৭ ৩৭৬ ৪১৯ ৪২১-২
নিত্যানন্দ ২৮১ ২৯২ ৩১০ ৩৫৬-৭ ৩৬৫ ৩৮৮-০ ৪৩৬ ৪৩৯

## প ফ ব ভ ম

পঞ্চকি ২৫৩ ২৫৮ ৪২৩ ৫০২
পত্তনি ২৬৬ ২৬৯-০ ২৯৬ ৩০০ ৩০৯ ৩১১ ৩১৭ ৩২৭ ৩৩৩ ৩৩৫-৬ ৩৪৩-৯ ৪৬০-১
পরকুল ৪৬৯
পাঁচশালা ২৫২ ২৫৯ ২৭৩ ৪২৪
পাঁচাল ২৮৪ ৪১২
পাত্রসায়ের ২৫৪ ২৬৬-৭ ২৬৯-০ ২৯৭ ৩০০ ৩২২-৩ ৩২৭-৯ ৩৪৫ ৩৫৫ ৩৬৭-৮ ৩৭১-২ ৩৭৪ ৩৭৬ ৩৮৩ ৪০৯-১২ ৪১৪ ৪১৯ ৪৩৬ ৪৩৯ ৪৪১ ৪৪৭৮ ৪৫৬ ৪৬৬
পাঠান ২৬২ ৪৬৬
পাহাড়ী ২৬২-৪ ২৬৫
পূণ্যাহ উৎসব ২৭৫ ৪২৬
প্রজাস্বত্ত্ব আইন ৭৪
প্রদ্যুম্নপুর২৬ ২২৪-৫ ২২৮-৯ ২৩৩ ২৩৫ ২৩৭
ফতেসিং ২৮৪ ৩৯৭
ফার্গুসন ৪৫ ৬৭ ৭৭ ৮৪ ১১৮ ১৮১
ফুলকুসুমা ২৭১ ৪০৬ ৪২৪ ৪২৮ ৪৬৮
বগরী ২৫৪
বর্ধমান ৬০ ১৫৯ ২১৯ ২৪২ ২৪৫ ২৪৭
বনোয়ারীলাল (রামগড়) ৯৫ ৯৭
বরাভূম ৬০ ১৪২ ১৫১
বলভদ্ররাজা (অহিফেনসেবী) ৬৭ ৬৮ ৬৯
বর্গি ২৬২-৩ ২৮০ ৪৪৩ ৪৭০-১ ২৮১ ৩২০ ৩২৬ ৩৩০ ৪৭১
বড়হাজারী ২৭৪ ৩৬৭ ৩৭১-৩ ৩৮৩ ৩৮৭
বাউরী ২৭৫ ২৯৫ ৩০৬ ৩১৪ ৪১৬
বাঁকুড়া ৮৭ ১৭১ ২৩৭ ৩৩২ ৩৪৭
বাগদী২৭৫ ২৯২ ৩১৪ ৩৪২ ৩৫৫ ৩৭২-৩ ৩৭৬ ৩৮৫ ৪১১ ৪১৭ ৪৩৩ ৪৭০ ৪৭৫
বাঘুৎ ৮৭-৯ ১৯৫
বাসুলী ৫৪ ১৬৯-০ ১৭২ ১৭৪-৫ ১৭৮-১৮০ ১৮৩-৪ ১৮৬ ১৯০-৫
বাহাদুরখাঁ ২৪৬
বিজয়চন্দ্র সিংহচৌধুরী ১২০-১ ১২৪-৫ ১২৭-৮ ১৩০-১ ১৩৪ ১৩৬
বিশালাক্ষী ৩০৩ ৩০৪ ৩০৬
বিষ্ণুপুর২৬৯ ২৭১-৩ ২৭৭-৯ ২৮২-৩ ২৮৮ ২৯০-১ ২৯৩-৪ ৩০০-৮ ৩১৭ ৩২১-২ ৩২৭-৮ ৩৩০ ৩৩৬ ৩৩৯ ৩৫০-১ ৩৫৮ ৩৬৫ ৩৬৮ ৩৭০ ৩৭৪-৫ ৩৭৭-৮ ৩৮১ ৩৮৪ ৩৯০-১ ৩৯৫-৬ ৪০৯ ৪১৪-৫ ৪২১ ৪৩৬ ৪৩৯ ৪৪৪-৫ ৪৪৯-০ ৪৫৫ ৪৬১ ৪৬৫ ৪৭০
বীরসিংহ২৫৯ ২৮৫-৬ ২৮৮-৯ ২৯১-২ ২৯৪ ২৯৬ ২৯৮-৯ ৩৬৯ ৩৭০ ৩৭৪ ৩৭৬ ৩৯০
বেগডানলপ কোম্পানী ১৮৫

বেলিয়াতোড় ২৬৬ ৩২৯-২ ৩৫৩ ৩৮২ ৪৪২
বেলুট-গোবিন্দপুর ৩৬৮ ৪১০ ৪৩৯ ৪৪২ ৪৪৯ ৪৫০ ৪৬৮
ব্রজরাজপুর ২৮০ ৩২০ ৪১৫ ৪৭০-২
ভবানী ৩৪০ ৩৪৩ ৩৭৬ ৪২১
ভাদু ২৭৮ ৪১৫-৬
ভাস্করপণ্ডিত ১২৪ ২৪৭ ২৫৫ ২৬২ ২৮০ ৪৭০-১
ভূমিহীন ৪২৯ ৪৩১-৩
ভেলাইডিহা ৪১৫ ৪২১ ৪২২ ৪২৪ ৪৪৯ ৪৫৩ ৪৫৫ ৪৬৮
মথুরানন্দ ৩২০ ৩৮৯ ৩৯০
মল্ল ২২১-৫১৪
মনসা ৩১৬-৭ ৩৫৩-৪ ৩৫৬-৭ ৩৬৮ ৩৫ ৪০৯ ৪১০
মন্বন্তর ৭৩ ১১৪
মনোহরদাস ৩৮৮ ৩৮৯ ৩৯০
মন্দারণ ৩৭০ ৩৭২ ৩৭৭ ৩৮০ ৩৬৫
মজুর ২৮০ ৩৮৪-৫ ৩৮৮ ৩৯০ ৪২৩ ৪২৫ ৪৩৩ ৪৩৫ ৪৪৭
ময়নাপুর ৩৫০-৩ ৩৫৯ ৪০৮ ৪৫৮
মহামায়া ৩১৪-৬ ৩২৮ ৪০৭ ৪১১ ৪৬০
মহাদান৮৯
মহিষাড়া ৪২৪
মাধবসিংহ ২৫৩ ২৬৭-০ ২৯০
মানসিংহ ৫০ ২৩৬
মালাকার ২৫৮ ২৮২ ৩১৪ ৩২২ ৩৬৫ ৩৭৩ ৩৮৪
মালিয়াড়া ১৯ ২৭ ৬২ ৮১ ১৫১ ১৮৭ ২০২ ২০৪-১৯ ২৪৩
মোকাবরীস্বত্ব ২৬৬ ৪২৫ ৪২৭ ৪২৯ ৪৪৮ ৪৬১ ৪৮৬
মোলবোনা ১৬৯ ৫১১ ৫১৩
ম্যাকালপিন ৪২৭ ৪২৮
মৃন্ময়ী ৪৩ ৫৩ ১৯০-১ ২৭৮ ২৮৯ ২৯১-২ ৩০১ ৩০৪ ৩০৬ ৩২০ ৩৪০-১ ৩৯৩ ৩৯৫ ৪১২ ৪৫১

## য র ল ব শ ষ স হ

রঘুনাথ ৩০৩ ৩৫০ ৩৫২ ৩৮২ ৩৮৪ ৩৯১ ৪১৮
রঘুনাথসিংহ ৩৪৬ ৩৪৮ ৩৫১-৪ ৩৯২-৩ ৪০২
রঙ্কিণী ১২১ ১২৬-৮ ১৪১ ১৬৩
রজক২৬ ৩৩ ৭৯ ১৪০-১ ১৫৩ ১৫৯ ১৭৩ ৩৭১
রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী ২৯৩ ৩৮৫ ৪৩১ ৪৪০ ৪৪৭
রবার্টসন ২৫৯
রসপাল৪২ ৭৯ ৮০ ৮২-৩ ৮৭ ৯০-২ ৯৬
রাইচরণ ২৫ ৮২-৩ ১৪৮ ১৫২-৬
রাইপুর ২৫৪ ২৮৮ ৩০৪ ৩০৮ ৩৮১ ৪১১ ৪১৯ ৪২২ ৪২৪ ৪২৭ ৪৩০ ৪৬৮ ৪৭০
রাজগ্রাম ৬৯ ১০০ ১১৭ ১৩৩ ১৭১ ১৮৭ ৩২৭ ৩৭০ ৩৮০ ৪০৭ ৪৩৪
রাজস্ব ৪৫ ৬১ ৬৫ ৭০ ৭৭ ৭৮ ৮৩-৪ ৯১ ৯৩ ৯৪-৫ ১০৫-৬ ১০৯ ১১৬ ১৪৯ ১৫২ ১৬০ ১৬৭ ১৮১ ১৯১ ১৯৫-৭ ২০২ ২০৮ ২৩৯ ২৪৩ ২৪৬ ২৪৮-৯ ২৫০
রাজরাজেশ্বরী ২৯১-৪ ২৯৬ ২৯৮ ৪১২
রাজহাট ২৪৪ ৩৮০
রাজাকাটা ৩৭ ৪৪ ৪৬ ৮১ ১৫২

রামাইপন্ডিত ২৭৮ ৪০৮ ৩৫৩ ৩৫৯ ৩৬০ ৩৭২ ৪০৮
লক্ষ্মীসাগর ১২১ ১২৩ ১২৬-৯ ১৩৯
লাউগ্রাম ৩০৩
লাউসেন ৩৫৩
শরৎকামিনী ৪৮ ৭৩-৪ ১৬৬
শিকার উৎসব ২৫৮ ২৭৫ ২৯২ ৪১৬
শিব ৩১৮ ৩২৪-৫ ৩৫৭ ৩৬০ ৩৬৩ ৩৭৪-৫ ৪০২ ৪১৩-৪ ৪৫৮ ৪৬৫ ৪৬৯
শিল্পী ২৮৭ ৩০২ ৩০৬ ৩২৯ ৩৪৫ ৩৬৭ ৩৭০ ৩৭৫-৭ ৩৮০ ৩৮৪ ৩৮৯
শীতলা ৩১৮ ৩৫২ ৪১২
শ্রীপতি মহাপাত্র ২৭ ২৯-০ ৩১-২ ৪৬ ৫০ ৮৫ ১০১-২ ১০৭ ১১০ ১১৪ ১১৭-৮
শ্রীনিবাস আচার্য ২৭৭-৯ ২৮০-৩ ২৯২ ৩৪২ ৩৫৭-৮ ৩৬৫ ৩৬৯ ৩৭৭ ৩৮৩-৪ ৪১৪ ৪১৮ ৪৩৮-৯ ৪৪৬
শুভঙ্কর ২৬০ ২৭৯ ২৮০ ৩২২ ৪০৫ ৪১৮ ৪২১ ৫০৮
শূন্যপুরাণ ২৫৫ ২৭৮ ৩৫৩ ৩৫৯ ৪৩৬
শূর২৩১ ২৩৩-৫ ৩৭৭
শেরবোর্ণ ২৫৬ ২৬১ ২৬৪
শ্যাম ২৭৭ ৩০৪ ৩২০ ৩৫০-৩ ৩৫৫
শ্যামসুন্দরপুর ২৮৮ ৩০৪ ৩০৮ ৪১০ ৪২৪ ৪২৭-৮ ৪৪০ ৪৫২-৩
ষড়চক্রবাসিনী ৩৬
সর্বমঙ্গলা ২৯১ ৪১১-২
সলদা ২২৩-৬ ২৬২ ৩৫০ ৪০৮ ৪১১ ৪৭০
সন্ন্যাসী ২৫৩ ৪০৯ ৪১২-৩ ৪৩৫ ৪৪০ ৪৪৪ ৪৪৬
সাঁওতাল ২৬-৭ ৪৫-৬ ৫০ ৯৬ ১০০ ১২৯ ১৬০ ১৬৯-২ ১৭৬
সাজাপ্রথা ২৯৭ ৪২৯ ৪৩২-৩ ৪৪১ ৪৪৪ ৪৪৭ ৪৫২
সাতপাট্টা ৪১ ৪৬ ৪১১
সামন্তভূম ১৭১ ১৭৩-৪ ১৮০-১ ১৯৪-৫ ২৩৬
সামন্তসার ৪ ১০ ২৭ ২৯ ৩১-২ ৫০ ১০০ ১০২
সায়লা ২২১ ২২২
সাহারজোড়া ৬২ ১৮৭ ২০৭ ২০৯ ২১৯ ২৩৪ ৩১৪-৬ ৩৮১ ৪১১
সিমলাপাল ১০ ৪৭ ৬৯ ১০০ ১০৪-৬ ১০৯ ১১১ ১১৪-৬ ১৩৭ ২৪৬
সিংহহাজারী ২৯২ ২৯৪-৫ ৩৬৭-৮ ৩৭১ ৩৭৩
সুখনিদী ৮৪ ১৫১
সুন্দরনারায়ণ ৩২ ৪০ ৪৪ ৪৭ ৫৮ ৭৭-৮ ৮০ ৮২ ৮৯ ৯২-৬ ১২২
সুপুর ২৮৮ ৪১৫ ৪২৪ ৪২৭
সুবুদ্ধি ১৫০ ১৬২
সোমসার ৩১৩-৪ ৩৪৪
সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৬৬
হদলনারায়ণপুর ৩২২-৫ ৩৬৭ ৪১০-১ ৪১৫ ৪৪৯ ৪৫৫ ৪৭০-১
হরিশ্চন্দ্র ধবল ১৪৫ ১৫৮ ১৫৯
হাজারী ৩২৮ ৩৬৭ ৩৮৩
হান্টার ৪৩২ ৪৬৫
হাম্বির ২৬২ ২৭৭-৮ ২৮১ ৩০২ ৩১৬ ৩২০ ৩৩৮ ৩৫০ ৩৫৮ ৩৫৯ ৩৬৮ ৩৭০ ৩৭৭ ৩৯১ ৩৯৪ ৪১২ ৪১৪ ৪৪১ ৪৪৬ ৪৬৬
হেসেলরিজ ২৫৭ ২৬০ ২৬৪ ২৭৩
হেমলতা ২৭৭ ২৮২ ৩৮৪ ৪৩৬

গোকুলনগর গোকুলচাঁদের মন্দির

ছাতনা রাজবাড়ী সংলগ্ন
নতুন পঞ্চরত্ন বাসুলী মন্দির

বাঁকুড়া শহর সন্নিকটে এক্তেশ্বর মন্দির

বর্তমান ছাতনা রাজবাড়ী ও দুর্গামণ্ডপ

পুরান বাসুলী মাতার মন্দির

রাইপুর রাজাদের ব্যবহৃত শিলমোহর

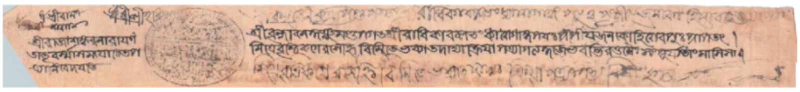

সাহারজোড়ার রাজা শঙ্করনারায়ণের পিতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণপত্র

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জেলা মুরশিদাবাদ এই যে জেলা বীরভূমের সংক্রান্ত মোকাম কান্দরার মুনসেফের ডিক্রীর টাকা রাধাকৃষ্ণ চৌধুরি ও জীবনকৃষ্ণ চৌধুরি বাদিগণের পাওনা কালিদাস মুস্তফি প্রতিবাদির দেনা আদায়কারণ চতুর্দ্দশবিভাগের প্রবল প্রতাপ শ্রীযুত বিবনু কমিস্যনর বাহাদুরের সন১৮৪১ ইংরেজীর ৭ অক্টোবর তারিখের চিঠির ও জেলা বীরভূমের শ্রীযুত জজ সাহেবের এই সনের ১৮ মাই ও সন ১৮৪২ ইংরেজির ২০ জানেওআরি তারিখের রুবকারি আদেশ মত প্রতিবাদির সম্পত্তি সন ১৮৪১ ইঙ্গরেজীর ১২ আইনের ৮ ধারার মর্ম্মানুযায়ি নীচের তপসিলমত সন ১৮৪২ ইঙ্গরেজীর তারিখ ৫ মাহ আপরেল মোতাবক সন ১২৪৮ সালের তারিখ ২৪ মাহ চৈত্র নীলামহওনের ইস্তাহার জারি হইল যদি প্রতিবাদী এই ইস্তাহারের লিখিত, সমুদায় টাকা নীলামের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্তপর্য্যন্ত দাখিল না করে তবে ঐ নীলামের নিরূপিত দিবসে দেনদার টাকা দিলেও তাহা গ্রহণ না হইয়া এই কালেক্টরীর কাছারিতে নীলাম হইবেক যে কেহ খরিদের বাসনা রাখহ ডাক আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব ফিশত ১৫৲ টাকা হিসাবে ফিস সমেত হাজির হইয়া আইনমত খরিদ করহ এ বিষয় সকলের জ্ঞাত কারণ ইস্তাহার দেওয়া গেল ইতি সন ১৮৪২ সাল তারিখ ২ মার্চ মোতাবক সন ১২৪৮ সাল ২০ ফাল্গুণ।

| নম্বর নাম | নম্বর বেজিষ্টরি | নাম মহাল | নাম তালুকদার | সদর জমা সালিয়ানা | তায়দাদ রকম যাহা নীলাম হইবেক | ডাইন ডিক্রীর টাকা ঠৈৎ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৫১ | কিসমত মৌজে পাকুড় হাম | কৃষ্ণগোপাল ও আনন্দ কিশোর ওকাশী দাস্যা ও কালিদাস মুস্তফী ও সুধাময়ী ওপ্রাণকমলা | ৭৩৯৻১১ | এই মহাল মধ্যে নিজ পাকুড় হাম ও জানুর ও বানী পুরেরজকম৶ দুই আনি কালিদাস মুস্তফীর হক নীলাম হইবেক। | শ্রীযুত জজ সাহেবের সন ১৮৪১ সাল ১৮ মেই তারিখের রুবকারি অনুযায়ি ৫৯৷৶১২কো<br>ইস্তক সন ১৮৪০ সালের ৫ মাহ মেই লাগাত সন ১৮৪২ সালের ৪ মাহ আপরেল মুদ্দত ১।১১।৪ দিনের ৩৫ টাকার সুদ ৮৶০<br>৬৭৷৷৶১২ কোম্পানি |

সদর বোর্ডের সন ১৮৪১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ২৫ নম্বরের সরকুলেরের চিঠির আজ্ঞানুযায়ি বিজ্ঞাপন করা যায় যে উক্ত ভূমির সাবেক মালিকের উপর যে সকল দায় আছে তাহা খরিদারকে অর্পিবেক এবং মাহালের পর সরকারের যে দাওয়া থাকে ঐ নীলামের দ্বারা কিছু লোপ হইবেক না ইতি।

*Moorshedabad Collectorate, 12th March, 1842* — C D Russell, *Actg Collector*

---

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জেলা মুরশিদাবাদ এই যে সন ১৮৪১ সালের ১২ দ্বাদশ আইনের তৃতীয় ও ষষ্ঠ ধারার মর্ম্মানুযায়ি এ জেলার সংক্রান্ত বাটোয়ারার অধীন ও অন্যং সমুদয় মাহালাতের সন ১২৪৮ সালের নাগাইদ কিস্তী ফাল্গুণের সরকারের বাকী রাজস্ব আদায় জন্য সদর বোর্ডের সাহেবান সন ১৮৪২ সালের ৫ আপরেল মোতাবেক সন ১২৪৮ সালের ২৪ চৈত্র নীলামের দিবস ধার্য্য করিয়াছেন অতএব উক্ত আইনের মর্ম্মানুযায়ি ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত মাহালাতের তালুকদারান নীলামের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্তপর্য্যন্ত আপনং জেম্মার মালগুজারি বেবাক দাখিল না করে তবে উক্ত নীলামের দিবস বাকীদারের টাকা গ্রহণ না করিয়া মাহালাত নীলাম হইবেক যে কেহ খরিদের বাঞ্ছা রাখহ নীলামের দিবস নীলামের ডাক আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব ফিশত ২৫৲ পঁচিশ টাকার হিসাবে ফিসের টাকা সম্বলিত হাজির হইয়া আইনমত খরিদ করহ এ বিষয় সকলের জ্ঞাতার্থে ইস্তাহার দেওয়া গেল ইতি সন ১৮৪২ সাল তারিখ ৮ মার্চ মোতাবেক সন ১২৪৮ সাল তারিখ ২৬ ফাল্গুণ।

*Moorshedabad Collectorate, 12th March, 1842* — C D Russell, *Actg Collector*

---

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেকটরি মোং বাঁকুড়া জেলা বর্দ্ধমান।

সন ১৮৪১ সালের ১২ আইনের মর্ম্মানুসারে নীচের লিখিত মহালাতের বাকালা সন ১২৪৮ সালের লাগাত ফাল্গুণের কিস্তির সরকারী মালগুজারির বাকি টাকা আদায় কারণ প্রবলপ্রতাপান্বিত শ্রীযুত সাহেবান সদর বোর্ডের সন ১৮৪১ সালের ৬ অকটোবরের সরকুলরের চিঠীর আজ্ঞাপ্রমাণ সন ১৮৪২ সালের ৫ আপরেল মতাবক সন ১২৪৮ সালের ২ চৈত্র মঙ্গলবার দিবা দুই প্রহরের পর জেলা বর্দ্ধমান মোকাম বাঁকুড়ার কালেক্টরি কাছারিতে প্রকাশ্যরূপে নম্বরওয়ারি শ্রেণীমত নীলামে বিক্রয় হইবেক নীলামের দিবসের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সরকারী বাকি দাখিল হইবেক তৎপরে নীলামের নিরূপিত দিবসে কোনক্রমে বাকি টাকা দাখিল হইবেক না যেহেতু ইস্তাহারী মহলাত খরিদ করিবার বাসনা রাখহ নির্দ্ধারিত দিবসে জেলা বর্দ্ধমান মোকাম বাকুড়ার কালেক্টরি কাছারীতে হাজির হইয়া দাখিল করিবা নীলাম শেষ হইলে পর মূল্যের টাকার চতুর্থাংশ অর্থাৎ সিকি টাকা নগদ কি বাঙ্গালবেঙ্ক নোট অথবা ঐ বেঙ্কের পোষ্টবিল কিম্বা দাঁড়ামত দস্তখৎকরা কোম্পানির প্রোমিসরি নোট বায়নার স্বরূপ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক খরিদারকে নীলামের দিবসাবধি ত্রিংশত্তম অর্থাৎ ত্রিশ দিবসের মধ্যে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব অবশিষ্ট মূল্যের সমুদায় টাকা দিতে হইবেক ইতি।

| নম্বর লাট | নাম মহাল ও পরগনা | মালিকের নাম | জমা সদর | তাবদাদ রকম যাহা বিক্রয় হইবেক | বাকী মালগুজারির লাং ফাল্গুণ। |
|---|---|---|---|---|---|
| ৫ নং | কুচ্যাকোল | বীরসিংহ দে বাবু | ৮২৮৪৷৶৯ | জমিদারি মুস্তমম | ৪২১৻৪ |
| ৬ নং | পচাল | রঘুনাথ মিত্র | ৪০৮৷৷/৯ | ঐ | ৪৩৭/ |
| ৭ নং | জামতড়া | কৃষ্ণপ্রসাদ পাঠক দীং | ৬৩৪১৸৶২ | ঐ | ৫৪২৶৬ |
| ৮ নং | মেলিয়াড়া | আমালসিংহ অধ্যক্ষ | ৫২৭৬৷৯ | ঐ | ৻৪ |

*Government Gazette, 22d March, 1842* ]

( ১৩৮ )

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৯ নং পং সাহারজোড়া | রাজাশঙ্করনারায়ণ সিং | ৬১১০৫ | ঐ | ৫১৪।৵৮ |
| ১৩ নং লহমা | অযোধ্যানাথ হাজরা সিং | ৫৫৪৵৪ | ঐ | ১৮৪৵৪ |

ইহারা মহালাত যাহা সকল মেয়াদি সুরত বন্ধক।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৪ নং | চাতরা কৃষ্ণনগরের জঙ্গলের আবাদী | কিশোরদাসমহান্ত | ৬০৲ | ২০৲ |
| ১৬ নং | পাইকবাশা | বেচারাম ভট্টাচার্য্য সকন | ১৩১৵৮ | ৪৵৮ |
| ১৭ নং | গাজজোড়া | রাজা জয়সিংহ ও মির আজলাম আলি | ৪৪/৯ | ২২/৯ |
| ১৮ নং | জমুনাবাদের আথান | শ্রীলশ্রীমহারাণী গোপালসিং | ১১৬৶৭ | ৫৶৭ |
| ১৯ নং | খোষমাজডিহি | রাজা জয়সিংহ | ১৯৩৫৵৬ | ২৭৮৵৪ |
| ২০ নং | জামসনা | মেহের আলি | ১৮২৴ | ৬০৪৴ |
| ২১ নং | জুনসরা | বীরসিংহ দেব | ২৩০৪।৶৪ | ১৩০৩।৶৪ |
| ২৩ নং | রাধারমণপুর | চন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী | ৩০৪৶০ | ২৭৪৶০ |

*Bancoorah Deputy Collectorate, 12th March, 1842*    R. P HARRISON, *Deputy Collector*

---

এস্তাহারনামা কাছারি কালেকটরি
জিলা ঢাকা জালালপুর এই যে

১৮৪১ সনের ১২ আইনের ৩ তিন ধারা ও সাহেবান সদর বোর্ডের ঐ সনের ৬ অক্টোবরের বিধিঅনুসারে লেখা যাইতেছে যে যে সকল মহালের সদর জমা সং ১০৲ টাকার অধিক তাহার ১২৪৮ সনের লাগায়ত কিস্তি ফাল্গুনের বাকি আদায় জন্যে ও যে সকল মহালের সদর জমা দশ টাকার অধিক নহে ঐ রকমের মহালাতের বাকি আদায় না হইলে ১৮৪২ সনের ৫ আপ্রেল মোং ১২৪৮ সনের ২৪ চৈত্র এ জিলার কালেক্টরি কাছারিতে নিলামে বিক্রয় হইবেক উক্ত মহালাতের মালগুজারদারানের উচিত যে আপন জিম্মার বাকি খাজানা ৪ আপ্রেল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে অথবা তাহার পূর্ব্বে আদায় করে যদি বাকীদারান উক্ত নিয়ম মতে বাকি আদায় না করে তবে ঐ বাকী টাকা না লইয়া বাকীর মহালাত নিলাম করা যাইবেক আর খাজানা না লওয়ার আপত্তি গ্রাহ্য হইবেক না ও যে কেহ নিলাম খরিদের বাসনা রাখহ ঐ তারিখে হাজির হইয়া খরিদ করহ ইতি সন ১৮৪২ ইং ২৫ ফেব্রুআরি মোং ১২৪৮ সন বাং ১৫ ফাল্গুণ।

W J ALLEN, *Offg Collector*
*Dacca Collectorate, 24th February, 1842*

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৪২ ২২ মার্চ।]

---

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত উলিয়ম মিচল সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সাহারজোড়া সহ বিভিন্নমহলের নিলাম নোটিশ

বলভদ্র সিংহের রাইপুরের
রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ (নতুন গড়)

রাইপুরের রাজার
ভগ্নপ্রায় বাড়ী (হরিহরগঞ্জ)

রাইপুরের মহামায়া

রাইপুরের ভগ্নপ্রায় নীলকুঠি :
গিসবোর্ণ কোম্পানীর
ম্যানেজারের আবাস

রাজা দুর্জন সিংহের ব্যবহৃত হাত কামান ও খড়্গা

রাইপুর রাজবাড়ি সংলগ্ন
কুলদেবালয় ও প্রাচীন রাজদ্বার

রাইপুরের মিরণ শাহের সমাধি

ফুলকুসুমা রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ

রাজবাড়ী সংলগ্ন জগন্নাথ মন্দির

দামোদরবাটী চৌধুরীদের দারুবিগ্রহ (দুর্গা)

রসপালের রাজের কুলদেবতা

শ্যামসুন্দরপুর নতুন রাজবাড়ীর একাংশ

মটগোদার ধর্মঠাকুর

মটগোদার ধর্মঠাকুরের মন্দির

ভগ্নপ্রায় সিমলাপাল রাজবাড়ী

সিমলাপালের রাজপরিবারের দুর্গাপূজা

সিমলাপালের ভগ্ন রাজবাড়ী ও মন্দির প্রাঙ্গণ

ধ্বংসপ্রাপ্ত ভেলাইডিহা রাজবাটীর অধুনালুপ্ত রাজদ্বার

ভেলাইডিহার রাজার ধ্বংশপ্রায় কুলদেবতার মন্দির

লক্ষ্মীসাগরের রঙ্কিণী দেবীর মন্দির

লক্ষ্মীসাগরে রঙ্কিণী দেবী

১৯২৮ সালে প্রাণবল্লভ প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির

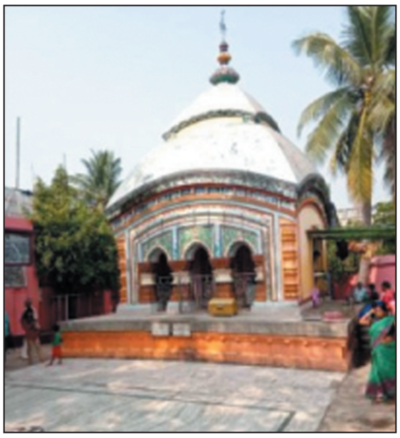

ব্রজরাজপুরের শ্যামরাই মন্দির

খাতড়ার রাজার দুর্গামণ্ডপ ও
সংলগ্ন শ্যামসুন্দর মন্দির

খাতড়ায় ভগ্নাবশিষ্ট রাজবাড়ীর প্রবেশ দ্বার

ভগ্নপ্রায় অম্বিকানগর রাজবাড়ী

অম্বিকানগর রাজবাড়ী সংলগ্ন রাসমঞ্চের ভগ্নাংশ

সুপুরের কালাচাঁদ মন্দির :
ধ্বংসের অপেক্ষায়

অম্বিকানগরের রাজবাড়ী প্রাঙ্গণে
কালাচাঁদ (বাঁ দিকে) মন্দির ও
শিব মন্দির (ডান দিকে)

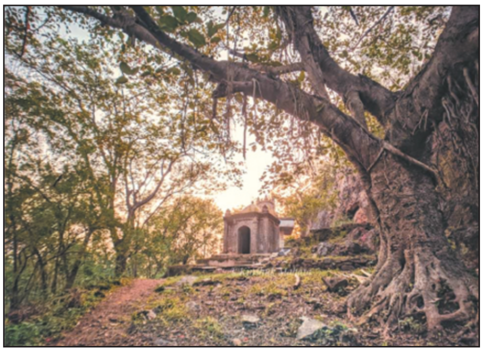

খাতড়ার মশক পাহাড়

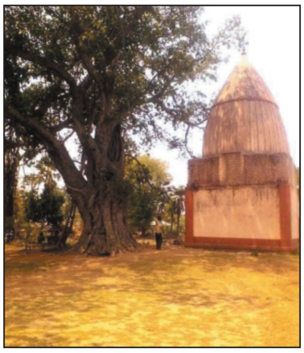

ধবলভূমের প্রথম রাজধানী
ভোজদায় শিবমন্দির

মালিয়াড়া রাজবাড়ীর একাংশ

মালিয়াড়া রাজবাড়ী প্রাঙ্গণে নাট্যমণ্ডপ

মালিয়াড়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীর
প্রথম পর্বের রায়েদের বিষ্ণু মন্দির লিপি

রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ চন্দ্রাধূর্য্য

মালিয়াড়া রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়
পরগণার একমাত্র কালী মন্দির ও মূর্তি

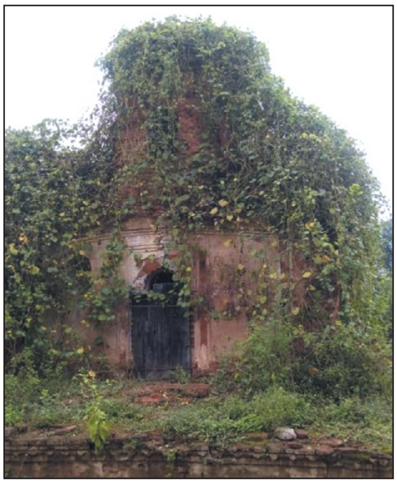

মালিয়াড়া কায়স্থ পাড়ার বিশ্বাসদের (পাত্র)
গৃহদেবী চণ্ডীর মন্দির। দুর্গার এক রূপ
বলে বিশ্বাস। ধাতু মূর্তি বর্তমান।

মুকুটমণিপুর জলাধারে নিমজ্জিত সুবুদ্ধিদের
শতাব্দী প্রাচীন লক্ষ্মী-জনার্দন মন্দির

জামকুড়িতে ভগ্নপ্রায় রাজা দামোদর
সিংহের দুর্গ ও আবাসস্থল

মালিয়াড়া পরিবারের বিষ্ণু মন্দির

মালিয়াড়া রাজাদের তৈরি
ডিসপেনসারির আদি ভবন

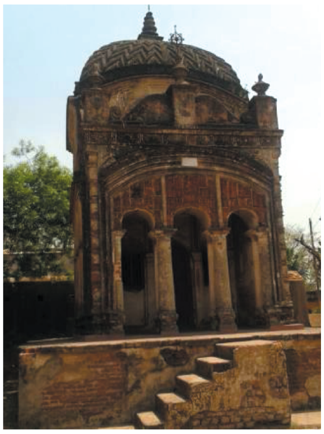

মালিয়াড়া রানী শ্রদ্ধাবতী প্রতিষ্ঠিত
১৮৬৫ সালের শিবমন্দির

মালিয়াড়ায় রাজাদের পূজিত
অষ্টধাতুর দুর্গা প্রতিমা

মালিয়াড়া রাজ পরিবারের
রাসমঞ্চ এবং অন্যান্য মন্দির

মালিয়াড়া রাজ পরিবারে কুলদেবীর আরাধনা

ধ্বংসের অপেক্ষায়
মল্লরাজভবন (হাওয়ামহল)

অযোধ্যার বন্দ্যোপাধ্যায় রাজবাড়ী প্রাঙ্গণ

বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ

সোমসার জমিদার বাড়ির একাংশ

হদলনারায়ণপুরের জমিদার বাড়ি

হদলনারায়ণপুর জমিদারির দুর্গা মণ্ডপ

সাহারজোড়া প্রাচীন মহামায়া
মন্দিরের সংস্কৃত রূপ

ওন্দার দামোদরবাটী চৌধুরীদের জমিদার বাড়ি

কুচিয়াকোলের প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত
জমিদার বাড়ির দুর্গামণ্ডপ

পাত্রসায়েরের হাজরা জমিদারদের
শিব মন্দির প্রাঙ্গণ

বাঁকুড়ার কুষ্টিয়ায় শিট পরিবারের
দুর্গা মন্দির ও জমিদার ভবন

সোনামুখীর জমিদারির
প্রতিষ্ঠাতা অধর চন্দ্র দে

সোনামুখী দে পরিবারের
সরস্বতী মন্দিরের চূড়া

বিষ্ণুপুরের নন্দলাল মন্দির

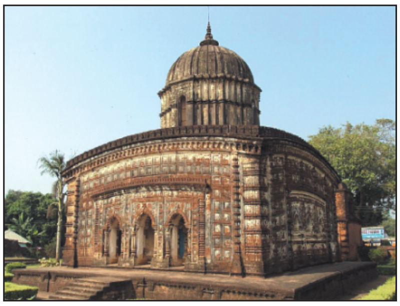

বিষ্ণুপুর লালজি মন্দির

কোতলপুরের ভদ্র জমিদার বাড়ি

বিষ্ণুপুর রাধেশ্যাম মন্দির

শ্যামরায় মন্দির

বাঁকুড়ার প্রাচীন চাতরা অস্থল

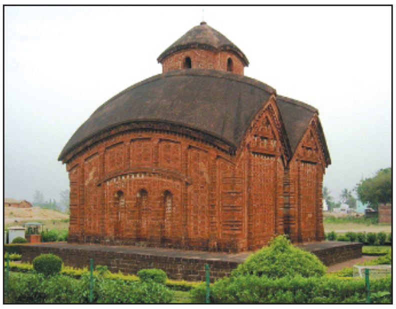

বিষ্ণুপুর জোড়-বাংলা মন্দির

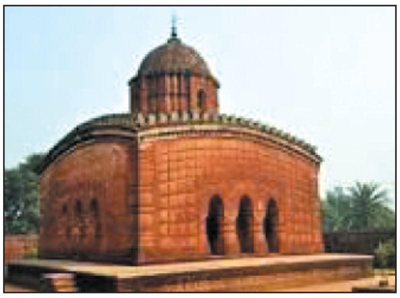

বিষ্ণুপুর মদনমোহন মন্দির

জামকুড়ির রাজবাটীর সন্নিকটে
রাজরাজেশ্বরীর মন্দির

জামকুড়ির রাজরাজেশ্বরী

মৃন্ময়ী মন্দিরে মায়ের মূর্তি

বিষ্ণুপুরের প্রাচীন মৃন্ময়ী মন্দিরে

নারিচা সর্বমঙ্গলা মন্দির

মোলবোনার মৌল্লেশ্বরের মন্দির

ডিহরের ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরি
প্রাচীন শৈলেশ্বর ও ষাড়েশ্বর মন্দির

বিষ্ণুপুরে শ্রীনিবাস আচার্যের সমাধি

বড়জোড়া তন্তুবায় পোড়েলদের
পঞ্চরত্ন মন্দিরের
প্রতিষ্ঠালিপি : ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের

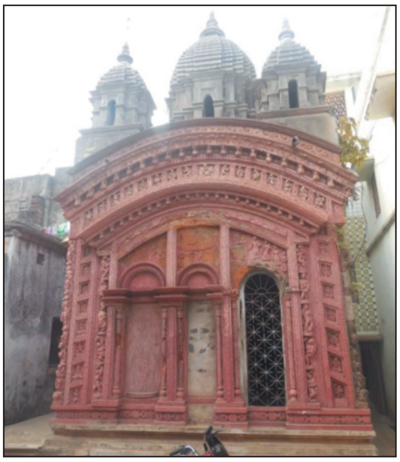

রাজগ্রামের কুনডুদের প্রাচীন মন্দির

বড়জোড়া তন্তুবায় পোড়েলদের
১৭৯৮-১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের মন্দির

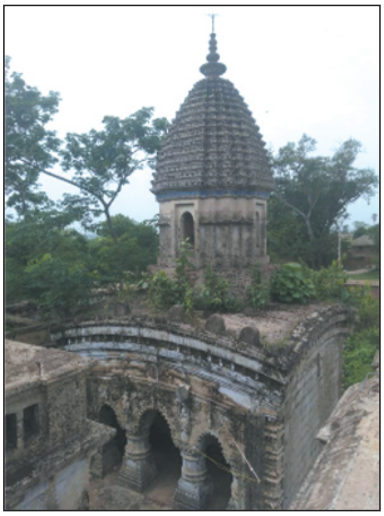

বেলুট-গোবিন্দপুরের রাম মন্দির

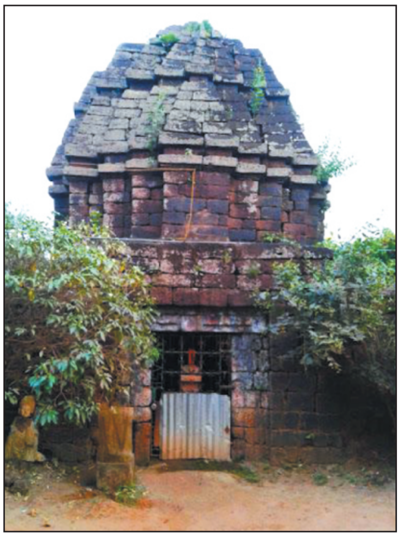

ময়নাপুরের সুপ্রাচীন হাকন্দ মন্দির

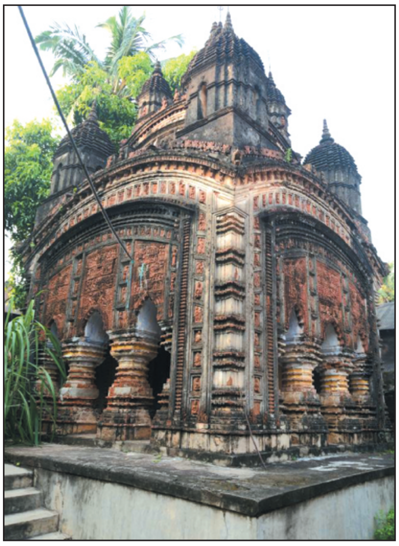

গোকুলনগরের গন্ধেশ্বরের মন্দির

জয়পুরের দেপাড়ার নবরত্ন বিষ্ণুমন্দির

রাউতখণ্ড নাপিতপাড়ায়
দে পরিবারের পঞ্চরত্ন মন্দির

জয়পুর-রাজগ্রামের গিরিগোবর্ধন মন্দির

রাজগ্রাম রাহাবাড়ীতে দামোদর মন্দির

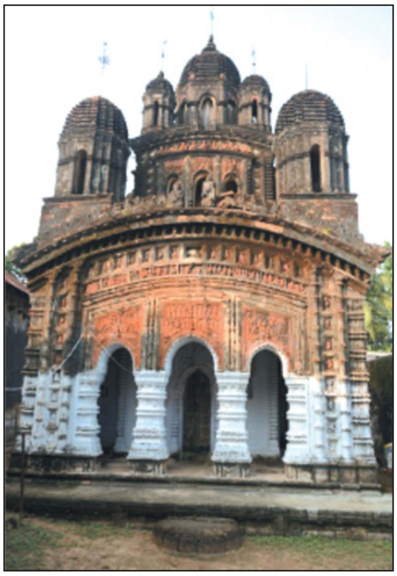

জয়পুর দত্তপাড়া নবরত্ন
রাধাদামোদর মন্দির

ওন্দার বিক্রমপুরের গোপাল জীউয়ের মন্দির

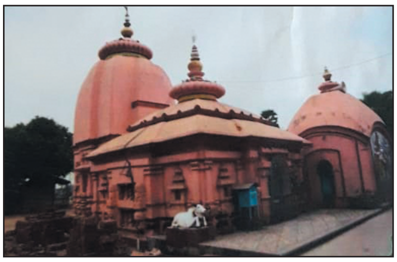

সিহরের শান্তিনাথ মন্দির

জয়পুর গোস্বামীপাড়ায়
প্রাচীন আটচালা মন্দির

১৬৫৯ সালে নির্মিত
বৈতল গ্রামের চণ্ডীর মন্দির

১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত
বৈতলের পঞ্চরত্ন শ্যামচাঁদ মন্দির

বালসী পূর্বপাড়ায় দুই চালার
বিষ্ণু ও শিখর শিব মন্দির

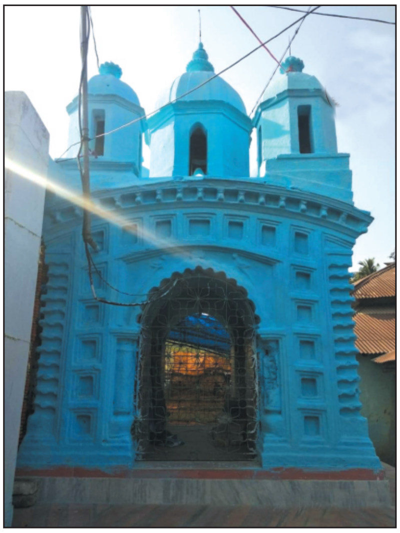

গোড়াশোল গ্রামের প্রাচীন রাধা-মাধব মন্দির

পাত্রসায়ের ঘোষালপাড়ায়
একরত্ন কালঞ্জয় মন্দির

ছাতনা-দুবরাজপুর রাজবাটীর
ধ্বংসপ্রাপ্ত বাসুলী মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি

লোকপুরের ইসমাইল গাজীর দরগা

পাত্রসায়ের ঘোষালপাড়া
শিখর-দালান-চালা রীতির মন্দির

নারিচা সর্বমঙ্গলা মূর্তি

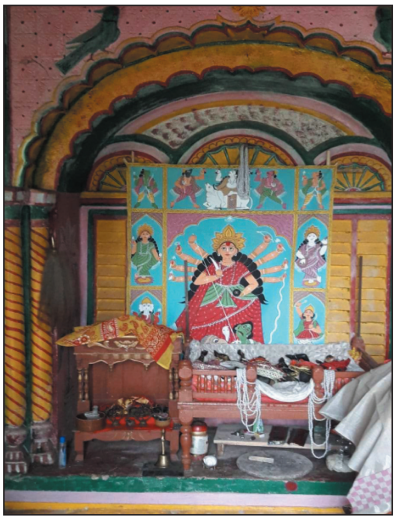

কুচিয়াকোল রাজবাড়ীর দেবী দুর্গা

তালডাংরা-দেউলভিড়ার জৈন মন্দির

গোড়াশোল গ্রামের
প্রাচীন রাধা-মাধব

কাঞ্চনপুর গ্রামের
প্রাচীন রাধা-মাধব মন্দির

নারিচা সর্বমঙ্গলা মূর্তি

সোনামুখীর চীপের নীলকুঠি

ভেলাইডিহা নতুন রাজবাড়ী প্রাঙ্গণে
কুলদেবতার মন্দির

লাউগ্রামের দণ্ডেশ্বরীর মূর্তি

ধ্বংশের পথে কুচিয়াকোল রাজবাড়ী

লক্ষ্মীসাগর রঙ্কিনীতলায় তীর্থঙ্করের মূর্তি

সোনামুখীর স্বর্ণমন্দির ও
দেবীর ডানপাশে বুদ্ধমূর্তি

ভেলাইডিহা রাজপরিবারের
কুলদেবতা রাধা-কৃষ্ণ

বীরসিংহের কর্মকার পরিবারের
আঁকা দামোদর সিংহ (সৌজন্যে :
জলধর হালদার)

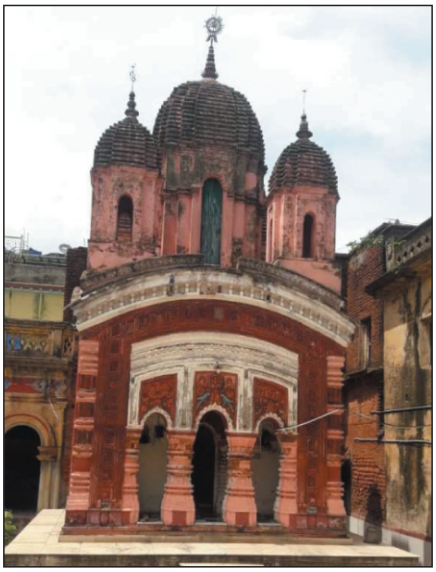

হদল-নারায়ণপুর বড়তরফ মণ্ডল
জমিদারির কুলদেবতা রাধা-কৃষ্ণ মন্দির

হদল-নারায়ণপুর মেজোতরফ মণ্ডল
জমিদারির কুলদেবতা রাধা-কৃষ্ণ মন্দির

হদল-নারায়ণপুর ছোটতরফ
মণ্ডল জমিদারির কুলদেবতা
রাধা-দামোদর মন্দির

বালসী লক্ষ্মীনারায়ণমূর্তি

বালসী লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির